আর্য্যদর্শন।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, বার্ত্তাশাস্ত্র,
জীবনবৃত্ত, শব্দশাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি-বিষয়ক

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্‌ এ
সম্পাদিত।

৩২ প্রথম খণ্ড।

১২৮১ সাল।

কলিকাতা।

৪৩ নং মলঙ্গা লেন বহুবাজার, নূতন ভারতযন্ত্রে
শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৩৷৷০ টাকা।

ডাকমাশুল সমেত ৪৲ টাকা।

সন ১২৮১ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

বৈশাখ মাস।

শ্রীযুক্তবাবু চন্দ্রমোহনমাল
কাঁথি কাঁটানালা বাজার ৩৶৹
" দক্ষিণ প্রসাদ নেউগী
দিনাজপুর কালিতলা…৩৶৹
" গুরুপ্রসন্ন রায় দিনাজ-
পুর কালিতলা … ১৸৵৹
" সত্যশরণ মুখোপাধ্যায়
বাদাইখাড়া রাজসাহী ৩৶৹
" কালীকিশোর মুন্সি
সেরপুর বগুড়া … ৩৶৹
" রাধাগোবিন্দ রায়
দিনাজপুর … ৩৶৹
" রসিক লাল সিংহ
মৃজাপুর কলিকাতা … ৩৲
" নূর চন্দ্র সেন
চট্টগ্রাম … ১৷৵৹
" পূর্ণেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
জলপাইগুড়ি … ১৸৵৹
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
হিন্দুস্কুল কলিকাতা…২৸৵৹
" যশোদানন্দন প্রামাণিক
কান্দী … ৩৷৶৹
" আনন্দ মোহন বৰ্দ্ধন
কোমিল্লা ত্রিপুরা …৩৷৶৹
" আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
ক্যানিংকালেজ লক্ষ্ণৌ…৩৷৶৹

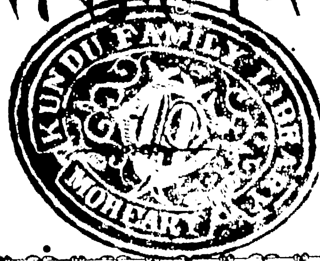
শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ রায়
মুরশিদাবাদ সাহানগর…৩৶৹
" গিরিশচন্দ্র ঘোষ
কাঁথি …১৷৵১০
" অতুল চন্দ্র সিংহ
কমিল্লা ত্রিপুরা … ৷৶৹
" হেমচন্দ্র ঘোষ
জয়নগর মজিলপুর… ৩৷৶৹
" তারকনাথ মুখোপাধ্যায়
কদম্বগাছি বারাশাত… ৷৷৶৹
" কৃষ্ণগোপাল বন্দোপাধ্যায়
রাজসাহী …৩৷৶৹
" উমাচরণ চক্রবর্ত্তী
রামপুর হাট … ২৶৹
" অপূৰ্ব্বকৃষ্ণ পাল
মৃজাপুর …৩৷৶৹
" তফজেল হোসেন
সুন্দরপুর নদীয়া … ৷৶৹
" মহেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
কটক … ১৸৶৹
" রামলাল পাল
আগরা … ৩৷৶৹
" হরিবিলাস আগরওয়ালা
তেজপুর আসাম …২৸৵৹
" দুর্গাদাস আচার্য্য চৌধুরী
মুক্তাগাছা মৈমনসিংহ…৩৷৹

শ্রীযুক্তবাবু হরচন্দ্র রায়
রামপুর, বোয়ালিয়া ... ৩।৵৹
" ঈশ্বর চন্দ্র রায়
জামার্কি মৈমনসিংহ ৩৶৹
" নৃসিংহরাম চট্টোপাধ্যায়
হরিহরপুর বহরমপুর ... ৩৶৹
" চন্দ্র কিশোর তরফদার
কলুটোলা কলিকাতা ... ৩৲
" যদুনাথ সেন
জয়পুর রাজপুতানা ... ১॥৴৹
" কৃষ্ণ নাথ চন্দ্র
সিরাজগঞ্জ ... ২৶৹
" রঘুনাথ দাস মহাপাত্র
মহাপাল মেদিনীপুর ... ৩।৵৹
" সারদারঞ্জন রায়
ঢাকাকালেজ ... ৩।৵৹
" কৃষ্ণকিশোর রায়
সলূয়া দমদম ... ১৴১০
" রাজনারায়ণ বন্দোপাধ্যায়
গোবরডাঙ্গা ... ।৵৹
" সিদ্ধেশ্বর বসু
ঘুঁটেবাজার হুগলি ৩।৵৹
" নিতাই প্রসাদ বসু
মাহীগঞ্জ ... ৩।৹
" রাজারাম রায়
হরিহরপাড়া বহরমপুর ৩৶৹
" চণ্ডীকালপ্রসন্ন মজুমদার
নওয়াখালী ৩৶৹
" দীনবন্ধু রায়
রাণীগঞ্জ ৩৶৹
" রাসবিহারীচৌধুরী
রাণীসঙ্কোল দিনাজপুর ৩।৹

শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী দাস
কান্‌সীদেনা ... ৩৶৹
" শম্ভুচন্দ্র দে
কমলগঞ্জ শ্রীহট্ট ... ৩৶৹
" গোলোকচন্দ্র শর্ম্মা
মণ্ডলীভুগ ... ৩৶৹
" ভুবনমোহন চৌধুরী
মাহীগঞ্জ রংপুর ... ৩।৵৹
" রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গোপালপুর রংপুর ... ৩।৶
" চন্দ্রনাথ সিংহ ঐ ... ৩।৵৹
" রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
কান্দিরপাড় কমিল্লা ... ৩।৵৹
" দীননাথ চট্টোপাধ্যায়
কাকুর অযোধ্যা ... ।৵৹
" রমণীমোহন চৌধুরী
তুষভাণ্ডার রংপুর ... ৩।৵৹
" শরৎচন্দ্র লাহিড়ী
মুক্তাগাছা মৈমনসিংহ ... ৩।৹
" রঘুনাথ মুস্তৌফ
নাথিলা বগুড়া ... ৩।৹
" বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী
কুলিয়া গোপীগঞ্জ ... ৩।৵৹
" দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী
পারলিয়া নার্শিংদি ঢাকা ... ৩।৵৹
" শ্রীশচন্দ্র দত্ত
গড়বেতা মেদিনীপুর ... ৮৶৹
" শ্রীনাথ সেন
নাটুদহ ১॥৵৫
" কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়
সিউড়ি ৩।৴৹
" অম্বিকা প্রসাদ শর্ম্মা
নওগাঁ আ্যাসাম ৩।৵৹
" নবীনচন্দ্র পাল পুরুলিয়া ১॥৶৹
রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায়
জেমো ৩।৵৹

সূচিপত্র।

আর্য্যদর্শন।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

প্রথম খণ্ড। বৈশাখ ১২৮১। [প্রথম সংখ্যা।

অবতরণিকা।

আমরা একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে উদ্যোগ করিতেছি, ইহার নাম "আর্য্যদর্শন" রাখিলাম। জ্ঞান ও নীতির চর্চ্চা এবং প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। যাহাতে উপদেশ আমোদ-সহকৃত হইয়া সকলের উপাদেয় হয়, তদ্বিষয়ে আমরা সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইব। তন্নিমিত্ত লঘু ও গুরু বিষয়ের সমাবেশ করিতে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। কিন্তু আমোদ ও কৌতুকের নিতান্ত ছড়াছড়ি হইলে, জ্ঞান ও নীতির সজীবতা নষ্ট হয়, একথা আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না। ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের অধিক পরিমাণে আলোচনা হইবে, এবং কাব্য কলা ও উপাখ্যানের জন্যও যথোচিত স্থান প্রদত্ত হইবেক। সময়ে২ নব্যসমাজ এবং নব্যসম্প্রদায়ের অভাব ও কর্ত্তব্যের বিষয় কীর্ত্তন হইবেক, এবং এই উভয়ের সহিত প্রাচীন সময়ের ও প্রাচীন সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ ও সাপেক্ষতার আলোচনা করা যাইবেক।

কিন্তু আমরা জানি যে, নিজের ভাব ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা যেরূপ প্রবল, অন্যের মনের কথা শুনিবার ইচ্ছা সচরাচর সেরূপ

প্রবল দেখা যায় না। অনেক সময়ে মনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা অনিবার্য্য ও নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। তথাপি বিবেচনা করা উচিত, যে যখন আমরা কোন সুহৃদের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করি, তিনি স্থির ভাবে কখন ২ সকৌতুক মনেও উহা শ্রবণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা কেবল প্রণয়ের অনুরোধে নয়। তিনি প্রত্যাশা করেন আমরাও তাঁহার নিজের কথায় তাদৃশ মনোযোগ ও কৌতূহল প্রদর্শন করিব। এইরূপ বাধ্য-বাধকতা থাকাতে আমরা স্বজনের নিকট তাদৃশ সাবধান না হইয়া বরং সময়ে ২ বিরক্তিকর হইয়া ও পার পাইয়া থাকি।

কিন্তু যখন সমাজের নিকট কোন কথা বলিতে হইবে, তখন যত সম্ভব সতর্ক হওয়া উচিত। সমাজ শ্রোতা, লেখক বক্তা, কদাচ এ সম্বন্ধের বিপর্য্যয় ঘটিবেক না। সুতরাং সমাজের নিকট আমরা নিয়তই বাধ্য থাকিব। সমাজ এ হিসাবে আমাদের নিকট কখন বাধ্য হইবেন না। লেখকের নিকট সমাজের অন্যরূপে বাধ্যতা জন্মে; কিন্তু উহা কালও পরীক্ষা-সাপেক্ষ। অতএব আমরা একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে উদ্যত হইয়া যাহাতে পাঠকগণের বিরক্তি বা পণ্ডশ্রম না হয়, তদ্বিষয়ে দায়ী হইতেছি। আমরা এরূপ অঙ্গীকার বা প্রত্যাশা করি না, যে আমাদের উক্তি নিয়তই আমোদকর হইবেক। কিন্তু আমাদের ভরসা এই, আমাদের রচনা, জ্ঞান ও নীতির অনুসরণ করিতে কখন বিমুখ হইবে না। আমরা বাক্যবিন্যাস বিষয়ে ডাক্তারী চিকিৎসার অনুকরণ করিব। আমাদের প্রবন্ধে নানা রস থাকিবে, ইহা কখন কটু, কখন তিক্ত, কখন কষায় লাগিবে। সময়ে ২ মধুর ও সুরভি ও হইতে পারে। কিন্তু আমরা পর্য্যাপ্ত ও তৃপ্তিকর পথ্য প্রদানে কখন সেকেলে বৈদ্যের ন্যায় কার্পণ্য প্রকাশ করিব না। আমাদের বাসনা এই, যাহা দেশ, কাল ও পাত্রের অবিসম্বাদী, তাহাই প্রচার করিব। ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষ সমর্থন বা খণ্ডন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যখন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের কার্য্য সমাজকে স্পর্শ করিবে, তখন মূকভাব অবলম্বন করিব না। কোন রাজপুরুষের কুৎসা বা গুণানুবাদ কিম্বা রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় চলিতবিষয়ের সমালোচন এ পত্রে স্থান পাইবেক না। কিন্তু রাজনীতির উন্নতি বা অঙ্গহীনতার বর্ণনস্থলে অতীত ঘটনার ন্যায় বর্ত্তমান দৃষ্টান্তও বিবৃত হইবে। কোন সহযোগীর সঙ্গে আমাদের প্রতিদ্বন্দিতা নাই, তবে যদি মতভেদ ঘটে, সবিনয়ে, অকপটে ও স্পষ্টাভিধানে ব্যক্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইব না।

বঙ্গসমাজের ও বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিলে, আমাদের এই উদ্যোগ অসাময়িক বলিয়া বোধ হইবে না; এবং কতিপয় কৃতী লেখকের দৃষ্টান্ত দেখিলে নিরুৎসাহ হইবারও কারণ নাই। যৎ

কালে বঙ্গভাষায় সাময়িক পত্রিকার সর্ব্ব-প্রথম প্রচার হয়, তখনকার সমাজের অবস্থা ভাবিলে এখন যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত লার্ড হেষ্টিংস সর্ব্বত্র শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বিস্তার করিয়া এ-দেশীয় লোকের বিদ্যানুশীলনের নিমিত্ত সবিশেষ যত্নবান্ হন। বঙ্গবন্ধু শ্রীরাম পুরের মিষণারিগণ তদ্দর্শনে উৎসাহান্বিত হইয়া স্থানে ২ বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে লাগিলেন এবং "সমাচার দর্পণ" নামে এক খানি পত্রিকা প্রচার করিলেন। তৎ পর বৎসর মহাত্মা রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কৌমুদী" এবং মিষণারিদিগের 'গস্‌পেল ম্যাগা-জিন্" মুদ্রাঙ্কিত হইল। ইহার তিন বৎসর পরে রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মণিক ম্যাগা জিন" প্রকাশ করিলেন। অনন্তর ১৮২২ অব্দে ভবানীবন্দ্যো তাঁহার ব্রাহ্মমতে বিরক্ত হইয়া 'সমাচার চন্দ্রিকা" বাহির করিলেন। এই রূপে চারিবৎসরের মধ্যে পাঁচ খানি সাময়িক পত্রিকার প্রচার হইল। একদিগে রামমোহন রায় ও বেদান্ত,—আর এক দিকে ভবানী বন্দ্যো ও হিন্দুধর্ম্ম,—এবং অন্যদিকে মিষণারি ও বাইবেল। এই মতত্রয়ের ঘর্ষণে বিশেষতঃ সহমরণপ্রথার আন্দোলনে সমাজ সজীব ও বঙ্গভাষা সবল হইতে লাগিল। ইহার কিঞ্চিৎ পরেই ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে আদালত হইতে পারস্য ভাষা উঠিয়া গেল, এবং উহার চারি বৎসর পরে মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীন হইল। এই উভয় ঘটনাই আমাদের মাতৃভাষার উন্নতির পক্ষে অনুকূল। এই সুযোগে অনেকা-নেক পত্রিকা সমুত্থিত হইল। কিন্তু তখন ও সমাজের তাদৃশ সংস্কার হয় নাই, ও তাদৃশ রুচি-পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সুতরাং কয়েকবৎসরের মধ্যে "প্রভাকর" "ভাস্কর" "রসরাজ" "পথ্যপ্রদান" পাষণ্ড পীড়ন" "আকেলগুড়ুম" প্রভৃতি পত্রিকার ছড়াছড়ি হইতে লাগিল; বঙ্গ-সমাজ কিছুকাল অশ্লীলরসিকতায় খুব হাসিলেন খুব মাতিলেন। এই রূপে কয়েকবৎসর অতীত হইলে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্ত "তত্ত্ববোধিনীর" সম্পা-দকতা গ্রহণ করিলেন এবং ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" প্রচারে ব্রতী হইলেন। এই দুই পত্র ভূরি ভূরি সারগর্ভ প্রবন্ধে পরি পূর্ণ। রচনা পারিপাট্য বিষয়ে পরস্পর যত কেন বিসদৃশ হউক না, উভয়েই বিশুদ্ধ প্রণালীতে লিখিত এবং উভয়েই উপর্যু-পরি নূতন ২ তত্ত্বপ্রচার ও সাধারণের ভ্রম-নিরাস পূর্ব্বক সমাজের প্রকৃত হিতসা-ধন করিয়াছে। কিন্তু এখনও এদেশীয় সাময়িক পত্রের অনেক অভাব ও অঙ্গহীনতা রহিল। প্রকৃত প্রস্তাবে রাজ-নৈতিক বিষয়ের পর্য্যালোচন ও রাজপুরুষ-গণের ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন, সমাজের স্বত্ব-সমর্থন ও অভাব নিবেদনের জন্য এখনও কোন উপযুক্ত পত্রের জন্ম লাভ হয় নাই। পরিশেষে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে "সোমপ্রকাশ"

মুদ্রিত হইল। সোমপ্রকাশ ও তৎসহযোগিগণ কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন উহা সকলেই অবগত আছেন; অতএব উহার বিবরণ করা পুনরুক্তিমাত্র। পরন্তু গত দুই বৎসর হইতে আরও উচ্চদরের সাময়িক পত্রিকার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে; তদ্বিষয়ে বর্ণন করিতে গিয়া পাছে আত্মশ্লাঘার অভিযোগে পতিত হই, এই জন্য বিরত হইলাম।

ইউরোপের জ্ঞানস্রোত এদেশে ক্রমশঃ প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু উহা এখনও একটী নির্দ্দিষ্ট অনতিপ্রসর খাত ছাড়িয়া বড় অধিক দূর চলিতেছে না। যাঁহাদের সুবিধা ও যত্ন আছে, তাঁহারা এই স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করিয়া চিত্তের তৃপ্তি ও সজীবতা লাভ করিতে পারেন। অধুনা অনেক মধ্যবিত্ত যুবকের এরূপ সুবিধা ও যত্ন দেখা যাইতেছে। তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় কৃতবিদ্য সেই জ্ঞানস্রোতের দিব্য জল সেচন করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত উভয় পারের ক্ষেত্রগুলিকে উর্ব্বর করিতে প্রয়াস পাইতেছেন এবং দুই চারিজন কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য ও হইয়াছেন। তাঁহাদের অনেক প্রতিবন্ধক আছে, সত্য। কিন্তু বাস্তবিক উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের গুণে তৎ সমস্ত ক্রমশঃ অপনীত হইতেছে। ইদানীং বঙ্গভাষার সে অবস্থা নাই। ইহার স্বাভাবিক শক্তির দিন২ উপচয় দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আমরা দেখিতেছি, ইহা সুচালকের হস্তে পড়িলে, আরব্য উপন্যাসের ঐন্দ্রজালিক অশ্বের ন্যায় অনেক দূর উঠিতে পারে এবং ক্ষণ কালের মধ্যে বহু পথ অতিক্রম পূর্ব্বক ভুবনের নানা চমৎকারজনক দৃশ্য দেখাইতে পারে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না একজন প্রকৃত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইতেছেন, ততদিন বঙ্গভাষার আয়তি ও বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ব্যাপার নহে।

কবিবর ডাণ্টির "ডিবাইন কমিডি" নামক সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্যের প্রচারের পূর্ব্বে নবোদিত ইতালীয় ভাষার গৌরব কেহই বুঝিতে পারেন নাই। এস্থলে বক্তব্য এই, যে সকল সুধীগণ বঙ্গসাহিত্য-সংসারের পথ পরিষ্কৃত ও সুগম করিয়া দিতেছেন তাঁহারা বঙ্গবন্ধুমাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাঁহাদের সাফল্যদর্শনে মনে বিলক্ষণ আশার সঞ্চার হয়। যেমন সুরধুনী গঙ্গা হিমাচলের অক্ষয় নির্ঝর হইতে উঠিয়া, নানা শাখানদীর সঙ্গমে বর্দ্ধিত-কলেবর হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছেন,—ইহার স্রোত ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া শত শত জনপদের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং শত শত নগরের সমৃদ্ধি বিস্তার করিয়া দিয়াছে, সেই প্রকার আমাদের মাতৃভাষা সংস্কৃতের অগাধ উৎস হইতে অভ্যুত্থান পূর্ব্বক হিন্দী, পারস্য প্রভৃতি ভাষা হইতে নিজশরীর পুষ্ট করিয়া উত্তরোত্তর আয়ত হইয়া ইউরোপীয় ভাবসমুদ্রে পতিত হইতেছে। এখন দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রত্যাশা—ইহা দ্বারা শতসহস্র মানসক্ষেত্র উর্ব্বর ও শস্যশালী হইবেক।

কিন্তু ইহা স্থূলদৃষ্টিরও অগোচর নয়, যে দেশীয় পুরাতন ইতিহাস, দৃষ্টান্ত ও সমাজপদ্ধতিকে মূল করিয়া একটি জাতির যেরূপ উন্নতি সাধন হইতে পারে, অনুকরণে তাদৃশ হয় না। স্বকীয় মূলধনে বাণিজ্যের যেমন শ্রীবৃদ্ধি হয়, কর্জ্জ করা অর্থদ্বারা তেমন সম্ভব নয়। সলামিষের সংগ্রাম পাঠ করিয়া আমাদের শরীর অবশ্যই লোমাঞ্চিত হইবে; কিন্তু গত বিদ্রোহকালে পূর্ব্বপুরুষগণের ঈদৃশ কীর্ত্তিকলাপ স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আধুনিক গ্রীকদিগের উৎসাহ শক্তি যেরূপ দেদীপ্যমান হইয়াছিল, আমাদের সম্বন্ধে কি কখন সেরূপ হইতে পারে? পুরাতন রোমীয়দিগের স্বদেশানুরাগের বিষয় পাঠ করিলে, একজন য়িহুদির ও মন উত্তেজিত হইয়া উঠে। কিন্তু উহার দৃষ্টান্ত গুণে ভিক্টর ইমানুয়েল ও গারিবল্‌ডির স্বদেশানুরাগ যেরূপ জাজ্জ্ল্যমান হইয়াছিল, তেমন কি অন্যত্র সম্ভবে?

রামচন্দ্রের প্রজানুরাগ ও ভরতের নিঃস্বার্থতা, ভীষ্মের সারগ্রাহিতা ও যুধিষ্ঠিরের সত্যশালিতা, অর্জ্জুনের বীরত্ব ও কর্ণের উদারতা, ভারতবাসিমাত্রেরই হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত রহিয়াছে, কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে। শাক্যসিংহের কীর্ত্তি আমাদের নিকট যেরূপ দেদীপ্যমান, লুথারের দৃষ্টান্ত সেরূপ নয়। ইরাস্‌মস্‌ ইউরোপে যেমন গ্রীক ও লাটিন বিদ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করেন, শঙ্করাচার্য্য সেইরূপ ভারতের বৈদিক বিদ্যার উদ্ধার করেন। কিন্তু শঙ্করদিগ্বিজয়ে আমাদের মন যেমন উৎসাহ ও কৌতুকরসে আর্দ্রীভূত হয়, ইরাস্‌মসের চরিত পাঠে কি সেইরূপ? যৎকালে গজনীরাজ মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, হিন্দু-সিমন্তিনীগণ যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ স্ব স্ব অঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া দিয়াছিলেন। সেইরূপ, যখন সিপিয়ো কার্থেজ নগর অবরোধ করেন, কার্থেজের কামিনীগণ আপনাদের কেশপাশ ছেদন পূর্ব্বক রজ্জু প্রস্তুত করিতে দেন। এই উভয় জাতীয় রমণীকে বিষণ্ণ ও বিস্মিত মনে শত শত ধন্যবাদ দিতে হয়। কিন্তু ভারত সন্তানের পক্ষে এতদুভয়ের কি তারতম্য, সহৃদয় পাঠক মীমাংসা করিবেন।

আমরা আর অধিক উদাহরণ দিয়া, পাঠকের সহিষ্ণুতা আকৃষ্ট করিব না। আমাদের বক্তব্য এই, যদি এখানকার কৃতবিদ্যগণ পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি ও দৃষ্টান্ত সকল বিস্মৃত হন, তাঁহারা সভ্য সমাজে কেবল অকৃতজ্ঞ বলিয়া ঘৃণিত হইবেন এমন নয়, স্বজাতির সভ্যতার ভিত্তিভঙ্গ নিবন্ধন তাঁহাদিগকে ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের নিকট দায়ী হইতে হইবে। আমরা সেই ধর্ম্মান্ধ যবনের ন্যায় একথা বলিতেছি না, যে সংসারের জ্ঞাতব্য সমুদয় বিষয়ই আমাদের ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে। আমরা জানি যে আমাদের পৈতৃক ধনের মধ্যে

অধিকাংশ এখন কালসহকারে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং অনেকাংশ উদ্ধার-যোগ্য নহে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই, যে পূর্ব্ব পুরুষের উপকরণ-সামগ্রী লইয়া আমাদের জাতীয় সভ্যতা একতা ও চরিত্রের কেবল ভিত্তিটি মাত্র নির্ম্মিত হইতে পারে। তাহাও ইউরোপীয় কৌশল ও মসলা ব্যতিরেকে হইবে না। নতুবা তৎসমস্ত গৌড়নগরের ভগ্নাবশেষের ন্যায় চিরকালই কার্য্যের অনুপযোগী থাকিবে। সমাজের যথার্থ কৃতবিদ্যগণ এই সকল অমূল্য সামাজিক তত্ত্বগুলি অধুনা বিশিষ্ট রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং যাহাতে অন্যের হৃদয়ঙ্গম হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন। তাঁহারা আরও জানিতে পারিয়াছেন যে বিজাতীয় ভাষার উপাসনা ও তন্ত্রমতে নায়িকার উপাসনা তুল্য। শবসাধন না করিলে সিদ্ধি লাভ হয়না। কিন্তু সেই সিদ্ধি কেবল একপুরুষ স্থায়িনী। উহার প্রকৃত ফলভাগী সাধক ভিন্ন আর কেহই হইতে পারেন না। আমরা বিদেশীয়ভাষা হইতে অমূল্যতত্ত্ব সকল সংগ্রহ করিতে পারি; কিন্তু তৎসমস্ত, সম্যক্‌রূপে প্রচার করিতে হইলে, মাতৃ-ভাষার সাহায্য লইতে হইবেক।

বর্ত্তমান সময়ের এই সকল সুচিহ্ন দর্শনে আমরা প্রোৎসাহিত হইতেছি। এখন যদি যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণেও সাধারণের চিত্তানুবর্ত্তনে সমর্থ হই, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব।

আর্য্য-দর্শন।

" আর্য্য !"——আজি এ ভারতে,
নিষ্ঠুর ! এ নাম কেন ধ্বনিলে আবার,
মরুভূমে পিপাসায়,
যে জন জ্বলিছে হায় !
"সুশীতল জল " কাণে কেন কহ তার ?
কেন মৃগ-তৃষ্ণিকার কর আবিষ্কার ?

" আর্য্য !"——মোহান্ধ যুবক !
নিশীথ নিদ্রায় তুমি দেখিছ স্বপন ;
পুনর্ব্বার নিদ্রা যাও,
যদ্যপি শুনিতে পাও,
এই মধুময় নাম——সুদূর-স্মরণ !
নিশ্চয় যুবক তুমি দেখিছ স্বপন।

৩

স্বপন নাহি হবে যদি,—
অনন্ত সময় গর্ভে যেই নাম হায় !
অকালে হইয়া লয়,
আজি তদুপরে বয়,
দ্বিতীয় লহরী দর্পে কাঁপায়ে ধরায়,
সেই নাম আজি তুমি পাইলে কোথায় ?

ইতিহাসে ?——অবিশ্বাস !
ইতিহাস নহে,——অনুমানের সাগর !
তব ইতিহাসে কয়,
এই সেই আর্য্যালয়,
আমরা সে বীর্য্যবান্ আর্য্যের কুমার ;
চন্দ্র সূর্য্য বংশে, এই জোনাকি-সঞ্চার !

না, না,——এ যে অসম্ভব !
অসম্ভব,—এই সেই আর্য্যাবর্ত্ত নহে ;
কুরুক্ষেত্র মহারণ,
হলো যথা সংঘটন,
সেই আর্য্যাবর্ত্ত——কেন করিব প্রত্যয়—
একটী ইংরেজ ভয়ে কম্পিত হৃদয় !

৬

ছিল যেই—পুণ্য ভূমি ;
অনন্ত-ঐশ্বর্য্য-খনি,—প্রাচুর্য্য-ভাণ্ডা ;
যাহার মলয়ানীলে,
যাহার জাহ্নবী-জলে,
বহিত, ভাসিত, চির-আনন্দ অপার,
আজি তথা দুর্ভিক্ষের ধ্বনি হাহাকার !

৭

এই নহে আর্য্যাবর্ত্ত ;
আমরাও নহি সেই আর্য্যের কুমার ;
তাহাদের বীর্য্য-বল,
ছিল যেন দাবানল,
পৃষ্ঠে তূণ, করে ধনু, কক্ষে তরবার ;
আমাদের—অশ্রুজল, হংস-পুচ্ছ—সার !

৮

কি দোষে না জানি হায় !
বিধাতার কাছে দোষী আমরা সকল
তেজোহীন বীর্য্য-হীন,
ততোধিক পরাধীন,
আমাদের——হায় ! কোন্ পাপের এ ফল ?
করে ভিক্ষা পাত্র, কণ্ঠে দাসত্ব-শৃঙ্খল।

৯

হায়! ওই দীন, হীন,
অনন্ত-বিষাদ-ভাণ্ড— ভারত-সন্তান,
বসি শ্বেতপুচ্ছ করে,
স্বেদ সহ অশ্রু ঝরে;
কহিও না আর কাণে এই আর্য্য নাম,
বিষাদ সাগরে তার উঠিবে তুফান।

১০

সৃষ্টিকর্ত্তা!——বল নাথ!——
সর্ব্ব-শক্তিমান্ তুমি, তবে কি কারণ,
প্রত্যেক পবন যায়,
উঠিতে পড়িতে হায়!
এই ক্ষুদ্র বালি রাশি করিলে সৃজন?
আর্য্য বংশে কুলাঙ্গার—— কলঙ্ক অর্পণ?

১১

শুনেছি মঙ্গলময়
তুমি নাথ, তুমি নাথ দয়ার নিদান;
হতভাগ্য হিন্দু চয়,
সৃজি, ওহে দয়াময়!
জগতের কি মঙ্গল করিলে বিধান?
দুর্ব্বল পতঙ্গে বহ্নি অনলে প্রদান?

১২

বিদরে হৃদয় নাথ!
বল হায়! কি মঙ্গল করিলে সাধন?
তীব্র আর্য্য-বংশ রবি,
বাল্মীকি কল্পনা ছবি,
অনন্ত রাহুর গ্রাসে করিয়া অর্পণ?
এই গ্রাস—মুক্ত নাথ! হবে কি কখন?

১৩

হায়! যেই আর্য্য নাম,
আছিল জগত-পূজ্য;—আছিল অচল,
অটল হিমাদ্রি-সম,
সিন্ধু জিনি পরাক্রম,
আজি সে বাতাস ভরে করে টলমল,
আজি সেই নাম ওই পদ্ম পত্রে জল!

১৪

বৃথা তবে, প্রিয়বর!
নাহি আর্য্য; কেন "আর্য্য-দর্শন" এখন?
কি আছে আর্য্যের আর,
বিনে ওই—হাহাকার,
নাহি অঙ্গ, নাহি মন, নাহি সে জীবন,
কি আর দেখিবে "আর্য্য-দর্শন" এখন?

১৫

ওই আর্য্য-ভস্ম-রাশি!—
ভাগীরথী দুই তীরে, ওই স্তূপাকার!
জানিয়াছি দৃঢ় মতে,
পতিত-পাবনী হতে,
এ পতিত বংশ নাহি হইবে উদ্ধার;
না পারিবে ভাগীরথী;—তবে যদি আর—

১৬

আর কোন মহারথী,
বাজাইয়া পাঞ্চজন্য, ধরি তরবার,
করি সিংহ নাদ ধ্বনি,
আনে রক্ত তরঙ্গিণী,
আর্য্য রক্তে আর্য্যাবর্ত্ত ভাসায় আবার,
তবে যদি আর্য্য-বংশ জাগে পুনর্ব্বার।

১৭

সেই দিন আর্য্যাবর্ত্ত
দেখিবে নবীন শশী, নবীন গগণ;
উদিবে নবীন রবি,
গাইবে নবীন কবি;
দেখিবে নবীন "আর্য্য-দর্শন" তখন;
কি দেখিবে?—কত দিনে?—সকলি স্বপন!

শিবির কর্ণফুলী-তীর। শ্রীনঃ

আর্য্যবংশ।

আর্য্য—এই নামে আমরা কি বুঝিব? এই নামে সচরাচর কি বুঝায়? সচরাচর এই নামে কেবল হিন্দু মাত্র বুঝায়। আমরা কি শুদ্ধ তাঁহাদিগের বিষয় বর্ণনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইব? আমরা কি সেই সঙ্কীর্ণ অর্থেই এখানে "আর্য্য" শব্দ প্রয়োগ করিলাম? না।—আর্য্য শব্দের যে গভীর ও বিস্তৃত অর্থ, যে অর্থে এসিয়া ও ইউরোপের প্রায় সমস্ত সভ্য জাতিই ইহার অন্তর্ভূত, সেই গভীর ও বিস্তৃত অর্থেই আমরা এস্থলে এই "আর্য্য" শব্দ প্রয়োগ করিলাম। হিন্দু ও পারসিক,—কেল্‌তিক ও দৈতনিক,—রোমিক ও গ্রীক,—স্লাভোনিক ও ঈশ্মীরিক, সকলেই এই বিস্তৃতার্থ-আর্য্যশব্দের বিষয়ীভূত। 'ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী শ্যামবর্ণ খর্ব্বকায় শর্ম্মোপাধিক ব্রাহ্মণ-তনয়—ও রাইননদীতীরবর্ত্তী শুভ্রবর্ণ দীর্ঘকায় জর্ম্মন্ বা সর্ম্মন্—এ উভয়ই এক-আর্য্যবংশসম্ভূত'—অশীতিবর্ষ পূর্ব্বে ইহা কে জানিতেন? অশীতিবর্ষ পূর্ব্বে কে জানিতেন যে ভারতবর্ষবিজেতা গৌরাঙ্গেরা ও তদ্বিজিত হিন্দুরা এক-আর্য্যবংশ-সম্ভূত? আহা! সে দিন জগতের কি শুভদিন, যে দিনে মহাত্মা সার্ উইলিয়ম্ জোন্‌স মহাকবি-কালিদাস-প্রণীত শকুন্তলা নামক সুপ্রসিদ্ধ নাটক-গ্রন্থের ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গকে রসভাবালঙ্কারাদি-পরিপূরিত অমৃতময় সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে প্রবর্ত্তিত করেন। সেই দিন হইতেই সংস্কৃত ভাষার প্রতি ইউরোপীয়দিগের শ্রদ্ধা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে! সেই দিন হইতেই ভারতবাসী দীনাবস্থ-ভ্রাতৃগণের দুরবস্থাপনয়নে তাঁহাদিগের বিশেষ চেষ্টা ও বিশেষ যত্ন আরব্ধ হইয়াছে! সেই দিন হইতেই সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের (Philology) প্রকৃত প্রস্তাবে চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। ইংরাজী অনুবাদ দৃষ্টে অচিরকাল মধ্যেই শকুন্তলার অনুবাদ ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মনিক, ইতালিক, ডেনিস্ ও সুইডিস্ প্রভৃতি ভাষায় প্রচারিত হইল। সমুদায় ইউরোপ শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে এতদূর বিমোহিত হইলেন যে মূল শকুন্তলা পাঠ না করিয়া তাঁহারা আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। সুবিখ্যাত জার্ম্মান্ কবি গেটি (Goethe) "ইতালীদেশ-ভ্রমণ" নামক তদীয় গ্রন্থে শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন 'শকুন্তলে! একমাত্র তোমার নাম উচ্চারণ করিলেই বসন্তের ফুল, অসময়ের ফল প্রভৃতি জগতের যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোহর—সকলি বুঝায়—

"Wouldst thou the young year's blossoms and the fruits of its decline.
And all by which the soul is charmed, enraptured, feasted, fed?
Wouldst thou the earth and heaven itself in one sole name combine?
I name thee, O Sakoontala! and all at once is said."

শকুন্তলা পাঠ করিয়া ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তা, শব্দশাস্ত্রজ্ঞ, ও দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্থির করিলেন যে—যে ভাষা শকুন্তলারূপ অমূল্যরত্ন প্রসব করিয়াছে, সে ভাষার অভ্যন্তরে যে অনন্তরত্ন নিহিত আছে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং সেই অনন্তরত্নের আকর-স্বরূপ সংস্কৃত ভাষার প্রগাঢ় অনুশীলনে যে জগতের মঙ্গল হইবে তদ্বিষয়ে তদানীন্তন পণ্ডিতবর্গের দৃঢ় সংস্কার জন্মিল। শকুন্তলা ও শকুন্তলার ন্যায় সংস্কৃত নাটকাদির প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের এই নবীন উৎসাহ ও এই নবীন আগ্রহ অধুনা কিঞ্চিৎ শিথিলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্যসাধারণ, সংস্কৃত দর্শন এবং সংস্কৃত পুরাবৃত্তের প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের বৈজ্ঞানিক উৎসাহ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, জার্ম্মণী ও ইতালী, ডেনমার্ক ও সুইডেন, রুসিয়া ও গ্রীস—সকলেই সেই সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের উন্নতি বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম ও যথেষ্ট যত্ন স্বীকার করিয়াছেন। সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের প্রধান উৎসাহদাতা ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নাম উল্লেখ করিতে গেলে—ইংলণ্ডে সার উইলিয়ম্ জোন্স, কোলব্রুক, উইল্‌সন্; ফ্রান্সে বর্নূফ্, এবং জার্ম্মণীতে হম্বোল্ট্, স্লেগেলদ্বয়, বপ্, লাসেন এবং মক্ষমূলর—এই মাহাত্মাগণের নাম কাহার না স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়? এই মহাত্মাগণের অসীম যত্নে এই অশীতিবৎসর সময়ের মধ্যে সংস্কৃত—ইউরোপীয় শিক্ষাবিভাগে—লাটিন ও গ্রীক ভাষার প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এই সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলনে যে শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছে তাহা নহে—আর্য্যভাষা মাত্রেরই শব্দশাস্ত্র উন্নত হইয়াছে। মনুষ্যের অতীত অবস্থার পর্য্যালোচনাদ্বারা বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি সাধন করাই শব্দশাস্ত্রের অন্যতর মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারাই বিশেষ রূপে সংসাধিত হইতে পারে। সংস্কৃতভাষানুশীলন-শীল আর্য্যেরা যখন জ্ঞান ও সভ্যতায় জগৎ সমুজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, তখন অধুনাতন ইউরোপীয় সভ্যজাতিরা কোথায় ছিলেন? তখন তাঁহারা চীরধুর হইয়া বনে ২ ভ্রমণপূর্ব্বক ফলমূলাদি আহার দ্বারা জীবনধারণ করিতেন। তাঁহাদিগের সভ্যতার প্রবর্ত্তক গ্রীক ও রোমীয়েরা তখন কেবল জ্ঞান ও সভ্যতা-সোপানে পদার্পণ করিতেছিলেন মাত্র। ভারতের সহিত তুলনা করিতে গেলে তাঁহারা তখন সভ্যতা-শৈশবে অবস্থিত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ প্রাচীন জাতির ভাষার অনুশীলন করিলে জগতের জ্ঞান

ও সভ্যতা যে অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইবে তদ্বিষয়ে কে সন্দেহ করিতে পারেন? এই সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন বিনা কে বলিতে পারিতেন যে, ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ, এবং ইউরোপের কেল্‌তিক ও দৈতনিক, জার্ম্মণিক ও স্ক্লাভোনিক, রোমিক ও গ্রীক, —ইঁহারা সকলেই এক-আর্য্যবংশসম্ভূত? সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন ব্যতীত কে বলিতে পারিতেন যে,ভারতের ব্রাহ্মণেরা এবং ইরাণস্থ জোরস্ত্রিকেরা এক-আর্য্যেবংশসম্ভূত? কে জানিতেন যে সেই আর্য্যবংশ-স্রোতস্বিনী দ্বিধাবিভক্ত হইয়া প্রথমতঃ উত্তর-পশ্চিমাভিমুখিনী হইয়া ইউরোপে কেল্‌তিক,ও দৈতনিক, জার্ম্মণিক ও স্ক্লাভোনিক, রোমিক ও গ্রীক জাতির সৃষ্টি করে; এবং পশ্চাৎ দক্ষিণবাহিনী হইয়া হিমালয়ের দুর্ভেদ্যহিমানীভেদ-পূর্ব্বক সরস্বতী, শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, ও সিন্ধু, এই সপ্তনদকূল সপ্তনদ প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমে২ সমস্ত ভারতে ব্যাপিয়া পড়ে। ভাষার প্রমাণ অলঙ্ঘনীয়। প্রত্যুতঃ যখন ইতিহাসের সৃষ্টি হয় নাই, যখন মনুষ্য সত্য ঘটনাকে কল্পনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে জানিতেন না, সে সময়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে একমাত্র ভাষার প্রমাণই বিশ্বসনীয়। ভাষার প্রমাণ না থাকিলে কে বলিতে পারিতেন, যে ভারতের কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীরা ও তাঁহাদিগের বিজেতা ধবলাঙ্গ গ্রীক ও ইংরেজেরা একবংশসম্ভূত? যখন আর্য্যেরা ভারতে আসেন নাই, যখন গ্রীকেরা গ্রীসে যান নাই, সেই পুরাকালের সংবাদ ভাষা ব্যতীত আর কে দিতে পারিত? আর্য্যজাতি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে যে সকল শব্দ ব্যবহার করিতেন, ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাষাসকলে সেই সকল শব্দ অদ্যাপি লক্ষিত হয়। গৃহ, দেবতা,—পিতা, মাতা,—পুত্র, কন্যা,—অশ্রু, হৃদয়, —বৃক্ষ, কুঠার,—এই সকল সদাপ্রয়োজ্য শব্দ আর্য্যভাষা মাত্রেই প্রায় একরূপ। এরূপ অলঙ্ঘনীয় ভাষার প্রমাণ সত্ত্বেও কে বলিবেন যে ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ, রাইননদীতীরবর্ত্তী জর্ম্মন্, এবং ভূমধ্যোপকূলস্থ গ্রীক,—ইহারা এক আর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন হন নাই? ইতিহাস-বেত্তারা ইহা অস্বীকার করিতে পারেন, শারীর-তত্ত্ববিদেরা (Physiologists) ইহা সন্দেহ করিতে পারেন,—এবং কবিদিগের ইহা রুচিকর না হইতেও পারে,—কিন্তু শব্দশাস্ত্রজ্ঞেরা, ভাষাতত্ত্ববিদেরা—যাঁহারা ভাষার প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন—তাঁহারা কখনই ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন যে বর্ত্তমান কেল্‌তিক ও দৈতনিক, জার্ম্মণিক ও স্ক্লাভোনিক, গ্রীক ও রোমিক, পারসিক ও হিন্দু,—ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা এক গৃহে ও এক প্রাচীরের অভ্যন্তরে একত্র বাস করিতেন; এবং তাঁহারা জাতি, ভাষা ও জ্ঞানে বর্ত্তমান তৌরাণিক ও সেমেতিকদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে সর্ব্বপ্রকারে বিভিন্ন ছিলেন।

ইউরোপীয় ভাষা সকলের সহিত সংস্কৃত ভাষার আপেক্ষিক পরিদর্শন দ্বারা বিখ্যাত-নামা ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন——যে (১) প্রতীচ্য আর্য্যেরা ইউরোপাভিমুখে যাত্রা করার অনেক পরে প্রাচ্য আর্য্যেরা আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া উপনিবেশিত হন; (২) সংস্কৃত একসময়ে প্রতীচ্য ও প্রাচ্য এই উভয় আর্য্যেরই মাতৃভাষা ছিল, এবং (৩) প্রাচ্য আর্য্যজাতি জ্যেষ্ঠ আর্য্যের বংশোদ্ভব ও প্রতীচ্য আর্য্যজাতি কনিষ্ঠ আর্য্যের বংশোদ্ভব। কি জন্য যে প্রতীচ্য আর্য্যেরা প্রথমে আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করেন এবং কেনই বা প্রাচ্য আর্য্যেরা তৎকালে তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তন না করিয়া কিছুকাল বিলম্বে পূর্ব্বাভিমুখী হন, এই প্রশ্নের কেবল এই একমাত্র মীমাংসা হইতে পারে—জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ আর্য্যদ্বয়ের বংশ-পরম্পরা ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উভয়ের একত্র অবস্থিতি আর সাধ্যায়ত্ত থাকিল না। উভয়ের অন্যতরের জন্মভূমি পরিত্যাগ করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন আর্য্যজাতির স্বভাব-সিদ্ধ ও চির-প্রচলিত ধর্ম্ম। কনিষ্ঠ-আর্য্য ও তৎসন্ততিগণ সেই ধর্ম্মের বিপর্য্যাস না করিয়া জ্যেষ্ঠের সম্মান-বর্দ্ধনার্থ মাতৃভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে প্রতীচ্য এসিয়া ও সমস্ত ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন। জ্যেষ্ঠ আর্য্য ও তৎসন্ততিগণ কিছুকাল মাতৃভূমির অধীশ্বর রহিলেন। কিন্তু ক্রমে জ্যেষ্ঠের পরিবার এত বিস্তৃত হইয়া পড়িল, যে তাঁহাদিগেরও আর একত্র বাস সম্ভবপর হইল না। এই ঘটনার দাস হইয়া জ্যেষ্ঠ আর্য্যবংশ দ্বিধা-বিভিন্ন হইল। এক অংশ আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া আর্য্যপতাকা উড্ডীন করিলেন। অন্য অংশ জৌরস্ত্রিক নামে খ্যাত হইয়া মাতৃভূমির শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে যে আর্য্যজাতি পুরাকালে ইউরোপে উপনিবেশিত হন কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃপুত্র সেই আর্য্যজাতিই এক্ষণে আমাদিগের বিজেতা। ইহাঁরাই এক্ষণে জগৎ-রঙ্গের প্রধান নট। ইহাঁরাই এক্ষণে জগতের সভ্যতামার্গের উপদেশক। সাঙ্খ্যেরা মনুষ্যের যে কার্য্যকরী বৃত্তিকে (Active Faculty) প্রকৃতি নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহাঁরাই সেই প্রকৃতি দেবীর পরম উপাসক। ইহাঁদিগেরই যত্নে আধুনিকী সমাজপদ্ধতি ও নীতি পরিশোধিত হইতেছে। অন্তর্বিদ্রোহে এবং সেমেতিক ও তৌরাণিকদিগের সহিত সমরে, ইহাঁদিগের ইতিহাস দিন দিন পরিপুষ্ট হইতেছে। ইহাঁদিগের বিষয় আর অধিক কি বলিব? এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, বুঝি বিধাতা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দেশ সকলকে এতদিনের পর সভ্যতা, জ্ঞান, ও বাণিজ্যাদি সূত্রে একত্র সম্বদ্ধ করিবার জন্যই ইহাঁদিগকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন।

এদিকে জ্যেষ্ঠ আর্য্যেরা কনিষ্ঠ আর্য্যদিগের আর্য্যভূমি পরিত্যাগের কিয়ৎকাল

পরে ধীরে ধীরে উত্তরে হিমালয়-পরিবেষ্টিত নব আর্য্যভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তথায় তৎকালে অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য তৌরাণিকেরা বাস করিতেন। আর্য্যেরা অক্লেশে এই অসভ্য তৌরাণিকদিগকে বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণেও হিমালয়-প্রদেশে তাড়িত করিয়া অপূর্ব্ব শস্যশালিনী গাঙ্গেয় অববাহিকায় নব গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী এই গাঙ্গেয় প্রদেশে আর্য্যেরা প্রথমে অধিবেশন করেন বলিয়াই বিশেষরূপে ইহার নাম "আর্য্যাবর্ত্ত" হইল। আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যদিগের এই প্রথম অধিষ্ঠানের পর হইতে অ্যালেক্‌জাণ্ডারের ভারতে আগমন পর্য্যন্ত বোধ হয় যেন কোন দৈবীশক্তি ভারতকে বিপক্ষ-করাল-কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে যে—দিগ্বিজয়ী সিসস্ট্রীস্, নেবুকড্‌নেসর, ও সাইরস, এবং যে দিগ্বিজয়িনী সেমিরেমিস্ তৎকালে জগৎ-প্রাণ আকুলিত করিয়াছিলেন—তাঁহাদিগের শাণিত অস্ত্রে তৎকালে আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যরুধিরে অবশ্যই প্লাবিত হইত। চতুর্দ্দিকে নৈসর্গিক প্রাকার পরিখাদি দ্বারা যাবনিক জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতীয় আর্য্যেরা স্বাধীনভাবে আত্মমনোজগতের উৎকর্ষ সাধন আরম্ভ করিলেন। যেমন প্রাচীন গ্রীকেরা গ্রীসের বহিঃস্থ জাতিমাত্রকেই বার্ব্বেরিয়ান্ (Barbarian) বা অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করিতেন, যেমন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা স্বধর্ম্মবিরোধী ব্যক্তি মাত্রকেই হীথেন্ (Heathen) বা পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, এবং যেমন মুসলমানেরা বিধর্ম্মীদিগকে কাফের বা ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া ঘৃণা করেন, সেইরূপ ভারতীয় আর্য্যেরা সিন্ধুর অপরপারস্থ ভ্রাতৃগণকে ক্রমে যবন বা বিধর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন। এরূপ ভাব যে প্রথমে ছিল না, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে—কান্দাহার (Candahar) বা গান্ধারনগরের রাজকুমারী গান্ধারীর সহিত কুরুকুলতিলক ধৃতরাষ্ট্রের পরিণয়—এই ঘটনার উল্লেখ করিলেই বোধ হয় আপাততঃ পর্য্যাপ্ত হইবে। যাহাহউক্, ভারতীয় আর্য্যেরা এইরূপে সমস্ত পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরপর হইলেন। তাঁহাদিগের জ্ঞান ও তাঁহাদিগের সভ্যতা, বৈদেশিক জ্ঞান ও বৈদেশিক সভ্যতার সহিত মিশ্রিত না হইয়া অপূর্ব্ব স্বাধীন ভাব ধারণ করিল। বৈদেশিক সমাজ বিপ্লবে ভারতের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে ভারতের কি কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই? তাহা নহে—আভ্যন্তরীণ বিপ্লবে বাহ্য ভারতের দিন২ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। প্রাচীন রাজবংশসকল কালসহকৃত-বিলয়-ভাজন হইল, পুরাতন গৃহ সকল সমূলে বিনষ্ট হইল, অমনি তৎতৎ-স্থানে নূতন রাজবংশ ও নব গৃহ সংস্থাপিত হইল। কিন্তু এই সকল বিপ্লবে ভারতীয় আর্য্যদিগের অন্তর্জীবনের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। যেমন নলিনীদল

বৃষ্টিধারায় অঙ্কিত হয় না, সেইরূপ আর্য্য-মন এই সকল অন্তর্বিপ্লবে কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই। ইহা সকল অবস্থাতেই নিষ্ক্রিয়, চিন্তাশীল, প্রশান্ত ও ধর্ম্মরত ছিল।

প্রাচীন আর্য্যসমাজ পুরাকালে তিনবার আলোড়িত হয়। প্রথমতঃ ভারতবর্ষ বিজয়ের পর আধিপত্য লাভের জন্য আর্য্যদিগের মধ্যে অন্তর্ব্বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের মধ্যে কোন্ বর্ণ আর্য্যদিগের নেতা হইবেন, কিছুকাল এই বিবাদে আর্য্যসমাজ আন্দোলিত হইতে লাগিল। অবশেষে ভৃগুনন্দন পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া ব্রাহ্মণবর্ণেরই আধিপত্য সংস্থাপন করেন। গ্রীসের পুরাবৃত্তেও এই ঘটনার প্রতিবিম্ব উপলক্ষিত হয়। পুরাকালে গ্রীসের প্রাজ্ঞেরা যথেচ্ছাচারী গ্রীসীয় রাজগণকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া গ্রীসে সুসম্বদ্ধ সাধারণতন্ত্রের সূত্রপাত করেন। দ্বিতীয়তঃ আর্য্যাবর্ত্তে অন্তঃশৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইলে পর, আর্য্যেরা আকস্মিক ঘটনাবশতঃ সিংহল ও দক্ষিণাপথবাসী অসভ্য পৌরাণিকদিগের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হন। মহাকবি বাল্মীকি-প্রণীত "রামায়ণে" ইহা সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রতিরূপ গ্রীসের ইতিবৃত্তেও দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্মীকি-প্রণীত "রামায়ণের" ও হোমর-প্রণীত "ইলিয়ডের" প্রতিপাদ্য বিষয়ের একতা কে না অবগত আছেন? এই দুই ভীষণ সমরের উদ্দীপককারণ ও ঘটনাবলী প্রায় একইরূপ। একদিকে দশাননের সীতাহরণ,——অপরদিকে ট্রয়-রাজকুমার পারিসের হেলেনাহরণ; একদিকে, রাবণকুমার ইন্দ্রজিতের অদ্ভুত রণকৌশল,—অপরদিকে প্রায়ামতনয় হেক্টরের অমানুষী সমরচাতুরী; একদিকে পতিপরায়ণা মেঘনাদ-জায়া প্রমিলার হৃদয়বিদারক বিলাপ,——অপরদিকে পতিপ্রাণা হেক্টর-বনিতা অ্যান্ড্রোমাকীর মর্ম্মচ্ছেদিনী খেদোক্তি; একদিকে রাবণপুরীর সমূলোৎপাটন,——অপরদিকে প্রায়ামনগরী ট্রয়ের ভস্মীকরণ; এই দুই তুল্য ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনা করিলে কে না বলিবেন যে—এই দুই প্রায় একই রূপ? তৃতীয়তঃ পিলপনিস্ ক্ষেত্রে এথিনীয় ও ল্যাসিডিমোনীয় সংগ্রামে যেমন সমস্ত গ্রীস অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া আত্মরুধিরে স্বদেহ প্লাবিত করিয়াছিলেন,—সেইরূপ কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবসমরে ভারতীয় সমস্ত আর্য্যেরা অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া আত্মরুধিরে জননী ভারতভূমির দেহ উক্ষিত করিয়াছিলেন। গ্রীস যেমন রোমীয়দিগের হস্তে এই অন্তর্দৌর্ব্বল্যকর অন্তঃসমরের বিষময় ফল অচিরাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভারতীয় আর্য্যগণও সেইরূপ যবনদিগের হস্তে অচিরকাল মধ্যেই আপনাদিগের এই অনার্য্য রণোন্মাদের গরলময় ফল লাভ করিয়াছিলেন।

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত।

শৈশব ও তৎকালিক শিক্ষা।

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এ মে লণ্ডননগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ভারতবর্ষের অপূর্ব্ব ইতিহাসলেখক জেম্‌স মিলের জ্যেষ্ঠপুত্র। জেম্‌স মিল অ্যাঙ্গস্-কাউণ্টিস্থ নর্থওয়াটর ব্রিজ গ্রামের কোন দরিদ্র কৃষি-পুণ্যোপজীবী ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। জেম্‌স পিতৃদারিদ্র্যসূত্রে ও কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার সাহায্যে অল্প বয়সেই এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। তথায় কিছুদিন অধ্যয়নের পর তিনি ধর্ম্ম প্রচারক হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য না হওয়ায় তিনি কখন এ ব্যবসায়ের অনুবর্ত্তন করেন নাই। সুতরাং কিছুকাল তাঁহাকে স্কটলণ্ডের নানা পরিবারে গৃহশিক্ষকের কার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি লণ্ডনে সংস্থিত হইয়া অবিশ্রান্ত গ্রন্থরচনায় নিমগ্ন হইলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার আর অন্য কোনপ্রকার জীবনোপায় ছিল না। এই বৎসর তিনি ইণ্ডিয়া হাউসের সহকারী পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। সুতরাং এই বৎসরই তাঁহার দুর্ভাগ্যগ্রহ অস্তমিত হয় বলিতে হইবে।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে জেম্‌সমিলের জীবনে দুইটী প্রবল ঘটনা উপলক্ষিত হয়। তাঁহার বিবাহ ও তাঁহার দারিদ্র্য। এরূপ দুরবস্থায় বিবাহ করা তাঁহার মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। তথাপি তিনি যে এরূপ অবস্থায় কেন পরিণয়সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক্ এরূপ দুরবস্থায় পরিণয়সূত্রে সম্বদ্ধ হওয়ায় তাঁহাকে যে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণের জন্য তাঁহাকে নানা প্রকার ঋণে জড়ীভূত হইতে হইয়াছিল। পুস্তক লিখিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহাতে তাঁহার কোন মতে চলিত না। তিনি যেরূপ স্বাধীন লেখক ছিলেন তাহাতে লোকানুরঞ্জন জন্য নিজমতের বিরুদ্ধে লেখা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হইত। নূতন ২ মত প্রকাশ করাতে বরং তিনি লোকের অপ্রিয় হইয়া উঠিতেন। সুতরাং তদ্রচিত গ্রন্থ সকল লোক-প্রিয় না হওয়ায় তাঁহার আয়েরও অতিশয় সঙ্কীর্ণতা জন্মিল। কিন্তু তিনি ইহাতেও একদিনের জন্য পরিশ্রমবিমুখ বা হতাশ হন নাই। তিনি হতশ্রদ্ধ হইয়া কখন কোন কার্য্য

See John Stuart Mill's Autobiography.

করিতেন না। কথন আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিতেন না।" যে কার্য্যে যে পরিমাণ সময় ও মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক তিনি কথন তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য করিতেন না। এইরূপ অসাধারণ অধ্যবসায়-বলেই তিনি এতাদৃশী বিঘ্নপরম্পরা অতিক্রম করিয়া দশবৎসরে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "ভারতবর্ষের ইতিহাস" নামক গ্রন্থের কল্পনা, আরম্ভ ও সমাপনে কৃতকার্য্য হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজ সন্তান সন্ততিগণেকে স্বয়ং শিক্ষা দিতেন। প্রত্যেক দিবসের অধিক সময় তাঁহার এই কার্য্যে পর্য্যবসিত হইত। বিশেষতঃ যেরূপ পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের উচ্চশিক্ষা বিধান করিয়াছিলেন, এরূপ পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায় আর কোন ব্যক্তির শিক্ষার জন্য কথন ব্যয়িত হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

জেম্স বৃথা সময় নষ্ট করা অধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। তিনি যে কেবল স্বয়ং সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন এরূপ নহে—জ্যেষ্ঠপুত্র জন্‌কে ও তিনি সেই ধর্ম্মে ও তদনুষ্ঠানে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি, তিন বৎসর বয়সে জন্‌কে গ্রীক ভাষা শিখাইতে আরম্ভ করেন। সহজে কণ্ঠস্থ হইবে বলিয়া তিনি স্বহস্তে পুত্রের জন্য ইংরাজী প্রতিশব্দের সহিত প্রচলিত গ্রীক-শব্দ গুলির একটী তালিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে গ্রীক্ ব্যাকরণের শব্দ ও ধাতুর রূপ "করিতে শিখাইয়াই একবারে গ্রীক্ ভাষার অনুবাদে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। পুত্র পিতৃযত্নে তৃতীয় বৎসর বয়সে ইসফ্-লিখিত কথামালা আরম্ভ করিয়া অষ্টম বৎসরবয়সে হিরোডোটস্, ঝিনোফন্, সক্রেটিস্, ডাওজিনিস্, আইসোক্রেটিস্, প্লেটো প্রভৃতি বিখ্যাতনামা গ্রীক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই অষ্টম বৎসর বয়সে তিনি প্রথম লাটিন্ পড়িতে আরম্ভ করেন। জেম্স মিল্, যে পাঠ বিশেষ যত্নে পুত্রের অধিগম্য হইতে পারিত, পুত্রকে কেবল সেই পাঠ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন এরূপ নহে; কিন্তু তিনি, পুত্রের প্রতিভা উদ্দীপ্ত করিবার জন্য তাঁহাকে সচরাচর এমন পাঠও দিতেন যাহা বিশেষ যত্নেও তাঁহার অধিগম্য হইবার নহে। জেম্স মিল্ পুত্রের শিক্ষার জন্য কতদূর ব্যস্ত ছিলেন তাহা এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে তিনি পুত্রকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়নের অন্তরাল করিতেন না। যে গৃহে ও যে টেবিলে তিনি স্বয়ং লিখিতেন সেই গৃহে ও সেই টেবিলের এক পার্শ্বে পুত্রও বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন। জেম্স যখন গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন তখন ও তিনি পুত্রকৃত প্রশ্ন সকলের উত্তর দানে বিরক্ত হই-

তেন না। পুনঃ সংযোগের এরূপ অবিচ্ছিন্ন বিঘ্ন সত্ত্বেও জেম্‌স তাঁহার ভারতবর্ষেয় ইতিহাসের কয় খণ্ডের এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করিয়াছিলনে।

মিল্ গ্রীক ভাষার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিদিন সায়ংকালে পিতার নিকট গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। গণিতে তাঁহার স্বভাবতঃই বিরক্তি ছিল। তিনি গ্রীক ভাষা ও গণিতশাস্ত্র ব্যতীতও প্রতিদিন ভ্রমণকালে পিতার নিকট মুখে মুখে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতেন। জেম্‌স মিলের শরীর নিতান্ত অসুস্থ ছিল। এই জন্য তিনি প্রাতরাশের (Breakfast) পূর্ব্বে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। পুত্রও পিতার অনুবর্ত্তন করিতেন; এবং পূর্ব্বদিন স্বয়ং যে সকল পুস্তক পাঠ করিতেন, পরদিন প্রাতঃকালে ভ্রমণের সময় সেই সকল পুস্তকের সারাংশ পিতার নিকট বর্ণন করিতেন। এইরূপে তিনি এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই রবার্টসন্, হিউম্, গিবন্, ওয়াট্‌সন্, হুক্, রোলিন্, প্লুটার্ক, বর্ণেট্, প্রভৃতি বিখ্যাতনামা ঐতিহাসিকগ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া ফেলিলেন। মিল্ এইরূপে যৎকালে পিতার নিকট মুখে২ স্বপঠিত গ্রন্থ সকলের বর্ণন করিতেন, সেই সময় পিতৃদেব তাঁহাকে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, মনোবিজ্ঞান, ও সভ্যতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। এবং প্রতিদিন যাহা উপদেশ দিতেন, পরদিন পুত্রকে নিজের ভাষায় সেইগুলি বলিতে বলিতেন। যেসকল পুস্তক * স্বয়ং পাঠ করিলে পুত্রের বিরক্তিকর হইবার সম্ভাবনা, পিতা ভ্রমণকালে পুত্রকে সেই সকল পুস্তকের বিষয় এরূপ হৃদয়গ্রাহী করিয়া বর্ণন করিতেন, যে পুত্র তাহার পর সেই সকল পুস্তক স্বয়ং পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না। যাঁহারা বিপদে পড়িয়াও অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন—যাঁহারা বিপদে পড়িয়া তাহাতে অভিভূত না হইয়া তদতিক্রম পূর্ব্বক উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন,—যে সকল পুস্তকে † এরূপ পরমারাধ্য ব্যক্তিদিগের বিষয় বর্ণিত আছে, জেম্‌স পুত্রের হস্তে এরূপ পুস্তক সমর্পণ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। আমোদকর পুস্তক সকল বাল-শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃতকরা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু এরূপ পুস্তক সর্ব্বদা পড়িলে, পাছে

---

* Millar's Historical View of the English Government;
Mosheim's Ecclesiastical History;
McCrie's Life of John Knox;
Sewell and Rutty's Histories of the Quakers.

† Beaver's African Memoranda;
Collins's Account of the First Settlement of New South Wales;
Anson's Voyages;
Hawkesworth's Voyages round the World.

মনোবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া কল্পনাশক্তির অনৈসর্গিক পরিচালনা হয়, এই জন্য তিনি পুত্রকে সে সকল পুস্তক সর্ব্বদা পড়িতে দিতেন না। সেই আমোদকর পুস্তক গুলির ‡ মধ্যে রবিন্‌সন্ ক্রুসোই মিলের অতিশয় আদরের জিনিস ছিল। ইহা বাল-সহচরের ন্যায় শৈশবে সতত তাঁহার অনুবর্ত্তন করিত।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে মিল্ অষ্টম বৎসর বয়সে লাটিন্ পড়িতে আরম্ভ করেন। তিনি পিতার নিকট প্রতিদিন যতটুকু লাটিন শিখিতেন, কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীদিগকে প্রতিদিন ততটুকুলাটিন শিখাইতেন। এইরূপ শিক্ষকতার কার্য্যে তাঁহার অমূল্য সময়ের অধিকাংশ বৃথা নষ্ট হইত। এই জন্যই এরূপ কার্য্যভার কখনই তাঁহার প্রীতিকর হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার শিশু ছাত্রওছাত্রীদিগকে তিনি যে সকল বিষয় শিক্ষা দিতেন, তাহাদিগকে আবার পিতৃসমীপে সেই সকলবিষয়ের পরীক্ষা দিতে হইত। তাহাদিগের পরীক্ষার শুভাশুভ ফলের জন্য তাঁহাকেই পিতার নিকট দায়ী থাকিতে হইত। সুতরাং এই গুরুকার্য্যভার তাঁহার আরও বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহাতে তাঁহার একটী মহৎ উপকার হইয়াছিল। অন্যকে বুঝাইতে গিয়া তাঁহার মনের ভাব সকল যাহা—অস্পষ্ট ছিল—তাহা স্পষ্ট হইয়া আসিল। এবং যেং বিষয়ে তিনি শিক্ষা দিতেন, সেইং বিষয়তাহার মনে চির-অঙ্কিত হইয়া রহিল।

মিল্ যে বৎসরে লাটিন্ পড়িতে আরম্ভ করেন, সেই বৎসরেই গ্রীক্‌কবিদিগের কাব্যকাননে প্রথম প্রবিষ্ট হন। মহাকবি-হোমর-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "ইলিয়ড" গ্রন্থই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করে। তিনি মূল "ইলিয়ড" পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে পিতা তাঁহার হস্তে পোপকৃত "ইলিয়ডের" অনুবাদ প্রদান করেন। মিল্ পোপকৃত ইলিয়ডের অনুবাদে এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে উপর্য্যুপরি ন্যূনাধিক ত্রিশবার ইহা আদ্যন্ত পাঠ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি পিতার নিকট প্রথমে বিখ্যাত ইউক্লিড্-প্রণীত ক্ষেত্রতত্ত্ব, ও পরে বীজগণিত পড়িতে আরম্ভ করেন। অষ্টম বৎসর বয়সে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সের মধ্যে মিল্ লাটিন্ ওগ্রীক্ ভাষায় যে গ্রন্থরাশি * পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা নিম্নে

‡ Robinson Crusoe ;
Arabian Nights ;
Cazotte's Popular Arabian Tales ;
Don Quixote ;
Miss Edgeworth's Popular Tales ;
Brooke's Fool of Quality.

In Latin :—

1. Virgil's Bucolics and the first six books of his Æniad ;
2. All Horace, except the Epodes ;
3. The Fables of Phædrus ;
4. The first five books of Livy ;
5. All Sallust ;
6. A considerable part af Ovid's Metamorphoses ;

প্রদত্ত হইল। এই তালিকা দর্শন করিলে আপাততঃ বোধ হইবে যেন মিল্ দৈবী-শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু তাহা নহে—তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে অসাধারণ অধ্যবসায় ও এরূপ অনুকূল ঘটনাবলীর বলে যে কোন ব্যক্তিই এতাদৃশী কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন।

এই সময়ের মধ্যেই মিল্ ক্ষেত্রতত্ত্ব ও বীজগণিত সমাপ্ত করেন। ডিফারেন্সল্ ক্যাল্‌কুলস্ ও তৎসদৃশ উচ্চ অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার জন্মে নাই। জেম্‌স স্বয়ং বাল্যাভ্যস্ত এই দুরূহ বিষয় সকল বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার এরূপ অবকাশ ও ছিল না, যে সেই সকল বিষয়ের পুনরালোচনা করেন। সুতরাং এই দুরূহ বিষয় সকলে পুত্রকে শিক্ষা দেন তাঁহার এরূপ সামর্থ্য ছিল না। এই দুরূহ বিষয়ে পুস্তক বই মিলের আর অন্য অবলম্বন ছিল না। সুতরাং তিনি এ সকল বিষয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না। ইতিহাসসাধারণের, বিশেষতঃ পুরাবৃত্তের দিকে মিলের বলবতী প্রবণতা ছিল। মিট্‌ফোর্ডের গ্রীস,—এবং হূক্ ও ফার্গুসনের রোম,—সতত তাঁহার চিত্তবিনোদন করিত। তিনি পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস পড়িতে এত ভাল বাসিতেন ও তাহা এত পড়িতেন, যে সকল দেশেরই পুরাবৃত্ত তাঁহার এক প্রকার কণ্ঠস্থ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি নব্য ইতিহাসে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন না। নব্য ইতিহাস সম্বন্ধে "ডিনেমারদিগের স্বাধীনতাযুদ্ধ" প্রভৃতি বিশ্লিষ্ট বিষয় ভিন্ন আর কিছুই পড়িতেন না। তিনি বাল্যকাল হইতেই ইতিহাস লিখিতে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি সেই নবীন বয়সে "রোমের ইতিহাস," "পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত্ত," ও "হলণ্ডের ইতিহাস" নামক গ্রন্থত্রয় রচনা করেন। এবং একাদশ বা দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় হূক্, লিবি, ডাওনিসিয়স্ প্রভৃতি পুরাবিদ্‌দিগের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "রোমের শাসনপ্রণালী" নামে এক খানি উচ্চ-অঙ্গের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে তিনি রোমের পেট্রিসীয় ও প্লীবীয়দিগের পরস্পর-বিবাদ-বর্ণনোপলক্ষে রোমীয় সাধারণতন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল বাল্য-রচনার প্রতি তাঁহার সবিশেষ শ্রদ্ধা না থাকায়, তিনি কিছু দিন পরে এ সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলেন।

---

7. Some plays of Terence ;
8. Two or three books of Lucretius ;
9. Several of the Orations of Cicero, and of his writings on oratory, also his letters to Atticus.

In Greek:—

1. The whole of Illiad and Odyssey ;
2. One or two plays of Sophocles, Euripides, and Aristophanes ;
3. All Thucydides ;
4. The Hellenics of Xenophon ;
5. A great part of Demosthenes, Æschines, and Lysias ;
6. Theocritus ;
7. Anacreon ;
8. A little of Dionysius ;
9. Several books of Polybius ; and
10. Aristotle's Rhetoric.

সভ্যতার ইতিহাস।

উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইতিবৃত্তের তত্ত্বানুসন্ধানার্থ যে সকল উপায় আছে তৎসমুদয়ের উল্লেখ। মানুষিক কার্য্যপরম্পরা যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন তাহার প্রমাণ। অবদানসমূহ মানসিক ও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। অতএব মানসিক ও প্রাকৃতিক উভয় প্রকার নিয়মই বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। এতাবতা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিপরীত কোন ইতিবৃত্তই প্রকৃত ইতিবৃত্ত বলিয়া গণ্য নহে।

জ্ঞানের যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে ইতিহাস অবলম্বন করিয়াই অনেকে অনেক প্রকার রচনা করিয়াছেন। ইতিহাসকেই অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণের প্রিয়তর পদার্থ বলিয়া প্রতীতি হয়। ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত প্রতিজ্ঞা, যে ইতিহাসলেখকেরা যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধিও প্রায় তদনুরূপই হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা ইতিহাস অবলম্বন করিয়াই লোকে অধিকতর পরিশ্রম করিয়াছে যথার্থ বটে, কিন্তু সেই পরিশ্রম নিষ্ফল হয় নাই। উহাদ্বারা অনেকানেক রহস্যের উন্মেষ হইয়াছে ও আমরা অনেক বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছি।

ইতিহাসের যেরূপ সারবত্তার বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের —বিস্তর সমাজ ও ব্যক্তির—দৃঢ় বিশ্বাস। প্রায় তাবৎ সভ্যসমাজের অধিবাসীরা সাধারণে যেরূপ আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করিয়া থাকেন, ও সভ্যসমাজমাত্রেরই শিক্ষাপ্রণালীতে উহার যেরূপ প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা দৃষ্ট হয়, এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এবিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসের সারবত্তার বিষয়ে এই সাধারণ সংস্কার যে অনেকাংশে বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, যে ইতিবৃত্তের অনুসন্ধানবিষয়ে যে প্রভূত পরিশ্রম ব্যয়িত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এরূপ বহুবিধ জ্ঞানের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, যাহা অন্ততঃ স্থূলদৃষ্টিতেও উজ্জ্বল ও সারগর্ভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উক্ত পরিশ্রম দ্বারা ইউরোপখণ্ড ও অন্যান্য মহাদেশের দেশসমূহের রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহঘটিত অবদানপরম্পরা যত্নসহকারে সংগৃহীত হইয়াছে, এবং

See Buckle's History of Civilization.

এরূপ আকারে নিবেশিত হইয়াছে যে উহাদের সত্যাসত্যতার বিচার করা পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ হইয়া উঠিয়াছে। আবার সংগৃহীত ঘটনাবলীর সত্যাসত্যতা যেরূপ প্রমাণ সাপেক্ষ তৎসমুদয় এক-প্রকার উদ্ধৃত হইয়াছে বলিতে হইবে। নানাদেশের ব্যবস্থাশাস্ত্র ও ধর্ম্মনীতি-ঘটিত ইতিহাসের বিষয় বিশেষ মনোযোগ ও যত্নসহকারে অনুসন্ধান করা হইয়াছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও শিল্পাদি কলা সকলের তথ্যজিজ্ঞাসায় অনল্প পরিশ্রম প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং সমাজের ব্যবহারার্থ ব্যক্তি-বিশেষ কর্ত্তৃক নবোদ্ভাবিত যন্ত্রাদি পদার্থসকল ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন রীতি নীতি এবং সুখস্বচ্ছন্দের উপকরণ প্রভৃতি অবগত হইবার আশয়ে বহুল আয়াস স্বীকার করা হইয়াছে। অতীত কালের অতীত-বৃত্তান্ত-বিষয়ক জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে অশেষবিধ প্রাচীন পদার্থই পরীক্ষিত হইয়াছে, প্রাচীন নগরবৃন্দের অবস্থানবিভাগ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভূমিখননপূর্ব্বক প্রাচীন মুদ্রা উত্তোলিত হইয়াছে ও তৎসমুদয়ের উপরি-খোদিত নাম অঙ্ক প্রভৃতির ব্যাখ্যা হইয়াছে। যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বা যত্নলব্ধ প্রস্তর-ফলকের উপরিখোদিত রচনাবলী লিপি-বদ্ধ করিয়া উহার অর্থ নিষ্কাসন হইয়াছে, পুরাতন বর্ণমালার পুনরুদ্ধার হইয়াছে, মিসর প্রভৃতি দেশে পুরাতন-কাল-প্রচলিত দুর্ব্বোধ পবিত্র অক্ষর সমূহের মর্ম্মোদ্ভেদ হইয়াছে ও কোন কোন স্থলে বহুকালবিস্মৃত ভাষা সকলের উদ্ধার ও পুনঃসংস্কার হইয়া উঠিয়াছে। শব্দবিদ্যাপারদর্শী পণ্ডিতমণ্ডলীর অবিরত চেষ্টায় মনুষ্য জাতির বাক্যোচ্চারণ-প্রণালীর নিয়ামক কতিপয় সাধারণ নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ঐ সকল নিয়মের সাহায্যে মনুষ্যজাতির প্রাচীনকালিক নানাদিদেশ-গমন-বিষয়ক অনেকানেক নিগূঢ় ও দুর্ভেদ্য তত্ত্বের সম্যক্ প্রকাশ হইতেছে। বার্ত্তাশাস্ত্রও ঐরূপ চেষ্টাদ্বারা এক্ষণে প্রকৃতপ্রস্তাবে বিজ্ঞানপদবাচ্য হইয়া উঠিয়াছে ও উহার নিয়ম ও সূত্র সকলের সাহায্যে সামাজিক উৎপাতের মূলস্বরূপ দেশভেদে ধন-সম্পত্তির বিষম বিভাগ অর্থাৎ ন্যূনাতিরেকের কারণ-পরম্পরার বিষয় যথাসম্ভব বিদিত হওয়া গিয়াছে। নানাদেশের ও নানাজনপদের সামাজিক তত্ত্বের বিষয় বিশেষ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম-সহকারে এতদূর নির্ণীত হইয়াছে, যে এক্ষণে তৎসমুদয়ের সাহায্যে মনুষ্যজাতির সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহের উপায়সকলের বিষয় যে কেবল পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে এরূপ নহে, কিন্তু উহাদের মানসিক প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বিষয়েও আমাদের সম্যক্ জ্ঞান জন্মিয়াছে বলিতে হইবে। কারণ আমরা এক্ষণে প্রায় সকল দেশের অধিবাসীদিগেরই সামাজিক অপরাধের সংখ্যা ও পরিমাণ সবিশেষ বিদিত হইয়াছি। একদেশের অপরাধ ও পাপ-সংখ্যার সহিত অন্যান্য দেশের অপরাধ

ও পাপসংখ্যার কিরূপ পরস্পর সম্বন্ধ তাহাও আমাদের অবিদিত নাই। আবার বয়ঃক্রম, লিঙ্গ ও শিক্ষাপ্রভৃতি কারণ সমূহের অপরাধরূপ কার্য্যের প্রতি কিরূপ প্রয়োজকতা তাহাও আমরা অনুমান করিতে সমর্থ হইয়াছি। সমাজদর্শনের প্রতি আমরা যাদৃশ মনোযোগী হইয়াছি, প্রাকৃতিক ভূগোলের বিষয়েও তদনুরূপ মনোযোগ প্রদর্শন করিয়া থাকি। ভিন্ন ভিন্ন দেশের জলবায়ু (আব হাওয়া) প্রভৃতির ঋতুপরিবর্ত্তন প্রকৃতিগত বিভিন্নতা সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পর্ব্বতের উচ্ছ্রায় নির্ণীত হইয়াছে, নদীসমূহের দৈর্ঘ্য প্রস্থ গতিমার্গ ও উদ্ভবস্থান সম্যক্‌রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অশেষবিধ প্রাকৃতিক উৎপন্নদ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বিষয় বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক তৎসমুদয়ের নিগূঢ় গুণাবলীর উদ্ভেদ হইয়াছে। আমাদের জীবনরক্ষার উপযোগী যাবতীয় আহারসামগ্রী আছে, তৎসমুদয়ের প্রায় প্রত্যেকটীকেই রসায়নশাস্ত্রের নিয়মানুসারে স্ব স্ব উপকরণসমূহে পরিণত করিয়া প্রত্যেকের তাবৎ উপকরণ গুলিরই সংখ্যা ও গুরুত্বের বিষয় নির্ণীত হইয়াছে, এবং অনেক স্থলেই উক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি ও মানবদেহের পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ, উক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি কি প্রকারে মানবদেহের উপকরণ-পরম্পরার সহিত সমীকৃত হয় ও উহারা মানবশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া কিরূপ ফল উৎপাদন করে ইত্যাদি বিষয় সকলও সুচারুরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অধিক কি, যে কোন প্রকারেরই হউক না কেন, যে কোন ঘটনা মনুষ্যজাতির উপর কিছুমাত্র শক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ, তৎসমুদয়ের বিষয়ে জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার যে সমস্ত উপায় সম্ভব-পর তাহার একটীও আমাদের অবিদিত না থাকে এই অভিপ্রায়ে, উপরি-উল্লিখিত ব্যতীত অন্যান্য নানাবিষয়েও অবস্থাবিশেষে বহুবিধ অনুসন্ধান করা হইয়াছে। এইরূপ অনুসন্ধানের বলে আমরা এক্ষণে তাবৎ সভ্যতম সমাজেরই জন্ম মৃত্যু ও বিবাহের আপেক্ষিক সংখ্যা, তত্তৎসমাজের অধিবাসীদিগের অবলম্বিত বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ের প্রকৃতি, এবং তাহাদের পরিশ্রমের বেতন, ও জীবনধারণোপযোগী পণ্যদ্রব্যনিচয়ের মূল্য ও পণের উন্নতি ও অবনতির বিষয়ও অবগত হইয়াছি। ফলতঃ আমাদের চেষ্টায় উল্লিখিত ও উহাদের তুল্যপ্রকৃতি অন্যান্য নানাবিধ প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়া এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুসজ্জীভূত হইয়াছে, যে আমরা এক্ষণে অনায়াসেই তৎসমুদয় ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছি। উপরে যে সকল তত্ত্বের বিষয় উল্লেখ করা গেল তৎসমুদয়কে সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল তত্ত্ব এতদূর সূক্ষ্ম যে উহাদের বিষয়ে সম্যক্‌ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে অপরিমিত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। মনুষ্যের পরিশ্রমপ্রভাবে

উক্ত নানাবিধ তত্ত্বের সহিত অপেক্ষাকৃত অল্প সূক্ষ্ম কিন্তু অধিক ব্যাপক অন্যান্য অনেকানেক তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা যে কেবল প্রধান প্রধান সমাজ ও জাতির কার্য্যপরম্পরা ও বিশেষ গুণ সকলের বিষয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অবগত হইবার চেষ্টা করিয়া যাহা কিছু অবগত হইতে পারিয়াছি অবগত হইয়াছি, এরূপ নহে, পরন্তু আমাদিগের পর্য্যটকেরা এই বিশাল পৃথিবীর নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন জাতির রীতি নীতি প্রভৃতি স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগের বিষয় সুন্দররূপ বর্ণন করিয়াছেন। আমরাও ঐ সকল বর্ণনার সাহায্যে সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় মনুষ্যের অবস্থাগত কিরূপ প্রভেদ লক্ষিত হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত লোকের রীতি নীতি আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে কিরূপ বিভিন্নতা হয়, তৎসমুদয় পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া সবিশেষ নির্ণয় করিতে পারগ হইয়াছি। ইহার উপর যদি আর একটী বিষয়ে মনোনিবেশ করা যায় যে মনুষ্যজাতির হৃদয়ে স্বজাতির তত্ত্বজিজ্ঞাসার্থ যে স্বাভাবিক কৌতূহল নিহিত আছে, কিছুতেই তাহা চরিতার্থ হয় না, জ্ঞান বৃদ্ধিদ্বারা ঐ কৌতূহলের শান্তি নাই, বরং জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত উত্তরোত্তর উহার উপচয়ই লক্ষিত হয়, যে উক্ত কৌতূহলের সহিত উহার উপভোগ পদার্থেরও নিয়তই সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে এবং উক্ত পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ার্থ যেসমস্ত পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে, তৎসমুদয় অদ্যাপি সংরক্ষিত রহিয়াছে, যদি আমরা যুগপৎ এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহই আমাদের এক প্রকার প্রতীতি হইবে যে আমরা ইতিহাসনির্ণয়ার্থ পরিশ্রমদ্বারা যে অসংখ্য ও বহুবিস্তৃত উপকরণসামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছি তৎসমুহের যথার্থই অপরিমেয় সারবত্তা আছে ও ভবিষ্যতে উহাদেরই সাহায্যে আমরা মনুষ্যজাতির প্রকৃত ইতিবৃত্ত নির্ণয় করিতে সক্ষম হইতে পারিব।

কিন্তু পক্ষান্তরে আমরা উল্লিখিত উপকরণরাশির কিরূপ ব্যবহার করিয়াছি যদি তাহার বর্ণন করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে পূর্ব্বোল্লিখিত চিত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অপর এক খানি চিত্র প্রদর্শন করিতে হইবে। মনুষ্যজাতির ইতিবৃত্তের একটী বিশেষ দুরদৃষ্ট এই, যে যদিও আমরা উহার পৃথক্ পৃথক অংশ সমুদয়ের প্রত্যেকেরই বিষয় অনল্প ক্ষমতাপ্রকাশ পূর্ব্বক স্বতন্ত্ররূপে পরীক্ষা করিয়াছি বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে প্রায় কেহই বিসংষ্ঠুল পুরাবৃত্তের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংস্থাপন দ্বারা একটী অখণ্ড অবয়বী নির্ম্মাণ করিবার প্রয়াস পান নাই। উক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয়ের পরস্পরের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা নির্ণয় করিবার জন্য কেহই চেষ্টা করেন নাই। জ্ঞানের অন্যান্য তাবৎ ক্ষেত্রেই সর্ব্বসাধারণের এরূপ দৃঢ় সংস্কার জন্মি-

য়াছে, যে বিশেষ ও ব্যাপ্য পদার্থ সকল একত্র করিয়া উহাঁদের পরস্পর কার্য্য-কারণভাব প্রভৃতি সম্বন্ধ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক সাধারণ নিয়মের উদ্ভাবন করা নিতান্ত আবশ্যক। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অনুমানপ্রভৃতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ পূর্ব্বক উক্ত ব্যাপ্য তত্ত্বের নিয়ামক সাধারণ ও ব্যাপক বিধির সংস্থাপন করিতে যত্নবান হইয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে ইতিবৃত্তক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই লোকের সংস্কার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া পড়ে। ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই একটী অদ্ভুত সংস্কার আছে। তাঁহারা মনে করেন যে বিগত ঘটনাবলীর বর্ণন মাত্র করাই ইতিহাসলেখকের প্রকৃত কার্য্য। তবে কোথাও কোথাও আবশ্যক-মত মনুষ্য-সমাজের রাজনীতি ও মানসিক প্রবৃত্তি সমূহের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া নীরস ঘটনাবলীর সজীবতা সম্পাদন করা বিধেয়। ইহা হইলেই ইতিহাসলেখকের যথার্থ ও উপযুক্ত কার্য্য করা হয়। এই ভ্রান্তিসঙ্কুল সংস্কারের সাহায্যে, বুদ্ধি প্রতিভা ও চিন্তাশক্তি নিতান্ত অলস বলিয়া অথবা প্রাকৃতিক অসামর্থ্য হেতুক যাঁহারা জ্ঞানের উচ্চতর শাখায় অধিরোহণ করিতে অসমর্থ, এরূপ লেখকেরাও কয়েক বৎসর মাত্র কতিপয় পুস্তক পাঠ পূর্ব্বক আপনাদিগকে ইতিহাস লিখিবার উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া ইতিহাস-বেত্তা বলিয়া পরিচয় দেন এবং কোন সুমহৎ প্রধান জাতির ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এরূপ ব্যক্তিদিগের রচনাও কালক্রমে মাননীয় মধ্যস্থাদির ন্যায় বিবাদভঞ্জনপূর্ব্বক লোক সমাজে সম্যক্ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে। এইরূপ সঙ্কীর্ণ ও ভ্রান্তি সঙ্কুলমত মানদণ্ড ও সিদ্ধান্ত স্বরূপে গৃহীত হওয়াতে আমাদের জ্ঞানোন্নতির পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। এই জন্যই ইতিহাসরচয়িতারা সাধারণ্যে প্রায়ই স্বীকার করেন না ও বুঝিতেও পারেন না যে তাঁহাদের অভিপ্রেত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে নানাশাস্ত্র বিস্তৃতরূপে অধ্যয়ন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এরূপ না করিলে তাঁহারা অন্য কোন প্রকারেই তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রকৃতরূপে হস্তক্ষেপ পূর্ব্বক উহা ও উহার সহিত সম্বদ্ধ অন্যান্য বিষয়ের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইবে না। ফলতঃ প্রকৃতরূপে ইতিহাস লিখিতে হইলে সকল শাস্ত্রের প্রতিই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, ইহা আমাদের ইতিহাসবেত্তারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। এইজন্যই ইতিহাসরচয়িতা-দিগের মধ্যে কেহ বা বার্ত্তাশাস্ত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কেহবা ব্যবহারশাস্ত্রে সম্পূর্ণ নিরক্ষর, কেহ বা ধর্ম্মনীতিশাস্ত্র চক্ষেও দেখেন নাই, কেহ বা সমাজনীতিশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করা আবশ্যক মনে করেন না, আবার কেহ বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এরূপ অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া

ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে উল্লিখিত শাস্ত্র সমুদয় ইতিহাসশাস্ত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ প্রমেয়ের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক সাধারণ নিয়ম ও প্রমাণ উদ্ভাবন করাই ইতিহাসের প্রকৃত কার্য্য, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সাধারণ পুরাবৃত্তলেখকদিগের এ বিষয়ে প্রবৃত্তি নাই। উক্ত শাস্ত্রসকল পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়া মার্জ্জিত ও উন্নত হইতেছে, একথা অস্বীকার্য্য নহে, কিন্তু ইতিহাসলেখকদিগের চেষ্টা বিরহে উক্ত শাস্ত্র সকল পরস্পরের উপকারে না আসিয়া কালক্রমে সম্পূর্ণরূপ পৃথক্ হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় প্রকৃত ইতিহাসের আবির্ভাব সম্ভাবনা করাও সুদূরপরাহত।

কাব্য, কবি ও কবিত্ব।

"কবি" এই কথা উচ্চারণ করিবামাত্রই কালিদাস, ভবভূতি সেক্সপিয়র মিল্টন প্রভৃতি কতকগুলি হৃদয়ের অতি প্রিয় নাম স্মরণ হয়। এই নাম গুলি এত প্রিয় কেন? এক একটী নাম শুনিবামাত্র হৃদয়ের কোন অন্তরতম আত্মীয়ের নাম বলিয়া বোধ হয় কেন? তখন সহস্র-যোজন-বিস্তৃত সাগর ও বহু-শতাব্দী-ব্যাপী যুগের ব্যবধান ও স্মরণ থাকে না কেন? মানবজাতির এই কুল-ভূষণ-সন্তানগণ যখন এই মর্ত্ত্য ভবনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সে সময়ের—সে যুগের চিহ্ন নাই; সকলই কালসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে; কিন্তু এই প্রিয় নাম গুলি সে স্রোতে মগ্ন হইল না কেন? সাহিত্য রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই মনে স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন গুলি উদিত হইয়া থাকে, যাঁহাদিগকে হৃদয়ের প্রিয় এবং অন্তরতম আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিলাম তাঁহাদিগকে অদ্যাবধি কোন্ ব্যক্তি দেখিয়াছে? যে কালিদাস বৃক্ষশাখায় বসিয়া সেই শাখা ছেদন করিতেন, যে সেক্সপিয়র হরিণ-শিশু চুরি করিয়া বেড়াইতেন, সে কালিদাস কিম্বা সে সেক্সপিয়রকে কে দেখিতে চায়? সে কালিদাস কিম্বা সে সেক্সপিয়র আমাদের মন প্রাণ হরণ করেন নাই। যে কালিদাস বনে বসিয়া সরলপ্রাণা শকুন্তলার প্রেমের নবাঙ্কুর দেখিতেন,—তাঁহার সহিত মৃগশিশুর সন্তান-সম্বন্ধ ঘটাইতেন, নির্জ্জন কুঞ্জবনে দুষ্মন্তকে শকুন্তলার

মুখচন্দ্র তুলিয়া চক্ষের ধূলি পরিষ্কার করিতে বলিতেন,—যিনি নবমেঘাসনে বসিয়া বিরহিণীর বিরহ-যন্ত্রণা দেখিতে পাইতেন,— আমরা তাঁহাকেই চিনি এবং তাঁহাকেই চাই। সেইরূপ যে সেক্সপিয়র যুবরাজ হামলেটের গভীর মনোবেদনার সাক্ষী হইতেন;—সরলহৃদয়া ডেস্‌ডিমোনার ক্রূর হত্যাকাণ্ড দর্শন করিতেন,-কিন্তু দুরাচারিনী বিশ্বাসঘাতিনী লেডী ম্যাকবেথের ঘোরতর পাপের ঘোরতর শাস্তি দিয়া সন্তুষ্ট হইতেন, সেই সেক্সপিয়রই আমাদের মন প্রাণ হরণ করিয়াছেন।

সরল ভাষায় বলিতে গেলে—বলিতে হয় কাব্যের জন্যই কবির আদর। এখন এই প্রশ্ন,—কাব্য কাহাকে বলে? কি কাব্য নয় জানিতে পারিলে কাব্য কি জানা সহজ হয়; অতএব আমরা প্রথমে কি কাব্য নয় তাহা জানিতে চেষ্টা করিব। একজন বঙ্গদেশীয় কবি বলিয়াছেন,—

"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে!
কে বাঁচিতে চায়!
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে!
কে পরিবে পায়!"

সকলেই বলেন এই দুই পঁক্তিতে কবিত্ব শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, এবং সে কথা সত্য বটে; কিন্তু ইহার কোন্ স্থানটী কবিতা, ইহার মধ্যে কি কি আছে? (১ম) ছন্দ আছে (২য়) পরাধীনতা প্রার্থনীয় নহে এইমতটী আছে, (৩য়) দাসত্ব শৃঙ্খল-সমান এইরূপক আছে। ইহার কোন্টী কবিতা? কেবল মাত্র ছন্দের জন্য যদি কবিতা বলা যায় তাহা হইলে নিম্ন-লিখিত কয় পংক্তি ও কবিতা;—

কাশ্মীর লাহোর বম্বে সব বেড়াইয়ে,
পুনরায় উপস্থিত এদেশে আসিয়ে।
হরেক নূতন খেলা দেখাব এবার,
বঙ্গবাসী দেখে সবে হবে চমৎকার।
করিতে অদ্ভুত বাজি আসিল বুঙীন,
এস এস ছুটে এস-বালক প্রবীণ।

এরূপ পদ্যময় বিজ্ঞাপনকে ও কবিতা বলিতে হয়। উৎকৃষ্ট মত থাকিলেই যদি কবিতা বলিতে হয়, তাহা হইলে সমুদায় বিজ্ঞানের গ্রন্থও কাব্যরূপে পরিগণিত হয়। অথবা নিম্নলিখিত কয়েক পঁক্তিকেও কবিতা বলিতে হয়।

পরাধীন দেশ হলে ভদ্রস্থতা নাই,
নিরানন্দ দেশবাসী থাকিবে সদাই।
পর রাজা প্রজা-অর্থ করয়ে শোষণ,
নাহি করে প্রজাদের অভাব পূরণ।

একয় পঁক্তিতে স্বাধীনতা বিষয়ে অনেক ভাল কথা আছে; কিন্তু সেকারণে ইহাকে কবিতা বলা যায় না। এইরূপ কেবল মাত্র অলঙ্কারের সদ্ভাব দেখিয়া কোন পদ্যকে কাব্য বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। এমন কি, মনোহর ছন্দ, সুললিত পদ, উৎকৃষ্ট মত, ও সুসঙ্গত অলঙ্কার এই সকল গুলি সমবেত হইলেও কোন প্রবন্ধের কাব্যত্ব সম্পাদনে সমর্থ হয় না। আমরা বিলক্ষণ জানি আমাদের অনেক পাঠক এই গুলি দেখিলেই তাহাকে কাব্য বলিয়া গণনা করেন; কিন্তু তথাপি আমাদের বলিতে হইতেছে যে আমরা ইহার

সকলগুলি সমবেত হইলেও কবিতা বলি না। কোন পাঠক হয়ত মনে মনে প্রশ্ন করিতেছেন, যে,যে দুই পংক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে ইহার অতিরিক্ত আর কি আছে? অতিরিক্ত আর একটী পদার্থ আছে এবং তাহারই জন্য ইহাকে কবিতা বলিয়া গণনা করা যায়। সেটী লেখকের "স্বাধীনতাপ্রিয়তা"। সেটী মত নহে; বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্য নহে; কোন গূঢ় নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব নহে; কিন্তু এক প্রকার হৃদয়ের ভাব; ইংরাজীতে যাহাকে Emotions বা Passions বলে। এই ভাবের সত্ত্বেতেই কবিত্ব; ইহার অভাবে এসমুদায় কথা শুষ্ক ও নীরস। স্বাভাবিক নিয়মে দেখা যায় যে বক্তার ভাবের উত্তেজনা হইলে শ্রোতাদিগের ও ভাবের উত্তেজনা হয়, সুতরাং হৃদয়-নিহিত ভাব সকল উত্তেজিত করাই কবিতার লক্ষ্য। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। সংস্কৃত অলঙ্কার-কারেরাও কাব্যের এই লক্ষণ দিয়াছেন। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং"। রসাত্মক বাক্যই কাব্য। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্তি;—রস এই নয় প্রকার। এই সকল ভাবকে ইংরাজীতে (Nine Emotions) বলা যাইতে পারে। এবেনেজার ইলিয়ট নামক এক ব্যক্তি বলেন "হৃদয়ের ভাবমিশ্রিত সত্যই কাব্য।" আর একজন লেখক বলেন "হৃদয়ের ভাবমিশ্রিত চিন্তাই কবিতা" এই সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মত প্রায় এক প্রকার। বাস্তবিক হৃদয়ের ভাব লইয়াই কবিতার কার্য্য। কোন প্রকার নূতন মতে উপনীত করিবার জন্য কবিতার প্রয়োজন নয়; বিজ্ঞানশাস্ত্র কিম্বা তর্ক শাস্ত্র সেকার্য্যে রত আছে; হৃদয়ের নবভাবের উদয় করিবার জন্যই কবিতার প্রয়োজন। এমন কি হয়ত সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রান্ত মতও প্রচার হইতে পারে।

এই কথা কয়টি স্মরণ থাকিলে প্রকৃত কবিতা বাছিয়া লইতে ক্লেশ হয় না। যাহা পড়িয়া হৃদয়ের কোন ভাব উত্তেজিত হয় না, তাহা কবিতা নয়। যে শোক-সূচক পদ্য পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে বাস্তবিক করুণরসের সঞ্চার হয় না তাহা কবিতা নয়। অপরাপর ভাবের পক্ষেও এইরূপ। অনেকে কোন পদ্যগ্রন্থ পড়িয়া মতামত প্রকাশ করিবার সময় বলিয়া থাকেন, গ্রন্থকারের কবিত্ব-শক্তি আছে, কারণ গ্রন্থের উপাখ্যানভাগটী সুন্দর হইয়াছে। প্রকৃত কবিতার যে লক্ষণ দেওয়া গেল তদনুসারে বিচার করিতে গেলে একথা সারগর্ভ বোধ হয় না। কারণ উপাখ্যান সুন্দর করিতে কবিত্বের প্রয়োজন কি? কিঞ্চিৎ বুদ্ধি এবং কিঞ্চিৎ কল্পনা থাকিলেই যথেষ্ট। এইরূপ উপন্যাসকে (Novel) কবিতা বলা যায় না; কারণ তাহা গল্পরচনা মাত্র। কবিতার সহিত তাহার বিশেষ সম্পর্ক নাই। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ বলেন, মনুষ্যের জীবনের যে সময়ে—অর্থাৎ বালককালে—গল্প

শুনিবার জন্য আগ্রহ অধিক, সেই সময়েই কবিতার রসজ্ঞতা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। মানবজাতির জীবন সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। মানবজাতির ও বালককালে প্রকৃত কবিতা অপেক্ষা গল্পের আদর অধিক দেখা যায়। সে সময়ের যে কিছু কবিতা দেখা যায় তাহা গল্পমূলক।

এস্থলে গুটিকত কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ, অনেকের সংস্কার, বালককাল কবিতা পাঠের প্রকৃত সময়। কিন্তু তাহা ভ্রম বলিয়া বোধ হয়; কারণ যে সকল ভাব লইয়া কবিতা কার্য্য করে, তাহার অনেক গুলির তখনও উন্মেষ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অনেকের সংস্কার, যে সুকবি হইতে গেলে মনুষ্যের রীতি নীতি প্রভৃতি পাঠ করা আবশ্যক। তাহা ও আবশ্যক বোধ হয় না। প্রোফেসর এডোয়ার্ডের ন্যায়, একজন নিজের গো অশ্ব প্রভৃতি চিনিতে না পারিলে ও যেমন এক জন সুধী (Philosopher) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন, সেইরূপ জনসমাজের রীতি নীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়া ও একজন সুকবি হইতে পারেন। বরং ইহার বিপরীত মত সত্য; প্রকৃত কবিরা এসকল বিষয়ে উদাসীন। উপন্যাস লেখকের সে আয়োজন আবশ্যক বটে, কারণ মনুষ্যের চরিত্র, কার্য্য, কথা প্রভৃতি চিত্রিত করাই, পরের ভাব বর্ণনা করাই, তাঁহার কার্য্য। কিন্তু কবির চেষ্টা অন্যপ্রকার, কোন ব্যক্তির চরিত্র কিম্বা কার্য্য চিত্রিত করা তাঁহার লক্ষ্য নহে; কিন্তু নিজের হৃদয়ের তরঙ্গায়িত ভাবসমূহের একখানি ছবি চিত্রিত করাই তাঁহার লক্ষ্য। ঘটনার যোগাড় করিতে না পারিলে উপন্যাস লেখক নিরুপায়! কিন্তু কবি—ঘটনার দিকে দৃক্‌পাতও করেন না; তিনি এক মুষ্টি ধূলি ধরিয়া স্বর্ণমুষ্টি করিতে পারেন। প্রবল ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ—অমাবস্যার ঘোর তিমিরাবৃত রাত্রি—বিজন প্রান্তরে বিজন দেবমন্দির—তাহার মধ্যে এক পরম রূপবতী কামিনী এই সকলের সমাবেশ না হইলে উপন্যাস লেখকের কিম্বা উপন্যাস-পাঠকের চিত্ত উত্তেজিত হয় না। কিন্তু নবমেঘের উদয় মাত্র দেখিয়া কালিদাসের ভাবসমুদ্র উথলিতে পারে! ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে একটী মুষিকের বাসা ভাঙ্গিয়া দিয়া বরনসের হৃদয় নানাভাবে উচ্ছ্বলিত হইতে পারে! কিম্বা একটী লার্ক পক্ষী দেখিয়া শেলির হৃদয় আন্দোলিত হইতে পারে!

তৃতীয়তঃ লোকে সচরাচর আর এক প্রকার পদ্যকে কবিতা বলিয়া থাকেন। তাহা বস্তু কিম্বা পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা। ইহাকে Descriptive Poetry বলে। কিন্তু কেবল মাত্র বর্ণনা কবিতা নয়। তাহা হইলে হুতুমের নক্‌সাকেও প্রকৃত কাব্য বলিতে হয়। যদি কোন প্রকার বর্ণনাকে কখনও কবিতা বলা যায়, তাহা সেই বর্ণনার জন্য নহে কিন্তু তাহার অন্ত-

নিহিত ভাব বিশেষের (Emotion) জন্য।

যেমন,——

হের হের রণ মাঝে নাচিছে সুন্দরীরে
নাচিছে সুন্দরী।
করে অসি থরসান সুখে ডাকে হান হান
পদতলে কাঁপে ধরা থর থর করি রে
থর থর করি।
রণমদে মত্ত সতী, পাগলিনী প্রায় রে
পাগলিনী প্রায়!
নিবিড় ধূমের মাঝে, চপলা রূপসী সাজে
নবঘনে সৌদামিনী খেলিয়া বেড়ায় রে
খেলিয়া বেড়ায়!

এস্থানে যে কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে বর্ণনীয় বীর রসের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে, সেই জন্যই এটী কবিত্ব।

৪র্থতঃ অনেকের সংস্কার এই, নাটক মাত্রেই কবিতা ও নাটককার মাত্রেই কবি। সে সংস্কারও ভ্রান্ত সংস্কার। নাটকের মধ্যে "উপাখ্যান এবং রস" উভয়েরই সমাবেশ আবশ্যক। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ বলেন এই উভয় পদার্থের প্রচুর সমাবেশ থাকাতেই সেক্সপিয়রের গ্রন্থ সকল এত আদরণীয় হইয়াছে, তাঁহার এক একখানি ট্রাজেডি পড়িতে আরম্ভ করিয়া যতই অগ্রসর হওয়া যায় উপাখ্যান ভাগ ততই গাঢ় হইতে থাকে, অবশেষে এক একটী ঘটনাতে শরীর কণ্টকিত, হৃদয় চমকিত, হইতে থাকে; আবার যতই পাঠ করা যায় হৃদয়ের নিদ্রিত শত শত ভাব জাগ্রত হইতে থাকে; এবং কখন শোকে কখনও ক্রোধে হৃদয় আন্দোলিত হইতে থাকে।

হয়ত কেহ কেহ বলিতে পারেন, কবিতার যে লক্ষণ করা হইয়াছে তদনুসারে বক্তাকে ও কবি বলিতে হয়। কারণ তিনিও নিজের হৃদয়ের তরঙ্গায়িত ভাব সকল বাহিরে প্রকাশ করেন, এবং শত শত ব্যক্তির নিদ্রিত ভাবরাশিকে জাগ্রত করেন; তবে বক্তৃতা এবং কবিতার প্রভেদ কি? মিল বলেন "বক্তৃতা সাক্ষাৎ ভাবে শুনিতে হয়; কবিতা লুকাইয়া শুনিতে হয় (Oratory is heard, but Poetry is overheard)" ইহার অর্থ এই বাগ্মী যখন বক্তৃতা করেন তখন তিনি অপরের সত্ত্বা স্মরণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু কবি যখন লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি ভিন্ন যে জগতে লোক আছে, ইহা তাঁহার স্মরণ থাকে না। বক্তা পরের ভাব কি রূপে উত্তেজিত হইবে, তাহার চেষ্টা পান; কিন্তু কবি নিজের হৃদয়ের ভাব কি রূপে বর্ণমালায় প্রকাশ পাইবে তাহার চেষ্টা পান। কষ্ট-কল্পিত কবি লেখনী ধারণ করিয়া ভাবেন, কিরূপে লিখিলে,—কোন্ কথা ব্যবহার করিলে লোকের কর্ণে ভাল লাগিবে; লোকে পরিতৃপ্তি লাভ করিবে সুতরাং তিনি সুললিত কথার অন্বেষণে বাহির হন;—ছন্দটী ঘষিয়া মাজিয়া কোমল করিবার চেষ্টা পান; কিন্তু প্রকৃত কবি সে বিচার ও করেন না; সে প্রকার প্রয়াস ও পান না; তিনি লেখনী ধরিয়াই ভাবেন কিরূপে লিখিলে কোন্

কথা ব্যবহার করিলে আমার, হৃদয়ের সমগ্র ভাব বাহিরে চিত্রিত হইতে পারে। অনেক সময় ভাষার দরিদ্রতা নিবন্ধন্ তাহাঁর হৃদয়ের সমগ্র ভাব বাহিরে চিত্রিত হইতে পায় না; কিন্তু যে দুই, একটী বাহির হয় তদ্দ্বারাই সমগ্র ভাবের আভাস পাওয়া গিয়া থাকে; এবং সেই কারণে বিশেষ মনোহর হয়; যেমন একজন সুচিত্রকরের তুলিকার দুই চারিটী দাগে একটী পরমসুন্দর দৃশ্যের আভাস পাওয়া যায়।

কাব্যের স্বরূপ ও লক্ষণ নির্ণয় মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। আগামী বারে প্রকৃত কবি ও কবিত্বশক্তির লক্ষণাদির বিচার করা যাইবে।

শ্রী শি,

আত্মারাম পড়!!

হে ক্ষণভঙ্গুর-শরীর-কুটীর-বাসি! অদৃশ্য জীব! তুমি কি? মনে করি তোমাকে বর্ণনা করি, কিন্তু চক্ষু তোমাকে আজি পর্য্যন্ত দেখিল না! তুমি,—

"অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ, শ্রোতা; অমতো মন্তা, অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা।"

তোমাকে কেহ দেখে নাই, কিন্তু তুমি সকল দর্শন কর; তোমাকে কেহ শুনে নাই, কিন্তু তুমি সকল শ্রবণ কর; তোমাকে কেহ মনন করিতে পারে না; কিন্তু তুমি সমুদায় বিষয় মনন কর; তোমাকে কেহ জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তুমি সমুদায় বিষয় জ্ঞাত হও। হে রূপ-রস-গন্ধ-বিহীন জীব! তুমি কি? আমিই কেবল এই প্রশ্ন করি না, পূর্ব্বকালে নচিকেতাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; অতএব বল তুমি কি?

তুমি দেবতা নও, কারণ কখন ও তোমাকে নরক-বাসী দেখি! তুমি পিশাচ নও, কারণ তোমাকে স্বর্গে ও যাইতে দেখি! তুমি পশু নও, কারণ তুমি কথা কও! তুমি তরু লতা নও, কারণ তুমি স্বর্গ মর্ত্তে বিচরণ কর। তবে তুমি কি?

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা—প্রাচীন ভারতের প্রাচীন আর্য্যেরা—তোমার অন্ত পান নাই! তুমি কে? কেহ তোমাকে এই দেহ রথের সারথি বলিয়াছেন,—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু,
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ মনঃ প্রগ্রহমেবচ।"

হে সারথি! তুমি নাকি এই দেহ-রথে ইন্দ্রিয়রূপ দশ অশ্ব যোজনা করিয়া মন অর্থাৎ প্রবৃত্তিরূপ রশ্মি ধরিয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ কর? কেহ কেহ তোমাকে পরব্রহ্মের রূপান্তর বলিয়াছেন,—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপে বিহায়,
পরাৎপরং দেবমুপৈতি দিব্যং ॥"

নদী সকল যেমন নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া মহাসমুদ্রে লীন হয়, সেই রূপ দিব্য জ্ঞান জন্মিলে তুমি ও নাকি নাম রূপ পরিহার করিয়া পরাৎপর দেবে লীন হও?

তুমি যে হও—যাহাই হও,—তোমার শক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি! নারীরূপ-ধারিণী প্রকৃতিরা যেমন অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিয়াও আমাদিগকে শাসন করেন—মহারাজচক্রবর্ত্তীকেও যেমন শাসন করেন—হে অদৃশ্য অস্পৃশ্য অচ্ছেদ্য জীব! তুমি ও সেইরূপ স্বকীয় কারাগারের অন্তঃপুরে থাকিয়া প্রভুত্ব কর। আমরা যেমন আমাদের গৃহের অন্তঃপুর-বিহারিণী-দিগের দাস, সেইরূপ এই হস্তপদ, এই চক্ষু কর্ণ, আমাদের যাহাকিছু আছে, সকলি তোমার দাস। যেমন অন্তঃপুরের বন্দিনীরা উঠিতে বলিলে উঠি, বসিতে বলিলে বসি, সেইরূপ তুমিও উঠিতে বলিলে উঠি—বসিতে বলিলেও বসি, তাঁহাদের জন্য যেমন বস্ত্র অলঙ্কার যোগাই, তোমার জন্য ও সেইরূপ যত্ন করিয়া বসনভূষণ আহরণ করি; কিন্তু তুমি কিছুতেই সন্তুষ্ট নও কেন? দুর্ল্লভ রমণীরও মন সুলভ হইল, তথাপি তোমার মন পাইলাম না কেন? তোমার মন যোগাইতে জীবন কাটিয়া গেল—পরিশ্রান্ত হইলাম—আর পারি না, তথাপি কি সন্তুষ্ট নও? কোন্ পদার্থে তোমার রুচি? পোলাও কালীয়ে কোপ্তা ও অনেক দিয়াছি—ক্ষীর সর নবনীর ও যথেষ্ট উপযোগ হইয়াছে—আর কি চাও? যদি বল উনবিংশ শতাব্দী! মটন হ্যাম বিফ্‌ষ্টেক্ চাই; তাহা দিতে পারি না, কারণ তাহা অভক্ষ্য বিবেচনা করি। আর সে বিষয়ে অনেক বাবু তো লুকোচুরি খেলিতে ক্রটী করিতেছেন না, কই তোমার স্বজাতীয় ভ্রাতারাও ত তাহাতে সন্তুষ্ট নয়! তোমরা সে জাত নও। সুস্বাদু সুশীতল জল তো দিয়াছি—যদি বোতল-বিহারিণী ভাগীরথীর কামনা কর, তাহা দিতে পারিব না; কারণ তাহা বিষ মনে করি। ভারতের ভাগীরথী ভগীরথের চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন—এ ভাগীরথী সেইরূপ ভারতের সন্তানদিগের চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ করিবারজন্য আসিয়াছেন। আর তাহাই যে চাও কেমনে বলিব? আমার ন্যায় অনেক বানর তো তোমার ভ্রাতাদিগকে সে দ্রব্য যোগাইতেছে—তাহাতেও তারা সন্তুষ্ট নয় কেন? তোমরা সে জাত্ নও। রমণীর মুখ পরম পদার্থ—এই কষ্ট-দুঃখ-পূর্ণ, শোক-তাপ-পূর্ণ, পৃথিবীর আরামস্থল—আধিব্যাধির মহোষধ—যদি তাহাই চাও তাহাও দিয়াছি। যদি বল সে মুখ পুরাতন হইল;—সে কথা মানি না—কারণ তাহা যে পুরাতন হয় না; সাক্ষী মিল্‌টন্,—

"My ever-new delight"

ইহার অতিরিক্ত চাও—এ দাস পারিল না। ফল কথা এই—তুমি

এসকলের কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না। যখন কিছুতেই পোষ মান না তবে বুঝি তুমি পক্ষী? তাহাই বটে—কারণ পূর্ব্বপুরুষেরা এ কথাও বলিয়াছেন,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।"

দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন এবং উভয়ে পরস্পরের সখা। হে বিহঙ্গবর! তুমি পোষ মানিতেছ না কেন?

" বাসঃ কাঞ্চন-পিঞ্জরে
নৃপসুতাহস্তৈ স্তনূমার্জ্জনম্।
ভক্ষ্যং স্বাদুরসাল-দাড়িম-ফলং
পেয়ং সুধাভং পয়ঃ॥
গেয়ং সংসদি রাম-নাম সততং
ধীরস্য কীরস্যতে।
হাহা! হন্ত! তথাপি জন্ম-
বিটপি-ক্রোড়ে মনোধাবতি॥"

হে ধীর বিহঙ্গ! কাঞ্চন-পিঞ্জরে তোমার বাস; রাজকুমারীর হস্ত দ্বারা তোমার দেহ-মার্জ্জন; সুস্বাদু রসাল দাড়িম ফল তোমার ভক্ষ্য—সুধাতুল্য জল তোমার পেয়; এবং প্রতিদিন রাজসভায় রামনাম গান তোমার কার্য্য; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তথাপি তোমার চিত্ত সততই জন্মতরুর দিকে ধাবিত হয়। হে পতত্রিকুলতিলক! তুমি বিহঙ্গদিগের মধ্যে কোন্ জাতিকে অলঙ্কৃত করিয়াছ? তুমি কি গরুড়? কারণ দেখি সাগর-পারী পুরুষোত্তমদিগের নিকটে গেলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া থাক। তুমি কি শকুনি? কারণ অনেক সময় দেখি অনেক হতভাগ্যের যশ ও মান সম্ভ্রম লইয়া টানাটানি করিতেছ? তুমি কি কাঠ্ঠোক্রা? কারণ অনেক সময় দেখি কাষ্ঠসমান বিজ্ঞান প্রভৃতিতে ঠোকর মারিতেছ? তুমি কি মাছরাঙা? কারণ কখনও দেখিতে পাই সিকি দুয়ানি প্রভৃতি চুণাপুটী ভবনদীতে যাহা পাও, ধরিবার প্রয়াস করিতেছ? তুমি কি পায়রা? কারণ প্রায় দেখি সামান্য মতান্তর হওয়াতে স্বাধিকার হইতে স্বজাতীয়দিগকে ঠুকরাইয়া ও ড্যানার ঝাপ্টা মারিয়া তাড়াইবার চেষ্টায় আছ। তুমি কি ময়ুর? কারণ মধ্যে মধ্যে দেখি গলা ফুলাইয়া প্যাকম্ খেলাইয়া—আপনাকে দুনিয়ার মধ্যে বড় বলিয়া পরিচয় দিতেছ? তুমি কি ঘুঘু?—কারণ কখন কখন দেখিতে পাই কাহারও কাহারও বাসভবনে চরিবার যোগাড় করিতেছ, তুমি কি শুক? তুমি কি বৈশম্পায়ন? কারণ তুমি কখন হাস, কখনও কাঁদ—কখন গান গাও —কখনও কথা কও আবার কখনও দেখি যে ভগবানের নাম কর। বিদেশীয় পণ্ডিতেরা তোমাকে ফিনিক্স (Phœnix) বলিয়া পরিচয় দেন। কারণ তুমি নাকি অমর এবং ভস্মময় হইলেও পুনরুত্থিত হও। তুমি যে হও—হে আত্মারাম! তুমি এত উড়ু উড়ু কর কেন? তোমার ঘর কোথা? তুমি সুস্থির হও; শরীর পিঞ্জরে বসিয়া একবার পড়! "হে রাম"

"মহাভারত!" "রাধা-কৃষ্ণ" এসকল পুরাতন পড়া পড়িও না; কারণ তাহা হইলে পাঠক পক্ষিরাও "আর্য্যদর্শন" হস্তে পড়িলেই সেই পড়া পড়িবেন; তুমি মিল পড়, কম্‌তে পড়, কবি পড়, কাব্য পড়, ছাই ভস্ম পড়! যাহা হউক্‌ হে আত্মারাম তুমি একবার পড়!

শত্রুসিংহ।

বিজনে।

একে বৈশাখ মাস তাহাতে আবার মাসাবধি এক বিন্দুও বৃষ্টি নাই। আকাশে মেঘ পর্য্যন্তও দৃষ্ট হইতেছে না। বেলা প্রায় আড়াই প্রহর। সূর্য্য-রশ্মি বেগে শরীর বিদ্ধ করিতেছে। এতে কি আর পথিকের প্রাণ বাঁচে? শরীর গলদ্‌ঘর্ম্ম, পিপাসায় কণ্ঠরোধ। পথিকের পা আর চলেনা। বিশ্রাম-ইচ্ছা বলবতী, কিন্তু বিশ্রাম করিবার স্থান নাই। চতুর্দ্দিকেই মাঠ—তৃণ-শূন্য মাঠ—মধ্যে মধ্যে কেবল খর্জ্জুর বৃক্ষের ন্যায় এক প্রকার বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। সে গুলিও অতি ক্ষুদ্র। মাঠের ভূমি এরূপ কঠিন, যে অশ্বারোহী গমন করিলে অশ্বের ক্ষুর-ঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয়। পথিক স্বভাবতঃ সবলকায়, শীত উত্তাপের ক্লেশ সহ্য করা তাঁহার চিরাভ্যস্ত। তথাপি আর চলিতে পারেন না। দুই তিন দিবস আহার নাই, দুই তিন দিবস বিশ্রাম নাই, পথিক এই দুই তিন দিবস ক্রমাগত পথ চলিতেছেন। আর চলিতে পারেন না। রক্ত মাংসের শরীর—আর কত সহ্য হবে? ক্রমে পদচালনার বেগ কমিতে লাগিল। পূর্ব্বে তিনি যে সময়ের মধ্যে চারি ক্রোশ চলিতেছিলেন এখন সেই সময়ের মধ্যে এক ক্রোশও যাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এখন আর চরণ-যুগল তাঁহাকে বহন করিতেছে না। তিনিই অতি কষ্টে আপনার চরণ দুইটীকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। চরণদ্বয় তাঁহার পক্ষে দুইটী অতি গুরু লৌহপিণ্ডের ন্যায় বোধ হইতেছে। পথিক প্রাণপণে চলিতেছেন, তাঁহার গুরু পদদ্বয় তাঁহাকে চলিতে দিতেছে না।

এইরূপে ক্রোশ দুই গমন করিলেন। এই দুই ক্রোশ গমন করিতেই বেলা শেষ হইয়া আসিল। রৌদ্রের উত্তাপ ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। রৌদ্রের তেজ কমিল, কিন্তু বায়ু শীতল হইল না। বৈশাখ মাসের আকাশ কখন কোন

ভাব ধারণ করে কেহই বুঝিতে পারেনা। দেখিতে দেখিতে আকাশে মেঘ ঘোর করিয়া আসিল। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। পথিক চিন্তায় আকুল। কি করিবেন, কোন্ দিকে যাবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। একে অপরিচিত প্রদেশ, তাহাতে এরূপ অবস্থা, পথিক স্বভাবতঃ নির্ভীক হইলেও তাঁহার হৃদয়ে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল—কিন্তু উহা ক্ষণিক, তৎক্ষণাৎ নৈসর্গিক সাহস তাঁহার চিত্তকে উৎসাহিত করিল। পথিক ভবিষ্যৎ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ক্রমাগত দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে আকাশের ভাব ভয়ানক হইতে লাগিল। ঝড় আগতপ্রায়, পথিক নিরুপায়, আবার সম্মুখে এক নদী, পথিক হতজ্ঞান। এখন যান কোথা? নদীর পারেও কেবল মাঠ—পথিক সাহসে ভর করিয়া নদী পার হইলেন। নদীতে জল অধিক নাই। পার হইতে পথিককে বড় ক্লেশ পাইতে হইল না—এখন প্রবল বেগে ঝড় বহিতে লাগিল। বৃষ্টিও পতনোন্মুখ। রাত্রি উপস্থিত, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ হইতেছে, তাহাতেই পথিক পথ দেখিতে পাইতেছেন। নিবিড় অন্ধকারে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। গুরুতর ক্লেশ লঘুতর ক্লেশকে পরাজিত করিল। পথিকের ক্ষুধা তৃষ্ণার ক্লেশ এখন আর অনুভূত হইল না। তিনি প্রাণপণে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ঝড়ের তেজও ক্রমে প্রবলতর হইতে লাগিল।

পথিক নদী পার হইয়া প্রায় অর্দ্ধ-ক্রোশ গমন করিয়াছেন। আর গমন করিতে পারেন না। এখন আর কোন অঙ্গই তাঁহার বশ নহে। পথিক প্রায় নির্জীব—সহসা সম্মুখে একটী আলোক দৃষ্ট হইল। পথিক চমকিয়া উঠিলেন। মনে হইল যেন তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। আবার দেখিলেন অনতিদূরেই একটী ক্ষুদ্র আলোক। আস্তে আস্তে অতি কষ্টে সেই দিকে গমন করিলেন। অধিক দূর যাইতে হইল না। আলোক একটী দেবমন্দিরে জ্বলিতেছিল। পথিক প্রাণপণে হস্ত পদের সাহায্যে, কোনরূপে মন্দিরের উপর উঠিলেন। দেখিলেন মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ নহে। মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই বসিয়া পড়িলেন। বসিতে পারিলেন না, তাঁহাকে শয়ন করিতে হইল। মন্দিরের ভিতর কোন্ দেব বা দেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত, দেখিতে তাঁহার অবকাশ হইল না। সম্মুখে কিছু দেখিতেও পাইলেন না। পথিকের অঙ্গবস্ত্র সমুদয় জলে অভিষিক্ত। অভিষিক্ত হইলেও অঙ্গবস্ত্র অঙ্গেই রহিল। পথিক অচেতন হইলেন। নিদ্রা তাঁহাকে অচেতন করিল।

২য় অধ্যায়।

অপরিচিত পুরুষ।

রাত্রি প্রভাত হইল। আকাশ নির্ম্মল, প্রকৃতি পূর্ব্ব-রাত্রির ভীষণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া সুস্নিগ্ধা বালিকার ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন। সর্ব্ব-সংহারিণী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব রাত্রিতে বাত্যাহস্ত দ্বারা যাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন, মৃদু মন্দ বায়ু হস্ত দ্বারা তাহাদিগকে স্থির ও পুনর্জ্জীবিত করিতেছেন। বৃক্ষ লতাদি তাঁহার সুকোমল-করস্পর্শে সুস্থির হইতেছে। পক্ষিগণ আবার আনন্দধ্বনি করিতেছে—গত রাত্রির সমস্ত ক্লেশ বিস্মৃত হইয়াছে।

পথিক এখনও নিদ্রিত, কিন্তু এখনকার নিদ্রা আর তত গাঢ় নহে। পথিকের অল্প অল্প জ্ঞানের উদ্রেক হইতেছে। সহসা একবার চক্ষু উন্মীলন করিলেন। চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। গত রাত্রির সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার মনে হইল। ভূমিশয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। শরীর অতিশয় দুর্ব্বল, ক্ষুধায় বিকলপ্রায়। কিন্তু আহারে রুচি নাই—চেষ্টাও নাই। শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইলেও আস্তে আস্তে উত্থান করিলেন। মন্দিরে কোন দেব দেবীর মূর্ত্তি নাই দেখিয়া তাঁহার কিছু বিস্ময় বোধ হইল। সহজেই বিস্ময় হইতে পারে। কোন দেব দেবীর মূর্ত্তি নাই, তবে গত রাত্রিতে আলোক জ্বলিতেছিল কেন?

কারণ অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা হইল, ধীরে ধীরে বহির্গত হইলেন, দেখিলেন মন্দিরটী অতি প্রকাণ্ড। মন্দিরের ভিতর দেখিয়া যত বৃহৎ বোধ হইয়াছিল—বাহির হইতে তাহা অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া বোধ হইল। মন্দিরটীর গঠন অন্যান্য পুরাতন মন্দিরের ন্যায়।

পথিক পুনর্ব্বার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরের এক দিকে একটী অতি অপ্রশস্ত দ্বার দৃষ্ট হইল। দ্বার অতিক্রম করিতে পথিকের কিছু ক্লেশ বোধ হইল। তাঁহার শরীর একটু স্থূলতর ছিল। দ্বার অতিক্রম করিয়া একটী ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেটীও ঠিক প্রথমটীর মত। মধ্যস্থলে বাণলিঙ্গ বিরাজিত। পথিক প্রকৃত ভক্ত, লিঙ্গদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

মন্দিরটীর কারুকার্য্য অতি সুন্দর, দুইটী গবাক্ষে আলোক প্রদান করিতেছে। কিন্তু এরূপ দুই ভাগে বিভক্ত কেন? দেবমূর্ত্তি এরূপ গুপ্তভাবে প্রতিষ্ঠিত কেন? পথিকের মনে একটু খট্‌কা লাগিল। বিশেষ কোন কারণ থাকিবে, ইহা তিনি এক প্রকার মনে মনে স্থির করিলেন। কিন্তু কারণটী কি তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

পথিক মন্দির হইতে বহির্গত হইবার

উপক্রম করিলেন, অপ্রশস্ত পথ দ্বারা বহির্গত হইয়া অন্যভাগে আগমন করিলেন। আপনার বস্ত্রাদি উচিতমত পরিধান করিলেন। পথিকের পরিচ্ছদ অতি অল্প। পরিধান একটী পায়জামা। গাত্রে অঙ্গরাখা, অঙ্গরাখাটী আজানুলম্বিত। কোমরে একটী কোমর বন্ধন, মস্তকে উষ্ণীষ, পায়ে জরীর কাজ করা নাগ্‌রা জুতা। সঙ্গে কেবল একখানি তরবারি।

পথিক বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া বহির্গত হইতেছেন। হঠাৎ তাঁহার পথরোধ, সম্মুখে এক পুরুষ দণ্ডায়মান। পথিক অন্যমনস্ক ছিলেন, অপরিচিত পুরুষ যে কখন মন্দির দ্বারে উঠিয়াছেন দেখিতে পান নাই। সম্মুখে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পথিক একটু প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অপরিচিত পুরুষ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পথিক মন্দির হইতে বহির্গত হইতে যান—অপরিচিত পুরুষ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ইঙ্গিত দ্বারা নিষেধ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে কহিলেন। পথিক তাঁহার অনুগমন করিলেন।

দুজনেই পূর্ব্বোক্ত পথ দ্বারা যে খানে বাণলিঙ্গ বিরাজিত সেই খানে প্রবেশ করিলেন। অপরিচিত পুরুষ দেবমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া নিয়মিত অর্চ্চনাদির পর মহাদেবের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন।

তিনি এক মনে স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন, পথিক ও একমনে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অপরিচিতের বয়স পঞ্চাশতের কম নয়। তাঁহার বর্ণ অতি গৌর, মস্তকের কেশ ঈষৎ শুভ্র। শুভ্র কেশে একটী ক্ষুদ্র শিখা। আকৃতি দেখিলেই বোধ হয় অপরিমিত বল, হস্তপদাদি অতি দৃঢ়। পরিধান এক খানি গরদের ধুতী মালকোচা মারা। স্কন্ধে এক খানি গরদের দোব্‌জা। কপালে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রক্তচন্দনের ফোঁটা। গলদেশে উপবীত। হস্তে রুদ্রাক্ষের মালা। তিনি স্তব পাঠ করিতেছেন—রুদ্রাক্ষের মালাও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হস্তে ঘুরিতেছে। স্তব পাঠ শেষ হইল। অপরিচিত পুরুষ আবার দেব মূর্ত্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। দেবাদিদেবকে প্রণিপাত করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। পথিক ও গাত্রোত্থান করিলেন। উভয়েই মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন।

পথিক নিস্তব্ধ, অপরিচিতের সহিত অগ্রে কথা কহিতে সাহস হইল না। ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অপরিচিত এখনও মৌনভাবেই আছেন। হস্তের রুদ্রাক্ষমালা এখনও স্বীয় কার্য্যে বিরত হয় নাই, ক্রমাগত ঘুরিতেছে। কপালের ভ্রুকুটী এখনও শিথিল হয় নাই। দেখিলেই বোধ হয় যেন তিনি কোন অতি গুরু দুর্ভাবনায় নিমগ্ন আছেন। পথিক অপরিচিতের ভাব ভঙ্গি একমনে নিরীক্ষণ করিতেছেন। বিস্ময় ও ঔৎসুক্য তাঁহার চিত্ত অধিকার

করিয়াছে। কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইতেছেনা। অপরিচিত পুরুষ ও পথিকের ভাব ভঙ্গি সকল মধ্যে মধ্যে নিরীক্ষণ করিতেছেন। এরূপ ভাবে দেখিতেছেন যেন পথিক না টের পান। পথিকের বেশ ভূষা, রূপ গঠন, দেখিয়া তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা তিনিই জানেন। আমি বলিতে পারি না।

এই রূপে উভয়েই মৌনভাবে গমন করিতেছেন। উভয়ের মনের ভাব, উভয়েই জানিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। অবশ্যই হইয়াছেন। তবে এমন নিস্তব্ধ ভাব কেন?. বাক্‌শক্তি কি তিরোহিত হইয়াছে? কথা কহিলেই ত হয়। না—কথা কহা সহজ নহে—দুই জন অপরিচিতের পরস্পরসম্ভাষণ বড় সহজ নহে—দুই জন তেজস্বী গৌরব-প্রিয় অপরিচিতের পক্ষে সহজ নহে। এমন ভাবেই বা কতক্ষণ চলিবে? স্বভাবের গতিরোধ করিয়া আর কতক্ষণ থাকিবে? দুই জনেরই কথা কহিতে ইচ্ছা হইল। ইচ্ছা ক্রমে অধিকতর বলবতী হইল,—ইচ্ছা চেষ্টায় পরিণত হইল। দুই জনেই দুই জনকে সম্বোধন করিলেন। দুই জনেই বলিয়া উঠিলেন "আপনার,"—এই শব্দ উচ্চারণমাত্রেই পথিক আর কিছুই বলিলেন না। অপরিচিত পুরুষ তাঁহা অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনিই কথা কহিতে লাগিলেন।

"আপনার নিবাস কোথায়?"—অপরিচিতের মুখ হইতে গম্ভীর স্বরে এই প্রশ্ন নির্গত হইল। এই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার নয়নদ্বয় প্রখর বেগে পথিকের মুখের দিকে ধাবিত হইল। পথিকের হৃদয়ের সহসা একটু ভাবান্তর হইল। অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার মুখের দিকে এরূপে নিরীক্ষণ করিতেছেন কেন? তিনি তাঁহার আন্তরিক গূঢ়ভাব জানিবার জন্যই কি এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন? পথিক কি উত্তর দিবেন? সত্য কথা তাঁহার হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া ওষ্ঠপ্রান্তে আগমন করিল। কিন্তু বিপদাশঙ্কা এবং স্বার্থসিদ্ধি তাহাকে বাহির হইতে দিল না। পথিকের মন মুহূর্ত্তের জন্য স্থানান্তরিত হইল। যেখানে তাঁহার নিবাস, যে নগরের পরিচয় দিতে তিনি সাহস করিলেন না, তাঁহার হৃদয় সেই স্থানে গমন করিল। কেন গমন করিল—কে বলিতে পারে। পথিকের মনের ভাব পথিকের মনই জানে, আমি জানি না—পথিক নিজে জানেন কি না সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ। যাহাই হউক তাঁহার মনকে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে অন্ততঃ এক মিনিটও লাগিল। অপরিচিত ব্যক্তি এই অবসরে তাঁহার মুখের ভাব ভঙ্গি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছিলেন। ঈষৎ কঠোর স্বরে পথিককে বলিলেন, "আপনি পরিচয় দানে পরাঙ্মুখ, ভাল আমার জানিবার প্রয়োজন নাই।" পথিকের সহসা চমকা ভাঙ্গিল। কি বলিবেন ঠিক নাই। কিন্তু সত্য কথা অবশ্যই

গোপন করিতে হইবে। বলিলেন "আমার নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঞ্চন নগর"—পথিক যে প্রকৃত উত্তর দিলেন না, প্রশ্নকর্ত্তা তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু প্রকাশে যেন বুঝিয়াও বুঝিলেন না। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নাম কি?"

এবার উত্তর দিতে পথিক আর বড় চিন্তিত হইলেন না। তিনি এই নিমেষদ্বয়ের মধ্যেই ইতিকর্ত্তব্যতা একরূপ স্থির করিয়া লইয়াছেন। কিরূপে প্রকৃত পরিচয় গোপন করিতে হইবে তাহা এক-প্রকার অভ্যাস করিয়াছেন। বলিলেন, "আমার নাম বিজয়-সিংহ, আমি জাতিতে ক্ষত্রিয়।" প্রশ্নকর্ত্তা ইহাতেই প্রত্যয় করিলেন। অবিশ্বাসের কোন চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। তিনি পথিককে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন বলিয়াও বোধ হইল না। পথিক কোন্ কার্য্যোদ্দেশে কোন্ দেশে গমন করিতেছেন ইহা জানিতে তাঁহার এখন ইচ্ছাও হইল না। পথিক ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যেরূপ কাতর, তাঁহাকে আর বিরক্ত করা ভালও দেখায় না। পথিকও তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। বাস্তবিকও তিনি এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিলেন, যে দুই একটী কথা কহিতেও তাঁহার যারপর নাই ক্লেশ হইতেছিল।

উভয়ে মৌনভাবে গমন করিতে লাগিলেন। অধিক দূর যাইতে হইল না। সম্মুখেই একটী বাটী। দেখিতে দেখিতে উভয়েই বাটীর তোরণসন্নিধানে উপনীত। অপরিচিত পুরুষ পথিককে সঙ্গে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অগস্ত্য কম্‌ত (সুমত) ও তাঁহার উদ্ভাবিত প্রত্যক্ষবাদ।

অগস্ত্য কম্‌ত অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁহার তুল্য প্রগাঢ়ধীশক্তিসম্পন্ন দার্শনিক অতি বিরল। তিনি তদীয় প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) উদ্ভাবন ও সংস্থাপন করিয়া পণ্ডিতসমাজে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। এক্ষণে সভ্যসমাজমাত্রেই কম্‌তের নাম প্রতিধ্বনিত। অনেক স্থলে কম্‌তপ্রণীত ধর্ম্মের পতাকা উড্ডীন। তাঁহার উদ্ভাবিত অপূর্ব্ব দর্শন সর্ব্বত্রই প্রচারিত। তিনি প্রায় তাবৎ সভ্যসমাজের কৃতবিদ্য

অবিবাসীদিগকে দুই দলে বিভক্ত করিয়াছেন। এক দল তাঁহার শিষ্য, তাঁহাকে দেবতোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, তাঁহার মত অভ্রান্ত বলিয়া সাদরে গ্রহণ করেন। অপর দল তাঁহার বিরোধী। এই দলের মধ্যে কেহ কেহ ভ্রান্ত ও অশ্রদ্ধেয় বোধে তাঁহার মতের পোষকতা করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহারা তাঁহার মতের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। কিন্তু অধিকাংশই স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার বিদ্বেষী। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই কম্‌তের প্রণীত দর্শন, সমাজনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রের মধ্যে সার আছে কিনা জানিবার জন্য কখন কোনরূপ চেষ্টা না করিয়াও অকারণে ইঁহার নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন, ইঁহার উপর অকারণে 'পাষণ্ড' 'নাস্তিক' 'ভণ্ড' প্রভৃতি নানাপ্রকার কটু শব্দ অজস্র বর্ষণ করেন। অনেকেই কম্‌তের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহেন, তবে কেহ বা বন্ধু বান্ধব প্রভৃতির মধ্যে কাহার ও প্রমুখাৎ কখন ও কিছু না কিছু শুনিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। যাহা হউক্ ইঁহারা সকলেই একবাক্যে নিরপরাধ কম্‌তের প্রতি খড়্গাহস্ত। আমাদের দেশেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এক্ষণকার কৃতবিদ্য বঙ্গীয় যুবকের মধ্যে অনেকে কম্‌তের মত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কম্‌তের প্রশংসা বা গুণানুবাদ করা দূরে থাকুক, ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কখন কম্‌তের নামমাত্র উল্লেখ করিলেও প্রাচীনতন্ত্রের লোকেরা উহাঁদিগকে নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। এরূপ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত কার্য্য পাঠক বিচার করিবেন। এতাবতা আমরা এরূপ বলিতেছি না যে আমরা ও কম্‌তের শিষ্য। তবে কম্‌তের কুৎসাবাদ আমাদের গায়ে সহে না। আমরা কম্‌তের অদ্বিতীয় অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। আমরা কম্‌তের পক্ষপাতী। আমরা অকারণপ্রবৃত্ত কম্‌তের নিন্দকদিগকে এইমাত্র বলিতে চাহি, যে ঐরূপ অকারণপ্রবৃত্ত হইয়া কাহারও অপভাষা করা কাপুরুষেরই কার্য্য। যদি কোন বিষয় অধিকার করিয়া কথা কহিবার প্রয়োজন হয়, পূর্ব্বে তদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হওয়া, অন্ততঃ হইবার চেষ্টা করাও, সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই নিয়মের বিপরীতাচরণ করিলে বাক্‌শক্তির অবমাননা করা হয়। কালিদাস লিখিয়াছেন—'ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে, শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।' আমরা এই শ্লোকের সারগর্ভতা স্বীকার করি। মহৎ লোকের বৃথা অসূয়াপ্রবর্ত্তিত নিন্দাবাদ শ্রবণপূর্ব্বক যিনি যথাসম্ভব উহার প্রতিবাদ না করেন, তাঁহাকেও আমরা নিন্দকের সহিত প্রত্যবায়ের অংশী করিতেছি। বুঝিতেছি যে এতদূর না করিলে ভাল করিতাম। কিন্তু প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে ক জন সমর্থ? "ক ইপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ, পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।" কম্‌তের বিষয় অবতারণা করাও এই জন্যই। কম্‌তের গ্রন্থপাঠ করিতে

করিতে অনেক দিন হইতে আমাদের এই সংস্কার হয়, যে লোকে বিনা কারণে নিন্দা করিয়া কম্‌তের প্রতি অত্যাচার করিতেছেন। ফলতঃ আমাদের সংস্কার এই, লোকে সহস্র দোষ করিলেও ঐ দোষসমূহের অনুরোধে তাঁহাদের গুণ ভুলিয়া যাওয়া কোন মতেই বিধেয় নহে। উদারপ্রকৃতি মহৎলোকেরা শত্রুরও গুণোৎকীর্ত্তন করিতে বিমুখ হন না। আমরা কম্‌তের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া শিষ্যবর্দ্ধনের চেষ্টা করিতেছি না। তাঁহার শিষ্য নহি। তবে কম্‌তের গুণ আছে কি না সকলেই একবার স্বয়ং দেখুন। সকলেই একবার তাঁহার Philosophie Positivo স্বচক্ষে দেখুন, অবশ্যই দেখিবেন উহার অভ্যন্তরে অদ্বিতীয় ক্ষমতা, অদ্বিতীয় বিদ্যাবুদ্ধি, অদ্বিতীয় সাধারণ্যসংস্থাপন (Generalisation) দীপ্যমান। কম্‌ত অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বেকন প্লেতো অথবা এরিস্ততল, ইহাতে আমাদের সংশয় নাই। এরূপ অসাধারণ ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত ও তৎপ্রণীতশাস্ত্র সমালোচনা করা সাধারণের প্রীতিকর হইবে মনে করিয়া আমরা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলাম। প্রথমে উহাঁর জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। পরে শাস্ত্রীয় কথা হইবে।

ফ্রান্সের অন্তঃপাতী মন্তপিলর নামক প্রাচীন নগরে ১৭৯৮ খৃঃ অব্দের ১৯ এ জানুয়ারি দিবসে অগস্ত্য কম্‌তের জন্ম হয়। যে সামান্য পরিচ্ছন্ন আবাসে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান্ আছে। কম্‌তের পিতা তত্রত্য হিরাত (Herault) নামক উপবিভাগে রাজকরের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী উভয়েই ক্যাথলিক ধর্ম্মে দৃঢ়ব্রত ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা শৈশবকালে কম্‌তের কোমল অন্তঃকরণে উক্ত ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কম্‌ত বাল্যকালে নিতান্ত অবাধ্য ছিলেন, অপরে সহজে তাঁহাকে নিজ ক্ষমতার বশীভূত করিতে পারিতেন না। এতদ্ভিন্ন তিনি শৈশবকালে যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার মনে ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি কিছুমাত্র বিশ্বাস জন্মায় নাই। কাজে কাজেই তাঁহার পিতা মাতার সমুদায় চেষ্টাই নিষ্ফল হইয়া যায়।

নয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে অগস্ত্য কম্‌ত মন্তপিলর প্রবেশিকা পাঠশালায় প্রবিষ্ট হয়েন। তথায় প্রবিষ্ট হইবার পর অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পাঠে মনোযোগ ও অধ্যবসায়, এবং অবাধ্যতার জন্য সমধিক বিখ্যাত হইয়া উঠেন। সহাধ্যায়ীরা খর্ব্বকায় কম্‌তকে ভাল বাসিতেন বটে, কিন্তু কম্‌ত কখনই তাঁহাদের সহিত বাল্য ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেন না। কম্‌ত অধ্যাপকবর্গের প্রতি যথোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন বটে, কিন্তু অধস্তন শিক্ষকেরা তাঁহাকে দুর্ব্বোধ অবাধ্য বালক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষ-

বয়ঃক্রমের সময় কম্‌ত প্রবেশিকাপাঠশালায় পাঠশেষ করিলেন দেখিয়া, তথাকার তত্ত্বাবধায়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে তাঁহার অল্পবয়স্ক ছাত্র শিল্প-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ-পূর্ব্বক অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন। তত্ত্বাবধায়কের প্রার্থনা সফল হইল। বার বৎসরের বালক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন! চারি বৎসর কাল তথায় অধ্যয়ন করিয়া ষোড়শবর্ষ বয়সের সময় তিনি তথাকার পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন। কিন্তু উক্ত বিদ্যালয়ের সভ্যশ্রেণীতে নিবিষ্ট হইবার জন্য তাঁহাকে আর এক বৎসর কাল অপেক্ষা করিতে হইল, কারণ তথাকার নিয়মানুসারে তখনও তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। এই এক বৎসর অতিবাহিত হইলে পর তিনি অন্যতম অধ্যাপকের পদে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার অনেকানেক সহাধ্যায়ী ও কোন কোন শিক্ষককেও শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই কম্‌তের প্রগাঢ় ধীশক্তি ও অদ্বিতীয় ক্ষমতার আবির্ভাব হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়েই তিনি চিরপ্রচলিত রাজতন্ত্রশাসন ও ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রণালীর বিদ্বেষী হইয়া উঠেন। এই সময় হইতেই তিনি আধুনিক ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর কারণানুসন্ধান প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সহাধ্যায়ীরা অসাধারণ ক্ষমতাদর্শনে তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অধ্যাপকেরা তাবিমহত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় একটী অসুখের ঘটনা উপস্থিত হইল। উক্ত বিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষক তাঁহার ছাত্রদিগের প্রতি অসদাচরণ করিয়াছিলেন। ছাত্রবর্গ আপনাদিগকে অবমানিত মনে করিয়া প্রধান কর্ম্মচারীদিগের নিকট উক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। কম্‌ত এই দলের অধিনায়ক হইলেন। তিনিই অভিযোগের আবেদনপত্র স্বয়ং রচনা করিলেন। স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে সাক্ষর করিলেন। ইহার কি ফল হইল সহজেই বুঝা যায়। তিনি বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। তাঁহার বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ হইল। বিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার সম্পর্ক চিরজীবনের নিমিত্ত উৎসন্ন হইল।

এ অবস্থায় পতিত হইয়া কম্‌তকে গৃহে প্রতিগমন করিতে হইল। তৎকালে তাঁহার বাটী প্রত্যাগমন ভিন্ন উপায়ান্তর কি? কম্‌ত বাটী যাইলেন বটে, কিন্তু অধিক কাল তথায় অবস্থিতি করিতে পারিলেন না। অশিষ্টব্যবহার করিয়া বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হওয়াতে তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার প্রতি আন্তরিক বিরক্ত হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় তিনি কত কাল বাটীতে থাকিবেন? কিছুদিন বাটীতে বসিয়া প্রগাঢ় যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন

করিলেন। কিন্তু আর ভাল লাগিলনা। বাটী অরুচিকর হইল। তিনি পারিসে যাইবার নিমিত্ত দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার পিতা মাতা অনেকবার নিবারণ করিলেন, ভয় প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধি হইলনা। ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয় মানবের অন্তঃকরণ ও নিম্নাভিমুখ জলপ্রবাহ সমান পদার্থ। এ উভয়কে প্রতীপগামী করা কাহার সাধ্য? কম্‌ত পারিসে চলিলেন। স্বাধীনতারত্ন উদ্ধার করিবার আশয়ে এই অল্পবয়সেই সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া উহার ভীষণ তরঙ্গমালার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবলবুদ্ধি ও স্বাবলম্বনপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই অদৃষ্টে প্রায় এইরূপ বয়সে এতাদৃশ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। কেহবা যুদ্ধে জয়লাভ পূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি লাভ করেন। কেহ বা তরঙ্গের সহিত বাহুযুদ্ধে অসমর্থ ও পরাজিত হইয়া প্রবলতর স্রোতে বিকল ও বিলীন হইয়া যান। দেখা যাউক কম্‌তের অদৃষ্টে কি ঘটে? তাঁহার ন্যায় অসাধারণ বুদ্ধি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

কম্‌ত পারিসে উপস্থিত হইয়া অঙ্ক অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই রূপে যাহা কিছু আয় হইত, তদ্দ্বারা তাঁহার সুখ ভোগ করিবার সম্ভাবনা ছিলনা বটে, তাঁহাকে মোটা ভাত মোটা কাপড় ব্যবহার করিতে হইত বটে, কিন্তু তাহাতেই তাঁহার সুখ। তিনি ইহা অপেক্ষা অধিক প্রার্থনা করিতেন না। তিনি পারিস নগরের মনোহর প্রলোভনে উদ্ভ্রান্তমনা হইবার পাত্র ছিলেন না। এই সময় পঁনসো ও ব্লেন্‌ভিল্‌ নামক দুই জন সুবিখ্যাত পণ্ডিত তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইঁহারাই চেষ্টা করিয়া নবাগত অধ্যাপককে ছাত্রসংগ্রহ করিয়া দিলেন। এসময় তাঁহাদের সদয় সাহায্য না পাইলে কম্‌তকে অশেষবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে হইত সন্দেহ নাই। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে কম্‌ত সুবিখ্যাতনামা সেণ্ট্‌ সাইমনের সেক্রেটরী হইলেন। কাহার ও নিকট অধীনতাস্বীকার করা তাঁহার মনোগত ছিলনা বটে, কিন্তু সেণ্ট্‌ সাইমন্‌ প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার অধীন হওয়া তাদৃশ ক্লেশকর হইবেনা মনে করিলেন। ফলেও অল্পকালের মধ্যেই তিনি সাইমনের ছাত্র, পরে বন্ধু হইয়া উঠিলেন। কম্‌ত সার্দ্ধ ছয় বৎসর কাল সাইমনের নিকট রহিলেন। ১৮২৪ অব্দে সাইমনের সহিত অনেক বিষয়ে কম্‌তের মতভেদ হওয়াতে কম্‌ত উহাঁর আশ্রয় পরিত্যাগ করেন। ইহার পর বৎসর কম্‌ত তাঁহার প্রত্যক্ষবাদ প্রণয়ন করেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কম্‌ত যে দুইটী ক্ষুদ্রাবয়ব প্রস্তাব প্রচারিত করেন তাহাতেই প্রত্যক্ষবাদের সূত্রপাত করা হয়। এই দুইটী প্রস্তাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত কয়েকটীর সংস্থাপন হয়। (১) কি বিজ্ঞান-ঘটিত, কি রাজনীতিসম্বন্ধী তাবৎ ঘটনাই কতিপয় নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন, (২)

মনুষ্যের যে কোন বিষয়ে অনুভূতি জন্মে মনুষ্য প্রথমে তৎসমুদয়ের দৈবকারণ নির্দ্দেশ করে, ক্রমে ক্রমে দৈব শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিতে থাকে ও মনুষ্য ঐ সমুদয়ের আধ্যাত্মিক কারণ নির্দ্দেশ করেন, এবং অবশেষে বিজ্ঞানশাস্ত্রাদির সবিশেষ উন্নতি হইলে প্রত্যক্ষবাদের প্রতি মনুষ্যের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। (৩) মনুষ্যসমাজে পর্য্যায়ক্রমে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সংঘটিত হয়, মনুষ্য প্রথম হীনবলদিগকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ করে, পরে আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করে, এবং অবশেষে সামাজিক কুশল ও জীবনধারণার্থে সামাজিক পরিশ্রমের প্রাদুর্ভাব হয়।

১৮২৫ অব্দে ক্যারোলাইন মাসীন নাম্নী কোন পুস্তকবিক্রেত্রীর সহিত কম্‌তের পরিণয় হয়। তৎকালে ক্যারোলাইন চতুর্বিংশতিবর্ষদেশীয়া। বিবাহ মনুষ্যজীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। মনুষ্য মনের সুখে জীবন যাপন করিবে বা চির কাল ঘোরতর দুঃখভোগ করিতে করিতে জীবনভার বহন করিবে, বিবাহই এই প্রশ্নের নিয়ামক। বিবাহ হইলেই ইহার সিদ্ধান্ত হয়। যদি বিবাহে স্ত্রীপুরুষের মনের মিল হয়, বিবাহ স্বর্গীয় সুখের আকর হইয়া উঠে। ইহার বিপরীত হইলেই বিবাহ নরক। এরূপ বিবাহে দম্পতীর পক্ষে চিরজীবন বিষময় হয়। কম্‌তের পক্ষে বিবাহ সুখের হয় নাই। কম্‌ত পত্নীর গুণসমূহের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন, তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। পত্নী ও স্বামীকে যথোচিত ভক্তি করিতেন। তথাপি বিবাহ সুখের হইল না? কারণ কি? কারণ উভয়ের মনের মিল হয় নাই। উভয়ের মন একভাব ধারণ করে নাই, সুতরাং এরূপ বিবাহে সুখ জন্মিবার সম্ভব কি? কিছুকাল পরেই বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু আইনের আশ্রয় লইয়া বিবাহভঙ্গ হইলনা, কেবল উভয়ে পৃথক হইলেন এই মাত্র। এবিষয়ে কে দোষী? কম্‌ত, না তাঁহার পত্নী? কম্‌তের পক্ষপাতীরা তাঁহার পত্নীর উপর দোষারোপ করেন, আবার তাঁহার পত্নীর বন্ধুবান্ধব তাঁহাকেই দোষী করেন। প্রকৃত কথা কি, কে বলিবে? আমরা ইহার উত্তর দিতে পারিলাম না। দম্পতীর মনে কখন কি ভাবের উদয় হয় ইহা নির্ণয় করা কার সাধ্য? বোধ হয় তাঁহাদের নিত্যসহচরেরাও সমর্থ হয়েন না। উভয়ের মনোগত ভাব বিশেষরূপে অবগত না হইয়া এক জনকে দোষী করিতে পারিনা। এজন্য এবিষয়ে ক্ষান্ত রহিলাম। কম্‌ত বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু এ বিবাহে তাঁহার পিতা মাতার মত ছিল না। আবার ক্যাথলিক ধর্ম্মে বরের বিশ্বাস না থাকাতে বিবাহব্যাপার শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইল না, উভয়ের ইচ্ছা ও অঙ্গীকার এই দুইটীই বিবাহের সাক্ষীস্বরূপ হইল। কম্‌তের বিবাহ হইল বটে, কিন্তু সুখে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করা তখনও তাঁহার পক্ষে সহজ হয় নাই। যাহা আয় ছিল তাহাতে

স্ত্রীপুরুষের স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ হয় না। তৎকালে তাঁহার এক জন মাত্র ছাত্র ছিল। সুতরাং পাঠনাদ্বারা তাঁহার যৎসামান্য আয় ও পুস্তকবিক্রয় দ্বারা তাহার পত্নীর যাহা কিছু আয় ছিল, সেই উভয়ের উপর নির্ভর করিয়া রূমন্তমার্ত্ত নামক স্থানে নবদম্পতী একটী বাটী ভাড়া লইয়া কিছুকাল স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১৮২৬ অব্দের এপ্রেল মাসে কম্‌ত তাঁহার প্রত্যক্ষবাদের বিষয় সাধারণের গোচর করিলেন। প্রথমে আপন বাটীতেই এই বিষয়ের প্রস্তাব সকল পর্য্যায়ক্রমে সাধারণের নিকট পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। যৎকালে কম্‌ত স্বপ্রণীত দর্শন সাধারণের নিকট উপস্থিত করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অধিক হয় নাই, তিনি এক জন সামান্য লোক মাত্র ছিলেন। কিন্তু যখন আমরা এই সামান্য ব্যক্তির উপদেশ শ্রবণার্থ হম্বোল্‌দ, পনসো, মন্তেবিলো, কারুণো প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়দিগকে তাঁহার সামান্য আবাসে উপস্থিত হইতে দেখিতেছি, তখন এই সামান্য আবাসের অধিবাসীকে আর সামান্য ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না। বস্তুতঃ এই সামান্য ব্যক্তি তাঁহার মহামহোপাধ্যায় শ্রোতাদিগের অপেক্ষাও মহৎ লোক। এই সামান্য ব্যক্তি আরিস্ততল, প্লেতো বা বেকনের সমকক্ষ ব্যক্তি।

প্রত্যক্ষবাদ সংস্থাপন করিতে কম্‌তকে এতদূর মানসিক শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছিল, যে তাঁহার মনের বল কিঞ্চিৎপরিমাণে খর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার উপর আবার সাংসারিক অসুখ ও অকৌশল। নানা কারণে তিনি কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই চলচিত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ক্রমশঃই উহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরিশেষে চারিটী প্রস্তাব পঠিত হইবার পর তিনি স্পষ্টরূপে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। উন্মত্ততা জ্ঞানরাশির ও চেতনা হরণ করিল। এই সময় হইতে তাঁহার দর্শনপ্রকাশ কিছুদিনের নিমিত্ত স্থগিত রহিল। উন্মাদ ক্রমশঃ এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে তিনি একবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। এই সময় তাঁহার পত্নীর অবিরত চেষ্টা না থাকিলে তিনি অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেন সন্দেহ নাই।

পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহাকে বাতুলালয়ে স্থাপিত করাই যুক্তিসিদ্ধ হইল, এবং তিনি তত্রত্য উন্মত্তাশ্রয়ে প্রেরিত হইলেন। তাঁহার পিতা মাতা এই সংবাদ শ্রবণে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মাতা স্বয়ং তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিলেন। এইরূপে কিছুদিন চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু আরোগ্যলাভের কোন লক্ষণই লক্ষিত হইল না, তাঁহার পিতা মাতা ও বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে অতঃপর তথায় রাখা পরামর্শসিদ্ধ মনে করিলেন না। তদনুসারে কম্‌ত তথা হইতে স্থানান্তরিত হইলেন এবং এই সময় হইতে

আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত তাঁহার মাতা ও স্ত্রী ইহাঁরাই উভয়ে তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় প্রায় দুই মাস অতিবাহিত হইবার পর আরোগ্যের চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহার নির্ব্বাণোন্মুখী প্রতিভার পুনরুন্মেষ হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে তিনি সম্পূর্ণ রূপে প্রকৃতিস্থ হইলেন। প্রকৃতিস্থ হইলেন বটে কিন্তু কার্য্যক্ষম হইতে আর ও অধিক দিন লাগিল। এই সময় আবার নানাবিধ দুশ্চিন্তা তাঁহার মনোরাজ্য অধিকার করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন তিনি উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিশক্তি তাঁহাকে একবারে পরিত্যাগ করিয়াছে, তিনি একবারে কার্য্যের বাহির হইলেন। এই সকল দুশ্চিন্তা অতিশয় প্রবল হওয়াতে জীবনের প্রতি তাঁহার যৎপরোনাস্তি অশ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি আত্মহত্যা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার পত্নী কোন কার্য্য-উপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। কম্‌ত এই সুযোগে বাটী হইতে নির্গত হইয়া একটী সেতুর উপরিভাগ হইতে আপনাকে সীন নদীর তরঙ্গোপরি নিক্ষেপ করিলেন। এক জন সৈনিক পুরুষ দৈবাৎ এই ব্যাপার দেখিয়া অনেক চেষ্টায় তাঁহার জীবনরক্ষা করিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই রূপে পতিত ও আহত হইবার পর হইতেই তাঁহার মানসিক বৃত্তি সকল সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্য লাভ করিল। তিনি নিজ মূঢ়তার অনুশোচনা করিলেন এবং এই সময় হইতেই দ্বিগুণতর উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত পুনর্ব্বার কার্য্যারম্ভ করিলেন।

কম্‌ত যে উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবিষয়ের এত বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার কারণ কি? সমূহ কারণ আছে। রোগী আরোগ্যলাভ করিবার পর স্বয়ং উক্ত কারণের বিষয় আশঙ্কা করিয়া প্রকাশ্যক্ষেত্রে আপন রোগের বিষয় প্রচার করেন। সে কারণটী সামান্য ও উপেক্ষণীয় নহে। গুরুতর, মনুষ্যের প্রকৃতিগত একটী দোষ আছে। মনুষ্য পরদোষেক্ষণে দিব্যচক্ষু। এক বিষয়ে, এক সময়ে কাহার ও কোন দোষ দর্শন করিলে আমরা উক্ত ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সেই দোষে দোষী মনে করি। যে ব্যক্তি বহুকাল পূর্ব্বে একবার উন্মত্ত হইয়াছিল, কিন্তু যাহার উন্মাদ অল্পকাল মাত্র ছিল, এরূপ ব্যক্তি যদি কোন বিষয়ে প্রগাঢ় যুক্তির অনুমোদিত কোন মত উদ্ভাবন করেন আমরা তৎক্ষণাৎ উহা উন্মত্তপ্রলপিত বলিয়া উপেক্ষা করি। কম্‌তের বিষয়েও অবিকল ইহাই ঘটিয়াছিল। কম্‌তের মত যাহাদের রুচিকর হয় নাই, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে উহা উন্মত্তপ্রলাপমাত্র বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেন। কম্‌ত যে কিছুদিনের জন্য লুপ্তবুদ্ধি হইয়াছিলেন ইহা আমরা অস্বীকার করিনা। তবে আমাদের এই মাত্র বলিবার উদ্দেশ্য, যে তাঁহার প্রণীত প্রত্যক্ষবাদ কথনই

উন্মত্তপ্রলাপ নহে। উহার উদ্ভাবন ও সংস্থাপন করিবার সময় তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন, ও উহাতে প্রগাঢ় বুদ্ধি ও প্রতিভার ব্যয় হইয়াছে। তাঁহার উদ্ভাবিত প্রতিজ্ঞা, প্রমেয় ও প্রমাণ ভ্রান্ত ও অরুচিকর বল আপত্তি নাই, কিন্তু বিশুদ্ধ ও প্রগাঢ় যুক্তি সকলকে উন্মত্ত-প্রলপিত বলিয়া অগ্রাহ্য করা কেবল অসূয়ার কার্য্য বলিতে হইবে। যেরূপ জ্বর প্রভৃতি রোগ ভোগকালের পর সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়, উন্মাদের পক্ষেও অবিকল তদ্রূপ। উন্মাদ ও রোগ, ভোগকালের পর ইহার ও কিছুমাত্র চিহ্ন থাকেনা। কাউপর ও লুক্রীসিয়স মধ্যে মধ্যে উন্মাদগ্রস্ত হইতেন। যখন যখন ভাল থাকিতেন সেই সময়েই তাঁহাদের কাব্যকলাপ রচিত হয়, তাঁহাদের অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ ক্রমশঃ গ্রথিত হয়। অনেক প্রধান লোক এক সময়ে উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মহম্মদ, লাইওলা, রুসিয়ার অধীশ্বর পীটর, হ্যালার, নিউটন, ট্যাসো, সুইফ্‌ট, ডনিজেটী, কাউপর এই সকল দেবতুল্য ব্যক্তিরাও এক সময় উন্মাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুষ্ট উন্মাদ-রাহু তাঁহাদের সুবিমলকান্তি জ্ঞানশশধরের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। ইহাঁদের অসামান্য মহৎ কার্য্যকলাপের প্রতি উন্মাদ-প্রলাপ বলিয়া কটাক্ষপাত করিতে কাহার চক্ষু অগ্রসর হইতে পারে? আমরা উর্দ্ধ নামমালার মধ্যে কমৃতের নামও নিবেশিত করিলাম। যখন নিউটন উন্মাদের পর তাঁহার প্রিন্‌সীপিয়া রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন অগস্ত্য কম্‌ত এক সময়ে উন্মত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার Philosophie Positive উন্মত্ত-প্রলাপ বলিতে কাহার সাহস? যিনি এরূপ গ্রন্থকে উন্মত্ত-প্রলাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেসাহসী হয়েন, আমাদের মতে তাঁহারই বুদ্ধিস্থৈর্য্যপ্রমাণ-সাপেক্ষ। যদি উন্মাদের সময় মনুষ্য এরূপ সুমহৎকাণ্ড সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবী উন্মাদ-গ্রস্ত হউক এই আমাদের প্রার্থনা।

প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। ১৮২৮ অব্দে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার প্রস্তাব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। এবারেও অনেকানেক বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁহার প্রস্তাব শ্রবণার্থ সমাগত হইলেন, এইবার তাঁহার প্রস্তাব শেষ হইল। ১৮৩০ অব্দে প্রত্যক্ষবাদের প্রথম ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ক্রমে দুই এক খানি করিয়া প্রকাশ হইতে হইতে উহার ষষ্ঠ অর্থাৎ শেষ ভাগ ১৮৪২ অব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৩০ অব্দে তিনি জ্যোতিঃ-শাস্ত্রঘটিত প্রস্তাব পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ছয় বৎসরকাল এই প্রস্তাব পঠিত হইয়া ১৮৪৪ অব্দে উহা পুস্তাকাকারে প্রচারিত হয়।

১৮৩৩ অব্দে তিনি Ecole Polytechnique নামক শিল্প-বিদ্যালয়ে অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন, এই সময় অপর একটী বিদ্যালয়েও তিনি অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপনার্থ নিযুক্ত হয়েন। এই দুইটী

পদ হইতে তাঁহার যথেষ্ট আয় হওয়াতে তিনি পাঠার্থীদিগের গৃহে গিয়া শিক্ষাদান পরিত্যাগ করিলেন। এই সময় হইতে কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় ৩০০৲ টাকা করিয়া বাৎসরিক আয় হইতে লাগিল। সঙ্গীত-শাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ রসবোধ ছিল। এই সময় আয়ের প্রতুল হওয়াতে তিনি প্রায়ই নাট্যশালায় অভিনয় দর্শন করিতে যাইতেন। তিনি সর্ব্বদাই দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যয়নে কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার অদ্ভুত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ছিল। তিনি তত্তদ্ভাষার এক এক খানি অভিধানের সাহায্য মাত্র গ্রহণ করিয়া ইংরাজী, ইতালীয়, ও স্পানিস ভাষায় সম্পূর্ণরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪২ অব্দে তাঁহার জীবনের দুইটী প্রধান ঘটনা হয়। এই বৎসর তাঁহার Philosophie Positive সম্পূর্ণ হয়। এই বৎসর তিনি দাম্পত্যসুখে জলাঞ্জলি দেন। এই বৎসর স্ত্রী পুরুষ চিরজীবনের মত বিযুক্ত হয়েন। তাঁহার না তাঁহার স্ত্রীর—কাহার দোষে উভয়েই দাম্পত্যসুখে বঞ্চিত হইলেন এবিষয়ে মত প্রকাশ করা আমাদের সাধ্য নহে ইহা আমরা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত অবগত আছি যে পত্নীর প্রবর্ত্তনাতেই দম্পতী পৃথক্ হয়েন। বিবাহ-বন্ধনবিচ্ছিন্ন হউক এরূপ ইচ্ছা স্বামীর অন্তঃকরণে ছিল কিনা আমরা বলিতে পারিনা। কিন্তু কম্‌ত যখন স্বয়ং লিখিয়াছেন যে তাঁহার স্ত্রীর প্রবর্ত্তনাই উভয়ের পৃথক হইবার কারণ, তখন ওবিষয়ে আর সংশয় কি? উভয়ের মনের ভাব, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ছিল। স্বামী নিয়তই শাস্ত্রচর্চ্চায় নিমগ্ন, ধনসম্পত্তি ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ঐহিক সুখে তাঁহার তাদৃশ মনোযোগ ছিল না। পত্নী ইহার ঠিক বিপরীত, তিনি ধন সম্পত্তি বেশভূষা প্রভৃতি ঐহিক পদার্থেই নিয়ত তৎপর। সুতরাং এরূপ স্থলে উভয়ের মানসিক ঐকতান ও পরস্পর অকৃত্রিম প্রণয় কিরূপে সম্ভবে? সে যাহা হউক কম্‌ত তাঁহার পত্নীকে কখনই অশ্রদ্ধা করিতেন না, বরং যথাসাধ্য স্নেহ ও আদর করিতেন। এমন কি উভয়ে বিশ্লিষ্ট হইলেও কম্‌ত কিছুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার পত্নীকে সাদরে পত্রাদি লিখিতেন।

প্রত্যক্ষবাদ প্রকাশ করিয়া কম্‌ত ভবিষ্যতে প্রগাঢ় দার্শনিক বলিয়া কীর্ত্তি-লাভের সূত্রপাত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সংসারযাত্রার পক্ষে বিলক্ষণ ক্লেশ ও অসুবিধা উপস্থিত হইল। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মযাজকেরা তাঁহাকে নাস্তিক ও পাষণ্ড বলিয়া অপমান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা তাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরে গালি দিতে লাগিলেন। এই রূপ নানা কারণে শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে অধ্যাপকতার পদ হইতে অপসারিত করিলেন, ও তাঁহাকে অগত্যা আবার পূর্ব্বের ন্যায়

পাঠার্থীদিগের বাটী বাটী ভ্রমণপূর্ব্বক শিক্ষা দিয়া জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করিতে হইল। এই সময় মহাত্মা জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের প্রবর্ত্তনায় সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসরচয়িতা গ্রোট, করী প্রভৃতি কতিপয় মহোদয় এক বৎসর যাবৎ তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থসাহার্য্য করিয়াছিলেন। কমত্ মনে করিয়াছিলেন যে উক্ত মহাশয়েরা তাঁহাকে চিরজীবন সাহায্য প্রদান করিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। কিন্তু এটী তাঁহার কুসংস্কার ও ভ্রম। এক বৎসর পরে কম্‌ত যখন অর্থসাহায্যের নিমিত্ত পুনঃপ্রার্থনা করিলেন, তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে কম্‌ত এতদূর ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন, যে ক্রোধসম্বরণ করিতে না পারিয়া মিল্‌কে এক খানি কোপপূর্ণ পত্র লিখিলেন। মিল্ এই পত্র পাইয়া কম্‌তের উপর কিয়দংশে বীতশ্রদ্ধ হইলেন, ও ইহা হইতেই তাঁহাদের পরস্পর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন—চিরকালের নিমিত্ত—বিচ্ছিন্ন হইল। এবিষয়ে কম্‌তই সম্পূর্ণ রূপে দোষী। ধনীব্যক্তিরা নিঃস্ব ও নিরুপায় পণ্ডিতদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন বলিয়া উক্ত পণ্ডিতদিগের এরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রম, যে ধনীরা তাঁহাদিগকে চিরজীবন প্রতিপালন করিতে বাধ্য। অতএব এস্থলে কম্‌তের দোষ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? মিল প্রভৃতির সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া তিনি এতদূর হতাশ হইলেন, যে কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার বন্ধুবান্ধব ছাত্র ও শিষ্যদিগের নিকট প্রকাশ্যভাবে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার প্রার্থনানুসারে যাবজ্জীবন তাঁহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন।

১৮৪৫ অব্দে তাঁহার জীবনের অপর একটী সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা উপস্থিত হয়। অনেকে বলিয়া থাকেন, যে সেণ্টসাইমনের নিকট তিনি তাঁহার প্রত্যক্ষবাদ দর্শনের আভাস ও ইঙ্গিত প্রাপ্ত হয়েন। এ বৎসর যে ঘটনাটী উপস্থিত হইল, তাহা হইতে তিনি তাঁহার রাজনীতি ও সমাজদর্শন শাস্ত্রের (Politique Positive) প্রণয়নার্থ ইঙ্গিত প্রাপ্ত হয়েন। সেই ঘটনার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করি। ১৮৪৫ অব্দে ক্লোতিল্‌দ দিভো নাম্নী কোন স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কম্‌ত ও ম্যাদাম দিভো ইহাঁদের উভয়ের পরস্পর অবস্থাঘটিত অনেক সৌসাদৃশ্য ছিল। দিভোর স্বামী কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়া যাবজ্জীবনের নিমিত্ত নির্ব্বাসিত হয়েন, সুতরাং ক্লোতিল্‌দকে এক প্রকার বিধবা বলিতে হইবে, আবার কম্‌ত ও চিরজীবনের নিমিত্ত পত্নীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁকেও এক প্রকার দারশূন্য বলিতে হয়। অবস্থাগত এইরূপ সৌসাদৃশ্য থাকাতে ক্রমশঃ পরিচয়, স্নেহ ও ঘনিষ্টতাতে পরিণত হইল। অবশেষে প্রণয়, গাঢ় প্রণয়। কিন্তু এ প্রণয়ে পরিণয়

সম্ভাবনা ছিলনা। উভয়ের প্রণয় উভয়ের হৃদয়কন্দর, মর্ম্মগ্রন্থি, শিরা, রক্তস্রোত প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গম্ভীররূপে নিখাত হইল বটে, কিন্তু পরিণয়ের আশা নাই। কেহই আইনের আশ্রয় লইয়া বিবাহসূত্র বিচ্ছিন্ন করেন নাই। সুতরাং নূতন বিবাহ কিরূপে সম্ভবে? উভয়ে উভয়ের বন্ধু, সুহৃৎ, দেবতা, আরাধ্য দেবতা স্বরূপ হইলেন এই মাত্র। বিবাহ হইল না। পবিত্র দাম্পত্য সুখ, স্বর্গীয় সুখ অপেক্ষাও গুরুতর, ইহা তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটিল না। বস্তুতঃ কম্‌ত এইরূপ অবস্থাতেও বিলক্ষণ সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার অদৃষ্টে অধিকদিন এ সুখভোগ হইলনা। এক বৎসর পরেই ম্যাদাম ক্লোতিল্‌দের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যু হইল বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার প্রতি কম্‌তের যে প্রগাঢ় প্রণয় ও ভক্তি ছিল তাহার কিঞ্চিদংশেও হ্রাস হইলনা। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। তাঁহার জীবদ্দশায় কম্‌ত তাঁহার প্রতি যেরূপ ভক্তি প্রকাশ করিতেন সে পার্থিব ভক্তি; এক্ষণে তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে স্বর্গোচিত ভক্তি প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনের যতদিন অবশিষ্ট রহিল, কম্‌ত তত্তাবৎ কাল প্রতিসপ্তাহে তাঁহার সমাধি মন্দিরের নিকট গমন করিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহাকে স্মরণ করিতেন, তাঁহার শ্রাদ্ধ করিতেন। ফলতঃ ক্লোতিল্‌দের সহিত পরিচয় হওয়া অবধি তাঁহার মনের ভাব অনেক পরিবর্ত্তিত হয়। মনুষ্যজাতিকে প্রত্যক্ষদেবতা মনে করিয়া দয়া প্রভৃতি প্রকাশ পূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করাই ধর্ম্ম, ম্যাদাম দিভোই তাঁহার উদ্ভাবিত এই নূতন ধর্ম্মের প্রথম দেবতা। কম্‌ত দিভোকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন, ক্রমে সর্ব্বসাধারণকে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশে তাঁহার Politique Positive নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি (Positive Politique) প্রণয়ন করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে কম্‌ত আর একবার উন্মাদগ্রস্ত হয়েন। কিন্তু এবারকার পীড়া অল্পকালমাত্র ছিল ও তাদৃশ কঠিন ও হয়নাই। এই পীড়া হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াই তিনি তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্বোল্লিখিত ধর্ম্ম প্রচারিত করাই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। তাঁহার ও প্রত্যক্ষবাদ ও ধর্ম্মনীতি পরস্পর এত-দূর বিরুদ্ধ হইয়াছিল, যে তাঁহার প্রাক্তন শিষ্যেরাও তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থকে উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া পরিত্যাগ করেন। ফলতঃ এই উভয় গ্রন্থের বিষয় বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিলে ওরূপ সংস্কার হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাঁহার প্রত্যক্ষবাদ দর্শন করিয়া লোকে তাঁহাকে নিরীশ্বর, নাস্তিক ও পাষণ্ড বলিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে, আবার যাহারা তাঁহার প্রত্যক্ষবাদ দেখে নাই, কেবল ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি দেখিয়াছে, তাহারা তাঁহাকে ধর্ম্মের গোঁড়া বলিয়া উপহাস করে। এক

আধারে কিরূপে এরূপ বিরুদ্ধমতদ্বয়ের সমাবেশ হইল? এ প্রশ্নের উত্তর করা সহজ নহে। আমাদের বোধ হয়, কম্‌তের এই রূপ মত ছিল, যে তাঁহার উদ্ভাবিত ধর্ম্মনীতি প্রচারিত হইলে পৃথিবীতে প্রকৃত কুশল ও শান্তি বিরাজমান হইতে পারে, কিন্তু ওরূপ হওয়া তাদৃশ সম্ভব নহে। এই গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পর কম্‌তআর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। ১৮৫২ অব্দে স্বপ্রণীত ধর্ম্মনীতির পোষকতা করিবার উদ্দেশে তিনি আর এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচার করেন, কিন্তু উহাদ্বারা তাঁহার অভীষ্ট সাধন পক্ষে বিশেষ সাহায্য হয় নাই।

১৮৫৭অব্দের ৫ই সেপ্তেম্বর তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই সময়ে তাঁহার ৬০ বৎসর বয়স হইয়াছিল। কম্‌ত অতিশয় সৎস্বভাব লোক ছিলেন। তাঁহার মনে ক্রোধ, দ্বেষ প্রভৃতির লেশমাত্র ছিলনা। তিনি কখনই বৃথা অহঙ্কার ও আত্মগৌরব প্রকাশ করিতেন না। তিনি তাঁহার প্রত্যক্ষবাদ সংস্থাপন পূর্ব্বক অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। লোকে তাঁহার সহিত সম্পূর্ণরূপে একমত হউন, আর নাই হউন, তিনি যে অসাধারণবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন ইহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম বিশুদ্ধধর্ম্ম হউক আর নাই হউক, তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক লোককে নাস্তিক বলিয়া ঘোষণা করা অসূয়ার কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। সে ধর্ম্মে সার আছে কিনা? এই প্রশ্নের সহজেই মীমাংসা হয়। যখন অনেকানেক বুদ্ধিমান্ লোক তাঁহাকে দেবতাজ্ঞান পূর্ব্বক তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তখন উহা যে অসার নহে, তাহাতে আর সংশয় কি? তাঁহার প্রণীত দর্শন ও ধর্ম্ম সারাৎসার বলিয়া গ্রহণ কর আমরা একথা বলিতে চাহিনা। কিন্তু তাঁহাকে নিরর্থক অকারণ অপভাষার হস্তহইতে বাঁচাইবার জন্য এই মাত্র বলি যে সকলে একবার তাঁহার গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করিয়া দেখ সার আছে কি না।

সঙ্গীত পথিক।*

আমি এ কোথায় আসিলাম! এ কি অপ্সরা-দেশ! এসবই কি আমার এই অবসন্ন, বিঘূর্ণিত মস্তিষ্কের কল্পনোচ্ছাস-সম্ভূত! ঘটনা আমাকে এ কোথায় আনিল! "বিপদ্বিপদমনুবধ্নাতি"। অদৃষ্ট কি এখনও আমার সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে? যে অদৃষ্ট ইতিপূর্ব্বেই আমার জীবনে একদিকে এত ভয়ানক ও বিষম, আর একদিকে এত অতর্কিতপূর্ব্ব অনুকূল ও অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত করিল, সে অদৃষ্ট কি এখনও বিরত হয় নাই? আমি এখনও কি জলের মধ্যে আছি? মায়া কি তাহার মধ্যে এই সকল অদ্ভুত দৃশ্য রচনা করিয়া দেখাইতেছে? না, সমুদ্রমধ্যে হইতে এ সকল কোন এক গূঢ় কারণে সহসা সমুত্থিত হইয়াছে? যাহাই হউক, এই সংসারের কত দেশ দেখিয়া আসিলাম, প্রকৃতিদেবীর কত বিবিধ শোভাই অবলোকন করিলাম কিন্তু এমন দেশ ত কখনও দেখি নাই! যতই যাই, প্রকৃতিদেবীকে একই রূপবেশভূষায় ভূষিতা দেখিতেছি! প্রকৃতির ও শিল্পের এরূপ যুগলপ্রেম কই আর ত কোথায় ও দেখিনাই! এই সমস্ত রাত্রি ক্রমাগত চলিয়া আসিতেছি এখন ও সেই একই ভাব, চতুর্দ্দিকে সেই একই অবস্থা অবলোকন করিতেছি। চারিদিক্ নিস্তব্ধ! জন মানবের সমাগম নাই! এদেশে মানুষ নাই তাহা বলিতে পারি না। কারণ, এই সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার আলোকে যে দিকেই নয়ন নিপাত করি, সেই দিকেই গৃহকদম্বক কোথায়ও শ্রেণীভাবে, কোথায়ও স্তবকে, কোথায়ও ভূমির উপর, কোথায়ও বা জলের উপর অবস্থান করিতেছে। একটীও বড় বাড়ী বা সভ্যতা-প্রসাদলভ্য বিশুদ্ধ-রুচির অনুমোদিত এমন ত একটীও গৃহ দেখিতেছি না। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ২ স্বল্পপরিসর উদ্যান ও উপবন তাহাদের অবান্তর প্রদেশ সুশোভিত করিতেছে। চারিদিক্ সমতলক্ষেত্র, শ্যামলশস্যে পরিপূরিত। কি আশ্চর্য্য!

---

* ভ্রমণ করিতে২ পৃথিবীর সমুদায় সঙ্গীতের উন্নতি, অবনতি, ক্রমান্বয় পরিবর্ত্তন প্রভৃতি বর্ণনা করা ইঁহার উদ্দেশ্য। ইনি যে২ দেশ দর্শন করিবেন, তত্তাবৎ দেশীয় আচার ব্যবহার, রাজ-নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা, প্রাণিতত্ত্ব, ও উদ্ভিদ্বিজ্ঞান প্রভৃতি যাহা কিছু অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সে সমুদয়ের প্রতি যে দৃষ্টি রাখিবেন না, এমন নহে। অবশেষে সে সমুদয় সঙ্গীতের সহিত আমাদের দেশের আর্য্যসঙ্গীতের তুলনা করিয়া ও তাহাদিগকে কিরূপে বঙ্গস্বরলিপিতে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহা দেখাইয়া নিজ সংকল্প সিদ্ধ করিবেন।

কোথায়ও একটী বড় বৃক্ষ নয়নগোচর হয় না। খর্ব্বাকার বৃক্ষ সকল নিকুঞ্জের অবয়ব ধারণ করিয়াছে। সমস্ত দিন আহার হয় নাই, এখন রাত্রি অনুমান দ্বিপ্রহর, এখনও কিছু হয় নাই, কখন্ যে হইবে তাহাও কিছু জানি না। পথ-শ্রান্তিতে শরীর নিতান্ত অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আর অধিক চলিতেও পারি না। কোথায়ই বা যাই? কোথায়ই বা আশ্রয়প্রার্থী হই? এ পর্য্যন্ত একটীও মানুষের মুখাবলোকন করিতে পাইলাম না। কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? কোন্ গৃহেই বা যাই? সমুদয়দ্বারই অর্গলরুদ্ধ। এত গৃহের সংখ্যাওত আর কোথায়ও দেখি নাই। এসব গৃহে কি মানুষ নাই? তাহা যদি নাই থাকিবে, তবে এসব নির্ম্মিতই বা হইল কেন? যাহাহউক, এসব আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এদেশটা যদি সত্যই কোন এক স্থাবরজঙ্গমময় দেশহয়, তাহা-হইলে এদেশের ভাষা কি, এদেশের নাম কি, এসব জানিবার উপায় ত কিছুই দেখিতেছি না। তবে এখন কি করি? কোথায় যাই? পণ্যশালা কোথায় আছে তাহার সন্ধান পাইলে বোধ হয় সেইখানে গেলে বিশ্রাম স্থান পাইবার অনেক সুবিধা হইবে। এসব গৃহ এত নীচতল যে আমাদের দেশেইহা এক পণ্যশালারমত। কিন্তু একটী পণ্যশালার সম্পূর্ণতা বিধানে অন্যান্য যে সকল উপাদান চাই,তাহাদের এখানে অনেক অসদ্ভাব দেখিতেছি। যাহা হউক চলি,কিন্তু পা ত আর চলেনা। যতদূর পারি, সাধ্যমত চেষ্টা করি। এ অবস্থায় আমার মত অনন্যোপায় আর এক জনই বা কি করিতে পারে? অদৃষ্ট! যদি তোমার এখনও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হইয়া থাকে, যতদূর পার, তোমার ভীষণ কাল মূর্ত্তি দেখাও, তোমার পিশাচোচিত নানাবিধ নির্ম্মম বিচেষ্টিত দেখাও, আমিও অবাত অক্ষুব্ধ জলরাশির ন্যায় স্থির ও নিশ্চল থাকিব—জেনো, সকলেতেই নির্ভীক চিত্তে সহেল দৃষ্টিপাত ব্যতীত আর তুমি আমা হইতে অন্যকোন প্রতিবাধ প্রাপ্ত হইবে না। এই অদ্ভুত ভূমিভাগে সহসা উঠিয়া এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, পাঠক! অনিশ্চিত-গন্তব্য হইয়া ক্রমেই চলিতে লাগিলাম। যতই যাই, এতক্ষণ যাহাই দেখিয়া আসিতেছিলাম,দুইধারে সেইসমুদয়ই কেবল ক্রমেই দেখিতে লাগিলাম। বোধহয়, পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন-রচনা যেন সেখানকার পদ্ধতি নয়। বস্তুতঃ প্রকৃতির এমন অবিসম্বাদি সমাবস্থতা আর কুত্রাপিও আমার নয়নগোচর হয় নাই। সম্মুখে, অদূরে এক আলোক দেখিতে পাইলাম, বোধহয় ওখানে কোন সন্ধান পাইতে পারিব। পাই আর না পাই, এই সমূহ বিপদের উপর বিপদে, এই অনিশ্চিত পরিণামে, আমার এই নিরাশা-বিদলিত হৃদয় ঐ আলোক দেখিয়া তখন যেন একটু সজীব হইল। যাহাহউক,ফলোপলব্ধি বহুদূরস্থিত হইলেও আশার সূচনায়ও মানুষের মন এমনই

করে বটে। সেই অনভ্যস্ত পথশ্রমে ও ভীষণ ক্ষুধায় শরীরের সেই রচিতপূর্ব্ব অবসাদের অনুমাত্রও বিগণনা না করিয়া, যতদূর পারিলাম, ত্বরিতপদ-বিক্ষেপে সেই আলোকের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। কিন্তু হায়! অদৃষ্ট-চক্রের বিবর্ত্তনে তাহার পরিধির কৃষ্ণবর্ণাঙ্কিত ভাগ একবার যাহার দিকে উঠিয়াছে, যতক্ষণ না আর তাহা নামিয়া পড়িতেছে কে আর তাহার অন্যথাসম্পাদনে সক্ষম হইতে পারে? সে আলোক সেইখানেই ছিল বটে কিন্তু যাহার উদ্দেশে এতক্ষণ ধাবিত হইতেছিলাম, তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। তখন আমার যে হৃদয়ে আশার নবোন্মেষ মাত্র হইতেছিল, সহসা নির্ব্বাণদীপ গৃহে অন্ধকারের ন্যায়, সেই হৃদয়ে নিরাশা আরও গাঢ়প্রসারী হইল। সেখানে জন মানব নাই। নিরূপণ করিয়া দেখিলাম সেস্থান একটী প্রহরীর আস্থান। সেই আস্থান একটী ক্ষুদ্রকুটীর, শরাদ্রিরচিত। আলোকাধার এক প্রকার কাগচে বিনির্ম্মিত। তাহার উপরে নানাবিধ শিল্প-কৌশল দর্শিত আছে, কিন্তু সেখানে প্রহরী কাহাকেও দেখিতে পাইলামনা। যাহা হউক, তখন আর কি করি, অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, ক্রমেই চলিতে লাগিলাম। এবারে বোধ হইল যেন প্রকৃতি-দেবী এক পরিচ্ছদে অনেকক্ষণ থাকিতে ভাল না বাসিয়াই সেইখানে বেশপরিবর্ত্তনের সবে উদ্যোগ করিতেছেন! সেখানে সেরূপ ক্ষুদ্র-গৃহ-শ্রেণী আর বড় দেখা যায় না, বহুদূর বিস্তীর্ণ রথ্যার দুই পার্শ্বে অবিচ্ছেদে গৃহরাজি বিরাজিত রহিয়াছে। প্রত্যেক গৃহই এক২ নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। নানাবিধ কৃত্রিম উপবন, উদ্যান ও সরোবরে চারিদিক্ সুশোভিত হইয়াছে। তখন সেই রাত্রিশেষে চারিদিক্ দেখিয়া যতদূর জানিতে পারিলাম তাহাতে বোধ হইল যে, সেটী একটী নগর হইবে। যাহা হউক, যতক্ষণ রাত্রিশেষ না হইতেছে, ততক্ষণ কিছুই জানিতে পারিতেছি না, অন্য কোন বিষয়েরই সন্ধান পাইতেছি না। তখন কি করি এক নিকটবর্ত্তী সরোবরের ধারে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আহা! তেমন চমৎকার সরোবর চন্দ্রকিরণে কি অপূর্ব্ব শোভাই না ধারণ করিয়াছিল! তখন তৃষ্ণায় অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই সরোবরে নামিয়া হস্ত পদ মুখ প্রক্ষালন করিলাম। জল আস্বাদ করিয়া দেখিলাম, পান করিতে পারিলাম না, তাদৃশ বাহ্যিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত স্থানে তত অপরিষ্কৃত কটুজল বোধ হয় আর কোথায়ও দেখিনাই। যাহা হউক, তখন এক শিলাতলে উপবেশন করিলাম, কিন্তু দেখিলাম, এই কষ্টের পর এই নিস্তব্ধ নির্জ্জন সুস্নিগ্ধস্থলে মৃদুমন্দ সুশীতল বায়ুহিল্লোলে অনতিবিলম্বেই আমার নিদ্রাবেশ হইবে। যাহা মনে করিয়াছিলাম ঠিক্ তাহাই ঘটিল। ঘোর আবেশে নিতান্ত অভিভূত হইয়াপড়িলাম। কি ঘটিবে কিছুই জানি না। সেদেশের আচার ব্যবহার, মানুষের প্রকৃতি প্রভৃতি

কিছুই জানিনা, নিদ্রিত হইলে কি ঘটিবে কি বলিতে পারি? নিদ্রায় অচেতন হইয়া থাকিলে সে সময় কত অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে। কিন্তু দেখিলাম আর যে পারিনা! শরীর যে আর বয় না! প্রাণ যে আকুলিত হইতেছে! কি ছিলাম কি হইলাম! এখন একটু শান্তচিত্তে স্থির হয়ে নিদ্রা যাইব, তাহাও আমার কপালে ঘটিতেছেনা। কিন্তু ভাবিলে আর কি হইবে, ভবিতব্য যাহা থাকে, ঘটুক। ইহা অপেক্ষা মানুষের আর অধিক দুর্দ্দশা কি হইতে পারে! এইরূপ ভীষণ অবস্থা, এইরূপ নিরাশ মন, এই অপরিচিত অদৃষ্টপূর্ব্ব দেশ, এই আমি একাকী বন্ধুবান্ধব বিরহিত, এই আমার মন পূর্ব্বে কত উৎসাহে পরিপূর্ণ ছিল, এখন এই অতর্কিতপূর্ব্ব ঘটনার পর কিরূপ ভাবাপন্ন হইল! এসব কে ঘটাইল? কেন ঘটাইল? কি সংকল্পসংসাধনের নিমিত্ত এতদিন স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি? আশার কি এখানেই পর্য্যবসান হইবে? এসব অবিদিত পাঠক! আমার সেই অবসন্ন আক্লান্ত শরীর সেই নিদ্রাবেশে অবশেষে অভিভূত হইয়া পড়িল। অগত্যা আমি সেই শিলাতলেই শয়ান হইলাম।

শ্রী. শৌঃ—



সন ১২৮১ সালের মূল্য-প্রাপ্তি।

জ্যৈষ্ঠ মাস।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
মেছোবাজার কলিকাতা ···৩৲
„ ভোলানাথ পালিত
শ্রীরামপুর ···৩।৵৹
„ রামপদ ঘোষ, ত্রিহুত ··৩।৵৹
„ রাজেন্দ্র কুমার বসু, ঢাকা ৩।৵৹
„ হরকুমার সরকার,
করচমেড়িয়া, রাজসাহী ৩।৵৹
„ যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী
মুক্তাগাছা, মৈমনসিংহ ৩।৵৹
„ ত্রৈলোক্যনাথ বসু এম্ এ বি এল
মুজঃফরপুর, ত্রিহুত ৩।৵৹
„ ব্রজনাথ মুন্সী
কাদিরপাড়া, যশোহর ৩।৵৹
„ বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়
টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ ৩।৵৹
„ শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী
কুরীগ্রাম, যশোহর ···১৸৶৹
„ রাজকুমার রায়
নড়াল, যশোহর ···৩।৵৹
„ বিহারীলাল রায়
কোন্নগর, হুগলী ···৩।৵৹
„ বরদাকান্ত বিশ্বাস
এলাহাবাদ ৩।৵৹
শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরী
চাঁদপাড়া, দিনাজপুর ৩।৵৹
„ উমানাথ সাধুখাঁ
বরণডালি, যশোহর ···৩।৵৹
„ কালীকুমার মজুমদার
পায়ডাঙ্গা, রঙ্গপুর ···৩।৵৹
„ কালীনাথ রায়
নবাবগঞ্জ, মালদহ ··৩।৵৹
„ বিধুভূষণ পাল
আমিনবাজার, কৃষ্ণনগর ৩।৵৹
„ বিনন্দচন্দ্র আচার্য্য গোস্বামী
নওগাঁ, আসাম ···৩৸৵৹
„ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
কৃষ্ণনগর কালেজ ···৩।১০
„ বিপীনমোহন শিক্ষানবীশ
তুষভাণ্ডার, রংপুর ৩।/১০
„ শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
লক্ষ্ণৌ ··· ৩।৵৹
„ কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়
দাহুরদহ, বালেশ্বর ৩।৵৹
„ তারাকালী চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা ···৩৲
„ দ্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায়
নয়াদুম্‌কা ৩।৵৹
„ ভুবন মোহন বসু মুলতান ৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু ষষ্ঠীবর ভট্যাচার্য্য
ভুধসরাই, চাঁদপুর ১৲
„ উমাচরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড হার্ব্বর ···৩।৵৹
„ অতুলচন্দ্র সিংহ
কমিল্লা, ত্রিপুরা ১৸৶৹
„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জব্বলপুর ···।৵৹

,, হরিমোহন বসু
কমিল্লা, ত্রিপুরা ৩।৵০

,, কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়
মালিপোতা, নদীয়া ৩।১০০

,, চন্দ্রমোহন ঘোষাল
বহির্গাছি, নদীয়া ...৩।৵০

,, হরিকুমার দত্ত
কুমিল্লা, ত্রিপুরা ...৩।৵০

,, বি, ভেঙ্কাটাচেরীয়র
সিমোগা, মহীসুর... ৩।৵০

,, গিরীশচন্দ্র গুপ্ত
ফোর্ট গ্লষ্টর, চব্বিশপরগণা ৩।৵০

,, দীননাথ চট্টোপাধ্যায়
কাকুর, অযোধ্যা ।৵০

,, রাজেন্দ্র চন্দ্র
নাথের বাগান, কলিকাতা ৩৲

,, নবীনচন্দ্র পাল
পুরুলিয়া, মানভুম ...১||৵০

,, কুমার মহেন্দ্রলাল খাঁ
নারাজোলি, মেদিনীপুর ৩৵০

,, দিগম্বর চক্রবর্ত্তী. জলপাইগুড়ি ।০

,, নবীনচন্দ্র দাস . রংপুর ...৩।৵০

,, জ্ঞানদাশঙ্কর বসু
বিদ্যানন্দকাটি, যশোহর ।১৸৵০

,, রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুর
সৈয়দাবাদ, বহরমপুর ৩।৵০

মহারাণী স্বর্ণময়ী
কাসিমবাজার বহরমপুর ৩।৵০

রাণী শরৎসুন্দরী
পুটিয়া, রাজসাহী ...৩৵০

রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর
দীঘাপতিয়া, রাজসাহী ৩।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
বহুবাজার, কলিকাতা ৬

,, ক্ষেত্রনাথ মজুমদার
চেঁপা, হুগলী ...৩।৵০

,, নবীনচন্দ্র শর্ম্মা
নিমুখানসামার লেন, কলিকাতা ১৲

,, যোগেশচন্দ্র রায়
প্রেসিডেন্সি কালেজ, কলিকাতা ১৲

,, শশীভূষণ বসু
পটলডাঙ্গা, কলিকাতা ১৸০

,, দ্বারিকানাথ দত্ত
বল্‌গনা পুস্তকালয় ...৩৲

,, শারদাপ্রসাদ ঘোষ
ক্লাইব রো, কলিকাতা ১৸০

,, গৌরলাল সাহা
গোয়াস, মুরশিদাবাদ ৩।৵০

,, বনআরিলাল মুন্‌সী
অলিপুর, রংপুর ...৸৵০

,, মুন্‌সী মহামেদ পেতারুদ্দিন
বোদাচন্দন, জলপাইগুড়ি ...১৴১০

,, সফর আলি, নওয়া খালী ৩।৵০

রাজশ্রী শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর
কলিকাতা ... ১৫৲

,, অমৃত নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী
মুক্তাগাছা, মৈমনসিংহ ... ৩।৵০

,, অন্নদাপ্রসাদ সুর
শোভাবাজার, কলিকাতা ... ।৵০

,, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ইটা, উত্তর পশ্চিম বিভাগ ...।৵০

,, প্রসন্ন কুমার নিয়োগী
মৈমনসিংহ ... ১||৵১০

,, কমলচাঁদ হালদার
দারজিলিং ... ১৲
,, ভগীরথ দাস
মাহীগঞ্জ, রংপুর ... ৩৶৹
,, হরদয়াল ঘোষ
মাহীগঞ্জ, রংপুর ... ৩৵৹
,, প্রিয়নাথ ঘোষ
আমাটী, শ্রীরামপুর ... ১৸৵১০
,, কালীরঞ্জন লাহিড়ী
পুটিয়া, রাজসাহী ... ৩৶৹
,, হরিকিশোর রায়
নরসিংহদি, ঢাকা ... ৩৶৹
,, যদুনাথ বন্দোপাধ্যায়
,, বিজয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
নিবাধই দত্ত পুকুর, বারাসাত ১৷৶৹
,, গোবিন্দচাঁদ বসু
দেবানন্দপুর, হুগলী ... ৩৵১০
,, শিবচন্দ্র মিত্র
খিদিরপুর, চব্বিশপরগণা ১৸৹
,, অনঙ্গ মোহন চৌধুরী
তুষভাণ্ডার, রংপুর ... ৩৶৹
,, জগন্নাথ প্রসাদ গুপ্ত
নসীপুর, মুরশিদাবাদ ... ৩৶৹
,, দুর্গানারায়ণ চৌধুরী
নড়াল, যশোহর ... ১৸৶৹
,, রামগোপাল সেন
মাটিয়ারি, দাঁইহাট ... ১৸৵
,, মৃত্যুঞ্জয় বসু
লক্ষণনাথ, জলেশ্বর ... ৩৶৹
,, গোরাচাঁদ সিংহ
বীরসিংহ, মেদিনীপুর ।৶৹

,, বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
নোয়াখালি ... ৩৶৹
,, মণিলাল সেট
পাতুরিয়াঘাটা, কলিকাতা ৩৲
,, পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত
শ্যামবাজার, কলিকাতা ৩
,, নারায়ণ প্রসাদ ভট্টাচার্য্য
বৈদ্যবাটি ... ৩৶৹
,, কালীকুমার কর
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম ৩৶৹
,, অন্নদাচরণ রায়
কাপাসগোলা, চট্টগ্রাম ৩৶৹
,, যদুনাথ ঠাকুর
সুকদমপুর, মালদহ ৩৶৹
,, রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
কুচবেহার ... ১৸৶৹
,, মাধবচন্দ্র রায়
কামারপাড়া, চুঁচুড়া ... ৩৶৹
,, দেবেন্দ্র নাথ সাহা
চিথলিয়া, পাবনা ৩৶৹
,, ভিবিরাম বড়ুয়া
উত্তর গৌহাটী, আসাম ... ৩৶৹
,, মহেশচন্দ্র লাহিড়ী
মাহীগঞ্জ, জেলা রংপুর ... ১৷৶১০
,, প্রবোধ চন্দ্র রায়
শ্রীপুর, টাকী ... ৷৹
,, গিরীশচন্দ্র চৌধুরী
মুন্‌সেফ, পেরোজপুর ... ৩৶৹
,, কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
মাহেশ, শ্রীরামপুর ... ৩৶৹

আর্য্যবংশ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

গ্রীস ও ভারত—আর্য্যবংশের উৎকর্ষের প্রধান স্থল। উভয়দেশীয় আর্য্যেরাই পুরাকালে জ্ঞান ও সভ্যতা বিষয়ে জগতের উপদেষ্টা ছিলেন। অধুনাতন তত্ত্বান্বেষী পণ্ডিতবর্গ এই দুই প্রাচীন জাতিরই অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে অবিশ্রান্ত তত্ত্বসংগ্রহ করিতেছেন, তথাপি সেই অক্ষয় ভাণ্ডার অদ্যাপি শূন্য হইল না। বলিতে কি এই দুই প্রাচীন জাতি পুরাকালে তাদৃশ উন্নতিশালিনী না হইলে, বর্ত্তমান জ্ঞান ও সভ্যতার স্রোত কখনই এত দূরপ্রসারি হইতে পারিত না। কিন্তু সেই দুই প্রাচীন জাতির উন্নতি কেন সম্পূর্ণ প্রতিকূলগামিনী হইল? কেনই বা এই দুই জাতির মনের বেগ সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে প্রধাবিত হইল? কেনই বা গ্রীসে বক্তৃতা ও ইতিহাস,—তক্ষণী ও স্থপতি,—চিত্র ও শিল্প,—অধীনতাসহিষ্ণুতা ও স্বদেশানুরাগ,—এবং বীরগরিমা ও রণচাতুরীর—এতাদৃশী পরিণতি হইল? আর কেনইবা ভারতে তাহার তাদৃশী পরিণতি না হইয়া কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ের এতদূর উৎকর্ষ হইল? এই গভীর প্রশ্ন সকলের কে উত্তর দিবে? কিরূপেই বা ইহাদের মীমাংসা হইবে? পুরাবৃত্ত এ সকল বিষয়ে আমাদের কোন সাহায্য করিবে না। কারণ ভারতের পুরাবৃত্ত নাই বলিলেও হয়। আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ও অনুমানই এবিষয়ে আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন। সেই প্রমাণ ও অনুমানের বলে আমরা জানিতে পারি যে, গ্রীসের আর্য্যেরা,—ঐহিক সুখ, ঐহিক যশ, এবং ঐহিক উন্নতিরই পক্ষপাতী ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যকলাপ তাহারই অনুসারি হইত। ভারতীয় আর্য্যেরা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। পারমার্থিক সুখ, পারমার্থিক যশ, এবং পারমার্থিক উন্নতিই তাঁহাদিগের জীবনের লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা পার্থিব দ্রব্যমাত্রকেই মায়াবিজৃম্ভিত বলিয়া মনে করিতেন। পরলোক ও পরমাত্মা বিষয়ে তাঁহারা এতদূর তন্ময় হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে নিজের এবং এই প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান জগতের সত্ত্বা স্বীকার করিতেন না। তাঁহারা একমাত্র পরমাত্মার অস্তিত্বমাত্র স্বীকার করিতেন। জগতের আর সমস্ত বস্তুই তাঁহাদিগের মতে অবিদ্যাকল্পিত পরমাত্মার বিকার মাত্র। তাঁহারা বলেন যে—যত দিন আমাদিগের

অন্তর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে, ততদিনই আমাদিগের মনে এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ বুদ্ধি থাকিবে। যে মুহূর্ত্তে আমাদিগের মন জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদিগের মন হইতে সেই ভেদবুদ্ধি চলিয়া যাইবে। যাঁহারা এই জগতের অস্তিত্বই স্বীকার করিতেন না তাঁহারা যে এ জগতের উন্নতি বিষয়ে যত্নশীল হইবেন কখনই আশা করা যায় না। তাঁহাদিগের মন আজন্ম আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিমগ্ন থাকিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এরূপ জাতি যে ইতিহাসবিষয়ে বীত-শ্রদ্ধ হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এরূপ জাতি যে ঐহিক সমস্ত বিষয়েই উপেক্ষা করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এ পৃথিবী তাঁহাদের মাতৃভূমি নয়। ইহা তাঁহাদের বিদেশ,—তাঁহারা এখানে অতিথিমাত্র। তাঁহাদের মাতৃভূমি স্বর্গ,—তাঁহাদের মন প্রাণ সতত সেই দিকেই ধাবিত। মুক্তি—এই দেহপিঞ্জর হইতে মুক্তি—জন্মান্তর হইতে মুক্তি—মুক্তিই তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁহাদের জীবনে যত কিছু কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত, সমস্তই এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে—চিন্তা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ বুদ্ধি সংস্থাপন করিতে পারিলেই, তাঁহারা সেই চিরকাঙ্ক্ষিত মুক্তিলাভে সমর্থ হইবেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই অভেদ বুদ্ধি সংস্থাপনের ইচ্ছা ভারতীয় আর্য্যগণের হৃদয়ের এরূপ স্বভাবসিদ্ধ ভাব, যে, হিন্দুদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ—যে ঋগ্বেদের জড়প্রবণতা স্থূলবুদ্ধি পাঠকেরও অগোচর নয়—সেই ঋগ্বেদেরও দুই এক স্থলে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্
হৃদি প্রতীষ্য কবয়ো মনীষা।"
ঋ ১০।১২৯।৪ ॥

কবিরা চিন্তা দ্বারা তাঁহাদিগের অন্তরে সৎ (জীবাত্মা) ও অসৎ (পরমাত্মা) এই দুয়ের সংযোগ দেখিতে পান। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই—যে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ সংস্থাপনের জন্য মধ্যকালীন ভারতীয় আর্য্যেরা সতত ব্যাকুল ছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে সেই জীবাত্মার নিত্যানিত্যত্ব বিষয়ে তাঁহারা কোন মীমাংসাই করেন নাই।

অধিক কি ঋগ্বেদ পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে তথায় জীবাত্মার "প্রেত্যভাব" অর্থাৎ দেহধ্বংসের পর অবস্থিতির, দুই এক স্থল ভিন্ন প্রায় উল্লেখ নাই। বৈদান্তিকদিগের মায়াবাদ ও সর্ব্বেশ্বরবাদিত্ব (Pantheism),—এবং বৌদ্ধদিগের মুক্তিবাদ,—তখনও আর্য্যদিগের মনকে অপার্থিক করিয়া ফেলিতে পারে নাই। "যিনি দীন দুঃখীকে দান করিবেন তিনি স্বর্গের উচ্চতম স্থান অধিকার করিবেন,—তিনি দেবতাদিগের ও সহচর হইবেন।" (ঋ ১।১২৫।৫) যদিও ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে

এরূপ স্বর্গীয় সুখের প্রলোভন ও প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি ঋগ্বেদের প্রার্থনাগুলির সাধারণ উদ্দেশ্য ঐহিক সুখ। সবল শরীর, দীর্ঘ জীবন, বৃহৎ পরিবার, সুস্বাদু খাদ্য, সুপুষ্ট পশুদল—তাৎকালিক গ্রাম্যজীবনের উপযোগি এই পার্থিব দ্রব্যজাতের নিমিত্তই ঋগ্বেদপ্রণেতা ঋষিগণ দেবতাদিগের উপাসনা করিতেন। ঋগ্বেদের ১।৬৩।৮ শ্লোকে লিখিত আছে—"হে ইন্দ্র! তুমি যেমন জলবর্ষণ করিয়া আমাদিগকে "আত্মা" প্রদান করিয়াছ, সেইরূপ আমাদিগকে যথোপযুক্ত খাদ্য প্রদান করিয়া "আত্মা" প্রদান কর।" এখানে স্পষ্টাক্ষরে "আত্মা" শব্দে জীবন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে "আত্মা" শব্দ—বর্ত্তমান নিগূঢ় ও দুর্ব্বোধ অর্থে—ঋগ্বেদ-প্রণেতা প্রাচীন ঋষিগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা সেই অর্থে ঋগ্বেদের পরেই ব্যবহৃত হয়। কারণ বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী সংবাদে "আত্মা" শব্দের বর্ত্তমান নিগূঢ় অর্থ বিশেষরূপ বিবৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক ঋগ্বেদের অনেক পরে লিখিত হয়। ঋগ্বেদ ভারতীয় আর্য্যদিগের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। ইহাতেই তাঁহাদিগের প্রাচীনতম রীতি নীতি, সমাজপদ্ধতি, ও মানসিক ভাব বর্ণিত হইয়াছে। ইহার গীতিমালায় আধুনিক দর্শনের কোন চিহ্নই উপলক্ষিত হয় না। তাহাতে বর্ত্তমান নির্জীব আর্য্যের ছবি চিত্রিত হয় নাই। ইহার ভাবা—ইহার ভাব—সকলই তেজঃপূর্ণ। ইহার কোথাও রাজগণের পরস্পর-সমর,—কোথাও মন্ত্রিগণের পরস্পর-বিরোধ,—কোথাও জয়জনিত সিংহনাদ,—কোথাও পরাজয়-জনিত আর্ত্তনাদ,—কোথাও ভৈরব সমরগীতি,—এবং কোথাও বা শত্রুদিগের বিনাশপ্রার্থন প্রভৃতি সজীবতার লক্ষণ সকলই প্রত্যক্ষগোচর হয়। ইহাতে স্পষ্ট অনুমান হয়—যে সময়ে আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে উপনিবেশিত হন,—যে সময়ে ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য তৌরাণিকদিগের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর সমর চলিতেছিল,—এবং যে সময়ে ভারতীয় আর্য্যেরা ভিন্ন দেশাধিকরণ ও আত্মরক্ষণে একান্ত ব্যস্ত ছিলেন,—সেই সজীবতার সময় ও সেই বিজয়ের সময়ই ঋগ্বেদ লিখিত হয়। তৌরাণিকদিগের সহিত এই ঘোরতর সমর পর্য্যবসিত হইলে, আর্য্যেরা হিমালয় ও বিন্ধ্য-পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভারতের অপ্রতিহত অধীশ্বর হইয়া উঠেন। এই সময়েই সুবিস্তীর্ণ শান্তি কিছুকাল আর্য্যাবর্ত্তে বিরাজ করে। এবং সেই সময়েই ভারতীয় আর্য্যদিগের মন বাহ্য জগৎ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্তর্জগতের গূঢ়-গণনায় নিযুক্ত হয়। এই সময়েই ভারতীয় আর্য্যদিগের অবশ্যম্ভাবি দাসত্বের বীজ রোপিত হয়। এই সময় হইতেই তাঁহাদিগের শারীরিক নির্বীর্য্যতার সূত্রপাত হয়। এই সময়েই তাঁহাদিগের

সমরকণ্ডু উপশমিত হয়। এই সময় হই তেই তাঁহাদিগের দিগ্বিজিগীষা নির্ব্বাণ হয়। কেনইবা না হইবে? সকলেই যখন পদানত—তখন তাঁহারা কাহাকে পরাজয় করিবেন? বিষয় না থাকিলে কখন কি কোন বৃত্তির পরিচালনা হইয়া থাকে? তখন তাঁহারা রবিন্‌সন্ ক্রুসোর ন্যায় বলিয়াছিলেন,—We are the monarchs of all we survey,—যাহা কিছু আমাদের নয়নগোচর হয়, আমরা সকলেরই অধীশ্বর। দুর্ব্বল ও অসভ্য তৌরানিকেরা তাঁহাদিগের ভয়ে তটস্থ। পশুরাজ যেমন মেষপালকে তাড়িত করেন, সেইরূপ ভারতীয় আর্য্যেরা তৌরাণিকদিগকে তাড়িত করিয়া ক্রমে দক্ষিণ সাগরের তীরস্থ ও পর্ব্বতের অধিত্যকাবাসী করিলেন। পরস্পর-সংঘর্ষ ব্যতীত বলের উপচয় হয় না। জগতের কোন দ্রব্যই বহুদিন একাবস্থ থাকে না। হয় ইহা বাড়িবে—না হয় ইহা কমিবে—চিরদিন ইহা এক ভাবে কখনই থাকিবে না। অন্যোন্য-সংঘর্ষ অভাবে ভারতীয় আর্য্যদিগের বলের উপচয় হইল না—ইহা সমভাবেও থাকিল না—ক্রমেই ইহার অপচয় হইতে লাগিল। পূর্ব্বোল্লিখিত পরলোক-প্রবণতা-জনিত ঐহিক বিষয়ের অনাদর ও অন্যোন্য-সংঘর্ষের অভাব—এই দুইটীই ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের অবনতির প্রধান কারণ। এবং ঐহিক উন্নতির পূজা ও বিদেশীয় শত্রুদিগের সহিত সতত সংঘর্ষ—এই দুইটীই গ্রীসীয় আর্য্যদিগের ঐহিক উন্নতির ও অধিকতর বলবত্তার প্রধান কারণ।

ভারতীয় আর্য্যেরা দীর্ঘকালব্যাপী সমরের পর এইরূপে নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতেছেন,—বিজ্ঞান ও দর্শনাদি দ্বারা অন্তর্জগতের গূঢ়গণনায় ধ্যানমগ্ন আছেন,—এমন সময়ে সহসা দিগ্বিজয়ী অ্যালেক্‌জাণ্ডারের অজেয় সেনা ভারতের তোরণদ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ করিল।

ক্রমশঃ।

সুপ্রসিদ্ধ প্রথম ফরাসি বিদ্রোহ।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের প্রথম সমুত্থান ও ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ওয়াটার্লু সমরে ইহার পর্য্যবসান হয়। পার্থিব ইতিহাসের যে ভাগে এই ভীষণ সমরের আদ্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে, তৎসদৃশ চিত্তাকর্ষক ও উপদেশক ভাগ আর দৃষ্ট হয় না। কোন প্রাচীনকালেই এতাদৃশী গুরুফলপ্রসবিনী ঘটনাপরম্পরা একত্র সমবেত হয় নাই। এই ভীষণ বিদ্রোহানল প্রথমে ফ্রান্সে ও অবশেষে সমস্ত সভ্য জগতে বিস্তারিত হইয়া প্রাচীন ও নূতন মহাদেশে এক নবযুগের

আবির্ভাব করিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফ্রান্সে স্বাধীনভাবের এই নবোত্থান সময়েই উত্তর আমেরিকায় স্বাধীনতা সংস্থাপিত হয়; এবং ফরাশিদিগের উত্তেজনায় এই বলবতী স্বাধীনতাস্পৃহা অবশেষে ইউরোপীয় যাবতীয় দক্ষিণ প্রদেশেই সংক্রামিত হইয়া পড়ে। যৎকালে ইউরোপ এই ভীষণ অন্তর্ব্বিদ্রোহানলে দগ্ধ হইতেছিল, সেই সময়ে যবনপ্রপীড়িতা ভারতলক্ষ্মী অচিরকালমধ্যেই ইংলণ্ডেশ্বরের করে আত্মসমর্পণ করেন। যদিও ফরাশিবিদ্রোহানলের প্রজ্বলিত জ্বালা রুশিয়ায় তখন ও প্রবিষ্ট হয় নাই, তথাপি ইহার সেনাদল এই ভয়ঙ্কর সমরাঙ্গণে যে পরিমাণে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতেই ইহা অনিবার্য্যবেগ হইয়া অবশেষে প্রাচ্য দেশসকলকে প্লাবিত করে। এদিকে মূরাধীনা যবনরাজলক্ষ্মী,—উত্তরে সমরবিজয়ী রুসীয় পদাতিক ও দক্ষিণে ইংলণ্ডীয় অজেয় রণতরি দ্বারা—আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণা ও জীর্ণকলেবরা হইতে লাগিলেন।

পুরাবৃত্তে বিভিন্ন বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন বিভিন্ন অদ্ভুত ঘটনার উদয় দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন বিভিন্ন কালেই, সেই সেই অদ্ভুত ঘটনার বিভিন্ন বিভিন্ন ফলের উৎপত্তি উপলক্ষিত হয়। ম্যারাথন, থার্ম্মোপিলী ও স্যালামিস্ প্রভৃতি সমরে,—গ্রীসীয়দিগের সাধারণতন্ত্র ও যবনদিগের যথেচ্ছাচারতন্ত্র এই পরস্পরবিরোধি রাজনীতিদ্বয়ের অন্যোন্য-সংঘর্ষ হইতেই গ্রীসের বৈজ্ঞানিকী ও শিল্পকরী প্রতিভার আবির্ভাব হয়। এথেন্স নগরে পেরিক্লিসের সময়েই এই প্রতিভার সমধিক ঔজ্জ্বল্য দেখিতে পাওয়া যায়। রোমীয় সাম্রাজ্যের যে সমরবিজয়িনী সেনা একসময়ে সমস্ত ধরাতলকে স্বকীয়পদতলস্থ করিয়াছিল, সুবিখ্যাত কানী ও জামা প্রভৃতি সমরই তাহার উৎপত্তির কারণ। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপীয় নরপতিগণ খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান তীর্থস্থল জেরুজেলম্ নগরীর দ্রোহকারিণী যবনসেনার সহিত যে ঘোরতর ধর্ম্মসমরে প্রবৃত্ত হন, সেই সমরেই গ্রীসীয় বৈজ্ঞানিকী ও শিল্পকরী প্রতিভা অসভ্য যবনদিগের রণোন্মাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইউরোপীয় আধুনিক সভ্যতার সূত্রপাত করে। স্পেনীয়দিগের যে অসমসাহসিকতা, অজ্ঞানবিঘ্নের উলঙ্ঘন দ্বারা নবপৃথিবীর আবিষ্কার করিয়া, আধুনিক জনগণের দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তির চরিতার্থতা সমর্থন করিয়াছিল,—সেই অসমসাহসিকতা স্পেনীয় ও মূরদিগের পরস্পর-সমরের স্ফুলিঙ্গস্বরূপ অবশ্যই বলিতে হইবে। এইরূপ পুরাবৃত্তে বিভিন্ন বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন বিভিন্ন কারণবশতঃ, বিভিন্নপ্রকার ফলের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ফরাশি বিদ্রোহের সময়ের মত,—নেপোলিয়নের সময়ের মত,—এত অদ্ভুতফলপ্রসূ আশ্চর্য্যঘটনাবলীর একত্র সমবায় আর কুত্রাপি দেখা যায় নাই।

পুরাবৃত্তের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনই এই পঞ্চাধিক বিংশতি বৎস-

রের মুকুরে প্রতিফলিত দৃষ্ট হয়। যাবনকি রাজ্যের যথেচ্ছাচার প্রণালী,—গ্রীসের সাধারণতন্ত্র প্রণালী,—রোমের প্রথমে প্রজাতন্ত্র ও পরে যথেচ্ছাচার প্রণালী,—এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গথ্ ও ভ্যান্ড্যাল্গণ কর্ত্তৃক ইউরোপের ভীষণ আক্রমণ ও অধিকরণ, ও দেশহিতৈষী বীরবৃন্দদ্বারা তৎপ্রতিরোধ,—এ সমস্ত ঘটনারই প্রতিরূপ এই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। প্রাচীন কালের ইতিহাসে এমন কোন ঘটনাই দৃষ্ট হয় না, যাহার অনুরূপ এই স্বল্পকালের ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় না। কার্থেজ্ সেনাপতি বীরবর হ্যানিব্যালের রণবিষয়িণী প্রতিভা,—রোমীয় সাধারণ সভার সভাপতি গ্রাক্কসের অসাধারণ দেশহিতৈষিতা—রোমরাজ কাইসরের দূরারোহিণী আকাঙ্ক্ষা,—রোমসম্রাট্ অগষ্টসের অতুল সমৃদ্ধি,—ট্রেজানের সুবিখ্যাত দিগ্বিজয়,—এবং জুলিয়ানের অদ্ভুত বিপৎপাত,—এসমস্তই এই পঞ্চাধিক বিংশতি বৎসরের ইতিবৃত্তে সংলক্ষিত হয়। ফরাশি দেশের আধিপত্য অধিকৃত দেশসকলের অধিকতর কষ্টদ হওয়ায়, রোমরাজ্যের কোমলতর আধিপত্যের ন্যায় দীর্ঘকালস্থায়ি হইতে পারে নাই। ফ্রান্স—রোমরাজ্যের ন্যায় অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই অমূল্য সভ্যতামৃত বর্ষণ করেন নাই বলিয়াই এত সমবেত চেষ্টা দ্বারা ইহার অনিবার্য্য বেগ নিবারিত হইয়াছিল। ফরাশি বিজয়রবি রোমীয় বিজয়রবির ন্যায়, সভ্যতাজ্যোতির্ব্বিকিরণে বর্দ্ধিতজ্যোতিঃ না হইয়া জলজ্জ্বাল উল্কাপিণ্ডের ন্যায় তীব্রবেগে পতিত ও প্রদীপ্ত হইয়া অচিরকালমধ্যেই জগৎ সংহার করতঃ অন্তর্লীন হইয়াছিল।

এরূপ পরস্পরবিসম্বাদিনী অদ্ভুতগুণপরম্পরার এত অসংখ্য আধার আর কখনই একত্র সমুদিত হয় নাই। কিন্তু, একদিকে—যেমন এরূপ অভুতপূর্ব্ব প্রতিভার আবির্ভাব আর কখন দৃষ্ট হয় না, তেমনই আবার অন্যদিকে—এইরূপ ঘোরতর নৃশংসতার আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। "ইতিহাস যেমন—এক দিকে—ফরাশি যোদ্ধৃগণের অসাধারণ রণনিপুণতা ও ফরাশি বৈজ্ঞানিকদিগের অসামান্য ধীপ্রভার তুলনা দিতে পারে না, তেমনই অন্যদিকে ফরাশি সাধারণতন্ত্রিদিগের ঘোরঘাতুকতার দ্বিতীয় উদাহারণ দিতে একান্ত অক্ষম। যেমন ড্যান্টনের ভীষণ পাষাণহৃদয়তা—ও রোব্স্পীয়রের জুগুপ্সিত জিঘাংসার—অনুরূপ ইতিবৃত্তে দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ নেপোলিয়নের সামরিকী ও ভল্টেয়রের বৈজ্ঞানিকী প্রতিভার প্রতিরূপ কোন ইতিহাসেই দেখা যায় না। ফ্রান্সের সৌভাগ্যপতাকা যেমন অদ্ভুতগুণিবৃন্দ-সমাগমে সগর্ব্বে গগণস্পর্শিনী হইয়াছিল, তেমনই ভীষণ নররুধিরতরঙ্গবেগে লজ্জায় ভুতলশায়িনী ও হইয়াছিল। ইতিবেত্তৃগণ যেমন হর্ষস্খলিত কণ্ঠে সেই গুণিবৃন্দের যশোগান সতত

কীর্ত্তন করিবেন, তেমনই ঘৃণারোষারুণ নয়নে ফরাশিদিগের সেই নর-রুধির-ক্রীড়ার সতত তাড়না করিবেন।

এই ভীষণ সময়ে ইউরোপের প্রায় সমস্ত জাতিই যেন পরস্পর-প্রতিদ্বন্দিনী হইয়া নিজ নিজ অসাধারণগুণে পরস্পরকে পরাস্ত করিতে উদ্যত হইয়া উঠিলেন। স্পেনীয়দিগের দুর্দ্দমনীয় শত্রুদ্রোহিতা,—ফরাশিদিগের দিগ্বিজয়িনী রণমত্ততা,—প্রুসীয়দিগের তেজস্বিনী উৎসাহবত্তা—রুসীয়দিগের জীবন-তুচ্ছকারিণী নির্ভীকতা,—ক্রমান্বয়ে এসকলই পরীক্ষিত হইয়াছিল। গুরু-গর্ব্ব-কারিণী চতুর্দ্দশ লুইয়ের জয়লক্ষ্মী, নেপোলিয়নের জয়সূর্য্যের কিরণনিকরে, বিলীনপ্রভা হইয়াছিল। এবং মারল্বরোর সমরগরিমা ভিটোরিয়া ও ওয়াটার্লু সমরে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। নেপোলিয়নের দিগ্বিজয় উপলক্ষে অসংখ্য বীরবৃন্দের যেরূপ সমাবেশ হইয়াছিল, এরূপ সমাবেশ—প্যালেষ্টাইন উপকূলে ইউরোপ ও এসীয়ার ঘোরতর পরস্পর-সংগ্রামের পর আর দৃষ্ট হয় না। স্যালোন্ রণক্ষেত্রে অবতারিত গথ্‌সেনাপতি অ্যাটিলার সেনাব্যূহ অপেক্ষা যে—সিথিয়া মরুক্ষেত্রে অবতারিত রুসীয় সম্রাট্ অ্যালেক্‌জ্যাণ্ডারের সেনাব্যূহ—অধিকতর ভীষণ ছিল, তদ্বিষয়ে আর কে সন্দেহ করিবেন?

এই অদ্ভুত সময়ের জ্ঞানদিগ্বিজয়—সমরদিগ্বিজয় অপেক্ষা কোনমতে ন্যূন হয় নাই। এই নর-রুধির সংগ্রামে, জল ও স্থলের অধিপতি—সভ্যতামার্গের উপদেশক—ফ্রান্‌স ও ইংলণ্ড—অন্যান্য সমস্ত সভ্য দেশকে হীনপ্রভ করিয়া ফেলিয়াছিল। একদিকে নেপোলিয়ন্ ও ওয়েলিংটন সমরদর্পে মেদিনীকে কম্পান্বিত করিতেছিলেন,—অন্যদিকে ফরাশি বৈজ্ঞানিক ল্যাপ্‌লাস্ সৌরজগতের, এবং ব্রিটানীয় মনোবৈজ্ঞানিক সারওয়াল্টর স্কট্ অন্তর্জগতের গূঢ়গণনায় নিমগ্ন ছিলেন। এই অদ্ভুত সময়েই পৃথিবী আত্ম-কুক্ষি-গত গূঢ় বস্তুনিকর দ্বারা নিজ অন্তরীক্ষ পরিভ্রমণের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ (Philosophical analysis) পার্থিবপদার্থ নিচয়ের অন্তর্ভেদ করিয়াছিল। এই অদ্ভুত সময়েই, ক্যানোভার হস্তে তক্ষণী (Sculpture) যেন পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল, এবং টরওয়াল্‌ড্‌ষ্টনের চিত্রকরী-প্রতিভা-বলে চিত্রবিদ্যা যেন আবার নবীভাব ধারণ করিল। এই অদ্ভুত সময়েই, স্থপতিবিদ্যা (Architecture) ইন্দ্রের অমরাবতী-সদৃশী ফ্রান্‌সের পারীস নগরী সুশোভনে পূর্ণকলা হইয়া উঠিল; এবং মিসর ও গ্রীসের শিল্পবিদ্যা সমৃদ্ধিশালিনী রুসীয়নগরী সুশোভনে নিঃশেষিত হইয়াছিল। অধিক কি এই অদ্ভুত সময়েই দুরারোহ উত্তুঙ্গ আল্‌প্‌স পর্ব্বতের দুর্ভেদ্য অধিত্যকা প্রদেশও—বিজ্ঞানের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। এবং পঞ্চভূতের অন্যতম, জেম্‌স ওয়াটের বৈজ্ঞানিকী প্রতিভাবলে, বাষ্পীয়পোতের প্রাণভূত হইয়াছিল।

এই সমস্ত ঘটনাপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলে আপাততঃ বোধ হয় যেন মানবী শক্তি ইহাদের উদ্ভাবনে একান্ত অক্ষম। যেন কোন দৈবী শক্তি কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন মানসে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া অমানুষী শক্তি সংক্রামন দ্বারা মনুষ্যগণকে পরস্পরের ধ্বংসবিধানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে এসকল ঘটনাপরম্পরার কারণ নির্দ্দেশে কোন অমানুষী শক্তির উদ্ভাবনার প্রয়োজন নাই। বহুকাল-সংরুদ্ধ হৃদয়ভাবের আকস্মিক ভীষণ উদ্গীরণেই এরূপ অভূতপূর্ব্ব গুরুফলপরম্পরার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অসংখ্য কারণ বশতঃ প্রাচীন সমাজসংস্থিতি হঠাৎ বিশৃঙ্খল হইলে গুরুতর পাপ ও উচ্চতর পুণ্য উভয়ই এক সময়ে বিকাশ পায়।

ফ্রান্‌সে এই সময়ে যে বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা কোন রাজ্যবিশেষের ধ্বংস অথবা কোন সেনাবিশেষের রণপরাঙ্মুখতার জন্য নহে। রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত সমস্ত ফরাশি জাতির ধন, প্রাণ ও মান এই আন্দোলনস্রোতে ভাসিয়া যায়। এই অন্তর্বিদ্রোহ—পৃথিবীর সৃষ্টি প্রারম্ভাবধি ক্রমশঃ বদ্ধমূল, উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর পরস্পর-বৈরিভাবের—সহসোদ্গীর্ণ বিষময় ফলস্বরূপ। একদিকে স্বাধীনতাপ্রিয় দেশহিতৈষী মহাত্মাগণ গ্রীস ও রোমের পুরাবৃত্ত হইতে আহৃত স্বাধীনতা-বীজ অন্তরে রোপিত করিয়া তত্তদ্দেশীয় সাধারণতন্ত্রিগণের উন্মাদিনী দৃষ্টান্তপরম্পরায় নিরতিশয় উৎসাহিত হইলেন,—অন্যদিকে রাজসিংহাসন-পরিবেষ্টিনী প্রজারা বংশপরম্পরাগত রাজভক্তি ও ধর্ম্মভীরুকতায় বশবর্ত্তিনী হইয়া রাজরক্ষণে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে ও উদ্যত হইলেন। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর এবং রাজা ও প্রজার পরস্পর-বৈরভাব অতি পুরাকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু এরূপ বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতার ভাব কেবল এই অদ্ভুত সময়েই প্রাদুর্ভূত হয়। রোম ও গ্রীসের সাধারণতন্ত্র (Commonwealth) বস্তুতঃ কেবল শ্রেষ্ঠতন্ত্রমাত্রই (Oligarchy) ছিল। যথায় উচ্চ, মধ্য ও নীচ—সকলশ্রেণীস্থ লোকেরই—রাজ্যশাসন বিষয়ে সমান অধিকার, তথায়ই সাধারণতন্ত্র বিদ্যমান। কিন্তু গ্রীস ও রোমে তাহা ছিল না। এখানে যাঁহারা ধন, মান ও বিদ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তাঁহারাই কেবল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু ফ্রান্স এক্ষণে যে স্বাধীনতার জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল, সে স্বাধীনতার নিকট—রাজা ও প্রজা, গুণবান্ ও নির্গুণ, বিদ্বান্ ও মূর্খ, ধনবান্ ও নির্ধন, এবং ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক—সকলই এক সমান। সকলেরই দেশের রক্ষণাবেক্ষণে সমান অধিকার। দেশের করনির্দ্ধারণে, শত্রুবিরুদ্ধে রণখ্যাপনে, এবং দুষ্টদমনে সকলেরই সমান অধিকার।

মনুষ্যজাতি যখন প্রথমে সমাজবদ্ধ হন তখন বলবান্ ও দুর্ব্বলের পরস্পর আশ্রয় ও আশ্রিতত্ব ভাব নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। বলবানের আশ্রয় না লইলে দুর্ব্বলের ধন ও প্রাণ রক্ষার আর উপায়ান্তর ছিল না। এই আশ্রয়াশ্রিতত্বভাব হইতেই ভীষণ দাসত্ব-প্রথার আবির্ভাব হয়। অতি প্রাচীন কালে দাসাধিপেরা দাসদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন; এবং তাহারাও স্ব স্ব প্রভুকে পিতৃনির্ব্বিশেষে ভক্তি ও সেবা করিত। এই জন্য পুরাকালে দাসত্ব-প্রথা শৃঙ্খলস্বরূপ না হইয়া বরং পারিবারিক বন্ধনের কার্য্য করিত। বিশেষতঃ সে সময়ে দাসেরা কোন দাস-প্রভুর সম্পত্তিরূপে পরিণত না হইলে, দুর্ভিক্ষ ও উৎপীড়ন তাহাদিগকে অকালে সংহার করিত। সুতরাং পুরাকালে দাসত্বাধীনে দাসদিগের অবস্থা শোচনীয় হইলেও দাসত্বের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত তাহাদিগের আর গত্যন্তর ছিল না।

কিন্তু সমাজের সেই আদিম অবস্থায়—যখন কোন নির্দ্দিষ্ট শাসনপ্রণালী ছিল না—যখন ধন-প্রাণ-রক্ষণী নগরীর আবির্ভাব হয় নাই—যখন দাসত্বাবলম্বন ব্যতীত ধন মান ও প্রাণ রক্ষণের আর উপায়ান্তর ছিল না—তখন এই প্রথা যতই কেন শুভফলোৎপাদক হউক না; এই প্রথার আর বর্ত্তমান সময়ে কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে এই প্রথা হইতে কেবল বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে দেখা যাইতেছে। দাস-শ্রেণী দীর্ঘকাল স্বাধীনতা-বিরহে ক্রমে জ্ঞান-বুদ্ধি-হীন জড়পিণ্ডবৎ হইয়া উঠিল। দাস-প্রভুদিগের অত্যাচারে দাসদিগের অবস্থা দিন দিন অতি শোচনীয় হইতে লাগিল। ইঁহারা আর পূর্ব্বের মত দাসদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন না। ইঁহারা তাহাদিগকে গো, মেষ, ও ছাগ প্রভৃতির ন্যায় আপণে আপণে ও বন্দরে বন্দরে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাদের ধন ও প্রাণের উপর তাঁহাদিগের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকায় তাঁহারা ইহাদিগকে বলপূর্ব্বক ভূমিকর্ষণ, ভারবহন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের পরিশ্রমের ফল সমস্তই আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিলেন। দয়া ও ন্যায়পরতা তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে অন্তরিত হওয়ায় দাসদিগের নিদারুণ অবস্থায় তাঁহাদিগের হৃদয়ে করুণা সঞ্চার হইত না। এইরূপ দাসত্ব-প্রথায় অসংখ্য রাজ্যের উচ্ছেদ সম্পাদিত হইয়াছিল। ইতালী-সাধারণতন্ত্রের অতিশয় সমৃদ্ধি সময়েও স্বাধীন লোকের সংখ্যা বিংশসহস্র বই ছিল না। বিনিসে—স্বাধীন লোকের সংখ্যা সার্দ্ধ দ্বিসহস্রমাত্র; জেনোয়ায়—সার্দ্ধ চতুঃসহস্রমাত্র; এবং পাইসা, লুক্কা ও ফ্লুরেন্সে—ষট্ সহস্রমাত্র ছিল। অতি অল্প পরিবারই স্বাধীন নাগরিক (Free citizens) হইতে পারিতেন এবং তাঁহারা এই মর্য্যাদা কোন প্রকারে দাসগণ দ্বারা আক্রান্ত হইতে দিতেন না। এই স্বাধীন

নাগরিক হওয়ার অধিকার অধিকৃত দেশ সকলে প্রদত্ত হইত না। বিজেতৃ-দেশের উচ্চশ্রেণীস্থ লোকেরা শাসনকার্য্যের সমস্ত ভার যত্নপূর্ব্বক নিজ নিজ হস্তেই রাখিতেন এবং অর্থ-গৃধ্নু বণিকেরা সমস্ত বাণিজ্য কেবল আপনাদের করতলস্থ করিয়া স্বদেশ ও অধিকৃত দেশসকলকে দুস্তর দারিদ্র্য-পঙ্কে নিমগ্ন করিতেন। এরূপ সঙ্কীর্ণ স্বাধীনতা হইতে কোন প্রকার সাধারণ মঙ্গলেরই আশা নাই। এরূপ সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর কখনই চিরস্থায়িনী উন্নতি-সৌধ-রাজি নির্ম্মিত হইতে পারে না। এইসকল রাজ্যের অতিশয় সৌভাগ্য-গরিমার সময়েই অন্তর্বিদ্রোহানল রূপ—সঙ্কীর্ণ স্বাধীনতার গরলময় ফল—উৎপন্ন হইয়াছিল। ফ্লরেন্‌স নগরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি আমাদিগের নিকট এই পরিচয় দিতেছে যে, একসময়ে এই নগরীর প্রত্যেক গৃহ বিদ্রোহি-প্রজাপুঞ্জের আক্রমণ নিবারণকালে একএকটী স্বতন্ত্র দুর্গের কার্য্য করিত। এই সকল শ্রেষ্ঠতন্ত্র রাজ্যের দ্রুত উন্নতি ও দ্রুত পতন এই দুইটি বিষয় সপ্রমাণ করিতেছে;—প্রথমতঃ স্বাধীনতা অল্প-হস্ত-ন্যস্ত হইলেও ইহার উন্মাদিনী উত্তেজনায় সেই অল্প সংখ্যক লোক দ্বারাও অদ্ভুত ঘটনা সকল সংসাধিত হইতে পারে;—দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা অল্প-হস্ত-ন্যস্ত হইলে সেই দেশের উন্নতি কখন চিরস্থায়িনী হইতে পারে না।

ফ্লরেন্স—প্রতিদ্বন্দী শ্রেষ্ঠতন্ত্র পাইসাকে পদানত করিয়াও বলীয়ান্ হইতে পারে নাই। পাইসার রক্ষণার্থ সৈন্য নিযুক্ত করাতে নিজে অধিকতর ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছিল। সাইরাকিউজ যুদ্ধে পরাজয়ের পর যেমন এথিনীয় মিত্রতা-বন্ধনের (Athenian Confederacy),—লিউকট্রা যুদ্ধে পরাজয়ের পর যেমন ল্যাসিডিমোনীয় প্রাধান্যের,—এবং ইপামিনণ্ডাসের মৃত্যুর পর যেমন থিবীয় প্রাধান্যের ধ্বংস হয়, বর্ত্তমান সময়ে ইতালীর শ্রেষ্ঠতন্ত্র সমুদায়েও সেইরূপ আকস্মিক ধ্বংস উপলক্ষিত হয়। বিজয়সম্বদ্ধ নগরী সকল এই যথেচ্ছাচারী স্বার্থপর শ্রেষ্টতন্ত্র রাজ্য সকলকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত—সুতরাং সুযোগ পাইলে ইহাদের দাসত্ব-শৃঙ্খল ভেদে পরাঙ্মুখ হইত না, এবং আক্রমণকারী বিজয়ী শরীর জয়-পতাকা উড্ডীন হইলে সশস্ত্রে সেই পতাকা-মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিত, সুতরাং বিজেতৃসৈন্য অনায়াসেই বিজয় লাভে সমর্থ হইত। অনেক সময় বহিরাক্রমণ ব্যতিরেকেও ইহারা—চির-বিলম্বিত অবশ্যম্ভাবী কালপরতন্ত্র অন্তর্ধ্বংসেই—বিলীন হইত। যে অল্প-সংখ্যক পরিবারে রাজ্য শাসনভার ন্যস্ত ছিল, সেই সকল পরিবার—কোথায়ও অপুত্রক দোষে, কোথায়ও অতুল সম্পত্তির বল-ক্ষয়-কারিণী শক্তিতে, এবং সর্ব্বত্র অন্তর্দৌর্ব্বল্যকর নীচশ্রেণী সহ বৈবাহিকী প্রথার অসদ্ভাবে—কালে নির্নাম হইয়া উঠিল। যে রোমীয় সাধারণতন্ত্র এক সময়ে ট্রিবিয়া, থ্রেসীমীন ও কানী সমরের ভয়ঙ্কর পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই রোম রণ-

ক্ষেত্রে অসংখ্য সেনা প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং যে রোমনগরীর দুর্জ্জেয় সেনা-সমুদ্র এক সময়ে তদা-পরিজ্ঞাত সমস্ত দেশকেই প্লাবিত করিয়াছিল, সেই রোমনগরী—এক্ষণে অন্তর্দৌর্ব্বল্যকর কারণ-সমূহে ক্ষীণবল হওয়ায় অসভ্য গথ ও ভ্যাণ্ডাল্ সেনার আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে পারিল না। এই অসভ্য উত্তরসেনা রোম রাজ্যের ধংসসম্পাদন করিয়া বিনষ্ট রাজ্য সকলে অসভ্য-জীবন-সুলভ স্বাধীনতা ও উৎসাহবত্তা অন্তর্নিবেশিত করে; সভ্যজাতীয় সমাজসংস্থিতির নির্ব্বাণোন্মুখ পাংশুরাশিতে অসংখ্য স্বাধীনতা-স্ফুলিঙ্গ বিন্যস্ত করে; নাগরিকী সভ্যতার শুষ্কপ্রায় স্কন্ধে তেজস্বিনী গ্রাম্য-স্বাধীনতার শাখা সংযোজিত করে। এই সেনা-বারিধির মন্থন হইতেই ইউরোপের সমস্ত রাজমণ্ডল ও সামন্তমণ্ডল সমুত্থিত হইয়াছে। ইহাদিগের আচার ব্যবহার হইতেই আধুনিকী সমাজপদ্ধতি ও রাজবিধি উৎপন্ন হইয়াছে। এই অসভ্যজাতির বিজয়ের পরিণাম যে কেবল শাসন-প্রণালী বা রাজ্যবিশেষের পরিবর্ত্তন এরূপ নহে, কিন্তু বিজিত জনপ্রদগণের প্রাচীন আচার বব্যহার রীতি নীতি এবং সম্পত্তির সমূলোৎপাটনই এই জয়ের চরম ফল। তাহাদিগের নগরী সকল বিনষ্ট, দেবালয় সকল ভগ্ন, অস্থাবর সম্পত্তি সকল বিলুণ্ঠিত, ও স্থাবর সম্পত্তি সকল হস্তান্তরীকৃত হইয়াছিল। বিজিত সম্রান্ত-কুলকুমারীগণ বিজেতৃ-সম্রান্ত-কুলোদ্ভব পুরুষগণের মধ্য হইতে স্বামী মনোনীত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং বিজিত নীচ কুলকামিনীগণ নীচ সৈনিক পুরুষগণের মদনোন্মাদে বিমানিত হইয়া ধর্ম্মাশ্রমের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। বিজিত যুবকসম্প্রদায়ের কিয়দংশ দাসরূপে বিক্রীত এবং অবশিষ্টাংশ বলপূর্ব্বক ভূমিকর্ষণে নিয়োজিত হইলেন। অধিকৃত দেশ সকল এরূপ দুরবস্থায় ভগ্নহৃদয় হইয়া দুর্ব্বৃত্ত বিধিবিহীন সৈনিকপুরুষদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য স্বাধীনতার বিনিময়ে ধন ও প্রাণ রক্ষা করিলেন।

রোমরাজ্যের উন্মূলক এই বিজেতৃ-সেনা হইতেই আধুনিক ইউরোপীয় উচ্চ শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে; এবং বিজিত রোমীয় নাগরিকগণ ও তাঁহাদিগের দাসশ্রেণী হইতেই বর্ত্তমান ইউরোপীয় নিম্ন শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়াছে। এই অসভ্য সেনাদলের গ্রাম্য-জীবন-সুলভ সমতা (Equality) ও উৎসাহবত্তা অদ্যাপিও উত্তরাধিকারিগণের মনে স্বাধীন ও সাহঙ্কারভাব অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে; এবং দুঃখপরম্পরা ও অবনতি, বিজিতদিগের গলদেশে একসময়ে যে শৃঙ্খল পরাইয়াছিল, সহস্রবৎসর অতীত হইল অদ্যাপি সে শৃঙ্খল অপনীত হইল না।

এই বিজিত ও বিজেতৃদিগের পরস্পর বদ্ধমূল বৈরভাবই ফরাশিবিদ্রোহের ব্যবহিতকারণ (Remote Cause)। এই বৈরানল সহসা প্রজ্জলিত হয় নাই। যতদিন বিজিত রোমীয় নাগরিকগণ গথদিগের অসহ্য উপদ্রব সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন,

তত্তদিন ইহার জ্বালা উপলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু রোমীয়দিগের বীর্য্যবহ্নি আর কত দিন এরূপ ভস্মাচ্ছাদিত থাকিবে? বর্ষ-সহস্র-সমবেত কারণ-সামগ্রীর বিশ্রান্তি-বিহীন প্রক্রিয়ায় ইহা ক্রমে প্রধূমিত হইতে লাগিল। অবশেষে সহসা ভীষণ বেগে প্রজ্বলিত হইয়া ফ্রান্স ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশ সকলকে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিল।

ক্রমশঃ।

কাব্য, কবি ও কবিত্ব।

গতবারে কাব্যের স্বরূপ ও লক্ষণ নির্ণয় করা হইয়াছে। এবারে কবি ও কবিত্বের সমালোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। কবি বলিলেই কবিত্ব কি তাহাও বলিতে হয়। সুতরাং এই দুইটীর পৃথক্ পৃথক্ বিচার না করিয়া যুগপৎ বিচার করা যাইবে।

কাব্য কি? তাহা এক প্রকার বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এক্ষণে কবি কে তাহা বিচার করা যাউক। কাব্যের লক্ষণ দিলেই কবির লক্ষণও এক প্রকার দেওয়া হয়। রসবৎ বাক্যই যদি কাব্য হয়, তাহা হইলে যিনি রসবৎ-বাক্য-রচনা-পটু তিনিই কবি। অর্থাৎ যাঁহার রচনা হৃদয়ের ভাবে পরিপূর্ণ এবং যাঁহার রচনা পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ের নিদ্রিত ভাব সমূহ জাগ্রত হয়, তিনিই কবি। মিল বলিয়াছেন এবং আমিও বলি যাঁহার রচনা পড়িয়া প্রকৃত কবি কিনা এরূপ বিচার করিতে হয়, কিম্বা "যেহেতু" এবং "অতএব" দ্বারা প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হয় তাঁহার কবি না হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

সাধারণের সংস্কার এই যে ঈশ্বর বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা দিয়াছেন, যাহার গুণে তাঁহারা প্রকৃত রসোদ্দীপক কাব্য রচনা করিতে পারেন। এই ক্ষমতা কিরূপ ও ইহা কিরূপে কার্য্য করে সে বিষয়ে বড় কেহ অনুসন্ধান করেন না। কিন্তু এই ক্ষমতা সচরাচর কবিত্বশক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন,—"যিনি কবি তিনি জন্মতঃই কবি, এবং তাঁহার কবিত্ব অপহরণ করা কাহারও সাধ্য নয়। আবার যিনি কবি নন তিনি জন্মতঃই নন এবং চেষ্টা কিম্বা কৌশল দ্বারা কেহ তাঁহাকে কবি করিতে পারেনা"।

এ প্রশ্নটী বড় গুরুতর। যাঁহারা মনুষ্যের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক তারতম্য স্বীকার করিতে চান না, তাঁহারা

বলেন অবস্থা ও শিক্ষার সাদৃশ্য থাকিলে সকলেরই পক্ষে এক এক সেক্‌সপীয়র কিম্বা কালিদাস হওয়া সম্ভব। আমি ক্রমে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব। সম্প্রতি দুই একটি বিষয়ে পাঠকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছি। প্রথমতঃ দেখিতে পাই এক এক জন কবিত্বের সুখ্যাতির জন্য নিতান্ত লোলুপ; তাঁহারা সময় পাইলেই পদ্যচর্চা—পদ্যরচনা প্রভৃতি লইয়াই পড়েন এবং অর্থসঙ্গতি থাকিলে সেই পদ্যময় গ্রন্থাবলী মুদ্রিত করিতেও ত্রুটী করেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই তাঁহাদের পদ্য পাঠে কেহই আনন্দ প্রকাশ করে না। আবার এমনও দেখিতে পাই এক এক জন নয় মাসে ছয় মাসে এক একটী পদ্য লেখেন। অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তাঁহাকে পদ্য লিখিতে সম্মত করিতে হয়। কিন্তু সুখের বিষয় এই, যাহা কিছু লেখেন তাহাতেই লোকে আনন্দ প্রকাশ করে। ইহা দেখিলে পূর্ব্ব পক্ষের মত যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। আবার কখনও কখনও দেখিতে পাই যাঁহারা জীবনের এক সময়ে বিশেষ কবিত্বশক্তির পরিচয় দেন নাই, পরে সময়ান্তরে তাঁহাদের কবিত্ব শক্তি অতিশয় বিকসিত হইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ কালিদাসের নাম করা যাইতে পারে। ঋতুসংহার, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র প্রভৃতি যে হস্তের লেখা,—শকুন্তলা, মেঘদূত, কুমার, প্রভৃতি সে হস্তের রচনা বলিয়া বোধ হয় না। ভবভূতির পক্ষেও ঠিক এইরূপ। মালতীমাধব ও বীরচরিতের সহিত তুলনা করিলে উত্তররামচরিতকে শতগুণে উৎকৃষ্ট বোধ হয়। মিলটন্ ও কাউপারের পক্ষেও সেইরূপ। বিশ বাইশ বৎসরের সময় তাঁহারা যে কবিতা লিখিয়াছিলেন আর পঞ্চাশ বৎসরের সময় যাহা লিখিয়াছিলেন, উভয়ের অনেক প্রভেদ। ইহা দেখিলে আবার দ্বিতীয় পক্ষের কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হয়। পাঠক আপনার মত কি? ইহার কোন্ পক্ষকে যুক্তিযুক্ত মনে হয়? আমি বলি এই উভয় মতেই সত্য আছে; উভয়ের কথাই যুক্তিসঙ্গত। অর্থাৎ কবিত্বশক্তি নামক কোন বিশেষ ক্ষমতাও আছে এবং অবস্থা কিম্বা শিক্ষানুসারে তাহার হ্রাস বৃদ্ধিও হইয়া থাকে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি হৃদয়ের ভাব ভিন্ন কাব্য হয় না, সুতরাং হৃদয়ের ভাব ভিন্ন কাহারই কবিত্ব থাকে না। এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন—"সন্তানের মৃত্যু হইলে জননী যখন হাহাকার করিতে থাকেন, সেখানে ত হৃদয়ের ভাবের অপ্রতুল নাই এবং তাহা শুনিলে হৃদয়ের করুণারস ও জাগ্রত হয়, তাহাকে কি কাব্য এবং সেই জননীকে কি কবি বলা যাইতে পারে? আমার উত্তর; না। যেহেতু জননীর শোকের কারণ যাহা তাহা কল্পনা-পরিশূন্য ও প্রকৃত ঘটনা মাত্র। তাহা সকলের নিকটে একই। তাঁহার শোক একই। কিন্তু কবির কল্পনা তাহাতে অপরাপর ভাব ও চিন্তা প্রভৃতি সন্নি-

বেশিত করিয়া তাহাকে আর এক প্রকার করিয়া তুলে। কবি কল্পনার গুণে সেখানে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অতএব কেবল মাত্র হৃদয়ের ভাব কবিত্বশক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কল্পনাও একটী প্রধান পদার্থ, কেবল কল্পনাও নহে; কবির অন্তরে আর একটী বিশেষ শক্তির কার্য্য দেখা যায়। তাহা উদ্বোধনী শক্তি অর্থাৎ (Assocation of ideas)। বিকার—গ্রস্ত রোগীর চক্ষের সমক্ষে যেরূপ নানা প্রকার দৃশ্য ভাসিয়া যায়, এই শক্তির প্রভাবে নিমেষের মধ্যে কবির মনে নানা ঘটনা, নানা ভাব, নানা চিন্তা, উদিত হইতে থাকে। অতএব যাঁহাদিগকে কবি বলা যায় তাঁহাদের প্রকৃতির মধ্যে এই তিনটী শক্তি বিশেষ রূপ সতেজ দেখা যায়, "ভাব" "কল্পনা" ও "উদ্বোধন"। পর্য্যায়ক্রমে বলিতে গেলে বলিতে হয় প্রথমে কোন ঘটনা বা বিষয় দেখিয়া কবির মনের কোন ভাবের উদ্রেক হয়, দ্বিতীয়তঃ ভাবের উদ্রেক হইবা মাত্র কল্পনা তাহাকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়া নূতন সাজে সজ্জিত করে; কবি তখন আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই ভাব ও তদুত্তেজক ঘটনাময় হইয়া পড়েন। যদি কোন বীরের বীরত্ব দেখিয়া বা ভাবিয়া তাঁহার ভাবের উদয় হইয়া থাকে, তিনি জগত সংসারের সকল বিষয় ভুলিয়া সেই বীরময় ও বীরত্বময় হইয়া পড়েন; তাঁহার সঙ্গে কখন ও রণযাত্রা করিতেছেন, বা কখনও প্রণয়িনীর নিকট বিদায় লইতেছেন। তাহার কল্পনা এতদূর একপ্রবণ হইয়া উঠে যে তিনি যেন প্রতিপদে সেই বীরের পদচিহ্ন গণনা করিতে থাকেন। কল্পনার এই উদ্রেক নিবন্ধনই কবিরা হৃদয়স্থ ভাব ও ঘটনার একখানি ঠিক ছবি আঁকিতে পারেন। কল্পনার উত্তেজনা হইয়া চিত্ত যখন একপ্রবণ হয় ও সেই ঘটনাকে এক অদ্ভুত স্বতন্ত্র ও নূতন বেশে সাজাইতে থাকে, তখন হৃদয়ের আর এক দ্বার খুলিয়া স্মৃতি শত শত পূর্ব্বানুভূত ভাব ও চিন্তা উপস্থিত করিতে থাকে। পূর্ব্বে যে যে ঘটনাতে যেরূপে ঠিক সেইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল সে সমুদায় ঐন্দ্রজালিকের বাজির ন্যায় দেখিতে দেখিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই শক্তিকে উদ্বোধনী শক্তি বলে, এই শক্তি নিবন্ধন কবিদের রচনাতে উপমা রূপক দৃষ্টান্ত প্রভৃতির সদ্ভাব দেখা যায়।

এইরূপে কল্পনা ও উদ্বোধনের সাহায্য যখন হৃদয়-সাগরে ভাবতরঙ্গ উঠিতে থাকে, তখন কবি তাহা ভাষাতে প্রকাশ করিবার জন্য লেখনী ধারণ করেন। এবিষয়ে ও তিনপ্রকার কার্য্য দেখা যায়। প্রথমতঃ তিনি নিজের ভাবের অনুরূপ কথা মনোনীত করিতে থাকেন, অর্থাৎ যে যে কথা সচরাচর সেইরূপ ভাব প্রকাশার্থ ব্যবহৃত হয়, তাহাই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। এবিষয়ে পটুতা থাকিলে তাঁহার (choice of words)

কথার পছন্দ ভাল বলা যায়। হৃদয়স্থ ভাবের অনুরূপ কথাগুলি মনোনীত হইলে যদি তাঁহার স্বর-চাতুরী বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকে, তাহা হইলে তিনি সেই সমুদায় কথা অতি সুশ্রাব্য ছন্দে গ্রথিত করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ তাঁহার যদি পরিষ্কৃত রুচি থাকে তাহা হইলে তিনি উদ্বোধিত ভাব ও চিন্তা গুলিকে নির্ব্বাচন করিয়া যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিতে পারেন। অকৃত্রিম কবিরা কবিত্বের মূলে এই সকল শক্তি দেখা যায়। এই শক্তি গুলির সমাবেশ হইয়া যে এক প্রকার বিশেষ শক্তি জন্মে তাহাকে কবিত্ব শক্তি বলে। যাঁহাদিগের মানসিক প্রকৃতি এই সকল শক্তিতে নির্ম্মিত নহে, তাঁহারা কবি হইতে পারেন না। তাঁহাদিগকে ইংরাজীতে (prosaic men) বলে। তাঁহারা সচরাচর হৃদয়ের ভাব অপেক্ষা যুক্তির কথা ভাল বাসেন— কল্পনা অপেক্ষা প্রকৃত ঘটনা ভাল বাসেন।

আমরা সচরাচর যাঁহাদিগকে সুকবি বলি এবং যাঁহাদের রচনা বাস্তবিক কাব্য নামে পরিগণিত, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই এই শক্তি গুলি দেখা যায় বটে—কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর কবি আছেন। এক শ্রেণী অকৃত্রিম অর্থাৎ স্বভাব-জাত। অপর শ্রেণী কৃত্রিম অর্থাৎ প্রয়াস-জাত। স্বভাব-জাত কবির ভাবোদ্রেক সর্ব্ব প্রথমে হয় এবং কল্পনা উদ্বোধন প্রভৃতি যাহা কিছু সমুদায় সেই ভাবোদ্রেক নিবন্ধন হইয়া থাকে। প্রয়াস-জাত কবিকে কল্পনা উদ্বোধন প্রভৃতির সাহায্যে ভাবোদ্রেক করিয়া লইতে হয়, এই মাত্র প্রভেদ। আমরা শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেখাইতেছি।

অকৃত্রিম কবি। (Born Poet)

(১ম) কোন ভাবোদ্রেক। (Inspiration)

(২য়) কল্পনার উদ্রেক। (Imagination)—

তাহার ফল;—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি এবং বর্ণনার উজ্জ্বলতা।

(৩য়) উদ্বোধন। (Association of ideas).

ফল;—উপমা, রূপক, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি।

ভাষাসম্বন্ধে।

(১ম) ভাব ও কথার যোগ। (Association between words and sentiments)

ফল;—কথা মনোনীত করা। (Choice of wods)

(২য়) স্বরচাতুরী বিষয়ে অভিজ্ঞতা। (Faculty of Harmony)

ফল;—ছন্দ।

(৩য়) রুচি। (Taste)

ফল;—অলঙ্কারাদি সন্নিবেশ। (Choice of arrangement)

প্রয়াসজাত কবি। (Made poet)

(১ম) কল্পনা।

(২য়) উদ্বোধন।

(৩য়) ভাবোদ্রেক।

ভাষা সম্বন্ধে উভয়ে সমান। স্পষ্ট রূপে উভয়ের প্রভেদ বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়;—অকৃত্রিম কবি ভাব দ্বারা আক্রান্ত হন, আর কৃত্রিম কবি ভাবকে ডাকিয়া আনেন। একজনের হৃদয়-পাত্রের জল স্বভাবতই উষ্ণ এবং আপনাপনি উথলিয়া পড়ে। অপরের হৃদয় পাত্রে তাপ দিয়া জল মুখের নিকট আনিতে হয়। এক জনের কবিতা কেবল চিন্তাদি-মিশ্রিত ভাব অপরের কবিতা ভাব-মিশ্রিত চিন্তা; অথবা মিল যেমন বলিয়াছেন;—একজন কবিতাতে দর্শন করেন এবং কবিতাতেই বর্ণনা করেন, কিন্তু অন্য ব্যক্তি গদ্যে দর্শন করিয়া পদ্যে বর্ণনা করেন। এক জনের হৃদয়-ফোয়ারা হইতে জল উথলিয়া উঠে, ধরিয়া রাখা ভার। অপরের পক্ষে জল চাপ দিয়া তোলা আবশ্যক। এক জনের ভাবের মুখে যে অলঙ্কার, যে দৃষ্টান্ত, কিম্বা যে চিন্তা আসিল তাহা আসিল, নতুবা সে সব দিকে দৃষ্টিই থাকে না; কিন্তু অপরের দৃষ্টি সেই দিকে। অলঙ্কারাদি শুদ্ধ হইল কি না,—দৃষ্টান্তগুলি 'সুসংলগ্ন হইল কি না, তিনি ভাবিয়া থাকেন।

পাঠকগণ! আমার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন? আমরা সচরাচর যাঁহাদিগকে কবি বলি, তাঁহাদের মধ্যে এই দুই শ্রেণীরই লোক আছেন। বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে কবিকঙ্কণ, মাইকেল, মদনমোহন ও হেমচন্দ্র স্বভাবজাত কবি। দৃষ্টান্ত স্থলে যাঁহাদের নাম গৃহীত হইল, ইঁহাদের মধ্যে কোন কোন্ ব্যক্তির প্রতি লোকের অন্য প্রকার ভাব থাকিতে পারে। হয়ত কেহ কেহ ভারত চন্দ্র রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির নাম না দেখিয়া দুঃখিত হইবেন। কেহবা মদনমোহনের নাম দেখিয়া দুঃখিত হইবেন। কিন্তু আমার সংস্কারানুরূপ কথাই বলিয়াছি। ইংরাজী কবিদিগের মধ্যে যদি কাহারও নাম করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা আধুনিকদিগের মধ্যে বরন্স, বাইরন্ ও সেলীর্ নাম করিব। এবং "প্রয়াসজাত" কবির নাম করিতে হইলে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন প্রভৃতির নাম করিব। বোধ হয় উভয়ের প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আর অধিক বর্ণনার আবশ্যক নাই।

যাহা হউক আর দুই একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। অকৃত্রিম কবির হৃদয়ের ভাব যতক্ষণ, বর্ণনার সরলতা, অলঙ্কার, দৃষ্টান্ত প্রভৃতিও ততক্ষণ। এই জন্য যদি তিনি কোন দীর্ঘকালব্যাপী বিষয়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে প্রায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। তদপেক্ষা এক একটি বিষয় লইয়া এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিলে তাঁহার রচনা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও সরস হয়। কৃত্রিম কবি অনুরোধে কবিতা লিখিতে পারেন এবং সে কবিতা ভাল হওয়াও সম্ভব, কিন্তু অকৃত্রিম কবি অনুরোধে

কবিতা লিখিতে গেলে প্রায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। তাঁহাকে ভাবোদ্রেকের (Inspiration) জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। তবে এক এক জন অকৃত্রিম কবিও চেষ্টা দ্বারা সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারেন।

অনুষঙ্গক্রমে এখানে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। উপরে কবির যে ছয়টী গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার দুই একটী লইয়াও অনেকে কবি বলিয়া পরিচিত হন। যেমন, মনে কর, একজনের প্রথম তিনটীর কিছুই নাই। কেবল কথা মনোনীত করিবার শক্তি আছে—স্বর-বোধের ক্ষমতা আছে—এবং সুন্দর রুচিও আছে। এরূপ লোকের রচনা জনসমাজে প্রায় কবিতা বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। আমি এরূপ কবিদিগকে কবিই বলি না।

এখনও আর একটী প্রশ্নের মীমাংসা করা অবশিষ্ট আছে। অবস্থা কিম্বা শিক্ষা নিবন্ধন কবিত্বশক্তির হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভব কি না? ইহার উত্তর এই;—হৃদয়ের ভাব লইয়াই যখন কবির কবিত্ব, তখন সেই ভাবের যদি হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভব হয়, তাহা হইলে কবিত্ব শক্তিরও হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভব। আমরা সচরাচর কি দেখি? আমরা দেখিতে পাই সংসারের চিন্তায়, রোগে, শোকে, নানা কারণে লোকের ভাবের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। কবি যদি সেই সকল অবস্থায় পতিত হন এবং তজ্জন্য তাঁহার হৃদয়-নিহিত ভাবসমূহের যদি কোন পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা হইলে তাঁহার কবিত্ব শক্তিরও পরিবর্ত্তন হয়। যাহাতে তাঁহার হৃদয়ের ভাবসকল সতেজ হয়—তাহাতেই তাঁহার কবিত্বশক্তির উন্নতি; এবং যাহাতে তাঁহার সেই সকল ভাব ম্লান হয়—তাহাতেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির অবনতি। বর্ত্তমান সময়ের জড়-বাদ কবিত্বের পরমশত্রু। এ সময়ের লোকে ভাবের বিকাশ কিম্বা প্রকাশকে দুর্ব্বলতার চিহ্ন এবং পুরুষের অযোগ্য মনে করেন। প্রণয়ে মুগ্ধ হওয়া নিষ্কর্ম্মার কাজ। দরিদ্রের দুঃখে চক্ষের জল ফেলা স্ত্রীলোকের কর্ম্ম। এই ভয়ানক মত দিন দিন প্রচার হওয়াতে কবিতার সমূহ ক্ষতি হইতেছে। জগদীশ্বর যাঁহাদিগকে কবিত্বশক্তি দিয়াছেন—যাঁহাদের হৃদয়কে ভাবের আধার করিয়াছেন—তাঁহারাও ক্রমাগত সেই সকল ভাব দমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কম্‌ত এই মহৎ অনিষ্ট নিবারণের জন্য অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। যে শাস্ত্র হৃদয়কে অসার ও মস্তিষ্ককে সার মনে করে, তাহা ভ্রান্ত শাস্ত্র। এই কষ্ট-দুঃখ-পূর্ণ মানব জীবনের আরামের স্থান কোথায়? পাঠক! কি বলিবে না—হৃদয়ে? নিশ্চয় হৃদয় সেই সুখের স্থান। মানবজীবনকে হৃদয়-শূন্য কর, ইহা আর প্রার্থনার বস্তু থাকিবে না। মিল তর্ক করিয়া স্থির করিয়াছেন, জড় জগৎ কেবল "Permanent Possibility of Sensation" মাত্র; তাহা বলিয়া কি ঐ যুবা পুরুষ উহার প্রণয়ের

অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে Permanent Possibility of sensation বলিয়া বিদায় করিবে—না এই কথা বলিবে ?

সদা হাসি হাসি, কি যে ভাল বাসি,
ওই মুখখানি, দেখিতে তোমার।
দেখিলে হৃদয়, কি জানি কি হয়,
ইচ্ছা হয় দেখি, বসে অনিবার॥
নিকটে আসিয়া, সোহাগে গলিয়া,
প্রেমে মাথাইয়া, যবে কথা কও।
অক্ষরে অক্ষরে, হৃদয়ের তারে,
কি বাদ্য যে বাজে, অবগত নও॥
অলো সুলোচনা, প্রসন্ন-বদনা,
তুমি ত জান না, তুমি যে কি ধন।
প্রেমসুধা দানে, তোষ যার প্রাণে,
সেই জন জানে, তুমি কি রতন॥
হেন ইচ্ছা মনে, লইয়া গোপনে,
বলি গলা ধরি, কথা আছে যত।
কোমল হৃদয়ে, মস্তক রাখিয়ে,
পড়ি ঘুমাইয়ে, জনমের মত॥

ইংরাজী কবি ক্যাম্বেলের ন্যায় ঐ যুবা পুরুষও বলিবে—

"I ask not proud philosophy,
To teach me what thou art."

কবিত্বশক্তির উন্নতিরও দুইটী উপায় আছে। প্রথমতঃ বহুলপরিমাণে অকৃত্রিম কবিদিগের কাব্য পাঠ করা। ইহাতে দুইটী উপকার হয়। প্রথমতঃ ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ের নানা ভাব উত্তেজিত হইতে থাকে, অনেক ম্লানভাব উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এবং অনেক নূতন ভাবের উদয় হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ কথা পছন্দ করিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হয়; ছন্দঃশক্তি বর্দ্ধিত হয়—এবং রুচিও পরিষ্কৃত হইতে থাকে। দ্বিতীয় উপায় তরুণীদিগের সঙ্গ। এটী অনেকের কর্ণে সম্পূর্ণ নূতন কথা। বিশেষ আমাদের দেশে স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধের যে শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে এই উপায়টীর কোন ভাল অর্থ গ্রহণ করা এক প্রকার কঠিন। হয়ত কোন কোন পাঠক আমাকে উপহাস করিতেছেন, উপহাস করুন আর যাহাই করুন, মনুষ্যের হৃদয়ের সহিত রমণীর যে কতদূর যোগ, তাহা আজিও এদেশের লোকে জানেন না। যুবতীদিগের সহবাস বলিলে এই দুর্ভাগ্য দেশে অতি বিকৃত অর্থই বুঝাইয়া যায়, কিন্তু আমি বলিতেছি যে, পবিত্র ভাবে কোন যুবতীকে হৃদয়ের ভালবাসা দেওয়া ও তাঁহার ভালবাসা পাওয়া যে কি ব্যাপার তাহার বর্ণনা হয় না। তাহাতে যে হৃদয়-সাগরে কত তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহা লোকে জানেন না। কম্‌ত তাহা বুঝিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই বোধ হয়, স্ত্রীজাতিকে মানব-সমাজের আরাধ্য দেবতা করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করা উচিত। সকল দেশেই কবিত্ব-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এক এক জন স্ত্রীলোক। সরস্বতী এদেশের দেবতা। ইহার কি কোন অর্থ নাই ?—আছে। ইহাতেই প্রমাণ হয়—রমণীর মুখ দেখিলে যে কবিত্ব-শক্তির বিকাশ হয় তাহা পূর্ব্ব পুরুষেরা ও বুঝিয়া-

ছিলেন; আমিও সে কথা বলিতেছি। রমণীর নির্ম্মল মুখ-চন্দ্রকে যাঁহারা নীচ পশুভাব ভিন্ন অন্যভাবে দর্শন করিতে পারেন না,—সেই নীচ, নরকবাসী, কৃপাপাত্র জীবদিগের কথা আমি বলিতেছিনা—কিন্তু যাঁহাদের চক্ষু পবিত্র ভাবে যুবতীর পবিত্র মুখ দর্শনে সক্ষম তাঁহাদিগকেই এই পরামর্শ দিতেছি। শ্রীশিঃ—

দৃশ্য কাব্য বা নাটক।

প্রথম অধ্যায়।

নাটক কাহাকে বলে?—অভিনয় কি?—অভিনয়ের সূত্রপাত কিরূপ?—অভিনয়ের উপযোগিতা কি?—

আলঙ্কারিকেরা বলেন, কাব্য দুই প্রকার, দৃশ্য কাব্য, এবং শ্রব্য কাব্য। রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ইলিয়েড, ওডিসী, ইনিয়েড, ইন্‌ফারণো, পারাডাইস্ লষ্ট, চাইল্‌ড হ্যারোল্‌ড, রিভোল্‌ঠ অফ ইস্‌লাম প্রভৃতি শ্রব্য কাব্য। শকুন্তলা, উত্তরচরিত, ইডিপস্, ক্লাউডস্, মিডিয়া, জেরুসেলম্, হ্যাম্‌লেট্, ওথেলো প্রভৃতি দৃশ্য কাব্য। সোজাসুজী বলিতে গেলে যাহা শুনিতে হয় তাহাই শ্রব্য কাব্য, যাহা দেখিতে হয় তাহাই দৃশ্য কাব্য।

দৃশ্য কাব্য অভিনেয়। অতীত কোন ঘটনাকে অনুকরণ দ্বারা পুনর্ব্বার দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়ঙ্গম করার নাম অভিনয়। তাহা কিরূপে হয়?——যিনি এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে পারেন, তিনিই নাটকের প্রকৃতিবিশেষ রূপে জ্ঞাত আছেন।—অভিনেয় দৃশ্য কাব্যকেই আমরা নাটক বলিয়া উল্লেখ করিব। ইহাতে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের সহিত আমাদিগের কলহ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও আমরা তাঁহাদের অনুগামী নহি।

অনেকে মনে করেন, জনকতক লোক একত্রে পরস্পর কথোপকথনচ্ছলে কোন ঘটনা বিশেষের বর্ণন করিলেই নাটক অভিনয় হইল। তাঁহাদের ভ্রম। কতিপয় অভিনেতার শুদ্ধ পরস্পর কথোপকথন হইলেই যে নাটক অভিনয় হইল, এবং প্রকৃত নাটক যে ঐরূপ তাহা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারা যায় না। কেবল বাক্য দ্বারা পরস্পরের মনের ভাব প্রকাশ করিলেই অভিনয় হইবেনা। মনের ভাব এরূপে প্রকাশ করিতে হইবে, যাহাতে এক জন অভিনেতার বাক্য অপর অভিনেতার মনের উপর কার্য্য করিতে

পারে, পরস্পরের মন পরস্পরের কথা শুনিয়া ভাবান্তরিত হয়। এরূপে ভাবান্তরিত হয়, যেন দর্শক-মণ্ডলী অনুভব করিতে পারেন। প্রকৃত ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিলে মনের ভাব যেরূপ হইত, অভিনয় কালে সম্পূর্ণ সেইরূপ না হউক, যেন অনেকাংশে সেইরূপ হয়।

তবে নাটকের প্রধান অবয়ব কি?—নাটকের আত্মা কি?—নাটকের আত্মা উদ্যম, চেষ্টা, কার্য্য। ইহার অভাব হইলে নাটকের মনোহারিত্বের অভাব হইল, নাটকত্বের অভাব হইল।

নাটকের মনোহারিত্বের কথায় মনে হইল—নাটকাভিনয় কাহাদের মনোহারী?—যাঁহাদের মনে কার্য্যের অভাব,—যাঁহারা প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের অধীন, যাঁহাদের জীবন কোন গুরুতর অসাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত নহে—তাঁহাদেরই জন্য অভিনয়। সংসারের অধিকাংশ ভাগই এই শ্রেণীর অন্তর্গত, অভিনয় তাঁহাদেরই জন্য।—যাঁহাদের জীবন সর্ব্বদাই কোন না কোন মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত আছে, যাঁহাদের উপর পৃথিবীর উন্নতি অবনতি নির্ভর করিতেছে, তাঁহারা অভিনয় দেখিবেন কি, প্রকৃত অভিনেতার কার্য্য করিতেছেন—সকলে তাঁহাদের অভিনয় দেখিতেছেন।

বাস্তবিকও তুমি আমি অভিনয় দেখিতে যাই কেন? মুখে না বলিতে পারি কাজে কি হয়—হ্যাম্‌লেট্ ও কর্ডিলিয়ার পিতৃভক্তি, ডেস্‌ডেমোনা ও সীতার পতি-অনুরাগ এবং সরলতা, ম্যাক্‌ডফ ও রাক্ষসের প্রভু-ভক্তি, আন্‌টোনিয়োর উদারতা এবং বন্ধুর প্রতি একান্ত অনুরাগ, এসকল আমাদের চিত্তকে এত আকৃষ্ট কেন করে?—আমরা যদি নিজে হ্যাম্‌লেট, কি ম্যাক্‌ডফ, কিম্বা আণ্টোনীয়ো হইতাম, তাহা হইলে কি ইহাদের অভিনয় আমাদের ভাল লাগিত?

প্রকৃত পক্ষে,—মনুষ্য-প্রকৃতির মহত্ত্ব প্রদর্শন করাই নাটকের জীবন। একজনের মহত্ত্ব প্রদর্শন করিতে হইলেই, অপরের নীচত্ব দেখান চাই। এই কারণেই যেখানে হ্যাম্‌লেট, সেই থানেই ক্লডিয়স্; যেখানে কর্ডিলিয়া, সেই থানেই গনারিল এবং রীগান্; যেখানে ডেস্‌ডেমোনা, সেই থানে ইয়াগো; যেখানে ম্যাক্‌ডফ্, সেই থানে লেডী ম্যাক্‌বেথ; যেখানে এণ্টোনিয়ো, সেই থানেই সাইলক্।

যে কবি দৃশ্য কাব্যে কুশল তিনি ঘটনার সার প্রদর্শন করিবেন। সামান্য অসার ক্ষুদ্র ঘটনা সকল পরিত্যাগ করিবেন। তিনি ভক্তি, প্রেম, সরলতা, উদারতা, স্নেহ, প্রভৃতি উন্নত বৃত্তি সকল এবং লোভ, কুটিলতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি নীচবৃত্তি সকলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবেন। যিনি ইহাতে অশক্ত, দৃশ্য কাব্যে হস্তক্ষেপন করা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা।

আচ্ছা, বোকাসিও, সার্ ভ্যান্‌টিস্, ফিল্‌ডিঙ্, স্কট, বুল্‌ওয়ার, প্রভৃতিও ত

এই পথের পথিক, তবে কেন ডিক্যামেরণ, ডন্‌কুইক্‌সো, টম জোন্‌স, আইভ্যান্‌হো, রিয়েন্‌জী, নাটক নহে। আমাদের দুর্গেশনন্দিনীই বা নাটক নহে কেন? নাটকে আর নভেলে তবে ভেদ কি?—

নভেল লেখককে নিজে অনেক কথা না বলিলে চলেনা। নভেলেইবা কি, আর নাটকেইবা কি, বর্ণনীয় ঘটনার শৃঙ্খল অনেক সময়ে স্বভাবতঃ ছিঁড়িয়া যায়, অনেক সময়ে বিযুক্ত থাকে, নভেললেখক সেই ফাক গুলি নিজে যোড়া দেন, নিজের কথায় যোড়া দেন। নাটককার সে গুলি নিজে নিজের কথায় যোড়া দেন না, তাঁহার সৃষ্ট অভিনেতৃগণ সে গুলি যোড়া দেন, তিনি যোড়া দেওয়ান। আইভ্যান্‌হোর অনেক স্থলে স্কট নিজে অনেক ঘটনাশৃঙ্খলের ফাক বোজাইয়াছেন। বঙ্কিম বাবু ও দুর্গেশনন্দিনীতে অনেক স্থলে অন্যের হয়ে নিজে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু হ্যাম্‌লেটে সেক্‌সপীয়ার কোন স্থানেই নিজের মুখে কোন কথা বলেন নাই। সধবার একাদশীতে দীনবন্ধু বাবুও নিজে কোন কথা বলেন নাই।

নভেলে, দেশ, কাল, পাত্র, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সকল বিষয়েরই বিশেষ বিবরণ লেখককে নিজে বলিতে হয়, নাটকে তাহা করিতে হয় না। আলেখ্য (Scene), অভিনেতৃগণের পরিচ্ছদ, তাহাদের যথোপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি, সময়োচিত স্বর-বৈলক্ষণ্য প্রভৃতি এই কার্য্য সম্পন্ন করে। দুর্গেশনন্দিনীতে অভিনেতৃগণকে বঙ্কিম বাবু নিজে সাজাইয়াছেন, সধবার একাদশীতে অভিনেতৃগণ আপনারাই সাজিয়াছে। দুর্গেশনন্দিনীতে কে কখন্ কোথায় আছে শুদ্ধ এই দেখাইতে বঙ্কিম বাবুকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। সধবার একাদশীতে দীনবন্ধু বাবুকে তাহা করিতে হয় নাই, চিত্রকরের তুলিকা তাঁহার হইয়া সে কাজ করিবে।

ক্রমশঃ।

শম্ভু সিংহ।

তৃতীয় অধ্যায়।

পরিচয়।

পথিকের চলৎশক্তি রহিত প্রায়,—অপরিচিত পুরুষ তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী একটী ঘরে বসাইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। পথিকের অনভিমত হইলেও অপরিচিতের আদেশে এক জন পরিচারক আসিয়া পথিকের বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করা-

ইয়া দিল। আর একজন কিছু আহারীয় আনিয়া দিল। পথিক কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। আহার করিয়া নিকটবর্ত্তী শয্যায় শয়ন করিলেন। এক জন পরিচারক তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল। পথিক নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করিলেন, চক্ষে নিদ্রা আসিল না। তাঁহার মন চিন্তায় পরিপূর্ণ। নিদ্রা না হউক, তাঁহার শরীর এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ হইয়াছে। আহার ও বিশ্রামে, ক্লান্ত দেহ আবার সবল হইয়াছে। এখন আর কথা কহিতে তাঁহার ক্লেশ বোধ হইতেছে না।

পার্শ্বস্থ পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এসংসারে কত দিন আছ?" —পরিচারক স্বভাবতঃ সরল-চিত্ত—সরল ভাবেই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিল "আমি বাল্যকালাবধি এই সংসারেই আছি। আমার বাপও এই সংসারে চাকরি করিয়া বুড়ো হইয়াছেন।" পরিচারকের ভাষা ঠিক এমন নহে, মেদিনীপুর জেলার উত্তর পূর্ব্ব ভাগের অশিক্ষিত লোকেরা যে ভাষায় কথা বার্ত্তা কহে, সে সেই ভাষাতেই কথা কহিল। কিন্তু আমার যাঁর কাছে শোনা, তিনি সে ভাষায় আমার নিকট গল্প করেন নাই, তিনি সাধারণ চলিত ভাষায় গল্প করিয়াছিলেন। আমি তাঁহারই ভাষা ব্যবহার করিলাম। পরেও যখন যখন আবশ্যক হইবে, আমাকে তাঁহার ভাষাই ব্যবহার করিতে হইবে।

পথিক ভৃত্যকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার প্রভুর নাম কি? তিনি কোন্ জাতি?" ভৃত্য ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিল—"আপনি কি তা জানেন না, উনিইত আপনাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন?"—পথিক বলিলেন না—আমি তাঁহাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করি নাই।" ভৃত্য আর কিছু না বলিয়া কহিল "মহাশয়! আমার প্রভুর নাম শক্রসিংহ।"

শক্রসিংহ—এই নাম শ্রবণমাত্রেই পথিকের চক্ষু স্থির, হৃদয় স্তম্ভিত,—তিনি শক্রসিংহকে বিলক্ষণ চিনিতেন। কেইবা তাঁকে না চিনিত? শক্রসিংহের নাম বহুদেশ-খ্যাত। একশত বৎসরেরও অধিক কাল গত হইয়াছে, এখনও শক্রসিংহের নাম অনেকেই জানেন। পথিক পরিচারককে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না। তাঁহার মন চিন্তায় নিমগ্ন হইল, তিনি নয়ন মুদ্রিত করিলেন। পরিচারক মনে করিল, তিনি ঘুমাইয়াছেন। হস্তের পাখা সেই স্থানেই রাখিয়া পরিচারক চলিয়া গেল। পথিকের মনে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। তিনি মুদ্রিত নয়নে সেই চিন্তা-স্রোতে গা ঢালিলেন।

"শক্রসিংহ—যাঁর প্রবল প্রতাপ দেশ-প্রথিত, যাঁর ভয়ে দুরন্ত মহারাষ্ট্র-সেনাও সর্ব্বদা শশব্যস্ত, যিনি একাকী এই উত্তর-পূর্ব্ব মেদিনীপুর, রক্ষিত করিতেছেন, সেই মহাবীর শক্রসিংহই কি ইনি? আমি কি তবে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়াছি?

এই কি তাঁহার দুর্গ? শক্রুসিংহের দুর্গ কি এত ক্ষুদ্র, এমন সুখপ্রবেশ্য? যাঁর শত্রু চতুর্দ্দিকে, যিনি দুরাত্মা যবন ও দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয় উভয়েরই বিদ্বেষপাত্র—তাঁহার ভবনে একজনও প্রহরী নাই! যাঁহার দেহ সর্ব্বদাই অরাতি-অস্ত্রের লক্ষ্য, যাঁহার কাটামুণ্ডের মূল্য দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা, যে মুণ্ড দেখিবার জন্য নৃশংস যবন-চক্ষু নিরন্তর লালায়িত, তাঁহার শরীররক্ষক একজনও নাই! তিনি একাকী নিরস্ত্র বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন! ইহা যে মনে করিলেও শরীর লোমাঞ্চিত হয়!"

পথিকের মনে প্রথমতঃ এই চিন্তা-তরঙ্গ উত্থিত হইল, বিজয়সিংহের মনকে এই চিন্তাই প্রথমতঃ বিলোড়িত করিল। এখন অবধি আমি পথিককে নাম ধরিয়া ডাকিব, তাঁহার নাম বিজয়-সিংহ। পথিক সেই নামেই শক্রুসিংহের নিকট পরিচিত হইয়াছেন, সেই নামেই তিনি পাঠকদিগের নিকটেও পরিচিত হউন।

বিজয়সিংহের মনের প্রথম চিন্তা-তরঙ্গ ক্রমে বিলীন হইল, মন একটু প্রশান্ত হইল। কিন্তু সে শান্তি ক্ষণিক। তৎক্ষণাৎ আর একটী তরঙ্গ আসিয়া তাঁহার চিত্তকে উচ্ছলিত করিল। "লোকে বলে শক্রুসিংহ একজন দস্যু, পরধন অপহরণ করিয়া, পরকে পীড়া দিয়াই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয়, তিনি কতক গুলো দস্যুর অধিপতি, তাহাদের সাহায্যেই, এ প্রদেশে আধিপত্য করিতেছেন। এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক—শক্রুসিংহের মূর্ত্তি দেখিলে তাঁহাকে কোন মতেই একজন দস্যু বলিয়া বোধ হয় না, শক্রু সিংহের মন নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, ইহা তাঁহার সতেজ চক্ষু ও বিশাল ললাটে স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে। নীচাশয় দস্যুর কখনই এরূপ হয় না; তবে লোকে কেন ইঁহাকে দস্যু বলে?—লোকে যাই বলুক শক্রুসিংহকে আমি কোন মতেই দস্যু মনে করিতে পারি না, ইনি একজন প্রকৃত বীর পুরুষ। তেজস্বী বীর পুরুষে ও নৃশংস দস্যুতে অনেক প্রভেদ"—বিজয়সিংহের দ্বিতীয় চিন্তা-তরঙ্গ এই খানে বিলীন হইল।

শক্রুসিংহের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বিজয়সিংহের মন আত্ম-চিন্তায় নিবিষ্ট হইল। "শক্রুসিংহের ভবনে কি এক দিনের অধিক অবস্থান করা উচিত?—এখানে বিলম্ব করিবার কি প্রয়োজন? কল্য প্রাতেই এ স্থান হইতে যাত্রা করিব। এখানে থাকিয়াই বা ফল কি? তা হলে কি আমার স্বকার্য্য-সাধনের কোন রূপ সুবিধা হইবে? শক্রুসিংহ কি আমার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইবেন? তিনি কেনই বা আমার সাহায্য করিবেন?—শক্রু-সিংহকে কি আত্ম-পরিচয় প্রদান করিব?—তাতেই বা ফল কি? আমার হৃদয়ের গুরুভার হৃদয়েই অবস্থিতি করুক, কাহাকেও তাহার অংশী হইতে দিব না। আর কেই বা অংশ গ্রহণ করিবে?—ইচ্ছা

পূর্ব্বক কেই বা গরল ভক্ষণ করিবে?”

বিজয়সিংহ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, অপরিস্ফুট বাক্যে এই কথা গুলি উচ্চারণ করিতেছেন, তাঁহার চক্ষু দুটি স্থির, ঠিক যেন কাচে নির্ম্মিত। বিস্ফারিত নেত্র ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত, যেন কি দেখিতেছেন—দেখিবেনই বা কি? নয়নপথে কিছুই নাই। অধর-প্রদেশ দন্তাগ্রভাগ দ্বারা অল্পে অল্পে দংশন করিতেছেন, দীর্ঘ নিশ্বাস—পড়িতে চেষ্টা করিতেছে, তিনি তাহাকে দমন করিতেছেন। তাঁহার হৃদয় হইতে শোক-স্রোত বেগে বহির্গত হইতে চেষ্টা করিতেছে, তিনি ও প্রাণপনে নিবারণ করিতেছেন।—আর পারিলেন না। অভ্যাস যতই বলবান্ হউক না কেন, স্বভাবের নিকট অবশ্যই পরাজিত হইবে। বিজয়সিংহ আর স্বভাবের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্তিমিত নেত্রে জল আসিল। বিজয়সিংহের চক্ষু হইতে অশ্রুবর্ষণ হইল!——প্রকৃতির চমৎকার শক্তি, অসীম তুষার-রাশিও সূর্য্যের উত্তাপে বিগলিত হয়!

বিজয়সিংহের হৃদয়ের এরূপ ভাব অধিক ক্ষণ রহিল না। শিক্ষাবলে তাঁহার হৃদয় আবার তৎক্ষণাৎ স্থির ভাব ধারণ করিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। বাহিরে গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন দাস আসিয়া তাঁহাকে শক্রসিংহের সেলাম জানাইল। বিজয়সিংহ সেই পরিচারকের সঙ্গে বাটীর ভিতরে গমন করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

আতিথ্য-স্বীকার।

বিজয়সিংহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বাটীর বাহিরেও যেমন একতল গৃহ, ভিতরেও সেইরূপ। একতল ঘর গুলি দেখিতে অতিশয় মজবুত। উঠানটী অতিশয় প্রশস্ত, উঠানের চারি দিকেই ঘর। পরিচারক বিজয় সিংহকে উত্তরের ঘরে লইয়া গেল। সেই ঘরেই শক্রসিংহ আছেন। বিজয় শক্রসিংহের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

ঘরটী চুনকাম করা। বাটীর ভিতর দিকে দুইটী জানালা, বাহির দিকে কোনরূপ আলোক-পথ নাই। ঘরে ঢুকিতেই সম্মুখের দেওয়ালে এক খানি চিত্রপট। শিব-বক্ষে কালী-মূর্ত্তি বিরাজিত। পটের গায়েতেই এক খানি নিষ্কোষ অসি ঝুলিতেছে। তাহার নিকটে সেই রুদ্রাক্ষমালা রহিয়াছে। দেওয়ালের আর এক দিকে এক তুণীর তীর ও এক খানি বৃহৎ ধনু, লম্বমান। ঘরের মধ্যে আর কোন অস্ত্র কি গৃহ-সজ্জা দৃষ্ট হইল না। এক খানি প্রশস্ত তক্তপোষে শয্যা বিস্তৃত। শক্রসিংহ শয্যায় অর্দ্ধশয়ান। একটী উন্নত তাকিয়ায় ঠেশ দিয়া রহিয়াছেন। বিজয়কে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। বিজয়কে শয্যার এক পার্শ্বে বসিতে কহিলেন। বিজয় উপবেশন করিলেন।

শক্রসিংহ বিজয়কে জিজ্ঞাসা করি-

লেন " শরীর কিছু সুস্থ হইয়াছে'ত ?"—শত্রুসিংহের এই বাক্যটী বিজয়ের কর্ণে অতিশয় মিষ্ট লাগিল। তাঁহার ভাব যেন স্নেহপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। বিজয় বাক্য-স্ফূর্ত্তি না করিয়া মস্তক-চালনা দ্বারাই উত্তর দিলেন। শত্রুসিংহ বিজয়কে বলিলেন, "আপনাকে দিন কতক এখানে অবস্থিতি করিতে হইবে, কএক দিনের বিশ্রামে শরীর সুস্থ ও সবল হইবে, তার পর আপনার গন্তব্য স্থানে গমন করিবেন"।

বিজয় শত্রুসিংহের কথার উত্তর দিলেন না। শত্রুসিংহের যেরূপ সস্নেহ ভাব তাহাতে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করা নিতান্ত অভদ্রের কাজ। আবার কি বলিয়াই বা তিনি শত্রুসিংহের আলয়ে অধিক দিন থাকেন। তাঁহার কি অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে ? অভীষ্টসিদ্ধির কি কোন উপায় স্থির করিতে পারিয়াছেন ?—না।—তবে এখানে থাকিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা কি তাঁর উচিত ? এখনকার এক দিন এক বৎসর—এক যুগ। এখনকার সময় নষ্ট করা নিতান্ত অনভিজ্ঞের কাজ। মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিতেছেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। শত্রুসিংহ আবার বলিলেন "আমার বাটী আপনি নিজের বাটী মনে করিবেন, আমার দাস দাসী আপনার নিজের দাস দাসীর তুল্য, এখানে থাকিতে আপনি কিছুমাত্র সংকুচিত হইবেন না।"

বিজয় শত্রুসিংহের কথা আর এড়াইতে পারিলেন না। কএক দিবস তাঁহার ভবনে থাকিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। শত্রুসিংহও আর কিছু বলিলেন না। তিনি অধিক কথার লোক নহেন। তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইল, কথাও বন্ধ হইল। উভয়েই ঘর হইতে বাহির হইলেন। উভয়েই সদর বাটীতে আগমন করিলেন। নিয়মিত সময়ে ভোজনাদি সমাপন করিয়া উভয়েই নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। আজ হইতে বিজয় শত্রুসিংহের পরিবারের মধ্যে একজন গণিত হইলেন। পরিচারকেরা তাঁহাকে আপন প্রভুর মতন শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে লাগিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাবলপুর।

বিজয়সিংহ শত্রুসিংহের ভবনে রহিলেন। সেখানে কেমন থাকেন, কি করেন, ক দিন থাকেন, আমাদের এখন সেনে কাজ নাই। চল আমরা স্থানান্তরে যাই। চল মহাবলপুরে যাই। দেখিগে সেখানকার অবস্থা কি ? —একি ! মহাবলপুরে সহসা এমন ভাব কেন ? চতুর্দ্দিকে আনন্দধ্বনি, চতুর্দ্দিকে উৎসব-চিহ্ন! এর কারণ কি ?——কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি, সকলেই অপরিচিত। চল দেখি একবার রাজভবনের দিকে যাই। দেখিগে বৃদ্ধ রাজা কি করিতেছেন। এই যে সম্মুখেই রাজভবন।

রাজভবনটী অতি প্রশস্ত। একটী

বৃহৎ মাঠ যোড়া। মাঠটী প্রায় অর্দ্ধক্রোশ। চতুর্দ্দিকে প্রাচীর। চারি ধারে চারিটী তোরণ। আমরা এখন দক্ষিণ ধারের তোরণ-সন্নিধানে উপস্থিত। চল তোরণ-দ্বার অতিক্রম করি।—সম্মুখেই যে দুই জন প্রহরী। তবে কি রাজভবনে প্রবেশ নিষেধ? কৈ না—সকলেরই অবারিত দ্বার।—আজি যে রাজভবনে উৎসব। ঐ শোন নহবৎ বাজিতেছে।—কিসের উৎসব?—রাজভবনে যে লোকের মহা সমারোহ।—চলনা আমরাও এই সমারোহে মিশি।

সংসারের ত গতিই এইরূপ, আমাদের ত প্রকৃতিই এই। আমরা যেখানে সমারোহ সেই খানেই গিয়া মিশি। সমারোহ সুখেরই হউক আর দুঃখেরই হউক আমরা গিয়া মিশি। এই জন্যেই ত বিবাহের মজলিসে এবং শ্রাদ্ধের সভাতেও আমাদের দেখিতে পাও। বিচারালয়েও ত এই জন্যেই আমরা গিয়া থাকি। লোকের ফাঁশি হইতেছে, আমরা দেখিতে যাই। কেন যাই? সেখানে মহা সমারোহ। বাস্তবিকও অনেক লোককে একত্রে দেখিলে মনে একটু আনন্দের সঞ্চার হয়, একটু উৎসাহ হয়। এবং সেই সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছা হয়। কেন হয়?—তা আমি জানি না—বলিতেও পারি না। যাঁরা আমার অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ তাঁরাই বলুন। যাঁরা নূতন চিন্তা ভাল বাসেন, নূতন ভাবের আবির্ভাবে যাঁদের মন সর্ব্বদাই অভিভূত, যাঁরা সকই নূতন দেখেন, নূতন শোনেন, নূতন পড়েন, তাঁরাই বলুন।—একত্রে অনেক লোকের সমাগম দেখিলে আমাদের মনে কেন আনন্দের সঞ্চার হয়, ইহার নিগূঢ় কারণ তাঁহারাই জানেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। আমি বলি, সেটি আমাদের স্বভাব। অধিক বলিবার আমার সাধ্য নাই। এই স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই চল আমরা রাজভবনে প্রবেশ করি।

ষষ্ট অধ্যায়।

মহাবলসিংহ।

বৃদ্ধ রাজা মহাবলসিংহ সভায় আসীন। সভাগৃহটী বিলক্ষণ প্রশস্ত। দ্বারদেশে নকীব ফুকরাইতেছে। রাজা মধ্যস্থলে গদীর উপর বসিয়া আছেন। শুনিয়াছি রাজাদের রাজসিংহাসন, কই তাত দেখিতে পাইলাম না! সমগ্র রাজবেশে রাজার অঙ্গ ভূষিত। চতুর্দ্দিকে সভাসদ্‌মণ্ডলী, চারিজন সশস্ত্র প্রহরী রাজার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছে।

মহাবল সিংহের বয়স প্রায় পঁয়ষট্টী বৎসর। তথাপি অঙ্গ সকল বিলক্ষণ সতেজ। মস্তকের কেশ কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু সে বর্ণ কৃত্রিম। দন্তগুলি এখনও বিগলিত হয় নাই। এটী তাঁর বড় সৌভাগ্য। শ্মশ্রু মুণ্ডিত। গলায় মুক্তার মালা বিরাজ করিতেছে। মহাবলসিংহের বর্ণ গৌর, কিন্তু মুখে কান্তির লেশমাত্র নাই।

দেখিলে ভক্তি হওয়া দূরে থাকুক আন্তরিক অশ্রদ্ধা জন্মে। মুখের ভাব দেখিলেই বোধ হয় যে তিনি বিলাসের দাস। বৃদ্ধ বয়সে ভোগলালসা তাঁহার চক্ষু দিয়া ফুটে বাহির হইতেছে।

রাজা মন্ত্রীর সহিত কি পরামর্শ করিতেছেন? মন্ত্রী মহাশয়ের আকার প্রকার বেশভূষা প্রায় প্রভুর অনুরূপ। না হওয়াই বিচিত্র।—দুই জনে কাণে কাণে পরামর্শ হইতেছে। কি পরামর্শ হইতেছে, শুনিতে পাওয়া যায় না। "বি—বা—হ—হাঁ—অ—তি—শী—ঘ্র," এই কয়েকটী কথা অতি অস্ফুট রূপে কর্ণগোচর হইল মাত্র।

সভাস্থগণের মধ্যে সকলেরই মুখ অতি প্রফুল্ল। রাজার মুখ প্রফুল্ল—সকলেরই মুখ প্রফুল্ল হওয়া চাই। নহিলে রাজভক্তির অন্যথা হইবে। রাজার কোপদৃষ্টিতে পড়িতে হইবে। একজনকে এমন দেখ্‌ছি কেন? এমন আনন্দের ভিতরে একজনের মুখ এমন বিমর্ষ কেন? এ যুবাপুরুষটী কে?

যুবক তুমি কি কারণে এমন বিষণ্ণবদন? সভাস্থ সকলেরই ত হাসি হাসি মুখ, তুমিও কেন হাস না? তোমার মন যদি না হাসিতে পারে, মুখের হাসি ত হাসিতে পার? তুমি কি তাহা শিক্ষা কর নাই? যদি না শিখিয়া থাক, তবে এ সংসারে তোমার সুখের সম্ভাবনা নাই। তোমার বৃথাই জীবন।—না—তোমার মুখ দেখিয়াই বোধ হচ্চে তুমি এখন সংসারের নিগূঢ় তত্ব অবগত হও নাই। তোমার সরল মন এখনও সরল আছে। বল দেখি তুমি এমন বিষণ্ণ কেন? তোমার বিশাল ভ্রূযুগল এমন আকুঞ্চিত কেন? আয়ত নেত্রদ্বয় এমন নিম্নদিকে নিক্ষিপ্ত কেন? তুমি কি দেখিতেছ? তুমি কে?—পরিচারকেরা তোমাকে সমাদর করিতেছে কেন? তুমি ত কিছুর মধ্যেই নও, তবে তাহারা তোমাকে ভয় করিতেছে কেন? ভাল এখন থাক, তোমার পরিচয় পরে জানিতে পারিব। অনেকটা এখনই জানিতে পারিয়াছি।

ঐ দেখ সভা-ভঙ্গের উদ্যোগ। বহির্দ্দেশে দুন্দুভিধ্বনি, রাজা সভা ভঙ্গের ইঙ্গিত করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। মহাবলসিংহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ।



কেন দেখিলাম?

১

কেন দেখিলাম,—
বিস্তৃত সরসীমাঝে, বেষ্টিত শৈবালরাজে,
রক্ষিত ভুজঙ্গদন্তে ফুল্ল কমলিনী,
কেন দেখিলাম সেই সর-সোহাগিনী?

২

কেন দেখিলাম,—
ভীষণ নিবিড় বনে, বসিয়া কণ্টকাসনে,
বেষ্টিয়া কণ্টকজালে কানন-প্রসূন,
কেন দেখিলাম ওই কণ্টকে কুসুম?

৩

কেন দেখিলাম,—
অনন্ত জলধিতলে, অনন্ত তরঙ্গদলে,
আস্ফালিয়া ফণা যারে করেছে রক্ষণ,
কেন দেখিলাম হেন সমুদ্রে রতন?

৪

কেন দেখিলাম,—
ঘনঘটা ঘোররণে, ভীম ঘন গরজনে,
নাচে যথা রণরঙ্গে শূন্য-বিহারিণী,
কেন দেখিলাম সেই চলসৌদামিনী?

৫

কেন দেখিলাম,—
জিনি সর-সোহাগিণী, জিনি বন-সুশোভিনী,
জিনি রত্নাকর-রত্ন, বিদ্যুত-বরণ,
কেন দেখিলাম প্রিয়ে তব চন্দ্রানন?

৬

কেন দেখিলাম,—
নহে গবাক্ষের দ্বারে,—নহে সরোবরপারে,
নহে কুঞ্জবনে,—নহে কুসুম-কাননে,
নহে কালিন্দীর তীরে কুটিল নয়নে,—
নহে জুলিয়েট,—
নহে বিদ্যা রূপবতী,—নহে শকুন্তলা সতী,—
নহে কুলকলঙ্কিনী ব্রজবিলাসিনী;—
পর্ণকুটীরের দ্বারে—সরলা কামিনী!

৮

যেই দেখিলাম,—
নন্দন-সৌরভরাশি,—স্বর্গীয় সঙ্গীতে ভাসি,
পূশিল হৃদয়ে সেই সুকোমল ধ্বনি,
উন্মত্ত হইনু, মত্তা হইল রমণী।

৯

অয়স্কান্ত মণি,—
আকর্ষিল লৌহ হায়! আর নাহি সহা যায়,
হইল যুগল-চিত্ত প্রেমস্রোতাধীন;
হৃদয়ে হৃদয়ে সুখে হইল বিলীন!

১০

নীরব প্রকৃতি;—
সন্ধ্যা-সমীরণে ধীরে, কাঁপাইছে বংশশিরে,
নীরবে করিছে কেলি বৃক্ষপত্রদলে,
কিম্বা ওই বারি-কক্ষ-রমণী-অঞ্চলে।

১১

হায়! সে সময়ে,
হৃদয়ের যন্ত্রদ্বয়, একত্রে হইয়া লয়,
আনন্দে বাজিতেছিল, যে সুখ-সঙ্গীত,
কে বুঝিবে? যে বুঝিবে, সে হবে মোহিত।

১২

হায়! এ সঙ্গীত,—
লতাগৃহ-অন্তরালে, দাঁড়ায়ে মধ্যাহ্নকালে,
শুনিতে শুনিতে প্রিয়া-প্রণয়-লিখন,
বুঝেছিল এসঙ্গীত দুষ্মন্ত তখন।

১৩

এ সঙ্গীতস্বরে,
উন্মত্ত হেমলেট হায়! মৃত প্রেয়সীর পায়ে,
বর্ষেছিল পুষ্পচয় "মধুরে মধুর"
বুঝেছিল এ সঙ্গীত বিরহ-বিধুর!

১৪

ভীষণ শ্মশানে,
তরঙ্গ-আহত-তীরে, ভাসিয়া নয়ন-নীরে,
ধরি অভাগিনী-ভার্য্যা-কর-সুকোমল,
বুঝেছিল হায়! নবকুমার বিহ্বল।

১৫

"টাইবর-জলে,—
হ'ক্ রোম নিমগন," বলেছিল যেইক্ষণ,
মৈসরীর প্রেমে মত্ত বীরচূড়ামণি,
বুঝেছিল এ সঙ্গীত অভাগা এণ্টনি।

১৬

সামান্য সঙ্গীতে
কেড়ে লয় হরিণীর, কণ্ঠহার—কবে নীর
নিরেট পাষাণ যদি; তবে কি বিস্ময়,
যথা প্রেম যন্ত্র, যন্ত্রীমানব-হৃদয়!

১৭

মুহূর্ত্তেক হায়!—
মুহূর্ত্তেক প্রেমভরে, হৃদয়ে হৃদয় ধরে,
মুহূর্ত্তেক এসঙ্গীত সুখে শুনিলাম,
মুহূর্ত্তেক পরে স্বপ্ন হৈল অন্তর্ধান!

১৮

"মনে রাখিবেন"—
শুনিলাম বীণাধ্বনি; হৃদয়েতে প্রতিধ্বনি,
ভাসিতে লাগিল ধ্বনি সন্ধ্যাসমীরণে,
কতবার শুনিলাম "রাখিবেন মনে"।

১৯

রাখিবেন মনে!
কেমনে রাখিব মনে?—রাখি যদি প্রাণপনে,-
কিসে মগ্ন তৃণ, স্রোত করিবে ধারণ,
প্রিয়ে তব রূপ স্রোত, তৃণ মম মন।

২০

সেই স্রোতে হায়!
ভাসায়ে দিয়াছি মন, নাহি সাধ্য নিবারণ,
করি তারে, নাহি জানি ভাবি পরিণাম,
সদা ভাবিতেছি হায়! কেন দেখিলাম।

শ্রীনঃ—

আর্য্যগণের আয়ুর্ব্বেদ।

প্রথম অধ্যায়।

সূচনা।

প্রাচীন মহর্ষিগণ আপনাদের চিকিৎসা শাস্ত্রকে "আয়ুর্ব্বেদ" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য রুগ্ন ব্যক্তির রোগ-শান্তি ও সুস্থশরীরীর স্বাস্থ্য-রক্ষা এবং যে শাস্ত্রে আয়ুর বিষয় বর্ণিত এবং আয়ুর বর্দ্ধনোপায় প্রদর্শিত আছে—তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ কহে *। এইটী আয়ুর্ব্বেদের বিশদ ও বিস্তীর্ণ লক্ষণ নহে।

* ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদ-প্রয়োজনং ব্যাধ্যুপসৃষ্টানাম্ব্যাধিপরিমোক্ষঃ স্বাস্থ্যস্য রক্ষণঞ্চ।

কিরূপ নিয়মে থাকিলে জীবন সুখময় হইবে, নিয়ম লঙ্ঘনে কতদূর ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, জীবনের সুখই বা কি, দুঃখই বা কি, আয়ুর পরিমাণ কত এবং আয়ু কাহাকে বলে এই সমস্ত বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহার নাম আয়ুর্ব্বেদ †।

আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ, ব্রহ্মার মুখ-বিনির্গত। ব্রহ্মা প্রজাপতিকে, প্রজাপতি অশ্বিনীকুমারকে, অশ্বিনীকুমার ইন্দ্রকে, এবং ইন্দ্র মহর্ষিগণকে, আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন ¶। বেদ নিত্য, বেদের স্রষ্টা কেহই নাই, ব্রহ্মার মানসক্ষেত্রে বেদ সকল স্বয়ংই উদিত হইয়াছে। বেদের বাক্য অলঙ্ঘনীয়। বেদ-সকলে যাঁহাদের অশ্রদ্ধা, বেদ-প্রদর্শিত পথ হইতে যাঁহারা চ্যুত এবং বেদোক্ত ধর্ম্মে যাঁহাদের অনাস্থা তাঁহারা নাস্তিক। আয়ুর্ব্বেদও সেই বেদ। আয়ুর্ব্বেদে চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই বর্ণিত আছে এবং তৎসমুদায় অভ্রান্ত ও আদরণীয়। ইহাতে চিকিৎসা-বিষয়ক যাহা নাই, তাহা কোথাও নাই।

এইটি প্রাচীন ঋষিগণ ও তদধস্তন আর্য্য সন্তানগণের মত। বাস্তবিকও তত্তৎ সময়ে এইরূপ মত কল্পনা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। তখন অধিক-সংখ্যক লোক অজ্ঞানান্ধ। কেবল মহর্ষিগণই অধ্যয়নে নিমগ্ন। সে সময় কোন বিষয় প্রচারিত করিতে হইলে তাহা দেব-নির্ম্মিত ও অলোকসামান্য বলিয়া নির্দ্দেশ না করিলে অনভিজ্ঞ লোকদিগের মনে বিশ্বাস জন্মিবে কেন? যাহা হউক এ সকল কথা লইয়া অধিক তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন নাই। আমাদের উদ্দেশ্যও তাহা নহে। আমরা প্রাচীন মহর্ষিগণকে যথেষ্ট ভক্তি ও সমাদর করি, তাঁহাদের যুক্তিপূর্ণ বাক্যে নিরতিশয় শ্রদ্ধা রাখি, কিন্তু তাঁহারা যাহা কিছু বলিবেন, সমুদায় কথাই যে আদর ও শ্রদ্ধার জিনিস হইবে তাহা কেমন করিয়া বলিব।

আমাদের উদ্দেশ্য আর্য্যগণের আয়ুর্ব্বেদের তথ্যানুসন্ধান। আয়ুর্ব্বেদ কত কালে সংগৃহীত হইয়াছে, কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, কোন্ সময়েই বা উন্নতির চরম সীমা এবং কোন্ সময় হইতেই বা অবনতি হইতেছে, এই সমস্ত বিষয়ের আমরা অনুসন্ধান করিব। কতদূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না।

আয়ুর্ব্বেদে এখন যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা এক জনের পরিশ্রমের ফল নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। মনুষ্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই রোগের আবি-

---

আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে অনেন বা আয়ুর্ব্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ। সুশ্রুত, সূত্রস্থান ১ম অধ্যায়।

† হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতং মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে। চরক, সূত্র স্থান ১ম অধ্যায়।

¶ সুশ্রুত সূত্রস্থান প্রথম অধ্যায় দেখ।

ভাব। আদিম অসভ্যাবস্থায় প্রতীকার-বিরহে সামান্য সামান্য রোগেও কত শত লোকের প্রাণ বিনাশ হইয়াছে। সুখের ইচ্ছা মনুষ্যের স্বাভাবিকী। আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না—তখন প্রতীকারের চেষ্টা হইতে লাগিল। শরীরের কিঞ্চিন্মাত্র ভাবান্তর হইলেই আহারে অস্পৃহা হয়, যতক্ষণ শরীরে রোগ থাকে ততক্ষণ অন্নে রুচি হয় না। দেখিল অনাহারেই রোগ-শান্তি হইতেছে। অতএব অনশনই রোগের ঔষধ। (সকল রোগের কথা বলিতে পারি না, কোন কোন রোগে ঔষধ হইতে পারে বটে)। এই জন্যেই প্রাচীন ঋষিগণ জ্বর প্রভৃতি রোগের আমাবস্থায় অর্থাৎ প্রথমে লঙ্ঘন ব্যবস্থা করিয়াছেন *। লঙ্ঘনেও রোগের শান্তি হয় না, উদরের, হৃদয়ের ও মস্তকের গুরুতা থাকে, হয়ত স্বভাবতঃ ভেদ হইয়া উদরের গুরুতা নষ্ট হইল। বমন হইয়া হৃদয়ের গুরুতা গেল, এবং নাসিকা দ্বারা শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া মস্তকের ভার রহিল না। কিন্তু যেখানে স্বভাবতঃ উল্লিখিত কার্য্য সফল হইল না, সেখানে সেই সেই কার্য্য সাধনের উপায় আবশ্যক।—অনুসন্ধান হইতে লাগিল, কোন্ দ্রব্য-ভক্ষণে বিরেচন হয়, কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে বমন হয়, কোন্ দ্রব্য ব্যবহার করিলেই বা মস্তকের শ্লেষ্মা নির্গত হয়। অনুসন্ধান সফল হইল। কিন্তু আবার যখন দৃষ্ট হইল, যে বিরেচন, বমন ও শিরোবিরেচনে (নস্য) সকলের রোগ-শান্তি হয় না (কোন কোন স্থলে হয় বটে) কেবল শরীরের লঘুতা মাত্র উৎপাদন করে, তখন রোগ-শান্তির উপায়ান্তরের চেষ্টা হইতে লাগিল।—বিবিধ ওষধি-পূর্ণ হিমালয়-প্রকোষ্ঠ, নানা-তরু-লতা-বিভূষিত বিস্তীর্ণ গাঙ্গেয় প্রদেশ এবং খণি-বিরাজিত-বিন্ধ্যাচল-বিভাগ; মহর্ষিগণ সমুদয় আলোড়িত করিলেন। অন্যের দুঃখ-মোচন ও আত্ম-দীর্ঘ-জীবন কামনায় প্রোৎসাহিত হইয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। সকল দ্রব্যই তাঁহাদের নিজ শরীরে পরীক্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের যত্নের ফল ও যথেষ্ট ফলিয়াছিল। কি কায়-চিকিৎসা কি শল্য-চিকিৎসা—উভয় বিষয়েই তাঁহারা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। এই উন্নতি এক দিনের নহে,—এক সময়েরও নহে। মহর্ষিগণ যে কত শত বৎসর অনুসন্ধান করিয়া রত্নসকল সংগ্রহ করিয়াছেন, কে বলিতে পারে? তাঁহারা কুথিত দুর্গন্ধ-ময় বীভৎসাকার মৃত শরীরের কুচী দ্বারা ত্বকাদি উত্তোলন করিয়া, শিরা স্নায়ু প্রভৃতি দর্শন করিতেন।* অধিক কি কহিব মধুমেহের মূত্র পর্য্যন্তও আস্বাদ করিতেন।† কিন্তু প্রকৃত

* জ্বরে লঙ্ঘনমেবাদাবুপদিষ্টমিত্যাদি। চক্রদত্ত-কৃত-সংগ্রহঃ।

* সুশ্রুত শারীরস্থান ৫ম অধ্যায়ের শেষ দেখ।

† রসনেন্দ্রিয়-বিজ্ঞেয়াঃ প্রমেহাদি-রস-বিশেষাঃ। সুশ্রুতঃ সূত্রস্থানং ১০ম অধ্যায়ঃ।

কথা বলিতে হইলে সে উন্নতি কেবল উন্নতির সোপান-শ্রেণীর প্রথম সোপানমাত্র। এক্ষণকার পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিশারদেরা প্রাচীন গ্রীকদিগের, আর্য্যদিগের এবং মধ্য সময়ের স্পর্শ-মণি-অনুসন্ধিৎসুদিগের (Alchemists) মূল সোপান অবলম্বন করিয়া সোপান-শ্রেণীর কতদূর উন্নতি করিয়া তুলিয়াছেন!—অনুরাগ ও অধ্যবসায়ে কি না হয়?—যদি মহর্ষিগণের ন্যায় তদধস্তন আর্য্য-সন্তানেরা উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে আপনাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতির চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কি আয়ুর্ব্বেদের এই অবস্থা থাকিত? বোধ হয় পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের সহিত সমকক্ষ হইয়া চলিতে পারিত।

মহর্ষিগণ রোগসকলকে আপনাদিগের তপো-বিঘ্নকারী এবং ইতর জনগণের সংহারক প্রবল শত্রু মনে করিয়া তাহাদের পরাজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রথমতঃ অনায়াস-লভ্য মৃদুবীর্য্য বৃক্ষলতাদি দ্বারা রোগ শান্তির চেষ্টা হইতে লাগিল। ক্রমশঃ রোগ সকল যত প্রবল ও দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইতে লাগিল, ততই তীক্ষ্ণবীর্য্য বিষাদি এবং খনিজ ধাতু ও উপধাতু সকলের প্রয়োজন হইতে লাগিল। এইরূপে ঔষধ সকলের সংগ্রহ এবং রোগ সকলের লক্ষণানুসারে শ্রেণী-বিভাগ হইতে লাগিল। যখন মেধা ভারবহনে অসমর্থা হইলেন, তখনই বহুকালের আয়াসের ফল চিরস্থায়ী করিবার জন্য লিখন আরম্ভ হইল।

চরক ও সুশ্রুতই মহর্ষিগণের অপ্রতিম অধ্যবসায়ের ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল-যুগল। চরক ও সুশ্রুতই তাঁহাদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভদ্বয়। চরক ও সুশ্রুতের পূর্ব্বে আর্য্যদিগের রীতিমত কোন চিকিৎসাগ্রন্থ ছিল কি না তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। অথর্ব্ববেদের কোন কোন উপনিষদে * চিকিৎসা শাস্ত্রের দুই এক কথা আছে বটে কিন্তু তাহা চরকসুশ্রুতের পূর্ব্বের কি পরের তাহার নিশ্চয় নাই। উপনিষদের এবং চরক ও সুশ্রুতের ভাষা প্রায় একরূপই বোধ হয়। কিন্তু ভাষা দ্বারা পৌর্ব্বাপর্য্যনির্ণয় করা অতি কঠিন।

সুশ্রুতের সূত্র স্থানের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে—স্বয়ম্ভু প্রজা-সৃষ্টির পূর্ব্বে অধ্যায়-সহস্রে বিভক্ত এবং লক্ষ-শ্লোকসম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি করেন †। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে, (ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি করুন বা নাই করুন) যে, চরক ও সুশ্রুতের পূর্ব্বে বৈদিক ভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্র ছিল। হয়ত তাহা চরক ও সুশ্রুতের আবির্ভাবে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আমরা ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের চি-

* গর্ভোপনিষদ্ ও শারীরোপনিষদ্।

† ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোক-শত-সহস্রমধ্যায়-সহস্রঞ্চ কৃতবান স্বয়ম্ভুঃ।

কিৎসা-শাস্ত্রের—বাল্য, প্রৌঢ়, জরা, ও মরণ এই চারিটি অবস্থা কল্পনা করিব। বাল্যাবস্থা চরক ও সুশ্রুতের পূর্ব্বাবস্থা, সে অবস্থার বিষয় আমরা কিছুই বলিব না। কারণ আমরা তাহার বিষয় কিছুই জ্ঞাত নহি, তাহার চিহ্নও কিছু প্রাপ্ত নহি। কেবল অনুমান করিয়াই এ অবস্থা কল্পনা করিতেছি মাত্র। যেহেতু চরক ও সুশ্রুতই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির চরম সীমা। তাহাদের পূর্ব্বে কিছু না থাকিলে একেবারেই কিছু চরক ও সুশ্রুত হয় নাই।

চরক ও সুশ্রুতই আয়ুর্ব্বেদের প্রৌঢ়াবস্থা। চরক সুশ্রুতই আয়ুর্ব্বেদের পূর্ণাবস্থা। এই সময়েই আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সর্ব্বায়বে সম্পূর্ণ,—এখনই আয়ুর্ব্বেদ প্রৌঢ়, এখনই আয়ুর্ব্বেদ অধ্যবসায়শালী, এখনই আয়ুর্ব্বেদ সজীব এবং এই সময়েই আর্য্যদিগের চিরলালিত বৃক্ষের শুভ ফল ফলিয়াছিল।

চরক ও সুশ্রুতের পরেই—আয়ুর্ব্বেদের জরা অর্থাৎ অবনতির অবস্থা। এখন আয়ুর্ব্বেদ জীর্ণ, শীর্ণ, উৎসাহ-বিহীন এবং নির্জ্জীব। এখন আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিকল এবং অবসন্ন। এই সময়ে সুখাভিলাষী আর্য্যগণ কঠোর-ব্রত-ধারী পিতামহগণের পদবী পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদের সঞ্চিত রত্ন সকল বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা না করিয়া, অনায়াস-লব্ধ পিতৃধনের ন্যায় উপভোগ করিতে লাগিলেন। আয়ুর্ব্বেদ-তত্ত্বের অনুসন্ধান রহিত হইল। চরক ও সুশ্রুত হইতে সংকলিত গ্রন্থসকল বহির্গত হইতে লাগিল। প্রথম-সংকলিত গ্রন্থ বাগ্‌ভট-কৃত "অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতা"। এই সংহিতায়—চরক ও সুশ্রুতে যাহা আছে তদ্ব্যতীত নূতন কথা কিছুই নাই। ইহা কেবল উভয়ের সারসংগ্রহমাত্র। কোন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় বৃদ্ধ বাগ্‌ভট নামে এক খানি গ্রন্থ ছিল। কিন্তু তাহা এক্ষণে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় সেখানিও বাগ্‌ভটের গ্রন্থের ন্যায় সংকলিত গ্রন্থ মাত্র। বাগ্‌ভটের গ্রন্থের পর বহুতর গ্রন্থ সকল সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু সে সকল গ্রন্থও কেবল মূল গ্রন্থদ্বয়ের ছায়া মাত্র।

ইহার পর আয়ুর্ব্বেদের মরণ অর্থাৎ নির্জ্জীব অবস্থা। এখন আয়ুর্ব্বেদ মৃত শরীরের ন্যায় স্পন্দ-রহিত, চেষ্টা-রহিত ও সংজ্ঞা-রহিত। আয়ুর্ব্বেদের এই অবস্থা বর্ত্তমান সময়ে। এখন আয়ুর্ব্বেদ-সম্পর্কে কোন নূতন গ্রন্থ হওয়া দূরে থাকুক, যাহা কিছু আছে তাহাও করাল-কাল-গ্রাসে পতিত হইতে চলিয়াছে। এ অবস্থাকে আয়ুর্ব্বেদের মৃত্যুর অবস্থা বৈ আর কি বলিব? আমাদের পিতামহগণ—প্রাচীন আর্য্যগণ—যে অমূল্য রত্ন সকল—বহুযত্নে, বহু কষ্টে, ফলমূলাহারে জীবন ধারণ করিয়া সঞ্চিত করিয়াছিলেন, তাহা কিছু দিন পরে নাম-মাত্রাবশিষ্ট হইবে, ইহা মনে করিতে হইলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়।—এমন কি কেহ বংশধর নাই যে তিনি পৈতৃক রত্ন সকল কালের মুখ হইতে কাড়িয়া লয়েন?

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমরা এই অধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদের যে চারিটী অবস্থার সূচনা করিলাম, পরে তাহা সবিস্তর বলিব। আয়ুর্ব্বেদ-সম্পর্কীয় যাহা কিছু বলিবার আবশ্যক, তৎসমুদয়ও বলিবার আশা রহিল। শ্রীব্রঃ—

মধুমক্ষিকাদংশন।

১

একদা মদন করিয়ে যতন,
বাছি বাছি তুলি কুসুম-রতন,
শয়ন রচিলা মনের মতন,
শয়ন-সন্তোষ লাভের তরে;
অতি অনুপম সে ফুল-শয়ন
হইল, দেখিলে জুড়ায় নয়ন,
সুরভি-নিকরে ভরিল ভুবন,
শুইলা মদন তাহর'পরে।

২

ঘুমের ঘোরেতে হয়ে অচেতন,
মুদিয়ে নয়ন রহিলা মদন;
ফুলদল-তলে শোভিল বদন,
তারাপতি যথা তারার মাঝ।
ক্ষণকাল পরে আসব-আশায়,
মধুমাছি এক আসিল তথায়,
বসিল কুসুমে, সুখেতে যথায়
শয়িত আছেন মদনরাজ।

৩

ঘুমঘোরে কাম নড়িলা যেমন,
মধুমাছি-দেহে বাজিল চরণ;
রাগ-ভরে মাছি সবলে তখন
ফুটাইল কাম-চরণে হুল;
অধীর হইয়ে বিষের জ্বালায়,
উঠি রতিপতি ছুটিয়ে পালায়,
প্রিয়তমা রতি বসিয়ে যথায়,
গাঁথিতেছিলেন মালতী-ফুল।

৪

"অয়ি প্রিয়তমে!" কহিলা রতিরে
রতিনাথ "প্রাণ যায় যে,—অচিরে
ফেল ফুলমালা, চেয়ে দেখ ফিরে,
একি জ্বালা, উহু, হইল হায়!
কেন শুইলাম বিছা[illegible] ফুল?
তাই মধুমাছি ফুটাইল হুল,
বিষের জ্বালায় হয়েছি আকুল,
কি হবে—কি করি—প্রাণ যে যায়!"

৫

ব্যথিত হৃদয়ে, অথচ হাসিয়ে,
কহে কামে রতি-সমীপে আসিয়ে,—
"ছোট মধুমাছি দিয়েছে বিঁধিয়ে
বিষভরা হুল তোমার পায়;
তাই তুমি, নাথ! হইলে কাতর?
ভাল, বল দেখি দাসীর গোচর,
কতই জ্বলিবে তাহার অন্তর,
পঞ্চশর তুমি বিঁধিবে যায়?"

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এই কিশোর বয়সে ঐতিহাসিক গ্রন্থের ন্যায় কবিতামালাও তাঁহার লেখনী হইতে প্রসূত হইত। তবে এই দুয়ের প্রভেদ এই যে, প্রথমটী তাঁহার স্বাভিলষিত বিষয় আর শেষোক্তটী তাঁহার আদিষ্ট বিষয়। ইতিহাস-রচনায় পিতা তাঁহাকে কখনই উত্তেজিত করিতেন না। কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইতিহাস লিখিয়া কেহ কখন সাধারণের প্রীতিভাজন হইতে পারেন না। কিন্তু পুত্র সাধারণের প্রীতিভাজন হন, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল।—কোন্ পিতাই না ইহা ইচ্ছা করেন?—তিনি জানিতেন পুত্র সুকবি হইলে তাঁহার সেই ইচ্ছা ফলবতী হইবে। এই জন্য তিনি পুত্রকে সতত কবিতা-রচনার প্রবর্ত্তিত করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পুত্র স্বাভাবিক--কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন না। এই জন্য পিতার উত্তেজনা তাঁহার পক্ষে কেবল ক্লেশকর হইয়া উঠিত। এবং তদ্রচিত কষ্টকল্পিত কবিতা কেবল ছন্দোময়ী রচনায় পরিণত হইত মাত্র। পিতার উত্তেজনার আর একটী কারণ এই, তিনি জানিতেন অনেক বিষয় গদ্য অপেক্ষা পদ্যে লিখিলে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। লেখকের মত সর্ব্বপ্রচারি করিতে হইলে পদ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু পিতার সেই সমস্ত আশাই বিফল হইল,—পুত্র কিছুতেই সুকবি হইতে পারিলেন না! পিতা পুত্রের হস্তে হোমার, হোরেস, সেক্‌পিয়র, মিল্‌টন্, টম্‌সন্, পোপ, গোলড্‌স্মিথ, বরন্, গ্রে, কাউপার, বিয়েটী, স্পেন্‌সার, স্কট, ড্রাইডেন, প্রভৃতি বিখ্যাতনামা কবিদিগের গ্রন্থ সকল প্রদান করিলেন। পুত্র সকলগুলিই পড়িলেন, কোন কোন খানির রস-গ্রহ করিলেন, কোন কোন খানির অনুকরণে কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার ছন্দোময়ী রচনা কিছুতেই কবিতা হইল না! হইবেই বা কেন? অনুকরণে কবি হইলে এতদিন জগৎ কবিময় হইয়া উঠিত!

শৈশবের এই সময়ে পরীক্ষা-বিষয়ক বিজ্ঞান (experimental science) তাঁহার আর একটী প্রমোদ-স্থল ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এরূপ দুরূহ বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে করিতে পারেন নাই। তিনি কেবল পুস্তকে সেই সকল বিষয় পাঠ করিতেন মাত্র। কিন্তু কখন পরীক্ষা দ্বারা সেই সকল বিষয় প্রতিপন্ন করিয়া লন নাই। জয়েস-লিখিত "বৈজ্ঞানিক-আলোচনা" এবং পিতৃবন্ধু ডাক্তার টম্‌সন্ লিখিত "রাসায়নিক গ্রন্থ" এই দুই

এখানেই বিশেষ রূপে তাঁহার হৃদয়াকর্ষণ করিয়াছিল।

এই স্থানেই তাঁহার শৈশব-শিক্ষা সমাপ্ত হইল। তিনি দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া এক্ষণে শৈশব হইতে বাল্যে পদার্পণ করিলেন। যে সকল বিষয় চিন্তাশক্তির সাহায্যে অবগত হওয়া যায়, এক্ষণে সেই সুকোমল বিষয় সকল আর তাঁহার পাঠনার বিষয় রহিল না। যে সকল বিষয় চিন্তাশক্তির বিশেষ উদ্দীপক সেই সকল বিষয়ই এক্ষণে তাঁহার পাঠ্য বিষয় হইয়া উঠিল। তিনি এক্ষণে ন্যায়শাস্ত্রের (Logic) আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ন্যায়সম্বন্ধীয় তাঁহার প্রথম পাঠ্যপুস্তক অর্গেনন্ (Organon)। পিতৃদেব পুত্রকে অর্গেননের সঙ্গে সঙ্গে লাটিন নৈয়ায়িকদিগের সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে আদেশ করেন। মিল্ সেই গুলি পড়িয়া তাহাদিগের স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত, ভ্রমণকালে পিতার নিকট বলিতেন। অনন্তর তিনি বিখ্যাত-দার্শনিক-হবস্-লিখিত "কম্পিউটেসিও সিভ লজিকা" (Computatio sive Logica) নামে একখানি উচ্চ-অঙ্গের ন্যায়গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার পিতার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, সুতরাং তিনি পুত্রকে এইখানি পড়িতে বিশেষ অনুরোধ করেন। মিল্ স্বভাবতঃই চিন্তাপ্রবণ ছিলেন, এই জন্য ন্যায়শাস্ত্র তাঁহার অতিশয় ভাল লাগিত। ন্যায়-শাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় পরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিল। ন্যায়ের সাহায্যে তাঁহার স্বাভাবিকী চিন্তা-প্রবণতা অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইল। তিনি এক্ষণে গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। তাঁহাদিগের যুক্তির উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করিতেন, এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগের মত খণ্ডন করিয়া তত্তৎস্থলে স্বমত সংস্থাপন করিতেন।

এই সময়েই তিনি সুবিখ্যাত গ্রীক-বক্তা ডিমস্থিনিসের "ফিলিপিক্স" নামে বিখ্যাত বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ডিমস্থিনিসের বক্তৃতা পাঠ করিয়া মিল্ এথিনীয় রীতি, নীতি, সমাজ-পদ্ধতি, ও রাজনীতির বিষয় সবিশেষ অবগত হন। এই সময়েই তিনি টাসিটস্, জুভিনাল্, এবং কুইন্‌টিলিয়ান প্রভৃতি লাটিন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থসকল পাঠ করেন। এই সময়েই তিনি প্লেটো-লিখিত "জর্জিয়াস," "প্রোটাগোরাস" এবং "সাধারণতন্ত্র" পড়িতে আরম্ভ করেন। জেম্স মিল্ আত্ম-শিক্ষার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্লেটোর নিকটই বিশেষ ঋণী ছিলেন। তাঁহার মতে প্লেটো-লিখিত ডায়েলগ্ গুলি (Dialogues) না পড়িলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। এই জন্য তিনি তরুণ-বয়স্ক ছাত্রমাত্রকেই সেই সুবিখ্যাত গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন। এবং এইজন্যই তিনি পুত্রকেও সেই সকল গ্রন্থে বিশেষরূপে দীক্ষিত করেন। পুত্রও পিতার ন্যায় সেই

সকল গ্রন্থে বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে মিল্ এক বিষম বিপদে পড়িয়াছিলেন। যৎকালে তিনি প্লেটো ও ডিমস্থিনিস্ অধ্যয়ন করেন, সেই সময় তাঁহার ধীশক্তি অধিকতর পরিণত হওয়ায় পিতা তাঁহাকে আর পূর্ব্বের মত প্রত্যেক বাক্যের অর্থ বুঝাইয়া দিতে বাধ্য করিতেন না। বুঝিবার ভার পুত্রের নিজের উপর নির্ভর করিয়া, ঐক্ষণে তিনি উচ্চারণ লইয়া বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। তিনি পুত্রকে সেই সকল পুস্তক স্পষ্টরূপে ও উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে বলিতেন। মিল্ চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কিছুতেই পিতার ইচ্ছামত পড়িতে পারিতেন না। পিতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইতেন। এই ঘটনা মিলের অতিশয় ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।　　ক্রমশঃ।

*আশার ছলনা।

আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে!
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,—
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন; হীনবল দিন দিন,
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? একি দায়!

২

রে প্রমত্ত মন মম, কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবিরে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম-ভাতি
কত কাল রবে?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কিরে ঝল ঝলে?
কে না জানে অম্বু মুখে অম্বু বিম্ব সদ্যঃপাতি!

৩

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে!
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধারে
পথিকে ধাঁধিতে!
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষা-ক্লেশে;—
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

৪

বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ অন্বেষণে—
সে সাধ সাধিতে?
ক্ষতমাত্র হাত তোর মৃণাল কণ্টকগণে,
কমল তুলিতে!
নাবিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী!
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে?

৫

যশোলাভ লোভে আয়ুঃ কত যে ব্যয়িলি, হায়,
কব তা কাহারে?
সুগন্ধ-কুসুম-গন্ধে অন্ধকীট যথা ধায়
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়েরে অনুক্ষণ!
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে, অনিদ্রায়!

* আমরা মৃত মহাত্মা কবিবর মধুসূদন দত্তের ক্লার্ক মহাশয়ের নিকট হইতে এই অপ্রকাশিত কবিতাগুলি প্রাপ্ত হইয়া মৃত কবির প্রতি ভক্তির চিহ্নস্বরূপ সাধারণকে উপহার দিতেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সাধারণে অতি সমাদরে ইহা গ্রহণ করিবেন।

সভ্যতার ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সৌভাগ্যক্রমে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে ইউরোপ খণ্ডে কয়েক জন তত্ত্বজিজ্ঞাসু মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা ইতিহাসশাস্ত্রের অঙ্গহীনতা ও অসম্পূর্ণতার বিষয় সবিশেষ অনুভব করিয়া উহার প্রশমনার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। সুতরাং অল্পলোকের চেষ্টায় কি রূপে এরূপ মহৎ কাণ্ড সম্পাদিত হইবে? এই সময়ের মধ্যে ইউরোপে যাবতীয় ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই এক খানি ব্যতীত কোন খানিকে প্রকৃত ইতিহাস-শব্দে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়না।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর সমুদয় স্থানেই প্রকৃত ইতিহাস রচনা করিবার অশেষবিধ উপকরণ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু আমাদিগের চেষ্টার অভাবে সেই সকল উপকরণ সত্ত্বেও আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছিনা। প্রকৃত ইসিহাসের উপকারিতা বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। অতএব এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে যাহাতে আমরা অবিলম্বে প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজ সকলের উপকার সাধনে সমর্থ হই, আমাদের তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রগাঢ় চর্চ্চাদ্বারা যেরূপ তাবৎ প্রাকৃতিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, সেইরূপ ইতিহাস শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইলে. আমরা এরূপ নিগূঢ় সামাজিক তত্ত্বসকলেরও ব্যাখ্যা সুন্দররূপে করিতে সমর্থ হইব। যে গুলি আপাততঃ অসম্ভব ও অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যদি যথার্থ বুদ্ধিমান্ ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এবিষয়ে অনুরাগী হয়েন, তাহা হইলে অতি অল্পকালের মধ্যেই ইতিহাসশাস্ত্রের ভূয়সী উন্নতি সাধিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, কি আমাদের দেশে কি ইউরোপখণ্ডে কোন স্থানেই কখনই কোন প্রগাঢ় ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি এবিষয়ে মনোনিবেশ করেন নাই। যাঁহারা ইতিহাসের চর্চ্চা করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেপ্‌লার বা নিউটনের ন্যায় প্রগাঢ় ব্যক্তি একজনকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার যদিও কেহ না কেহ কখনও ইতিহাসের উন্নতিসাধনার্থ দৃঢ়ব্রত হয়েন, তথাপি বিজ্ঞানশাস্ত্র অপেক্ষা ইতিহাসের চর্চ্চা করা এত অধিক দুরূহ যে কেবল দুই এক জনের চেষ্টায় কোন প্রকারে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। এই সকল কারণেই ইতিহাস অপেক্ষা বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের

সম্যক্ চর্চ্চা ও উন্নতি হইয়াছে। বিজ্ঞান শাস্ত্রে প্রকৃতি-পর্য্যালোচনা দ্বারা নিরূপিত তত্ত্ব সকল সপ্রমাণ করিতে পারা যায়, এবং ভূয়োদর্শন দ্বারা সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক নিতান্ত কঠিন বিষয় সকলেরও সম্যক্ ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়, কিন্তু ইতিহাস শাস্ত্রে এরূপ কোন প্রকারে সুবিধা নাই। পুরাবৃত্ত-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াই লোকে মনে করিতে পারে, যে প্রাকৃতিক পদার্থ সমুদয় যে রূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন, মানুষিক বিষয় সকল সেরূপ নহে। মনুষ্যসমাজ একরূপ বা অন্যবিধ আকার ধারণ করিবে। ঈশ্বরেচ্ছাই তৎসমুদয়ের প্রকৃত নিয়ামক, সুতরাং আমরা যতই পর্য্যালোচনা ও অনুসন্ধান করি না কেন, আমরা বিজ্ঞান-শাস্ত্রের ন্যায় কখনই ইতিহাসের উন্নতি-সাধন করিতে সমর্থ হইব না। কিন্তু কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, এরূপ সংস্কার ভ্রান্তিমূলক। ফলতঃ বিজ্ঞান শাস্ত্রের নিরূপ্য বিষয় সকল যেরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন, ইতিহাসের বিবেচ্য বিষয় সকলও অবিকল সেইরূপ। এই প্রতিজ্ঞার যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে পারিলে ইতিহাসের উন্নতি-সাধন-কল্পে অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারা যাইবে। অতএব আমরা ইহার যাথার্থ্য ও সারবত্তা সপ্রমাণ করিতে বিশেষ যত্ন করিব।

মানুষিক ও সামাজিক ঘটনা সকল কিরূপে সংঘটিত হয়, কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের ফলস্বরূপ না ঘুণাক্ষরে ঐ সমুদয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এ বিষয়ে দুইটী পৃথক্ মত আছে। কেহ কেহ বলেন, প্রত্যেক মানুষিক ঘটনাই স্বতন্ত্র, কোন মানুষিক ঘটনার সহিত অপর ঘটনার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। ঘটনা সকল কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর অধীন নহে, কেবল ঘুণাক্ষরেই সমুদয়—উদ্ভূত হইয়া থাকে। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে অতি সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে, এরূপ মত নিতান্ত ভ্রান্তি-সঙ্কুল। আমাদের দৈনন্দিন ভূয়োদর্শন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যৎকালে মনুষ্য রীতিমত সমাজবদ্ধ হয় নাই, যখন তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, তাহারা নিরন্তর এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করিত, ও যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল প্রভৃতি আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত, তাৎকালিক সমাজের রীতিনীতি আহার ব্যবহার প্রভৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এরূপ প্রতীতি হইতে পারে বটে, যে মনুষ্য-সমাজ প্রাকৃতিক পদার্থের ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন নহে। মনুষ্যের আহার ব্যবহার প্রভৃতি তাবৎ বিষয়ই কেবল অন্ধ যদৃচ্ছার অধীন। কিন্তু যখন মনুষ্য পূর্ব্বোক্ত রূপ অনির্দ্দিষ্ট অবস্থা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহারা বুঝিতে পারে যে তাহাদের জীবন-ধারণোপযোগী সামগ্রী সকল তাহাদের

পরিশ্রমের নিয়মিত ফল, তাহারা যে শস্যের বীজ-বপন করে তাহাই ফলস্বরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাদের জীবনধারণার্থ আবশ্যক তাবৎ সামগ্রীই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী হইয়া উঠে। ফলতঃ এরূপ অবস্থায় তাহারা নানাবিধ পদার্থের পরস্পর সাদৃশ্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কার্য্যকারণ-ভাব প্রভৃতি নানা বিধ নিয়মের উদ্ভাবনা করিতে সমর্থ হয়। অধিক কি এরূপ অবস্থায় মনুষ্য ক্রমশঃ ভবিষ্যতের প্রতি নেত্রপাত করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে কালসহকারে মনুষ্য প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের স্থায়িতার বিষয় অবগত হইয়া থাকে এবং ক্রমে যত অগ্রসর হইতে থাকে ততই ভূয়োদর্শনদ্বারা এই সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইতে থাকে। পরে আরও অধিক অগ্রসর হইলে বিশেষ বিশেষ ঘটনা সকলের মধ্যে সাদৃশ্যাদি সম্বন্ধ অবলোকন পূর্ব্বক মনুষ্য সাধারণ্য সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অসভ্য অবস্থায় লোকে এইরূপ মনে করিত যে তাবৎ পরিদৃশ্যমান ব্যাপারই কেবল যদৃচ্ছার ফল। কিন্তু সমাজের উন্নতি সহকারে এরূপ ভ্রমের নিরাস হইয়া থাকে ও লোকে বুঝিতে পারে যে ঘটনা সকল কার্য্যকারণ ভাব প্রভৃতি নানাবিধ সম্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ। বোধ হয় এই দুই প্রকার সিদ্ধান্ত হইতেই কালক্রমে ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যবাদ ও অদৃষ্টবাদ এই দুইটী অপেক্ষাকৃত অধুনাতন মত উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে। সমাজের উন্নতিসহকারে মনুষ্যের মত কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে তাহা বুঝিতে পারা দুরূহ ব্যাপার নহে। যখন কোন দেশে অধিবাসীদিগের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন সঞ্চিত হয়, যখন এক এক ব্যক্তির পরিশ্রম হইতে এত অধিক উৎপন্ন হইতে থাকে যে তদ্দ্বারা তাহার নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষণ হইয়াও যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বৃত হয়, তখন আর তত্তদ্দেশের প্রত্যেক অধিবাসীকেই জীবিকা নির্ব্বাহার্থ পরিশ্রম করিতে হয় না। একের পরিশ্রমের ফলভোগ করিয়া অন্য লোকেও জীবন ধারণ করিতে পারে সুতরাং এরূপ অবস্থায় অনেকেই জীবিকা-নির্ব্বাহার্থক পরিশ্রম হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, কেহ বা ইচ্ছাপূর্ব্বক বিরত হইয়া আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতে থাকে, কেহ বা আমোদ প্রমোদে মনোনিবেশ না করিয়া জ্ঞানের চর্চ্চা ও বিস্তৃতি করিবার উদ্দেশে পরিশ্রম করিয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞানপক্ষপাতী ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার প্রকৃতির বাহ্যমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যের আন্তরিক প্রকৃতির তথ্যানুসন্ধানার্থ যত্নবান্ হয়েন। এই প্রকার মহাত্মাদিগের অসাধারণ ক্ষমতা ও অধ্যবসায়ের প্রভাবেই নূতন নূতন দর্শন ও ধর্ম্ম উদ্ভাবিত ও প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু এই সকল অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের উদ্ভাবয়িতারাও তত্তৎকালের রীতি নীতি প্রভৃতি প্রবল সাধারণ মতের

বশবর্ত্তী। প্রবল সাধারণ মতের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করা নিতান্ত অসম্ভব। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, যে আমরা যে সকল দর্শন ও ধর্ম্ম প্রভৃতিকে নূতন পদার্থ বলিয়া মনে করি, তৎসমুদয়ের মধ্যে বাস্তবিক কিছুমাত্র নূতন পদার্থ নাই। তৎসমুদয় কেবল সমুদয় সমাজব্যাপী নানাবিধ মতের সমষ্টিমাত্র। কিন্তু এরূপ কৌশল ও নিপুণতার সহিত সংগৃহীত যে উহারা সামান্য লোকের হস্তে পতিত হইয়া কখনই বিপথগামী হইতে পারেনা।

ক্রমশঃ।

পরিবারবর্গ।

পরিবারবর্গের অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের পরস্পর সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য বিষয়ে দুই একটী কথা বলা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। আমরা সেকেলে লোকের ন্যায় পরিবার শব্দের এরূপ বিস্তৃত অর্থ করি না যে, যে কোন ব্যক্তির সহিত শোণিত-সম্বন্ধ বা যৌন-সম্বন্ধ আছে, তৎসমস্তই পরিবার পদের বাচ্য হইতে পারে। পক্ষান্তরে ইংরাজের অনুকরণপ্রিয় আধুনিক ইয়ংবেঙ্গলের ন্যায় পরিবার শব্দকে ফ্যামিলির প্রতিরূপ করিয়া কেবল স্ত্রী পুত্র বাটী বলিয়া স্বীকার করিতেও আমাদের ইচ্ছা হইতেছে না। আমরা পরিবারবর্গের এই মানে বুঝি, যাহাদের সহবাস ও ভরণপোষণ, সামাজিক ও নৈতিক নিয়মানুসারে অপরিহার্য্য, তাহারাই পরিবার শব্দের প্রতিপাদ্য। আমরা কতিপয় ব্যক্তির সহিত এক বাসাতে অবস্থান করি; কিন্তু তাঁহাদের ভরণের জন্য দায়ী নহি। অতএব তাঁহারা পরিবার নহেন। আমরা দীন ব্যক্তিকে স্বাবাসে আশ্রয় দিয়া রাখিতে পারি। কিন্তু সে কেবল শ্রদ্ধার পাত্র, আমরা তাহার প্রতিপালনের জন্য বাধ্য নহি। অতএব আশ্রিত যে সেও পরিবার নহে। পক্ষান্তরে বৃদ্ধ পিতা মাতার সহিত আমাদের একত্র বাস না ঘটিতে পারে। আমরা স্ত্রী পুত্র লইয়া বিদেশে কর্ম্মস্থানে রহিয়াছি; পিতা মাতা গৃহে অবস্থান করিয়া আছেন। অথবা আমরা বাটীতে রহিয়াছি; বৃদ্ধ পিতা কাশীবাসী হইয়াছেন। এস্থলে একত্র বাস না হইলেও পিতা মাতা পরিবারে অন্তর্ভূক্ত। গৃহস্থিত কিঙ্করের সহিত সম্বন্ধ চুক্তি-মূলক। তথাপি সে যত দিন আমাদের আবাসে থাকিয়া পরিচর্য্যা করে, ততদিন তাহাকেও পোষ্য ও পরিবারের মধ্যে গণ্য বলিয়া বিবেচনা করা উচিত।

অনেকে পরিবার শব্দটীকে এত সহজ ও সামান্য বলিয়া বিবেচনা করেন, যে ইহার অর্থ লইয়া এত পীড়াপিড়ি দেখিয়া বৃথা আড়ম্বর ভাবিতে পারেন। কিন্তু

ইহা যে, সংসারের যত বস্তুকে আমরা স্থায়ী বলিয়া বোধ করি তাহাদের স্বরূপও সম্বন্ধ দেশ, কাল, ও সভ্যতা অনুসারে সততই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং পরিবার পদের অর্থ এই নিয়মের প্রত্যুদারণ হইতে পারেনা। বিশেষতঃ আমাদের দেশে সমাজ ও রাজনীতি,—এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিতেছে। প্রথমতঃ সমাজ কি বলিতেছেন, তাহা স্থির করা যাউক। প্রাচীন আর্য্য কাহাকে পরিবার বিবেচনা করিতেন, সম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, যে তিনি পিতা মাতা এবং স্ত্রী পুত্রের ন্যায়, শিষ্য ও দাসকেও পরিবারবর্গের অন্তর্গত মনে করিতেন। সবর্ণার ন্যায় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রাও তাঁহার ভার্য্যা হইতে পারিত। ঔরস, দত্তক ও কৃত্রিম পুত্রের ন্যায় তিনি ক্ষেত্রজ, কানীন ও পৌনর্ভব পুত্রও লাভ করিতে পারিতেন। স্থলবিশেষে কন্যাকে পুত্রিকা কল্পনা করিয়া বংশ রক্ষার চেষ্টা দেখিতেন। "পুত্রঃ পিণ্ড-প্রয়োজনঃ" অতএব যে কোন রূপে পুত্রবান্ হইতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। তিনি বসন, ভূষণ ও মিষ্ট বাক্য দ্বারা ভার্য্যাকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা উচিত মনে করিতেন। কারণ তাঁহার মতে ভার্য্যা শরীরার্দ্ধ ও পুণ্যাপুণ্য-ফলের সমাংশভাগিনী। এবং যাঁহার গৃহে স্ত্রী সন্তুষ্ট মনে বাস করেন, দেবতারা তাঁহার উপর প্রসন্ন থাকেন। কিন্তু গৃহলক্ষ্মীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য কখন কখন তাঁহাকে রাজদ্বারে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইতে হইত; কখন বা কৃতবিদ্য শিষ্যের নিকট অন্যায় গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করিতে হইত।

প্রাচীন আর্য্য—স্ত্রী, পুত্র ও দাসের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা তাহাদের পক্ষে নিরঙ্কুশ ছিল এবং তাঁহার কথা তাহারা আইনের ন্যায় প্রতিপালন করিত। বৃদ্ধ মনু বলিতেছেন "ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ। যত্তে সমধিগচ্ছন্তি, যস্য তে, তস্য তদ্ধনং" ॥ অর্থাৎ ভার্য্যা, পুত্র ও দাস এই তিন জনকে অধন বলে, ইহারা যে ধন উপার্জ্জন করে, ইহারা যাঁহার, সেই ধন তাঁহারই। তিনি নিজে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় পুত্র ও দাসকে ইচ্ছামত দান বিক্রয় করিতে পারিতেন। পত্নীকে দান বা বিক্রয় করা তাঁহার রোগ ছিল না, কিন্তু মহা-সঙ্কট স্থলে ওরূপ করিতেও তাঁহার সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা ছিল। বিবাহ বিষয়েও প্রাচীন আর্য্যের অনেকাংশে স্বাতন্ত্র্য ছিল। আমাদের মত তাঁহাকে চেলির জোড় পরিয়া, হাতে সুতা বাঁধিয়া, কোমরে জাঁতি গুঁজিয়া সর্ব্বদা বর সাজিতে হইত না। তিনি কখন ইংরাজ যুবকের ন্যায় কোর্টসিপ করিয়া গান্ধর্ব্ব বিধানে প্রণয়িনীর সহিত মাল্য বদল করিতেন, কখন বা তরবারি চালাইয়া বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক স্ত্রীরত্ন লাভ করিতেন, এবং কখন বা ধূর্ত্ততাবলে চরিতার্থ হইয়া পরে কোন কামিনীকে

পৈশাচবিধানে নিজ অন্তঃপুরচারিণী করিয়া লইতেন।

এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রাচীন আর্য্যের পরিবারবর্গ বড় অল্প বোধ হইবেক না। বিশেষতঃ ভ্রাতা ও পিতৃব্যের সহিত একত্র সংসৃষ্ট ভাবে অবস্থান করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। যে স্থলে কিছু পৈতৃক সম্পত্তি থাকিত, তথায় পৃথগ্‌ভাবে বাস করা বড় সহজ ব্যাপার হইত না। পৈতৃক সম্পত্তির বিভাগ বা দান বিক্রয়ের জন্য এক জন অংশীকে অপরাপরের মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে হইত। এই সকল বিষয়ে পূর্ব্বতন অবস্থা অনুসারে বড় একটী স্বাতন্ত্র্য বা সুবিধা ছিল না। সুতরাং নিকট জ্ঞাতিবর্গের সহিত একত্র সংসৃষ্ট ভাবে থাকা সচরাচর অপরিহার্য্য হইয়া উঠিত। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ উহার পক্ষপাতী ছিলেন; লোকাচারও তদ্বিষয়ের প্রতিপোষকতা করিত এরূপ বোধ হয়। কারণ সংসৃষ্ট জ্ঞাতি, অসংসৃষ্ট জ্ঞাতির পূর্ব্বে ধনাধিকারী হইয়া থাকেন; এমন কি, বঙ্গদেশ ভিন্ন সর্ব্বত্র এই বিধি চলিত আছে যে, সংসৃষ্ট ভ্রাতা পত্নীর পূর্ব্বে উত্তরাধিকারী হইবেন।

পরন্তু আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অগ্ন্যাধান লইয়া বড় বিব্রত ছিলেন। গৃহস্থ নিজ গৃহে যে পবিত্র অগ্নি স্থাপন করিয়া রাখিতেন, তাহা কদাচ নির্ব্বাণ হইতে দেওয়া হইত না। তদ্দ্বারা সমুদয় নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য চলিত, এবং জাতকর্ম্ম হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় সংস্কারের সমাধা হইত। বিধিপূর্ব্বক অগ্নির রক্ষণ ও অর্চ্চন—সকল ধর্ম্মের মূল, এবং ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের নিদান বলিয়া পরিগণিত হইত। গৃহস্থ কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে যাইলে অগ্নির সেবার জন্য প্রতিনিধি রাখিয়া যাইতেন; পাছে কোন বৈগুণ্য ঘটে, এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতেন। অতএব ঈদৃশ কঠোর সাগ্নিকতা প্রাচীন আর্য্যের পৃথগ্‌ভাবে অবস্থানের পক্ষে একটী বিশেষ অন্তরায় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইত্যাদি কারণে প্রতীতি হইতেছে যে, প্রাচীন আর্য্যের পরিবারবর্গ বহু বিস্তৃত ছিল ও উহা যে উত্তরকালে পল্লী-সমাজ নামক সুপ্রসিদ্ধ পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এখন আমাদের আধুনিক পরিবারবর্গের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি পরীক্ষা করা যাউক। আমরা এখন অসবর্ণা-বিবাহ করিতে পারি না। কেবল সবর্ণা দ্বারা পুত্রবান্‌ হইবার প্রয়াস পাইতে হয়। আমরা পূর্ব্বপুরুষের মত বলশালী নহি, সুতরাং রাক্ষসবিধানে বলপূর্ব্বক স্ত্রীরত্ন লাভে সাহস হয় না। পরন্তু বাল্য-বিবাহের প্রবল্য প্রচারের গুণে এখন আর গান্ধর্ব্ববিধানানুসারে কোর্টসিপ করিবার সুবিধা নাই। ধূর্ত্ততায় পূর্ব্ব-পুরুষগণ আমাদের নিকট বহুকাল শিক্ষা পাইতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ

আমরা তাঁহাদের মত তেজস্বীয়ান নহি; এখন রাজশাসনও বড় খরতর। সুতরাং ছলপূর্ব্বক পৈশাচ নিয়মে স্ত্রীধনে অধিকারী হইয়াও হজম করিতে পারি না। এইরূপে অদৃষ্ট-দোষে আমাদের অন্তঃপুর একপ্রকার শূন্যময় হইবার উপক্রম হইয়াছে; তথাপি আমরা কেবল বুদ্ধিবলে বহুবিবাহের আশ্রয় লইয়া কিয়ৎপরিমাণে উক্ত অভাব পূরণ করিতে সক্ষম হইতেছি। কাল-মাহাত্ম্যে পরিণয়ের সহিত বংশরক্ষার উপায়ও অনেকাংশে সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ঔরসপুত্র না জন্মিলে কেবল দত্তকপুত্র দ্বারা অধুনা পিণ্ড-সংস্থান করিয়া লইতে হয়। কারণ ক্ষেত্রজ প্রভৃতি স্বল্লাঙ্গসসাধ্য পুত্রলাভের পক্ষে লোকাচার আমাদের প্রতিবাদী হইয়াছেন।

শাস্ত্রে বলে "গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা, পুষ্কলেন ধনেন বা। অথবা বিদ্যয়া বিদ্যা চতুর্থী নোপপদ্যতে"॥ অর্থাৎ বিদ্যার্জ্জনের প্রথম উপায় গুরুশুশ্রূষা, দ্বিতীয় অর্থ, তৃতীয় প্রতিশিক্ষা; এ বিষয়ে চতুর্থ উপায় নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নিতান্ত নির্ধন ছিলেন; সুতরাং গোচারণ, যজ্ঞকাষ্ঠাহরণ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা গুরুর চিত্তানুবর্ত্তন করত বিদ্যালাভ করিতেন। তৎকালের সামাজিক বন্দোবস্তও উক্ত প্রথার প্রতিপোষক ছিল। রাজা, ভূস্বামী ও ধনী ধর্ম্মবোধে অধ্যাপকের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট বৃত্তি দিতেন। সুতরাং তিনি এখনকার ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত অন্নচিন্তায় বিব্রত না হইয়া অকাতরে শিষ্যকে অন্ন ও বিদ্যা দান করিতেন। পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায় আমাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা নাই; কিন্তু ইউরোপীয় বাণিজ্য ও শাসনপ্রণালীর গুণে আমরা তাঁহাদের অপেক্ষা ধনাগমে পটুতা ও কৃতার্থতা লাভ করিয়াছি। ইউরোপীয় দৃষ্টান্ত ও উপদেশের-প্রভাবে আমাদের অনেক কুসংস্কারের অপনয়ন হইয়াছে এবং স্বাধীনভাবে চলিবার স্পৃহা জন্মিয়াছে। সুতরাং আমরা গুরুশুশ্রূষায় মন না দিয়া অর্থ দ্বারা বিদ্যা লাভ করিতেছি। এইরূপে গুরু ও শিষ্যের পরস্পর সম্বন্ধ পূর্ব্বের মত আর ঘনিষ্ঠ নাই এবং আধুনিক শিষ্য গুরুর পরিবারের মধ্যে গণ্য নহে।

লর্ড এলেনবরার সময় হইতে দাসত্ব-প্রথা রাজ-নিয়মানুসারে দণ্ডনীয় হইয়াছে। উক্ত ঘটনায় বহুকাল পূর্ব্ব হইতে উহা এক প্রকার রহিত হইয়া আসিতেছিল। ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের আর যে কোন দোষ থাকুক না, তাঁহারা কদাপি নৃশংস ছিলেন না। তন্নিবন্ধন দাসত্ব-প্রথা স্পার্টা, রোম প্রভৃতি রাজ্যের ন্যায় এদেশে কখন তাদৃশ অসহ্য ও অত্যাচারের নিদান হয় নাই। অদ্যাপি আসাম, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে যে নফর রাখিবার রীতি আছে, মধ্য ভারতের দাসত্ব-প্রথা তদপেক্ষা বড় অধিক কঠোর ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহা হউক অধুনা

দাসী ও দাসপত্নী আমাদের পরিবারের অন্তর্গত নহে।

অধুনা সংসৃষ্ট থাকিবার তত প্ররোচক কারণ নাই; প্রত্যুত অসংসৃষ্ট থাকিবার অসুবিধা অনেকাংশে অপনীত হইয়াছে। পৈতৃক-ধন-বিভাগ ও দান বিক্রয় বিষয়ে এদেশে অধুনা কোন নিযন্ত্রণাই নাই। সুতরাং পৃথক্ হইবার প্রধান প্রতিবন্ধক গিয়াছে। পরন্তু আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় অগ্নির পরিচর্য্যার জন্য ব্যতিব্যস্ত নাই; এখন সে ভাব বোম্বাই-নিবাসী পারসীক ভ্রাতাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। অতএব অসংসৃষ্ট থাকিবার প্রধান অসুবিধা অপনীত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত কারণকলাপের সাহচর্য্যবশতঃ আমাদের পরিজন-মণ্ডলের আয়তন নিতান্তসংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি উহাকে সুশৃঙ্খল ও সুসংস্কৃত করিতে আরও অনেক সময় লাগিবেক। আমাদের সমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে সঙ্গতিপন্ন ও স্বাধীন হইয়াছে। পূর্ব্বে কোন জনপদের মধ্যে দুই চারিজন যোত্রাপন্ন লোক থাকিলেই অনেক হইল বলিয়া জ্ঞান হইত। দুই একজন ভূম্যধিকারী, দুই একজন রাজকর্ম্মচারী, দুই একজন বণিক্, দুই একজন মহাজন, জেলার মধ্যে সচ্ছন্দে লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইত। আর সকল লোক নিতান্ত দুই এক জনের মুখাপেক্ষী হইয়া কাল কাটাইত। স্বাধীনও স্বচ্ছন্দভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, পূর্ব্বে এরূপ ব্যবসায় নিতান্ত বিরল ছিল।

তখন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য অনেকাংশে অল্প ছিল। বিশেষতঃ ইংরাজি-শিক্ষা ও সভ্যজাতির সহিত সংসর্গ না থাকাতে প্রাচীনদিগের তত অভাব ছিলনা। বিলাস ও বাবুগিরি কাহাকে বলে, তাঁহারা জানিতেন না। পক্ষান্তরে শারীরিক সুখসচ্ছন্দতা, বাহ্যিক ভব্যতাও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে তাঁহাদের রুচি ও অভ্যাস নিতান্ত জঘন্য ছিল। সুতরাং তাঁহাদের সংসারখরচ অতি অল্পে চলিত। অধুনা একশত মুদ্রা মাসিক আয়ে যাহা না হয়, পূর্ব্বে ২৫ টাকা উপায়ে তাহা সম্পন্ন হইত। তন্নিবন্ধন তখনকার মধ্যে যাঁহারা উপায়ক্ষম ছিলেন, তাঁহারা অনেক অর্থ উদ্বৃত্ত করিয়া পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধ, পূজা অর্চ্চন, আতিথ্য, পুরাণ দেওয়া, ব্রাহ্মণ-ভোজন, বৃত্তিদান, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয় করিতেন। যদি কোন ব্যক্তি ঢাকায় বা মুরসিদাবাদে একটী ভাল চাকরী পাইতেন, তাঁহার বাসায় পালে পালে আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধু বান্ধব, গিয়া উপস্থিত হইত। তিনি সকলকে অকাতরে অন্নদান করিতেন। মধ্যে মধ্যে ভাট ফকির, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, এবং ঘটক ভট্‌চাজের সমাগম হইত। তিনি কাহাকেও নিরাশ করিতে পারিতেন না। এইরূপে তখনকার লোকের বিত্তর উপরি ব্যয় হইত। ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা নিঃসন্দেহ ব্যক্তিবিশেষের এবং জাতিবিশেষের বদান্যতা

প্রকাশ পায়; কিন্তু সমাজের কোন স্থায়ী উপকার সাধিত হয় না। বাণিজ্য ব্যতীত সমাজের উন্নতি হইবার উপায় নাই। কারণ বাণিজ্য—কৃষি ও শিল্পের প্রধান প্রবর্ত্তক ও পুরস্কারক। লৌহ-বর্ত্ম, তাড়িৎবর্ত্ম, বাষ্পীয়পোত, কুল্যা-বলী, বাণিজের বরযাত্র মাত্র। অধুনা এই সকল কার্য্যে সহস্র সহস্র লোক নিযুক্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। পরন্তু ইংরাজ-রাজতন্ত্রের শাখা প্রশাখা এত বিস্তৃত, যে সহস্র সহস্র লোক ও তদ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। এই-রূপে দেশের দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, ও সমাজে নূতন জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। সত্য, অলস ও নিষ্কর্ম্মা লোকের পূর্ব্বাপেক্ষা কষ্টে দিনপাত হইতেছে; কিন্তু ইদানীং পরিশ্রমের পুরস্কার হইবার নানা উপায় হইয়াছে। তন্নিবন্ধন মধ্যবিধ গৃহস্থের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং পরভাগ্যজীবী লোকের হ্রাস হইতেছে। এখন অনেকে অপরিচিত স্থানে অতিথি হইতে লজ্জাবোধ করেন এবং বড় বাড়ী-তে নিমন্ত্রণ হইলে, আপনাকে কৃতার্থ ভাবেন না। অধুনা কুটুম্বনারীগণের তত অনুগ্রহ হয় না; কুটুম্বিতার আড়-ম্বরও অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে।

এইরূপে এদেশের মধ্যশ্রেণীস্থ লোক পূর্ব্বাপেক্ষা সচ্ছল ও স্বাধীন হওয়াতে পরিবারবর্গের অবয়বসংস্থান কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তথাপি এককালে সাহেবী চালে চলিবার অবসর হয় নাই। তাহা আমাদের পক্ষে সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয়ও নহে। স্থানীয় কুপ্রথা, জাতীয় কুসংস্কার এবং অবস্থার বৈষম্য বশতঃ শ্রেণী-ভেদে পরিজনবর্গের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। নিম্নশ্রেণীস্থ স্বল্পোপায় ব্যক্তির পরিবার—স্ত্রীপুত্র, কদাচিৎ বৃদ্ধ পিতামাতা। সচ্ছল মধ্যবিত্তকে এতদ্ভিন্ন দুই একজন আশ্রিত কুটুম্ব স্বজনের প্রতি-পালনের ভার লইতে হয়। বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীনের কোন পরিবার নাই বলিলেই চলে।

কিন্তু এইরূপ লোক অধুনা নিতান্ত বিরল। যে কুলীন-সন্তান গৃহস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাকে নিজ জননী, অনূঢ়া বা দুর্ভাগা ভগিনী এবং দুই একটি ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীর ভার, গ্রহণ করিতে হয়। যিনি কুলনাশক সাবর্ণ,—ভগিনী ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী এবং তাহাদের ছেলেপুলেরা পর্য্যন্ত তাঁহার পরিবারের মধ্যে গণ্য। কিন্তু যিনি কুলপোষক শ্রোত্রিয়,—তাঁহাকে এত ঝঞ্ঝাট পোয়াইতে হয় না। যে সঙ্গতিপন্ন লম্বোদর মহার্জন বা জমিদার পুত্রমুখাব-লোকনে বঞ্চিত হন, তাঁহার মনে সর্ব্ব-দাই এই ভাবনা, পরে কে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে। তিনি উপর্য্যুপরি তিন চারিবার বিবাহ করিয়াও যদি সিদ্ধকাম না হন, তবে দত্তকবিধানের আশ্রয় লন। কিন্তু পাছে পত্নীগণের মধ্যে বিবাদ ঘটে, এই ভয়ে প্রত্যেকের জন্য এক একটি পৃথক্ পোষ্য পুত্র গ্রহণ পূর্ব্বক

বহুপুত্রের পিতা হইয়া জন্ম সার্থক করেন।

আমাদের সমাজে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিলেও আমাদিগকে অদ্যাপি স্ত্রী পুত্রের ন্যায় পিতা মাতা, দুর্ভগা ভগিনী ও অকৃতবয়স্ক ভ্রাতাকে প্রতিপালন, এবং দুই একজন আত্মীয় কুটুম্বের ভার গ্রহণ করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে দুই একজন অতিথির ও খবর লইতে হয়। ইহা না করিলে লোকের নিকট মূঢ়ত্ব ও অমানুষত্ব প্রকাশ পায়। এ স্থলে প্রাচীন মনু কি বলেন শোনা যাউক। "পিতা মাতা গুরু র্ভার্য্যা, প্রজা দীনা স্তথাশ্রিতাঃ। অভ্যাগতোঽতিথিশ্চৈব পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ॥ ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গ-সাধনং। নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাদ্যত্নেন তং ভরেৎ॥" মনুর শাসন এখনও আমাদের সমাজে বিলক্ষণ খাটিতেছে। বিশেষের মধ্যে এই, আমরা পূর্ব্বপুরুষের মত গুরুভক্ত নহি, এবং আমাদের সহরবাসীগণ তাদৃশ আতিথেয় ও দীনপালক নহেন।

এখন আইন কি বলেন, তাহা বিবরণ করা যাউক। আইন মনুর অনুসরণ করেন না, ইহা বলা বাহুল্য। অনুসরণ করাও অসম্ভব। তাহা হইলে, যে ব্যক্তি অতিথিকে স্থান দান না করিবে, অথবা আশ্রিত দীনজনকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে, কিম্বা বার্ষিকের পরিবর্ত্তে গুরুকে * তদীয় আনকোরা মন্ত্র প্রত্যর্পণ করিতে চাহিবেক, তাহার আদালতে দণ্ড হওয়া উচিত। আইন যদি ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র ও কার্য্য লইয়া এরূপ পীড়াপিড়ি করেন, তাহা হইলে সমাজস্থিতি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবেক, এবং লোকের সংসার-যাত্রা নিতান্ত নিযন্ত্রিত ও ক্লেশময় হইয়া এক প্রকার বিড়ম্বনা হইবেক। অতএব মনু-মত আদালতে চলিতে পারে না। পক্ষান্তরে এদেশীয় আইন বিলাতী বিধি-ব্যবস্থার প্রতিবিম্বমাত্র। উহা অনেক স্থলে আমাদের সমাজের অনুপযোগী ও অন্যায়ের সোপান হইয়া উঠে।

মনু যে পিতামাতাকে সর্ব্ব প্রথম পোষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, ইংরাজী আইন তাহাদিগকে পরিবারের মধ্যেই গণ্য করেন না। যদি বল লোকে কর্ত্তব্যবোধে পিতামাতার প্রতিপালন করিবে; আইনের প্রয়োজন রাখে না। তাহা হইলে স্ত্রী পুত্রেরও বেলা এই যুক্তি দিতে পারা যায়, বিশেষতঃ ইহাদের অনুকূলে প্রকৃতি আমাদের অন্তঃকরণকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও স্নেহার্দ্র করিয়া দেয়। অতএব যদি পিতামাতার অনুকূলে আইনের প্রয়োজন না রাখে, স্ত্রী পুত্রের জন্য উহা আরও অনাবশ্যক হইবেক। বস্তুতঃ স্ত্রী পুত্রের প্রতিপালনের ভার

* মনু গুরুশব্দ আচার্য্য-অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। গুরুশব্দে যে মন্ত্রদাতা বুঝায়, উহা আধুনিক, ও তন্ত্রের কল্পনা মাত্র। কিন্তু এখনকার শিক্ষক অপেক্ষা তন্ত্রমতোক্ত মন্ত্রদাতা প্রাচীন আচার্য্যের অনুরূপ।

প্রকৃতি নিজেই আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করেন; তবে কখন কখন পক্ষপাত, পারদারিকতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা নিবন্ধন ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, এই জন্য রাজশাসনের প্রয়োজন। পিতামাতার পক্ষে প্রকৃতি তত অনুকূল নহেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রতিপালন—কর্ত্তব্যতা-অংশে কোনরূপে ন্যূন বলিয়া বোধ হয় না। অতএব এ স্থলে আইনের অধিকতর প্রয়োজন বোধ হয়। কোন সমাজে, আমেরিকাতেও, স্ত্রী-জাতি প্রকৃত প্রস্তাবে উপায়-ক্ষম ও আত্মপোষণে সমর্থ নন। অতএব যে পুরুষ কোন রমণীকে পরিণয়-গ্রন্থিতে বদ্ধ করিয়া তাঁহার স্বাধীনতা হরণ করেন, তিনি অবশ্যই তদীয় ভরণ পোষণের জন্য দায়ী। পরন্তু আমরা যাঁহাদিগকে এই কর্ম্মক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছি, সেই সন্তান সন্ততির প্রতিপালনের নিমিত্ত আপনা হইতেই সমাজের নিকট জবাবদিহি লইয়াছি। কারণ কোন্ ব্যক্তি নিজের কার্য্য অপলাপ করিয়া এড়াইতে পারে?

আমরা পিতামাতার নিকট শুদ্ধ ভরণ পোষণের জন্য ঋণী নহি; ভবিষ্যতে এসংসারে যে কিছু স্পৃহণীয় বস্তু—খ্যাতি প্রতিপত্তি, বিদ্যা বুদ্ধি, অর্থ সামর্থ্য—প্রাপ্ত হই—, তৎসমুদায়ের জন্যও ঋণী হইয়া থাকি। এই দ্বিবিধ উপকারের আনৃণ্য-লাভের জন্য, যখন তাঁহারা বৃদ্ধ, আতুর ও উপার্জ্জনে অক্ষম হন, তৎকালে তাঁহাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করা ও তাঁহাদের অভাব দূর করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাঁহাদের নিমিত্ত আমরা এজীবনে যাহা কিছু করি, উহা দ্বারা সেই অসীম ঋণের কিয়দংশ মাত্র পরিশোধ হইতে পারে। লোকের কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর উহার নির্ভর রাখিলেই চলিতে পারে, এরূপ বিবেচনা করা ভ্রমমাত্র। কর্ত্তব্যজ্ঞান রাজশাসন ব্যতিরেকে কোন স্থলেই পর্য্যাপ্ত হয় না। আদালত সামান্য ঋণ-আদায়ের জন্য সাহায্যদান করিতে তৎপর; কিন্তু এই গুরুতর ঋণের পরিশোধ বিষয়ে কেন নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, তাহা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না।

বিশেষতঃ পিতা মাতা সন্তান সন্ততির প্রতিপালনে অমনোযোগী হইলে, আইন অমনি হস্তক্ষেপ করিবেন। সুতরাং সন্তান যে পিতামাতার নিকট ঋণী—আইন তাহার সাক্ষী ও প্রতিভূ হইতেছেন। অতএব ভবিষ্যতে তাঁহাদের দুঃখের সময়ে সেই ঋণের অন্ততঃ কিয়দংশ পরিশোধের জন্য আইন কেন দায়ী হইবেন না; তাহার কারণ নাই।

শ্রীঃ—



সন ১২৮১ সালের মূল্যপ্রাপ্তি।

আষাঢ় মাস।

শ্রীযুক্ত বাবু শারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
উনাও, অযোধ্যা ৩।৵০

„ কামাখ্যাপ্রসাদ রায়
কুড়লগাছি, নদিয়া ৩।৵০

„ নবীন চন্দ্র ঘোষ নেটিব ডাক্তার
কৃষ্ণ নগর পুলীস ৩।৵০

„ দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী
নাটোর ১৸৶০

„ ব্রজনাথ মুন্সী
কলিকাতা ৩৲

„ সর্ব্বেশ্বর মজুমদার
জামালপুর, ময়মনসিংহ ৩৶০

„ মহিমচন্দ্র ঘোষ
ঐ ঐ ৩৶০

„ কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত
ঐ ঐ ৩৶০

„ উমেশচন্দ্র রায়
ঐ ঐ ৩৶০

„ পূর্ণচন্দ্র সেন
ঐ ঐ ৩৶০

„ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী
পাবনা, কাঁকুড়কাটী ৩।৵০

„ প্রেমচাঁদ সাহা
পাবনা, জেলা স্কূল ১৷১০

„ দিগ্বিজয় চন্দ্র পাল
হাজারিবাগ ৩।৵০

কুমার প্রমথভূষণ দেবরায়
কলিকাতা ৩৲

„ বরদাকান্ত মজুমদার
নলডাঙ্গা, যশোহর ৩।৵০

„ মহেশনারায়ণ রায়
লালধাগা, মুরশিদাবাদ ১।/১০

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারি মুখোপাধ্যায়
সাহেব গঞ্জ ৩।৵০

„ যোগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়
ভবানীপুর ১৸০

„ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
পাবনা নরম্যাল স্কূল ।০

„ মতিলাল চৌধুরী
কলিকাতা ১৸০

„ ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়
কুঁচবিহার ৩।৵০

„ দয়ালচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়
সিবাটী বোসের হাট ৩।৵০

„ দ্বারকানাথ দত্ত
ডেঃ ইনস্পেক্টর দিনাজপুর ৩।৵০

„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
দিনাজপুর ৩।৵০

„ শশিভূষণ ঘোষ
দিনাজপুর ৩।৵০

„ হরিমোহন ঘোষ
নেটিবডাক্তার, ঘাষিপাড়া ৩।৵০

„ গিরীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
নওয়াখালী সন্দ্বীপ ৩।৵০

„ ভোলানাথ পাল
কলিকাতা ৩৲

„ ইন্দ্রকান্ত মিত্র
কলিকাতা ৩৲

„ গুরুদাস বসু
ক্যাথেড্রাল মিসন কালেজ ৩৲

„ কৃষ্ণপ্রসন্ন মিত্র
ক্যাথেড্রাল ঐ ৩৲

„ অক্ষয়চন্দ্র ঘোষ
রাণীডাঙ্গা, নদীয়া ৩।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র রায়
রাজসাহী ৩৲

„ কেদারনাথ সেন
কলিকাতা ৩৲

„ কামাখ্যানাথ ভট্টাচার্য্য
নলডাঙ্গা ১৸৶০

„ শ্রীশচন্দ্র হিসাবিয়া
পাটগ্রাম ৩।৵০

„ যোগেশচন্দ্র ঘোষ
ক্যাঃ মিঃ কলেজ, কলিকাতা ৩৲

„ ত্রিগুণাচরণ সেন
প্রেঃ কলেজ, কলিকাতা ৩৲

„ তারাপদ ঘোষাল
হেয়ার স্কুল কলিকতা ৩৲

„ বামাচরণ ঘোষ
বড় জাগুলী ৩।/১০

„ কেশবলাল মল্লিক
হুগলী ৩।/০

„ যাদবকিশোর গোস্বামী
সংস্কৃত কলেজ কলিকাতা ৩৲

„ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
হাজারিবাগ ।৵১০

„ বিনোদবিহারী দাস
ঢাকা ।৵০

„ অম্বিকাচরণ দত্ত
সংস্কৃত কলেজ কলিকাতা ৩৲

„ বেঙ্গলীবুকক্লাব
বাঁকীপুর ৩।৵০

„ রাজবিহারি দাস
ঢাকা ২।/১০

„ শারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
মেড়তলা ৩।৵০

„ জানকীনাথ দত্ত
গবিপুর ৩৶০

„ রাজনারায়ণ দাস
শোনহাটবিন্দু ৩।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন চৌধুরী
কলিকাতা ৩৲

„ রামনাথ মুখোপাধ্যায় ডাক্তার
দাসপুর ৩।৵০

„ কৈলাসচন্দ্র ঘোষ
কলিকাতা ২৲

„ প্রবোধচন্দ্র রায় চৌধুরী
টাকী শ্রীপুর ২৸৵০

„ প্রিয়নাথ কড়ার
শ্রীরামপুর ৩।৵০

„ প্রসাদদাস গোস্বামী
শ্রীরামপুর ৩।৵০

„ রজনীভূষণ ধর
মগলটুলী ৩।৵০

„ নরেন্দ্রনারায়ণ কর
সুজনপুর মহিষ রাথা ৩।৵০

„ অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়
ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩।৵০

„ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
হেয়ারস্কুল ৩৲

„ কমলচাঁদ হালদার
দারজিলিং ৸৶০

„ কালীকুমার চক্রবর্ত্তী
চট্টগ্রাম ৩।৵০

ললিতমোহন সরকার
টাকী ৩।৵০

„ শারদাচরণ মিত্র
বহরমপুর কলেজ ৩।৵০

„ বিহারিলাল মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা ৩৲

„ ষষ্ঠিচরণ কাস্তগিরি
চট্টগ্রাম ৩।৵০

„ রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়
জয়দেবপুর ৸০

„ কৈলাসচন্দ্র সেন উকিল
চট্টগ্রাম ৩।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ সেন
জয়পুর ।৶০

" যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
হাজারিবাগ ৩।৶০

" নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
ছাতক ৩।৶০

" শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
লক্ষ্ণৌ ২৲

" লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
হাজারিবাগ ৩।৶০

" নরহরি দাস
মালদহ ৩।৶০

" যোগেন্দ্রনাথ রায়
কলিকাতা ৩৲

" শশীভূষণ বসু
চন্দন নগর ২৲

" রাধানাথ শর্ম্মা
ডেবরুগড উত্তর আসাম ১৸৶০

" গোপীমোহন ঘোষ
চট্টগ্রাম ৩।৶০

" কৃষ্ণগোপাল সান্যাল
এলাহাবাদ ৩।৴০

" সর্ব্বেশর ঘোষ
বড়জাগুলী ৩।৶০

" আশুতোষ লাহিড়ী
বাঘ্‌ই পাড়া, কৃষ্ণনগর ১৸৶০

" দীননাথ চট্টোপাধ্যায়
কাকোরূ, লক্ষ্ণৌ ।৶০

" চন্দ্রকান্ত সেন
বাশেন্দা, মহারাজগঞ্জ ৩।৶০

" বৈকুণ্ঠনাথ দাসগুপ্ত
বাশেন্দা, মহারাজ গঞ্জ ১৸৶০

" তফজেল হুসেন বিশ্বাস
সুন্দর পুর, নদিয়া ।৶০

" ললিতকিশোর রায়
বরিশাল ৩।৴০

শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র বসু উকিল
মেহেরপুর ৩৶০

" বিলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
রহমতপুর ৸৶০

" শরচ্চন্দ্র গুপ্ত মেউগী
কাঁটালীয়া স্কুল ৩।৶০

" যাত্রামোহন চৌধুরী
চট্টগ্রাম ৩।৶০

" নবীনচন্দ্র সরকার
গয়া ৸৴০

" অন্নদানন্দন সেন
ক্যাথেড্রাল মিসন কলেজ ৩৲

" দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী
ময়মন সিংহ স্কুল ৩।৶০

" চণ্ডীচরণ মিত্র
সরদারপুর, ইন্দোর ৩।৶০

" চন্দ্রশেখর বড়ুয়া
পৌহাটী ৩।৶০

" অনুকূল গঙ্গোপাধ্যায়
টুণ্ডুলা ১৸৶০

" উমেশচন্দ্র দে কলিকাতা ৩৲

" দিগম্বর চৌধুরী খাতাঞ্চী
বগুড়া ৩।৴০

" শ্রীনাথ দে হেড পণ্ডিত
মডেল স্কুল বগুড়া ৩।৶০

" গোবিন্দচন্দ্র দত্ত হেড মাষ্টার
বগুড়া ৩।৶০

" শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল
প্রাক্‌টীসনার বগুড়া ৩।৶০

" কালীনাথ মুখোপাধ্যায়
পানীহাটী ৩।৶০

" তারাকালী বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা ৩৲

" বরদাদাস বসু
ফুলনিয়া ২৲

" কেদারনাথ দাস
শিবপুর ৸০

শ্রীযুক্ত বাবু বিপীনবিহারি মুখোপাধ্যায়
ময়মনসিংহ ৩।৵০
" ভূপতি সর্ব্বাধিকারী
মেদিনীপুর ৬॥২০
" রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ময়মনসিংহ ৩।৵০
" বীরেশ্বর সেন
ধাপ রংপুর ৸৶০
" বৈদ্যনাথ দাস বসু
ফেরোজপুর ৩।৵০
" তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়
মট্‌স লেন কলিকাতা ৩৲
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
জান বাজার কলিকাতা ৩৲
" মহেশচন্দ্র দাস
পালপাড়া ৩।৵০
" বিশ্বেশ্বর রায়
কলিকাতা ৩৲
" কালীমোহন ঘোষ
হিমালয় ৩।৵০
" বিপীনবিহারী রায়
ঢাকা ৩।৵০
" উমাচরণ দত্ত
গোবর ডাঙ্গা ৩।/০
" মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
উকীল পূর্ণীয়া ১৸/০
" চন্দ্রকুমার দাস
ঢাকা ৩।৵০
" ক্ষেত্রলাল সিংহ
কৃষ্ণনগর ৩।৵০
" রাখালচন্দ্ররায় চৌধুরী
বরিসাল, নাকুটিয়া ৩।৵০
" রঘুনৃসিংহ গোস্বামী
শান্তিপুর ১/১০
" মথুরানাথ রায় চৌধুরী
কলিকাতা ১৲

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল সান্যাল
কলিকাতা ৩৲
" প্রকাশচন্দ্র সেন
আসাম ৸/০
" অধরকালী মুখোপাধ্যায়
হাজারিবাগ ৩।৵০
" রজনীকান্ত দাস গুপ্ত
ত্রিপুরা ১৸৴১০
" রাজনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গেধোড় ৩৲
" রামকুমার সরকার
কলিকাতা ১৲
" অনুকূলচন্দ্র সাহা
কাথেড্রালমিসন কলেজ ১৸০
" প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঐ ১৸০
" অনন্তকুমার নাগ
বহুবাজার ৩৲
" জীবনধন বসু
ক্যাথেড্রালমিসন কলেজ ১৲
" রামকৃষ্ণ সাহা
মালদহ, শিবগঞ্জ ৩।/০
" প্রসন্নকুমার বসু
সিলঙ্গ ৩।৵০
" রসময় সিংহ
এলাহবাদ ৩।৵০
" শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ
দারজিলীং ৩।৵০
" এককড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
মসাগ্রাম, মেমারি ৩।৵০
" সীতাকান্ত মুখোপাধ্যায়
ডেঃ মাজিষ্ট্রেট মালদহ ৩।৵০
" দীনবন্ধু তর্কালঙ্কার
নওগা, আসাম ৩।৵০
" কৃষ্ণকুমার দাস
ক্যাঃ মিঃ কালেজ কলিকাতা ৩

* বিদ্যাপতি।

বঙ্গীয় কাব্য-ক্ষেত্রে জয়দেব-সরস্বতীর বীণা নীরব হইলে বিদ্যাপতি-বিরচিত মধুর পদাবলী বঙ্গবাসীর চিত্ত আকর্ষণ করিল। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যেখানে জয়-দেব-বর্ণিত "মাধবিকা-পরিমল-ললিত" "নবমালিকা-জাতি-সুগন্ধি" সরস বসন্ত ঋতু বিরাজ করিতেছিল, সেই স্থানে আসিয়া জয়দেবেরই সুর লইয়া বিদ্যাপতি গাইলেনঃ—

"আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত,
"ধাওল অলিকুল মাধবী পন্থ;"

আবার সকলই নূতন বোধ হইল, কিছুই পুরাতন হয় নাই।

"নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ,
নব নব বিকসিত ফুল;
"নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল,
মাতল নব অলিকুল;
"নবীন রসাল-মুকুল-মধু-মাতিয়া,
নব কোকিলকুল গায়;
"নব-যুবতীগণ, চিত উনমাতই,
নব রসে কাননে ধায়।"

কেবল কথায় নূতন নহে, বস্তুতঃ নূতন। যদিও বিদ্যাপতির পদাবলী ও গীত-গোবিন্দে পরস্পর রচনা-সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু পদাবলীর আভ্যন্তরিক প্রকৃতি সম্পূর্ণ নূতন। আর একটী নূতনত্ব বি-শেষরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল—নূতন কাব্যের ভাষাও নূতন। বিদ্যাপতির লেখনী হইতে "বাসন্তীকুসুম-সুকুমার" অবয়ব ধারণ করিয়া বাঙ্গালা কাব্য জন্ম পরিগ্রহ করিল।

বিদ্যাপতি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি। যাঁহারা বিদ্যাপতির পদ বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, বিদ্যাপতির ভাষা বাঙ্গলা নয় ও তিনি বাঙ্গলা ভাষার কবি নহেন। এই বি-ষয়ের মীমাংসা করিতে অনেকে ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন, অতএব ইহার যাথার্থ নির্ণয় করা আবশ্যক।

ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভাষা মাত্রই নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল। যখন কোন দেশে সাহিত্য সুন্দররূপে পরিপুষ্ট ও পরিমার্জ্জিত হয়, তখন তথাকার সাহিত্যের ভাষা স্থির থাকে বটে, কিন্তু বাচনিক ভাষা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং সাধু-ভাষার সহিত চলিত ভাষার প্রভেদ হয়। খৃষ্ট শকের প্রারম্ভে † বা তৎপূর্ব্বে ভারত-বর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃত থাকিলেও তত্তৎ স্থানের চলিত

* "মহাজন পদাবলী সংগ্রহ" প্রথম সংখ্যা। বহুবাজার স্মিথ এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত।

† এই সময়ে বররুচি "প্রাকৃত-প্রকাশ" লিখিয়াছিলেন।

ভাষা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। ক্রমে সংস্কৃতের সহিত চলিত ভাষার এত প্রভেদ হইল যে, ভারতবাসী কঠিন পরিশ্রম ব্যতিরেকে আর সংস্কৃত বুঝিতে পারেন না। বৌদ্ধগাথা, মাগধী, হিন্দী এই সকলের তুলনা করিলে ভাষার এই পরিবর্ত্তনপ্রবৃত্তি কিরূপ অনেক বুঝিতে পারা যায় (১)। দুঃখের বিষয় এই মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচীর ন্যায় বঙ্গদেশ-প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা প্রাকৃত-শাস্ত্রভুক্ত হয় নাই; সুতরাং "ত্রিপুরা-রাজাবলী" পুস্তকের পূর্ব্বে আমাদের ভাষা কি ছিল, কিছুই জানা যায় না। যদিও কাব্যাদর্শে "গৌড়ী" নামে প্রাকৃত বিশেষের উল্লেখ আছে (১) কিন্তু গৌড়ী কিরূপ ছিল তাহার কোন নিদর্শন নাই। যাহা হউক জয়দেবের সময়ে বাঙ্গলা ভাষা যে সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। কবি যতই ভাষাপটু হউন না কেন, হৃদয়ের ভাব মাতৃভাষাতেই প্রকাশ পায়, এজন্যই জয়দেবের সংস্কৃত "চল সখি! কুঞ্জং" "ধীর-সমীরে যমুনাতীরে" ইত্যাদি বাক্যের ভাষা বাঙ্গলার মত হইয়া পড়িয়াছিল।

পরিশুদ্ধ সাহিত্য ভাষা হইতে অপভ্রষ্ট হওয়া অবধি চলিত ভাষা যতদিন পর্য্যন্ত নূতন সাহিত্যে পরিণত না হয়, ততদিন অরাজক রাজ্যের ন্যায় বিশৃঙ্খল ও পরিবর্ত্তনশীল থাকে। এইরূপ ভাষাবিপ্লবে কোন মহালেখক জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহা হইতে নূতন সাহিত্য উৎপন্ন হয়; ভাষারাজ্যে এককালে শৃঙ্খলা ও স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয় এবং ভাবি সমৃদ্ধির অঙ্কুর আরোপিত হয়। ডান্টে, চসার, লূথার, একাকী স্বস্ব মাতৃভাষা ইতালীয়, ইংরেজী, জর্ম্মান ভাষার স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি এবং তাঁহার সমসাময়িক চণ্ডিদাস আমাদের দেশে এই মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া যান।

এক্ষণে বিদ্যাপতির ভাষা বাঙ্গালা কি না এই বিষয় বিবেচনা করা যাউক। কেহ কেহ বলেন বাঙ্গালা হিন্দী হইতে উৎপন্ন এবং বিদ্যাপতি বাঙ্গালার আদিম অবস্থার কবি বলিয়া তাঁহার কাব্যে এত হিন্দী দেখা যায়। সুতরাং ইহাঁদের মতে বিদ্যাপতির সময়ের প্রচলিত বাঙ্গালা হিন্দীর ন্যায় ছিল। কিন্তু এই অনুমানয়ে নিতান্ত অমূলক হিন্দী ও বাঙ্গালার বিভক্তি পরীক্ষা করিলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিদ্যাপতির ব্যবহৃত হিন্দীশব্দ কখনই বাঙ্গালার প্রচলিত হয় নাই; তবে তিনি যে এই সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার কারণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছেঃ—

১ম। ব্রজলীলা বর্ণনে ব্রজভাষা ব্যবহার স্বভাবসিদ্ধ।

২য়। অনেক হিন্দীশব্দ সমানার্থ বাঙ্গালা শব্দ অপেক্ষা কোমল এবং স্থান

(১) Muirs Sanscrit Text. Vol. II.

বিশেষে স্বরের উপযোগী; এই দুই অনুরোধেই কোনস্থলে যুক্ত বর্ণের বিয়োগ (যথা পদ্মিনী পদমিনী) কোন স্থলে দুঃশ্রাব্য বর্ণের স্থানে কোমল বর্ণ প্রয়োগ (যথা কনক-কনয়) দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ বর্ণবিপর্য্যাস শব্দ শাস্ত্রের অনুমোদিত।

৩য়। ভাষাবিপ্লবে অপর ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করা আদিকবি ও মহাকবির স্বভাব-সঙ্গত। বিদ্যাপতির সমসাময়িক চসার এইরূপ করিয়া ছিলেন।

বস্তুতঃ বিদ্যাপতি কেবল কতকগুলি হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র, তাঁহার পদের ভাষা বাঙ্গালা। কারণ তাঁহার সকল পদে সমান সংখ্যক হিন্দীশব্দ দেখা যায় না, এমন কি কোন পদে একটীও হিন্দী নাই; যথা—

"শুনলো রাজার ঝি
"তোরে কহিতে আসিয়াছি
"কানু হেন ধন পরাণে বধিলি,
এ কাজ করিলি কি?"

ইত্যাদি।

বিদ্যাপতির সমকালিক কবি * চণ্ডীদাসও হিন্দী শব্দ প্রায় ব্যবহার করেন নাই। কারণ চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির মত পণ্ডিত ছিলেন না, হিন্দী ও জানিতেন না। বিদ্যাপতি কেবল পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ মধ্যে মধ্যে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে হিন্দী কবি বলা যায় না ও তাঁহার কবিত্ব শক্তির ন্যূনতা প্রকাশ পায় না।

সাহিত্যবিষয়ক ইতিহাসবেত্তারা বলেন যে, যখন দেশে রাজবিপ্লব বা সমাজ বিপ্লব প্রশমিত হইয়া শৃঙ্খলা ও শান্তির পুনরাবেশ হয়, দিন দিন রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রজাগণের সুখসমৃদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হয় তখনই সাহিত্যানুশীলনের প্রকৃত সময়; তখন মনুষ্যহৃদয়ের উৎকৃষ্ট ভাব সকল স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং উৎকৃষ্ট নাটক উৎকৃষ্ট মহাকাব্য প্রভৃতি কীর্ত্তিকলাপ সংস্থাপিত হয়।

বিক্রমাদিত্য, আগষ্টস্, এলিজেবেথের রাজ্যকাল পরীক্ষা করিলে বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে যে স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীনতা দেশের কাব্যোন্নতির প্রধান সহায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বাঙ্গালা কাব্যের জন্মকালে বঙ্গভূমি পরাধীনা ও দুর্দ্দশাগ্রস্তা; বঙ্গবাসী নিরুৎসাহ ও পরপীড়িত, তখন কীর্ত্তি সংস্থাপনের দিন ফুরাইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতি বিশ্বংসনীয় নহে। সহস্র বৎসরের পরিমার্জ্জিত চিন্তাশক্তি কোথায় যাইবে? বহুকাল-কর্ষিত বিশাল কল্পনাক্ষেত্র, যাহা কত কত মহাকবির আয়াসে হিন্দু-হৃদয়-ভাণ্ডার পরিপূরিত করিয়াছে, সে অক্ষয় ধন অপহৃত হইবার নহে। সত্য বটে ধর্ম্মমন্ত্র-পূত শান্তিজলে বারম্বার পরিধৌত হওয়াতে বাঙ্গালীর হৃদয় নিতান্ত কোমল হইয়া পড়ি-

* "চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ" ইত্যাদি, পদ পদকল্পতরু ২২২ পৃষ্ঠায় দেখ।

য়াছে, এবং সে জন্য আমরা দুরাত্মাদিগের আশুদমনীয়; কিন্তু কোমলহৃদয়তার গুণে বঙ্গবাসীর এমন কীর্ত্তি আছে যে, তাহাতে জগতে কোন জাতি তাহাদের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে পারে না।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমরা পরাধীন। বঙ্গবাসীর মান, জাতিগৌরব, স্ফূর্ত্তি কিছুই নাই। কোন্ জাতি আছে যে এমন সময়ে মনুষ্য-হৃদয়ের উৎকৃষ্ট ভাব সকলের সমুচিত পরিচয় প্রদান করে? বাঙ্গালীরা পারিয়াছিল। পরাধীনতায়, রাষ্ট্রবিপ্লবে, ঘোর অত্যাচারে

"কবিপতি বিদ্যাপতি মতিমানে
"(গায় গীত,) জগত-চিত চোরাওল।
"গোবিন্দ গোরি রস গানে।" *

যখন যবন-পঙ্গপাল দশ দিক্ আচ্ছন্ন করিল, জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক তিরোহিত হইল, অন্ধকারেও বাঙ্গালী কবি গাইলেন

"বিদ্যাপতি কহঃ—সুপুরুখ নারী
"মরণ-সমাপন, প্রেমভিখারী।"

কিন্তু এরূপ দুরবস্থায় বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি কতক্ষণ থাকিবে? কবিত্বশক্তির স্বাভাবিকী প্রতিভা অবশ্যই উদ্দীপ্ত হইবে, কিন্তু হৃদয় স্ফূর্ত্তিহীন; বহুক্ষণ-স্থায়িনী হওয়া অসম্ভব। আদিশূরের রাজ্যকালে ভট্টনারায়ণ এবং লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যকালে জয়দেব বৃহৎকাব্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালা তখন স্বাধীন ও শ্রীসম্পন্ন ছিল; বিদ্যাপতির রাজা শিবসিংহ রায় "পঞ্চগৌড়েশ্বর"† উপাধি ধারণ করিলেও ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন সন্দেহ নাই; "বিদ্যাপতি কবি-ভূপ" না জন্মিলে শিবসিংহকে কেহই জানিত না। সুতরাং বিদ্যাপতি ভট্টনারায়ণের ও জয়দেবের মত উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন নাই, তবে তিনি প্রকৃত কবি ছিলেন এ জন্য শক্তির অনুযায়িক উদ্যম করিলেন। তিনি কবিসিংহাসনে আরোহণ করিয়াই নিজ হেমময় রাজদণ্ড দ্বারা বঙ্গ-কবিগণকে পথ দেখাইয়া দিলেন। এই পথ গীতিকাব্য। বিদ্যাপতি সুপণ্ডিত ও সংগীতবেত্তা, কোন বাঙ্গালী তাঁহার অপেক্ষা অধিক শক্তি ধারণ করেন নাই, তিনি আদর্শ কবি হইলেন। যাঁহারা তাঁহার সমপথগামী হইলেন, উৎকর্ষ লাভ করিলেন। ফলতঃ গীতিকাব্যে বাঙ্গালীজাতির ন্যায় কেহই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন নাই।

সুর গীতিকাব্যের প্রাণের স্বরূপ; জগদ্বিখ্যাত গীত সকলের মধ্যে অনেকেই সুর-বিযুক্ত হইলে অপদার্থ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ যে গীতের রচনা কালে কবি ভাব, সুর ও লয়ের প্রতি অনবচ্ছেদে লক্ষ্য করেন, তাহাই যথার্থ-গীত-পদ বাচ্য হয়। সচরাচর ছন্দোবদ্ধ রচনাতে সুর বসাইয়া

* গোবিন্দদাস।

† "চিরঞ্জীব রহু, পঞ্চগৌড়েশ্বর, কবি বিদ্যাপতি ভানে।"

যে গীত প্রস্তুত হয়, তাহাতে কখন শব্দের অনুরোধে স্বরের বিকৃতি, কখন তালের অনুরোধে শব্দের বিকৃতি, এই রূপ বিপরীত ঘটনা ঘটে। যদি আমাদের সংগীত শাস্ত্র না থাকিত তাহা হইলে ইংরেজদের ন্যায় আমাদেরও কবিরা গীত রচনা করিতেন ও গায়কে স্বর বসাইতেন। কিন্তু এরূপ ভাগযোগ করিয়া কার্য্য করিলে পিন্ প্রস্তুতে সুবিধা হয় বটে, গীতকাব্যে হয় না। এজন্য ইউরোপে উৎকৃষ্ট গীতকাব্য বিরল এবং গীতকবি দুর্ল্ভ। গীত- ব্যবসায়ী যদি কবির হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারেন তাহা হইলে কবির ভাবের উপযোগী স্বর বসাইতে পারেন বটে, কিন্তু এরূপ লোক পাওয়া অতি দুর্ঘট। আর যে কবি সঙ্গীত-বিশারদ নহেন, তিনি "গীতকবি" হইতে পারেন না। কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্র গীতের উদ্দেশে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্য গীতিকাব্য নহে। প্রকৃত গীতিকাব্য একমাত্র অবস্থা বা হৃদয়ের ভাব অবলম্বন করিয়া রচিত হয়। মহাকাব্যের ন্যায় ইহাতে নরনারীর প্রকৃতি ও কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে চিত্রিত হয় না। তথাচ সঙ্গীতে যেমন ধ্রুপদ-গায়ক বহু আয়াসে বিচিত্রলয়ানুসারিণী বিবিধ-ভাবধারিণী মূর্ত্তিমতী রাগিণীকে চিত্রিত করিলেও তাহা টপ্পার ঘনসন্নিবিষ্ট মধুর ও বিচিত্র স্বরমালার ন্যায় হৃদয়গ্রাহী হয় না, সেইরূপ মহাকাব্য গীতকাব্যের মত অনায়াসে শ্রোতার হৃদয়ে রস উদ্দীপ্ত করিতে পারে না। বঙ্গবাসী কাব্য-প্রিয় ও কাব্যপটু হইলেও আয়াসভীত ও দুর্ব্বল, এই জন্য গীতিকাব্যই বাঙ্গালী-হৃদয়ের স্বাভাবিক উৎস। এই জন্যই জয়দেব ও বিদ্যাপতি বঙ্গ দেশের প্রধান কবি।

স্থূলদর্শনে বিদ্যাপতির পদাবলী গীতগোবিন্দের অনুকরণ মাত্র বোধ হয়। উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়, উভয়েই মনোহর ছন্দোবৈচিত্র্য, ও অনুপ্রাসচ্ছটা উভয়ই 'কোমল-কান্ত-পদাবলী'। এ সকলি সমান। কিন্তু উভয় কাব্যের সার বস্তু প্রীতি—দুই কবি দুই রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। যে প্রণয় হৃদয়কে প্রবলবেগে আপ্লুত করে, আত্ম-সংযমকে সমূলে উৎপাটিত করে এবং প্রণয়ী জনকে মুগ্ধ ও অন্ধ করে, গীতগোবিন্দে সেই প্রণয়। বিদ্যাপতির প্রীতি তেমন নয়। ইহা তড়িতের ন্যায় সমস্ত শরীরকে কম্পিত ও হৃদয়ের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিলেও প্রণয়ীকে অন্ধ করে না, সে আপনার হৃদয়ের ভাব আপনি অনুভব করিতে পারে। গীতগোবিন্দের সরস্বতী যেন সুবর্দ্ধিত-কলেবরা, পুষ্পাভরণ-সুসজ্জিতা, চঞ্চল-নয়না (ঘূর্ণিত-নয়না?) হাস্যমুখী নারী। পদাবলীর দেবী জাতি-কুসুম-সদৃশ সুকুমারী, আলুলায়িত-কেশ-বেশা, চিন্তাশীল-ধীর-লোচনা, ঈষৎ-সস্মিত-বদনা।

উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য উৎকৃষ্ট গীত ও উৎকৃষ্ট কাব্য। এজন্য বিদ্যাপতির কাব্য বিনা গীতেও উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণ্য

হইবে। তাহার প্রমাণের জন্য পদাবলী হইতে দুই চারি পঁক্তি পাঠ করিলেই যথেষ্ট হয়। একটী রত্ন দেখাইয়া রত্নভাণ্ডারের পরিচয় দেওয়া অন্যায়, কিন্তু নিম্ন-লিখিত কয়েক পঁক্তি না উদ্ধৃত করিয়া থাকিতে পারিলাম নাঃ—

১। রাধা-রূপ নিরীক্ষণ করিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণঃ—

" অপরূপ পেখনু রামা ;
" কনক-লতা অবলম্বনে, উয়ল হরিণীহীন হিমধামা।
" নয়ন-নলিনী দউ, অঞ্জনে রঞ্জিত, ভাঙ বিভঙ্গী বিনাসা ;
" চকিত চকোর, জোরি বিধি বাঁধল, কেবল কাজর পাশা।
" গিরিবর-গুরুয়া-পয়োধর- পরশিত, গীম গজমতি হারা ;
" কাম কম্বু ভরি, কনয়া শম্ভুপরি, ঢারত সুরধুনী ধারা।"

২। " জোড়ি ভুজ যুগ, মোড়ি বেঢ়ল, তত হি বয়ান সুছন্দ ;
" দাম চম্পকে, কাম পূজল, যৈছে শারদ চন্দ।
" উরহি অঞ্চল, ঝাঁপি চঞ্চল, আধ পয়োধর হেরু ;
" পবন পরাভবে, শরদ ঘন জনু, বেকত করল সুমেরু।"

৩। " চঞ্চল লোচনে, বঙ্ক নেহারনি ; অঞ্জন লোচনে তায় ;
" জনু ইন্দীবর, পবনে হেলিত, অলি-ভরে উলটায়।"

৪। শ্রীরাধার প্রীতিঃ—

" হাতক দরপণ, মাথক ফুল ; নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বুল ;
" হৃদয়ক মৃগমদ, গীমক হার ; দেহক সরবস, গেহক সার ;"

৫। " শীতের ওঢ়নি পিয়া, গীরিষের বা।
" বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না।"

৬। " হাত দিয়া দিয়া, মু'খানি মাজিয়া, দীপ নিয়া নিয়া চায় ;
" দরিদ্র যেমন, পাইয়া রতন, থুইতে ঠাঁই না পায়।
" হিয়ার উপর, শোয়াইয়া মোরে অবশ হইয়া রয়।"

* * * * *

৭। শ্রীরাধা বিরহিণী ;—

" ফুটল কুসুম নব, কুঞ্জকুটীর বন, কোকিল পঞ্চম গাওইরে।
" মলয়ানিল, হিমশিখরসি ধাওল, পিয়া নিজদেশ না আওইরে।"

৮। " কি ক্ষণে বিহি মোরে বাম ভেল রে, পালটি দিঠি নাহি দেল।"

৯। " মরিব মরিব সখি ! নিচয় মরিব ; কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।
" ** " না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ, না ভাসাইও জলে,
" মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে
" সুই তমালতরু কৃষ্ণবর্ণ হয়, " * *

১০। " ইহ সব আভরণ দিহ পিয়াঠাম
" জনম অবধি মোর এই পরণাম।"

আকাঙ্ক্ষা * *
" অবসর জানি কিছু কহিও সন্দেশে ;

"দিনে একবার পহুঁ নিহে মোর নাম
"অরুণ-তুলহ করে দিহে জল দান।"

বিদ্যাপতির জীবনবৃত্ত নির্ণয় করা কঠিন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে, চৈতন্যদেব বিদ্যাপতি-রচিত পদাবলী গান করিতেন ও শুনিতেন; ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে বিদ্যাপতি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক। আর বিদ্যাপতির ভণিতা দেখিয়া জানা যায় যে, তিনি শিবসিংহ রাজার সভাসদ্ ছিলেন (রাজ্ঞী) লছিমা দেবী ও (বন্ধু) রূপনারায়ণ তাঁহার গীত শ্রবণ করিতেন। পুরাবৃত্তে মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের মধ্যে শিবসিংহের নাম পাওয়া যায় না। প্রবাদ যে তিনি বীরভূম প্রদেশের রাজা ছিলেন। তদ্ব্যতীত লছিমা দেবীর প্রতি কবির অনুরাগ-বিষয়ক একটী প্রবাদ আছে। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র জানি।

প্রবাদ আছে যে লছিমা দেবীকে না দেখিলে বিদ্যাপতির কবিতার স্ফূর্ত্তি হইত না। পরম্পরায় এই কথা জানিতে পারিয়া রাজা একদিন লছিমাকে গৃহরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন ও বিদ্যাপতিকে পদ রচনা করিতে বলিলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিদ্যাপতি কিছুই করিতে পারিলেন না। রাজাজ্ঞায় বিদ্যাপতিকে শূলে আরোপিত করিতে লইয়া যাইতেছে, এমন সময় কবি সম্মুখস্থ প্রাসাদে প্রদীপ হস্তে লছিমা দেবীকে দেখিতে পাইলেন। বিদ্যাপতি তৎক্ষণাৎ গান করিতে লাগিলেন:—

"যব গোধূলি সময় বেলি; ধনি মন্দির
বাহির ভেলি;
"ঘন জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারিয়া
গেলি;
"ধনি! অল্প-বয়সী বালা, জনু গাঁথনি
পুহপ মালা;
"থোর দরশনে, আশ না পূরল, বাঢ়ল
মদন-জ্বালা;"
ইত্যাদি।

কিছু দিন হইল বিদ্যাপতির সমস্ত পদ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। সংগ্রহকার নাম গোপন করিয়াছেন, কিন্তু যিনিই হোন্, তিনি বঙ্গবাসীদিগের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন সন্দেহ নাই। যদিও এই পুস্তকে বিস্তর বর্ণাশুদ্ধি ও অশুদ্ধ পাঠ আছে, কিন্তু বহুমূল্য মণি ধাতু-গৈরিক-সংশ্লিষ্ট হইলেও সকলের নিকট আদরণীয়। মুদ্রাযন্ত্রের অপরাধ জন্য উৎকৃষ্ট কাব্যের কে অবহেলা করে?

সংগ্রহের ভূমিকার পদাবলী সম্বন্ধে নানাবিধ কথা আছে। অশ্লীলতা-সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অনেকাংশে সত্য বটে, কিন্তু এক্ষণকার শিক্ষাপ্রণালী ও তদানুসঙ্গিক রুচির পরিবর্ত্তের প্রতি দৃষ্টি করাও আবশ্যক। তদনুসারে কতক গুলি পদ পরিত্যাগ করিলে ভাল হইত। বৈষ্ণব মতের প্রেম সকল ধর্ম্মে সকল সমাজনীতিতে সম্পূর্ণ রূপে অনুমোদিত হয় না। তবে যদি সংগ্রহকার এমন আশা করেন যে বিদ্যাপতির কাব্য রসাস্বা-

দনের সহিত শিক্ষাপ্রণালী ও রুচিরও পরিবর্ত্ত হইবে তবে সে আশাকে অবশ্যই দুরাশা বলিব।

বিদ্যাপতির পদ প্রথমতঃ কি রীতিতে গাত হইয়াছিল বলা যায় না। চণ্ডীদাস কীর্ত্তনীয়া ছিলেন প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু তখনকার কীর্ত্তন এখনকার কীর্ত্তন নহে। চৈতন্যদেবের সময় হইতে কীর্ত্তন-পদ্ধতি যে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, তাহার কোন পদ্ধতিতেই রাগরাগিণী রীতিমত স্থান পায় না। এমন কি অধুনা বিদ্যাপতির পদ যেরূপে গীত হইয়া থাকে, রাগরাগিণী সে দিক্ দিয়া চলে না। সংগ্রহকারের কথার ভাবে বোধ হয় যেন তিনি রাগরাগিণী-যুক্ত বিদ্যাপতির পদ শ্রবণ করিয়াছেন; যদি বাস্তবিক শুনিয়া থাকেন, এবিষয়ে তাঁহার স্পষ্টাক্ষরে লেখা উচিত ছিল।

গীতগোবিন্দে যতিতাল, একতাল, রূপকতালের উল্লেখ আছে। এই সকল তাল ব্যবহার করিয়া বিদ্যাপতির রাগরাগিণী ও ছন্দ অনুসারে কি পদাবলী প্রকৃতরূপ গীত হইতে পারে না? ভরসা করি সংগীত-বিদ্যোৎসাহী রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

শ্রীশ্রীঃ—

সুপ্রসিদ্ধ প্রথম ফরাশি বিদ্রোহ।

এই বিজয়িনী সেনার প্রথম সমাজ-সংস্থিতির সময় সমস্ত সৈনিক পুরুষদিগের এক সাধারণ সভা সংস্থাপিত হয়। বিজয়ী উইলিয়ম নিজ সমস্ত সৈন্যকে উয়িন্‌চেষ্টরে সমবেত হইতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং ষষ্ঠি সহস্র সেনা তাঁহার এই আদেশের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে প্রত্যেক সৈনিক পুরুষের সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার প্রথা অতিশয় কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ এই সৈনিকদল বিজিতদিগের স্থাবরাস্থাবর-সম্পত্তি-সমাগমে দিন দিন আলস্যপরবশ হইয়া উঠিল। এবং স্ত্রী পুত্র ও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইল। এই অনিচ্ছা হইতেই আধুনিকী প্রতিনিধি বিধিসভার (Representative Legistatures) আবির্ভাব হয়। এবং এই প্রতিনিধি বিধিসভা হইতেই বর্ত্তমান স্বাধীনতার উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রতি-

নিধি বিধিসভা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে খ্যাত। ইংলণ্ডে ইহার নাম পার্লিয়ামেণ্ট ; ফ্রান্সে ইহার নাম কখন ষ্টেস নর্ জেনেরল, ও কখন কন্ভেন্সন ; এবং স্পেনে ইহার নাম কর্টেস্। এই সকল-সভার প্রথম সংস্থাপয়িতা সেনানীগণ স্বপ্নে ও মনে করেন নাই যে এই সকল সভা হইতে অভাবনীয় ফল সকল সমুৎপন্ন হইবে। যে প্রতিনিধি সভার সভ্য মনোনীত হওয়া এখন সকলেই অসামান্য গৌরবের বিষয় মনে করেন, সেই প্রতিনিধি সভার সভ্য মনোনীত হওয়া সকলেই তখন এক প্রকার বিড়ম্বনা বলিয়া মনে করিতেন। কালক্রমে যখন প্রধান সেনা-নায়কেরা রাজোপাধি প্রাপ্ত হইলেন, এবং অধীন সেনাপতিরা সামন্ত বা ব্যারন্ নামে খ্যাত হইলেন, তৎকালে রাজা ও সামন্তদিগের পরস্পর বিদ্বেষ ভাব উপস্থিত হইল। সামন্তেরা সর্ব্বতোভাবে নিজ নিজ সম্রাটের যথেচ্ছাচারিতার বাধা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং এই বাধা প্রদান হইতেই (১) তাঁহাদের সম্মতি ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার কর নির্দ্ধারণ অবিধেয়, (২) এবং তাঁহাদের অনুমোদন ব্যতীত সর্ব্ব প্রকার বিধিই অগ্রাহ্য—এই দুই সাধারণ নিয়মরূপ অমৃতময় ফলের উৎপত্তি হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সমস্ত রাজ্যেই শাসন-প্রণালী একরূপ পক্ষপাত-দোষে দূষিত ছিল। সাধারণ জনরাশির মঙ্গলার্থে কোন বিশেষ নিয়মই বিধিবদ্ধ হইত না। সুতরাং এইরূপ দোষদুষ্ট অন্যান্য রাজ্য প্রণালীর ন্যায় এই সকল শ্রেষ্ঠতন্ত্র রাজ্য-প্রণালীর ধ্বংসবীজ স্বকীয় নিয়মাবলীরই অন্তরুপ্ত হইয়াছিল। রোমসাম্রাজ্যের বিজেতা গথ্স ও ভ্যান্ডাল্গণ বিজিত রোমের অধিবাসিগণকে জ্ঞানপথের গোচর-যোগ্য মনে করিতেও লজ্জিত হইতেন। অধিক কি ইংলণ্ডের ম্যাগ্না চার্টা বা মহদধিকার-পত্রেও কেবল উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীরই অধিকার সকল সযত্নে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। কিন্তু অগণ্য-সংখ্য হতভাগ্য কৃষক ও দাসগণের বিষয়ে একটী কথা ও উল্লিখিত হয় নাই। এই সকল কারণ-পরম্পরায় উচ্চ শ্রেণী ক্রমে বিলাসপ্রিয় ও আলস্য-পরবশ হইয়া দিন দিন নিস্তেজ হইতে লাগিল। যে সামন্তগণের পূর্ব্ব পুরুষেরা এক সময় সেনানায়ক অ্যাটিলাসহ অপ্রতিহতবেগে উত্তাল সাগরতরঙ্গের ন্যায় সহসা উত্থিত হইয়া রোমসাম্রাজ্য প্লাবিত ও উৎসন্ন করিয়াছিল, সেই বীর সেনানীগণের দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও হীনবীর্য্য সন্ততিগণ—স্পেনের আক্রমনকারী মুরীয় সেনানিচয়ের সহিত সংগ্রামে-চমূপতি রোডারিকের রণপতাকা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। এই বিজয়িনী মুরসেনাও কালে বিজিত গথ্ ও ভ্যান্ড্যাল্ দিগের দশা প্রাপ্ত হইল। ফ্রান্সের অদ্বিতীয় সম্রাট সার্লেমেন (বা বৃহৎ চার্লস) নিজ প্রজাপুঞ্জেরউন্নতির জন্য কিছুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু স্বাধীন অধিবাসীর সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন তাঁহার সমস্ত

চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। অল্প-সংখ্যক স্বাধীন প্রজা অসংখ্য দাস প্রজার অন্তর্বিলীন হইয়াছিল, এবং সার্লেমেনের যে দিগ্বিজয়িনী সেনা তদীয় জয়লক্ষ্মীকে এক সময়ে পূর্ণকলা করিয়াছিল, সেই বীরোন্মাদিনী সেনার মধ্যেই বিলাসপ্রিয়তা ও নির্বীর্য্যতা তাঁহার জীবদ্দশাতেই উপলক্ষিত হইয়া তদীয় হৃদয়ে মর্ম্মবেদনা প্রদান করিয়াছিল। ইংলণ্ডের উন্নতিসাধন ও রক্ষার জন্য প্রজাবৎসল ইংলণ্ডেশ্বর অ্যাল্‌ফ্রেড যে সমস্ত সুচারু নিয়মাবলী সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত কারণ-সমূহে সে সমস্ত নিয়মাবলী কোন সুফলপ্রসূ হইতে পারে নাই। এই জন্যই বহুকাল পর্য্যন্ত ইংরাজ জাতি, উত্তর সেনার অবিশ্রান্ত আক্রমণে, বিপর্য্যস্ত ও হতসার হইয়াছিল।

নির্ব্বাণ-প্রায় দীপশিখার ন্যায় সামন্তগণের এই বিলয়োন্মুখ বীর্য্য ও সাহস—অন্যোন্য-সংগ্রাম-সংঘর্ষণে—সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই কারণে, ও সামন্তদিগের আবাসভূমি দুর্গরক্ষিত হওয়ায়, এবং তাঁহাদিগের অধিকৃতবর্গের অস্ত্রসঞ্চালনের সদাবশ্যকতা হেতু, ফ্রান্সের রণবিষয়িণী প্রতিভার পুনরাবির্ভাব হয়। স্পেনীয় সামন্তগণ দুরারোহিণী অসুলভজীবনী গ্যালিসীয় পর্ব্বতশ্রেণীর অধিত্যকা প্রদেশে স্ব স্ব স্বাভাবিকী তেজস্বিতার পরিরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। ইংলণ্ডের নির্ব্বাণোন্মুখী রণবিষয়িণী প্রতিভাও ইংলণ্ডেশ্বর ষ্টিফেনের রাজ্যকালে সামন্তগণের পরস্পর-সমর-সংঘর্ষ জন্য পুনরুদ্দীপিত হয়। এবং এই উদ্দীপিত স্ফুলিঙ্গ হইতেই ইংলণ্ডের ভাবী স্বাধীনতা-বৃক্ষের মূল সংস্থাপিত হয়।

ঐশ্বর্য্যের স্বতোবর্দ্ধনে ও সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্ত্তনে এই নির্ব্বাণোন্মুখী সামন্তিকী স্বাধীনতা অবশেষে পুনর্নির্ব্বাণ হইল। এই অল্পাশ্রয়া স্বাধীনতা আশ্রয়তরুরূপ এই অল্পসংখ্যক লোকের মনস্বিতার সহিত অন্তর্ধান করিল। ধনের উন্মাদিনী শক্তিতে উচ্চ শ্রেণী ক্রমে হতবীর্য্য হইয়া উঠিল এবং নিম্ন শ্রেণী হইতে কেহই এই অযোগ্য উচ্চ শ্রেণীর স্থান অধিকার করিতে পারিল না। এক দিকে ধনীরা ধনের মোহিনী শক্তিতে শিথিলিতবল হইয়া উঠিল—অন্যদিকে দরিদ্রেরা কঠোর দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত না হওয়ায় দিন দিন ম্লান ও নির্বীর্য্য হইতে লাগিল। একদিকে ঐশ্বর্য্যশালী সামন্তেরা রাজধানীর সমৃদ্ধি ও বিলাস-দ্রব্যে প্রলোভিত হইয়া দুর্গ-পরিরক্ষিত স্ব স্ব প্রাসাদ ও করপ্রদ প্রজাপুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া নগরবাসী হইলেন—অন্যদিকে প্রভুপরায়ণ প্রজারাও প্রভুর অদর্শনে ক্রমে তাঁহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল।

ফ্রান্সে সামন্তিকী বীর্য্যবত্তার সময় রাজশক্তি ইংলণ্ডের ন্যায় এতদূর নিযন্ত্রিত হইয়াছিল যে, 'সম্ভ্রান্ত, যাজক ও মধ্যবিত্ত এই তিন সম্প্রদায়ের (Three Estates) অমতে রাজ্যমধ্যে কোন প্রকার কর নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে না'—

এই মত অচিরকাল মধ্যেই সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত ও অসংখ্য রাজকীয় গুরুবিধি-পরম্পরা দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই স্বাধীন শাসনপ্রণালীর কঙ্কালাবয়ব সামন্তিকী রীতিনীতির ধ্বংসের সহিতই বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজকীয় সৌভাগ্য ও নাগরিকী সমৃদ্ধি সামন্তদিগকে পারীস নগরীতে সমবেত করিল। এইরূপে গ্রাম্য-স্বাধীনতা—ইহার একমাত্র সমর্থক সামন্তগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া—অচিরাৎ ভূপতিত হইল।

জার্ম্মণীতে এই সাধারণ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়। অন্যান্য সামন্ততন্ত্র রাজ্যের (Feudal System) ন্যায়, এখানেও প্রজাপুঞ্জের অমতে কর নির্দ্ধারণের অবিধেয়তা, ও রাজার সহিত প্রজাপুঞ্জের বিধিনিয়ামক শক্তির (Legislative power) সহভোগিতা, রূপ স্বাধীন রাজ্যশাসন-বীজ উপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু জর্ম্মণিক সম্রাট্ গণ অসীম পরাক্রমশালী সামন্তগণ দ্বারাই মনোনীত হইতেন বলিয়া তাঁহারা একপ্রকার সামন্তগণের মুখাপেক্ষী ছিলেন, সুতরাং রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁহাদিগের কোন স্বাধীনতাই ছিল না। এই জন্যই জর্ম্মণিক সামন্তগণ স্ব স্ব ক্ষুদ্র রাজ্যে ক্রমে ক্রমে স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের অন্তর্দৌর্ব্বল্যবশতঃ এই স্বাধীনতা চিরস্থায়িনী হইতে পারে নাই। সম্রাট্ দিগের রণবিষয়িণীশক্তি—অচিরাৎ তাঁহাদিগের পতনোন্মুখী স্বাধীনতার মূলোচ্ছেদ করিয়াছিল।

ইংলণ্ডীয় প্রজাপুঞ্জের—স্বাধীন শাসনপ্রণালীর উপর স্বাভাবিকী ও পূর্ব্বপুরুষানুক্রমিকী আশক্তি সত্ত্বেও,—এবং জুরি দ্বারা সেই আশক্তির সর্ব্বতোবিধুনন সত্ত্বেও,—ইহার অবনতির স্বাভাবিক কারণ সকল ক্রমেই ফলগ্রহ হইয়া উঠিল। এবং মধ্যযুগের (Middle Ages) সামন্তদিগের সামন্ততান্ত্রিক স্বাধীনভাব ঐশ্বর্য্যবহুল বর্ত্তমান যুগের জুগুপ্সিত অধীনভাবের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। ইয়র্ক, ও ল্যাংক্যাষ্টরের উচ্ছেদক সমরনিচয় সামন্তগণকে হীনবল ও ক্ষীণদল করিয়াছিল। এই সময়ে আবার বিলাসপ্রিয়তা তাঁহাদের ব্যয়-স্রোতের পথ-নির্দ্দেশিনী হইয়া নির্ব্বাণমুখী স্বাধীনতার মূলোচ্ছেদ করিল। টিউডর (Teudors) নরপতিগণের সময়েই পার্লিয়ামেণ্টমহাসভায় স্বাধীনতা-বিষয়ে প্রজাপুঞ্জের ঔদাসীন্য বিশেষরূপে উপলব্ধ হয়। অষ্টম হেনরীর ন্যায় যথেচ্ছাচারী রাজা সে সময়ে ইউরোপের আর কোন রাজ্যেই দৃষ্ট হয় নাই। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার প্রধান ও সাধারণ বিভাগ এই দুর্দ্দান্ত নরপতির নিকট যে ঘৃণিত নমনীয়তা গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রজাদিগের ধনসম্পত্তি ও স্বাধীনতার উপর এরূপ বলবৎ আক্রমণ আর কোন নরপতির সময়েই উপলক্ষিত হয় নাই। বিচারালয়ে বিচারকার্য্য এরূপ পক্ষপাতদোষে আর কখনই দূষিত হয় নাই। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার কার্য্যপ্রণালীতে স্বাধীনতার ভাব এরূপ সম্পূর্ণ-

রূপে আর কথনই তিরোহিত হয় নাই। এবং রাজসিংহাসনও এরূপ যথেচ্ছাচারিতা-দোষে আর কখনই কলঙ্কিত হয় নাই। যাঁহারা সামন্ততন্ত্র প্রণালীকে ইংলণ্ডের স্বাধীনতার মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা যেন এই নরমাংসলোলুপ ভীষণ-প্রকৃতি নরপতির সমকালীন ইংলণ্ডীয় প্রজাপুঞ্জের দুরবস্থার বিষয় স্মরণ করেন। এই দুর্দ্দান্ত নরপাল ইংলণ্ডের ভূম্যাধিকারীগণের তৃতীয়াংশের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করেন, এবং তাঁহার রাজ্যকালে দ্ব্যধিক সপ্ততি সহস্র লোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করেন।

যদি ও মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্র-প্রণালী—স্বাধীনতা-রক্ষার একমাত্র উপায়-স্বরূপ ছিল,—যদিও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই প্রথা উদীচ্য বিজেতৃগণের অনিবার্য্য প্রতাপস্রোত প্রতিহত করিয়া প্রজাপুঞ্জের ধন সম্পত্তি ও অধিকার সকল ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিল, এবং যদিও ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে যৎকালে সাধারণ প্রজাপুঞ্জ অনৈক্য ও দৈন্য নিবন্ধন একান্ত ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছিল, তৎকালে সামন্তেরা তেজস্বী ও উর্জ্জস্বল না হইলে, যথেচ্ছাচারিতা নিরর্গলা হইয়া নিঃসন্দেহ প্রজার ধন প্রাণের উচ্ছেদসাধন করিত; তথাপি ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে এইপ্রথা কেবল সেই অসভ্য যুগেরই উপযোগিনী ছিল। কিন্তু ইহা সামাজিকী রীতি নীতির অজস্র পরিবর্ত্তনের ও সভ্য সময়ের স্বাধীনতার কোন মতে উপযোগিনী নহে। চিরস্থায়িনী সৈন্যসংস্থিতির সংস্থাপনের সহিত, বারুদ-চুর্ণকের আবিষ্ক্রিয়ার সহিত, এবং নগরী-নিচয়ের আবির্ভাবের সহিত, এই প্রথা অবশ্যম্ভাবী বিলয় প্রাপ্ত হইল। এবং এই প্রথার সহিত এতন্মূলক স্বাধীনতাও ভূতলশায়িনী হইল।

এই সামন্ততন্ত্র-প্রণালী দ্বাদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পূর্ণফলা হয়। যৎকালে সামন্তেরা—প্রভুপরায়ণ ও রণদীক্ষিত প্রজাপুঞ্জ দ্বারা পরিরক্ষিত, এবং প্রাকার-পরিবেষ্টিত, স্বস্ব গ্রাম্য প্রাসাদে—বাস করিতেন; যৎকালে তাঁহারা আপাদ-মস্তক কঞ্চুক-সমাচ্ছাদিত হইয়া রণ-পণ্ডিত উৎসর্গীকৃত-প্রাণ অধীন জনগণকে সমরে সংনোদিত করিতেন; তৎকালে তাঁহাদের প্রতাপভরে দরিদ্রের কুটীর ও রাজার অট্টালিকা সমকালেই বিকম্পিত হইত। যদি সৌভাগ্য-ক্রমে তাঁহারা রাজ-সকাশে কোন মর্য্যাদা বা অধিকার গ্রহণে সমর্থ হইতেন, দাসত্ব-শৃঙ্খল-প্রপীড়িত তাঁহাদের প্রজা-পুঞ্জকে তাহার কিছুমাত্র অংশ দিতেন না। যদি এই হতভাগ্য প্রজাপুঞ্জ কখন স্বাধীনতা সমর্থনের জন্য স্ব স্ব প্রভুর বিরুদ্ধে সমুত্থান করিত, তাহা হইলে এই দুর্দ্ধর্ষ সামন্তগণ তৎক্ষালে তাহাদিগকে ধনপ্রাণে সমাহিত করিতেন। ফ্রান্সে জ্যাক্‌কুইরীর,—ইংলণ্ডে ওয়াট্‌ টাইলরের,—বেল্‌জিয়মে ফ্লেমিংসদিগের বিদ্রোহ,—যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত নিরারিত হইয়াছিল এরূপ নিষ্ঠুরতার

অনুরূপ নিদর্শন ইতিবৃত্তে আর দৃষ্ট হয় না। আশৈশব শস্ত্রদীক্ষিত, আপাদ-মস্তক লৌহ-কঞ্চুক-মণ্ডিত, রণ-বীরদিগের সহিত স্বাধীনত্ব-সংগ্রামে প্রজাপুঞ্জের অশস্ত্র বীরোন্মাদ ও রণোৎসাহ কুণ্ঠিতাগ্র হইয়াছিল। অবশেষে এই দীন ও হীনবল প্রজাপুঞ্জ দুর্দ্দান্ত বীর প্রভুদিগের সহিত সমরে পরাস্ত হইয়া তাঁহাদিগের দাসত্ব স্বীকার করিল।

কিন্তু সামন্তগণের যে বীরদর্প ও প্রবল প্রতাপ বল দ্বারাও খর্ব্ব হয় নাই, ঐশ্বর্য্যের বলক্ষয়-কারিণী শক্তি দ্বারা সেই বীরদর্প ও প্রবল প্রতাপ ক্রমে অন্তঃসার-শূন্য হইয়া উঠিল। এবং প্রজাপুঞ্জের যে দাসত্বমোচনের জন্য সহস্র সহস্র ব্যক্তি জীবন পরিত্যাগ করিয়াও কৃতকার্য্যতা লাভ করেন নাই, উৎপীড়কদিগের নিজ নিজ দুরভিলাষ ও বিলাসিতা হইতেই সেই দাসত্বোন্মোচন স্বয়ং-সিদ্ধ হইয়া উঠিল। যত দিন পর্য্যন্ত সামন্তেরা—অধীন জনগণ দ্বারা পরিরক্ষিত, প্রাকার-পরিবেষ্টিত স্ব স্ব গ্রাম্য দুর্গে—বাস করিতেন, ততদিনই তাঁহাদিগের পরাক্রম দুরতিক্রমণীয় ছিল। কিন্তু যখন তাঁহারা স্ব স্ব গ্রাম্য দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীর আমোদ প্রমোদে মত্ত হইলেন; যখন তাঁহাদিগের অসিচর্ম্ম প্রভৃতি বীরসজ্জা সকল কোষরুদ্ধ হইল এবং যখন তাঁহাদিগের অতুলবিভব রাজধানীর অসংখ্য প্রলোভনে ব্যয়িত হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা রাজা ও প্রজা উভয়েরই ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠিলেন। প্রজাপুঞ্জ বহুকালাবধি প্রভুর অদর্শনে তাঁহাদিগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা সমরে প্রভুর অনুবর্ত্তনে ক্রমে বিরত হইতে লাগিল। নগরীর প্রলোভন-পরম্পরায় মুগ্ধ হইয়া প্রভুরাও ক্রমে স্ব স্ব প্রজাপুঞ্জের উপর বীতস্নেহ হইয়া উঠিলেন। মণি-মুক্তা-হীরক-খচিত রাজকীয় অমূল্য অলঙ্কার,—দুগ্ধফেননিভ-শয্যা-সমবেত সুবর্ণমণ্ডিত রাজকীয় পর্য্যঙ্ক,—চিত্তোন্মাদিনী রাজকীয় সৌধরাজি,—অগণ্যপণ্য-পরিপূর্ণ আপণশ্রেণী,—অমূল্য-ভূষণ-ভূষিতা রূপ-যৌবন-সম্পন্না নাগরিকী বারবিলাসিনী,—এই সকল নগর-সুলভ প্রলোভন-পরম্পরা তাঁহাদিগের ধনলালসা দিন দিন অধিকতর উদ্দীপিত করিতে লাগিল। এইরূপে যেমন সামন্তদিগের দুর্দ্দমনীয় প্রতাপ ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদিগের স্বাধীনতার পথ আপনিই পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল।

ক্রমশঃ।

শত্রুসিংহ।

সপ্তম অধ্যায়।

অন্তরে ঝড়।

মহাবলসিংহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পারিষদ্বর্গও একে একে গাত্রোত্থান করিয়া গমন করিতে লাগিল। মন্ত্রী মহাশয় এখনও গাত্রোত্থান করেন নি, আমাদের সেই যুবককে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছেন। অন্যান্য দুই এক জন কর্ম্মচারীও এক এক বার যুবকের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। কিন্তু সকলেই নিস্তব্ধ, কাহারও মুখে একটীও কথা নাই। দর্শনেন্দ্রিয়ই সে কার্য্য করিতেছে, তাহাও অতি সংকুচিত ভাবে। যুবক এ সকল কিছুই লক্ষ্য করিতেছেন না। আপনার হৃদয়ের ভারে আপনিই অচল হইয়া আছেন। সহসা শূন্য নয়নে একবার মন্ত্রীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন, সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। মন্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। যুবক তাহা দেখিতে পাইলেন না। যুবক কিছু দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন, মন্ত্রী মহাশয় বৃদ্ধ, তত দ্রুত চলিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দুর যুবকের অনুসরণ করিয়া তাঁহার মনে কি উদয় হইল, তিনি ফিরিয়া অন্যদিকে গমন করিলেন। যুবক এক মনে গমন করিতেছেন। একবার ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন কেহই তাঁহার অনুসরণ করিতেছে না, গমনবেগ হ্রাস করিলেন, কয়েক পদ গমন করিয়া একটী ছোট ফটকের নিকট উপস্থিত হইলেন, ফটক অতিক্রম করিয়া প্রবেশ করিলেন।—কোথায় প্রবেশ করিলেন?—বাগানে। বাগানটী কোথায়?—রাজভবনের ঈশান কোণে। বাগানে কেন প্রবেশ করিলেন?—এখন ত বেলা প্রায় দুই প্রহর! জ্যৈষ্ঠ মাস, সূর্য্যদেব সগর্ব্বে আপনার তেজ প্রকাশ করিতেছেন, পাছে নিশা আসিয়া তাঁহার দিবা-নিক্ষিপ্ত তেজঃপুঞ্জকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে, পাছে পৃথিবী আবার শীতলা হয়েন, পতির কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াও পাছে মেদিনী পতির শত্রুবর্গের সাহায্যে আবার সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিতে পারেন, এই আশ-

ক্ষায় ক্রোধ-লোহিত মার্ত্তণ্ড প্রাণপণে আপনার তীক্ষ্ণ কর-জাল নিক্ষেপ করিতেছেন। পতির অপ্রিয়া পৃথিবী পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাউক, ভস্ম হইলে কেহই উহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিবে না। এই রূপ ভাবিয়াই মার্ত্তণ্ড এমন জ্বলন্ত পাবক বৃষ্টি করিতেছেন, জীব জন্তু সকলই পুড়িয়া ছার খার হইয়া যাউক, উহাদের কৃতঘ্না জননীর যে গতি উহাদেরও সেই গতি এই ভাবিয়া দিননাথের হৃদয়ে দয়ার লেশ মাত্র উদিত হইতেছে না।—এরূপ ভয়ঙ্কর সময়ে একাকী অনাহারে যুবক উদ্যানে প্রবেশ করিলেন কেন?—কেন প্রবেশ করিলেন, চল না গিয়ে দেখি।

বাগানটী খুব বড়, প্রায় বিশ ত্রিশ বিঘা হইবে। বাগানের চারি ধারেই প্রাচীর, মধ্যস্থলে একটী সরোবর, সরোবরের চারি পাড়ে চারিটী বাঁধান ঘাট, প্রত্যেক ঘাটের দুই পার্শ্বে দুইটী করিয়া বকুল গাছ। নানাজাতীয় বৃক্ষাদি বাগানের শোভা সম্পাদন করিতেছে। এখনকার মতন বিদেশীয় বৃক্ষাদি বাগানে একটীও নাই। তখন বিদেশীয় বৃক্ষাদির এত প্রাদুর্ভাবও ছিল না। এখনকার মতন নানাজাতীয় কলমের গাছে উদ্যান শোভিত নহে। স্বভাবজাত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল মস্তক উন্নত করিয়া মেঘের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। চতুর্দ্দিকে আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা প্রভৃতি নানা প্রকার বৃক্ষ আপন আপন ফল-ভরে বিরাজ করিতেছে। বাগানের শৃঙ্খলা নাই। নাই থাকুক, স্বভাবজাত সৌন্দর্য্যে উদ্যানটী এক অপূর্ব্ব গভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। বৃক্ষগণের ছায়াতে উদ্যানে সূর্য্যের উত্তাপ নিবারিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক স্থির নিস্তব্ধ। পক্ষীগণ আপন আপন বাসায় লুক্কায়িত রহিয়াছে। পিপাসায় তাহাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, নতুবা এরূপ নীরবে রহিয়াছে কেন? সরোবরের চারি ধারে ফুলের বাগান, গোলাপ, মল্লিকা, জুই, গন্ধরাজ, টগর প্রভৃতি নানাজাতীয় সুরভি পুষ্পবৃক্ষে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদিত। বৃক্ষ সকল পুষ্পে পরিপূর্ণ। কিন্তু এ সময়ে গন্ধের লেশ নাই। প্রখর রৌদ্রে হয়ত গন্ধ শুকাইয়া গিয়াছে।

সরোবরে যে চারিটী ঘাট আছে, চারিটিতেই চাতাল আছে। চাতালগুলি মাধবী লতার চন্দ্রাতপে আবৃত। লতাবরণ গুলি এরূপ ঘন যে, সূর্য্যরশ্মি কোন মতেই প্রবেশ করিতে পারে না। চারিটী চাতালেরই দুই ধারে সান বাঁধান বসিবার স্থান আছে। যুবক পশ্চিম ধারের চাতালে গিয়া উপবেশন করিলেন। বাগানের কোন দিকেই তাঁহার দৃষ্টি নাই। সূর্য্যের খরতর কিরণাঘাতে প্রকৃতির কিরূপ অবস্থা হইতেছে! বিশাল বৃক্ষাবলি কেমন সাহস ও সহিষ্ণুতার সহিত সেই আঘাত সহ্য করিতেছে! গোলাপ মল্লিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর বৃক্ষ সকল হতাশ হইয়া সহস্র সহস্র পুষ্পনেত্র বিস্ফারিত

করিয়া—কেমন ছল ছল করিয়া চাহিয়া, রহিয়াছে।—এ সকল দেখিতে তাঁহার ইচ্ছাও নাই—অবকাশও নাই। তিনি অনেকক্ষণ নিশ্চল ও নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিলেন, প্রায় আধ ঘণ্টা এই রূপে অবস্থিতি করিয়া সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া পশ্চিম দিকে—যে দিকে রাজভবন,—সেই দিকে সতৃষ্ণ নয়ন পরিচালিত করিলেন। নয়নদ্বয় যাইয়া একটী ক্ষুদ্র দ্বারের নিকট নামিয়া গেল। নামিয়াই আবার ফিরিয়া আসিল, যুবক পুনরায় উপবেশন করিলেন।—"অনুপমা কি এখনও নিশ্চিন্ত আছে?—এখন কি নিশ্চিন্ত থাকিবার সময়?—মস্তকোপরি কাল সর্প দংশন করিবার উদ্যোগ করিতেছে, জীবনের মত নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, এখন ও কি হুঁশ হয় নাই? এ যম-পুরীতে কি তার আর নিস্তার আছে?—নিস্তারের ত কোন উপায়ই দেখিতেছি না।—সকলেই বিপক্ষ, সাহায্য করে এমন একজনও নাই।—উপায় কি?—দাদা ত একরূপ নির্ব্বাসিত হইয়াছেন।—দাদা নির্ব্বাসিত হইলেন,—তাঁহার আর এ মহাবলপুরে আসিবার সম্ভাবনা নাই—অনুপমা ইহাতেও নিশ্চিন্ত রহিয়াছে?—তবে কি? নানা—এরূপ চিন্তা মনে করিলেও পাপ, ঘোর পাপ—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! অনুপমা অতি পবিত্র-প্রকৃতি, তাঁহার মন অটল।—প্রতিজ্ঞা স্থির।—তবে কি অনুপমা আমার কথা ভুলিয়া গিয়াছে?—সভাভঙ্গের পর আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিব বলিয়াছিলাম তাহার কি সে কথা মনে নাই?—আমিত এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম, কৈ এখনও ত দেখা নাই।—চতুর্দ্দিকে শত্রুমণ্ডলী এখানে আর অধিক ক্ষণ থাকা উচিত নয়।" এইরূপ চিন্তার পর যুবক উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উদ্যোগ করিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দুই এক পদ গমনও করিলেন।—আবার ফিরিলেন, মনে কি উদয় হইল পুনর্ব্বার উপবেশন করিলেন।—ক্ষণকাল নির্নিমেষ নেত্রে সেই দ্বার দেশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন।—এখনও কাহার ও দেখা নাই। যুবক নিশ্চয় মনে করিলেন অনুপমা আসিলেন না।—তবে আর সে খানে অপেক্ষা করিয়া ফল কি?—বাগান হইতে চলিয়া যাওয়াই ভাল।—গাত্রোত্থান করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। দুই পা এক পা যান আবার ফিরিয়া দেখেন।—একটু দাঁড়ান যদি তখন ও অনুপমা আসেন।—অনুপমা তখন ও আসিলেন না—যুবক ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন।

"বীরসিংহ বীরসিংহ" সহসা এই শব্দ যুবকের কর্ণ-গোচর হইল, তিনি অমনি ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন অনুপমা।—চরণদ্বয় আপনারাই থামিয়া গেল, আপনারাই ফিরিয়া বীরসিংহকে অনুপমার সম্মুখে লইয়া গেল, বীরসিংহ জানিতে ও পারিলেন না। বীরসিংহ বসিলেন, অনুপমা ও বসিলেন।

বীরসিংহ মনে করিয়াছিলেন অনুপমাকে একটু তিরস্কার করিবেন, তাঁহার এইরূপ উদাসীনতার জন্য তাঁহাকে দুই এক কথা বলিবেন।—তাহা পারিলেন না। বীরসিংহ কথা কহিবার পূর্ব্বেই অনুপমা অতি মৃদুস্বরে বলিলেন "বীরসিংহ! তুমি আমার উপর বিরক্ত হইয়াছ, আমার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ?"—

বীরসিংহ অনুপমার বাক্যে 'না' বলিবেন, স্থির করিয়াছেন, 'না' শব্দ মুখে আগত প্রায়ও হইয়াছে, কিন্তু অনুপমা সে শব্দ বহির্গত হইতে দিলেন না।

"তোমার অস্বীকার করিবার যো নাই, তোমার চক্ মুখের ভাব দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিতেছি তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছ। তোমার দোষ নাই। আমার আসিতে বিলম্ব কেন হইয়াছে তা জানিলে তুমি কখনই আমার উপর বিরক্ত হইতে না।"

অনুপমার এই শেষ কথাটী শুনিয়া বীরসিংহের মুখের ভাব আর এক রূপ হইল। ঠোঁট দুইটী কাঁপিতে লাগিল, নাসাগ্র ও ললাটপ্রদেশে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতে লাগিল। ভ্রূদ্বয় আপনাদের সরল ভাব পরিত্যাগ করিয়া ঈষৎ বক্রভাব ধারণ করিল। দক্ষিণ হস্ত আপনা আপনি কটিদেশস্থ কৃপাণমুষ্টি স্পর্শ করিল।—অনুপমা দেখিলেন—বেশ বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন "বীরসিংহ! তুমি চঞ্চল হইতেছ কেন?"—

"চঞ্চল হইতেছ কেন?"—বীরসিংহের মুখে এই বাক্যটী প্রতিধ্বনিত হইল! তাঁহার ঠোঁটে একটু হাসিও আসিল। অনুপমা সেই হাসিতেই বুঝিতে পারিলেন বীরসিংহের মনে কিরূপ কার্য্য হইতেছে।—বুঝিতে পারিলেন সে হাসি কিসের হাসি।—বীরসিংহের মনে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত। সে যন্ত্রণা চক্ষু দিয়া অশ্রুরূপে নির্গত না হইয়া ওষ্ঠ দিয়া হাস্যরূপে নির্গত হইল,—বীরসিংহ বুঝিতে পারিয়াছেন, অনুপমার বিলম্ব ইচ্ছা-পূর্ব্বক নহে।—কোন নূতন বিঘ্ন তাঁহার আগমনে বাধা দিয়াছে।—"এ নূতন শত্রু কে?—তাহাকে এখনই নিপাত করিব"। এই মনে করিয়া তাঁহার হস্ত অপরিজ্ঞাতরূপে তরবারি স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু যখন অনুপমা বলিলেন, "চঞ্চল হইতেছ কেন?"—তখনই তাঁহার সমস্ত অবস্থা মনে হইল। তিনি একাকী, অসহায়, নিরুপায়। এখন সহসা কোন দুঃসাহসিক কার্য্য করিলে ফল নাই বরং সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তাঁহার বিপদ—নিজের বিপদে তিনি কিছুমাত্র ভয় করেন না—অনুপমার বিপদ্।—অভীষ্ট সিদ্ধির সম্পূর্ণ ব্যাঘাতের সম্ভাবনা, এই ভাবিয়াই তাঁহার মনের চঞ্চল ভাব তিরোহিত হইল।—আত্মাবজ্ঞার চিহ্ন স্বরূপ সেই করুণ-হাস্য টুকু ঠোঁটে আসিল।—তিনি স্থির হইলেন। অনুপমার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য উৎসুক হইলেন। বলিলেন অনুপমা!

তোমার আসিতে বিলম্ব হইল কেন ?"

"রাজমহিষী কমলাদেবীর নিকট বসিয়া আছি, দেবী আমাকে নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে আশ্বাস দিতেছেন, এমন সময়ে সহসা দুন্দুভিধ্বনি শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম সভা ভঙ্গ হইল। দেবীর নিকট বিদায় হইয়া এই থানে আসিব মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি,এমন সময়ে মহারাজ সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।"

"তার পর ?"

"আমি দেবীর নিকট বিদায় না লইয়াই ঘর হইতে বহির্গত হইতেছি, মহারাজ নিবারণ করিলেন, দেবীও নিবারণ করিলেন, কাজেই বসিতে হইল।"

"তার পর ?"

"মহারাজ দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'রাণী আমি অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে স্থির করিয়াছি'।"

"তার পর ?"

"দেবী বলিলেন মহারাজ! কি স্থির করিয়াছেন ?"

"তার পর ?"

"মহারাজ বলিলেন অনুপমাকে বিবাহ করাই স্থির।"

আর প্রশ্ন করিতে বীরসিংহের ক্ষমতা হইল না। তিনি চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিলেন, বোধ হইল যেন সহসা শূন্যে নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছেন, সেখান হইতে বেগে ভূমিতে পতিত হইতেছেন। মস্তক ঘূর্ণায়মান ইন্দ্রিয় সকল অবশ।—

অনুপমা বলিলেন "বীরসিংহ ও কি ? স্থির হও, এখন ও তুমি সকল কথা শোননি।"—বীরসিংহ স্থির ভাব ধারণ করিলেন, অনুপমার কথায় মনোনিবেশ করিলেন।

"কমলা দেবী রাজার এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া গেলেন। ক্ষণকাল চিত্রপুত্তলীর ন্যায় অবস্থিতি করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বলিলেন মহারাজ! আপনার এরূপ অভিপ্রায় বাতুলবৎ। অনুপমা আমার কন্যার সমান। আপনি জীবনের শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। অনুপমা বালিকা, কন্যার উপযুক্ত, আমি অনুপমাকে কন্যার মত স্নেহ করি। অনুপমা আমাকে মা বলে, আপনি কিরূপে বলিলেন অনুপমাকে বিবাহ করিবেন। ছি ছি আপনাকে ধিক্! আপনার বুদ্ধিকে ধিক্! আপনার মন্ত্রীকেও ধিক্!"

বীরসিংহ এতক্ষণ নির্জীব পুত্তলীর ন্যায় বসিয়া ছিলেন। তাঁহার একটু জীবনের সঞ্চার হইল। মনে করিলেন কমলা দেবীর বাক্য বুঝি রাজার হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার করিয়া দিবে। বুঝিলেন না যে সে আশা বৃথা, যাহার মনে দয়া নাই—যাহার হিতাহিত বিবেচনা নাই—ধর্ম্মাধর্ম্ম কাহাকে বলে যে জানে না—তাহার মন আবার কোমল হবে। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিই যাহার জীবনের একমাত্র

উদ্দেশ্য সে আবার কাহারও কথা শুনিয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।—বীরসিংহ অনুপমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেবীর কথায় রাজা কি উত্তর দিলেন ?"

অনুপমার মুখে আর কথা আসিল না, কণ্ঠরোধ হইল। বীরসিংহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন।—তখন অনুপমা অস্ফুট স্বরে "বলিলেন, দুদিন আগেই হউক আর দুদিন পরেই হউক আমি অনুপমাকে বিবাহ করিব, কাহারও সাধ্য নাই যে, আমাকে নিবারণ করে। যে আপনার মঙ্গল চায় সে আমাকে কখনও নিবারণ করিবে না। এই কথা বলিয়া-আমার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মহারাজ ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। কমলা দেবী বাক্যরহিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। আমিও সেখান হইতে এই আসিতেছি।"

"'যে আপনার মঙ্গল চায় সে নিবারণ করিবে না,—মহাবলসিংহ এত দূর পাগল হইয়াছেন।—আচ্ছা আমি নিবারণ করিব, দেখিব কিছু করিতে পারি কি না!—আমার জীবনের প্রয়োজন কি ?—আমার জীবনের মূল্যই বা কি ?"—এই কথা বলিয়া—আস্তে আস্তে এই কথা গুলি উচ্চারণ করিয়া—বীরসিংহ গাত্রোত্থান করিলেন। অনুপমা যাইতে নিষেধ করিলেন। বীরসিংহ আবার বসিলেন।

অনুপমা বলিলেন, "বীরসিংহ! তুমি কি পাগল হইয়াছ ? মহারাজের সহিত বিবাদ করা কি তোমার সম্ভব, তা হলে কি আর রক্ষা থাকিবে ?"

"তবে কি আমি জীবিত থাকিতে তোমার এইরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিবে, আমি তাহা চক্ষে দেখিব ?"

"বীরসিংহ! আমার কপালে যা আছে তাই হবে। আমার জন্য তোমরা কেন কষ্ট পাবে। দেখ আমার জন্যে তোমার দাদা এখান হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। তুমি আবার আমার জন্যে কেন ক্লেশে পতিত হইবে ?"—

অনুপমা যখন এই কথা গুলি বলিলেন, তখন তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। সে কণ্ঠরোধ নাই সে বাক্যের জড়তা নাই। সে ঘন ঘন নিশ্বাস নাই, সে সব কিছুই নাই। তখন অনুপমা মনে মনে কি স্থির করিয়াছেন, তাঁহার মন স্থির হইয়াছে, অনুপমা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন।—বীরসিংহও দাঁড়াইয়া আছেন।—অনুপমার মুখে ঈষৎ প্রফুল্লতার আভা দেখা দিয়াছে।—সন্দেহে—অস্থিরতায় মন নিতান্ত কাতর হইয়াছিল—এখন কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিয়াছেন।—মনের সে কাতরতা দূর হইল।—মুখ একটু প্রফুল্ল হইল।—বীরসিংহ এ সব কিছুই দেখিতে পাইলেন না।—দেখিলেও বুঝিতে পারিলেন না। বীরসিংহ অচল জড়মূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান।—চক্ষুদ্বয় নিম্নদিকে নিঃক্ষিপ্ত।—তেজ, বীর্য্য, দয়া, ধীরতা, তাঁহার মুখের এক অতি মনোহর ভাব সম্পাদন করিয়াছে।—বাম হস্ত বাম জানু পর্য্যন্ত লম্বমান। দক্ষিণ হস্ত বদ্ধমুষ্টি হইয়া দক্ষিণ

কটিদেশে সংলগ্ন। মুখে একটীও কথা নাই। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হইতেছে, হৃদয় ঘন ঘন স্ফীত হইতেছে।

অনুপমার দৃষ্টি স্থির ভাবে বীরসিংহের মুখের উপর পড়িয়া রহিয়াছে; তাঁহার ঠোঁট দুইটী এক একবার চঞ্চল হইতেছে।—যেন বীরসিংহকে কি বলিবেন। কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছেন না, সাহস ও হইতেছে না।

দুই জনেই নিস্পন্দ—দণ্ডায়মান, যেন দুইটী প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি। না—এক খানা বড় পটে দুইটি চিত্র। রাফেলের নিজের হাতে আঁকা। রাফেল, তেজ বীর্য্য, ধীরতা, দয়া প্রভৃতি পুরুষ-গুণ-সমষ্টির, এবং নম্রতা, বিনয়, সহিষ্ণুতা, করুণা, প্রভৃতি রমণী-গুণ-সমষ্টির দুইটি মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছেন।—প্রথমটি বীরসিংহ, দ্বিতীয়টি অনুপমা।

রাফেলের হাতের ছবি, ইহাতে কোথাও কোন খুঁত নাই। যেখানে যেরূপ প্রয়োজন সেখানে সেই রূপই আছে। পাঠক! মনে মনে ভেবে দেখ, তাহলেই বুঝিতে পারিবে। মনে কর তুমি যেন দেবরাজ যুপিটরের চিত্র দেখিতেছ। যুপিটর সৃষ্টি লোপ করিতে দৃঢ়-সংকল্প হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। যুনোদেবী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন।—বাক্য দ্বারা নিবারণ করিবার ক্ষমতা নাই জিহ্বা জড়।—চখের ভাবে মুখের ভাবে পতির নিকট কাতরতা প্রকাশ করিতেছেন। প্রিয় পাঠক! যুনোকে যুপিটরের পত্নী মনে না করিয়া প্রিয়তমা ভগিনী মনে কর, তাহা হইলে সাদৃশ্য আরও ঠিক হইবে, এবং লেখকও নিতান্ত অরসিক বলিয়া নিন্দিত হইবে না। তুমি যদি গ্রীক দেবদেবীদের না জান তবে বলে দিই—যুপিটর আমাদের ইন্দ্র, যুনো আমাদের শচীদেবী।

বীরসিংহ ও অনুপমা ঐরূপে চিত্রার্পিতের ন্যায় ক্ষণকাল অবস্থিতি করিলেন।—বীরসিংহ ভূমি হইতে নয়ন উত্তোলন করিলেন। বীরসিংহ কথা কহিলেন।

"অনুপমা! আমি এখন যাই, বেলা অনেক হইয়াছে। তুমি সাবধানে থেকো দেখো যেন——" বীরসিংহ কথা শেষ করিতে পারিলেন না। কথা শেষ না করিয়াই বাগান হইতে দ্রুতপদে বহির্গত হইলেন। অনুপমা বীরসিংহকে কি বলিলেন? বীরসিংহ তাহা শুনিতে পাইলেন না। বীরসিংহ তখন নিজের কথা নিজেই শুনিতে পান না। তাঁর কি সে ক্ষমতা আছে? তখন তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় কেবল নাম মাত্র।

অনুপমার কথা বীরসিংহ শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু আমি পাইলাম, না শুনিয়াও জানিতে পারিলাম। প্রিয় পাঠক! আমরা যে লেখক—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্। বাণভট্ট, স্কট, ডুমা প্রভৃতি মহাত্মাগণের বংশ-সমুদ্ভূত। আমাদের অদৃষ্ট কিছুই নাই, অশ্রুত কিছুই

নাই; অজ্ঞাত কিছুই নাই, অজ্ঞেয় কিছুই নাই।—যদি দেব নিন্দার ভয় না থাকিত তাহা হইলে বলিতে পারিতাম, আমরা সাক্ষাৎ দেব অবতার। আমাদের অসীম ক্ষমতা, স্বয়ং বাগ্‌দেবী আমাদের অনুগত সহচরী,—সর্ব্বদাই আমাদের সেবায় নিরত। যে বস্তুতে ভগবান্ নন্দনন্দনের বংশী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতেই আমাদের লেখনী প্রস্তুত হয়। আবার চতুর্ম্মুখ দেখিলেন, যে কৃষ্ণ-বংশী-বংশজাত অস্ত্রে কেবল স্বজাতীয়া সরস্বতীর দমন হয়, বিজাতীয়া দেবী সে অস্ত্রের শাসনে শাসিতা হয়েন না। অমনি আপনার বাহনের পুচ্ছ হইতে একটি পালক তুলিয়া এক অমোঘ অস্ত্র প্রস্তুত করিলেন। পুরাকালে বৃত্রাসুর-বধের নিমিত্তে দেবতারা মহর্ষি দধীচির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চতুর্ম্মুখ দুষ্ট-দমনের নিমিত্তে হংসপুচ্ছে এই এক নূতন বজ্র প্রস্তুত করিলেন। পাঠক! সে অস্ত্রও আমাদের নিকট আছে। আমরা তাহা দ্বারাই বিজাতীয়া সরস্বতীর শাসন করি।—যে নির্ব্বোধ আমাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, আমরা তাহাকেও এই দ্বিবিধ অস্ত্র দ্বারা শমন-ভবনে প্রেরণ করিয়া থাকি।—

পাঠক! আমাদের সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় পাইলে। সর্ব্বজ্ঞতার বিশেষ পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। ক্রমেই জানিতে পারিবে। যাহাই হউক স্বাহঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছি, অনুপমার কথা বীরসিংহ নাই শুনিতে পা'ন, আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম।

"বীরসিংহ! তোমরা সুখে থাক, তুমি সুখে থাক, তোমার দাদা সুখে থাকুন, আমার সুখের শেষ হইয়াছে।"—এই কথা বলিয়াই অনুপমা দ্রুতবেগে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। বীরসিংহও ত্বরিত পদে উদ্যান হইতে বার্গিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

হতাশে শান্তি।

রাজা মহাবল সিংহ যখন সহধর্ম্মিণী কমলা দেবীকে সেই নিদারুণ কথা বলিয়া বহির্গত হইলেন, "আমি অনুপমাকে বিবাহ করিব, যে আপনার মঙ্গল চায় সে নিবারণ করিবে না" এই নিষ্ঠুর বাক্য যখন পতি-রতা কমলার কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিল তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার সুখের শেষ হইয়াছে। কমলা পতিকে মনের সহিত ভাল বাসিতেন, দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন, পতি যথেচ্ছাচারী অননুরক্ত অন্যানিরত, তথাপি তিনি কমলার পতি,—দেবতুল্য। পতির যত দোষ থাকুক তিনি কমলার শ্রদ্ধার বস্তু। কমলা পতিকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভাল বাসিতেন। তাঁহার ভাল বাসা পবিত্র, স্বার্থ-শূন্য।—পতি

তাঁহাকে ভাল বাসেন না তিনি জানেন, তথাপি তাঁহার ভাল বাসার হ্রাস নাই।

কমলা জানেন পতি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত নন, তবে অনুপমাকে বিবাহ করিলে তাঁহার ক্ষতি কি? তিনি কি সামান্য নারীর মতন কেবল ঈর্ষার বশবর্ত্তিনী,—অনুপমা তাঁহার সপত্নী হইবে,—তিনি তাহা চক্ষে দেখিতে পারিবেন না। এই জন্যই কি রাজার প্রতিজ্ঞা তাঁহার কর্ণে এমন নিদারুণ বলিয়া বোধ হইল। —না।—কমলা পতির প্রণয়ের আশা অনেক কাল ছাড়িয়া দিয়াছেন, পতি পুনর্ব্বার বিবাহ করুন আর নাই করুন, তাঁহাকে ভাল বাসেন না,—ভাল বাসিবেন না। তবে তিনি কেন সপত্নীর ভয় করিবেন?—অনুপমা রাজাকে ভাল বাসে না,—বিজয়কে ভাল বাসে। রাজা যদি অনুপমাকে বিবাহ করেন তাহা হইলে অনুপমার সুখ জন্মের মতন শেষ হইবে। কমলা জানেন, প্রকৃত প্রণয় কাহাকে বলে রাজা তাহা জানেন না, তিনি কেবল ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া অনুপমাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।—পতি এই দুস্তর পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইতে যাইতেছেন, পতঙ্গের ন্যায় এই ভয়ঙ্কর দুঃখানলে পড়িতে যাইতেছেন,—কমলা তাঁহাকে নিবারণ করিতে গিয়াছিলেন, পতিকে সুখে রাখিতে পারিলেই তাঁহার সুখ। পতির যহাতে কোন অমঙ্গল না ঘটে এই চিন্তাই তাঁহার সর্ব্বদা।—পতি তাঁহার কথা শুনিলেন না—তাঁহার কথা শুনিবেন না।—কমলার সুখের শেষ হইল,—তাঁহার পতির সুখের শেষ হইল,—তাঁহারও সুখের শেষ হইল। —কমলা হতাশ হইলেন,—কমলা অজ্ঞান হইলেন।—কি করিবেন,—উপায় কি?—কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।—জড়পিণ্ডের ন্যায় ক্ষণকাল বসিয়া রহিলেন, অবশেষে গাত্রোত্থান করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন।

এই দিন অবধি কমলা দেবী আর রাজাকে কোন কথা বলিবেন না স্থির করিলেন। রাজা কাহারও কথা শুনিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহাকে আর কোন কথা বলিয়াই বা প্রয়োজন কি?—কিন্তু পতির সুখের চিন্তা কমলার হৃদয় হইতে তিরোহিত হইতে পারিল না। কমলা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখনও কিসে পতিকে সুখী করিতে পারি। মনে মনে স্থির করিলেন।—

"মহারাজ অনুপমাকে বিবাহ করিলে সুখী হন, ভাল, তিনি যাহাতে অনুপমাকে বিবাহ করিতে পারেন, আমি সে চেষ্টা করিব। অনুপমার যাহাতে মত হয় আমি তাহা করিব।—আহা! অনুপমার সুখ যে জন্মের মত ফুরাইয়া যাইবে।—বিজয়ের সুখ ও সেই সঙ্গে ফুরাইবে।—বিজয় যে আমাকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করে, দিদির মৃত্যুর পর আমি যে বিজয়কে আর বীরকে আপনার ছেলের মত মানুষ করেছি।—এক জন্মের

জন্য কি আমি এত লোকের সুখ নষ্ট করিব?—এমন গুরুতর পাপে কিরূপে লিপ্ত হব।—না—পতি যে আমার ইষ্ট-দেবতা, আমি যে কোন প্রকারেই হউক ইষ্ট দেবতাকে তুষ্ট রাখিব।—তাহাতে আমার পাপ নাই।—যাদের সুখের জন্য আমার মন সর্ব্বদাই চিন্তিত সেই সকল প্রিয় বস্তুর সুখ পতির সন্তোষের নিমিত্ত বলি প্রদান করিব।—বিজয়ের সুখ, বীরের সুখ, অনুপমার সুখ, সকলের সুখ, মহারাজের সামান্য সুখের জন্য নষ্ট করিব।—আমার সুখ অনেক দিন বিসর্জ্জন দিয়াছি।"—আজ হইতে এই চিন্তা কমলা দেবীর চিত্ত অধিকার করিল। চিন্তা প্রতিজ্ঞায় পরিণত হইল। কমলার মন স্থির ভাব ধারণ করিল।—কমলা এই কঠোর ব্রতে মন সমর্পণ করিলেন, পতির সন্তোষের নিমিত্তে অনুপমার সর্ব্বনাশে—বিজয়ের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইলেন।

বীরসিংহ! আমার সুখের শেষ হইয়াছে" এই হৃদয়-বিদারক বাক্য যখন অনুপমার মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল, তখন কি অনুপমা জানিতে পারিয়াছিলেন যে কমলা দেবীও তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছেন, পতির সুখের জন্য স্নেহের লতা অনুপমার জীবনের মূলে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।—তাহাতেই কি অনুপমা বীরসিংহকে সেই কথা বলিলেন, সেই শেষ বাক্য বলিয়া নিলেন?—তাহা নহিলে অনুপমা এমন হতাশ হইলেন কেন? কিসে জানিলেন যে তাঁহার সুখের একেবারে শেষ হইয়াছে;—এখনও বিজয়সিংহ জীবিত, এখনও বীরসিংহ জীবিত, তবে তাঁর সুখের আশা কি করিয়া জন্মের মতন নির্ম্মূল হইল?—অনুপমা জানিলেন, তাঁহার সুখের শেষ হইয়াছে, তাঁহার জীবনের ও শেষ হইয়াছে। মহাবল সিংহ যাহা মনে করিয়াছেন, তাহা করিবেন। তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিবেন, কাহারও নিবারণ শুনিবেন না।—কেহ নিবারণ করিবেন না,—অনুপমা যখন মহাবল সিংহের প্রতিজ্ঞা শুনিলেন তখনই জানিলেন তাঁহার কি দশা হইবে।—যখন উদ্যানে বীরসিংহকে বলিলেন, "আমার সুখের শেষ হইয়াছে" তখনই স্থির করিয়াছেন কি করিতে হইবে।—প্রাণ-বিসর্জ্জন ভিন্ন অনুপমার পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। মহাবল সিংহের গ্রাস হইতে এড়াইবার আর পথ নাই। অনুপমা স্থির করিলেন প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন।—সহসা প্রাণ ত্যাগ করিলেন না। শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। তাঁহার প্রাণ তাঁহার নিজের হাতে। যখন ইচ্ছা ছাড়িয়া দিতে পারেন। কিন্তু শেষ না দেখিয়া ছাড়িবেন না মনে করিলেন।—অনুপমারও মন স্থির হইল।

কমলা দেবী স্থির হইলেন, অনুপমাও স্থির হইলেন।—বীরসিংহের দশা কি হইল?—বীরসিংহও স্থির হইলেন; তিনি কমলা দেবীর মত অনুপমাকে মহাবল

সিংহের তৃপ্তির নিমিত্তে বলি প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির হইলেন না।—অনুপমার মত "সব শেষ হইয়াছে, কি করিব, প্রাণ বিসর্জ্জন দিব," বলিয়াও মন স্থির করিলেন না।—বীরসিংহ বুঝিলেন ঘোর বিপদ্।—কিন্তু যেমন করিয়া হউক সেই বিপদ্ নিবারণ করিবেন।—অনুপমাকে মহাবল সিংহের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন। বিজয় সিংহের হস্তে তাঁহাকে প্রদান করিবেন।—বীর সিংহ দেখিলেন শত্রু চতুর্দ্দিকে, শত্রুপক্ষ প্রবল। তিনি একাকী অসহায়।—কিন্তু বীরসিংহ তেজস্বী—বীরসিংহ সাহসী,—বীরসিংহ বুদ্ধিমান্। উপস্থিত বিপদ্ অতি গুরুতর হইলেও বীরসিংহ তাহাকে তুচ্ছ মনে করিলেন।—তাঁহার জীবন তুচ্ছ, সুখ তুচ্ছ, সকলই তুচ্ছ। অনুপমাকে পিতৃব্যের হস্ত হইতে উদ্ধার করাই তাঁহার জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য, অনুপমাকে বিজয় সিংহের হস্তে প্রদান করিতে পারিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হয়।—তিনি অনুপমাকে বিজয় সিংহের হস্তে প্রদান করিবেন।—তাহাতে প্রাণ যায় যাউক। রাজ্য ছারখার হয় হউক।—পিতৃব্যের প্রাণ ও ইহার কাছে তুচ্ছ। পিতৃব্যকে অনুপমা দিবেন না।—পিতৃব্যকে নিবারণ করিবেন।—যদি সহজে নিবৃত্ত না হন—মহাবল সিংহের জীবনের শেষ হইয়াছে।—ইহলোক হইতে তাঁহাকে বিদায় হইতে হইবে। বীরসিংহ সহস্তে মহাবল সিংহের মস্তক ছেদন করিবেন।—নরহত্যার পাতকী হইবেন।—গুরুহত্যার পাতকী হইবেন।—তথাপি অনুপমাকে পিতৃব্যের হস্তে প্রদান করিবেন না।—বীরসিংহ স্থির হইলেন।

মহাবল সিংহও স্থির হইয়াছেন।—অনুপমাকে বিবাহ করিবেন, কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না।—তবে তিনি স্থির না হইবেন কেন?—মনে করিলে আজই অনুপমাকে বিবাহ করিতে পারেন।—যখন ইচ্ছা তখনই পারেন। অনুপমা তাঁহার হস্তগত।—শীকার করতলস্থ হইলে ব্যাঘ্র কেনই না স্থির হইবে?—মহাবলসিংহ স্থির হইলেন।—মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলেন, কএক দিবস বিলম্ব করা স্থির হইল। বিলম্ব করা মহাবলসিংহের মত নয়।—শুভস্য শীঘ্রং,—শুভকর্ম্মে একদিনও বিলম্ব করা উচিত নয়। কিন্তু মন্ত্রীর মত বিলম্ব করা, কাজেই তাঁহাকে বিলম্ব করিতে হইল।

নগরের উৎসব কিছু দিনের জন্য বন্ধ হইল। রাজ বাটীর সমারোহ কমিয়া গেল। অনেকের মনে ক্লেশ হইল। এমন আমোদটা হাতের কাছ থেকে সরিয়া গেল। ক্লেশ না হইবে কেন?—এমন মহাসমারোহ সহসা থামিয়া গেল—ক্লেশ না হইবে কেন?—প্রিয় পাঠক! চল আমরাও এখান হইতে পলায়ন করি, সমারোহ কমিয়া গেল আমরা আর কি সুখে এখানে থাকি?—চল শত্রুসিংহের বাটীতে যাই দেখি গে বিজয় সিংহ কি করিতেছেন।

——১০——

বুদ্ধদেব ও তদুদ্ভাবিত ধর্ম্ম-প্রণালী।

হিন্দু, খৃষ্টীয়, মুসলমান, ও বৌদ্ধ এই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মপ্রণালী পৃথিবীর অধিকাংশব্যাপী। এই চারি প্রকার ধর্ম্মের প্রত্যেকটীই আসিয়াখণ্ডের কোন না কোন স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়া কালক্রমে দিগ্-দিগন্ত-ব্যাপী হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মও আসিয়াখণ্ডেই সমুদ্ভূত। ইহা হিন্দু-ধর্ম্মেরই রূপান্তর মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্রমে তিব্বৎ, চীন, জাপান, পূর্ব্বউপদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি নানা দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হয়। আসিয়াখণ্ডের অধিকাংশ অধিবাসীই বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। কোন সময়ে ভারতবর্ষেও ইহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের অবিরত চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদের দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া তিব্বৎ প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, ও হিন্দুধর্ম্মের জয়লাভ হয়। এই সকল ব্যাপার কত কাল হইল সম্পন্ন হইয়াছিল এক্ষণে তাহা প্রকৃতরূপে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। কিরূপে ও কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের সমুদ্ভব হয়, কিরূপে ইহা দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া উঠে, কি রূপেই বা কালক্রমে ইহার সমুন্নতির বিলোপ হয়, এ সকল তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুর হস্তে কিছুমাত্র প্রকৃত উপায় নাই। সংস্কৃত, পালী, মাগধী প্রভৃতি নানা ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনেকানেক গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু তৎসমুদয় পাঠ করিলে বৌদ্ধদেবের সময় প্রভৃতির বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারা যায় না। ললিতবিস্তরনামে বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্তান্তঘটিত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, সেই গ্রন্থ ও বিদেশীয় পুরাবৃত্ত-রচয়িতাদিগের লিখিত গ্রন্থাদি পাঠদ্বারা যাহা কিছু অবগত হইতে পারা যায়, বৌদ্ধধর্ম্মের রহস্যোদ্ভেদার্থ এতদ্ভিন্ন অন্য কোন নিশ্চিততর উপকরণ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় নাই, ভবিষ্যতে যে কখন পাওয়া যাইবে এক্ষণে সেরূপ আশা করাও সুদূরপরাহত।

খৃষ্টের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের অন্যতম উত্তরাধিকারী সেলিউকসের নিকট হইতে মেগাসথিনিস নামক একজন দূত খৃষ্টের প্রায় ২৯৫ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্তের সভায় উপস্থিত হয়েন। এই ব্যক্তি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় যে রূপ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তাঁহার ভারতবর্ষে আগমন কালে এতদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রচার ও অধিকার সংস্থাপিত হইয়াছিল। খৃষ্টের জন্মের পর দুই তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের

প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত ছিল, তৎকালিক বৈদেশিকদিগের রচিত গ্রন্থাবলী হইতে ইহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার অধিবাসী ক্লেমেন্‌স খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইনিও বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের চতুঃসীমা অতিক্রমপূর্ব্বক দেশদেশান্তরেও লব্ধপ্রসর হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের তাবৎ গ্রন্থই সংস্কৃত, ও পালী ভাষায় রচিত। কালক্রমে এই সকল গ্রন্থ চীন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদিত হয়। অনেকে এরূপ বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থসকল এক সময়ে বা ভিন্ন ভিন্ন কালে সংস্কৃত ও পালী উভয়বিধ ভাষায় রচিত হইয়াছিল তাহার কিছুমাত্র বিনিগমনা নাই। কিন্তু খৃষ্টীয় তৃতীয় ও ষষ্ঠ শতাব্দ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী তাবৎ কালের মধ্যে যে সকল চীন দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই রচনাদৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয় যে বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত তাবৎ গ্রন্থই সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। পরে তৎসমুদয় ক্রমশঃ পালী, মাগধী ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়া থাকে। হিয়ন সাং নামক একজন চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন, যে তিনি তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্মের বিষয় যে যে গ্রন্থ পাঠ করিয়া সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই "ফ্যান" অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। তিনি উক্ত ভাষাকে "সংস্কৃত" এই নামে নির্দ্দেশ করেন নাই বটে, কিন্তু উহার যেরূপ স্বরূপ ও লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসমুদয় অভিনিবেশসহকারে পর্য্যালোচনা করিলে নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইবে যে উল্লিখিত ভাষা সংস্কৃতভিন্ন প্রাকৃত, পালী কি মাগধী প্রভৃতির মধ্যে একটীও হইতে পারে না। এক্ষণে বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধধর্ম্মের তাবৎ গ্রন্থই অগ্রে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়, পরে উহারবিস্তৃতির সহিত উহার গ্রন্থাদিও সিংহল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভাষায় অনুবাদিত বা রচিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় কোন্‌ সময়ে রচিত হয়, তাহার স্থির নিশ্চয় নাই। যতদূর অনুমান করা যাইতে পারে তাহাদ্বারা এই প্রতিপন্ন হয়, এই সকল সংস্কৃত গ্রন্থ খৃষ্টীয় শকের প্রারম্ভেই লিখিত হইয়াছিল। এতাবতা এরূপ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না, যে এই সময়ের অনেক পূর্ব্বেও উক্ত গ্রন্থ সমূহের কোন খানিই রচিত হয় নাই, বরং অনেক গুলিই ইহার অনেক পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, তবে এই সময়ের কতকাল পূর্ব্বে যে এই সকল গ্রন্থ রচিত হইতে আরম্ভ হয় তাহার নিশ্চয় নাই। খৃষ্টের জন্মিবার প্রায় ৭৬

বৎসর পরে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রচার হয়। এই সময়ে ও ইহার কিছু-কাল পর পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত যে সমস্ত গ্রন্থ চীনদেশে নীত হইয়া তথা-কার ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, তৎ-সমুদয়ই সংস্কৃতভাষায় রচিত। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম-ঘটিত তাবৎ গ্রন্থই যে প্রথমে সংস্কৃত ভাষায়, পরে পালী প্রভৃতি ভাষায়, রচিত হইয়াছিল তাহাতে আর সংশয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা শাক্যমুনি নিজ মত সংস্থাপনার্থ স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এরূপ বোধ হয় না। শাক্যমুনি তাঁহার শিষ্যদিগকে মৌখিক উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাঁহার শিষ্যেরা আবার নিজ নিজ শিষ্যবর্গকে উক্ত প্রকারে মৌখিক উপদেশ দিতেন। এই রূপে বেদাদি গ্রন্থের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র সকলও শাক্যমুনির মৃত্যুর পর বহু-কাল পর্য্যন্ত তদ্ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে শ্রুতি-পরম্পরায় প্রচারিত হইত। কোন্ সময় বৌদ্ধধর্ম্মের সূত্র সকল লিখিত হইতে আরম্ভ হয় তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। এ বিষয়ে বৌদ্ধধর্ম্মা-বলম্বীদিগের মধ্যেই অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করিবার উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনটী সভা সংঘটিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের অব্যবহিত পরেই প্রথম সভা হয়, ইহার ১১০ বৎসর পরে দ্বিতীয়, ও ২১৮ বৎসর পরে অর্থাৎ ২৪৬ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় সভার সংঘটন হয়। এই সময়েই তাঁহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রের মূলসূত্র সকল লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। আবার আর এক সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন, যে তৃতীয় সভাধিবেশন বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ৪০০ শত বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৩ অব্দে হইয়াছিল, ইঁহাদের মতে এই সময়েই বৌদ্ধগ্রন্থ সকল সর্ব্ব প্রথম লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। উভয় সম্প্রদায়ই একবাক্যে নি-র্দ্দেশ করিয়া থাকেন, যে এই সময়েই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারার্থ দেশবিদেশে ধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ করার সূত্রপাত হইয়া-ছিল।

সমুদয় বৌদ্ধগ্রন্থ—সূত্র, বিনয়, ও অভি-ধর্ম্ম এই তিন ভাগে বিভক্ত। সূত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র সকল ব্যাখ্যাত আছে। বিনয়কাণ্ডে যতিধর্ম্মের বিস্তর লিখিত, এবং অভিধর্ম্মে পক্ষসংস্থাপনার্থ বিচার। এই ত্রিবিধ গ্রন্থের এক প্রকারও বুদ্ধ-দেবের নিজের রচিত নহে। সকলই তাঁহার শিষ্যদিগের কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্তবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, তিব্বৎ প্রভৃতি তাবৎ দেশের বৌদ্ধ অধিবাসীরা ললিত-বিস্তর নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতেই বুদ্ধ-দেবের জীবন বৃত্তান্ত নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া থাকিবে। ললিতবিস্তর নামক গ্রন্থে বৌদ্ধদেবের জীবন ও লীলার

বিষয় সবিস্তরে বর্ণিত আছে। ইহাতে লিখিত আছে, যে নেপালের নিকটস্থ কপিলবাস্তু নামক নগরে শুদ্ধোদন নামক রাজার ঔরসে ও তাঁহার মহিষী মায়াদেবীর গর্ভে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। বৌদ্ধদিগের মতে মায়াদেবীর কুক্ষিপার্শ্ব হইতে বুদ্ধদেবের উৎপত্তি হইয়াছিল। বুদ্ধদেব শৈশবকালেই তাঁহার চিন্তাশীলতার নিমিত্ত সকলের নিকট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সহচরদিগের সহিত ক্রীড়াকৌতুকে লিপ্ত হইয়া বৃথা কালাতিপাত করিতেন না, অনেক সময় একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। তাঁহার পিতা তাঁহার এইরূপ প্রবৃত্তিদর্শনে "পাছে পুত্র সংসারবিরাগী হয়" এই আশঙ্কায় দণ্ডপাণিনামক কোন ব্যক্তির গোপানাম্নী কন্যার সহিত তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করিলেন, কিন্তু বুদ্ধদেব স্বভাবতই সংসারবিরক্ত ছিলেন, অভিনব পরিণয় দ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণে প্রণয়ের কিঞ্চিৎ মাত্র ও সঞ্চার হইল না। তিনি পূর্ব্ববৎ চিন্তা ও ধ্যান নিমগ্ন হইয়াই কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার আন্তরিক সংসারবিরক্তি অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তিনি সংসার ও জীবন অসার পদার্থ বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিলেন, এই রূপে কিছু দিন অতীত হইলে তিনি অবশেষে সংসারপরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন, এবং পিতা ও বনিতার নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া ঘোর নিশীথ সময়ে অশ্বারোহণে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, কিয়দ্দূরে উপস্থিত হইয়া অশ্ব ও অশ্বপালকে বিদায় দিলেন এবং একাকী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। ললিতবিস্তরপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যে স্থলে তিনি অশ্ব ও অশ্বপালকে বিদায় দিয়াছিলেন তথায় একটী স্তূপ নির্ম্মিত হয়, চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন সাং কুশীনগর পরিদর্শনার্থ যাইবার সময় পথে এই স্তূপ দর্শন করিয়াছিলেন। এক্ষণে গোরক্ষপুরের প্রায় ২৫ ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণে উক্ত কুশীনগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। বাটী হইতে নির্গত হইয়া বুদ্ধদেব বৈশলীনামক স্থানে উপস্থিত হইয়া কোন ব্রাহ্মণের নিকট কিছুদিন অধ্যয়নাদি করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করেন। অবশেষে প্রাচীন গয়ানগরীতে উপস্থিত হইয়া পরম জ্ঞান লাভপূর্ব্বক সিদ্ধ হয়েন। ইহার পর তিনি তাঁহার শিষ্য দিগকে উপদেশ প্রদান করিয়া কিছুদিন অতিবাহিত করেন। গয়া হইতে বুদ্ধদেব কাশীযাত্রা করেন। কাশীতে অবস্থানকালে তিনি বুদ্ধ ও ভগবান্ হইয়া অনেকানেক দেবপুত্র, বোধিসত্ত্ব প্রভৃতি শিষ্যদিগকে নিরন্তর উপদেশ প্রদান করিতেন। কাশী হইতে প্রস্থান করিয়া রাজগৃহ নামক স্থানে যাইবার সময় পথে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয়। সিংহলবাসী বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকেন যে শূকরমাংস আহার করাতে বুদ্ধের পীড়া উপস্থিত হয়, এবং এই পীড়াতেই তাঁহার পরলোক

হয়। কিন্তু একথা যুক্তিযুক্ত ও বিশ্বাসাহ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ বুদ্ধদেব আহারাদির বিষয়ে যৎপরোনাস্তি সংযতবৃত্তি ছিলেন বলিয়া তাঁহার অধিকাংশ উপাসকেরাই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মৃত্যুকালে তাঁহার অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল, সুতরাং এবয়সে স্বাভাবিক পীড়াতেই মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াই প্রতীতি হয়। বুদ্ধদেব মৃত্যুকালে তাঁহার শিষ্যদিগকে এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন, যে তাঁহার শবদেহ দাহপূর্ব্বক উহার ভস্মরাশি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় প্রযত্নসহকারে রক্ষিত হয়। তাঁহার আদেশানুসারে তাঁহার ভস্মীভূত দেহ সর্ব্বপ্রথম কুশীনগরে স্তূপ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় সংরক্ষিত হয়। পরে ক্রমশঃ তাঁহার নানাদেশীয় শিষ্যগণ ঐ ভস্ম পরস্পর ভাগ করিয়া লয়েন এবং প্রত্যেকেই এক একটী বা ততোধিক স্তূপ বা চৈত্য নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় উহা রক্ষিত করেন। এই সময় ও এই উপলক্ষ হইতেই চৈত্যস্থাপন ও চৈত্যবন্দন বৌদ্ধধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গস্বরূপ হইয়া উঠে। কথিত আছে মগধদেশের রাজা অশোক ন্যূনাধিক ৮৪০০০ চৈত্যসংস্থাপন করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণজাতীয়েরা ধর্ম্মাদি বিষয়ে অপ্রতিহতপ্রভাব ছিলেন, অন্যান্য তাবৎ জাতীয় লোকেরাই ব্রাহ্মণদিগের হস্তে ক্রীড়নকস্বরূপ ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগের এই অপ্রতিহত প্রভাবের হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। কিছুকাল বৌদ্ধধর্ম্ম এতদূর প্রবলপ্রতাপ হইয়াছিল যে ব্রাহ্মণদিগের বেদোক্ত সনাতন ধর্ম্ম উহার নিকট পরাজিত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠে। সে যাহা হউক কিছুকালের পর পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হয়েন ও বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের চতুঃসীমা হইতে একবারে দূরীভূত হয়। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে ব্রাহ্মণধর্ম্মের প্রবলপ্রতাপ অসহ্য বোধ হওয়াতেই বুদ্ধদেব বেদবিরুদ্ধ এক নূতন ধর্ম্মের প্রচার করিয়া নিজের ও নিজ সম্প্রদায়ের নিমিত্ত স্বাধীনতা সংস্থাপন করেন। বুদ্ধদেব শাক্যসিংহ, শাক্যমুনি, শ্রমণ 'গৌতম' প্রভৃতি নানাবিধ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহাঁর অলোকসাধারণ ও অদ্ভুত ক্ষমতা প্রমাণ করিবার উদ্দেশে ইহাঁর উপাসকেরা যে সকল অসম্ভব বিষয়ের উল্লেখ করে, তৎসমুদয় কখনই সত্য হইতে পারে না। বোধ হয় তাঁহার উদ্ভাবিত ধর্ম্মের প্রতি সাধারণ লোকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া দিবার জন্য তাঁহার অধস্তন উপাসকেরা এই সকল বৃত্তান্তের কল্পনা করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের প্রকৃত সময় নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। বৌদ্ধ গ্রন্থকারদিগের রচনা, বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্তূপমঠ ইত্যাদি দৃষ্টে যতদূর অনুমান করিতে পারা যায়, তদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যে বুদ্ধদেব খৃষ্টের অন্ততঃ

৫।৬'শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়া ছিলেন। সে যাহা হউক বৌদ্ধধর্ম্ম যে খৃষ্টের পর ৫।৬ শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশে অপ্রতিহতপ্রভাবে প্রচলিত ছিল তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের স্তূপ ও মঠের ভগ্নাবশেষ দর্শনে এবিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দের পর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাব হয়। ইহার পর বহুকাল অবধি এই ধর্ম্ম ভগ্ন ও অঙ্গহীন অবস্থায় ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিদ্যমান ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু ক্রমশঃই উহার প্রভাবের হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। খৃ, ষোড়শ শতাব্দে আক্‌বর বাদসাহের সাম্রাজ্যকালে তাঁহার অমাত্য আবুল ফাজেল অনেক অনুসন্ধান করিয়াও ভারতবর্ষের কুত্রাপি একজন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর সাক্ষাৎ পান নাই। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রবল অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া যে বৌদ্ধেরা বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, একথা কোন মতেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ বিধর্ম্মীদিগের প্রতি অত্যাচার করা কখনই হিন্দুদিগের স্বভাব নহে, বোধ হয় বৌদ্ধ পুরোহিতদিগের আলস্য ও ঔদাস্যই বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলোপের এক মাত্র কারণ। সে যাহা হউক বৌদ্ধধর্ম্ম যতই কেন বিলুপ্ত হউক না, এখন ও পৃথিবীর মধ্যে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা বৌদ্ধদিগের সংখ্যা অনেক অধিক।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে এই ধর্ম্ম কপিলপ্রণীত সাংখ্য দর্শনের মূলসূত্র অনুসারে সংঘটিত। সাংখ্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অধিক কি শুদ্ধোদন, মায়াদেবী, কপিলবাস্তু, সিদ্ধার্থ প্রভৃতি নামগুলিও বাস্তবিক পদার্থের পরিচায়ক নহে কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম যে সাংখ্যের রূপান্তরমাত্র তাহারই নিদর্শন স্বরূপ। বুদ্ধদেবের প্রণীত বিশুদ্ধ ধর্ম্ম এক্ষণে আর সেরূপ অবস্থায় নাই। এখনকার প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের কোন কোন অংশ প্রবিষ্ট হইয়াছে দেখা যায়। প্রাচীন বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বর, কিন্তু এখনকার অনেক বৌদ্ধমন্দিরে হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' এটী বৌদ্ধদিগের নিজের মত নহে, ইহা হিন্দুদিগের নিকট হইতে গৃহীত। অধুনাতন বৌদ্ধেরা 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' এই অনুশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া স্বহস্তে প্রাণিহত্যা করে না যথার্থবটে, কিন্তু কোন প্রকার মাংস ভক্ষণেই প্রায় ইহাদের অরুচি নাই। পূর্ব্বে বৌদ্ধেরা জাতিভেদ স্বীকার করিতেন কিন্তু এক্ষণে ইহাদের মধ্যে জাতিপ্রথা প্রচলিত নাই। এই সকল পরিবর্ত্ত দ্বারা এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, যে বৌদ্ধধর্ম্ম ভবিষ্যতে এক সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ হইয়া উঠিবে। কারণ এ ধর্ম্মের আর জীবন নাই। ইহার কঙ্কাল গ্রহণ-

পূর্ব্বক নানামুনি নানা মত প্রকাশ করিতেছেন।

বৌদ্ধেরা সর্ব্বশুদ্ধ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত; মাধ্যমিক, যোগাচর, সৌত্রান্তিক, ও বৈভাষিক। মাধ্যমিকদিগের মতে জগতে কিছুই নাই, সকলই শূন্য। যে সকল পদার্থ স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, জাগ্রদবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না, আবার যে সমস্ত বস্তু জাগ্রদ্দবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, স্বপ্নাবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না। আর সুষুপ্তিকালে কোন বস্তুই মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর হইতে পারে না। ইহাদ্বারা মাধ্যমিকেরা এই প্রতিপন্ন করেন, যে কোন বস্তুই সত্য নহে, সত্য হইলে অবশ্যই সকল অবস্থায় দৃষ্ট হইত। যোগাচারমতে বাহ্যবস্তু মাত্রেই অলীক, কেবল ক্ষণিক-বিজ্ঞান-রূপ আত্মাই সত্য। ঐ বিজ্ঞান দ্বিবিধ—প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, ও আলয়বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও সুপ্ত অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম প্রবৃত্তি বিজ্ঞান, আর সুষুপ্তিদশায় যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম আলয়বিজ্ঞান। সৌত্রান্তিকেরা বাহ্য পদার্থকে সত্য ও অনুমান-সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। বৈভাষিকদিগের মতে বাহ্য বস্তু সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ। একমাত্র ভগবান্ বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেষ্টা হইলেও ইঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধমতে বাক্, পাণি, পাদ, গুহ্য, ও লিঙ্গ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়; নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু ত্বক্ ও কর্ণ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর মন বুদ্ধি এই দুইটি উভয়েন্দ্রিয়। এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়ের অধীন বলিয়া দেহকে দ্বাদশায়তন কহে। সমুদয় বৌদ্ধমতেই এই দ্বাদশায়তন দেহের পূজা করাই প্রধান ধর্ম্ম। সকল প্রকার সংস্কারই ক্ষণমাত্রস্থায়ী এই রূপ স্থির বাসনার নাম মার্গতত্ত্ব। এই মার্গতত্ত্বই বৌদ্ধদিগের মতে মোক্ষ। চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্নে ভোজন, সমূহাবস্থান ও রক্তাম্বর এই কয়েকটি বৌদ্ধদিগের যতিধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ।

হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর কোন্ কোন্ বিষয়ে ঐক্য বা কোন্ কোন্ বিষয়েই অনৈক্য তৎসমুদয়ের উল্লেখ পূর্ব্বক প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে। বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বর। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইহঁাদের মতে মনুষ্যই নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন জন্ম গ্রহণ করিবার পর অগ্রে বোধিসত্ব, পরে বুদ্ধ হইয়া উঠে। বুদ্ধ হইলে মনুষ্যের ক্ষমতাই সর্ব্বতোমুখী হয় সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের আর আবশ্যকতা থাকে না। এইটি বেদ-প্রদর্শিত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দুরা যদিও ভিন্ন ভিন্ন শরীরে আত্মার সংক্রমণ স্বীকার করিয়া থাকেন, যদিও ইঁহাদের মতে মনুষ্য তপোবলে ঈশ্বরের ন্যায় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে, তথাপি ইঁহাদের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত এবিষয়ে কোন প্রকার মতভেদনাই,

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা জাতিভেদ স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতে সকল জাতির লোকেরাই ধর্ম্মের পৌরোহিত্য ও আচার্য্যত্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম। এই বৌদ্ধ-পুরোহিতেরা সমবেত হইয়া বিহার বা মঠে বাস করিয়া থাকেন। হিন্দু পুরোহিত-দিগের মধ্যে এরূপ প্রথা নাই। বৌদ্ধ-মঠ বা বিহারের অধিকারী অর্থাৎ সর্ব্ব-প্রধান পুরোহিতকে লামা কহে।

আর একটী বিষয়ে হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। খৃষ্টান ও মুসলমান-দিগের ন্যায় বৌদ্ধেরা অন্যান্যধর্ম্মাবলম্বী-দিগকে স্বধর্ম্মভুক্ত করিয়া থাকেন কিন্তু বেদপ্রদর্শিত আর্য্যধর্ম্ম মতে যে ব্যক্তি হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই হিন্দু। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তিই হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দু হইতে পারে না। বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্মের এই সর্ব্বগ্রাহক নিয়ম থাকাতেই উহার অতদূর প্রাদুর্ভাব ও প্রভার বৃদ্ধি হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা সাংসারিক কর্ত্তব্য-কর্ম্মে নিয়ত হইতে উপদেশ দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সমাজের মঙ্গলসাধন ইঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। ইঁহাদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায়ই স্ত্রী লোকদিগকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিয়া থাকে, এমন কি দৈবাৎ কোন স্ত্রীলোককে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে দেখিলেও ইহারা তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করে না।

বৌদ্ধেরা পরলোক স্বীকার করেন না। ইহাঁদের মতে নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ বিনাশ, যেরূপ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া যায় সেইরূপ আত্মার ও নির্ব্বাণ অর্থাৎ ধ্বংস হইয়া থাকে। কোন কোন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন যথার্থবটে, কিন্তু সে সকল কেবল হিন্দু ধর্ম্মের সহিত সংস্রবে সংঘটিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সঙ্গীত-পথিক।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

অগত্যা আমি সেই শিলাতলেই শয়ান রহিলাম। নিদ্রায় অচেতন—সহসা কর্ণে ঘণ্টার শব্দ বাজিল—নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখি আমার চতুর্দ্দিকে বহু-সংখ্যক লোক আসিয়া দাঁড়িয়া রহিয়াছে। আমার নিদ্রাবেশ তখনও সম্পূর্ণরূপে ছাড়ে নাই। আবার সেই পূর্ব্বরাত্রের বিজন প্রদেশে সহসা এত লোকের সমাগম দেখিয়া আমি চমৎকৃত ও হত-বুদ্ধির ন্যায় হইয়া পড়িলাম। আমার সেইরূপ শূন্য দৃষ্টি, অবাক্ অথচ চকিত মুখ-ভঙ্গি সন্দর্শন করিয়া তাহারা সকরতাল

উচ্চ হাস্য ও পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল কিন্তু কি কথা কহিতে লাগিল তাহার কোন অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। এসব দেখিয়া আমার বিস্ময় আরও বাড়িয়া উঠিল। যতই তাহারা আমার সেরূপ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে ততই তাহারা হাসিতে ও নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। আমি নিকটবর্ত্তী জনৈককে আমার নিজ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম যে তোমরা কে ও কেনই বা আমাকে লইয়া এত হাস্য করিতেছ, তাহাতে তাহারা কোন উত্তর না করিয়া আর ও হাসিতে লাগিল। আশ্চর্য্য! এরূপ চমৎকার দেশ ও এরূপ চমৎকার লোক ত কোথাও দেখি-নাই। আমি এরূপ বিপন্ন, অসহায়—তাহাদের দেশীয় ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এরূপ অবস্থার কোথায় তাহাদের দয়ার ও যত্নের পাত্র হইব, না, তাহারা একটী বিলক্ষণ আমোদের সামগ্রীর মত আমার সহিত ব্যবহার করিতেছে!

এমন আমোদ-প্রিয়—পর-দুঃখে আমোদ-প্রিয়—লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আরও এই আমোদে যে দুই দশটী যোগ দিয়াছে এমন নহে, সমুদয় লোকই একত্রে এক ভাবে পরস্পর সম্বন্ধী হইয়া ইহা উপভোগ করিতেছে। তখন তাহাদের নিকট আত্মবৃত্তান্ত বলিয়া কোন উপকার প্রাপ্তিতে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া, কি করি, তখন তাহাদিগকে কেবল নিরীক্ষণ—তাহাদিগের কেবল ভাবগতিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম, তাহাদের ক্ষুদ্র গোলাকার মুখ, পশ্চাৎ দেশে এক এক সুদীর্ঘ লম্বমান বেণী, শুভ্র-বর্ণ নির্লোম অঙ্গচর্ম্ম, সঙ্কীর্ণ অর্দ্ধ-নিমীলিত ক্ষুদ্র নয়নদ্বয়, বঙ্কিম সুদীর্ঘ ভ্রূযুগ, স্থূলতর ওষ্ঠ, স্থূল নাসাগ্র, ত্রিকোণ পিরামিডাকার মুণ্ডিত মস্তক, বিরল চিবুক কেশ—এইসব দেখিলে তাহাদিগকে লিনিয়সের প্রাকৃতিক বিভাগের নিয়মানুসারে কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত মানব জাতি বলিয়া বোধ হয় না। বস্তুতঃ হিন্দু সম্বন্ধীয় জাতির আকার লক্ষণের সহিত ইহাদের আকার লক্ষণের অনুমাত্র ও সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। সকলেই অবস্থানুসারে বিভিন্ন মূল্যের পরিচ্ছদে আপাদ-মস্তক আবৃত। সকলেই অপরিষ্কৃত। কতক এরূপ আকারের দুই একটী জাতি পূর্ব্বে দেখিয়াছি। কিন্তু সম্পূর্ণ সাদৃশ্য কোথায় দেখি নাই।

ক্রমে যতই বেলা বাড়িতে লাগিল ততই সেখানে জনতা অধিক হইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেখানে একটীও স্ত্রীলোক নয়ন-গোচর হইল না। কিছুক্ষণ পরে দুই একটী ছিন্ন ও মলিন বসনা নিরাভরণা দরিদ্রা ইতর বংশোদ্ভবা স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া গেল। কিন্তু তাহারা আমাকে দেখিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইলেও পুরুষদের সঙ্গে যোগ দিল না। ক্রমে একে একে কার্য্যান্তরে সকলেই চলিয়া যাইতে লাগিল, আবার অপর নবাগতেরা তাহাদের স্থান পরিপূর্ণ করিল। ক্রমেই বেলা

বাড়িতে লাগিল—মন্দিরের ন্যায় নিকট-বর্ত্তী এক অত্যুচ্চ অথচ সঙ্কীর্ণ গৃহ-চূড়া হইতে দশবার ঘণ্টার শব্দ শুনা গেল। দশটা বাজিল, কিন্তু আমাদের দেশের প্রকৃত দশটা কি না তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তখন আমার শরীরের ও মনের অবস্থা যে কি তাহা পাঠক! সহজেই বুঝিতে পারিবে। যে মানুষ দেখিব বলিয়া গত রাত্রে আমার মন এত ব্যাকুল হইয়াছিল সে মানুষ দেখিতে পাইলাম কিন্তু উদ্দেশ্য-সিদ্ধ হইল না—নিজের দুঃখ বলিলেও তাহারা কর্ণপাত করিবেনা, করিলে ও উপ-হাসকরিতে থাকিবে, এ মানুষে কি করিব? আবার সেই আমোদের—সেই বিদ্রুপের—সেই উপহাসের মধ্যে তাহারা ক্ষণে ক্ষণে এমন সন্দিগ্ধ চিত্তে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল যে আমার মনে এই ভয় হইতে লাগিল, পাছে আমার জীবনের প্রতি কোন অত্যাহিত ঘটায়। প্রহরীও ও প্রহরী-পালদের গম্ভীর কঠোর মুখ-ভঙ্গিতে ও ঘন ঘন সন্দিগ্ধ স্থির দৃষ্টিপাতে আমার হৃদয় ভয়ে বসিয়া যাইতে লাগিল, বস্তুতঃ তখনকার সেই ভয়ানক অবস্থা আমার নিতান্ত অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কি করি, কোথায় যাই, চলিবার আর অণুমাত্রও শক্তি নাই, ক্ষুধা তৃষ্ণা আর তখন তত বোধ ছিল না, কিন্তু শরীর যেন তখন আর আমার নাই; সুতরাং আর কি করি, হতাশের ন্যায়—ইতি-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় "যাহা হয়" ভাবিয়া দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া রহিলাম। কত লোক কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়া গেল। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, অথচ প্রত্যেককেই উত্তর দিলাম তাহারাও কিছু বুঝিল না। ভাবিতে লাগিলাম বা! এও মন্দ নয়! যাহা হউক এ সকলের পরিণাম কি তাহা দেখিতে হইবে।

যেখানে বসিয়া ছিলাম সেটী বস্তুতঃই একটী নগরের পুরোদ্বার। গতরাত্রে তাহার চারিদিক্ কিছুই দেখিতে পাই নাই, এখন কেবল ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগি-লাম। সেই পুরোদ্বারের সুসজ্জিত নানাবিধ-শিল্পকার্য্য-খচিত অত্যুচ্চ তোরণ দুইধারে দুই লৌহস্তম্ভ দ্বারা ধৃত হইয়া রহিয়াছে, একটা স্বল্প-পরিসর পরিখা সেই নগরের চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে। একটী সঙ্কীর্ণ সেতু সেই পরিখার উপর নির্ম্মিত রহি-য়াছে, নির্ম্মাণ রচনা সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যে, তাহার উপর দিয়া কত সহস্র সহস্র বর্ষা চলিয়া গিয়াছে তথাপি তাহা অদ্যাপি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাহার রচনা-প্রণালী আধুনিক রুচির সম্পূর্ণ অন-নুমোদিত। সম্মুখে মৃত্তিকা, বংশ, কাগচ, পশম, কাষ্ঠ প্রভৃতি নানাবিধ উপাদানে বিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশ্রেণী রথ্যার দুইপার্শ্বে বিরাজমান রহিয়াছে। প্রত্যেক গৃহ তৃণবিশেষ-সমাচ্ছাদিত ও অত্যুন্নত-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দৃষ্টি যতদূর গেল, দেখিতে পাইলাম সকল গৃহই শিল্প-কার্য্য-মণ্ডিত

শিল্পের এরূপ অদ্ভুত ছটা কোথায় ও দেখি নাই।

ক্ষুধা তৃষ্ণার অসহ্য ক্লেশ ক্রমে শরীরের অবসন্নতা-নিবন্ধন সহ্য হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু কৌতুক আরও বাড়িতে লাগিল। হতাশ—অথচ জীবনের প্রতি আমার অত্যন্ত মায়া জন্মিল। সহসা সেই স্থান হইতে আস্তে আস্তে পদে পদে চলিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে সেতু পার হইয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিবামাত্র জনৈক বংশ-যষ্টি-ধারী প্রহরী নিকটবর্ত্তী হইয়া আমাকে কিছু বলিল—ভাবভঙ্গিতে বোধ হইল, সে সন্দিগ্ধ হইয়া আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছে; কিন্তু আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমাকে তাহার অনুবর্ত্তন করিতে ইঙ্গিত করিল—কি করি, সঙ্গে সঙ্গেই চলিলাম। পথিমধ্যে আর এক জন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, বেশ ভূষায় বোধ হইল সে এক-জন প্রহরী-পাল হইবে। সেই গম্ভীরাকৃতি মহার্হ-বেশ-ধারী ধীর পুরুষকে দেখিবা-মাত্র আমার সঙ্গী প্রহরী তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কি বলিল, আমি কিছুই বুঝিতে পরিলাম না। পরে কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমাকে লইয়া যাইতে, সেই পুরুষ তাহাকে হস্ত দ্বারা দেখাইয়া দিলেন। আমি চলিতে লাগিলাম—ক্রমে এক স্থানে, এক বিস্তীর্ণ অথচ কদাকার—সহস্র-সহস্র-প্রহরী-পরি-বেষ্টিত গৃহ-শ্রেণীর নিকট সমুপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া অনেকে কুতূহলী হইয়া আমার নিকট আসিল।

যতক্ষণ পথে ছিলাম, কোন দিকেই প্রায় নেত্রপাত করি নাই—হৃদয় তখন ভয়ে ও বিস্ময়ে, জড়ীভূত ছিল; ইহাদের উদ্দেশ্য কি কেবল তাহাই ভাবিতেছিলাম। প্রহরী গৃহমধ্যে আমাকে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিল, কিন্তু আমি প্রবেশ করিতে চাহিলাম না—তাহারা সকলে হাস্য করিয়া উঠিল। কিন্তু কেহই আমার প্রতি কোন রূঢ় ব্যবহার করিল না, বরং তাহাদের আকার ইঙ্গিতে বোধ হইল, যেন তাহারা আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে সততই সচেষ্ট রহিয়াছে—অথচ প্রকৃত সদয় কি না তাহা এপর্য্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাহারা ক্রমেই আমাকে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিতে লাগিল, আমি কোন মতেই সম্মত হই-লাম না, ক্রমে তাহারা বল প্রয়োগ করিবে এরূপ ভাব দেখাইল; তখন আমি কি করি, যে দেশের নিয়ম-বিধি কিছুই জানি না—যে দেশের লোক আমার দুঃখে দুঃখী হওয়া দূরে থাকুক, বিদ্রূপ ব্যতীত আর কিছুই করিল না—সে দেশের লোক এরূপ আচরণ ব্যতীত আর কি করিতে পারে? যতই তাহাদিগকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলাম—হতাশ হইয়া যতই বলিতে লাগিলাম "ওগো! আমি বিপন্ন, ক্ষুধা তৃষ্ণায় অধীর, শরীর অবসন্ন, নিঃস্বম্বল, সংঘাতিক ঘোর বিপদ্ হইতে

সুদ্যঃ উত্তীর্ণ হইয়াছি—এখনও তাহার আতঙ্ক যায় নাই—আমি নিরপরাধী—সামান্য দীন চোরের ন্যায় এই ভীষণ কারাগারে প্রক্ষিপ্ত হইবার পাত্র কখনই নহি, যদি তোমরা আমার ভাষা বুঝিতে, তাহা হইলে আমার পূর্ব্বাপর অবস্থা শুনিয়া তোমাদের হৃদয় নিশ্চয়ই বিগলিত হইয়া যাইত” জানিতেছি এ সব বলা প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে তথাপি এইরূপ বলিতে লাগিলাম, তাহারা ও হাসিতে লাগিল। ক্রমে তত্রস্থ সমুদয় লোক আসিয়া সেখানে জমিল। আমার সেই দীন ভাবে সেই কাতরস্বরে ইতর জন্তুদের ও অবোধ হৃদয় বিগলিত হইল, কিন্তু তাহাদের সেই পাষাণ হৃদয় অণুমাত্রও বিচলিত হইল না। সেই দ্বারে দাঁড়াইয়া বিষণ্ণ ও কাতর ভাবে ভয়চকিত-নয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। তাহারা আমাকে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ ইঙ্গিত করিতে লাগিল, আমাকে তদবস্থ ও অটল দেখিয়া তাহারা হাত ধরিয়া লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম দূরে জনৈক অশ্বারোহী আমরা যেখানে ছিলাম তদভিমুখে বেগে আসিতেছে। আকৃতি ও পরিচ্ছদে বোধ হইল তিনি ইউরোপবাসী। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। ঘোর অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন সম্মুখজীবনে যেন আলোকের সহসা সমুদয় হইল—দূর হইতেই তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি নিতান্ত অপরিচিত হইলে ও আমার সে অবস্থায় তাঁহাকে যেন আমার কতকালের পরিচিত পরম আত্মীয় বলিয়া বোধ হইল। তখন কেবল এই মনে হইতে লাগিল যে ইনি আমাকে বুঝিতে পারিবেন, ইহাঁকে আমার আত্মবৃত্তান্ত জ্ঞাপিত করিলে আমার বিলক্ষণ উপকার দর্শিতে পারিবে। তখন দ্রুতপদে, সাগ্রহচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তিনি ও দেখি ক্রমে আমারই নিকট আসিতেছেন! ফেনিল অশ্ব আমরই নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তখন আমার আনন্দ কোথায় তিরোহিত হইয়া গেল—বিস্ময় হৃদয়কে সম্পূর্ণ অধিকার করিল। আমি চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। যে সকল লোক আমাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে ছিল, আরোহীকে দেখিবামাত্র তাহারা সকলে শস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল এবং পশ্চাতে দূরে তদ্গতচিত্তে চিত্রিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল।

আরোহী অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়াই আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া সাদরে অভিবাদন করিলে আমিও আগ্রহের ও আদরের সহিত তাহার প্রতিদান করিলাম। তাঁহার আকার ও ভাব দেখিয়া প্রতীতি হইল যে, তিনি কখনই সামান্যবংশ-সম্ভূত নন —কোন সামান্য কর্ম্মের জন্যও সে-

দেশবাসী হন নাই। তিনি আরও নিকটে আসিয়া সস্মিত বদনে চির পরিচিত বন্ধুর ন্যায় হস্ত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে কতদিন আসিয়াছেন? এখানে আসিয়া কোথায় রহিয়াছেন? এরূপ অবস্থায় কেন?" এই সকল প্রশ্নে আমি আরও বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম। আর যখন তিনি একখানি পত্র দিলেন সেই পত্রের শিরোনামে আমার একমাত্র স্নেহময় পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠের হস্তাক্ষর দেখিতে পাইলাম, তখন আমার হৃদয় কত প্রকার ভাবের ভাবুক হইল তাহা পাঠক! কল্পনা যদি তোমার সহায় থাকে, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ তুমি আমার সঙ্গে সহানুভূতি করিতে পারিবে। পত্র পাঠ করিলাম। আমার কোন উত্তর অপেক্ষা না করিয়াই তিনি সৌজন্যের সহিত মধুরস্বরে বলিলেন "যদ্যপি আপনি আমাকে ঐ সব করিতে বলেন তাহা হইলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব"।

আমি তখন আমার কৃতজ্ঞতা-বুদ্ধি যে কিরূপে প্রকাশ করিব তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। যে আমি ইতিপূর্ব্বে জীবনের প্রতি হতাশ হইয়াছিলাম—স্নেহময় ভ্রাতার ও পরিবার-বর্গের সহবাস-সুখে চিরজীবনের জন্য জলাঞ্জলি দিয়াছিলাম—যে আমি একমাত্র জীবনের লক্ষ উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে নানাবিধ বিপদ্‌-রাশির মধ্যে ও বিচরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি যে আমি পথে কোন এক দৈব দুর্ব্বিবিপাকে সমুদয় বন্ধুবান্ধব হারাইয়া নিঃসম্বল, একাকী চারি পাঁচ দিন হিংস্র-শ্বাপদ-সমাকুল ভীষণ নিবিড় অরণ্যে ভয়-ব্যাকুলিত চিত্তে বিচরণ করিয়া কষ্ট-লভ্য দুই একটী ফল ভক্ষণে দিনাতিপাত করিয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিয়াছি—এই দুই তিন দিন ক্রমান্বয়ে অনাহারে রহিয়াছি—যে আমি এতক্ষণ এই সকল পাষাণ-হৃদয় লোককে কাতর-স্বরে দীনবচনে অনুনয় বিনয় করিলেও সাহায্য পাওয়া দূরে থাকুক সমান্য চোরের ন্যায় জঘন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে যাইতে ছিলাম—সেই আমার এখন এখানকার অদ্বিতীয় প্রাণপবাবু সম্ভ্রান্ত ইংরাজের আশ্রয় ও আনুকূল্য প্রাপ্ত হইবার সুবিধা হইল! বোধ হইল, বিপদের উপর বিপদ আমার নয়ন-সমক্ষে যে এক ঘন বিস্তীর্ণ যবনিকা ভবিষ্যতের দিকে এতকাল প্রক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছিল, এখন যেন তাহা উৎক্ষিপ্ত হইয়া গেল!

অনন্তর আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া তাঁহারই অনুরোধে তাঁহার সঙ্গে এক শকটে আরোহণ করিয়া সেই ভীষণ-স্থান পরিত্যাগ করিলাম। প্রহরীরদের তদানীন্তন ভাবভঙ্গি দেখিয়া কেবল একবার ঈষৎ হাস্য করিলাম। তখন আমি প্রকৃতিস্থ—তখন আমার পূর্ব্বতন ভাব সকল নরীভূত হইয়া আমার হৃদয়ে

পুনরুদ্দিত হইতে লাগিল। আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সংসাধনের এত দিন কোন আশাই ছিল না, এখন সে আশার সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইল। গাড়িতে যাইতে যাইতে আমার সেই উপকারীকে তাঁহার অনুরোধে—বিশেষতঃ কৃতজ্ঞ হইতে হইলে বলা উচিত মনেকরিয়া আমার উদ্দেশ্য ও পথের দুর্ঘটনা অতি-সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। তাঁহারই নিকট জানিতে পারিলাম যে আমি তখন কোন্ দেশে রহিয়াছি, কাহাদের নিকট এতক্ষণ ওরূপ নির্দ্দয়রূপে আচরিত হইতেছিলাম। তখন জানিতে পারিলাম, সভ্যতা সম্বন্ধে যে দেশ পৃথিবীস্থ যাবতীয় দেশ অপেক্ষা পূর্ব্বতন—যে দেশের লোক শত সহস্র কুসংস্কার—বহুল বিঘ্নরাশি সত্ত্বেও চিরন্তন রীতির বশবর্ত্তী হইয়া জাতীয় সভ্যতা ও স্বাধীনতা সংরক্ষিত করিয়া আসিতেছে—কত রাষ্ট্র-বিপ্লব হইয়া গেল—পৃথিবীর মধ্যে কত ভাব-বিপ্লব ঘটিল—কত অরণ্য, কত সাগর, দেশ রূপে পরিণত হইয়া সভ্যতার, বিদ্যার, বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আবার সেই অরণ্যে ও সেই সাগরে পুনরাবর্ত্তিত হইল, যে দেশের ভৌতিক ও ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন কত সহস্র বার সংঘটিত হইয়া গেল, তথাপি সহস্র বৎসরের সামাজিক ও রাজনৈতিক আচার ব্যবহার অদ্যাপিও অক্ষুন্ন ভাবে রাখিয়াছে—মহাত্মা কন্‌ফিউসস্, ধার্ম্মিক-প্রবর ফো (কেহ কেহ বলেন, আমাদের দেবতা মহাদেবও) জন্ম-গ্রহণ করিয়া যে দেশের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন,—যে দেশের লোক শত সহস্র দোষ সত্ত্বেও—আমার প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর আচরণ করিলেও—অসাধারণ গুণাবলীর আশ্রয়, যাহাঁরা শিল্পে ও কৃষি-কর্ম্মে জগতের উপদেষ্টা,—কর্ম্মবল ও কর্ম্ম-কুশলতা যাহাদের প্রকৃতি—জাতি-গৌরবই যাহাদের একমাত্র অমূল্যরত্ন—পিতৃ ভক্তিই যাহাদের ধর্ম্ম—মিতাচারই যাহাদের নিষ্ঠা—সেই চীন দেশে আমি আসিয়াছি! তখন আমার বিস্ময়ের—কুতূহলের আর পরিসীমা রহিলনা।

এতক্ষণ কথায় মগ্ন ছিলাম—এখন চারিদিক্ চাইয়া দেখি যে, সে নগর দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, তাহার নাম—চোয়া-চু। সেটী একটী ক্ষুদ্র নগর, অথচ তাহার লোক-সংখ্যা এত অধিক যে, অন্যান্য অনেক বিশাল দেশের প্রধান রাজধানীতেও তেমন নাই। তাহার শিল্প রচনা, তাহার বাণিজ্য, বেশভূষায় সেই নগরের অধিবাসীদের প্রভূত ঐশ্বর্য্য, সন্দর্শন করিলে তাহাকে অন্যত্র একটী প্রধান নগর বলিয়া গণনা করা যাইত, কিন্তু ভূগোলবেত্তা এদেশের অন্যান্য নগরের সহিত তুলনায় চিত্রে ইহার নামমাত্র করাই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন।

শকট অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল—আনন্দে, উৎসাহে, কৌতুকে আমার শরীরের অবসাদ ও ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি যে কোথায় তিরোহিত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। যতই যাইতে লাগিলাম,

কখন বিস্তীর্ণ কখন বা সঙ্কীর্ণ রথ্যার দুই ধারে ক্রমে এক পল্লী হইতে অপর পল্লী অতিক্রম করিতে লাগিলাম। কোন পল্লী বৃহৎ কোনটী বা ক্ষুদ্র। মধ্যে মধ্যে কার্পাস, ধান্য, গোধূম, চা প্রভৃতির সমধিক-উর্ব্বর বিস্তীর্ণক্ষেত্র সকল ক্রমান্বয়ে আমাদের নয়ন-পথের পথিক হইতে লাগিল। সে সকল দেখিলে বোধ হয় যেন জগতের সমুদয় কৃষি-ফল সেখানে একত্রীভূত হইয়াছে। কখন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুরম্য উপবন, উদ্যান ও সরোবর সকল নয়ন চরিতার্থ করিতে লাগিল, কখন বা বহুদূর-বিস্তীর্ণ বংশক্ষেত্র আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিল। আশ্চর্য্য! এপর্য্যন্ত কোথাও একটী বড় বৃক্ষ নয়ন-গোচর হইল না। কিন্তু এক এক বৃক্ষ এত পুরাতন যে দেখিলে বোধ হয় কতশত বৎসর অতীত হইল তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার দৈর্ঘ্য দেখিলে কিছুই স্থির করা যায় না দৈর্ঘ্যে হয়ত চারি বা পাঁচ হাত মাত্র বাড়িয়াছে কিন্তু প্রস্থের বিস্তৃতি দেখিয়াই তাহার বয়স নিরূপণ করিতে পারা যায়। কোথায়ও বা ক্ষুদ্র কৃত্রিম হ্রদে ও পল্বলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকা-বিনির্ম্মিত গৃহরাজ দ্বীপাকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এমন কি, কোথাও এক এক পল্লী বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। সমুদয় গৃহই একই প্রকার গঠন-প্রণালীর অনুমোদনে নির্ম্মিত। নানা বর্ণের ও নানা আকারের সুন্দর বিহঙ্গকুল বিবিধ স্বরে কূজন করিতেছে, কখন বা বৃহৎ বৃহৎ সর্প ভীষণ আভোগ বিস্তার করিয়া বিস্তীর্ণ মস্তক উত্তোলন করিয়া ঘোর বিকৃত শব্দে ও প্রচণ্ড বেগে আমাদের শকটের শব্দ শুনিয়া সেই দিকে আসিতেছে।

কোন স্থলে তড়াগ সকল সুবিস্তীর্ণ পদ্ম ও কুমুদদামে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, প্যারগুলোরিয়া, ওডরেটিসিমা, ওলিয়া ফ্রেগ্রান্স, পিট্রিস্পোরম চীনেন্সি, শাইপ্রেসস্, পেন্ডুলা প্রভৃতি নানাবিধ জাতির পুষ্পফলে চারিদিক্ সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে—কতশত লোক সে সব স্থলে বিশ্রাম বা বিহারের জন্য একত্রিত হইয়া থাকে। ফলতঃ যে দিকেই নয়ন নিপাত করা যায়, সেই দিকেই অল্পস্থানের মধ্যে বহুল রচনাবৈচিত্র্য দেখান যে সে দেশের লোকদের প্রকৃতি-সিদ্ধ তাহারই বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্যে নয়ন মনের চরিতার্থতা লাভ করিতে লাগিলাম, ক্রমে ক্যাণ্টন্ নগরের পুরোদ্বারে আমাদের শকট আসিয়া দাঁড়াইল। এখানে সকলই সম্পূর্ণ নূতন—এতক্ষণ প্রকৃতির যে সকল শোভা নিরীক্ষণ করিয়া আসিতে ছিলাম সে সমুদয়ের প্রায় কিছুই দৃষ্ট হয় না—এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ-শ্রেণীর পরিবর্ত্তে বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদাবলী, অত্যুচ্চ 'প্যাগোডা', নানাবিধ ও নানা আকারের কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল বিরাজিত রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম উপপর্ব্বত সকল ক্রমান্বয়ে উচ্চ-

নীচ-চূড়াসমন্বিত হইয়া তদ্দেশবাসি-পরিবার বর্গের মধ্যে পিতা, মাতা, পুত্র এই তিনের মর্য্যাদার সূচনা করিতেছে। সেই বিস্তীর্ণ পুরোদ্বারে বহু-দূরব্যাপিণী তোরণ-মালা—প্রকাম-পরিসর পরিখায় নানা আকারের অসংখ্য অর্ণবযান—ও তরণী-মালায় নানা বর্ণের চীনাংশুক বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে।

নানাবিধ শিল্পকার্য্য-খচিত প্রশস্ত সেতু পার হইয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি নানা বর্ণের ও নানা দ্রব্যের বিপণি, অত্যুচ্চ হর্ম্ম্যমণ্ডলী! সকলকারই সম্মুখ-ভাগ বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত ও বিবিধ চিত্রে চিত্রিত। স্ব স্ব-কার্য্য-নিরত সুবর্ণ বণিক্ রাংকর, পাদুকাকর, কর্ম্ম-কার ক্রেতাও বিক্রেতা—ইহাদের নানা বিধ স্বর একত্রিত হওয়াতে এক তুমুল শব্দে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কাগজ, পট্ট, কাপড়, শৃঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ উপাদানে নির্ম্মিত দীপাধার-মালা রথ্যার দুই পার্শ্বে বিরাজমান রহিয়াছে।

এবম্ভূত নগরে প্রবেশ করিয়া ক্রমে আমার উপকারীর উচ্চতম হর্ম্ম্যের সন্নি-কটবর্ত্তী হইলাম। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফল মূল ও জল পান করিয়া শরীর শীতল করিলাম। একটু বিশ্রাম করিয়া সে দিন বিকালে তাঁহার বাটীর নিকটবর্ত্তী আর একটী বাটীতে তাঁহারই আশ্রয়ে বাস করিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া শরীর একটু সবল হইলে তাঁহারই নিকট প্রথমতঃ সেই দেশের ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম—দেখিলাম ভাষা না শিখিলে আমার উদ্দেশ্য কোন রূপেই সুসিদ্ধ হইতে পারিবে না।

ক্রমশঃ।

আর্য্যগণের আয়ুর্ব্বেদ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

২ য় অধ্যায়।

—০—

বাল্যাবস্থা।

প্রথম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, যে আয়ুর্ব্বেদের বাল্য, প্রৌঢ়, জরা ও মৃত্যু এই চারি অবস্থার যে সূচনা করা হইল, পরের অধ্যায়সকলে তাহার সবিস্তর বর্ণন করিব, এবং তদানুষঙ্গিক আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য তাহাও বলিব।

বর্ত্তমান অধ্যায়ে কেবল আয়ুর্ব্বেদের বাল্য অবস্থার বিষয় বর্ণিত হইবে। এই কল্পিত সময়ে আয়ুর্ব্বেদের অবস্থা কি রূপ ছিল, কতদূর উন্নতি লাভ করি-য়াছিল, কোন্ সময় হইতে আয়ুর্ব্বে-দের কথা দেখিতে পাওয়া যায় ইত্যাদি

বিষয় সমস্ত যথাসাধ্য অনুসন্ধান পূর্ব্বক সমালোচিত হইবে।

যে দেশে প্রকৃত ইতিহাস ও মহাত্মাদের জীবনবৃত্ত লিখিবার রীতি ছিল না, যে দেশের লোক কাল্পনিক গল্প-রচনা ও পাঠ করিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন, তথাকার পুরাবৃত্ত-সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় বা ঘটনাবিশেষের সময় স্থির করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পর হইতে তৎপথানুবর্ত্তী শিষ্যগণের মনে প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা প্রথম অঙ্কুরিত হয়। তৎপূর্ব্বের যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ ইতিহাস বলিয়া খ্যাত ছিল, বা আছে, সে সমুদয়ই কল্পিত উপন্যাসে পরিপূর্ণ। উপন্যাস-পঙ্ক-রাশির মধ্য হইতে সত্যরত্ন উদ্ধার করা অতিশয় সুকঠিন। ইদানীন্তন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মপুস্তক ও জীবনচরিত প্রভৃতি আলোড়ন পূর্ব্বক যে সকল তত্ত্ব স্থির করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের সেই গ্রন্থ সকল হইতে এবং রাজতরঙ্গিণী-পাঠে সত্যনির্ণয়কল্পে, অনেক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে।

ইতিহাস-পাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, অতি পুরাকালে যখন পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশ সকল অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন, তখনও আমাদের প্রাচীন মহর্ষিগণ পর্ণকুটীরে উপবিষ্ট হইয়া মহৎ মহৎ তত্ত্ব সকলের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। কি আয়ুর্ব্বেদ, কি মনোবিজ্ঞান, কি তর্কশাস্ত্র, কি জ্যোতির্ব্বিদ্যা, এই দুরবগাহ সমস্ত বিষয়েই তাঁহাদের বুদ্ধি অপ্রতিহত ছিল। দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে তাঁহারা যে সকল বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, আজি কালি তাহা দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও বিস্ময়াপন্ন হইতেছেন।

অনেকে বলেন, প্রাচীন মহর্ষিগণ ক্লেশসঙ্কুল সংসার-কার্য্য-পরম্পরায় বিরত হইয়া কেবল নির্জ্জনে পরমার্থ-চিন্তাই ভাল বাসিতেন। সংসারের যাহাতে প্রকৃত উন্নতি হয় এরূপ ব্যাপারে তাঁহাদিগের তাদৃশ আস্থা ছিল না। আমরা এমতের অনুমোদন করি না। আমরাই কেন যাঁহারা আর্য্যগণের জ্যোতির্ব্বিদ্যা, বার্ত্তাশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি, সমাজের উন্নতিকর ও মঙ্গলসাধক বিষয় সকল সাবধানে অনুশীলন করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যে প্রাচীন আর্য্যগণ কেবল ধ্যান-নিরত ছিলেন এরূপ নহে, সংসারীও ছিলেন।

আমাদের প্রবন্ধ আয়ুর্ব্বেদ-বিষয়ক। দেখা যাউক, আমাদিগের পিতামহগণ—প্রাচীন আর্য্যগণ—এবিষয়ে কি কারখানা করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে যেরূপ পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের মধ্যে ফিজিসান (physician) ও সার্জন (surgeon) এই দুই সম্প্রদায় লক্ষিত হয়, অতি প্রাচীন কালেও চিকিৎসকদিগের এই রূপ দুইটী সম্প্রদায়

ছিল। কতকগুলিকে কায়চিকিৎসক এবং কতকগুলিকে শল্যচিকিৎসক বলিত। যাঁহারা শস্ত্রাদি স্পর্শ না করিয়া কেবল জ্বরাদি রোগের চিকিৎসা করিতেন, তাঁহারা কায়-চিকিৎসক, এবং যাঁহারা ছেদ ভেদাদি দ্বারা স্বাভাবিক ও আগন্তুক ব্রণ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করিতেন, তাঁহারা শল্য-চিকিৎসক। শল্য-চিকিৎসক সম্প্রদায়ের আর একটি নাম ধান্বন্তরীয় সম্প্রদায়। * এই নামটি শল্য-চিকিৎসকগণ কোন্ সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা স্থির করা অতি কঠিন। কারণ সুশ্রুতের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে "ভগবান্ অমর-শ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরি যখন কাশীর অধিপতি দিবোদাস রূপে অবতীর্ণ হইয়া বানপ্রস্থাশ্রমে মহর্ষিগণে বেষ্টিত হইয়া আছেন, এমন সময়ে সুশ্রুত প্রভৃতি মুনিকুমারগণ তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ জিজ্ঞাসায় উপস্থিত হইলেন।" * কিন্তু বিষ্ণু পুরাণে দৃষ্ট হয় "কাশ্যের পুত্র কাশিরাজ, কাশিরাজের পুত্র দীর্ঘতমা, দীর্ঘতমার পুত্র ধন্বন্তরি। ধন্বন্তরির ক্ষীর সমুদ্রে জন্মকালে ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে এই বর প্রদান করেন যে, তুমি কাশীরাজ-গোত্রে অবতীর্ণ হইয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি করিবে এবং যজ্ঞাংশ-ভাগী হইবে, সেই ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্, কেতুমানের পুত্র ভীমরথ, ভীমরথের পুত্র দিবোদাস।" †.

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, "ধন্বন্তরি কাশীর অধিপতি ও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উপদেষ্টা ছিলেন" এই অংশে সুশ্রুত ও বিষ্ণুপুরাণের ঐকমত্য আছে। কিন্তু সুশ্রুতের মতে দিবোদাস ধন্বন্তরির অবতার, বিষ্ণুপুরাণের মতে দিবোদাস ধন্বন্তরির প্রপৌত্র মাত্র। ঋক্‌বেদেও এক দিবোদাসের উল্লেখ আছে, এবং আরও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় দিবোদাস নামে এক ব্যক্তি কাশীর অধিপতি ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কাশীধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশীর দশ ক্রোশ উত্তরে চম্বক নামক স্থানে দুর্গ ও কাশীসদৃশী নগরী নির্ম্মাণ করেন। সেই দুর্গ ও নগরীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান

* "তত্র ধন্বন্তরীয়ানামধিকারঃ ক্রিয়াবিধৌ বৈদ্যানাং কৃতযোগানাং ব্যধ-শোধন-রোপণে।" চরক, চিকিৎসিতস্থান গুল্মাধিকার।

* "অথ ভগবন্তমমরবরমৃষিগণপরিবৃতমাশ্রমস্থং কাশিরাজং দিবোদাসং ধন্বন্তরিমৌপধেনববৈতরণৌরভ্রপৌষ্কলাবতকর-বীর্য্যগোপুররক্ষিতসুশ্রুতপ্রভৃতয় ঊচুঃ।" সুশ্রুত সূত্রস্থান ১ ম অধ্যায়।

† "কাশ্যস্য কাশীরাজঃ তস্য দীর্ঘতমা পুত্রোঽভূৎ। ধন্বন্তরিস্তু দীর্ঘতমসোঽভূৎ। সচ নারায়ণেন বরং দত্তঃ। কাশিরাজ-গোত্রে অবতীর্য্য অষ্টধা সম্যগায়ুর্ব্বেদং করিষ্যসি। যজ্ঞভাক্ ত্বং ভবিষ্যসীতি। তস্যচ ধন্বন্তরেঃ পুত্রঃ কেতুমান্, কেতুমতো ভীমরথঃ। তস্যাপি দিবোদাস ইতি। বিষ্ণুপুরাণং।"

আছে। * এক্ষণে আমরা সুশ্রুতে, বিষ্ণু-পুরাণে, ঋগ্বেদে ও অন্যান্য স্থলে দিবোদাস নামক ব্যক্তির উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি; ঋগ্বেদের দিবোদাস যে অন্য-স্থলত্রয়ের দিবোদাস হইতে স্বতন্ত্র ও তাঁহা অপেক্ষা প্রাচীন তদ্বিষয়ে বোধ হয় সংশয় হইতে পারে না। কারণ পুরাণ ও সুশ্রুত অপেক্ষা ঋগ্বেদ অনেক প্রাচীন, এবং ঋগ্বেদের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মও প্রচলিত ছিল না।

দেখা যাউক অন্য তিনটী দিবোদাস এক কি না। সুশ্রুতে দিবোদাসকে কাশীর অধিপতি ও ধন্বন্তরির অবতার বলি-তেছে। বিষ্ণুপুরাণের দিবোদাসকে ধন্ব-ন্তরির প্রপৌত্র বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু এই দুই স্থলে দিবোদাসকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী বলিতেছে না। স্থলান্তরের দিবোদাস বৌদ্ধ ও কাশীর অধিপতি। এমন হইতে পারে বিষ্ণুপুরাণ-কার (যখন বিষ্ণুপুরাণের রচয়িতা বেদব্যাস কি না, এবং কোন্ সময়ে উহা রচিত হইয়াছে তাহার স্থির নিশ্চয় নাই) আপন গ্রন্থের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত বৌদ্ধধর্ম্মের কথাই উত্থাপিত করেন নাই। এবং ইহাও হইতে পারে, সুশ্রুত দিবো-দাসকে বৌদ্ধ বলিবার অবসর পান নাই। সুতরাং ঋগ্বেদের দিবোদাস ব্যতীত আর তিন স্থলের দিবোদাসের যখন অনেকাংশে সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে এবং যে বিষয় লইয়া আমরা আন্দোলন করিতেছি তদ্বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ সুশ্রুতে যখন দিবোদাসকে ধন্বন্তরির অবতার মাত্র বলিতেছে, আর সুশ্রুতের যখন পুরাণাপেক্ষা প্রামাণিকতা অধিক, তখন আমরা দিবোদাসের নামান্তর ধন্বন্তরি এবং ঋগ্বেদের দিবোদাস ভিন্ন আর তিন দিবোদাস এক এরূপ অনুমান করিয়া লইলাম।

অতএব যখন দিবোদাস ও ধন্বন্তরি এক বলিয়া অনুমিত হইল, তখন দিবো-দাসের পর হইতেই শল্য-চিকিৎসকগণ ধান্বন্তরীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতে-ছেন। আবার একথাও লিখিত আছে। ধন্বন্তরি স্বয়ং বলিতেছেন "আমি আদি-দেব ধন্বন্তরি অমরগণের জরারোগমৃত্যু-নাশক অন্যান্য অঙ্গের সহিত শল্যাঙ্গ (শল্যতন্ত্র) উপদেশ দিবার জন্য পৃথি-বীতে অবতীর্ণ হইয়াছি।" * ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে তিনি কেবল শল্য-তন্ত্রেরই উপদেশ দিয়াছিলেন এরূপ নহে। অন্যান্য তন্ত্রেরও উপদেষ্টা ছিলেন। বাস্তবিকও তাঁহার উপদিষ্ট সুশ্রুত গ্রন্থে কেবল যে শল্য-তন্ত্রের বিষয়ই আছে, এরূপ নহে, কায়চিকিৎসার

* Asiatic Researches, vol III Page. 411.

* "অহংহি ধন্বন্তরিরাদি দেবো জরারুজা-মৃত্যুহরোঽমরাণাং শল্যাঙ্গ মঙ্গৈরপরৈরু-পেতং প্রাপ্তোঽস্মি গাং ভূয় ইহোপদেষ্টুম্।" সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ১ম অধ্যায়।

বিষয়ও অনেক আছে। তবে শল্য-তন্ত্রের অপেক্ষাকৃত বাহুল্য আছে এই মাত্র বলিতে পারা যায়। বোধ হয় এই বাহুল্য দর্শনেই তদধস্তন কায়চিকিৎসকেরা শল্য-চিকিৎসকদিগকে ধান্বন্তরীয় সম্প্রদায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। সুতরাং যদিও চিকিৎসকদিগের শ্রেণী বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দৃষ্ট হইতেছে, তথাপি শল্যচিকিৎসকেরা যে কায়-চিকিৎসা করিতেন না, এমন নহে, বরং কায়-চিকিৎসকেরা শল্যচিকিৎসায় অক্ষম ছিলেন। কারণ চরকের অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, যে যে স্থানে ছেদাদির প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সেই স্থানে শল্য-চিকিৎসক দ্বারা তত্তৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে এরূপ লিখিত আছে।

যাহা হউক এ সকল বিষয় লইয়া অধিক আর আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই, প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করা যাউক।

পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, বর্ত্তমান অধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদের বাল্য অবস্থার বিষয় বলিব।——বাল্যাবস্থা অতি প্রাচীন কাল হইতে চরক ও সুশ্রুতের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। এ অবস্থায় আয়ুর্ব্বেদের কোন বিশেষ গ্রন্থ ছিল এরূপ বোধ হয় না। কেবল গুরু-পরম্পরায় মৌখিক শিক্ষা হইত মাত্র। তবে সুশ্রুতের প্রথম অধ্যায়ে যে লিখিত আছে "ব্রহ্মা প্রথমতঃ অধ্যায় সহস্রে বিভক্ত লক্ষশ্লোক-সম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি করেন" এরূপ গ্রন্থের কোন চিহ্নও নাই, আর এইরূপ ঔপন্যাসিক কথার উপর বিশ্বাস করাও যাইতে পারে না। তবে ঋগ্বেদে চিকিৎসার কথার উল্লেখ আছে; মহর্ষি হিরণ্যস্তূপ অশ্বিনীকুমারদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন যে "হে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় আপনারা আমাদিগকে স্বর্গ মর্ত্ত ও আকাশের ঔষধের বিষয় শিক্ষা দিউন।" * ঋগ্বেদ আদিবেদ এবং অতি প্রাচীন কালের। উপাধ্যায় উইল্‌সন্ সাহেব কোলব্রুক্ সাহেব ও অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে ঋগ্বেদের সংহিতা খৃঃশাকের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছে। * ঋগ্বেদের সংহিতা যখন এতদিনের, ঋগ্বেদ তাহার পূর্ব্বে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদ,সংহিতার কত শতাব্দীর পূর্ব্বে যদিও তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে না কিন্তু নিতান্ত অল্প দিন পূর্ব্বে নহে একথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। অন্ততঃ তিন চারি শতাব্দী পূর্ব্বে হইবে এরূপ অনুমান নিতান্ত ভ্রমাত্মক নহে। অতএব দেখা যাইতেছে ঋগ্বেদ খৃঃ শাকের সপ্তদশ কিম্বা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের। যখন খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের গ্রন্থে চিকিৎসা ও চিকিৎসকের উল্লেখ রহি-

* ঋগ্বেদ ১ ম অষ্টক তৃতীয় অধ্যায় সপ্তম অনুবাক চতুর্থ সূক্ত।

Vide Wilson's Instroduction to Rig-veda and Muir's Introduction to Sanskrit Texts.

য়াছে তখন তাহার পূর্ব্বে যে চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলন ছিল এবিষয়ে আর সন্দেহ হইতে পারে না।

এতাবতা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে আর্য্যগণ রোগ নির্ণয় ও তত্তৎ রোগের ঔষধানুসন্ধানরূপ বিশ্বহিতকর ব্যাপারে বহুকাল হইতে নিযুক্ত আছেন। যখন, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি নিতান্ত অসভ্যাবস্থায় পতিত, স্বাস্থ্যবিধান ও ঔষধাদির নাম গন্ধও অবগত নহেন। তখনও—সেই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও—আমাদের পিতামহগণ এই বিশ্বজনীন ব্যাপারে বিব্রত ছিলেন। কিন্তু তৎকালে আয়ুর্ব্বেদের নিতান্ত শৈশবাবস্থা। তখন আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অপরিপুষ্ট ও ক্রিয়াবিহীন। মাতৃক্রোড়ে শয়ান শিশুর ন্যায় কেবল ভাবি উন্নতির উন্মেষ উদ্বুদ্ধ হইতেছে মাত্র। ক্রমশঃ আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

মহাভারতে শল্যতন্ত্রের উল্লেখ আছে। ভীষ্মদেব যখন শরশয্যায় শয়ান, সঞ্জয় তাঁহাকে কহিতেছেন "শল্যোদ্ধরণকুশল সুশিক্ষিত বৈদ্যগণ সর্ব্বোপকরণসমেত উপস্থিত হইয়াছেন" * ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে শল্যতন্ত্র মহাভারতের সময় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। মহাভারত কোন্ সময়ে প্রণীত অথবা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার স্থির নিশ্চয় করা সহজ নহে। কোন কোন ইতিহাস-বেত্তা স্থির করিয়াছেন খৃঃ শাকের ১৩।১৪। শত অব্দের পূর্ব্বে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়। * কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর অনুসারে গণনা করিতে হইলে পাণ্ডবদের সময় খৃঃ শাকের ২৪৫০ অব্দ পূর্ব্বে হয়। মহাভারত কুরুক্ষেত্র-সমরের অনেক পরে প্রণীত হইয়াছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু মহাভারতের সময় স্থির নিশ্চয় করিবার উপায় নাই। তবে একথা অবশ্যই সাহসপূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে পৌরাণিক ধর্ম্মের বহুল প্রচার ছিল। যদি শাক্যসিংহ (বুদ্ধদেব) খৃঃ শাকের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন একথা প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে পৌরাণিক ধর্ম্ম খৃঃ শাকের ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে অনুমান করিতে হইবে। মহাভারত আদি পুরাণ। সুতরাং খৃঃ শকের ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত রচিত হইয়াছে, এরূপ আনুমানিক স্থির করা নিতান্ত অসঙ্গত হইতেছে না।—যদি মহাভারতের সময় খৃঃ শাকের ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বে স্থির করা যায় আর সেই মহাভারতে যখন

* "উপাতিষ্ঠন্নথো বৈদ্যাঃ শল্যোদ্ধরণকোবিদাঃ সর্ব্বোপকরণৈর্যুক্তাঃ কুশলৈঃ সাধুশিক্ষিতাঃ।" মহাভারত ভীষ্ম-পর্ব্ব ভীষ্মবধপর্ব্বাধ্যায় ১২০ অধ্যায়।

* Elphinstone's History of India Book 3rd, Chapter 3rd, Cowel's Edition Page 156.

শল্য-চিকিৎসার কথা পাওয়া যাইতেছে তখন খৃঃ শাকের ৮/৯ শত বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ কিয়ৎ পরিমাণে শল্যচিকিৎসায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন তাহার আর সন্দেহ রহিল না।

এক্ষণে দেখা যাউক অতি প্রাচীন কাল হইতে মহাভারতের কাল পর্য্যন্ত আমরা আয়ুর্ব্বেদের বিষয় কতদূর অবগত হইলাম। অবগত যাহা হইলাম বলিতে হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই নহে। কেবল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই একটি আয়ুর্ব্বেদের চিহ্ন মাত্র প্রাপ্ত হইলাম। ঋগ্বেদে আয়ুর্ব্বেদের উল্লেখ আছে, মহাভারতে আয়ুর্ব্বেদের উল্লেখ আছে। বিশেষ এই, ঋগ্বেদের সময় মহর্ষিগণ অমরভিষক্ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট ঔষধের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন। মহাভারতে শল্য-চিকিৎসা-কুশল মর্ত্ত্য চিকিৎসকগণের আবির্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। তখন (ঋগ্বেদের সময়ে) মহর্ষিগণের মনঃকল্পিত সুরচিকিৎসকগণের স্তুতি বিন্যাস; এখন (মহাভারতের সময়) চিকিৎসাশাস্ত্র ফলোন্মুখ ও প্রকৃত কার্য্যে নিযুক্ত। কিন্তু এই দুই দীর্ঘকালের মধ্যে আমরা আয়ুর্ব্বেদের কোন গ্রন্থ প্রাপ্ত নহি।—তাহার নামও অবগত নহি। কোন গ্রন্থ যে ছিল তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। আমাদের বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের পর হইতেই আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থ সকল সঙ্কলিত হয়। বুদ্ধদেব খৃঃ শতাব্দীর পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হন। তাহার পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদ বোধ হয় অন্যান্য বেদের ন্যায় শ্রুতিপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল। তাহা না হইলে কোন গ্রন্থ বিশেষ অবশ্যই থাকিত। তাহা যখন দৃষ্ট হইতেছে না, তখন আমাদের এরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

উপরে আয়ুর্ব্বেদের কালের বিষয় যে আলোচিত হইল আমরা তাহার আয়ুর্ব্বেদের "বাল্যকাল" নাম দিলাম।

ক্রমশঃ।

শ্রীব্রঃ

পরেশনাথ পর্ব্বত।*

হেরি দূরে ঊর্দ্ধশিরঃ তোমার গগনে,
অচল, চিত্রিত পটে জীমূত যেমতি।
ব্যোমকেশ তুমি কি হে, (এই ভাবি মনে)
মজি তপে, ধরেছ ও পাষাণ মূরতি?—
এহেন ভীষণ কায়া কার বিশ্বজনে?
তবে যদি নহ তুমি দেব উমাপতি,
কহ, কোন্ রাজবীর তপোব্রতে ব্রতী?
খচিত শিলার বর্ম্ম কুসুম-রতনে
তোমার। যে হরশিরে শশি-কলা হাসে,
সে হর কিরীটরূপে তব পুণ্যশিরে,
চিরবাসী,—যেন বাঁধা চির-প্রেম-পাশে!
হেরিলে তোমায় মনে পড়ে ফল্গুনীরে;—
সেবিলা বীরেশ যবে পাশুপত-আশে
ইন্দ্রকীল নীল চূড়ে দেব ধূর্জ্জটিরে।

---

* যে সময় কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তজ, পঞ্চকোটের মহারাজার পক্ষে কৌন্সলী হইয়া, কিয়দ্দিবস পুরুলিয়ায় অবস্থিতি করেন, সেই সময় একদা প্রত্যূষকালে দূরে পরেশনাথ পর্ব্বত অবলোকন করিয়া, এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাটী চরনা করেন। শ্রীকৈলাসচন্দ্রবসু।

গীত।

রাগিনী মুল্‌তানী—তাল আড়াঠেকা।

বিনায়ে বঙ্গ জননী, কাঁদিছে কাতর স্বরে।
দ্বারকানাথেরি শোকে, ব্যথিত হয়ে অন্তরে॥
কেন রে নির্দ্দয় শমন,— বাংলার গৌরব-তপন—
অকালে ঢাকিলি আসি, মৃত্যু-মেঘাচ্ছন্ন করে॥
হায়!
কে আর তেমন করি, বিচার-আসনোপরি,
বসিবে উজ্জ্বল কবি, সত্যেরি সন্ধানে——
নির্ভয়ে তেমন আর, করিবে কে সুবিচার,
মাপিয়ে সত্যেরি ভার, ন্যায়-তুলা ধরি করে॥
হায়!
সৌহার্দ্দ উদার গুণে, আদরেরি সম্ভাষণে,
কে আর বান্ধবগণে, তুষিবে তেমনি——
জ্বালিয়ে বুদ্ধির আলো, দেশের মুখ উজ্জ্বল,
কে আর তেমন বলো, করিবে বঙ্গ ভিতরে॥ শ্রীগঙ্গাধরঃ—

প্রাপ্ত-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বঙ্গভূষণ—বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ইহার প্রণেতা। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। গ্রন্থকার তরুণ-বয়স্ক। এই নবীন বয়সে তিনি যখন এরূপ সুললিত কবিতামালা রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন বোধ হইতেছে তিনি যদি অধ্যবসায়শালী হন, তাহা হইলে পরিণত বয়সে অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ সকল রচনা করিতে পারিবেন। কবি টাইটেল পেজে মিলটনের সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ;—

"——I will tell you now
What never yet was heard in tale or song,
From old or modern bard in hall or bower."
"——it pursues
Things unattempted yet in rhyme.
Milton.

'আমি যে বিষয় বর্ণনা করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা পূর্ব্বে পদ্যে কেহই বর্ণনা করেন নাই !'—কবি তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়াছেন। বাস্তবিক বঙ্গভূষণগণের জীবনচরিত পূর্ব্বে কখনই এরূপ পদ্যে গ্রথিত হয় নাই। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা মিল্‌টনের লেখনীতে যেরূপ মিষ্ট লাগিয়াছিল, আমাদের নবীন কবির লেখনীতে সেরূপ লাগিল না। গ্রন্থকার যৎকালে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তখন বোধ হয় তাঁহার মনে উদিত হয় নাই যে ইহা দ্বারা কিঞ্চিৎ আত্মগরিমা প্রকাশ পাইবে। কবি আর এক স্থলে এ কটী কাঁচা কাজ করিয়াছেন, দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ীকে এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিতে গিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়া বসিয়াছেন।

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন,—"আমি যতদূর অনুসন্ধান দ্বারা স্বদেশমুখোজ্জ্বলকারী মৃত ব্যক্তিগণের বিষয় অবগত হইয়াছি, এই পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত করিলাম।" কিন্তু গ্রন্থকার বিশেষ অনুসন্ধান করিলে বঙ্গভূষণগণের অনেকেরই বিষয় যে অধিকতর অবগত হইতে পারিতেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

কবি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, মৃত কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর অনুকরণে বঙ্গভূষণ লিখিত হইয়াছে। এই ঘটনাটী অতি শোচনীয়। কবি যদি কোন গ্রন্থকারেরই অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কবিত্ব-শক্তি অধিকতর প্রকাশ পাইত। নির্দ্দিষ্ট সীমায় বদ্ধ থাকায় তাঁহার রচনা বঙ্গকামিনীর ন্যায় যেন নির্জ্জীব ভাব ধারণ করিয়াছে।

ইহা সুললিত বটে,—কিন্তু ইহাতে স্বভাবজাত কবির তেজোরাশি উপলক্ষিত হয় না। কবির মনে ভাব আসিল—তিনি তাহা অবাধে লিখিয়া গেলেন। দেখিলেন তাঁহার লেখা ছন্দোময়ী রচনায় পরিণত হইয়াছে। এরূপ লেখককেই স্বভাবজাত কবি বলি এবং তাঁহার রচনাকেই প্রকৃত কবিতা বলি। লেখকের মনে ভাব আসিল—তিনি ভাবিলেন ইহা 'গদ্যে কি পদ্যে সুন্নিবেশিত করি'। পদ্যে সন্নিবেশিত করাই স্থির হইল—তাহার পর বিতর্ক উপস্থিত হইল—'কাহার ছন্দের অনুকরণ করি?'

অনুকরণীয় ছন্দের স্থির হইল—লেখক মনের ভাবগুলিকে সেই ছন্দময় কারাগারে বলপূর্ব্বক প্রবেশিত করিতে লাগিলেন। ভাব সকল ক্রমে নির্ব্বীর্য্য ও ম্লান ভাব ধারণ করিল। এরূপ লেখক স্বভাবিক-কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন হইলেও অচিরাৎ সেই উচ্চ সিংহাসন হইতে চ্যুত হইবেন সন্দেহ নাই। বঙ্গভূষণকার যদি এই সঙ্কীর্ণ পথে অধিক দিন পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলে আমাদের তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত আশাই যে বিফল হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমরা বন্ধুভাবে বঙ্গভূষণ-লেখককে এই সকল পরামর্শ দিলাম। আশা করি তিনি ভবিষ্যৎ নব রচনার সময় আমাদিগের এই পরামর্শগুলি স্মরণ করিবেন।

বঙ্গভূষণ যে অবস্থায় এক্ষণে বঙ্গসমাজে প্রেরিত হইয়াছে, এ অবস্থায় ও ইহা অতি উপাদেয় বস্তু হয় নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে ইহা এ অবস্থাতেও সুপাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। বঙ্গভূষণগণের জীবন-বৃত্ত গুলি অধিকতর বিবৃত হইলে ইহা আরও উপাদেয় হইত সন্দেহ নাই।

ভারতমাতা—বাবু কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা। মূল্য ৵০ আনা মাত্র। হতভাগ্য ভারতকলঙ্ক আর্য্যগণের ভস্মাচ্ছাদিত বীর্য্য-বহ্নির উদ্দীপক এরূপ অপূর্ব্ব কাব্য আর বঙ্গভাষায় রচিত হয় নাই। কিরণ বাবু এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করিয়া আমাদিগের মনে নিদ্রিত স্বাধীনতার ভাব যে কতদূর উদ্বোধিত করিয়াছেন বলিতে পারি না। ইহা বঙ্গবাসীর হৃদয়ের কি প্রিয়বস্তু হইয়াছে তাহা এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ইহা এক বৎসরের মধ্যে প্রায় বিংশতিবার অভিনীত হইয়াছে। অভিনয়-স্থলে এমন পাষণ্ড কাহাকেও দৃষ্ট হয় নাই, যাহার নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা পতিত হয় নাই। আমরা অন্তরের সহিত কিরণ বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তিনি যেন দীর্ঘজীবী হউন। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যত দিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে তত দিন ইহার ভারতলক্ষ্মীর দৃশ্যটি বঙ্গবাসীর হৃদয়ে দেদীপ্যমান রহিবে। আমাদের বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন জন্য সেই দৃশ্যটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

দৃশ্য।

হিমালয় পর্ব্বত।

চিন্তামগ্না আলুলায়িত-কেশা

ভারতমাতা আসীনা।

সম্মুখে ভারত-সন্তানগণ নিদ্রিত।

ভারতলক্ষ্মীর প্রবেশ।

গীত।

রাগিণী তিলক কমদ—তাল ঝাঁপতাল।

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত! তোমারি।

রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি॥

চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে।

আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।

এ দুঃখ তোমার হায়রে! সহিতে না পারি।

গীত।

রাগিণী পাহাড়ী—তাল একতালা।

দেখগো ভারতমাতা তোমারি সন্তান।

ঘুমায়ে রয়েছে সবে হয়ে হতজ্ঞান।

সবে বল-বীর্য্য-হীন, অন্ন বিনা তনু ক্ষীণ,

হেরিয়ে এদের দশা বিদরিয়ে যায় প্রাণ।

মরি এদশা তোমার, সহিতে না পারি আর,

অপার জলধিপার চলিলাম ছাড়ি এস্থান॥

(এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে

ভারতলক্ষ্মীর প্রস্থান।)

ললিতা-সুন্দরী—শ্রীযুক্ত অধরলাল সেন কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। সুযোগ্য এডুকেশন সম্পাদক মহাশয় ললিতা-সুন্দরীর সমালোচনায় লিখিয়াছেন যে, "গুড়ের হাঁড়া ভাঙ্গিয়া গেলে সেই সকল গুড় মাটি, খোলা, কঙ্করাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই ললিতা-সুন্দরী কাব্যখানির অবস্থাও ঠিক সেই রূপ হইয়াছে।" আমাদেরও এই পুস্তক বিষয়ে ঠিক এই মত। ললিতা-সুন্দরীর স্থানে স্থানে প্রকৃত কবিত্বশক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহা এত অসার বস্তুর সহিত মিশ্রিত যে, তাহা বাছিয়া লওয়া ভার। ইহার স্থানে স্থানে অশ্লীল রসিকতার চিহ্নও উপলক্ষিত হয়। অধর বাবু তাঁহার গ্রন্থে যে প্রণয়ের ছবি দিয়াছেন, তাহা উচ্চ দরের প্রণয়ের ছবি নহে। তাঁহার নায়ক নায়িকার মনে উচ্চতর প্রেমের সঞ্চার হইলে, তাঁহার গ্রন্থেরও অধিকতর সমাদর হইত সন্দেহ নাই। যাহা হউক উপরি-উল্লিখিত কয়েকটী দোষ পরিহার করিলে অধর বাবু একজন কবি বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারিবেন।

—০:—

সন ১২৮১ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রাবণ মাস।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ সেন
কলিকাতা ৩৲

,, বৈকুণ্ঠ নাথ সেন
বহরমপুর ৩।৶০

,, দিগম্বর চক্রবর্ত্তী
জলপাই গুড়ি ৩।৶০

,, প্রিয় নাথ দত্ত উকিল
মালদহ ৩।৶০

,, রাজেন্দ্রকুমার বসু ঢাকা ৩।৶০

,, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
আহিরী টোলা কলিকাতা ১৸৹

,, শিব চরণ মিশ্র
কালিকা কুণ্ডু ৩৶০

,, দ্বারিকা নাথ বসু
বনওয়ারি পাড়া ২॥১০

,, শ্রীশচন্দ্র দত্ত মেদিনীপুর ৯৲

,, রামকিশোর মোদক
গোয়াল পাড়া ৩।৶০

,, রামকানাই সেন
গোয়াল পাড়া ৩।৶০

,, যাদব চন্দ্র সেন
গোয়াল পাড়া ১/১০

,, সোমনাথ ডেকাবরা
আসাম ৩।৶০

,, শশীভূষণ লাহিড়ী কলিকাতা ৩৲

,, চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়
ব্রজ যোগিনী স্কুল ৩।৶০

,, ঈশান চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
পিঙ্গিলা সুবর্ণখুলী ৩৶০

,, কেদার নাথ মজুমদার
চুনাগলী ৯২নং ১॥০

,, দ্বারকা নাথ সিংহ জব্বলপুর ৩।৶০

,, মহেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জব্বলপুর ৩।৶০

,, রঘু নৃসিংহ গোস্বামী
শান্তিপুর ৶১৫

,, মোহিনী মোহন দত্ত
ক্যাথিড্রাল মিসন কালেজ ৩৲

,, পরেশ নাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রেসিডেন্সী কালেজ ৩৲

,, কাশী নাথ মৈত্র
প্রেসীডেন্সী কালেজ ৩৲

,, যোগেন্দ্র নাথ চৌধুরী
কলিকাতা ১৲

,, হৃদয় নাথ দাস
মেদিনীপুর ৩।৶০

,, লালবিহারি লাহিড়ী উকিল
মালদহ ২।১০

,, রাধাকিশোর সিল
বড় বাজার কলিকাতা ৩৲

কৈলাস চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
হরিশঙ্কর পুর ১৸৶০

,, যোগেন্দ্র নাথ মজুমদার
হরিশঙ্কর পুর ১/১০

" কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাজমহল ৩।৶৹
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রাজমহল ৩।৶৹
" গোরাচাঁদ সিংহ বীর সিংহ ৸৹
" দক্ষিণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরজ পুর ১৷৹
" হেনরী মাইকেল এলাহাবাদ ৩।৶৹
" শ্যামাচরণ মিত্র এলাহাবাদ ৩।৶৹
" অমৃতলাল মল্লিক বাগ আঁচড়া ৩।৶৹
" ভারতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কলিকাতা ৩৲
" উমেশচন্দ্র মৈত্র কলিকাতা ৩৲
" বিষ্ণুচন্দ্র সিংহ কলিকাতা ৩৲
" উমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহেশতলা ৩।১০
" রাজবিহারি দাস ঢাকা ১৷১০
" হরিমোহন ঘোষ কাটিপাড়া যশোহর ৩।৶৹
" কৈলাশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা নন্দন বাগান ১৲
" কালিচরণ শীল বড় বাজার ৩৲
" গণেশচন্দ্র মারিক পাথুরিয়া ঘাটা ১৶৹
" চন্দ্রকুমার চৌধুরী কলিকাতা ১৲
" নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেট ইষ্টারণ হোটেল ১৷৹
" নৃসিংহচন্দ্র হালদার রাইটার্স বিলডিং ১৲
" হেমচন্দ্র চৌধুরী কলিকাতা টেলিগ্রাফ ডিঃ ৩৲
" প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জলপাই গুড়ি ৩।৶৹
" ত্রৈলোক্যনাথ হালদার লক্ষ্ণৌ ৩।৶৹
" গোপী কৃষ্ণ ঠাকুর সাহেব ত্রিপুরা ব্রাহ্মণ বেড়িয়া ৩।৶৹
" ভগবতী চরণ চট্টোপাধ্যায় রাইটার্স বিলডিং ২৲
" নবীন চন্দ্র ঘোষ বেঙ্গল সেক্রেটরী ৩৲
" বিধু ভূষণ বসু কাট দহ নদীয়া ৩।৶৹
" নৃত্য গোপাল রায় ফটিকচরী চট্টগ্রাম ৩।৶৹
" বনওয়ারি লাল মুন্সী উলিপুর রংপুর ২।৶৹
" ত্রৈলোক্য নাথ দাস কলিকাতা শ্যামপুকুর ১৲
" হরিমোহন বসু অলিপুর ৩।৶৹
" শ্যামাচরণ ভট্ট বহরমপুর ৩।৶৹
" গণপতি ঘোষাল ঐ ৩।৶৹
" আশুতোষ বসু ঐ ৩।৶৹
" দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ঐ ৩।৶৹
" ধরণীধর কবিরাজ ঐ ৩।৶৹
" পুরুষোত্তম ধর বহুবাজার ২৲
" বহুবাজার স্কুল সম্পাদক ৩৲
" বলাই চাঁদ বসু কলুটোলা কলিকাতা ৩৲
" ভূপতি সর্ব্বাধিকারী মেদিনীপুর ১৸৴১০
" ধনকুমার দাস দিনাজপুর ৩।৶৹
" রাজা জগৎ কৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর ময়মন সিংহ ৩।৶৹
" রাধিকানাথ ঘোষাল রামগঞ্জ ৩।৶৹

সুপ্রসিদ্ধ প্রথম ফরাশি বিপ্লব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যৎকালে রোমসাম্রাজ্যের বিজেত্রী অসভ্য উত্তর সেনার গ্রাম্য স্বাধীনতা এতাদৃশী দশা প্রাপ্ত হয়, তৎকালে ইউরোপের দক্ষিণ প্রদেশে বিভিন্ন-প্রকার ঘটনাবলী আবির্ভূত হইয়াছিল। তথায় রোমীয় সভ্যতা কখনই সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত এবং গথীয় স্বাধীনতা কখনই সম্পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হয় নাই। ইতালীর আধুনিকী স্বাধীনতা নাগরিকদিগের অধীনতা-অসহিষ্ণুতা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্বাধীনতার পরিপোষণ দোলা নগরের সাধারণ মন্দিরই ছিল—সামন্তদিগের দুর্গ নহে। যৎকালে সামন্তেরা পরস্পরের উচ্ছেদ-সাধনের মন্ত্রণায় ব্যাপৃত ছিলেন, যৎকালে তাঁহারা উপত্যকা প্রদেশের লুণ্ঠন-মানসেই কেবল আপিনাইন পর্ব্বতের অধিত্যকাস্থিত দুর্গ হইতে মধ্যে মধ্যে নির্গত হইতেন, তৎকালে নগরের অধিবাসীগণ নাগরিক প্রাকারের অভ্যন্তরে নির্ব্বিঘ্নে উপচীয়মান হইতেছিলেন; এবং স্ব স্ব নগরমহানসে নাগরিক স্বাধীনতার নির্ব্বাণ-প্রায় স্ফুলিঙ্গকে পূর্ণ নির্ব্বাণ হইতে পরিরক্ষিত করিতেন। যৎকালে বহিরাল্‌প্‌স প্রদেশের রাজ্য সকল তখন ও অসভ্যতা-স্রোতে নিমগ্ন ছিল; এবং যৎকালে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প কেবল সামন্তদিগের দুর্গ-প্রাকারচ্ছায়ায় ধমায়মান হইতেছিল; তৎকালে ইতালীর সাধারণতন্ত্র সকলের ধনাগারে ঐশ্বর্য্য এবং সৌধরাজিতে শিল্প বিরাজ করিত। তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের রাজ্যকালে ইংলণ্ডে যখন সামন্তেরা স্ব স্ব গ্রাম্য আবাসে গ্রাম্য সুখে দিনাতিপাত করিতেন; যখন তাঁহাদের গৃহতল মনোহর-কার্পেট্-মণ্ডিত না হইয়া শরখণ্ডে আবৃত হইত; তখন ইতালী—পিট্রার্ক ও ড্যান্‌টী, র‍্যাফেল ও ম্যাকিয়্যাভেলের—প্রতিভায় সমুজ্জ্বলিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে অষ্টম চার্ল্‌স যৎকালে স্বীয় অসভ্য বীর সামন্তগণের সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয় মানসে সহসা ইতালীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তৎকালে দেখিলেন ইতালীর অধিবাসীরা ধনে ও সভ্যতায় অতিশয় উন্নত, এবং নগরসমূহ বণিকসম্প্রদায়-বহুল। এই বণিক্-সম্প্রদায় এক সময়ে ইউরোপের সমস্ত রাজাকেই নিজ-অধমর্ণ-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিল। যৎকালে সামন্তনায়ক চার্ল্‌স যুদ্ধার্থ ফ্লরেন্‌স নগরীর সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে স্বাধীন নাগরিকগণ যুদ্ধ-প্রতিদানে সিংহনাদ করিয়া উঠিল।

চার্লস এই রণোন্মত্ত অধিবাসিগণের সহিত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া স্বদেশে পলায়ন করিলেন।

ইতালীয় সাধারণতন্ত্র সকলের সামাজিক ও দেশহিতৈষিতা গুণ—ইহার সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের কোন অংশে ন্যূন ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্ম্মাণীর সম্রাট্ লম্বার্ডীর সাধারণতন্ত্র-সমবায়ের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। এবং আধুনিক ইতালীয়দিগের দেশহিতৈষিতার নিকট প্রাচীন গ্রীসীয়দিগের দেশহিতৈষিতা পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। ক্রিমোণার অবরোধকালে অবরুদ্ধ নগর-বাসিগণকে শস্ত্রমোক্ষণে বিরত করিবার উদ্দেশে নির্দ্দয় জার্ম্মণীয় সেনা যখন অবরুদ্ধ নাগরিকদিগের শিশুসন্তানগণকে প্রাকার-সান্নিধ্যে ধারণ করিয়াছিল, তখন অবরুদ্ধ পিতা মাতা পুত্র-প্রাণনাশাশঙ্কায় রোরুদ্যমান হইয়াও অস্ত্রমোক্ষণে বিরত হন নাই। যৎকালে পাইসার একাধিক দশসহস্র প্রধান নাগরিক জেনোয়ার কারাগারসমূহে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহারা স্বনগরীর প্রধান সভার নিকট এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন যে তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থে একটী দুর্গ ও যেন শত্রুহস্তে সমর্পিত না হয়। দেশহিতৈষিতার এরূপ দৃষ্টান্ত প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে আর দেখা যায় না। "ট্রাফাল্গার" জলযুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বিনী রণতরি যত নাবিক সংগ্রহ করিয়াছিল, "লা মেলোরিয়া" জলযুদ্ধে জেনোয়া ও ভিনিসের পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বিনী রণতরির নাবিক-সমবায় তাহা অপেক্ষা সংখ্যায় কোন মতে ন্যূন ছিল না।

কিন্তু এই অদ্ভুত দেশহিতৈষিতা অল্পসংখ্যক-নাগরিক-সংরুদ্ধ থাকায় দীর্ঘকাল-স্থায়িনী হইতে পারে নাই। সামন্তদিগের অসামান্য স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও ইতালীয় সাধারণতন্ত্রিদিগের অমানুষী স্বদেশহিতৈষিতা—এই এক কারণ বশতঃই ক্রমে অন্তর্হিত হইল। ধনের মোহিনী শক্তিতে উচ্চ শ্রেণী ক্রমে হৃতসার হইয়া উঠিল। দাসত্বপ্রপীড়িত নিম্নশ্রেণী তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করিতে পারিল না। তদানীন্তন উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অন্তর অতি প্রশস্ত ছিল। নিম্নলিখিত অদ্ভুত কারণ-পরম্পরায় এই অন্তর ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতে লাগিল।

প্রথমতঃ—খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের সহিত দাসত্বপ্রথা ক্রমে তিরোধান করিতে লাগিল। এই দাসত্বপ্রথা প্রাচীন সমস্ত রাজ্যেরই উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল। ঐশ্বর্য্যের স্বতোবর্দ্ধনে সকলদেশেই উচ্চশ্রেণী বিলাসপ্রিয় ও নির্বীর্য্য হইয়া উঠিল। এদিকে নিম্নশ্রেণী বহুকালপর্য্যন্ত দাসত্বের নিগঢ় বন্ধনে হৃতসার ও হতবীর্য্য হইয়া বিপদ্‌কালে উচ্চশ্রেণীর বলবর্দ্ধক না হইয়া বরং গলগ্রহস্বরূপ হইয়া পড়িল। এই জন্যই প্রত্যেক প্রাচীন রাজ্য প্রবল শত্রু-সৈন্যের অনিবার্য্য বেগ সহ্য করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া

পড়িয়াছিল। যে অল্পসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোকের হস্তে রাজ্যের শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত ছিল, তাঁহাদের পরাজয় ও ধ্বংসের সহিত সমস্ত রাজ্যই নির্ব্বিরোধে শত্রুহস্তে পতিত হইত। অসন্তুষ্টচিত্ত দাসেরা প্রজাদ্রোহী প্রভুদিগের জন্য শরীর ও প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে আর উদ্যত হইত না। বিশেষতঃ দাসদিগের ভূমি-সম্পত্তিতে কোন অধিকার না থাকায়, প্রাচীন রাজ্যের ধ্বংসে ও নবরাজ্যের অভ্যুত্থানে তাহাদিগের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না। তাহারা যে দাস সেই দাসই থাকিত। সুতরাং এই রূপ পরিবর্ত্তনে তাহাদিগের উন্নতি বা অবনতি কিছুরই সম্ভাবনা ছিল না। এই জন্যই শত্রু-হস্ত হইতে স্বদেশ-রক্ষণে তাহাদের এতাদৃশ ঔদাসীন্য উপলক্ষিত হইত। ইহাই অসংখ্যরাজ্যের পতনের এক মাত্র কারণ। খৃষ্টধর্ম্ম 'ঈশ্বরের নিকট সমস্ত মানব জাতিই এক—সমান' এই উদার মত প্রচার করিয়া অশুভকারিণী দাসত্ব-প্রথার মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পরিবারগণই সর্ব্বপ্রথমে স্ব স্ব দাসদিগকে শৃঙ্খলামুক্ত করেন। ইঁহাদের উদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া সামন্তেরা ও আপন আপন দাসদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং ইঁহাদেরই আশ্রয়ে স্বাধীন কৃষি ও বাণিজ্য প্রথম অঙ্কুরিত হয়। খৃষ্টধর্ম্ম যে কেবল সমস্ত মানবজাতির একতা প্রচার ও দুর্ব্বলকে বলবানের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে স্বাধীনতার বীজ বপন করিয়াছিল এরূপ নহে; কিন্তু তাহার অন্তরে চিরনির্ব্বাণ উৎসাহ উত্তেজিত করিয়া তাহাকে রাজকর্ম্মোপযোগিনী ও করিয়া তুলিয়াছিল। যে চীরধর কুটীরবাসী জীবনে কখন স্বাধীনতার অমৃতময় ফল আস্বাদন করে নাই, এবং যাহার মৃতপ্রায় অন্তর পূর্ব্বে কোন ঐহিক সুখেরই প্রত্যাশায় সঞ্চালিত হইত না, সেই চীরধর কুটীরবাসীর সেই মৃতপ্রায় অন্তরে এই নূতন ধর্ম্ম যেন নব জীবন প্রদান করিল। গ্রীসের অলৌকিকী স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং ম্যাসিডোনিয়ার অমানুষী রণদীক্ষা মানব-ঘটনা-স্রোতে কেবল ক্ষণিক বিবর্ত্তের উদ্ভাবনা করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু মহম্মদের ধর্ম্মোন্মাদে সমস্ত পৃথিবীতে যে ভীষণ ভূমিকম্প সমুত্থিত হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি প্রশমিত হইল নাই। সত্য—সামন্তেরা বীরদর্পে প্রণোদিত হইয়া অনেক সময় সমর-সাগরে অবতীর্ণ হইতেন; সত্য—তাঁহারা প্রবল পরাক্রমশালী নরপতিদিগের যথেচ্ছাচারিতায় উত্তেজিত হইয়া অনেক বার রণদীক্ষিত আশ্রিতদিগের সহিত সমরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতেন; কিন্তু প্রাচ্য ধর্ম্ম-সমরের ন্যায় অদ্ভুত রণোৎসাহ আর কখনই কোন পাশ্চাত্যদেশেই আবিষ্কৃত হয় নাই। এইরূপে ধর্ম্মোৎসাহের পরিবর্দ্ধনের সহিত প্রতীচ্য দেশ সকলে স্বাধীনতা ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল।

দ্বিতীয়তঃ—যৎকালে মানবজাতির মন এই নবীন ধর্ম্মোৎসাহে এখন ও আন্দোলিত ছিল, তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র প্রথমাবিষ্কৃত হইয়া এই ধর্ম্মোত্থিত নবীন স্বাধীনভাব সর্ব্বতঃ সঞ্চালিত ও বদ্ধমূল করিল। এই ধর্ম্মজ স্বাধীনভাব এখন আর একমাত্র আচার্য্যের বেদি হইতেই প্রচারিত বা কতিপয় শিষ্যবর্গের উপকারার্থ ধর্ম্মগুরু কর্ত্তৃক নির্জ্জন আশ্রমে সংরচিত হইতনা। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সেই নবীন স্বাধীন ভাব সর্ব্বতঃ প্রচারিত হইয়া মানবী চিন্তার আভরণস্বরূপ হইয়া উঠিল। বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়া, ও স্বাভাবিকী প্রতিভার মোহিনী মূর্ত্তি প্রত্যেক যুগে অতি অল্পসংখ্যক লোককেই মুগ্ধ করিতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মের অপূর্ব্ব রূপ মানবজাতির অগণ্য সংখ্যাকে ঝটিতি মোহিত করিয়া ফেলে। সুতরাং এই ধর্ম্মোৎসাহের সর্ব্বতোবিধূননদ্বারাই ইউরোপের স্বাধীনতা বদ্ধমূলা ও চিরস্থায়িনী হইয়াছে বলিতে হইবে। এই সর্ব্বশক্তিমতী আবিষ্ক্রিয়ায় সামাজিক সমস্ত নিয়ম পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইয়া উঠিল। জ্ঞানজ্যোতির সুলভ বিকিরণে ধনী ও দরিদ্রের গৃহ সমকালেই আলোকিত হইল। যে জীর্ণবসন শীর্ণকায় কুটীরী পূর্ব্বে কখন রোম ও গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম পাঠ বা শ্রবণ করে নাই, সেই কুটীরীর পর্ণশালায় এখন সুলভমূল্য হিরোডোটস্ ও ঝিনোফন্ এবং ট্যাসিটস ও লিভির ইতিবৃত্ত অনায়াসলভ্য হইয়া পড়িল। বিদ্যার স্বাধীন আলোচনায় অসংখ্য জনরাশির নির্ব্বাণোন্মুখী ধীশক্তি প্রধূমিত হইতে লাগিল। যে সাধারণী ধীশক্তি এতদিন চিরনিদ্রায় অভিভূত ছিল, তাহা এক্ষণে বিদ্যাপ্রভাবে প্রমার্জ্জিত হইয়া মানব-কার্য্যস্রোতের নির্দ্দেশক হইয়া উঠিল। যে চিরস্থায়িনী সৈন্য-সংস্থিতি দ্বারা ফ্রান্সরাজ চতুর্দ্দশ লুই সমস্ত সামন্তগণের অপ্রতিরথ পরাক্রম প্রতিহত করেন, জ্ঞানালোকে আলোকিত হওয়ায় সেই চিরস্থায়িনী সৈন্য-সংস্থিতিই ষোড়শ লুইয়ের পতনের প্রধান কারণ হইয়া উঠিল। রাজা ও প্রজার পরস্পর-সংগ্রামেপ্রজাদিগের সহিতই সৈনিক পুরুষদিগের সহানুভূতি দৃষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু জগতে অবিমিশ্রিত শুভ অতি বিরল। চির-কারারুদ্ধ ব্যক্তি কারামুক্ত হইয়া সহসা সূর্য্যালোকে নীত হইলে যেমন প্রতিহত-দর্শন হয়, এবং তদবস্থায় অগ্রসর হইলে যেমন বারম্বার স্খলিতপদ হয়, সেইরূপ জ্ঞানালোকের সহসা বিস্ফুরণে প্রজাপুঞ্জ অন্ধিত-দৃষ্টি ও কর্ত্তব্য মার্গে বারম্বার স্খলিতপদ হইতে লাগিল। অশুভ-স্রোতস্বিনী অতীবতীব্রবেগা, কিন্তু শুভ-স্রোতস্বিনীর বেগ অতি ধীর। প্রথমটী নিজ প্রবাহের সহিত উত্তরোত্তর স্ফীতাবয়বা হয় এবং অবশেষে ইহার জলোচ্ছ্বাসে তীরবর্ত্তী সমস্ত দেশকেই প্লাবিত করে। দ্বিতীয়টীর গতি ও যেমন মন্দ, ইহার বৃদ্ধি ও সেইরূপ অননুভবনীয়। ইহার

উদ্বেলতা কখনই দৃষ্ট হয় না। যে শুভ-করী বিদ্যা মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রজাপুঞ্জের মনে পবিত্র স্বাধীনভাব উত্তেজিত করিয়া দিয়াছিল, সেই শুভ-ফল-প্রসবিনী বিদ্যাই আবার মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে ফরাশি বিপ্লবকালে অসংখ্য অশুভ ফলের উৎপাদয়িত্রী হইয়াছিল। অবিশুদ্ধমতি দুরাচার স্বার্থপরেরা এই মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যেই সাধারন প্রজাদিগকে যুগপৎ রাজবিদ্রোহিণী ও আত্মদ্রোহিণী করিয়া তুলিয়াছিল। এবং এই মুদ্রাযন্ত্র-প্রভাবেই ফ্রান্সের অন্তর্বিপ্লবানল সমস্ত সভ্যজগতেই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়ার অব্যবহিত ফল যতই কেন ভীষণ হউক্ না, ইহার ভাবী ও চিরস্থায়ী পরিণাম অতীব হৃদয়-গ্রাহী। মুদ্রাযন্ত্র-প্রভাবে পরস্পর-সমরের ও ঘোরঘাতুকতার ভীষণ ভাবী পরিণাম হৃদয়ঙ্গম হওয়ায়, গ্রীসীয় শ্রেষ্ঠতন্ত্রিদিগের পরস্পর-সংগ্রাম ও এথীনীয় সাধারণতন্ত্রি-দিগের নৃশংস ঘাতুকতার অনুবর্ত্তন আর আধুনিক ইতিবৃত্তে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র-প্রভাবে সক্রেটিস ও প্লেটো প্রভৃতি গ্রীসীয় সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগের ধর্ম্ম-সূত্র এবং গ্রীসীয় প্রতিভার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সকল চিরকাল মানব জাতির বুদ্ধিবৃত্তি উন্নত করিবে সন্দেহ নাই। জ্ঞানজ্যোতিঃ নিম্নশ্রেণীতে বিকীর্ণ হওয়াতে অধুনা যে ভীষণ সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, সময়ে তাহা অবশ্যই বিলুপ্ত হইবে। এবং বিদ্যা-লোকের অমৃতময় ফল তখন সর্ব্বত্রই প্রতি-ফলিত হইবে। বিদ্যার এই নবীন সঞ্চালনে সমাজের যে সমস্ত ক্ষতি হইয়াছে, সে সমস্ত সংপূরিত হইয়া জগতের অবশ্যম্ভা-বিনী উন্নতির মূল অবশ্যই দৃঢ়বদ্ধ হইবে।

তৃতীয়তঃ—যদি ও নূতন ধর্ম্মের পবিত্রভাব দাসত্ব-প্রথার মূলে পরশুপাত করিয়াছিল; যদি ও মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া সাধারণ লোকদিগের মনোবৃত্তিকে সুমা-র্জ্জিত ও তেজস্বিনী করিয়াছিল; তথাপি এই সময়ে সংগ্রামের উপকরণ-সামগ্রীর অদ্ভুত পরিবর্ত্তন না হইলে সে সমস্তই বিফল হইত। যৎকালে সামন্তেরা গ্রাম্য প্রাসাদে বাস করিতেন, যৎকালে নগরের প্রলো-ভন-পরম্পরা তাঁহাদিগের বিলাস-প্রিয়-তাকে উন্মাদিনী করিতে পারে নাই, যৎকালে তাঁহারা আশৈশব যথারীতি রণবিদ্যায় দীক্ষিত হইতেন, এবং যৎকালে গ্রাম ও নগর বিলুণ্ঠনই তাঁহাদিগের অতুল বলশালিতার ও অসামান্য সমরচাতুরীর পরীক্ষা-স্বরূপ বিবেচিত হইত; তৎকালে নগরের প্রশান্ত অধিবাসী ও জনপদের অসভ্য শ্রমোপজীবী—এ উভয়ই তাঁহাদিগের ভয়ে কম্পিত-হৃদয় হইত। পার্ব্বতীয় জীবিকার দুর্লভতা যাহাদিগকে আশৈশব কষ্টসহ পদাতিক করিয়া তুলিয়াছিল—সেই অজেয় সুইস্ রাখালদল ব্যতীত এই দুর্জ্জয় সামন্ত-গণের বেগ সম্বরণ করিতে আর কেহই সমর্থ হয় নাই। সুইজরলণ্ড ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই নিম্নশ্রেণীর সমবেত সমুত্থান, লৌহকঞ্চুকাবৃত রণপণ্ডিত সামন্তদল দ্বারা মূলেই সংরুদ্ধ হইত। ফ্রান্সে সাধা-

রণ লোকদিগের, ইংলণ্ডে দ্বিতীয় রিচার্ডের সময়ে ওয়াট্ টাইলর ও তৎসহচর কৃষকদিগের, ফ্লাণ্ডার্স লিজ্ ও ঘেণ্ঠের নাগরিকদিগের, এবং জার্ম্মাণীর দাসদিগের, বিদ্রোহ জনপদবাসী বীরসামন্তদলের উৎকৃষ্টতর শস্ত্রনিচয় ও অধিকতর অধ্যবসায়দ্বারা অবিলম্বেই নিবারিত হইয়াছিল। কিন্তু বারুদচূর্ণকের আবিষ্ক্রিয়ায় এই অসন্দিগ্ধ উৎকর্ষ ক্রমেই বিনষ্ট হইল। কৃষকদিগের ভল্লাস্ত্র পূর্ব্বে সামন্তদিগের যে দুর্ভেদ্য লৌহকঞ্চুক ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, সেই দুর্ভেদ্য কঞ্চুক এক্ষণে বারুদপূর্ণ গোলকের ভীষণ অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। অকর্ম্মণ্য বোধ হওয়ায় দেহ-রক্ষক কঞ্চুক আর ব্যবহৃত হইল না। এবং রণক্ষেত্রে দুর্ভর কামানের আনয়ন তাঁহাদিগের নিতান্ত ক্লমসাধ্য হওয়ায়, কোমলাঙ্গ সম্ভ্রান্তজন-গণ আধুনিক সমরসাগরের একান্ত অপারদর্শী হইয়া উঠিলেন। পুরাকালে রিসিবিক্ সমরক্ষেত্রে যে দুর্ভেদ্য ফরাশি শেল ফ্লাণ্ডার্স-সম্ভ্রান্ত জনগণের বক্ষঃ ভেদ করিয়া ফ্রান্সের অতুল সমর-কীর্ত্তি জগতে চিরস্থায়িনী করিয়াছিল, সেই দুর্ভেদ্য শেল ফরাশিরাজ পঞ্চম চার্লসের রণে বেল্জিয়ম্ ও হলণ্ডের ভীষণ গোলক-বর্ষণে কুণ্ঠিতাগ্নি হইয়াছিল। ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় রিচার্ডের সামন্তেরা রাজবিদ্রোহী ওয়াট্ টাইলর ও তৎসহচরবর্গকে অনায়াসেই পরাস্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মার্ষ্টন মুর সমরে ইংলণ্ডীয় সাধারণ তন্ত্রি সৈন্যের ভীষণ অগ্নিস্রাব, রাজভক্ত নর্ম্মান্ সামন্তদিগের অজেয় সেনানিচয়কে সমূলে উন্মূলিত করিয়াছিল। অগ্নিবাণের ন্যায় সমীকর অস্ত্র জগতে আর নাই। মৃত্যুর করাল গ্রাসের ন্যায় ইহা কি সম্ভ্রান্ত সৈন্য, কি সাধারণ সৈন্য সকলকেই সমভাবে উদরস্থ করে। সমরের এই নবীন উপকরণ দ্রব্যের আবিষ্ক্রিয়ার সহিত অর্থ—সমরনির্ব্বাহের প্রধান উপকরণ হইয়া উঠিল। এবং এই অচিরধ্বংসশীল গোলক ও বারুদচূর্ণক প্রভৃতি সমরোপকরণের আশুক্ষয়িত্বনিবন্ধন, নব-নবোপকরণনির্ম্মাণার্থ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়—কৃতকার্য্যতালাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ হইয়া উঠিল। এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে সামাজিকী অবস্থা অতি অপূর্ব্ব নবীন ভাব ধারণ করিল। প্রতিদ্বন্দিনী সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ সেনার পরস্পরের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া উঠিল। শ্রমোপজীবী সাধারণ লোক নিজ পরিশ্রমদ্বারা আত্মরক্ষণোপযোগিনী সমরসামগ্রীর নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া আপনাদিগের অরক্ষণীয় ভাব ক্রমে দূরীকৃত করিল। এদিকে স্ববলের ক্রমিক ক্ষয়ে প্রজাদ্রোহিণী উচ্চশ্রেণী ক্রমেই ক্ষীণবল হইয়া পড়িল।

চতুর্থতঃ—শিল্পজনিত নব নব অভাব ও বিলাসপ্রিয়তার আবির্ভাব—ধ্বংসাবশেষ সামন্তিকী প্রভুতার পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিল। যৎকালে জীবনের সুখ-সৌকর্য্য অপেক্ষাকৃত অপরিজ্ঞাত ছিল, এবং যৎকালে সামন্তেরা স্ব স্ব ক্ষুদ্র রাজ্যে গ্রাম্য

প্রাচুর্য্যে মনের সুখে কাল যাপন করিতেন, তৎকালে তাঁহাদিগের সম্পত্তি নিজ নিজ সুখ সাধনে সমস্তই ব্যয়িত হইত না। আয় অধিক ব্যয় অল্প—সুতরাং তৎকালে তাঁহারা বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইতেন। এইরূপে সঞ্চিত বিপুল অর্থদ্বারা তাঁহারা অসংখ্য অনুযাত্রিকগণের ভরণ পোষণ করিতে পারিতেন। সুতরাং এই অনুযাত্রিকগণ প্রাণবিসর্জ্জনেও স্ব স্ব প্রভুর প্রভুতা সমর্থন করিত। কিন্তু কালক্রমে নগরীর প্রলোভন-পরম্পরা সম্ভ্রান্ত শ্রেণীকে নগরবাসিনী করিল; এবং বিলাসপ্রিয়তার অতিবর্দ্ধনের সহিত তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি পর্য্যবসিত হইতে লাগিল। সেই সময় হইতেই তাঁহাদিগের অপ্রতিদ্বন্দিনী প্রভুতার পতন হইল। যৎকালে সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীগণ নিজ নিজ বিলাসপ্রিয়তার চরিতার্থতাসাধনে সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং প্রজা-মণ্ডলীর রক্তশোষণ ব্যতীত অন্য কোন উপলক্ষে পিতৃপৈতামহিক-গ্রাম্য-প্রাসাদে গমনে বিরত হইলেন; তখন তাঁহাদিগের যুদ্ধোপযোগিনী সম্পত্তি, ও স্ব স্ব প্রজা-মণ্ডলীর উপর প্রভুতা, সমকালেই বিলুপ্ত হইল। পরস্পর-সাহায্যের বিনিময় ব্যতীত সখ্যবন্ধন কখন দৃঢ়মূল ও চিরস্থায়ি হইতে পারে না। স্নেহ ও ভক্তির আধার চিরদূরবর্ত্তী হইলে, স্নেহ ও ভক্তি কখন দীর্ঘ-কাল-স্থায়ি হয় না। কিন্তু বংশপরম্পরাগত প্রভুতার এমনই মোহিনী শক্তি, যে সামন্তগণ অন্তঃসার-শূন্য হইলেও বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নামমাত্রে প্রজারা কম্পিত-কলেবর হইত। এই পরিবর্ত্তন এরূপ অতর্কিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল যে ফরাশী বিপ্লবের পূর্ব্বে ইহা কেহই অনুভব করিতে পারেন নাই। সেই ভীষণ বিপ্লবকালেই এই অননুভূত-পূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের ফল প্রথম ফলিতে আরম্ভ হয়। অন্তঃক্ষীণমূলা পতনোন্মুখী উচ্চশ্রেণী এরূপ অবনতির সময়েও নিম্নশ্রেণীর নিকট ভীষণ ও ভয়াবহ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। নিম্নশ্রেণী বিপ্লবারম্ভকালে স্বপ্নেও মনে করে নাই, যে উচ্চশ্রেণীকে পরাজিত করিয়া ফ্রান্সে ও অন্যান্য সমস্ত সভ্য জগতে একদিন নিজ জয়-পতাকা উড্ডীন করিবে।

ক্রমশঃ।

আর্য্যবংশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বীরবর আলেক্‌জাণ্ডারের আগমনে ভারতের তমসাচ্ছন্ন পুরাবৃত্তে আলোক-সঞ্চার হইল। আমরা ভারতের যে কিছু পুরাবৃত্ত অবগত হই, তাহার অধিকাংশই গ্রীক পুরাবিদ্‌দিগের 'ভারত-সংবাদ' হইতে আহৃত। অধিক কি গ্রীকেরা সেই পুরাকালে ভারতে না আসিলে আমরা ভারতের পুরাবৃত্ত অতি অল্পই জানিতে পারিতাম। অ্যালেক্‌জাণ্ডারের আগমনের পূর্ব্বে ইউরোপীয়রা ভারতবর্ষের বিবরণ সবিশেষ অবগত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহারা টলেমি, এরিষ্টোবিউলাস, ষ্ট্রাবো, এরিয়ান্, হিকেটিয়স, টিসিয়াস, হিরোডোটস প্রভৃতির গ্রন্থে ও ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতবর্ষ-বিষয়ে যাহা কিছু অবগত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের ভারত-আগমন-ইচ্ছা অতিশয় বলবতী হইয়াছিল। তাঁহারা ভারতকে মণিমুক্তা-রত্নাদির আকর-স্বরূপ মনে করিতেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল, ভারতের মৃত্তিকায়—ভারতের ধূলিরাশিতে—সুবর্ণ-চূর্ণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের তেজস্বিনী কল্পনা কখন ভারতের তরুরাজিকে সুবর্ণময় ফলে সুশোভিত দেখিত, কখন ভারতের নির্ঝরিণী সকলকে অমৃতনিঃস্যন্দন করিতে দেখিত, কখন বা ভারতের গ্রাম নগরাদিতে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অদ্ভুত মানবী ছবি অবলোকন করিত। অধিক কি, ভারত তাঁহাদিগের নিকট ভূতলস্থ স্বর্গধাম বলিয়া প্রতীত হইত। কি রূপে ভারতে আসিবেন—কোন পথে ভারতে আসিবেন—এই চিন্তায় তাঁহারা সতত ব্যাকুল থাকিতেন। হায়! জননী ভারত-ভূমি হতভাগ্য সন্তানগণের সহিত বিদেশীয়-বিজেতৃ-হস্তে চির-দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবেন বলিয়াই বুঝি বিধাতা ইঁহাকে এত জগন্মোনোমোহিনী করিয়া রাখিয়াছেন। হায়! কুরুক্ষেত্ররণে অন্যোন্যবিমর্দ্দে যে দিন জননীর মহারথী সন্ততিগণ ধরাশায়ী হইলেন—যে দিন হইতে জননী অসহায়া ও অরক্ষণীয়া হইলেন—সেইদিনই জননীর মুকুটশোভি অমূল্য হিরকনিচয় এবং দেহোজ্জলকারি রজত কাঞ্চন মুক্তাদি কেন শূন্যে বিলীন না হইল! আহা! কেন সেই দিন হইতে জননী ভীষণ সাহারার রূপ ধারণ না করিলেন! তাহা হইলে ত তাঁহার ও তাঁহার সন্ততিগণের পরিণামে এত দুরবস্থা ঘটিত না!

আলেক্‌জাণ্ডার সিন্ধুতীরে উপনীত। তদীয় দিগ্বিজয়িনী সেনা অবিশ্রান্ত সমরে ক্লান্ত-কলেবর ও গৃহ-প্রতিগমনে নিতান্ত উৎসুক। আলেক্‌জাণ্ডার বিজ-

য়োম্মত্ত। হেলেস্পণ্ট হইতে সিন্ধুপর্য্যন্ত সমস্ত এসিয়া ও নীলস্রোতশোভিত মিসর তাঁহার পদানত—তথাপি তাঁহার দিগ্‌জিগীষা নির্ব্বাণ হইল না। ইচ্ছা—সমস্ত ভারত পরাজয়ের পর ব্রহ্মদেশ ও চীন পদতলস্থ করিয়া সমস্ত এসিয়ার অদ্বিতীয় ঈশ্বর হন। কিন্তু ভবিতব্যতা কে খণ্ডন করিবে? ভারত অ্যালেক্‌জাণ্ডারের করকরতলস্থ হইবে না,—তিনি এসিয়ার অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইবেন না,—এই জন্যই তাঁহার সেনাদল সমরবিজয়ে তদনুসরণে অসম্মত হইল। অ্যালেক্‌জাণ্ডার অগত্যা তাহাদিগের অনুবর্ত্তন করিলেন। ক্ষত্রিয়-কুল-তিলক পঞ্চনদেশ্বর পুরুই (Porus) কেবল তদীয় প্রতাপভরে অবনত হইলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়াপসদ নরাধম তক্ষশীল (Taxiles) স্বাধীনতার বিনিময়ে—ভারতের অতুল যশোরাশির বিনিময়ে—শান্তি ক্রয় করিলেন। এই হতভাগ্য নরপতি সমবেত হিন্দু সৈন্যের বিরুদ্ধে অ্যালেক্‌জাণ্ডারের সহিত যোগ না দিলে, জয়-লক্ষ্মী কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিতেন বলা যায় না। পুরু পরাজিত হইলেন বটে কিন্তু অ্যালেকজাণ্ডার পুরুর অসমসাহসিকতা ও অসাধারণ রণনিপুণতা সন্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে পুনঃ সংস্থাপন পূর্ব্বক সসৈন্য পারস্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ভারতের স্বাধীনতা-রত্ন কিছুকাল অস্পৃষ্ট রহিল।

গ্রীকেরা প্রায় তদাপরিজ্ঞাত সমস্ত জগৎ আলোড়িত করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের ন্যায় কোন জাতিই তাঁহাদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারেন নাই। অ্যালেক্‌জাণ্ডার গ্রাণিকস্, ইসস্, আর্বেলা প্রভৃতি অসংখ্য সমরে অসংখ্য জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন—ক্ষত্রবাজ পুরুকেও পরাজিত করিয়াছিলেন—কিন্তু এ পরাজয় ও পূর্ব্বপরাজয়ের অনেক প্রভেদ। পুরু পরাজিত হইয়াও আলেক্‌জাণ্ডারের সেনাদলের নিকট প্রজ্বলিত অনল-স্বরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। অ্যালেক্‌জাণ্ডারের সেনারা এই বিজয়ে এত দূর ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিল, যে এরূপ দ্বিতীয় বিজয়ে ধন প্রাণে সমাহিত হইবে মনে করিয়াছিল।

তাহারা ভাবিল যে—পুরু সমস্ত পঞ্চনদ বা পঞ্জাব প্রদেশের অধীশ্বর না হইয়াও (কারণ ষ্ট্রাবো ও এরিয়ান্ পুরুকে বিপাশা ও এসেসীনস্ নদীর মধ্যবর্ত্তি সঙ্কীর্ণ রাজ্যেরই অধীশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন) যখন সমরে দ্বিশত হস্তী, ত্রিশত রথ, চতুঃসহস্র অশ্ব এবং ত্রিংশসহস্র রণদীক্ষিত পদাতিক রূপ ভীষণ চতুরঙ্গ সেনার সমাবেশ করিতে পারিয়াছেন, তখন সমস্ত ভারত—ভারতের সমস্ত রাজবৃন্দ—একত্র সমবেত হইলে সমরের কি পরিণাম হইত কে বলিতে পারে? অ্যালেক্‌জাণ্ডারের বিজয়িনী সেনা এই চিন্তায় নিমগ্ন—এই ভাবী দর্শনে ভীত—সুতরাং গৃহ-প্রতিগমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আলেক্‌জাণ্ডার তৎপ্রতিবাধে অসমর্থ

ছিলেন ; সুতরাং তিনি অগত্যা তাহাদিগের অনুসরণ করিলেন।

গ্রীকেরা ভারতবর্ষ-বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, সে সমস্তই যে সত্যসম্বাদী এরূপ নহে। কিন্তু গ্রীকলিখিত ভারতবর্ষের বিবরণ ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের মূলভিত্তি বলিয়া ইহা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

প্রথমতঃ দেখা যাউক গ্রীকেরা কাহাদিগকে ইণ্ডীয় বা হিন্দু এবং কোন্ দেশকে ইণ্ডিকা বা ভারতবর্ষ নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সিন্ধুনদীর পূর্ব্ববর্ত্তী দেশের ন্যায় ইহার অপর তীর হইতে পশ্চিমে ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং উত্তর ও দক্ষিণে ক্রমান্বয়ে ককেসস্পর্ব্বত ও আরবসাগর দ্বারা সীমাবদ্ধ প্রদেশকেও গ্রীকেরা ইণ্ডিকা বা হিন্দুদিগের আবাস স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরবসাগরের তীরবর্ত্তী হিন্দু জাতিকে তাঁহারা অরতি ও আরাবতী নামে আখ্যাত করিয়াছেন। হিরোডোটসের ভূগোলে ইহাঁরা এসিয়াটিক ইথিয়োপিয়ান্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই প্রদেশে হিংগ্লেজ নামে সুবিখ্যাত হিন্দুদেবমন্দির অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহা যে এক সময়ে হিন্দুদিগের আবাস ছিল তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

হিরোডোটস্ আরও বলেন ককেসসের অব্যবহিত-দক্ষিণ-প্রদেশস্থ হিন্দুরাই পারস্যের অধীন ছিলেন। তাঁহার মতে সিন্ধুর অব্যবহিত পশ্চিম-তীর-বর্ত্তী ও আরবসাগরের উপকূলস্থ অন্যান্য সমস্ত হিন্দুজাতি তখনও পারস্যের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। হিরোডোটসের ভারতবর্ষবিষয়ক জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। ইহা সিন্ধুর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী মরুভূমি অতিক্রম করিয়া অধিকদূর যায় নাই। সুতরাং তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না।

এরিয়ান্ আলেক্জাণ্ডারের দিগ্বিজয় (Expeditio Alexandri) নামক তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'অ্যালেক্জাণ্ডার সিন্ধুনদী পার হইয়া হিন্দুদিগের রাজ্যে অবতীর্ণ হইলেন'। ইহার আর এক স্থলে তিনি ভারতবর্ষের পশ্চিমসীমা সিন্ধু নদী বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বিবরণ (Indica) নামক তদীয় গ্রন্থে তিনি তাঁহার এই মত সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন যে, যে দেশ সিন্ধুনদীর পূর্ব্বে অবস্থিত তাহাই ভারতবর্ষ এবং তাহার অধিবাসীরাই প্রকৃত হিন্দুপদের অভিবাচ্য।

ভারতবর্ষ-বিবরণ-বিচক্ষণ ষ্ট্রাবো ও ভারতবর্ষের পশ্চিমসীমা, হিমালয় হইতে আরবসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ, সিন্ধুনদীই নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং স্বমতের পরিপোষণ জন্য ইরাটস্থেনিসের (Eratosthemis) মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই গ্রীক লেখক-দিগের ভারতবর্ষবিষয়ক প্রস্তাব সকল ও প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থকারদিগের পুস্তক সকল আলোচনা করিয়া আমরা এইমাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যে পুরাকালে সিন্ধুর পশ্চিম উপ-

কূলেও সুবেণ (Sassani), গান্ধার (Candahar) প্রভৃতি রাজ্যে হিন্দু-দিগের বাস ছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা এত অল্প ছিল, যে তদধ্যুষিত প্রদেশকে কোনমতে হিন্দুস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। হিন্দুরা প্রধানতঃ সিন্ধুর পূর্ব্বতীরেই বাস করিতেন, এবং সিন্ধুর পশ্চিমের সমস্ত জাতিকেই সাধারণতঃ যবন * বা বিধর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা করিতেন, এইজন্যই সিন্ধুর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী দেশই প্রকৃতপ্রস্তাবে হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষ পদের অভিধেয়।

গ্রীকেরা কাহাদিগকে হিন্দু ও কোন্ দেশকে ইণ্ডিকা বা হিন্দুস্থান বলিতেন তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়া, হিন্দুদিগের জাতিভেদ, সমাজ-পদ্ধতি, ধর্ম্ম-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা কি লিখিয়াছেন তদ্বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটিত করা যাইতেছে। যৎকালে আলেক্‌জাণ্ডার বিতস্তা (Hydaspes) তীরে সমবেত সমস্ত ক্ষত্রিয় সৈন্যের সম্মুখীন হন, সেই পুরাকালেও আর্য্য জাতি প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এই চতুর্ব্বর্ণের পরস্পরের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম রূপ দুই প্রকার বৈবাহিকী প্রথা প্রচলিত থাকায় এক সঙ্করজাতি বা মিশ্র-শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। সুতরাং অ্যালেক্‌জাণ্ডারের আক্রমণ কালে হিন্দু সমাজ সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল বলিতে হইবে। কিন্তু গ্রীকেরা এই ভেদের সূক্ষ্মতা অনুধাবন করিতে না পারিয়া হিন্দুসমাজকে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

তাঁহাদিগের এই ভ্রমের প্রথম কারণ এই যে—তাঁহারা রাজমন্ত্রী ও রাজকরগ্রাহী কর্ম্মচারীগণকে এক স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া

* এই যবনশব্দ গ্রীক আয়োনিয়ান (Ionian) বা হিব্রু য়াবান্ (Yavan) শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে হিন্দুরা যবনশব্দ গ্রীকদিগের প্রতিই প্রথম প্রয়োগ করেন। ইহার আর একটী প্রমাণ এই যে পাণিনি-ব্যাকরণের এক স্থানে লিখিত আছে, 'যবনাঃ শয়ানা ভুঞ্জতে'। শয়ান অবস্থায় ভোজন করার প্রথা গ্রীকদিগের মধ্যেই প্রচলিত আছে। সুতরাং এস্থলে 'যবন' শব্দে গ্রীকজাতি বই অন্য কিছু বুঝাইতে পারে না। ইহার আরও একটী প্রমাণ এই যে সংস্কৃত গ্রন্থসকলে যবনেরা জ্যোতিঃ শাস্ত্র-বিশারদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন এবং জ্যোতিঃ-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় অনেক গুলি গ্রীক পারিভাষিক শব্দ সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং যবনশব্দে সংস্কৃতভাষায় সর্ব্বপ্রথমে গ্রীকজাতি বই অন্যজাতি বুঝাইত না স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। এই শব্দ পরে মালবিকাগ্নিমিত্র প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থে ও মগধরাজ অশোকের স্তম্ভনিচয়ের উপরিলেখনে সিন্ধুনদীর পশ্চিম-তীর-বর্ত্তী মুসলমানদিগের প্রতিই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে।

মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা যে—'সর্ব্বেষাস্তু বিশিষ্টেন ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতঃ। মন্ত্রয়েৎ পরমং মন্ত্রং রাজা ষাড়্গুণ্য-সংযুতং॥ এবং 'যদা স্বয়ং ন কুর্য্যাত্তু নৃপতিঃ কার্য্যদর্শনং। তদা নিযুজ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং কার্য্যদর্শনে'॥ ইত্যাদি বচন-পরম্পরা দ্বারা ব্রাহ্মণবর্ণ হইতেই মন্ত্রি-নির্ব্বাচনের আদেশ করিয়া রাজগণকে তৎপ্রতিপালনে বাধ্য করিয়াছিলেন, গ্রীকেরা তাহা জানিতে পারেন নাই। এই কর্ম্মচারীগণের বিশেষ গুণ দেখিয়া তাঁহারা ইহাঁদিগকে এক স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

তাঁহাদিগের এই ভ্রমের দ্বিতীয় কারণ এই যে—তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমের ব্রাহ্মণদিগকে বিভিন্ন বর্ণে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই তিন আশ্রমের ব্রাহ্মণদিগকে অনির্দ্দিষ্টরূপে কখন ব্রাহ্মণ (Brachmanes) কখন শর্ম্মন্ (Germanes) কখন বা সোফিষ্ট (Sophists) নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সেই আশ্রম ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ নহে—এক বর্ণেরই ভিন্ন ভিন্ন অবান্তর-ভেদ মাত্র।

তাঁহাদিগের এই ভ্রমের তৃতীয় কারণ এই যে—তাঁহারা বৈশ্যবর্ণকে ব্যবসায়-ভেদে রাখাল ও কৃষক এই দুই স্বতন্ত্র বর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন।

তাঁহাদিগের এই ভ্রমের চতুর্থ কারণ এই যে—তাঁহারা চর বা দূতদিগকে এক স্বতন্ত্র বর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা শূদ্রবর্ণের কোন উল্লেখই করেন নাই।

গ্রীকেরা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে সকলের পূজ্য শ্রেণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ব্রহ্মচারীরা সর্ব্ব প্রকার কর হইতে মুক্ত ছিলেন; রাজ্যের দৈবী ও মানুষী সর্ব্ব-প্রকার আপদ্ নিবারণের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করাই তাঁহাদিগের এক মাত্র কার্য্য ছিল; সর্ব্ব-প্রকার যাগ যজ্ঞেই তাঁহাদিগের সাহায্যের প্রয়োজন হইত; তাঁহারা নির্জ্জন গুরু-গৃহে কুশাসনে আসীন হইয়া ও মৃগ-চর্ম্ম পরিধান করিয়া সপ্তত্রিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত এক মনে ও ভক্তিভাবে গুরুর নিকট বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি অশেষ বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন; এবং অবশেষে পাঠসমাপনান্তে গৃহে প্রতিগমনপূর্ব্বক দার-পরিগ্রহ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতেন; তাঁহাদিগের মতে সুখ ও দুঃখ—জন্ম ও মৃত্যু বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করা এবং কোন বাহ্য পদার্থেরই অধীন না হওয়া, মনুষ্য-জীবনের প্রধান উৎকর্ষ। তাঁহারা ইহ জীবনকে ভাবি অনন্ত জীবনের শৈশব-মাত্র এবং মৃত্যুকে সেই অনন্ত জীবনের আরম্ভ মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন; সুতরাং তাঁহাদিগের যে কিছু চিন্তা, যে কিছু যত্ন সকলই সেই অনন্ত জীবনের জন্য ব্যয়িত হইত।

অ্যালেকজাণ্ডার এই ব্রহ্মচারী বা

সোফিষ্টদিগের সহিত কথোপকথন করিবার নিমিত্ত ওনেসিক্রাইটস্ (Onesicritus) নামক এক জন গ্রীক দার্শনিককে প্রেরণ করেন। তিনি নগরের প্রায় এক ক্রোশ দূরে পঞ্চদশ ব্যক্তিকে বস্ত্র-বিরহিত, এবং ইন্ধন-সম্ভূত ও সূর্য্য-কিরণ-জাত পঞ্চবিধ অগ্নি মধ্যে—কেহ দণ্ডায়মান,—কেহবা শয়ান,— কিন্তু সকলেই প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সমভাবে অবস্থিত,—দেখিতে পাইলেন।

সেই পঞ্চদশ তপস্বিগণের মধ্যে একজনের নাম কল্যাণ (Kalanas) ছিল। ওনেসিক্রেটস্ কল্যাণকে শিলাতলে উপবিষ্ট দেখিলেন, এবং তাঁহারই সহিত সর্ব্বপ্রথমে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। কল্যাণ ওনেসিক্রেটসের প্রতি সহেল উদাসীন ভাব ধারণ করিয়া তদীয় বৈদেশিক পরিচ্ছদের প্রতি সোপহাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এবং বলিলেন যদি আমার সহিত কথোপকথন করিবার মানস থাকে, তবে তোমার ঐ বৈদেশিক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ কর, এবং বিবস্ত্র হইয়া আমাদিগের সহিত এই অনাচ্ছাদিত শিলাতলে উপবেশন কর। ওনেসিক্রেটস্ ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময় সেই ঋষিগণের মধ্যে স্থবিরতম ও পবিত্রতম মন্দনিশ (Mandanis) নামক এক জন উপস্থিত হইয়া কল্যাণের সেইরূপ উদ্ধত ও কর্কশ ব্যবহারের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়া ওনেসিক্রেটস্‌কে সস্নেহ ভাবে বলিলেন, বৎস! যদি আমাদিগের পরস্পরের ভাষা পরস্পরের হৃদয়ঙ্গম হয় তাহা হইলে আমি তোমায় আর্য্যদিগের দর্শনে দীক্ষিত করিতে প্রস্তুত আছি। আলেকজাণ্ডার ওনেসিক্রেটসের মুখে মন্দনিশের এই উদার ব্যবহার শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে স্বদেশে লইয়া যাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না।

তিনি বলিলেন—আমার এই পার্থিব দেহের উপযোগি সমস্ত বস্তুই ভারতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, সুতরাং ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া আমার স্থানান্তরে গমন করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তাঁহার এই উত্তরে ভারতবাসী ও গ্রীক উভয়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কল্যাণ মন্দনিশের ন্যায় নিস্পৃহ ছিলেন না। সুতরাং তিনি অ্যালেক্‌জাণ্ডার-প্রদত্তপ্রলোভন-পরম্পরা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। সহচর-বৃন্দের তিরস্কারসকল অবহেলা করিয়া তিনি অ্যালেক্‌জাণ্ডারের অধীনতা স্বীকার করিলেন। গ্রীকেরা তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন বটে, কিন্তু তিনি অধিক দিন সে সম্মান উপভোগ করিতে পারেন নাই। পারস্যের অন্তর্গত পাসারগাদা (Pasargada) নগরে উপনীত হইয়াই তিনি সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তিনি জাতি-সংস্কার বশতঃ ঔষধি সেবনে অস্বীকৃত হইলেন। সুতরাং তাঁহার পীড়া ক্রমে অচিকিৎস্য

ভাব ধারণ করিল। তিনি চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অ্যালেক্‌জাণ্ডার তাঁহাকে এই মরণ-ব্যবসায় হইতে বিরত করিবার অশেষ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন অতি সমারোহে তাঁহার শেষ-কৃত্য সমাপন করিতে আদেশ দিলেন এবং তাঁহাকে বিবিধ মণি-মুক্তা-রত্নাদি দ্বারা পরিভূষিত করিলেন। কল্যাণ চিতাধিরোহণের পূর্ব্বে সেই সকল মহামূল্য উপহার দীন দুঃখী ও বন্ধুদিগকে সম্প্রদান করিলেন, এবং মস্তকে পুষ্পমালা পরিধান করিয়া সামগান করিতে করিতে ইন্ধন ও আগ্নেয় দ্রব্য নির্ম্মিত সেই ভীষণ চিতায় আরোহণ করিলেন এবং প্রশান্ত ও অবিচলিত ভাবে ইহা অগ্নি-সমুজ্জ্বলিত করিতে আদেশ দিলেন। গ্রীকেরা তাঁহার এই অদ্ভুত সহিষ্ণুতায় বিমোহিত হইয়াছিলেন।

ষ্ট্রাবো বলেন—এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বে গ্রীসের প্রধানতম নগর এথেন্সে এইরূপ আর একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া ছিল। মগধ-রাজ, —রোম-সম্রাট্ অগষ্টসের নিকট যে দূত প্রেরণ করেন, তাঁহারসহিত ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত এক জন বৌদ্ধ পুরোহিত গমন করেন। ইঁহাকে গ্রীকেরা শর্ম্মন্ চেয় [Sarman cheya] জর্ম্মণোচেগস্ [Zarmanochegus] প্রভৃতি নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সকল নিরর্থক শব্দ হইতে দুইটী সার্থক শব্দের অনুমান হইতে পারে—'শর্ম্মণাচার্য্য' বা 'শ্রমণাচার্য্য'। অধ্যাপক ভট্ট মোক্ষমূলর 'প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেতিহাস, নামক তদীয় গ্রন্থে শর্ম্মণাচার্য্যেরই অনুমান করিয়াছেন। যদি তাঁহার অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ ব্রাহ্মণেরা শর্ম্মন্ ও আচার্য্য এই উভয় উপাধিই ধারণ করিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা বিদেশ গমনে কখনই বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না এবং বৌদ্ধেরা সে বিষয়ে অতিশয় উৎসাহী ছিলেন ;—এই জন্য 'শ্রমণাচার্য্য' এই অনুমানটীই আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া প্রতীত হয়। কারণ "শ্রমণ" শব্দে বৌদ্ধ ও "আচার্য্য" শব্দে পুরোহিত বুঝায়। যাহাহউক আমরা উভয় অনুমানের সামঞ্জস্য সাধনের নিমিত্ত তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। ব্রাহ্মণ-কুলে জাত ব্যক্তি ধর্ম্মান্তর অবলম্বন করিলে ও তাঁহাকে শর্ম্মণাচার্য্য বলার কোন বাধা নাই। গ্রীকেরা 'শর্ম্মণাচার্য্য' বা 'শ্রমণাচার্য্য' পদে ব্যক্তি-বিশেষের নাম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা নাম নহে—উপাধি। এই শ্রমণাচার্য্য বা শর্ম্মণাচার্য্য এথেন্স নগরে উপনীত হইয়া অনির্দ্দিষ্ট কারণ বশতঃ স্বয়ং প্রজ্বলিত চিতায় আরোহণ করেন। এথিনীয়েরা এই অদ্ভুত ঘটনায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার স্মরণার্থ সেই চিতাভস্মের উপর একটী সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত

করেন এবং তাহাতে এই কয়েকটী পদ খোদিত করেন "Here lies the Indian Sarman Cheya from Barygaza, who sought immortality after the old custom of the Indians" এখানে 'শর্ম্মন্ চেয়' নামক একজন ভারতবাসী অবস্থিতি করিতেছেন। ইনি বারিগাজা * হইতে আসিয়া এই স্থানে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

* বর্ত্তমান বরোচ (Borouch) ইহা শালিবাহনের রাজধানী পত্তনের (Paithana) প্রায় ২৫০ মাইল দূরে অবস্থিত।

ক্রমশঃ।

বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন।

ভারতের অমূল্য-রত্ন-স্বরূপ এই দুই নরপতির জীবন এতদূর পরস্পর-সম্বদ্ধ যে একের জীবন-বৃত্ত বলিতে গেলে অপরের জীবনবৃত্ত না বলিয়া থাকা যায় না। 'শক' ও 'শকাব্দা' ইঁহাদিগের দুই জনের নাম ভারতবাসীর হৃদয়ে চির-অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। এই দুই নরপতির জীবন-বৃত্ত-সম্বন্ধে নানা-প্রকার পরস্পর-বিসম্বাদি মত প্রচলিত আছে। সেই মত-সমূহের মধ্য হইতে সত্য নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া অতীব কঠিন। বিক্রম-চরিত, দ্বাত্রিংশৎ- সিংহাসন, বেতালপঞ্চবিংশতি এবং বৃহৎ-কথা—এই চারি খানি মাত্র গ্রন্থে এই মহাত্মাদিগের জীবন-চরিত বিচ্ছিন্নভাবে সন্নিবেশিত আছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থদ্বয় শেষোক্ত গ্রন্থের অবচ্ছেদ মাত্র—স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে। এক জন মাত্র বিক্রমাদিত্য ছিলেন বলিয়া হিন্দুদিগের সাধারণ বিশ্বাস। কিন্তু পণ্ডিতেরা কেহ চারি জন, কেহ আট জন, কেহবা নয় জন বিক্রমাদিত্য ছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা চারিজন বিক্রমাদিত্য ছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে চতুর্থ বিক্রমাদিত্য লইয়া মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। প্রথম তিন জন বিক্রম-সম্বন্ধে উভয় দলেরই ঐকমত্য দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় দলেরই মতে—যাঁহার নামে শকাব্দা প্রচলিত তিনিই প্রথম বিক্রমাদিত্য, ভোজরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন (যাঁহার নামে শক প্রচলিত) তৃতীয় বিক্রমাদিত্য। চতুর্থ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে দুই মত। এক মতে—ভোজরাজের পুত্র, অন্য মতে—জয়চন্দ্র বা পৃথ্বীরাজ, চতুর্থ বিক্রমাদিত্য। এই পৃথ্বীরাজ ১১৯২ খৃঃ মুসলমানদিগের সহিত সমরে অদ্ভুত রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া রণ-স্থলে প্রাণ-বিসর্জ্জন করেন।

আমরা যখন শুদ্ধ বিক্রমাদিত্য শব্দ প্রয়োগ করিব—পাঠকবর্গ তখন ইহা

দ্বারা শকাব্দা-প্রবর্ত্তক প্রথম বিক্রমাদিত্যই বুঝিয়া লইবেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে বিক্রমাদিত্য দীর্ঘ জীবন ও অপ্রতিরথ প্রভুতা লাভের জন্য কপালাভরণা কালীদেবীর উপাসনা করেন। কালী দেবী বর প্রদানে বিলম্ব করায়, তিনি স্বহস্তে নিজমস্তকচ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। অমনি, কালীদেবী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং বলিলেন বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, আমি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিলাম, তুমি সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দী অধীশ্বর হইবে, কিন্তু সহস্র বৎসর অতীত হইলে এক তক্ষক-তনয় তোমাকে সিংহাসনে ও জীবনে বঞ্চিত করিবে। কালী এই বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। কালীর এই বরে বিক্রমাদিত্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত নির্ভয়ে ও নির্ব্বিরোধে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহস্র বর্ষ প্রায় অতীত হয় এমন সময় তিনি রাজ্য ও জীবনের জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এবং সেই তক্ষক-তনয়ের অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। অবশেষে তাহার সন্ধান পাইয়া অসংখ্য সৈন্য সামন্ত লইয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেই পঞ্চমবর্ষীয় তক্ষক শিশুর হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলেন।

এই তক্ষক-শিশুই আমাদিগের বর্ত্তমান প্রস্তাবের অন্যতর নায়ক। খ্রীষ্টের জন্ম-বৃত্তান্তের ন্যায় ইহারও জন্মবৃত্তান্ত নিগূঢ়-তমসাচ্ছন্ন। এরূপ প্রবাদ আছে যে—ইনি কোন কুম্ভকারের অপরিণত-বয়স্কা কুমারী দুহিতার গর্ভে এবং পন্নগরাজ তক্ষকের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। উক্ত কুম্ভকার দৌহিত্রের শৈশবেই অসাধারণ রণোৎসুক্য অবলোকন করিয়া তদীয় আনন্দ বর্দ্ধনের নিমিত্ত কতকগুলি মৃৎসৈন্য নির্ম্মিত করেন। তক্ষক-শিশু সেই মৃণ্ময় সৈন্য গুলি লইয়া শৈশবেই কৃত্রিম যুদ্ধে নিযুক্ত হইতেন। যৎকালে বিক্রমাদিত্য সসৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সমরে অবতীর্ণ হন, তৎকালে তদীয় পিতা পন্নগরাজ পুত্রকে একান্ত অসহায় দেখিয়া সেই মৃণ্ময় সৈন্য গুলিতে জীবন সন্নিবেশ করেন। তক্ষক-শিশু প্রাপ্ত-জীবন সেই মৃণ্ময় সৈন্যের সাহায্যে বিক্রমাদিত্যকে সমরে পরাজিত ও হত করেন।

খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ভবিষ্য পুরাণে (Apocryphal Gospel) খ্রীষ্টের শৈশব বর্ণন স্থলে, এই বিক্রমাদিত্যগণের বিষয়ে কোন কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদিগের জীবনবৃত্ত পারস্যের অন্তর্গত সুয়েণের রাজগণের জীবনবৃত্তের সহিত এতদূর সংশ্লিষ্ট যে এই উভয় জীবনবৃত্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা সুকঠিন। এরূপ প্রবাদ আছে যে—এক জন বিক্রমাদিত্য শতাধিক পঞ্চচত্ত্বারিংশৎ বৎসর উজ্জয়িনীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। সেই সমস্ত সময় তিনি রোমকদিগের সহিত সমরে নিবিষ্ট ছিলেন এবং সমরে পরাজিত করিয়া এক জন রোম-সম্রাট্‌কে বন্দী-স্বরূপ উজ্জয়িনীতে আনয়ন করেন।

সুষেণরাজ সপুরও (Shabour or Sopor) রোম-সম্রাট্ ভ্যালেরিয়ান্কে (Valerian) বন্দী স্বরূপ স্বনগরে আনয়ন করেন। এই জন্য অনেকে পূর্ব্বোক্ত বিক্রমাদিত্যের সহিত সুষেণরাজ সপুরের অভিন্নতা নিষ্পাদন করিয়া থাকেন।

সলমন্ (Solomon) রোম-সম্রাট্ ভ্যালিরিয়ানের, সুতরাং বিক্রমাদিত্যের ও সমর সমসাময়িক ছিলেন। বিক্রমাদিত্য সলমনের ন্যায় মন্ত্র বা ইন্দ্রজালে (Spell or talisman) সিদ্ধ ছিলেন এবং এই মন্ত্র-বলে তিনি পঞ্চভূত ও বেতালগণের উপর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা প্রকাশ করিতেন। ইহারা ক্রীত দাসের ন্যায় তাঁহার আদেশের অনুবর্ত্তী হইত। সলমনের ন্যায় বিক্রমাদিত্যের ও এক খানি ঐন্দ্রজালিক সিংহাসন ছিল। ইহা দ্বাত্রিংশৎ বেতাল দ্বারা সতত ধৃত থাকিত। ইহার বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, ইহা কোন অযোগ্য নরপতিকে আপনার উপর আরূঢ় হইতে দিত না। এই বেতাল গণের সাহায্যে বিক্রমাদিত্য সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর একেশ্বর হইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন-বৃত্ত।

বাল্য ও তৎকালিক শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মিল্ স্বয়ং বলিয়াছেন যে পিতৃদেব-লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসই তাঁহার সুশিক্ষার প্রধান উপকরণ হইয়াছিল। এই গ্রন্থ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারও রীতি নীতি সভ্যতা ও সমাজ-পদ্ধতি এবং ইংরাজদিগের ভারতবর্ষীয় শাসন-প্রণালী বিষয়ে এই গ্রন্থের উৎকৃষ্ট সমালোচন মিলের চিন্তা-শক্তিকে অনেক পরিমাণে উত্তেজিত করিয়াছিল। বাল্যকালেই ভারতবর্ষ-বিষয়ে দীক্ষিত হওয়ায় মিল্ পরিণত বয়সে ভারতবাসীদিগের পরমহিতৈষী বান্ধব হইয়া উঠিয়াছিলেন। জেম্স মিল্ এই গ্রন্থে ডাইরেক্টরদিগের শাসন-প্রণালীর উপর ভীষণ আক্রমণ করেন। সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট কখন কোন উপকারের প্রত্যাশা করেন নাই। তথাপি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় করেস্পনডেণ্ট বিভাগের সহকারী পরীক্ষকের পদ শূন্য হইলে—তিনি তৎ প্রার্থী হইয়া আবেদন করিলেন। ডিরেক্টরেরা ও তাঁহার এই আবেদন গ্রাহ্য করিয়া, এবং অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাকে পরীক্ষকের পদে উন্নীত করিয়া, আপনাদিগের উদারতা-গুণের পরিচয় প্রদান

করেন। এই দুই কার্য্যেই তিনি অসাধারণ মন্ত্রণা-পটুতা ও রচনা-চাতুরী প্রদর্শন করিয়া কর্ত্তৃবর্গের অতিশয় প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন।

জেম্‌স মিল্‌ তাঁহার সময়ের এই নূতন বিনিযোজনায়ও পুত্রের শিক্ষা-বিষয়ে বিন্দুমাত্র অমনোযোগী হন নাই। যে বৎসরে সহকারী পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত হন, সেই বৎসরেই তিনি পুত্রকে সমগ্র অর্থ-নীতি ও অর্থ-ব্যবহার শাস্ত্রে দীক্ষিত করেন। ইহার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু রিকার্ডো অর্থ-নীতি ও অর্থ-ব্যবহার বিষয়ে যে অপূর্ব্ব সুদীর্ঘ গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকটন করেন, সেই গ্রন্থের স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত লইয়া পিতা প্রতিদিন ভ্রমণ-কালে পুত্রকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। পুত্র এইরূপে সমগ্র অর্থনীতিও অর্থ-ব্যবহার শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবগত হইয়া, রিকার্ডোর বিস্তৃত গ্রন্থে অবতরণ করেন। রিকার্ডোর পুস্তক সমাপ্ত হইলে পিতৃদেব মিল্‌কে অ্যাডাম্‌ স্মিথ্‌ লিখিত অর্থ-নীতি ও অর্থ-ব্যবহার পাঠ করিতে আদেশ করেন। এই গ্রন্থ অধ্যয়ন কালে জেম্‌স মিল্‌ পুত্রকে রিকার্ডোর উৎকৃষ্টতর যুক্তির আলোক দ্বারা স্মিথের যুক্তিসকলের ভ্রমপ্রমাদ অবলোকন করিতে বলেন। পুত্র পিতার আদেশানুসারে সেই আলোক দ্বারা স্মিথের ভ্রমপ্রমাদ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তি ও চিন্তা-শক্তি অতিশয় পরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিল। শুদ্ধ পরের গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুদ্ধি-বৃত্তি ও চিন্তাশক্তি তেজস্বিনী হয় না। পরের গ্রন্থ পাঠ কর, ইহাকে স্বায়ত্ত কর, ইহার দোষ গুণ পর্য্যালোচনা কর, অন্য গ্রন্থের সহিত ইহার তুলনা কর এবং সেই সমস্ত মতের উপর নিজের সিদ্ধান্ত সংন্যস্ত কর,—তবেই দেখিবে তোমার চিন্তাশক্তি দিন দিন উপচীয়মান হইতেছে—তোমার বুদ্ধিবৃত্তি অধিকতর পরিমার্জ্জিত হইতেছে। কিন্তু এরূপ শিক্ষা বিধান করা এবং এরূপ শিক্ষা ধারণা করা, অতি অল্প লোকের সাধ্য। জেম্‌স মিলের ন্যায় গুরু অতি অল্প ছাত্রের অদৃষ্টে ঘটে। এবং জন্‌ ষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় ছাত্র ও অতি অল্প গুরুর ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। জেম্‌স পুত্রকে কখন কোন বিষয় অগ্রে বুঝাইয়া দিতেন না। অগ্রে তিনি পুত্রকেই সেই বিষয় বুঝিতে বলিতেন। পুত্র যখন কিছুতেই তাহা স্বয়ং বুঝিতে সক্ষম না হইতেন, তখনই তিনি পুত্রের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেন। এই রূপে মিল্‌ শৈশবেই চিন্তা-বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। এই বয়সেই পিতার সহিত তাঁহার মতান্তর উপস্থিত হইতে লাগিল। ঈষৎ পরিপক্ক বয়সে এই মতান্তর অনেক সময় পিতার পরাভবেই পরিণত হইত।

এইরূপে মিল্‌ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে উপনীত হইলেন। এই সময়েই তাঁহার পিতার নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হইল। এখন হইতে তিনি আর পিতার ছাত্র নন।

এখন হইতে আপনিই আপনার গুরু হইয়া উঠিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইল—এক্ষণে তিনি দেশ-ভ্রমণে নির্গত হইলেন। মিল্ পিতার অবিশ্রান্ত যত্নে ও নিজের অসাধারণ অধ্যবসায়বলে চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে গ্রীক, লাটিন ও ইংরাজি বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন। তিনি কখন বিদ্যালয়ে যান নাই—অথচ তিনি সেই বাল্যাবস্থাতেই ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। এই নবীন বয়সেই তিনি শিক্ষা-তরুর উচ্চ শাখায়ই আরোহণ করিলেন। এ বয়সে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সাধারণ্যে শিক্ষা-তরুর নিম্ন শাখায় বিচরণ করে। ইহার কারণ কি? বিদ্যালয়ে কি জেম্স মিলের ন্যায় সুপণ্ডিত শিক্ষক প্রবিষ্ট হন নাই? তাহা নহে—কারণ জেম্স মিল্ অপেক্ষা অধিকতর সুপণ্ডিত ব্যক্তিকেও বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার ভার লইতে দেখিতেছি। তবে কি জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় ধীশক্তি-সম্পন্ন ছাত্র আর জগতে জন্মে নাই? তাহাও নহে। কারণ নিউটন প্রভৃতি অসাধারণ-প্রতিভা-সম্পন্ন ছাত্রও বিদ্যালয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তবে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের কে মীমাংসা করিবেন? আমরা এবিষয়ের যাহা মীমাংসা করিয়াছি তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল:—

বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা হয়—অর্থাৎ ছাত্রগণের সাধারণ্যে যেরূপ বুদ্ধি ও ধারণা-শক্তি, যেরূপ যত্ন ও অধ্যবসায়—শিক্ষক তাহারই অনুরূপ শিক্ষা বিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা ছাত্র-বিশেষের উদ্দীপ্ত প্রতিভা ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের উপযোগিনী নহে। এই জন্য বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রকেও অধম ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিয়া অনেক সময় বৃথা অতিবাহিত করিতে হয়। সুতরাং সময়ে উত্তম ও অধম সকল ছাত্রই সাকল্যে এক সমান হইয়া যায়। এই জন্যই বিদ্যালয়োত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষ বৈষম্য উপলব্ধি হয় না। প্রদীপ্ত প্রতিভাও যথোচিত সংমার্জ্জনাভাবে ম্লান হয়, এবং সংরুদ্ধ প্রতিভা ও অবিশ্রান্ত ঘর্ষণে ঈষৎ বিস্ফুরিত হয়। এইরূপে বিদ্যালয়ে সাধারণ-শিক্ষায় অধম ছাত্রগণের বিশেষ উপকার ও উত্তম ছাত্রগণের বিশেষ অপকার হইয়া থাকে। এইরূপ সাধারণ শিক্ষা দ্বারা যদিও সাধারণ্যে জগতের মঙ্গল সাধিত হয়, প্রদীপ্ত-প্রতিভ ছাত্রগণের যে ইহা দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার আর একটী মহৎ অনিষ্ট এই যে এখানে চিন্তাশক্তির উদ্দীপনা অতি অল্পই হইয়া থাকে। ছাত্রেরা অল্প সময়ে অধিক শিখিলে শিক্ষকদিগের মুখ উজ্জ্বল হইবে বলিয়া শিক্ষকেরা অনেক বিষয় বলপূর্ব্বক ছাত্রদিগের গলধঃ করিয়া দেন। পরের গত, পরের মত, এবং পরবর্ণিত ঘটনাবলীর সমষ্টি—তাহাদিগের চিন্তা ও স্মরণ শক্তিকে উদ্দীপিত না করিয়া বরং নিষ্পেষিত করে। তাহারা নিজে কোন বিষয়

ভাবিতে শিখে না। পরের মস্তিষ্ক-নিঃসৃষ্ট চিন্তা দ্বারাই আপনাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দেয়। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর এই মহান্ দোষ অনেকেই উপলব্ধ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি কেহই তাহার প্রতিবিধানৌষধি নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন নাই। উৎকৃষ্ট শিক্ষকের নিকট গৃহে অধ্যয়ন করিলে, এই দোষের অনেক নিরাকরণ হয় বটে; কিন্তু সেরূপ সুবিধা অতি অল্প লোকের অদৃষ্টে ঘটে। যাহাহউক আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের অধিনায়ক মিলের অদৃষ্টে সেই সুবিধা ঘটিয়াছিল, এবং সেই জন্যই তিনি এত অল্প রয়সেই এত অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মিল্ বাল্য বয়সে পিতার নিকট নিজ শিক্ষা সম্বন্ধে স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত করিয়া অদ্য আমরা তাঁহার জীবনের "বালকাণ্ড" সমাপ্ত করিব।

"পিতা শৈশবেই আমার অন্তরে যে জ্ঞান-রাশি নিহিত করিয়াছিলেন, সে জ্ঞান-রাশি পরিণত বয়সেও অতি অল্প লোকে লাভ করিয়া থাকেন। এই ঘটনা এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিতেছে,—যে আমার মত সুবিধা পাইলে অন্যেও অনায়াসে আমার ন্যায় ফল লাভ করিতে পারেন। যদি আমার ধীশক্তি স্বভাবতঃ অতিশয় প্রখরা হইত, যদি আমার মেধা স্বভাবতঃ অতিশয় সূক্ষ্ম ও ধারণক্ষম হইত, এবং আমার প্রকৃতি স্বভাবতঃ কার্য্যদক্ষ ও উদ্যোগ-শীল হইত, তাহা হইলে এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এই সকল প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণে আমি জনসাধারণের নিম্নতলে বই কখন উচ্চতলে অবস্থিত ছিলাম না। সুতরাং যে বালক বা বালিকার ধারণা-শক্তি সাধারণ এবং শরীর সুস্থ, সেই যে—আমি যাহা করিয়াছি—তাহা করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদি আমা দ্বারা কোন অদ্ভুত বা অসামান্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে—তাহা আমার গুণে নহে—পিতৃদেবেরই গুণে। আমি যে আমার সমকালীন পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত তুলনায় জীবনপথের পঞ্চাধিক বিংশতি সোপানে অধিকতর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি, সে কেবল—পিতা যে অশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত আমার শিক্ষা বিধান করিয়াছিলেন—তাহারই ফল।

"শৈশবেই আমার অসাধারণ উৎকর্ষ লাভের আর একটী মহৎ কারণ নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এই নবীন বয়সে বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ বালক বালিকার অন্তরে স্তূপাকারে জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা তাহাদিগের ধারণাশক্তি তেজস্বিনী না হইয়া বরং ম্লান ভাব ধারণ করে। নিজের মত, ও নিজের চিন্তার পরিবর্ত্তে—পরের মত, ও পরের চিন্তা তাহাদিগের মনে বিরাজ করে। নিজের স্বাধীন মত সংস্থাপিত না করিয়া পরের মত লইয়াই তাহারা আত্ম-বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সৌভাগ্য-ক্রমে আমার বিষয়ে এরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটে নাই। যাহাতে শুদ্ধ স্মরণ-শক্তির সংমার্জ্জন হয়, পিতা

আমাকে কখনই এমন বিষয় শিখিতে দেন নাই। তিনি সকল বিষয়ই আমাকে অগ্রে বুঝিতে বলিতেন। যখন আমি স্বয়ং বুঝিতে একান্ত অক্ষম হইতাম, তখনই কেবল তিনি বুঝাইয়া দিতেন। যদি ও আমি অধিকাংশ সময়ই অকৃতকার্য্য হইতাম, তথাপি সবিশেষ চেষ্টা করায় আমার চিন্তা-শক্তি অচিরকাল মধ্যেই অতিশয় উদ্বোধিত হইয়া উঠিল।

"আত্ম-গরিমা বাল-পাণ্ডিত্যের ছুর্নিবার্য্য সহচর। ইহার সাহচর্য্যে অনেকের ভাবি উন্নতির আশা একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। পিতা আমাকে এই ভীষণ সহচরের হস্ত হইতে সতত রক্ষা করিতেন। অন্যের সহিত আত্মোৎকর্ষ-সূচক তুলনা বা আত্ম-প্রশংসাবাদ যাহাতে আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হয়, পিতা তদ্বিষয়ে সতত চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সহিত আমার যে কথোপকথন হইত, তাহা হইতে নিজের উপর কোন উচ্চ ভাব আমার মনে আসিতে পারিত না; বরং আপনাকে অতি নীচ বলিয়াই বোধ হইত। তিনি আমার সম্মুখে যেউৎকর্ষের আদর্শ ধারণ করিতেন, তাহা সাধারণ লোকের উৎকর্ষের আদর্শ নহে। যতদূর উৎকর্ষ লাভ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্তও যতদূর উৎকর্ষ লাভ মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা সেই উৎকর্ষেরই আদর্শ। সুতরাং আমি কখন জানিতে পারি নাই যে আমার বিদ্যা ও জ্ঞান বড় সাধারণ নহে। তিনি প্রায় আমাকে কোন বালকের সহিত মিশিতে দিতেন না। যদি ঘটনাক্রমে কোন বালকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত, এবং কথোপকথন দ্বারা তাহার বিদ্যা বুদ্ধি আমা অপেক্ষা অনেক ন্যূন বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিত, তাহা হইলেও কখন আমার মনে হইত না, যে আমার জ্ঞান ও বিদ্যা অসাধারণ। কেবল এই মাত্র বোধ হইত যে কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক বশতঃই কেবল সে রীতিমত শিক্ষা পায় নাই। আমার মনের অবস্থা কখন বিনীত ছিল না বটে, কিন্তু ইহা কখন উদ্ধত ও ছিল না। আমি কখন চিন্তাতেও আপন মনে বলি নাই যে আমি এত বড় লোক বা আমি এত মহৎ মহৎ কার্য্য সংসাধন করিতে পারি। আমি আপনাকে কখন উচ্চ বলিয়া ভাবি নাই, কখন নীচ বলিয়াও ভাবি নাই—অধিক কি আমি আপনার বিষয় কিছুই ভাবি নাই বলিলেও হয়। আমি যদি কখন আপনার বিষয় কিছু ভাবিয়া থাকি সে এই মাত্র—যে আমি পাঠনা দ্বারা কখন পিতার সন্তোষ জন্মাইতে পারিলাম না—সুতরাং আমি পড়া শুনায় আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিতে পারি না। আমার মনের ভাব আমি অবিকল ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু যাঁহারা আমায় শৈশবে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের আমার প্রতি বিশ্বাস অন্য রূপ। আমার প্রতি তাঁহাদিগের এই বিশ্বাস যে আমার আত্ম-গরিমা—অতিশয় ও অসহ্য। বোধ হয় আমি শৈশব হইতেই অত্যন্ত তার্কিক ছিলাম এবং

আমার নিকট অযৌক্তিক কথা বলিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতাম—এই জন্যই আমার প্রতি তাঁহাদিগের এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। পিতা ও তাঁহার সমবয়স্ক ব্যক্তিগণ আমার শৈশবেও অনেক গুরুতর বিষয়ে আমার সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেন। এই জন্যই আমার এরূপ কু-অভ্যাস জন্মিয়াছিল। এবং এই জন্যই আমি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সহিত সম্মান রাখিয়া কথোপকথন করিতে শিখি নাই। দুঃখের বিষয় পিতা আমার এই কু অভ্যাস ও দুর্ব্বিনীততার সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন নাই। বোধ হয় তিনি ইহা অবগত ছিলেন না। কারণ আমি তাঁহাকে অতিশয় ভয় করিতাম, এই জন্য তাঁহার সম্মুখে অতিশয় শান্ত ও বিনীত ভাব ধারণ করিতাম। সুতরাং তিনি আমার অনধিকার-চর্চ্চা ও দুর্বিনীততার বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেন না। যাহাহউক যদিও আমি বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সহিত অবালার্হ বাক্-বিতণ্ডায় প্রশ্রয়ান্বিত হইয়াছিলাম, তথাপি আমার শুভাদৃষ্ট-বশতঃ আত্মোৎকর্ষ বিষয়ক জ্ঞান কখনই আমার আত্মাকে অধিকার করিতে পারে নাই। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে, দেশ-ভ্রমণার্থ দীর্ঘ কালের জন্য পিতৃ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যাকালে হাইড্ পার্ক উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে পিতা, আমায় যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে অদ্যাপি গ্রথিত রহিয়াছে। তিনি বলিলেন,—'তুমি দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া অনেক নূতন দেশ ও অনেক নূতন জাতি অবলোকন করিবে। দেখিবে—সেই সেই দেশের ও সেই সেই জাতির, তোমার সমবয়স্ক যুবকেরা জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে তোমা অপেক্ষা অনেক হীন। সুতরাং অনেকেই তোমার এই অসাধারণ উৎকর্ষের বিষয় তোমার কর্ণগোচর করিবে এবং তোমার অতিশয় প্রশংসাবাদ করিবে। দেখিও যেন সেই সকল কথায় ও সেই সকল প্রশংসাবাদে তোমার হৃদয় আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ না হয়। সেই সেই সময় তোমার যেন মনে হয়—তুমি যে তোমার সমবয়স্ক যুবকবৃন্দ অপেক্ষা বিদ্যা ও জ্ঞানে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়াছ, তাহা তোমার গুণে নহে—যে অসাধারণ অনুকূল ঘটনাবলী সৌভাগ্য লক্ষীর ন্যায় সতত তোমার অনুবর্ত্তন করিয়াছে তাহারই গুণে তুমি যে সৌভাগ্য-বলে—স্বয়ং তোমার শিক্ষা বিধানে সমর্থ এবং তজ্জন্য যথোচিত পরিশ্রম ও সময় ব্যয়ে সমুৎসুক—এরূপ পিতা প্রাপ্ত হইয়াছ ইহা সেই সৌভাগ্যেরই ফল।' এরূপ অনুকূল ঘটনাবলীর সাহায্যে তুমি যে এতাদৃশী কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছ ইহাতে তোমার বিশেষ গৌরব নাই। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলে, বিশেষ লজ্জার বিষয় হইত বটে!' এই বাক্য গুলি আমার কর্ণে অদ্যাপি যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পিতার এই উপদেশপূর্ণ বাক্যই আমায় সর্ব্ব প্রথমে প্রতীত করে যে—আমার সমবয়স্ক যে সকল

ছাত্র অতিশয় সুশিক্ষিত বলিয়া খ্যাত, আমার বিদ্যা ও জ্ঞান তাঁহাদিগের বিদ্যা ও জ্ঞান অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু এই বোধ আমার অন্তরে কোন প্রকার আত্মাভিমান জন্মাইয়া দিল না। যত বারই এই বিষয় আমার মনে উদিত হইত, ততবারই আমার অন্তরে পিতার সেই বাক্য গুলি প্রতিধ্বনিত হইত এবং অমনি যেন পিতৃদেব বলিয়া উঠিতেন—'তুমি যে তোমার সমবয়স্ক যুবক-বৃন্দ অপেক্ষা বিদ্যা ও জ্ঞানে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়াছ, তাহা তোমার গুণে নহে—যে অসাধারণ অনুকূল ঘটনাবলী সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর ন্যায় সতত তোমার অনুবর্ত্তন করিয়াছে তাঁহারই গুণে। তুমি যে সৌভাগ্য-বলে— স্বয়ং তোমার শিক্ষা বিধানে সমর্থ এবং তজ্জন্য যথোচিত পরিশ্রম ও সময় ব্যয়েসমুৎসুক—এরূপ পিতা প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহা সেই সৌভাগ্যেরই ফল। এরূপ অনুকূল ঘটনাবলীর সাহায্যে তুমি যে এতাদৃশী কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছ ইহাতে তোমার বিশেষ গৌরব নাই। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলে বিশেষ লজ্জার বিষয় হইত বটে'।

"পিতা আমায় অত্যুৎকৃষ্ট শিক্ষা-বিধান করিবেন বলিয়া যে মনোরথ করিয়াছিলেন, অন্য-বালকবৃন্দের সংসর্গ হইতে আমায় সতত বিচ্ছিন্ন না রাখিলে, তাঁহার সেই মনোরথ কখনই পূর্ণ হইত না। বিদ্যালয়ের বালকেরা পরস্পরের বাহ্য চরিত্রের উপর যে বিষময় প্রভাব প্রকাশ করে, তিনি যে আমায় শুদ্ধ সেই প্রভাব হইতেই অন্তর রাখিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন এরূপ নহে; তাহাদিগের ইতর চিন্তা ও জঘন্য হৃদয়-ভাবের সংক্রামণে যাহাতে আমার আভ্যন্তরীণ চরিত্র কলুষিত না হয়, তজ্জন্যও তিনি সতত চেষ্টিত থাকিতেন। অধিক কি এই ভয়ে তিনি আমায়—অন্যান্য বালকেরা সাধারণতঃ যে সকল বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করে—সে সকল বিষয়ে ও উৎকর্ষ লাভ করিতে দিতেন না। আমার শিক্ষার প্রধান অভাব এই যে—আমি অনেক বিষয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ন্যায় আত্মনির্ভর-ক্ষম হইতে পারিতাম না। পরিমিতাচরণ ও প্রতিদিন ভ্রমণ দ্বারা আমি সুস্থশরীর ও কষ্টসহ হইয়া উঠিলাম বটে—কিন্তু কখনই আমার শরীরের স্নায়বীয় পরিণতি হইল না। সুতরাং আমি বলবীর্য্যসূচক বীরত্ব প্রদর্শন করিতে কখনই সমর্থ হই নাই। অধিক কি আমি সামান্য সামান্য ব্যায়াম-বিষয়েও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম। পিতা আমায় প্রতিদিন ক্রীড়া করিতে অবকাশ দিতেন বটে—কিন্তু পাছে আলস্য অভ্যাসগত হইয়া আমাকে পরিশ্রম-বিমুখ করিয়া ফেলে, এই জন্য তিনি আমাকে কখনই পূর্ণ অবকাশ দিতেন না। যাহাহউক আমি যে পরিমাণ অবকাশ পাইতাম, তাহাতেই ব্যায়াম ও ক্রীড়াদ্বারা শরীরের দৃঢ়তাসম্পাদন করিতে পারিতাম; কিন্তু

আমার এক জনও বালসহচর না থাকায় এবং শারীরিক পরিশ্রমের স্পৃহা দৈনন্দিন ভ্রমণ দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়ায়, সে সকল করিতে আমার ইচ্ছা হইত না। কিন্তু আমি যে, কোন প্রকারই আমোদপ্রমোদে, কোন প্রকারই ক্রীড়াতে লিপ্ত হইতাম না এরূপ নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সকলপ্রকার আমোদপ্রমোদ ও সকলপ্রকার ক্রীড়াই অতি শান্ত ও নিভৃত ছিল। এই জন্যই আমি স্বভাবতঃ শারীরিক-পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্যে একান্ত অপটু হইয়া পড়িলাম। যে সকল অবশ্য-কর্ত্তব্য গৃহকার্য্য সংসাধনে হস্তপদাদি শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালনের আবশ্যকতা; সে সকল গৃহকার্য্যে আমি অতি বিকলের ন্যায় হইয়া পড়িতাম। এই জন্যই আমি অনবধান, অদূরদর্শী এবং গৃহকার্য্যে শিথিল-যত্ন বলিয়া পিতার নিকট সতত তিরস্কৃত হইতাম। তিনি এই সকল বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। সকল সময়েই তাঁহার শরীর ও মন সমবেত হইয়া কার্য্য করিত। দৃঢ়তা এবং তেজস্বিতা তাঁহার সকল কার্য্যেই প্রতিভাত হইত। যিনি তাঁহার সহিত একবার কথোপকথন করিতেন, যিনি তাঁহার তেজঃপূর্ণ ও প্রতিভাসম্পন্ন মুখশ্রী একবার অবলোকন করিতেন তিনি তাঁহাকে কখনই ভুলিতে পারিতেন না। কিন্তু বীর্য্যবান্ ও তেজস্বী লোকদিগের সন্ততি যে নির্বীর্য্য ও নিস্তেজ হয়, তাহার কারণ এই যে—তাঁহাদিগের সন্ততিগণ সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করে এবং তাঁহারাও স্ব স্ব বীর্য্যবত্তাকে তাহাদিগেরই আলস্য-পরিপোষণে পর্য্যবসিত করেন। পিতা আমায় যে শিক্ষা প্রদান করেন—তাহার উদ্দেশ্য শুদ্ধ জ্ঞান—কর্ম্ম নহে। তিনি যে আমার শিক্ষার এই অঙ্গহীনতার বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না এরূপ নহে। কারণ তিনি এই অঙ্গহীনতার জন্য সতত আমার তিরস্কার করিতেন। তিনি যে এরূপ অঙ্গহীনতার অনুমোদন করিতেন তাহাও নহে। কারণ এজন্য তিনি সর্ব্বদা অনুশোচনা করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এই অঙ্গহীনতার বিষয় সম্পূর্ণ অবগত হইয়াও ইহার নিরাকরণের জন্য কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই। তিনি আমায় বিদ্যালয়-জীবনের দুর্নীতিকর পরিণাম হইতে মুক্ত করিয়া আমার ভাবী উন্নতির মূল রোপিত করেন বটে, কিন্তু যাহাতে কার্য্যদক্ষ ও কর্ম্মের নায়ক হই তাহার জন্য কোন উপায়ই অবলম্বন করেন নাই। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দেন। পিতা আশা করিয়াছিলেন যে বিনা শিক্ষায় আপনা হইতেই আমার এই সকল বিষয়ে পটুতা জন্মিবে। কিন্তু তাঁহার এরূপ আশা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক। সুতরাং ইহা কখনই ফলবতী হয় নাই। এই বিষয়ে এবং আমার শিক্ষা সম্বন্ধে আর কয়েক বিষয়ে পিতৃদেব কারণের অভাবেও কার্য্যের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি ভগ্নাশ হইয়া পরিশেষে অকারণ মনস্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

স্থির-সৌদামিনী।

লিখিব লিখিব হতেছে বাসনা,
কি লিখি কি লিখি ভাবিয়া চাই,
শোভিছে প্রকৃতি ধূষর বরণা,
বরিষার জলে দেখিতে পাই।
বরিষার জলে দেখিতে পাই।
(এই শৃঙ্গ হতে) পূর্ণ স্রোতস্বতী।
করিয়া যেমন যৌবন বড়াই
সাগর সদনে চলেছে যুবতী।

২

যুবতীযৌবন যায় গড়াইয়া,
যায় যার যায় থাকে না আর;
উন্মত্ত-জলধি আকুল হইয়া
আলিঙ্গনসুখ পাইতে প্রিয়ার
সহস্র তরঙ্গে করিছে বিস্তার
সহস্রেক কর; করিতে বর্দ্ধন
সংমিলনসুখ, প্রকৃতি আবার,
করিতেছে বৃষ্টি সুধা বরিষণ

৩

শুনিছে পবন; সর সর সর
ঝরে বরিষার ধারা অবিরল;
এই শৃঙ্গ হতে, কত মনোহর
সেই সুমধুর সঙ্গীত তরল।
নদী, সরোবর, নির্ঝর, ভূতল,
বরিষার জলে প্লাবিতপ্রায়;
পর্ব্বত, পাদপ, প্রাচীর সকল
সলিলে বেষ্টিত চিত্রিত দেখায়।

এই চারু ছবি হইল বাসনা,
চিত্রিয়া রাখিতে কবিতা মন্দিরে;
কিন্তু এই চিত্রে কি কাজ বলনা,
কত শত ছবি আছে সে প্রাচীরে?
অথবা কেমনে—ওই ধীরে ধীরে
নাচে যে হিল্লোল জলের উপরে,
ঐ যে বিশ্বশোভা কাঁপিছে সমীরে
চিত্রিবে সহজে মর চিত্র করে?

৫

ভাল বটে কিন্তু মনে নাহি লয়,
লইতে সাহায্য প্রিয় কল্পনার;
(আজি কালি তিনি সর্ব্বভূতময়!
মধুর ভাণ্ডার বসতি যাহার,
ভ্রমে এবে হায়! দুরদৃষ্টতার!
বাজারে বাজারে, বঙ্গ ক্ষেতে ক্ষেতে!
নিত্য মুদ্রাযন্ত্র, পীড়নে তাহার
অঙ্গ ভঙ্গি দেখি, মরি খেদেতে।

৬

হেন কল্পনায় কাজ নাহি আর,
স্বভাবে স্বভাব চিত্রিব আজি;
আবার জগত হইল আঁধার,
ভাসিল আকাশে জলদরাজি।
ধন্যরে প্রকৃতি তব ছায়া বাজি!
গম্ভীর গর্জ্জনে গর্জ্জে কাদম্বিনী;
শোভে ক্ষণে ক্ষণে গগনে বিরাজি,
জলধর কোলে চল সৌদামিনী।

৭

জলধর কোলে চল সৌদামিনী,
ক্ষণেকে দেখায় ক্ষণেকে লুকায়,
ক্ষণে ক্ষণে পুনঃ জলধর ধ্বনি,
ঘর্ঘর গর্জ্জনে পৃথিবী কাঁপায়।
দেখিয়া হলেম মগ্ন ভাবনায়!
ভয়ঙ্কর রূপ! শব্দে কান কালা।
বজ্রে বাঁধা বুক! শরীর শিলায়,
তার কোলে এই রূপসী বালা?

৮

না জানি কি ভাবি মূঢ় কবিগণ,
এই দৃশ্য দেখি আহ্লাদে ভাসে;
দাম্পত্যপ্রণয় ভাবে মনে মন,
দেখি সৌদামিনী জলধর গ্রাসে।
বলে শোভে প্যারী শ্রীকৃষ্ণের পাশে,
যেমন মেঘের কোলে সৌদামিনী—;
প্রণয়ে জগত মরিবে হুতাশে,
প্রেমাদর্শ যদি মেঘ-সৌদামিনী।

৯

চমৎকার প্রেম! ভয়ঙ্কর রব!
প্রেমালাপ বুঝি মেঘের গর্জ্জন?
নাগরের রূপে আঁধার নগর!
প্রেম আলিঙ্গন, অশনিপতন?
সৌদামিনী প্রেমে হইয়া মগন,
প্রাণভয়ে বুঝি ছুটিয়া পালায়?
প্রেম-মুগ্ধ মেঘ, কৃতান্ত যেমন,
ঘন ভীম রোলে পশ্চাতে ধায়?

১০

কেমন নিষ্ঠুর বিধাতার বিধি,
দুর্ভেদ্য, দুর্জ্ঞেয়, বুঝা নাহি যায়;
এমন অতুল রূপের নিধি—,
কেমনে সঁপিছে বজ্রের শিখায়?
বিকচ গোলাপ অনল জ্বালায়,
শরতের শশী রাহুর গ্রাসে,
দুর্ল্লভ রতন কাকের গলায়,
দেখে কার চক্ষে জল না আসে?

১১

এতোধিক আরো নিষ্ঠুর নির্দ্দয়,
বিধাতার বিধি দেখিতে কি চাহ?
আন তুলি রঙ, আন সমুদয়,
দেখাইব চিত্র শোকের আবহ।
জাননা মানব জীবন প্রবাহ;
দুঃখেতে মলিন বরণ তার,
বারেক ভিতরে পশিয়া চাহ,
কত শত রন্ধ্র কীটের আধার।

১২

চিত্র আগে এক রূপসী বালা,
রূপের আকর গুণের গরিমা;
সহি মনে মনে নিরাশার জ্বালা,
বিনোদ বদনে পড়েছে কালিমা;
নব দুর্গা জিনি প্রেমের প্রতিমা,
নিরাশা-ব্যঞ্জক যুগল নয়ন,
কিন্তু হায়! সেই নয়ন নীলিমা,
স্নেহে সিক্ত সদা—কোমল দর্শন!

১৩

লয়ে এই ছবি যাও বঙ্গালয়ে,—
নিরানন্দ বাস!—বিষাদের মণি!
ভ্রমি গৃহে গৃহে বল সহৃদয়ে,—
কত গৃহে হেন রমণীর মণি,
অপাত্র অম্বুদে, অপ্রেম অশনি
সহিতেছে হায়! দিবস যামিনী—
অচল হৃদয়ে! শোভিতেছে ধনী
জলধর-কোলে স্থির সৌদামিনী!

——

শ্রীনঃ

সৌর জগৎ।

আমরা পৃথিবীতে বাস করিয়া থাকি। পৃথিবী যে জগতের অন্তর্গত তাহার নাম সৌর জগৎ। সুতরাং আমরা সৌর জগতের অধিবাসী। সূর্য্য কেন্দ্র অর্থাৎ বৃত্তের মধ্যবিন্দু বলিয়া ইহার সৌরজগৎ এই নাম হইয়াছে। কতকগুলি প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ক পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া নিয়ত মণ্ডলাকার পথে প্রচণ্ডবেগে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহাদিগেরই সাধারণ নাম সৌরজগৎ। সূর্য্য এই জগতের কেন্দ্র। অর্থাৎ সেই মণ্ডলাকার পথের ঠিক মধ্যবর্ত্তী। সৌরজগতে সূর্য্য এবং গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ও উল্‌কাপিণ্ড নামে কতকগুলি জ্যোতিষ্ক আছে, গ্রহাদি নিয়ত মণ্ডলাকার পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্য ইহাদিগের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকিয়া ইহাদিগের সকলকে আলোক ও উত্তাপ বিতরণ করিতেছে। সূর্য্য সমুদয় গ্রহ, উপগ্রহাদি অপেক্ষা আয়তনে অনেক বৃহৎ বলিয়া ইহার আকর্ষণ শক্তি ও অদ্ভুত। ফলতঃ ইহারই আকর্ষণবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রহ উপগ্রহাদি সমগ্র সৌরজগৎ সুনিয়মে রক্ষিত হইতেছে। যে সকল জ্যোতিষ্ক নিজে তেজোময় নহে, কেবল সূর্য্যের তেজ প্রাপ্ত হইয়া তেজোময় ও আলোকবিশিষ্ট হয়, এবং যাহারা নিয়ত মণ্ডলাকার পথে সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে গ্রহ কহে। যে সকল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক উপরিনির্দ্দিষ্ট গ্রহগণের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে এবং এইরূপে পরিভ্রমণ করিতে করিতে উহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যমণ্ডলকেও প্রদক্ষিণ করে, তাহাদিগের নাম উপগ্রহ বা পারিপার্শ্বিক। গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র ব্যতীত আর একপ্রকার জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ রাত্রিকালে সময়ে সময়ে আকাশমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহারা গোলাকার, ও ইহাদিগের একটী বা ততোধিক পুচ্ছ দৃষ্ট হয়। ঐ পুচ্ছ আলোকময়, স্বচ্ছ, ও আকারে গৃহমার্জ্জনী অর্থাৎ ঝাঁটার সদৃশ। ইহাদিগকে ধূমকেতু বলে। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য উল্‌কাপিণ্ড নিয়ত সূর্য্যের ও অন্যান্য গ্রহাদির চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহারা গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহস্বরূপ। বোধ হয় কোন গ্রহের ভগ্নাবশেষ হইবে। অগ্নিময় ও উজ্জ্বল পিণ্ড বলিয়া ইহাদিগের নাম উল্‌কাপিণ্ড, উল্‌কাপিণ্ড সকল সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যখন যে গ্রহের নিকটবর্ত্তী হয়, তখনই তাহার প্রবলতর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নিজ কক্ষচ্যুত হইয়া পতিত হইয়া যায়। এই কারণেই আমরা মধ্যে মধ্যে উল্‌কাপাত দেখিতে পাই। ইহাকেই লোকে নক্ষত্রপাত ও অগ্নিবৃষ্টি বলিয়া থাকে। আমাদের দেশের লোকেরা ধূমকেতু ও উল্‌পাতকে অতিশয় অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া থাকে। সূর্য্য

সৌর জগতের কেন্দ্র। গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতি, জ্যোতিষ্কমণ্ড। এই কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, সূর্য্য একটী গ্রহ বলিয়া অনেকের ভ্রম আছে, কিন্তু বাস্তবিক গ্রহ নহে। ইহা একটী নক্ষত্রবিশেষ। উত্তাপ ও আলোকের আকর। ইহার তেজ ও আলোক পাইয়াই গ্রহগণ তেজস্বী ও আলোকময় হইয়া থাকে। সূর্য্য নিশ্চল নহে। ইহা সমুদয় গ্রহ উপগ্রহাদির সহিত নিয়তই কোন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু গ্রহ উপগ্রহাদির সম্বন্ধে সূর্য্যকে নিশ্চল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে অর্থাৎ সূর্য্যের গতির দ্বারা ইহা হইতে অন্যান্য জ্যোতিষ্কের দুরত্বাদির কখনই ব্যতিক্রম হয় নাপ সূর্য্য অন্য কোন জ্যোতিষ্কের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, না নিজ মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকেই কেবল ইহার গতি হয়, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

গ্রহ।

সৌরজগতে যে কত গ্রহ আছে তাহার অদ্যাপি স্থির নিশ্চয় হয় নাই। একাল পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ১২১ টা গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি বা শনৈশ্চর, ইউরেনস্, ও নেপচুন এই আটটী প্রধান। এতদ্ভিন্ন সীরিস, প্যালাস, জুনো, বেষ্টা, বিক্টোরিয়া প্রভৃতি অনেকগুলি [প্রায় ১১৩ টী] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ মঙ্গল ও বৃহস্পতির ভ্রমণপথের মধ্যে কোথাও না কোথাও অবস্থিত থাকিয়া নিয়ত সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে। দূরবীক্ষণের সাহায্যব্যতিরেকে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগকে ক্ষুদ্র গ্রহ কহে। জ্যোতির্বিদেরা গ্রহদিগকে সমুদায়ে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। পৃথিবীর গমনপথের সহিত অন্যান্য গ্রহদিগের গমনপথের তুলনা করিয়া এইরূপ শ্রেণিবিভাগ হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবী এই দুই শ্রেণীর মধ্যে গণনীয় নহে। যে সকল গ্রহের ভ্রমণপথ, সূর্য্য ও পৃথিবীর ভ্রমণপথের মধ্যবর্ত্তী তাহাদিগকে নীচ গ্রহ কহে। বুধ ও শুক্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আর যে সকল গ্রহের ভ্রমণপথ পৃথিবীর ভ্রমণপথের বহির্দ্দেশে অবস্থিত তাহাদিগের নাম জ্যেষ্ঠ বা উচ্চ গ্রহ। মঙ্গল, বৃহস্পতি শনি, ইউরেনস ও নেপচুন এই কয়টী উচ্চ গ্রহ। অর্থাৎ ইহাদিগের ভ্রমণপথ পৃথিবীর ভ্রমণপথের বাহিরে অবস্থিত। কনিষ্ঠ বা নীচ গ্রহদিগের একটীর ও উপগ্রহ নাই। পৃথিবীর একটী উপগ্রহ আছে। উহার নাম চন্দ্র। জ্যেষ্ঠ গ্রহদিগের মধ্যে কেবল মঙ্গলের একটীও উপগ্রহ নাই। তদ্ভিন্ন সকল কয়েকটীরই উপগ্রহ আছে। বৃহস্পতির ৪টী, শনির ৮টী, ইউরেনসের ৮টী, ও নেপচুনের ২টী উপগ্রহ। গ্রহগণ যেরূপ সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ উপগ্রহগণ নিজ

নিজ গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। কোন গ্রহ হইতে উহার উপগ্রহের যেরূপ আকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, উপগ্রহ হইতেও গ্রহগণের আকার অবিকল সেইরূপ দৃষ্ট হয়। যেমন পৃথিবী হইতে ইহার পারিপার্শ্বিক চন্দ্র যেরূপ আকারের দৃষ্ট হইয়া থাকে, চন্দ্র হইতেও পৃথিবী অবিকল সেইরূপ আকারবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পরে সৌর জগতের একটী প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইবে। উহা দ্বারা গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদিগের অবস্থান ও ভ্রমণপথের বিষয় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

সূর্য্য সৌর জগতের কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহ উপগ্রহাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী প্রচণ্ডবেগে পরিভ্রমণ করিতেছে। সমুদয় গ্রহই গোলাকার, কেবল উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। কোন গোলকের কেন্দ্র বা মধ্যবিন্দু ভেদ করিয়া যদি কোন সরল রেখা উহার দুই প্রান্ত বা সীমা স্পর্শ করে, তাহা হইলে উক্তরূপ রেখাকে উহার ব্যাস অক্ষ বা মেরুদণ্ড কহে। বৃত্ত বা গোলকখণ্ডের সীমাসূচক গোলাকার রেখার নাম উহার পরিধি। গ্রহগণ উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা ইহার অর্থ এইরূপে বুঝিতে হইবে। কোন গ্রহের কেন্দ্র ভেদ করিয়া যে সরল রেখা উত্তর দক্ষিণে উহার পরিধি স্পর্শ করে, তাহার দৈর্ঘ্য অপেক্ষা, উক্তরূপে কেন্দ্র ভেদ করিয়া যে সরল রেখা পূর্ব্ব পশ্চিমে উহার পরিধি স্পর্শ করে, তাহার দৈর্ঘ্য কিঞ্চিৎ অধিক। গ্রহগণ পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে নিয়তকাল ভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহারা যে নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে উহাকে গ্রহদিগের কক্ষ কহে। এই কক্ষ ঠিক গোলাকার নহে। বৃত্তাভাসাকার। একটী ডিম্বকে উহার লম্বাদিকে দুইখণ্ড করিয়া ছেদ করিলে ছেদমুখের যেরূপ আকার হয়, তাহাকে বৃত্তাভাস বলিলে বলা যায়। এই বৃত্তাভাসের দুইটী ব্যাসের মধ্যে একটী অপরটী অপেক্ষা দীর্ঘ ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। দীর্ঘতর ব্যাস বা অক্ষের দুই পার্শ্বে দুইটী বিন্দু এরূপ থাকে যে, অপর একটী বিন্দু পূর্ব্বোক্ত বিন্দুদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে এরূপে ভ্রমণ করিতে পারে, যে ঐ তৃতীয় বিন্দু হইতে পূর্ব্বোক্ত বিন্দুদ্বয়ের দূরত্বের সমষ্টি নিয়তই এক রূপ হয়। দীর্ঘতর ব্যাসস্থ উক্ত দুইটী বিন্দুকে বৃত্তাভাসের দুইটী অধিশ্রয় কহে। উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, যে গ্রহদিগের ভ্রমণপথ বৃত্তাভাসাকার। এই বৃত্তাভাসের একটী অধিশ্রয়ে সূর্য্যের অবস্থান। সুতরাং গ্রহগণ নিজকক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে কখন কখন সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, কখন বা সূর্য্য হইতে অনেক দূরে পড়ে। যখন ইহারা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, তৎকালে, ইহাদের বেগবৃদ্ধি হয়, আবার যখন সূর্য্য হইতে দূরে যায়, তখন ইহাদের বেগ অপেক্ষাকৃত কমিয়া যায়। গ্রহগণ গাড়ির চাকার

ন্যায় আপন কক্ষের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। গাড়ির চাকা যেরূপ আপন কক্ষের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে পথ অতিক্রম করে, গ্রহগণও অবিকল সেই রূপে নিজ নিজ মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতে করিতে সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। আপন কক্ষের চতুর্দ্দিকে একবার আবর্ত্তন করাকে গ্রহদিগের আহ্নিক গতি কহে। আর এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে একবার সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করার নাম গ্রহদিগের বার্ষিক গতি। এইরূপ সূর্য্যমণ্ডল বেষ্টন করিতে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহাকে গ্রহদিগের ভোগকাল কহে। সমুদায় গ্রহই পৃথিবীর ন্যায় ভৌতিক পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। তন্মধ্যে অধিকাংশ জ্যেষ্ঠ বা উচ্চ গ্রহই কনিষ্ঠ বা নীচ গ্রহদিগের অপেক্ষা অধিকতর লঘু উপকরণে নির্ম্মিত। অধিকাংশ গ্রহেই শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুভেদ হইয়া থাকে। পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহেও জীব জন্তুর বাস আছে কিনা, নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। তবে ইহাদিগের আকৃতি প্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, যে উহাদের পৃষ্ঠে জীবলোকের বসতি নিতান্ত অসম্ভব নহে। গ্রহগণ নিজে তেজোময় নহে। সূর্য্যের তেজ উহাদিগের উপর পতিত হয় বলিয়া উহাদিগকে তেজোময় দেখায়। গ্রহগণ নিজ নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কখন কখন পরস্পর সমসূত্রপাতে অবস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপে কখন কখন গ্রহ বা উপগ্রহ পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে সমসূত্রপাতে অবস্থিত হয়, কখন বা সূর্য্য মধ্যস্থলে থাকে, পৃথিবী এক পার্শ্বে ও গ্রহ উপগ্রহাদি অপর পার্শ্বে সমসূত্রপাতে অবস্থিত হয়। এই দুই প্রকার অবস্থানকেই গ্রহদিগের সংযোগ বলে। প্রথম প্রকার সংযোগের নাম দূরসংযোগ আর দ্বিতীয় প্রকারের নাম নিকট সংযোগ। জ্যেষ্ঠ গ্রহদিগের সহিত পৃথিবীর নিকট সংযোগ হইতে পারে না, কারণ উহাদিগের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের বাহিরে অবস্থিত। কখন কখন পৃথিবী সূর্য্য ও অপর কোন গ্রহ বা উপগ্রহের মধ্যস্থলে সমসূত্রপাতে অবস্থিত হয়। এই অবস্থানকে গ্রহদিগের অপযোগ কহে। কনিষ্ঠ গ্রহদিগের অপযোগ হইতে পারে না, কারণ ইহাদের ভ্রমণপথ পৃথিবীর ভ্রমণপথের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সুতরাং পৃথিবী কখনই ইহাদের মধ্যে কোনটীর ও সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত হইতে পারে না। গ্রহদিগের যখন যে ভাগ সূর্য্যের অভিমুখে থাকে, তখন সেই ভাগে সূর্য্যের আলোক পতিত হওয়াতে দিন হয়, আর অপর ভাগে আলোক না থাকাতে অন্ধকারময় হইয়া রাত্রি হইয়া থাকে।

এক্ষণে ভিন্নভিন্ন গ্রহাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। বুধ-সৌর জগতে যাবতীয় গ্রহ আছে তন্মধ্যে বুধ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী। এই গ্রহ সূর্য্য হইতে প্রায় ৩৬৮৯০৬০০ মাইল অন্তরে অবস্থিত। ইহার ব্যাস প্রায় ৩০৯৯

মাইল। বুধ ৮৭ দিন, ২৩ ঘণ্টা, ১৫ মিনিট, ৪৬ সেকেণ্ড সময়ে একবার সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে এবং ২৪ ঘণ্টা ৫ মিনিটে একবার স্বীয় অক্ষের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে। বুধ প্রতি ঘণ্টায় ১০৯০০০ মাইল গমন করিয়া থাকে। বুধের আলোক শ্বেতবর্ণ। সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পরে ও সূর্য্যদেবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই গ্রহ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী বলিয়া বুধ অন্যান্য সময়ে দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃথিবীতে সূর্য্যের উত্তাপ যেরূপ অনুভূত হয়, বুধগ্রহে উহা তদপেক্ষা প্রায় সাত গুণ অধিক। সুতরাং বুধ অন্যান্য তাবৎ গ্রহ অপেক্ষা অধিক উষ্ণ। সূর্য্য বুধ অপেক্ষা প্রায় ৪৮৬৫৭৫১ গুণ বড় ও পৃথিবী আকারে ৭ গুণ বড়। চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায় বুধের ও হ্রাস বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শুক্র—বুধের পর শুক্র। প্রদোষ ও প্রত্যূষে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত শুক্র বিলক্ষণ উজ্জ্বলভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই গ্রহ সূর্য্য হইতে প্রায় ৬৮৮৯৭৫০০ মাইল অন্তরে অবস্থিত। ইহা প্রতি ঘণ্টায় ৭০,৫০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আইসে। শুক্রের ব্যাস প্রায় ৭৮০৭ মাইল, ইহা ২৩ ঘণ্টা ২১ মিনিট, ২২ সেকেণ্ডে একবার নিজ মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে। শুক্র পৃথিবী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট। সূর্য্য শুক্র অপেক্ষা প্রায় ৪০১৮৪৯ গুণ বড়। দূরবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্টি করিলে চন্দ্রের ন্যায় শুক্রের ও কলায় কলায় হ্রাসবৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শুক্রের ঋতু সকল পৃথিবীর ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ পৃথিবীতে যখন গ্রীষ্ম তখন শুক্রে শীত, আর পৃথিবীতে যখন শীত তখন শুক্রে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হয়। শুক্রে মেঘ ও জলের চিহ্ন লক্ষিত হয়, সুতরাং ইহাতে জীবলোকের বাস থাকিলেও থাকিতে পারে। শুক্র অন্যান্য তাবৎ গ্রহ অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল। মধ্যে মধ্যে শুক্র গ্রহের গ্রহণ হইয়া থাকে, তৎকালে উহাকে সূর্য্যমণ্ডলের উপর একটী অতি ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নের ন্যায় দেখায়।

পৃথিবী—শুক্রের পর পৃথিবী। পৃথিবী একটী প্রকাণ্ড গ্রহ। ইহা বুধ শুক্র ও মঙ্গল এই তিনটী গ্রহ অপেক্ষা আয়তনে বৃহৎ। উচ্চ গ্রহদিগের মধ্যে কেবল মঙ্গলই পৃথিবী অপেক্ষা ছোট। অন্যান্য তাবৎ উচ্চ গ্রহই পৃথিবী অপেক্ষা বড়। পৃথিবী পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, এই জন্যই পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহাদি তাবৎ জ্যোতিষ্কই ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যদি সূর্য্যমণ্ডল হইতে গ্রহাদি নিরীক্ষণ করিবার উপায় থাকিত তাহা হইলে প্রায় তাবৎ গ্রহ উপগ্রহাদিই যে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইয়া ক্রমে সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে তাহা

স্পষ্টই বুঝা যাইত। পৃথিবী সূর্য্য হইতে প্রায় ৯৫০০০০০০ মাইল অন্তরে অবস্থিত। ইহার একটী পারিপার্শ্বিক আছে। ইহার নাম চন্দ্র। পৃথিবী আমাদের আবাসভূমি। আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতেই তাবৎ গ্রহ উপগ্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকি। পৃথিবীর আকার কিরূপ, অন্যান্য গ্রহ, সূর্য্য ও চন্দ্রের সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ধ এবং সেই সম্বন্ধাধীন পৃথিবীর পৃষ্ঠে কিরূপ নৈসর্গিক ব্যাপার দৃষ্ট হইয়া থাকে এই সমস্ত বিষয় আমাদের বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক। এই জন্য পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্যের বিষয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রস্তাবে সবিস্তরে লিখিত হইবেক। এই নিমিত্তই এস্থলে পৃথিবীর বিষয়ে দুই একটী কথা মাত্র বলা হইল।

মঙ্গল—পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রহগণের পর মঙ্গল। জ্যেষ্ঠ-গ্রহদিগের মধ্যে মঙ্গল সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবী ও সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী। মঙ্গল যে পথে পরিভ্রমণ করে উহা পৃথিবীর কক্ষের বাহিরে অবস্থিত। এই গ্রহ একপ্রকার নিবিড় বায়ু দ্বারা পরিবৃত আছে এই জন্য ইহার আলোক দেখিতে অতিশয় রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। মঙ্গল সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রায় ১৪৬০০০০০০ মাইল অন্তর, ইহা এক বৎসর ৩২১ দিন ১৭ ঘণ্টা, ৩০ মিনিট, ৪১ সেকেণ্ড সময়ে একবার সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে। ইহার ব্যাস প্রায় ৪১১৩ মাইল। সুতরাং ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ছোট। মঙ্গল প্রতি ঘণ্টায় ৫৫২২২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ২৪ ঘণ্টা, ৩৭ মিনিট ২৩ সেকেণ্ডে একবার আপন অক্ষের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিয়া থাকে। জ্যেষ্ঠ গ্রহদিগের মধ্যে কেবল মঙ্গলেরই উপগ্রহ নাই। পৃথিবীতে সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ যে পরিমাণে পতিত হয়, মঙ্গল গ্রহে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র পতিত হইয়া থাকে। এইরূপ পৃথিবী হইতে সূর্য্যকে যত বড় দেখায় মঙ্গল হইতে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যেরূপ ঋতু পরিবর্ত্তন হয় মঙ্গল গ্রহে ও অবিকল তদ্রূপ হইয়া থাকে। দূরবীক্ষণদ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে যে ইহার উভয় মেরুদেশ পৃথিবীর ন্যায় বরফে আবৃত। মঙ্গলে সমুদ্র নদী, মহাদেশ প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। ইহাতে মেঘ বৃষ্টি ও বায়ুর ও অসদ্ভাব নাই। ফলতঃ মঙ্গলগ্রহে আমা-আমাদের, পৃথিবীর ন্যায় অনেক পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহা বিলক্ষণ বোধ হয়। মঙ্গলে জলের ভাগ অপেক্ষা স্থলের ভাগ কিঞ্চিৎ অধিক। কিন্তু পৃথিবীতে ইহার ঠিক বিপরীত। মঙ্গলগ্রহে স্থল ও জলের বিভাগ ইউরোপ খণ্ডের ন্যায়। যখন পৃথিবীর সহিত এত সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, তখন মঙ্গল গ্রহে যে জীবলোক উদ্ভিজ্জাদি আছে তাহার আর সংশয় নাই।

ক্ষুদ্র গ্রহগণ—মঙ্গল গ্রহের ভ্রমণ পথ হইতে বৃহস্পতির ভ্রমণপথ অনেক দূরে অবস্থিত। এই ব্যবধানের মধ্যে

বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ অবিকল অন্যান্য গ্রহের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট নিজ নিজ ভ্রমণপথে যথানিয়মে সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ইহাদিগের অস্তিত্বের বিষয় কেহই অবগত ছিলেন না। এক্ষণে এক একটী করিয়া প্রায় ১১৩টী হইয়াছে, কালক্রমে আর ও আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই সকল গ্রহ অতিশয় ক্ষুদ্র। ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কয়েকটীর ব্যাস ৮০ মাইল হইতে ২৫০ মাইল পর্য্যন্ত। ইহারা সূর্য্য হইতে ২০,৫০,০০,০০০ অবধি ৩২, ৯০,০০,০০০ মাইল পর্য্যন্ত দূরে অবস্থিত। ইহাদের ভোগকাল ১১৯৩.২৮ হইতে ২৩৪৩ দিন পর্য্যন্ত।

বৃহস্পতি—ক্ষুদ্র গ্রহদিগের পর বৃহস্পতি। বৃহস্পতি অন্যান্য তাবৎ গ্রহ অপেক্ষা আয়তনে বৃহৎ। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ১৪১৪ গুণ বড়। উজ্জ্বলতা বিষয়েও এই গ্রহ কেবল শুক্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন। কিন্তু অন্যান্য সকল গ্রহ অপেক্ষাই ইহা সমধিক উজ্জ্বল। ইহার ব্যাস প্রায় ৮৯২০৩ মাইল। বৃহস্পতি সূর্য্য হইতে প্রায় ৪৯৫৫৮৬০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। ১১ বৎসর, ৩১৪ দিন, ২০ ঘণ্টা, ২ মিনিট, ৭ সেকেণ্ডে বৃহস্পতি একবার সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে। বৃহস্পতির ১ বৎসরে আমাদের প্রায় ১২ বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। ৯ ঘণ্টা, ৫৫ মিনিট, ২১ সেকেণ্ডে বৃহস্পতি একবার আপন অক্ষের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে। সুতরাং ঐ সময়েই উহার একবার দিবা রাত্রি হইয়া থাকে। এই গ্রহ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২৫৫২০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যায়। পৃথিবী হইতে সূর্য্য যত বড় দেখায়, বৃহস্পতি হইতে সূর্য্যমণ্ডল তাহার পঞ্চমাংশের ও কিঞ্চিৎ কম বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। পৃথিবীপৃষ্ঠে সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ যে পরিমাণে অনুভূত হয়, বৃহস্পতি হইতে উহা তাহার ২৫ গুণ কম পরিমাণে অনুভূত হইয়া থাকে। বৃহস্পতির ৪টী উপগ্রহ বা পারিপার্শ্বিক আছে। চন্দ্রমণ্ডল যেরূপ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, ৪টী উপগ্রহ ও চন্দ্রের ন্যায় বৃহস্পতির চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া উহাকে আলোক প্রদান করে। বৃহস্পতি গোলাকার নহে, ইহা উত্তর দক্ষিণে বিলক্ষণ চাপা। ইহার যেরূপ অবস্থান তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় ইহাতে শীত গ্রীষ্মাদি ক্রমে ঋতুপরিবর্ত্তন হয় না। দূরবীক্ষণ দ্বারা নিরীক্ষণ করিলে বৃহস্পতির পৃষ্ঠে চন্দ্রের ন্যায় কতকগুলি শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ কটিবন্ধের ন্যায় রেখা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ গুলির আকার সকল সময়ে সমান থাকে না। মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই সকল কটিবন্ধসদৃশ রেখা যে বাস্তবিক কি পদার্থ তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

শনি বা শনৈশ্চর।—শনিগ্রহ সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রায় ৯০৮৭২৩০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা ২৯ বৎসর, ১৬৬ দিন, ২৩ ঘণ্টা, ১৬ মিনিট, ৩২ সেকেণ্ড সময়ে

সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এই সময়কে শনির ভোগকাল বা বৎসর কহে। ইহার ব্যাস প্রায় ৭৯৭৮২ মাইল। শনি ১০ ঘণ্টা, ২৯ মিনিট, ১৭ সেকেণ্ডে একবার নিজ মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিয়া থাকে। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ৭৩৫ গুণ বড়। আর সূর্য্য ইহা অপেক্ষা প্রায় ৩৫০১৬ গুণ বড়। শনি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১০৩৬০ মাইল পথ গমন করে। পৃথিবী হইতে সূর্য্যকে যত বড় দেখায়, শনিগ্রহ হইতে তাহার ৯ ভাগের এক ভাগ মাত্র প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আমরা যে পরিমাণে সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ উপভোগ করি, শনিগ্রহে তাহার ৮০ ভাগের এক ভাগ মাত্র সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের অল্প মাত্র আলোক পায় বলিয়া ঐ অভাব নিরাকরণার্থই বোধ হয় ৮টী পারিপার্শ্বিক চন্দ্রের ন্যায় নিয়ত ইহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া ইহাকে আলোক প্রদান করিতেছে। বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া পৃথিবী হইতে শনিগ্রহ অতিশয় মলিন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এমন কি নক্ষত্র হইতে সহজে ইহাকে প্রভেদ করা যায় না, কেবল ঈষৎ পীতবর্ণ এক প্রকার অস্পষ্ট আলোক ইহা হইতে নির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু দূরবীক্ষণের সাহায্যে নিরীক্ষণ করিলে ইহাকে যেমন বিস্ময়জনক তেমনি পরমসুন্দর দেখায়। দূরবীক্ষণ দ্বারা নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে শনৈশ্চর তিনটী চক্র বা অঙ্গুরীয় মধ্যে অবস্থিত। এই তিনটীর মধ্যে বাহিরের ও ভিতরেরটী শশির ন্যায় ঈষৎ পীতবর্ণ এবং মাঝেরটী কৃষ্ণবর্ণ। শালগ্রাম শিলার গাত্রে সোণার পৈতা যে ভাবে পরান থাকে, শনির অঙ্গুরীয় কয়টীও প্রায় সেই ভাবেই সংস্থাপিত। কিন্তু এই সকল অঙ্গুরীয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান আছে, ইহারা শনির গাত্রে সংলগ্ন নহে। এই সকল অঙ্গুরীয়ের এক প্রকার গতি আছে, ইহারা নিশ্চল নহে। ইহারা যে কি প্রকার পদার্থে নির্ম্মিত তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। বৃহস্পতির ন্যায় শনিরও কয়েকটী কটিবন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শনিগ্রহে ঋতুপরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের প্রায় ৩০ বৎসরে একটী বৎসর মাত্র হয় বলিয়া ইহার ঋতু সকল প্রত্যেকেই ৭ বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত অবস্থান করে।

ইউরেনস।—১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ তারিখে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ সর উইলিয়ম হর্শেল নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ঐ গ্রহ আবিষ্কার করেন। এই নিমিত্ত তাঁহার নামানুসারে কেহ কেহ ইহার হর্শেল নাম দিয়াছেন। ইউরেনস সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রায় ১৮২২০০০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার ব্যাস প্রায় ৩৪,৫০০ মাইল, সুতরাং ইহা পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ৯৬ গুণ বড়। সূর্য্যমণ্ডল ইহা অপেক্ষা প্রায় ২৪৬০৬ গুণ বৃহৎ। এই গ্রহ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১৫০০০ মাইল গমন করিতে করিতে পার্থিব ৮৪

বৎসর ৫ দিন, ১৯ ঘণ্টা ৪১ মিনিট, ৩৬ সেকেণ্ডে একবার সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে। সুতরাং এই সময়ে ইহার এক বৎসর পূর্ণ হয়। ইউরেনস্ ৯ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে একবার আপন অক্ষের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে। এই গ্রহের সমুদয়ে ৮টী পারিপার্শ্বিক আছে। তন্মধ্যে কেবল ৪টীর ভ্রমণপথ নির্ণীত হইয়াছে। পৃথিবীতে সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ যে পরিমাণে পতিত হয়, ইউরেনসের পৃষ্ঠে তাহার ৩৬৩ ভাগের এক ভাগ মাত্র পতিত হইয়া থাকে। বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া এই গ্রহ দূরবীক্ষণের সাহায্যেও অতিশয় ক্ষুদ্র দেখায়, সুতরাং ইহাতে কোনরূপ চিহ্ন বা কটিবন্ধ আছে কিনা, অদ্যাপি বুঝা যায় নাই। কেবল শুভ্রজ্যোতির সহিত ঈষৎ নীল আভা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নেপচুন।—ইউরেনসের পর নেপচুন। এইটীই সৌরজগতের শেষ গ্রহ। ইহার গমনপথের বাহিরে অন্যান্য গ্রহ আছে কিনা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। নেপচুন গ্রহ সকল গ্রহ অপেক্ষা সূর্য্যমণ্ডলের অধিক দূরবর্ত্তী। ১৮৪৬ খৃ অব্দে এই গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নেপচুন সূর্য্য হইতে প্রায় ২৮৫০০০০০০০ মাইল অন্তর। ইহার ব্যাস প্রায় ৪১,৫০০০ মাইল। নেপচুন ১৬৪ বৎসর, ২২৬ দিনে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ১০৮ গুণ বৃহৎ। অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া ইহার আহ্নিক গতির কাল, ও ইহা প্রতি ঘণ্টার কত পথ অতিক্রম করে, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। সূর্য্য নেপচুন অপেক্ষা প্রায় ১৪৪৪৬ গুণ বড়। নেপচুনের নিশ্চয়ই একটী উপগ্রহ আছে, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে ইহার দুইটী উপগ্রহ। পৃথিবী হইতে শুক্রগ্রহ যত বড় দেখায়, নেপচুন হইতে সূর্য্যের সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র আকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীতে সূর্য্যাতপ যে পরিমাণে পতিত হয়, নেপচুনে তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র পতিত হইয়া থাকে।

উপগ্রহ বা পারিপার্শ্বিক।

উপগ্রহ বা পারিপার্শ্বিক কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ইহারা একপ্রকার ক্ষুদ্র গ্রহ। ইহারা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গ্রহদিগের চতুর্দ্দিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এবং এইরূপে গ্রহদিগের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে। সূর্য্যের আকর্ষণ গ্রহদিগের উপর ও যেরূপ, উপগ্রহদিগের উপর ও সেইরূপ। তবে উপগ্রহগণ নিজ নিজ গ্রহের অতিশয় নিকটবর্ত্তী বলিয়া ইহাদের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ইহাদের চতুর্দ্দিকেই ঘুরিতে থাকে। গ্রহগণ যেরূপ বৃত্তাভাসপথে সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, উপগ্রহগণ ও অবিকল সেইরূপ পথে নিজ নিজ গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে। ইউরেনস ও নেপচুন ভিন্ন অন্যান্য তাবৎ গ্রহের

উপগ্রহই গ্রহদিগের ন্যায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান। কেবল ইউরেনস ও নেপচুন এই উভয়ের উপগ্রহগুলি বিপরীতদিকে গমন করে। অর্থাৎ ইহাদের গতি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে। উপগ্রহগণ যে সময়ে নিজ নিজ মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে, গ্রহদিগের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেও ইহাদের অবিকল সেই সময়ই লাগিয়া থাকে। এই নিমিত্ত ইহাদের অর্দ্ধেক অংশ কেবল সূর্য্যাভিমুখে থাকিয়া আলোকময় হয়, অপরার্দ্ধ চিরকাল সূর্য্যের বিপরীত দিকে অবস্থিত, সুতরাং কখনই দৃষ্টিগোচর হয় না। উপগ্রহগণ নিজে আলোকময় নহে। সূর্য্যের আলোক প্রাপ্ত হইয়া রাত্রিকালে নিজ নিজ গ্রহকে আলোক বিতরণ করে, আবার উহাদিগের নিকট হইতেও ঠিক ঐরূপে আলোক প্রাপ্ত হয়। সমুদয় উপগ্রহেরই গ্রহণ হইয়া থাকে। চন্দ্রের গ্রহণ আমরা সচরাচর প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। বৃহস্পতির উপগ্রহগণের প্রত্যেক পরিভ্রমণেই গ্রহণ হইয়া থাকে। উপগ্রহগণ বোধ হয় গ্রহদিগের ন্যায় উপকরণে নির্ম্মিত। ইহাদিগের পৃষ্ঠে পৃথিবীর ন্যায় পদার্থ ও জীবজন্তু আছে কিনা তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। একাল পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ২৩টী উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে পৃথিবীর ১, বৃহস্পতির ৪, শনির ৮, হর্শেলের ৮, ও নেপচুনের ২৮। পৃথিবীর উপগ্রহের নাম চন্দ্র। নিম্নে উপগ্রহদিগের বিশেষবিবরণঘটিত একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

পৃথিবীর উপগ্রহ।

উপগ্রহ	গ্রহ পরিভ্রমণকাল দিন-ঘণ্টা-মি-সে।	গ্রহ হইতে যত দূর মাইল	ব্যাস। মাইল
চন্দ্র	২৭—৭-৪৩-১১.৫	২,৩৭,৬২৭	২,১৫৩

বৃহস্পতির উপগ্রহ।

উপগ্রহ	গ্রহ হইতে অন্তর মাইল	ব্যাস মাইল	গ্রহ প্রদক্ষিণ করিবার কাল। দিন - ঘণ্টা মিনিট - সেকেণ্ড
১ ম	২৫৯১৭০	২৪৩৭	১ — ১৮ - ২৮ - ১২
২ য়	৪১২৩৫২	২১৮৮	৩ — ১৩ - ১৩ - ৪৮
৩ য়	৬৫৭৭৩৪	৩৫৭৫	৭ — ৩ - ৪৩ - ১২
৪ র্থ	১১৫৭৬৪০	৩০৫৯	১৬ — ১৬ - ৩২ - ৪৮

শনির উপগ্রহ।

উপগ্রহ	গ্রহ হইতে অন্তর মাইল।	গ্রহ প্রদক্ষিণ করিবার কাল।			
		দিন	ঘণ্টা	মিনিট	সেকেণ্ড
১ ম	১২১২৪৪ ...	০	২২	৩৭	২২
২ য়	১৫৫৫৭০ ..	১	৮	৫৩	৬
৩ য়	২৯২৬১২ ...	১	২১	১৮	২৫
৪ র্থ	২৪৬৭৪০ ...	২	১৭	৪১	৮
৫ ম	৩৪৪৬০০ ...	৪	১২	২৫	১০
৬ ষ্ঠ	৭৯৮৯১২	১৫	২২	৪১	২৫
৭ ম	১১০৮২৪০ ...	২২	১২	০	০
৮ ম	২৩২৮৫৯৬ ...	৭৯	৭	৫৩	৪০

ইউরেনসের উপগ্রহ।

উপগ্রহ	গ্রহ হইতে দূরতত্ব মাইল।	গ্রহ প্রদক্ষিণ করিবার কাল।			
		দিন	ঘণ্টা	মিনিট	সেকেণ্ড
১ ম	১১৩১০০	২	১২	০	০
২ য়	২২৬২০০	৪	০	০	০
৩ য়	২৩০৩৩৪	৫	২১	০	০
৪ র্থ	২৯৮৮৩৪	৮	১৬	৬	৩১
৫ ম	৩৪৮৩৯৮	১০	২৩	০	০
৬ ষ্ঠ	৩৯৯৪৩৪	১৩	১১	৭	১২
৭ ম	৭৯৮৯২০	৩৮	২	০	০
৮ ম	১৫৯৭৭৩৬	১০৭	১২	০	০

নেপচুনের উপগ্রহ।

উপগ্রহ	গ্রহ হইতে অন্তর মাইল।	গ্রহ প্রদক্ষিণ করিবার কাল দিন	ঘণ্টা	মিনিট	সেকেণ্ড
১ম	২২৯৭৫১	৫	২১	৭	০
২য়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত			

ধূমকেতু।

ধূমকেতু কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ধূমকেতু সকল অতিশয় লঘু উপাদানে নির্ম্মিত। গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় কঠিন নহে। ধূমকেতুর অবয়ব মস্তক ও পুচ্ছ এই দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার মস্তক জ্যোতির্ম্ময় এবং উহার ঠিক মধ্যস্থলে ঠিক একটী নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল। ধূমকেতুর কেতু অর্থাৎ পুচ্ছ সকল সময়েই সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে। কোন কোন ধূমকেতুর পুচ্ছ নাই। আবার কোন কোনটার ৫।৬টী পুচ্ছ দেখিতে পাওয়া যায়। ধূমকেতুদিগের শিরোদেশ স্বচ্ছ বাষ্পরাশিতে আচ্ছন্ন, সুতরাং দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে উহাদের পুচ্ছ ও শিরোভাগের মধ্য দিয়া নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রহাদির ন্যায় ধূমকেতুদিগের ও নিজের আলোক নাই। সূর্য্যকিরণের অনুপ্রবেশহেতুক উহাদিগকে আলোকময় দেখায়, কিন্তু কোন কোনটা এরূপ আলোকময় হইয়া উঠে যে দিবাভাগে ও উহারা বিলক্ষণ উজ্জ্বলভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ধূমকেতুগণ ভ্রমণ করিতে করিতে যখন সূর্য্যমণ্ডলের সন্নিহিত হয়, তখনই উহারা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, অন্যান্য সময়ে উহাদিগকে দেখা যায় না। গ্রহাদির ন্যায় ইহারাও সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু উহাদের ভ্রমণপথের স্থিরতা নাই। কোনটা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমন করে, আবার কোনটা বা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া থাকে। কোনটার কক্ষ সুদীর্ঘ বৃত্তাভাস, কোনটা বা কোন কোন ধূমকেতুর পুচ্ছ এত বড় যে ক্ষেপণী রেখার ন্যায় পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে। কখন উহা পৃথিবীর সহিত ঘূর্ণমান বায়ুরাশির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। যে সকল ধূমকেতুর ভ্রমণপথ বৃত্তাভাস তাহারা কোন নিয়মিতকালের মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহারা ক্ষেপণীসদৃশ পথে ভ্রমণ করে তাহারা একবার দৃষ্ট হইলে আর কখনই দৃষ্ট হইতে পারে না, কারণ ঐরূপ পথের সীমা পরিসীমা নাই। কোন কোন ধূমকেতুর ভ্রমণপথ এত বড়, যে প্রতি ঘণ্টায় ৭৭৪০০ মাইল পথ ভ্রমণ করিয়াও এক-

বার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে উহাদের ন্যূনাধিক ৫৭৫ বৎসর কাল লাগিয়া থাকে। ধূমকেতুসকল ভ্রমণ করিতে করিতে কখন কখন সূর্য্যের এত নিকটবর্ত্তী হয়, যে তথায় সূর্য্যের তাপ পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ৪৭০০০ গুণ অধিক। ১৮৪৩ খৃ অব্দে এইরূপ একটী ধূমকেতু দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। এই ধূমকেতু সূর্য্যের এত নিকটে গিয়াছিল যে তথায় যেরূপ সূর্য্যের উত্তাপ লাগে, তাহার ৪ ভাগের এক ভাগ কোন পার্থিব পদার্থে লাগিলে উহা তৎক্ষণাৎ গলিয়া যায়। কিন্তু ঐ ধূমকেতু উহা অনায়াসে সহ্য করিয়াছিল। কোন কোন ধূমকেতুর পুচ্ছ এত দীর্ঘ যে শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ১৭৭০ খৃ অব্দে যে ধূমকেতু উদিত হইয়াছিল, তাহার পুচ্ছ ১৫০,০০০০০০ মাইল! ১৮১১ খৃ অব্দে একটী ধূমকেতু দৃষ্ট হয়, উহা পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ৬০০০০০০০ গুণ বড়!! এই সৌর জগতে যে ছোট বড় কত ধূমকেতু আছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা কাহার ও সাধ্যায়ত্ত নহে, একাল পর্য্যন্ত প্রায় ৭০০ ধূমকেতুর বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কেবল ৪টী ধূমকেতুর বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া গিয়াছে। ১৬৮২ খৃ অব্দে হালি সাহেব একটী ধূমকেতু আবিষ্কার করেন, উঁহারই নাম অনুসারে ঐ ধূমকেতুর নাম হইয়াছে। ঐ ধূমকেতু ৭৫ বৎসরের মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, উহা ১৮৩৫ খৃ অব্দে উদিত হইয়াছিল, সুতরাং আবার ১৯১১ খৃ অব্দে উহা পুনরুদিত হইবে। খৃষ্ট জন্মিবার ১১ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ধূমকেতু কোন্ কোন্ সময়ে উদিত হইয়াছিল তাহা নির্ণীত আছে। উপরি উল্লিখিত চারিটী ধূমকেতুর মধ্যে কোন্টী কত বৎসরে সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

হেলি···৭৫ বৎসর } বীলা ··৬বৎ ৯মাস
এনকি···৩।৪ মাস } ফে ···৭,, ৫,,

উল্কাপিণ্ড।

আকাশমণ্ডলে যে কত শত উল্কাপিণ্ড নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। ইহারা অতি ক্ষুদ্র গ্রহাদির ন্যায় সূর্য্য, বা কোন গ্রহ উপগ্রহাদির চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে উহাদের কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সময়ে সময়ে উহাদের পৃষ্ঠদেশে পতিত হইয়া থাকে। যখন পৃথিবীর আকর্ষণে ইহারা পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত হয়, তখনই আমরা উল্কাপাত দেখিতে পাই। বৎসরের মধ্যে সমগ্র কার্ত্তিক মাস ও অগ্রহায়ণ মাসের কিছু দিন পর্য্যন্ত সমধিক উল্কাপাত হইয়া থাকে। ধূমকেতুসকল যেরূপ পথে ভ্রমণ করে, অধিকাংশ উল্কাপিণ্ডও প্রায় সেইরূপ পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে। উল্কাপিণ্ড সকল গ্রহাদির ন্যায় কঠিন এবং উহাতে লৌহ, মৃত্তিকা, গন্ধক, অঙ্গার, টিন প্রভৃতি নানাবিধ পার্থিব পদার্থ দৃষ্ট হয়। উল্কাপিণ্ডের চতুর্দ্দিকে একপ্রকার দাহ্যপদার্থ পরিবেষ্টিত আছে। পৃথিবীর উপরিস্থ উষ্ণ বায়ু বা বিদ্যু-

তের সহিত সংযোগ ও ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হইয়া উহারা অগ্নিময় হইয়া উঠে। উল্কাপিণ্ড সকল ভূমণ্ডল হইতে প্রায় ১৬ অবধি ২০০ মাইল পর্য্যন্ত দূরে অবস্থিত থাকে। কিন্তু কখন কখন ইহারা এত দূরে যায় যে, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ গ্রহ নেপচুনেরও উপরে উঠিয়া থাকে। ইহাদের বেগ ও অসাধারণ। পৃথিবীর যেরূপ ভ্রমণবেগ কোন কোন উল্কাপিণ্ডের বেগ তদপেক্ষাও অধিক। ১৮৫০ খৃ অব্দে একটী উল্কাপিণ্ড ফ্রান্স দেশ অতিক্রম করে। উহার বেগ এত অধিক, যে প্রতি মিনিটে উহা ২৪০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। ইহারা পৃথিবীতে পতিত হইবার সময় পৃথিবীর পৃষ্ঠে না থাকিয়া বেগে ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া থাকে। উল্কাপিণ্ড সকল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। বৃহৎ গুলির পরিধি ৪।৫ হাতের অধিক হইবে না। কখন কখন অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য উল্কা পতিত হইয়া থাকে। একবার আমেরিকায় ৯ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ২৪০০০০ উল্কাপিণ্ড পতিত হইয়াছিল। এইরূপ উল্কাপাতকে আমরা অগ্নি-বৃষ্টি বলিয়া থাকি।

সঙ্গীত-পথিক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চীন ভাষা।

কিন্তু উপক্রমেই বিষম বিপদে পড়িলাম। ভাষা শিক্ষা করিতে গিয়া দেখি, এমন জটিল দুরূহ ভাষা আর নাই, ভাবিতে লাগিলাম কিরূপে আয়ত্ত করিতে পারিব। ভাষা সম্বন্ধে শব্দ-শাস্ত্র-বিদ্ গণের মত এখানে কোনমতেই লব্ধ-প্রসর হইতে পারে না। এ ভাষার সঙ্গে পৃথিবীস্থ অন্য কোন জাতির ভাষারই অণুমাত্রও সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না—যে ভাষা সৃষ্টির ২৯০০ বৎসর সময়ে পাওসি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে তাহা অদ্যাপিও, এই খৃষ্টীয় ঊনবিংশশতাব্দীর শেষ ভাগেও—এই প্রায় ৭০০০ বৎসর কাল হইল এখনও অক্ষুণ্ণভাবে রহিয়াছে। যদিও সময়ে সময়ে কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু স্থূলে সে ভাষা অবিকল সেই একই ভাবে রহিয়াছে। যে জাতি—পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহা জানেন নাই বা গ্রহণ করেন নাই অর্থাৎ তাহাদের নিকট যাহা নূতন—তাহা কখনই গ্রহণ করে না, সে জাতির নিকট কিছু নূতন বা পুরাতনের উপর কোনরূপ নূতন সংস্করণ কিরূপে প্রত্যাশা করিতে পারা যায়! যাহাহউক, এই ভাষা হাজার জটিল ও অদ্ভুত হউক আমাকে শিখিতেই হইবে, তাহা না হইলে আমার উদ্দেশ্য কোনরূপে সাধিত হইতে পা-

রিবে না। আমার আশ্রয়-দাতার নিকট সুবিখ্যাত ডাক্তার মার্সম্যান্ ও ডাক্তার মরিসন্ - কৃত চীন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান ছিল, সে গুলি গ্রহণ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। যদিও তাহাদের মধ্যে এক খানিও সম্পূর্ণ ও সুপ্রণালীবদ্ধ ছিলনা—এরূপ ভাষাকে শৃঙ্খলা-বদ্ধ করে এমন শক্তি কাহারই বা আছে ?—তথাপি তাহারা আমার অনেক উপকারের হইয়া ছিল।

পাঠক! সেই ভাষা কতক অভ্যাস করিলাম, কিছু দিন পরে তাহার অন্তরেও কতক প্রবেশ করিতে পারিলাম। যদি তাহা শিখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তাহার স্থূল ভাগ তোমাকে দেখাইতেছি, যদি বুঝিতে পার—যদি তোমার কৌতূহল জন্মে তাহা হইলে আরও বিস্তীর্ণতর গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন কর। আমি কিন্তু ওদিকে আর যাইব না! এরূপ কঠোর নীরস জটিল ভাষায় পারদর্শিতা লাভ কোন বিশেষ ফলোপযোগী হইবে না।

অন্যান্য জাতির ন্যায় চীনদের চলিত ও সাধু এই দুই প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে, সময়ে সময়ে সাধুভাষার কতক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু চলিত ভাষা অবিকল অপরিবর্ত্তিত অবস্থায়ই রহিয়াছে। চীনভাষা এই উভয়বিধ ভেদেই আকারোগ্নেয়। পূর্ব্বে যখন লোকে যে বস্তুকে বুঝাইতে ইচ্ছা করিত, তখন সে বস্তুর আকার অঙ্কিত করিত, আর আর বিষয় যাহা ইহাতে সম্পন্ন না হইত তাহা আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া থাকিত। তাহারা অতি পুরাতন অক্ষর, কিন্তু এখনও অনেক চীন গ্রন্থে সেইরূপ অক্ষর দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদিগকে চীন ভাষায় "কৌবেন" বলে। যে কোন শব্দ—চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা, সিংহ, পুরুষ, স্ত্রী প্রভৃতি—বুঝাইতে ইচ্ছা হইলে তাহারা তাহাদের প্রত্যেকের এক একটী আকৃতি অঙ্কিত করিত এবং দুই তিন ইত্যাদি অঙ্ক এক দুই তিন ইত্যাদি রেখা দ্বারা দেখাইত। কিন্তু এখন চীন ভাষাতত্ত্ব-বিদ্‌গণ ভাষাকে অনেক বৈজ্ঞানিক-নিয়মতন্ত্র করিয়া তুলিয়াছেন—এখন সেরূপ আকৃতিদ্বারা ভাবের পরিচয় না দিয়া রেখাদ্বারা দিয়া থাকেন এবং রেখার সংখ্যানুসারে ভাষাগত সমুদয় বাক্য বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত রহিয়াছে। এক রেখা দ্বারা যে সকল কথা সম্পন্ন হয় তাহারা এক শ্রেণীভুক্ত, দুই রেখা দ্বারা নিষ্পন্ন কথা সকল দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত। এইরূপ অষ্টাদশ রেখানুসারে অষ্টাদশ শ্রেণীতে সমুদয় কথা বিভক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা এমনি সুন্দর ও পরিপাটী যে, আর একটু হইলেই উহা বিশ্ব-ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত—পৃথিবীতে সমুদয় জাতি ঐ একই ভাষায় নিজ মন্তব্য অবাধে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইত। চীনেরা এতদ্ভিন্ন বিষয়-ভেদে সেই সমুদয় রেখা-সম্পন্ন শব্দকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে।

১ম। এই শ্রেণীতে সমুদয় পদার্থের

প্রতিকৃতি-ব্যঞ্জিত শব্দ সমূহ গৃহীত হইয়াছে। আকার অনুকরণ করিয়া রেখা অঙ্কিত করা হয় সেই জন্য এই শ্রেণীকে অনুকৃতি-শ্রেণী বলে। এই শ্রেণী জাতি ও দ্রব্যপরিচায়িকা।

২য়। এই শ্রেণী পদার্থগণের গুণ ও ধর্ম্ম পরিচায়িকা। যেমন,—

স্যাং=উপর
সি=নীচ
ই=এক
কুয়ান্=সরল।

ইত্যাদি, এইরূপ শব্দ সকল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাতে আবার যে সকল শব্দ উপমা ও রূপক প্রভৃতির পরিচায়ক তাহাও বিন্যস্ত হইয়াছে। যেমন, এক চতুষ্কোণকে এক রেখা দ্বারা মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত করিলে তাহার অর্থ—মধ্য হয়, অথবা দ্বিধা বিভক্ত এমন কোন পদার্থকে বুঝায়। সেই কথা আবার উপমা স্থলে, ন্যায়-পরতা, ধার্ম্মিকতা, সরল-হৃদয়তা ইত্যাদি বোধক হয়।

৩য়। সংযুক্ত অক্ষর সকল এই শ্রেণী ভুক্ত। দুইটী শব্দের যোগে আর একটী তৃতীয় শব্দ সমুৎপন্ন হয়, এবং তাহার অর্থও বিভিন্ন হইয়া থাকে—যেমন,—

জিন=মানুষ, ইয়েন্=বাক্য } সিন্ অর্থাৎ সরল-হৃদয়, হৃদয়
জি=সূর্য্য, ইউঙ্গ=চন্দ্র } মিঙ্ অর্থাৎ জ্যোতিঃ তেজঃ
চং=মধ্যস্থান, সিন্=হৃদয় } সিঙ্ অর্থাৎ বিশ্বস্ততা
ইউল=কর্ণ, চে=বন্ধকরা } চি অর্থাৎ লজ্জা
শি=মন্দির, ইয়েন=বাক্য } শি অর্থাৎ কবিতা, ছন্দঃ
ফেন্=বিভাগ করা, পেই=ধন } পিন্ অর্থাৎ দরিদ্রতা
কিউ=উচ্চ, মা=ঘোটক } থিউ অর্থাৎ গর্ব্বিত
তেন্=ক্ষেত্র, লি=বল } নান্ অর্থাৎ পুরুষ জাতি

এইরূপ অনেক আছে, কিন্তু এ সব স্থলে যেমন অনেকটা বুঝিয়া লইতে পারা যায় কিন্তু অনেক স্থানে এমন সব যুক্ত কথা আছে যে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। সেখানেও দুই কথা হইতে আর একটী উৎপন্ন হয় তাহার অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ, কিরূপে যে সে অর্থ সম্পন্ন হইল তাহা কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না।

৪র্থ। যাহাদের অর্থ ও স্বর বা উচ্চার্য্য শব্দ উভয়েই একত্রে বুঝাইয়া থাকে সেই সকল কথা এ পর্য্যায়ের অন্তর্গত। চেতন ও অচেতন এ উভয়বিধ পদার্থই এই শ্রেণী-ভুক্ত—এখানে দুইটী শব্দ একত্রে সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। একটী জাতিবাচক, আর একটী তাহার স্বর বা তাহার উচ্চার্য্য শব্দ-বাচক, যেমন,—

সুই=জল, কুঙ্=কার্য্য } কিয়াঙ্ অর্থাৎ দ্রুতগতি স্রোতস্বিনী, চীনেরা বলে জল স্রোত বহিয়া

চলিলে, কিয়াঙ্, ইত্যাকার শব্দ করিয়া থাকে।

হো = নদী }
সুই = জল } হো অর্থাৎ নদী

এখানে 'হো' নাম ও শব্দ উভয় ব্যঞ্জক।

জীব রাজ্যের নানাবিধ বস্তুকে যখন বুঝাইতে হইবে তখন একটী জাতি-বাচক শব্দ, আর যে বস্তুবিশেষকে বুঝাইবে তাহার নাম ও স্বর-ব্যঞ্জক আর একটী শব্দ এ উভয়ের যোগে একটী তৃতীয় শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেখানে প্রথমটীর লোপ হয়, আর সেই নাম ও স্বর এই উভয় ব্যঞ্জক শব্দটীই বর্ত্তমান থাকে। যেমন, পক্ষীবাচক শব্দের উত্তর নাম ও স্বর ব্যঞ্জক 'গো' শব্দের ব্যবহার হইলে 'গো' ইহাই থাকে এবং তাহার অর্থ হংস হয়—হংসের স্বরকে চীন ভাষায় 'গো' বলে।

৫। যে সকল শব্দের কতক অংশ পরিবর্ত্তিত করিলে অর্থের সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটে, যে সকল শব্দের নাম পরিবর্ত্তিত হইলে অর্থের ও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং যাহারা উপমা প্রভৃতি রূপক স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহারাই এই পর্য্যায়ে সংগৃহীত হইয়াছে। বিদেশীয় লোকেরা এই সব শব্দের প্রকৃতি অতি সহজে স্থির করিয়া লইতে পারে না, আবার ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক—এক কথায় যে কত অর্থ বুঝাইতে পারে তাহা বলা যায় না। এই সকলেরই জন্য ভাষা এত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা অনেক দিন এই ভাষার আলোচনা করিয়াছে—যাহারা ইহার অভ্যন্তরে গভীর প্রবেশ করিয়াছে তাহারাই ইহার প্রয়োগ চাতুরীতে কুশলী। দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখাইলেই ইহার দুরূহত্ব সহজেই লক্ষিত হইতে পারিবে। যে সংযুক্ত শব্দ সূর্য্য ও চন্দ্র এই দুই শব্দের পরস্পর সংযোগে উৎপন্ন হইয়া ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি, জ্যোতিঃ ইত্যাদি অর্থে পরিণত হয় সে উপমা বা রূপক স্থলে মহাশয়, উদার, সুপ্রতিষ্ঠ, সুযশাঃ প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। হৃদয় ও মৃত এই দুই শব্দ-দ্বয় একত্রে সম্বদ্ধ হইয়া যে একটী তৃতীয় শব্দের সৃষ্টি করে তাহা 'বিস্মরণ-শীল পুরুষ' এই অর্থের সমাবর্ত্তন করে। এইরূপ, বালিকা ও চিন্তা এই দুই অর্থবোধক শব্দদ্বয় দ্বারা চঞ্চল-চিত্ততা, মুখ এবং দশ এই দুই শব্দে প্রাচীনতা, বাক্য এবং লেহন এই উভয়ে তোষামোদ করা, পর্ব্বত এবং বলা এই উভয়ে শ্লাঘা করা, বুঝাইয়া থাকে। বরাহ বলিলে সাহস, ব্যাঘ্র বলিলে উগ্রতা, মাজিষ্ট্রেটের পত্নী বলিলে এক সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা রমণী বুঝাইবে।

৬ষ্ঠ। এ পর্য্যায়ে যে সকল শব্দ গৃহীত হইয়া থাকে তাহার কোন নিয়ম নাই অনেক গুলি দূর সম্বন্ধে কোন অর্থ-বিশেষের পরিচায়ক হয় এবং কেন যে অন্য কোন অর্থ না বুঝাইয়া সেই অর্থই বুঝায় তাহা, বিদেশীদের কথা দূরে থাকুক, চীনদের মধ্যে ভাষাকুশল পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠেরও বুদ্ধির অগম্য। বাঁশ এবং

স্বর্গ এই দুইএর সংযোগে হাস্য করা একথা কেন বুঝাইবে, কেনই বা জল এবং যাওয়া এই দুই কথায় আইন, কাষ্ঠে ও সূর্য্যে কেনই বা পূর্ব্ব দিক্, স্ত্রী লোক এই কথা তিন বার লিখিলে কেনই বা নষ্ট সতীত্ব বা কোন লোকের শত্রুর সঙ্গে যোগ দেওয়া এরূপ বুঝাইবে তাহা তাঁহারা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না, কিন্তু এই পর্য্যায়েই এমন কতক গুলি শব্দ আছে যাহাদের শব্দশক্তি একটু ভাবিলেই বুঝিয়া লইতে পারা যায়। আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, কেন মদ ও অঙ্গুরীয়ক এই দুই কথায় বিবাহ বুঝায়, কেন বালিকা ও দণ্ডায়মান হওয়া এই দুই কথায় রক্ষিতা নায়িকা বা নীচ পদবীর স্ত্রী বুঝায়, কেনই বা স্ত্রীলোক ও পীড়া এই দুই কথায় মৃত্যু বুঝায়। কারণ চীনদেশের রীতি এই যে, বিবাহের সময়ে বর কন্যাকে মদ উপহার দেয় এবং অঙ্গুরীয়ক বিবাহবন্ধক চিহ্ন বলিয়া স্বীকৃত হয়। সুতরাং এই দুই কথায় বিবাহ বুঝান অসম্বদ্ধ নহে, যখন কোন নায়িকা তাহার নায়কের প্রতি অনুরক্তা অথবা কোন দাসী প্রভুর সেবা-তৎপরা হইয়া তাহার বশতা স্বীকার করিতে যায় তখন সে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে। সুতরাং এই দুই কথায় রক্ষিতা বা নীচপদবীস্থা রমণী বুঝাইতে পারে। প্রবাদ আছে এক সময়ে কোন সম্রাটের রোগ চিকিৎসকগণের অসাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু না করিয়া তাঁহাকে মরিবার সময় একজন স্ত্রীলোকের হস্তে বিন্যস্ত করা হইয়াছিল। সুতরাং পীড়া ও স্ত্রী উভয়ের মৃত্যু এই অর্থ বুঝান অসঙ্গত বোধ হয় না। এ সকল স্থলে অর্থ কতক প্রতিপন্ন হয় কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

চীন ভাষায় এই ছয় পর্য্যায়ে সমুদয় শব্দ বিভক্ত হইয়াছে। কিছু দিন হইল চীন জাতিরা নিজভাষাকে আরও বৈজ্ঞানিকরীতির অনুসারিণী করিবে মনে করিয়া উক্ত বিভাগের কতক পরিবর্ত্তন করিয়াছে এবং কতকগুলি মূল শব্দ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তদনুসারে কথার শ্রেণী-বিভাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই সকল মূলশব্দের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ২১৪টী। এই বিভাগানুসারে একটী বিশেষ সুবিধা এই যে, অভিধানে কোন কথার অন্বেষণ করিতে গেলে অতি সহজেই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারা যাইবে। স্নেহ, মমতা, প্রেম, শোক, দুঃখ, ক্রোধ প্রভৃতি সমুদয় শব্দের মূল হৃদয় সুতরাং সমুদয় হৃদয় এই মূল শব্দের অন্তর্গত। সাগর, হ্রদ, নদী, গভীরতা, স্বচ্ছতা প্রভৃতি শব্দের মূল জল সুতরাং সমুদয়ই জল এই মূল শব্দের অন্তর্গত। ইয়েন এই একটী মাত্র শব্দের যোগে অনেক গুলি শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে যথা, পাঠ করা, কথা কহা, তর্ক ও পরামর্শ করা ইত্যাদি। হস্ত দ্বারা যত কর্ম্ম সম্পাদিত হয় সমুদায়েরই মূল হস্ত সুতরাং সে সমুদয়ই এই শব্দের অধীন।

ভবিষ্যৎ-কালবাচক প্রত্যয় দুইটী—'ইয়াউ' আর 'চংলে'। ইহারা ক্রিয়া-পদের পূর্ব্বে বা পরে উভয় স্থলেই বসিতে পারে।

ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা অর্থে 'ইয়াউ' আর শুদ্ধ ভবিষ্যদর্থে 'চংলে' প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা 'গে' = ভালবাসি,*

বর্ত্তমান	অতীত	ভবিষ্যৎ
গে	গে-লিউ	ইয়াউ-গে বা চাংলে-গে

গো গে = আমি ভালবাসি, গি গেলিউ আমি ভাল বাসিয়াছি বা ছিলাম।

গো ইয়াউগে বা চাংলে গে = আমি ভাল বাসিবই বা পরে বাসিব।

নঞর্থে 'মো' এবং 'পু' ব্যবহৃত হইয়া থাকে—মো ক্রিয়াবাচক পদের পূর্ব্বে এবং পু বিশেষণপদের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয়।

ইউ = পাওয়া, মোইউ = না পাওয়া

হাও = উত্তম, পু-হাও = মন্দ

ইহাই চীনদিগের সাধুভাষা। চলিত ভাষা উক্ত সাধু ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই ভাষা একমাত্রিক। সর্ব্ব-সমেত ৩৩০টী একমাত্র শব্দ এই চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এরূপ প্রত্যেক, শব্দের পূর্ব্বে সচরাচর ব্যঞ্জন বর্ণ এবং শেষে স্বরবর্ণ শ্রুত হইয়া থাকে। কখন কখন দুই ব্যঞ্জন বর্ণে মাত্রার শেষ হয়। স্বরগত বৈষম্যে এই ৩৩০টী শব্দ ক্রমে ১৩০০টী শব্দে বিস্তারিত হইতে পারে। এই সকল এক-মাত্রিক শব্দ বাক্যে বা পদে স্ব স্ব অবস্থানভেদে কর্ত্তা, ক্রিয়া, কর্ম্ম ইত্যাদি-দ্যোতক হয়। ইহা ব্যতীত চীনেরা নিজের মনোগত ভাব আকার ইঙ্গিতেও অনেকটা প্রকাশ করিয়া থাকে। অনেক সময়ে বিভিন্ন ভাব প্রকাশের জন্য তাহারা এই সকল শব্দের সঙ্গে কতক গুলি প্রত্যয়, বিভক্তি ও উপসর্গ যোগ করিয়া থাকে। যথা—

'গে' ভালবাসা

গে-তি = প্রণয়ের, ভালবাসার।

হউ-গে = প্রণয়ের উদ্দেশে, বা নিমিত্তে।

তুঙ্-গে = প্রণয় হইতে বা দ্বারা।

দুই বা বহু বুঝাইতে হইলে এক শব্দ দুই বার উচ্চারিত হইয়া থাকে যথা,—

ইন = মনুষ্য।

ইন্-ইন্ = মনুষ্যগণ।

তু-ইন্ = লোকদল।

তু-তু ইন্ = অনেকলোকদল।

গুণবাচক শব্দ হইতে বিশেষ্যকে পৃথক জানাইবার নিমিত্ত অনেক সময়ে শব্দের উত্তর 'সে' এই অব্যয় শব্দ প্রযুক্ত হয়। যথা,

পাই-সে = নল

ফ্যাং-সে = গৃহ

ইয়া-সে = বসিবার স্থান।

'তি' বিভক্তি যেমন বিশেষ্যের উত্তর তেমনি আবার সর্ব্বনাম ও বিশেষণের

* 'গে' প্রকৃত ধাতু। ইহার বর্ত্তমান কালের উত্তম পুরুষে কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

এ সকল স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই ২১৪টী মূল শব্দের প্রায় অর্দ্ধেকের কোন অর্থই নাই, কেন যে তাহারা মূল স্বরূপ গৃহীত হয়, কেমন করিয়াই বা অন্যান্য শব্দ তাহাদের অধীন হয়, তাহা কোন মতেই নির্ণয় করিতে পারা যায় না। এই সমুদয় মূল শব্দ সংযুক্ত শব্দের বামে থাকে। এই ২১৪ টী মূল শব্দের সমুদয়ই সচরাচর ব্যবহৃত হয় না—তাহাদের মধ্যে ১৫০টী মাত্র কার্য্যোপযোগী। চীন ভাষায় সর্ব্ব সমেত প্রায় ৪০,০০০ শব্দ, এই ২১৪টী মূল শব্দের অধীন। ইহার মধ্যে ২৫০০০ শব্দ ৬০ টী মাত্র মূল শব্দের অন্তর্গত, ১৪২৩ শব্দ উদ্ভিজ্জ এই শব্দ মূলক; ১৩৩৩ জল এই শব্দ মূলক ইত্যাদি। এই সকল শব্দ নিতান্ত বহুল হইলেও চীন অভিধানে তাহারা এমনি শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে যে, মূল শব্দগুলিরই অর্থবোধ হইলে প্রায় সমুদয় শব্দের অর্থ অধিগত হইতে পারে।

চীনেরা কোন শব্দের গুণ বা ধর্ম্ম বুঝাইতে ইচ্ছা করিলে সেই শব্দটীর নিম্নদেশে কোন একটী চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকে। জল লবণাক্ত কি কটু কি তিক্ত তাহা বুঝাইতে গেলে তাহারা জল এই শব্দের নিম্নদেশে সেই চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই চিহ্নের অবস্থানভেদে তাহার বিভিন্ন অর্থ প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু অন্যান্য আক্ষরিক ভাষায় কোন মতেই সেরূপ ঘটিতে পারে না।

চীন ব্যাকরণ অতি অল্পই। অধিকের আবশ্যকও নাই। কারণ যখন লেখার উপর, অক্ষরের অবস্থান-তারতম্যের উপর, অর্থ-বোধ নির্ভর করিতেছে—যখন অর্থ-বোধ কেবল এক-মাত্র দৃষ্টিসাপেক্ষ তখন ব্যাকরণ-প্রণালীর তত প্রয়োজন কেনই বা হইবে?

চীন ভাষায় সর্ব্বনাম শব্দ, ক্রিয়া, কাল প্রভৃতির সম্বন্ধে নিম্নে কিছু সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে;—

চীন সর্ব্বনাম

গো=আমি

নে=তুমি

তা=তিনি

মুন শব্দের যোগে ইহাদের বহুবচন হয়, যথা,

গো-মুন=আমরা

নে-মুন=তোমরা

তা-মুন=তাহারা

চে-কু, এবং নো-কু ইদম্ এবং অদস্ শব্দ বাচক।

চীন ভাষায় বর্ত্তমান, অতীত, ও ভবিষ্যৎ এই তিনটী মাত্র কাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতীত কালে বা ভবিষ্যৎ কালে বর্ত্তমান কালের ক্রিয়ার উত্তর আর একটী নূতন প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। অতীত কালে আর ও একটু বিশেষ এই যে কর্ত্তা কারকেরও আকৃতি-গত পরিবর্ত্তন ঘটে।

'লিউ' প্রত্যয় অতীত কালে হয়। সচরাচর পরেই বসে।

উত্তর প্রযুক্ত হইয়া সম্বন্ধ বুঝাইয়া থাকে। যথা,

তা=তিনি বা সে,

তা-তি=তাহার

চলিতভাষায় কথা বার্ত্তার সময়ে লিঙ্গপ্রভেদের অতি অল্পই আবশ্যক হয়।

'ন্যান' পুংলিঙ্গ বোধক। যথা, ন্যান-ইন=পুরুষ।

'নিউ' স্ত্রীলিঙ্গ বোধক, যথা,

নিউ-ইন=স্ত্রী। আর কোন কিছু না থাকিলে ক্লীবলিঙ্গ হয়।

'কেঙ' ও 'তোয়া কেঙ' এই দুই প্রত্যয় তর ও তম বোধক।

হাও=উৎকৃষ্ট।

কেঙ্ হাও=উৎকৃষ্টতর।

হাও-তোয়া-কেঙ্=উৎকৃষ্টতম।

শুদ্ধ শুনিতে ভাল লাগিবে বলিয়া প্রত্যয় সকলের প্রয়োগ কখন পূর্ব্বে বা পরে হইয়া থাকে।

চীন ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে নানাবিধ পুস্তক আছে। যে ব্যক্তি যত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারিবে সে তত পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইবে। এদেশের শিক্ষাপ্রণালী পৃথিবীস্থ অন্যান্য সমুদয় দেশের অপেক্ষা অধিক কঠোর ও রাজশাসন-পরতন্ত্র। যাহারা স্ব স্ব পুত্রদিগকে অতি বাল্যকাল হইতে বিদ্যালয়ে না দিবেন তাহারা রাজ-দ্বারে দণ্ডিত হইয়া থাকেন। শিক্ষা-সম্বন্ধে এই কঠোরতা মহাত্মা কনফিউসসের সময় হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ১৫ বৎসরের ন্যূনে কোন মতেই ছাত্রগণ বিদ্যায় শেষ উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারে না। চীন ভাষায় সর্ব্ব সমেত পাঁচ খানি প্রাচীনতম ও বিস্তৃততম গ্রন্থ আছে। সে গুলি যাঁহারা পাঠ করিয়া অভ্যস্ত করিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই সর্ব্বোচ্চ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত। সেই সকল গ্রন্থের নাম লে-কে, ইহে কিং, সে-কিং সু-কিঙ্, চন-সিউ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মৃণ্ময়ী—কপালকুণ্ডলার উপ-সংহার ভাগ। 'কপালকুণ্ডলার গ্রন্থ-কার বিখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুমতি' গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃতযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। গ্রন্থকার তরুণ-বয়স্ক। এই বয়সে তিনি যে এরূপ সুদীর্ঘ গ্রন্থের প্রণয়নে সক্ষম হইয়াছেন ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। তাহাতে আবার তিনি ইহাতে 'বঙ্কিম বাবুর রসময়ী' লেখনীর অনেক মাধুর্য্য পরিরক্ষিত করিয়াছেন। যিনি বঙ্গীয় আখ্যায়িকা-লেখকদিগের চূড়ামণি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছেন, সেই বঙ্কিম বাবুর 'কপাল-কুণ্ডলা' তাঁহার 'মৃণ্ময়ী'

দ্বারা যে বিকৃত দশাপন্ন হয় নাই ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে। গ্রন্থের রচনা-পারিপাট্য অতি সুন্দর। ভাষা অতি বিশুদ্ধ। কিন্তু গ্রন্থকার গ্রন্থ বিস্তৃত করিতে গিয়া স্থানে স্থানে, পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইয়া পড়িয়াছেন। উমাপতি ও মুক্তকেশী বিষয়ক প্রাসঙ্গিক উপন্যাসটী অকারণে অতিশয় সুদীর্ঘ করা হইয়াছে। নবকুমার ও পদ্মাবতীর প্রণয় সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা সর্ব্বত্র সমীচীন বলিয়া আমাদের বোধ হইল না। যাহাহউক পূর্ব্বোক্ত দুই একটী দোষ সত্বেও ইহা যে এক খানি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে যাঁহারা বঙ্কিম বাবুর কপালকুণ্ডলা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা যেন একবার অবশ্য 'মৃণ্ময়ী' পাঠ করেন।

বিজ্ঞান-সূত্র—ভাঙ্গামোড়া-নিবাস। শ্রীঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। ইহাতে বিজ্ঞান-বিষয়ক কতিপয় সত্য প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বিষয় গুলি সুকুমারমতি বালকদিগের অনায়াসবোধ গম্য ও বিশেষ হিতকর। মুদ্রাঙ্কন-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে ইহা বালকগণের সুপাঠ্য পুস্তক হইবে।

কবিতা-কুসুম-মালিকা—শ্রীকুঞ্জবিহারী সাহা কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা গুপ্ত-যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা মাত্র। কবি বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন "সময়ে সময়ে কাব্যোদ্যান হইতে যে কবিতা-কুসুম গুলি চয়ন করিয়াছিলাম, অদ্য সেই কুসুমচয়ে এক গাছি মালা গাঁথিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজের কোমল করে ভক্তি-মলয়জ-সহযোগে অর্পণ করিলাম। কিন্তু যে সকল কুসুমে মালা গাছটী গুম্ফন করিয়াছি, তাহার সকলই মকরন্দ-বিরহিত, কিসে যে সমাজের চিত্তাকর্ষণ করিবে, তাহা বলিতে পারি না; কেবল এই মাত্র ভরসা যে, অকিঞ্চিৎকর হইলেও সাধু লোকেরা ভক্তি-দত্ত উপহার সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন।" গ্রন্থকার স্বয়ং আপনার কবিতা-কুসুমের মকরন্দ-হীনতা স্বীকার করিয়া আপনার সরলতা ও ঔদার্য্যের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। সেই জন্যই আমরা তাঁহার কবিতা-কুসুম মকরন্দবিরহিত হইলেও সাদরে গ্রহণ করিলাম। আশা করি তিনি ভবিষ্যতে মকরন্দ-পূর্ণ কবিতা-কুসুমে মালা গাঁথিতে সক্ষম হইবেন।

দুঃখমালা—কোন হিন্দুমহিলা প্রণীত। একখানি পদ্যময়। ভ্রাতৃবিয়োগে ভগিনীর দুঃখ ছন্দোময়ী রচনায় গ্রথিত দেখিতে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় পুলকিত না হয়? আমরা সেই জন্য আশা করি যে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই ইহা পাঠ করিয়া নবীনা কবির শ্রম সফল করিবেন।

সন ১২৮১ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

ভাদ্র মাস।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস কলিকাতা ৩৲
" নীলকান্ত চৌধুরী ঐ ৩৲
" বিপীন বিহারী মুখোপাধ্যায় ময়মনসিংহ ১৸৶০
" ভবতারা ঘোষ কলিকাতা ৩৲
" গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ৯৵০
" তারাচরণ কবিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চট্টগ্রাম ৩৶০
" গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পাবনা ৩৷৵০
" কালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায় ত্রিহুত ৩৷৵০
" দীননাথ চট্টোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ ৷৵১০
" তারিণীকান্ত রায় দিনাজপুর ৩৷৵০
" মুনসী সেতারুদ্দীন মহম্মদ বোদা চন্দন বাড়ি ১৵১০
" নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় চুচুড়া ৩৷১০
" যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী সিউড়ি ৩৷৵০
" কৈলাসচন্দ্র দাস কাছাড় ৩৷৵০
" কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হরিশঙ্করপুর ১৷৶০
" হৃদয়নাথ দাস গৌহাটী ৩৷৵০
" পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী রংপুর ৩৷৵০

শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার রায় দেওয়ানবাড়ি চট্টগ্রাম ৩৷৵০
" রামচরণ ঘোষ কলিকাতা ১৸০
" চণ্ডীচরণ সিংহ জামালপুর ৩৷৵০
" দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ৩৲
" ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ৩৲
" গোপালচন্দ্র বসু কলিকাতা ১৲
" বসন্তলাল রায় ঐ ৩৲
" অনাথবন্ধু রায় পাবনা ২৲
" শচিনন্দন দত্ত কাটওয়া ২৸৵০
" গিরীশচন্দ্র রায় চট্টগ্রাম ৩৷৵০
" পূর্ণচন্দ্র মিত্র কৃষ্ণনগর ২৲
" প্রসন্নকুমার বসু ময়মনসিংহ ৷৶১০
" কালীমোহন চক্রবর্ত্তী বরিশাল ৩৶০
" শ্যামলাল সেন গুপ্ত বরিসাল ৩৶০
" মথুরেশচন্দ্র দেব রায় ছান্দবা ৩৶০
" শ্রীপতি রক্ষিত আমলাসদরপুর ৩৷৵০
" শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইটা ১৲
" নবচন্দ্র রায় চট্টগ্রাম ৩৷৵০
" প্রাণকৃষ্ণ ভাদুড়ী কলিকাতা ৩৲
" দক্ষিণেশ্বর মালীয়া রাণীগঞ্জ ৩৷৵০

" দেবীবর চট্টোপাধ্যায়
বাগহাট ৩।৵০

" মতিলাল বাগ্‌চি
বলিহার ১॥৵১০

" হরচন্দ্র চৌধুরী জমিদার
ময়মনসিংহ ৩।৵০

" প্রসন্নকুমার গোস্বামী
খানাকুল কৃষ্ণনগর ২৸৵০

" অমৃতলাল দে জয়পুর ৩।৵০

" গিরীশচন্দ্র রায় চাম্পারণ ৭৸৵০

" যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী
কলিকাতা ২৲

" জগদীন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী
জমিদার
নবাবগঞ্জ ৩।৵০

" অক্ষয়কুমার দত্ত কলিকাতা ৩৲

" রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
ত্রিহুত মজাফরপুর ৩৵০

" শ্রীমতী শশীকলা রায়
ঢাকা ৩৵০

" বরদাকান্ত সেন ঢাকা ৩।৵০

" বেনওয়ারীলাল নন্দী
বৈদ্যপুর ১৵১০

" হরনাথ রায় ঢাকা ৩৵০

" কৃষ্ণকালী মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ ৩৲

" ভবানীকিশোর ভায়া
জোক নালা গ্রাম ৩।৵০

" শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা ৩৲

" রামগোপাল সেন কৃষ্ণনগর ২৲

" রাওযোগেন্দ্র নারায়ণ রায়
শ্রীমন্তপুর ৩।৵০

শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
দিনহাটা পরমানী ৩।১০

" নন্দকৃষ্ণ বসু কলিকাতা ৩৵০

" দুর্গাচরণ রক্ষিত কলিকাতা ৩৲

" মধুসূদন দাস কলিকাতা ৩৲

" কালীকুমার চক্রবর্ত্তী
জাহ্নবী ৩।৵০

" ভবানীচরণ বসু কলিকাতা ৩৲

" উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
কুচবেহার ৩।৵০

" রামচন্দ্র চৌধুরী কুচবেহার ৫৲

" রামকমল বন্দ্যোপাধ্যায়
জমিদার মাটিয়ারী ৩।৴০

" বিপীন চন্দ্র সেন
ঢাকা ৩।৵০

" ভূষণচন্দ্র চৌধুরী ইছাপুর ১৸৵০

" অমৃত লাল সরকার
কলিকাতা ৩৲

" চন্দ্রবিষ্ণু দে
ঐ ৩৲

" জগদ্বন্ধু চট্টোপাধ্যায়
ঐ ১০

" কিশোরী মোহন রায়
রামপুর বোয়ালীয়া ৩৵০

" নগেন্দ্র নাথ সরকার
কলিকাতা ৩৲

" রামনাথ ভট্টাচার্য্য
ধানোয়ার ৩।৵০

" ক্ষেত্র নারায়ণ রায়
ধানোয়ার ১॥৵০

" লোহিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
ব্রাহ্মণ বাড়িয়া ৩।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল মজুমদার
কলিকাতা ১৲

" রেবারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ষ্টারণ
কলিকাতা ৩৲

" শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ডেঃ মাজিষ্ট্রেট
ঢাকা ৩।৵০

" পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
জামালপুর ২৲

" গোপাল চন্দ্র সরকার
জামালপুর ২৲

" প্রসন্ন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঢাকা ৩।৵০

" মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐ ৩।৵০

" শরচ্চন্দ্র বসু
ঐ ৩।৵০

" বামাচরণ রায়
দিনাজপুর ৩।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
দিনাজপুর ৩।৵০

" তারাপ্রসন্ন সান্ন্যাল কাশী ৩।৵০

" দুর্গাচরণ গুপ্ত
এসানশোল ৩৸০

" অন্নদাপ্রসাদ সুর কলিকাতা ১৲

" শশীভূষণ সেট কলিকাতা ৩৲

" শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইটা ১৴

" কিশোরীলাল সরকার
কলিকাতা ১।।০

" শারদানাথ মজুমদার
রাধানগর ৩।৵০

" উমাচরণ দত্ত গোয়ালপাড়া ৩।৵০

" হরেরাম ঘোষ চৌধুরী
যশোহর ৩৵০

" জ্ঞানেন্দ্রমোহন রায়
কলিকাতা ৩৲

বিজ্ঞাপন।

আমরা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্য আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিক সংখ্যায় প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। পাঠ যতদূর পরিশুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহা হইবে; যত্নের ত্রুটি হইবে না এবং স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দ ও দুরূহ পদের অর্থ দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক কবির এক একটী সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, কাব্যের গুণবিচার ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইবে। চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে; মুদ্রাঙ্কন যাহাতে পরিপাটী হয় তাহাও করা যাইবে। কবিগণের সমগ্র রচনা প্রচারিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু সাধারণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য নিতান্ত অশ্লীল ও ও সুরুচিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যক্ত হইবে। প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত যে কোন ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শারদাচরণ মিত্র এম্ এ,
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্
কদমতলা, চুঁচুড়া।

শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্র
৩০ নং রাজা কালীকৃষ্ণের লেন
শোভাবাজার কলিকাতা।

—০—

আগামী শনিবার ৪ঠা আশ্বিন ১৯এ সেপ্টেম্বর গ্রেট ন্যাসনেল থিয়েটারের প্রথম অপেরা হইবে। এবং তৎসম্বন্ধীয় সতী কি কলঙ্কিনী বহি ক্যানিংলাইব্রেরী কলেজ ষ্ট্রীট; বাগবাজার শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন নিয়োগী ও বিডেন ষ্ট্রীট গ্রেট ন্যাসনেল থিয়েটারের বাটীতে বিক্রী হইবে প্রতি খণ্ড পুস্তকের মূল্য ৷৷০ আনা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রেট ন্যাসনেল থিয়াটারের
ম্যানেজার।

—০—

শত্রুসংহার।

এই নাটক গ্রেট ন্যাসন্নেল থিয়েটার প্রোপ্রাইটর শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন নিয়োগীর ব্যয়ে ও যত্নে মুদ্রিত হইল। অন্য কেহ ইহা অভিনয় করিতে পারিবেক না।

শ্রীহরলাল রায়।

বিজ্ঞাপন।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এই কয়টী প্রধান, দীননাথ, তারানাথ, বেচারাম, ফটিকচাঁদ, জয়রাম, পুরুষগণ ; কমলিনী কুমুদিনী ও চিন্তা, স্ত্রীগণ।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। কবিতা ও গানগুলি সরস ও সুন্দর হইয়াছে।

সোম প্রকাশ।

The General Style of the Book is good and unaffected.

INDIAN DAILY NEWS.

নাটক খানি অতি সুললিত ও সু ভাষায় লিখিত। অধুনা এরূপ নাটক অতি বিরলপ্রচার। রচনাটী কবিসুলভ কৌশল ময়।

কুলীনকন্যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরিত্র নায়ক দীননাথ। কমলিনীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ, প্রগাঢ়, বিশুদ্ধ, পবিত্র। কমলিনীর চরিত্র সরলতাময়, তাঁহার প্রতি কথায় প্রতি আচরণে সরলতা কমলিনী সরলতা নির্ম্মিতা। তারানাথের স্ত্রী আমোদময়ী। কুমুদ যেখানে যায় কুমুদ সেই থানেই যেন আমোদরাশি ছড়াইতে থাকে।

এডুকেশন গেজেটের চড়কডাঙ্গাস্থ লেথক।

কুমুদিনীর প্রফুল্লতা ও রহস্য প্রিয়তা, তারানাথের মিত্র ভাব, বেচারামের কর্ত্তব্য জ্ঞান ধর্ম্মভাব, উন্নত শিক্ষা ও কৌশল, জয়রামের মর্য্যাদাবোধ তাঁহার স্ত্রীর বাৎসল্য এবং কমলিনীর প্রণয় ও সতীত্বধর্ম্ম তাহাদিগের চরিত্রে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত আছে।

কবি নাট্যনিয়ম সকল পরিজ্ঞাত আছেন, ইহা রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। রচনার নিপুণতা আছে বিশেষতঃ কবিতা গুলি অত্যন্ত সুমধুর লাগিল। স্ত্রীলোকের কথা গুলিও অনুরূপ বোধ হইল। দীননাথের অভিনয় বিশিষ্টরূপে চিত্তাকর্ষণ করিবে।

ভারত সংস্কারক।

অদৃষ্টবাদ।

আমাদিগের মহাভারত ও অপরাপর পুরাণাদি অদৃষ্টের অস্তিত্ব এতদ্দেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে। গৃহে স্ত্রীলোকের মুখে,—বাহিরে বিজ্ঞের মুখে,—রোগ শোক, বিপদ্‌ সম্পদ্‌, সকল অবস্থায় সর্ব্ব জনের মুখে,—এই বিশ্বাসের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সর্ব্ব সময় ও সর্ব্ব স্থানে না হউক, এই বিশ্বাস দ্বারা অনেক সময়ে ও অনেক স্থলে বিস্তর অনিষ্ট ঘটিতেছে। দীন ও দরিদ্র, অক্ষম ও বিপদাপন্ন, জরাগ্রস্ত ও শোকার্ত্ত এবং স্ত্রীলোকেই প্রায় অদৃষ্টের উপর অনেক বিষয়ে, নির্ভর করিয়া বৃথা কষ্ট পাইয়া থাকে। হয় ত চেষ্টায় সে কষ্ট নিবারণ হইতে পারিত। যে চেষ্টা ও উদ্যোগ দ্বারা কার্য্য-সিদ্ধি হয় সেই চেষ্টা ও উদ্যোগের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিয়া এই বিশ্বাস মানবের কতই না অমঙ্গল সাধন করিতেছে! নিরুদ্যোগিতা এই বিশ্বাসের বিষময় ফল। এই বিশ্বাসটি অপনীত না হইলে নিরুদ্যোগিতা ও তিরোহিত হইবার নহে। এক্ষণে আমরা অদৃষ্টের অস্তিত্ব খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলামঃ—

অদৃষ্টবাদিরা বলেন, ঈশ্বর মানিলে অদৃষ্ট মানিতে হয়। অদৃষ্টবাদ যে ঐশ্বরিক জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত আমরা তাহা স্বীকার করি না। আমরা বরং স্বীকার করি যে সেই জ্ঞানের অস্পষ্টতা নিবন্ধন এই বিশ্বাসটি উৎপন্ন হয়। অদৃষ্টবাদিরা স্বীকার করেন ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। আমরাও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহার এই সর্ব্বজ্ঞত্বের ভাব আমরা কোথা হইতে প্রাপ্ত হই? ঈশ্বরের অনন্ত ভাবই ঐশ্বরিক জ্ঞানের মূল ভাব। আমরা প্রথমে ঈশ্বরকে অনন্ত বলি। তৎপরে যখন তাঁহার অনন্ত প্রকৃতিতে আমরা জ্ঞানভাব উপলব্ধি করি, তখন তাঁহাকে অনন্ত জ্ঞান বলিয়া অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না। যিনি অনন্ত জ্ঞান তিনি অবশ্য সর্ব্বজ্ঞ। অতএব সর্ব্বজ্ঞত্ব ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের সিদ্ধান্ত মাত্র। এখন দেখা যাউক এই মৌলিক অনন্ত-জ্ঞানের ভাব হইতে মানবের অদৃষ্ট ভাব উৎপন্ন হইতে পারে কি না।

অদৃষ্টবাদিরা যেরূপ ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলেন তাহার অর্থ আমরা এইরূপ বুঝি, যে ঈশ্বর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ হইয়া সৃষ্টির কার্য্য কারণ স্থির করিয়া দিয়াছেন। ঈশ্বর এই ত্রিকাল জানেন বটে, কিন্তু এই ত্রিকালের জ্ঞান বলিলে আমাদিগের মনে যে প্রকার ভাবের উদয় হয়, ঈশ্বরের ত্রিকালজ্ঞান ঠিক সেরূপ হইতে পারে না। আমাদিগের সমুদায় জ্ঞান পরিমিত। এজন্য আমাদিগের কালের ভাব উপলব্ধি হইতেছে।

আমাদিগের চিন্তা ও মনের ভাব-সমুদায় পর্য্যায়ক্রমে উত্থিত হইতেছে। বাহ্য জগতের ঘটনাসকল আমরা পর্য্যায়-ক্রমে দেখিতেছি ও অনুভব করিতেছি। অদ্য, কল্য, ও পরস্য সূর্য্যের উদয় দেখিতেছি এবং তাহার সেই ভাবে অস্ত-গমনও দেখিতেছি। ভাব ও চিন্তা সমুদায় যখন এই প্রকার পর্য্যায়ক্রমে একে একে অনুভব করি তখনই আমাদিগের মনে কালের ভাব উত্থিত হয়। যে স্থলে ভাব ও চিন্তা নাই সে স্থলে কালের ভাবেরও অভাব। অতএব আমাদিগের এমত কোন ভাব হয় না যাহা হয় ভূত, না হয় বর্ত্তমান না হয় ভবিষ্যৎ কালে স্থিত নহে। পরিমিত জ্ঞানের ধর্ম্মই এই যে তাহা কালব্যাপি। আমাদিগের কালের ভাব কিরূপে উদিত হয় সুবিজ্ঞ লক্ তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

পরিমিত জ্ঞান যদি কালব্যাপি হইল, অনন্ত-জ্ঞান তবে কালব্যাপি হইতে পারে না। পরিমিত বুদ্ধি মনুষ্যের নিকট চিরকাল আছে বলিয়া যে, অনন্ত জ্ঞান ঈশ্বরের নিকট চিরকাল থাকিবে এমত অনুমিত হইতে পারে না। ঈশ্বর-সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে কোন কালই নাই। তবে মনুষ্য-ভাবনার অধীন করিবার জন্য কেবল বলা যাইতে পারে যে তৎ-সম্বন্ধে শুদ্ধ বর্ত্তমান কাল অবস্থান করিতেছে। অনন্ত-জ্ঞান,—নিখিল সৃষ্টি একেবারেই ভাবিতেছেন, এবং অনন্ত-শক্তি,—একেবারেই সমুদায় সম্পন্ন করিতেছেন।

পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, যিনি অনন্তজ্ঞান তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। অনন্ত-জ্ঞানের কালত্রয় সম্ভাবিত না হওয়াতে, সর্ব্বজ্ঞেরও তাহা সম্ভবে না। কালের ভাব পরিমিত-মনের ভাবমাত্র। অদৃষ্টবাদির সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অনুভব-মধ্যে এই কালের ভাব বিলক্ষণ বিদ্যমান আছে। তাঁহার ঈশ্বরের অনুভাবকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, যেন তিনি ভাবিতেছেন, যে ঈশ্বর সমুদায় পার্থিব ঘটনাবলি পর্য্যায়-ক্রমে বিধান করিয়াছেন ও করিবেন। কিন্তু এই ঘটনাবলির পর্য্যায়ের অনুভব মানবীয় ভাব মাত্র। ঈশ্বর যে অনন্ত জ্ঞান দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার একেবারে অনন্ত ভাবে পর্য্যালোচনা করিতেছেন তন্মধ্যে পর্য্যায় নাই। মানব যদি ঈশ্বর হইত, তবে একদা এই অনন্ত পর্য্যালোচনা কিরূপ তাহা বুঝিতে পারিত। কিন্তু মানবীয় পরিমিত জ্ঞানের পর্য্যালোচনা যে প্রকার, ঐশ্বরিক পর্য্যালোচনা এবং অনুভব যে সে প্রকার নহে তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি।

ঈশ্বর আমাদিগের স্বাধীন ইচ্ছা ভ্রান্তি-স্বরূপ বৃথায় প্রদান করেন নাই। এই স্বাধীন ইচ্ছা মানবের এত প্রবল, যে তিনি অনায়াসে যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন। কিন্তু এই স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্য-সকল, অনন্ত-শক্তি ও অনন্ত জ্ঞান তাঁহার অনন্ত-কৌশল-বলে অনন্ত-মঙ্গলোদ্দেশে নিয়োজিত করিয়া লইতে পারেন। আমরা

সেই কৌশলের কার্য্য-প্রণালী জানিতে পারি না বটে, কিন্তু তজ্জন্য আমরা বলিতে পারি না, যে আমাদিগের কার্য্য-সমুদায় স্বাধীন ইচ্ছা হইতে উত্থিত হয় না। ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি থাকাতেই বরং আমাদিগের স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্য-সকল তাঁহার মঙ্গলোদ্দেশের সহিত সমঞ্জসীভূত হইতেছে। অন্যথা সে রূপ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

অদৃষ্ট মানিতে হইলে স্বাধীন ইচ্ছা বিষয়ক বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করিতে হয়। আমরা যদি স্বাধীন-ইচ্ছা-বিরহিত হই, তবে জড় জগৎ হইতে আমরা কিসে শ্রেষ্ঠ? উদ্ভিদ্-পদার্থ যে পরিমাণে অচেতন পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, স্বাধীন-ইচ্ছা-বিরহিত চেতন পদার্থও সেই পরিমাণে উদ্ভিজ্জ হইতে শ্রেষ্ঠ। প্রাণিজগৎ যদি কেবল ঘটনা-স্রোতের লীলা-স্বরূপ হইল, তবে সেই জগতের সহিত জড় জগতের প্রভেদ কি? তাহা হইলে এই প্রাণিপুঞ্জ-পরিপূর্ণ পৃথিবী একটি জড় জগৎ মাত্রে পরিণত হইল। এই পৃথিবী কেন, অদৃষ্টবাদীর মতে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডও ঘটনাধীন; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডও জড়জগৎ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু যে ঈশ্বর সেই নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ জড়জগতের অধিপতি তিনি অনন্তজ্ঞান ও অনন্ত-শক্তি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে জড়জগৎ পরিচালন করিতে অনন্তজ্ঞান ও অনন্তশক্তির প্রয়োজন কি? যাহা জড়-ভাবাপন্ন তাহা অবশ্য চিরকাল এক ভাবে থাকিবে, তাহার কিছুই ব্যত্যয় ঘটিতে পারে না। কোন যন্ত্র যদি স্বতঃই চিরদিন সমভাবে চলিতে পারে, তাহার বিকল হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহাতে নব বল-প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা না থাকে, তাহা হইলে, সে যন্ত্রের তত্ত্বাবধারণের জন্য এক জন সুবিজ্ঞ এবং ক্ষমতাশীল কারীকরের প্রয়োজন কি? অদৃষ্টবাদ-সঙ্গত জড়-ভাবাপন্ন ব্রহ্মাণ্ডকেও সেই রূপ যন্ত্র মনে করিতে হয়। সে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পর আর অনন্তজ্ঞান ও অনন্ত-শক্তির আবশ্যক হইতে পারে না। প্রাণিজগৎ যদি না স্বাধীন ভাবে কার্য্য করে, ঘটনা-স্রোতকে ফিরাইতে না পারে, স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে করিতে যদি বিপথগামী না হয়, ঈশ্বরের মঙ্গলোদ্দেশের বিপরীত দিকে না যায়, তবে জ্ঞান ও শক্তি কি লইয়া কার্য্য করিবে, কি লইয়া ব্যস্ত থাকিবে?

ঈশ্বরের আর একটি লক্ষণ এই যে তিনি অনন্ত-মঙ্গল-স্বরূপ। যিনি অনন্ত মঙ্গল তিনি অবশ্য পরম পবিত্র পুরুষ। পবিত্র-স্বরূপের কার্য্য-প্রণালী অবশ্য পরিশুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ হইবে। অদৃষ্টবাদীর মতে যখন জগতীয় ঘটনাবলী ও মনুষ্যের কার্য্যকলাপ ঈশ্বরের কার্য্য-প্রণালী মাত্র, এবং যখন পবিত্র-স্বরূপ ঈশ্বরের কার্য্য-প্রণালীও পরিশুদ্ধ ভিন্ন কখন অবিশুদ্ধ হইতে পারে না, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে মানব-জাতির কার্য্য-কলাপ কখন অপবিত্র হইতে পারে না।

যে হেতু মানবের কার্য্য-সমূহ অপবিত্র হইলে, পবিত্র-স্বরূপ ঈশ্বরের কার্য্য প্রণালী অপবিত্র হইল। তবে অদৃষ্ট-বাদীর মতে স্থিরীকৃত হইল যে মানবের কার্য্য-কলাপ সকলই পবিত্র। যাহা পবিত্র তাহার বিপরীত অবশ্য অপবিত্র হইবে। শ্বেত কখন কৃষ্ণ হইতে পারে না, এবং কৃষ্ণ কখন শ্বেত হইতে পারে না। অতএব এ সিদ্ধান্তও নিশ্চয় যে, পবিত্র ও অপবিত্র বিষয় কখন একই নহে, এক প্রকার ও নহে। প্রত্যুত উহারা সম্পূর্ণবিভিন্ন-ধর্ম্মাক্রান্ত। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরের কার্য্য-প্রণালী অবশ্য পরিশুদ্ধ হইবে। যাহা পরিশুদ্ধ প্রণালী তাহা একই দিকে যাইবে। ঈশ্বর যখন সৎ-স্বরূপ, তখন তাঁহার কার্য্য-প্রণালী কখন পরিবর্ত্তন-শীল হইতে পারে না। অর্থাৎ এই কার্য্য-প্রণালীর কখন অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। মনুষ্যের কার্য্যকলাপ আর ঈশ্বরের কার্য্যপ্রণালী যখন একই, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে মনুষ্যের কার্য্যকলাপ অপরিবর্ত্তনীয় এবং পরম পবিত্র, অর্থাৎ সেই কার্য্য সমূহ কখন পরিবর্ত্তিত ও অপবিত্র হইতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিক মনুষ্যের কার্য্যা-বলি কি আমরা এই রূপ ধারায় দেখিতে পাই? তাহার কার্য্যাবলী যদি দৈবঘটনা হইত, সে কার্য্যাবলিকে কখন বিপরীত-ধর্ম্মাক্রান্ত দেখিতাম না। ঐশী শক্তির কেবল যন্ত্র-স্বরূপ হওয়াতে সকল মনুষ্যের অভিলাষ, উদ্দেশ্য, রুচি, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি এবং কার্য্যনিচয় একই দিকে ধাবিত হইত, এবং একই ভাবাপন্ন প্রতীত হইত। মনুষ্যেরা ভ্রান্তিক্রমেও কখন বিপরীত পথে গমন ও বিচরণ করিত না। কিন্তু বস্তুতঃ কি আমরা তাহাই প্রত্যক্ষ করি? প্রত্যুত আমরা দেখিতে পাই, যে মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও কার্য্যনিচয়ে যেরূপ বৈষম্য এরূপ বৈষম্য অন্য প্রাণদিগের কার্য্যনিচয়ে নাই। মনুষ্য যেমন স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া কর্ম্ম করে সেরূপ অন্য কোন প্রাণীকে দেখিতে পাই না। মনুষ্য মনে করিলে যথেচ্ছাচারী হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর-নিয়মিত,অপরি-বর্ত্তনীয় ও পরিশুদ্ধ কার্য্য-প্রণালীতে কখন কি যথেচ্ছাচারিতা সম্ভব হইতে পারে?

অদৃষ্টে বিশ্বাস করিতে গেলে স্বীকার করিতে হইবে, যে আমরা যে সমস্ত কার্য্য করি, তাহা বিধির নির্বন্ধ, তাহা অবশ্য করিতে হইত, না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। দৈব কর্ত্তৃক যাহা অবশ্য-ম্ভাবী, মনুষ্য কর্ত্তৃক তাহা খণ্ডিত হইতে পারে না। যে কার্য্য হইতে মুক্ত হওয়া মনুষ্যের সাধ্যাতীত, সে কার্য্যের প্রশংসা নাই নিন্দাও নাই। সে কার্য্যের দোষ নাই, গৌরব ও নাই। তাহা ন্যায় নহে অন্যায় ও নহে। অতএব অদৃষ্ট মানিতে হইলে আমাদিগের ন্যায়-অন্যায়-বোধ, হিতাহিত-জ্ঞান, এবং সমুদায় ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বিসর্জ্জন দিতে হয়।

অদৃষ্টবাদী বলেন আমরা ঘটনার

অধীন। রোগ, শোক, তাপ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি আমাদিগের জীবনের সমুদায়-ঘটনা বৃহৎ জগৎ-ঘটনার ক্রম-মাত্র। সুতরাং জীবন-ধারণ ও মৃত্যু আমাদিগের প্রয়াসাতীত। রাম যদি এত বৎসর জীবিত থাকিবেন পূর্ব্বে অদৃষ্টদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, তবে রাম রোগ, শোক, দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা পাউন আর নাই পাউন কিছুতেই তাঁহার মৃত্যু নাই। কিন্তু যাহার নিয়তি শেষ হইয়াছে সেই হতভাগ্য ব্যক্তি সহস্রপ্রকার প্রয়াস পাইলেও তাহার নিধন কেহ নিবারণ করিতে পারে না। এই রূপ বিশ্বাস করিয়া যদি আমাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহা হইলে মানব-জাতির জীবন ধারণ করা সুকঠিন হইয়া উঠে। রোগে এবং বিপদে কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে আয়ুঃশেষ না হইতেই সকলকে অকালে কালগ্রাসে নিশ্চয় নিপতিত হইতে হয়। তাহা হইলে মানব-জাতির ধ্বংস হইতে অধিক কাল-বিলম্ব হয় না।

অদৃষ্টের প্রতি যাহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে তাহার যেমন পদে পদে দুঃখ ও বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, তদ্রূপ তাহার সুখও উন্নতি হইবারও অল্প সম্ভাবনা। অদৃষ্টে থাকিলে অবশ্য সুখ হইবে আমরা যদি এই ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট হই, তাহা হইলে আমাদিগের সে সুখের আশায় ত্বরায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। পৃথিবীতে যথোপযোগী পরিশ্রম না করিয়া অল্পসংখ্যক লোকই উন্নতির সোপানে উত্থিত হইয়াছেন। অদৃষ্ট যদি সত্য হইত ঈশ্বর আমাদিগের মনে লোভ, আকাঙ্খা, ও উচ্চাশাপ্রভৃতি বৃত্তিসকল প্রদান করিতেন না। তাহা হইলে পৃথিবীতে এত গোলযোগ, সংগ্রাম, ও রাজ্যবিপ্লব সংঘটিত হইত না। মানবজাতি বহুকাল ধরিয়া প্রত্যেকের এবং সমাজের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে যাহাকে অদৃষ্ট বলা যায়, তাহা ভ্রান্তিমাত্র, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে অলীক স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। অদৃষ্ট যদি সত্য হইত, তাহা অবশ্য পরীক্ষাতেও সত্য বলিয়া প্রতীত হইত।

অদৃষ্টবাদের খণ্ডন আমরা অধিকাংশই গৌণ প্রমাণ দ্বারা সাধন করিলাম। আমরা দেখিলাম কার্য্যক্ষেত্রে অদৃষ্টবাদের পক্ষ কক্ষীকৃত হয় না। ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া ও দেখিয়াছি, যে অদৃষ্ট সম্ভবপর নহে। প্রকৃতিক্ষেত্রে বিশ্বপতির যে সমস্ত মঙ্গলময় উদ্দেশ্য প্রচারিত রহিয়াছে, অদৃষ্ট তাহাদিগেরও সহিত সমঞ্জসীভূত হয় না। মানব প্রকৃতিতে যে সমস্ত ঐশ্বরিক জ্ঞান ও সংস্কার মুদ্রিত আছে, অদৃষ্ট তাহাদিগেরও সহিত সংলগ্ন হয় না। দুর্জ্জনেরা কর্ম্মফল-ভয়ে, এবং দুঃখীরা কেবল সান্ত্বনার জন্য এই ভয়ানক মতের উদ্ভাবন করিয়াছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

সুপ্রসিদ্ধ প্রথম ফরাশি বিপ্লব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যালোচনার পুনরারম্ভ, এবং লুথারীয় ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের প্রথমাবির্ভাব-কাল হইতে এই কারণসামগ্রী এইরূপ অতর্কিত ভাবে কার্য্য-প্রসূ হইতেছিল। সময়ে সকল পার্থিব বস্তুই পরিবর্ত্তিত হয়। মানবী মনোবৃত্তিও কালে স্বতঃই পরিবর্ত্তিত হইল। বিশুদ্ধ ধর্ম্মের অপরিভবণীয় বল স্পেনের শ্রমোপজীবী কৃষিদিগকে স্পেনরাজ্যের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিল। এবং ইংলণ্ডীয় পিউরিটান দিগের অনমনীয় ধর্ম্মোন্মাদ নর্ম্মান্ সামন্তদিগের প্রভুতার মূলোচ্ছেদ করিল। জ্ঞানজ্যোতির সর্ব্বতোবিকিরণ যথেচ্ছচারিতার মূলোচ্ছেদ করিয়া সাধারণ মতের প্রভুতা সংস্থাপন দ্বারা অত্যল্পজ্ঞানালোকবিকীর্ণ জনপদেও যথেচ্ছচারী নরপতিগণের দুর্বিনীততার কিঞ্চিৎ উপশম করিল। প্রাচ্য রাজ্যসকলের সহিত তুলনা করিলে ইউরোপের অতিজঘন্যশাসন রাজ্যসকলও নিয়মতন্ত্র রাজ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এবং রোমীয় সম্রাট্‌দিগের ঘোরতর নিষ্ঠুরতার সহিত তুলনা করিলে আধুনিক রুসীয়দিগের অত্যাচারও অতি লঘু বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু ফরাশি বিপ্লবারম্ভের পূর্ব্বে এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের পরিমাণ কাহারই উপলব্ধি হয় নাই। এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত সংঘর্ষণের পূর্ব্বে যথেচ্ছচারিতার বল-দৌর্ব্বল্য এত স্পষ্টরূপে কেহই বুঝিতে পারেন নাই। যে চিরস্থায়িনী সৈন্যসংস্থিতি পূর্ব্বে রাজলক্ষ্মীর একমাত্র আশ্রয়-স্থল ছিল, পুরাবৃত্তে যে চিরস্থায়িনী সৈন্যসংস্থিতি যথেচ্ছচারিণী প্রভুতারই সংস্থাপক বলিয়া পরিগৃহীত হইত, সেই চিরস্থায়িনী সৈন্যসংস্থিতি ফরাশি বিপ্লব কালে রাজলক্ষ্মীর আশ্রয়স্থল না হইয়া বরং প্রাণাপহারিণী হইয়া উঠিল। রিসিলিউ প্রভৃতি সুবিখ্যাত ফরাসি সচিবগণের অসামান্য ধীশক্তি, সামন্তগণের প্রবল প্রতাপের নিয়মন জন্য, এই ভয়াবহ সৈনিকদলের সৃষ্টি করিয়া, ফরাশিরাজ-সিংহাসকে একপ্রকার সামন্তগণের অনধীন করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সেই সকল সুবিখ্যাত ফরাশিসচিবগণের প্রজ্ঞা ঐশ্বরিক প্রজ্ঞাদ্বারা বিফলীকৃত হইল। রিসিলিউ—ফরাশিরাজ সুবিখ্যাত চতুর্দ্দশ লুয়ের প্রধান অমাত্য ছিলেন। রিসিলিউয়ের সুযোগ্য পরামর্শে

চতুর্দ্দশ লুই নিজ সৈন্যদিগের মধ্যে যে অদ্ভুত রণচাতুরী অন্তর্নিবেশিত করিয়াছিলেন, সেই রণচাতুরীই ষোড়শ লুইয়ের পতনের প্রধান উপকরণ হইয়া উঠিল। হতভাগ্য ষোড়শ লুই যৎকালে দুর্বিনীত প্রজাপুঞ্জ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, যৎকালে তিনি পতিপরায়ণা রাজ্ঞী মেরায়া অ্যাণ্টয়নেট্টি, ভ্রাতৃবৎসলা বিশুদ্ধমতি এলিজেবেথ, ও শিশু সন্তানদ্বয় সহ, সপরিবারে জীবনাশায় হতাশ হইয়া নিজ সৈনিক পুরুষদিগকে রাজধানীতে শীঘ্র আসিতে ভূয়োভূয়ঃ আহ্বান করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহারা স্বামীর আহ্বানের আদেশবর্ত্তী না হইয়া বিদ্রোহি প্রজাপুঞ্জেরই সহিত মিলিত হয়। সাধারণতন্ত্রিদিগের স্বাধীন ভাব তাহাদিগেরও মধ্যে সংক্রামিত হইয়া পড়ে, এবং তাহাদিগের রাজবিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের সহিত ফরাশি-রাজমুকুটও লুইয়ের মস্তক হইতে ভূপতিত হয়।

সৈনিক পুরুষদিগের এই সহানুভূতিই আধুনিক সমবেত সমুত্থানের বিজয় লাভের মূলীভূত কারণ; এবং এই সহানুভূতির অভাবই প্রাচীন সমবেত সমুত্থানের পতনের প্রধান কারণ। যথেচ্ছচারী প্রাচীন রাজগণ এই সৈনিক পুরুষদিগের সাহায্যেই অবশিষ্ট প্রজাবৃন্দের উপর আপনাদের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা সংস্থাপন করিতেন। তৎকালে সৈনিক পুরুষদিগেরও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে রাজলক্ষ্মীর অস্তিত্বের সহিত তাঁহাদিগেরও অস্তিত্ব দৃঢ়-সম্বদ্ধ রহিয়াছে; সুতরাং তাহারা সেই রাজলক্ষ্মীর সংরক্ষণে ও সমর্থনে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতেও বিরত হইত না। কিন্তু, জ্ঞানজ্যোতির সর্ব্বতোবিকিরণে সৈনিক পুরুষদিগের এই চির-রূঢ় সংস্কার তিরোহিত হইল। সৈনিক পুরুষেরা এক্ষণে বুঝিতে পারিল যে তাহারা প্রজাবৃন্দের এক অংশ মাত্র। সুতরাং প্রজাবৃন্দের মঙ্গল ও তাহাদিগের মঙ্গল একই ও অবিভিন্ন; এবং প্রজাবৃন্দের উপর অস্ত্র-চালন ও গোলক-বর্ষণ, স্বাশ্রয়-তরুর মূলোচ্ছেদের ন্যায়, উন্মাদ-বিজৃম্ভন বই আর কিছুই নয়। চিররূঢ় বিশ্বাসের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই চিরস্থায়িনী সৈন্য-সংস্থিতি রাজলক্ষ্মীর শরীর-পরিরক্ষণী না হইয়া বরং ইহার আশুপতনের কারণ হইয়া উঠিল। অশস্ত্রদীক্ষিত প্রজাবৃন্দ অপেক্ষা সশস্ত্র রণ-দীক্ষিত সৈনিক পুরুষেরাই এক্ষণে ইউরোপীয় নরপতিগণের বিশেষ ভয়ের কারণ হইল। তাঁহারা যে প্রজাবৃন্দকে পূর্ব্বে দুর্নিবার্য্য স্বভাবজ শত্রু বিবেচনা করিতেন, এবং যে দুর্নিবার্য্য রিপুদলের বশীকরণ জন্যই এই অজেয় সেনাদলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ও ভাবিয়াছিলেন যে বিপদ্‌কালে ইহারাই তাঁহাদিগের বিপদ্‌-সাগরের এক-মাত্র কর্ণধার-স্বরূপ হইবে, কার্য্যকালে দেখিলেন যে সেই সেনাদলই তাঁহাদিগের বিপদ্‌-সাগরের কর্ণধার না হইয়া বরং প্রবল-বাত্যা-স্বরূপ হইয়া উঠিল। যে সমস্ত বিজয়িনী অসি সামন্তগণের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া

রাজলক্ষ্মীর করতলস্থ হওয়ায় এত দিন স্বাধীনতা-বন্ধুদিগের শোচ্য হইয়াছিল, সেই অসিই এক্ষণে মানবজাতির উদ্ধারের প্রধান উপকরণ হইয়া উঠিল। সমর,—নরহত্যা ও নগর-বিলুণ্ঠন প্রভৃতি অসংখ্য ক্রূর কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়াও, জ্ঞানালোকের সর্ব্বতোবিকিরণ ও কুসংস্কারের সর্ব্বথা দূরীকরণ দ্বারা, মানবমণ্ডলীর অসীম মঙ্গল সাধন করিয়াছিল। প্রভুতা,—স্থায়ি-সত্ব সামন্তগণের হস্ত হইতে প্রথমে নৃপতিগণের ও পরে অস্থায়িসত্ব চঞ্চল-রাজভক্তি সৈনিক পুরুষগণের হস্ত-ন্যস্ত হইয়া স্বকীয় প্রাচীন অপ্রধৃষ্য ভাব পরিত্যাগ করিল। প্রবল ভূপালেরা স্ব স্ব সর্ব্বতোমুখী প্রভুতার সমর্থন জন্য সামন্ত-রূপী শক্তির সৃষ্টি করিলেন। কালে সেই সামন্তেরাই আবার স্ব স্ব প্রভুর তাদৃশী সর্ব্বতোমুখী প্রভুতার সমর্থক না হইয়া বরং প্রতিরোধক হইয়া উঠিলেন। ভগ্নমনা নরপতিগণ আবার এই দুর্দান্ত প্রতিদ্বন্দিনী সামন্তসেনার সমতুল-স্বরূপ দুর্জ্জেয় চিরস্থায়িনী সেনার সংস্থাপন করিলেন। কালে অদ্ভুত প্রাকৃতিক নিয়মে সেই সেনাই আবার রাজ-সিংহাসনের ধ্বংসের নিদানীভূত হইয়া উঠিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এ হতভাগ্য জগতে অবিমিশ্রিত শুভ অতি বিরল। পুরাকালে জগতে যত বিপ্লবানল প্রজ্জ্বলিত হইত তৎসমস্তই প্রায় দাসত্বের নিগড়বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ও অমূল্য স্বাধীনতা রত্ন প্রাপ্তির জন্য। সে সমস্তই প্রায় অসংখ্য শ্রমোপজিবী কৃষিবৃন্দের, শ্রেষ্ঠতন্ত্রিণী প্রভুতার দুর্বিনীত গ্রাস হইতে, মুক্তিলাভের জন্য। সে সকল স্থলে আমাদের সহানুভূতি উৎপীড়িতদিগের প্রতিই স্বতঃ ধাবিত হইত। সে সময় আমাদের হৃদয় স্বভাবতঃই এই বলিয়া ভয়ে কম্পিত হইত, যে পাছে প্রাচীন দাসত্বপ্রথা পুনঃসংস্থাপিত হয়। কিন্তু ফরাশি বিপ্লবের সময়ে এক অশ্রুতপূর্ব্ব বিপদ্‌পরম্পরার নবাবির্ভাব দৃষ্ট হয়; অধিক কি ইতিবেত্তৃগণ তাৎকালিক উৎপীড়নায় অসংখ্য নবীন বিপদ্‌পাতের অশ্রান্ত পর্য্যবেক্ষণে হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কারণ পরম্পরায় সাধারণতন্ত্রিণী প্রভুতা পরিশেষে এতদূর উপচীয়মান হইয়াছিল যে, বিপদ্‌-রাশি এক্ষণে এক অপূর্ব্ব নবীন আকার ধারণ করিল। পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে আর বহুসংখ্যক লোক অল্প-সংখ্যক লোকদ্বারা স্বাধীনতা-বিচ্যুত হইল না, কিন্তু বহুসংখ্যক লোকই অল্পসংখ্যক লোকের উপর বিজাতীয় উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। ধনে, মানে, গুণে, ও জ্ঞানে যাঁহারা সকলের শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই এক্ষণে অসংখ্যলোকের বধ্য হইয়া উঠিলেন। এই ভীষণ বিপৎপাত রাজকীয় বা শ্রেষ্ঠ-তান্ত্রিক উৎপীড়না অপেক্ষা ও ভীষণতর হইয়াছিল। ইহা অচিরকালমধ্যে সমাজ-শৃঙ্খল ভেদ করিয়া আশ্রয়-তরুর মূলচ্ছেদ করিয়াছিল। সমস্ত সভ্য জগতে এক্ষণে এই ভীষণ

অগ্ন্যুৎপাতের প্রবল ধাতু-নিঃস্রব প্রবাহিত হইতেছে। এই ভয়ঙ্কর ধাতু-নিঃস্রবের প্রবল প্রবাহ প্রতিরোধ করিতে ধর্ম্ম, নীতি ও বিজ্ঞানের পরমা চর্চ্চার প্রয়োজন হইয়াছে। ইতিবেত্তৃগণ পুরাবৃত্তের ঘটনাবলী আলোড়ন করিয়া যদি এই ভীষণ বিপৎপাতের নিবারণৌষধির অনুসন্ধান করিতে পারেন, তবেই তাঁহাদিগের পরিশ্রম সার্থক!—তবেই তাঁহাদিগের জীবন ধন্য!

প্রকৃতির প্রায় সমস্ত পরিবর্ত্তনই অল্পে অল্পে এবং অতর্কিত ভাবে সংসাধিত হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক নিয়ম ধাতু উদ্ভিদ্ ও প্রাণী এই রাজ্যত্রয়েই সমানরূপে উপলক্ষিত হয়। সহস্র সাম্রাজ্যের আধার ও অসংখ্য প্রাণিগণের আবাস-ভূমি এই যে জগতী—ইহা ও অগ্নি-সংযুক্ত দুগ্ধ-শরের ন্যায় অন্তর্বহ্নি-সমুৎকীর্ণ ধাতব পরমাণুসমষ্টির বাহ্য-বায়ু-সমাগম-জনিত বহু-কালোৎপন্ন সংঘাত বই আর কিছুই নহে। অরণ্যের সম্রাট্-স্বরূপ এই যে বিশাল শালতরু এক্ষণে গর্ব্বিত-ভাবে গগন স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা সামান্য শৈবাল হইতেই ক্রমে ক্রমে সমুৎপন্ন হইয়াছে। এবং এই যে পশুরাজ সিংহেরও অধিরাজ এবং প্রাণি-রাজ্যের ভূষণ-স্বরূপ মানব-জাতি এক্ষণে সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছেন, ইনিও ক্ষুদ্র শম্বুকের আকার হইতেই কালে এই অপূর্ব্ব আকার ও এই অপূর্ব্ব বুদ্ধিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সমাজ-শৃঙ্খলাও এইরূপ অতর্কিতভাবে ও শনৈঃপাদসঞ্চারে সংস্থাপিত ও পরিণত হইয়াছে। সেইরূপ মানবীয় উন্নতির মূল-স্বরূপ যে সংযত স্বাধীনতা (Regulated liberty) ইহাও কালে সংস্থিতি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইবে। ইহা দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইতে সহস্র সহস্র যুগ অতীত হইবে। এবং ইহার সংস্থাপন-নিমিত্তক সংগ্রামে অসংখ্য জাতির পতন হইবে। এই অখণ্ডনীয় সত্যের পুনঃ পুনঃ পর্য্যবেক্ষণে মনে আশা ও ধৈর্য্য উভয়ই যুগপৎ সমুদিত হয়। আশা—এই বলিয়া, যে জগতের অসংখ্য বিবর্ত্ত মধ্য দিয়া ও উন্নতির স্রোত ক্রমেই উপচীয়মান হইতেছে; সুতরাং জগতের ভাবি মঙ্গলের জন্য আমাদের হতাশ হওয়া নিষ্প্রয়োজন। ধৈর্য্য—এই বলিয়া যে উন্নতি-স্রোতের প্রতিবন্ধকতা-সম্পাদন, ও যুগান্তরের সমাজ-পদ্ধতি যুগান্তরে সন্নিবেশিত করণ, চেষ্টা উন্মাদ-বিজৃম্ভন বই আর কিছুই নয়; এরূপ চেষ্টা প্রায় ফলে পরিণত হয় না; সুতরাং বল-পূর্ব্বক কোন বিষয় সংস্থাপন বা নিবারণ করিবার চেষ্টা বিফল ও নিষ্প্রয়োজন; যাহা ভাল তাহা কালে আপনিই সংস্থাপিত হইবে; যাহা মন্দ, তাহা আপনিই অন্তর্হিত হইবে। মানবী ঘটনাবলীর মধ্যে ফরাশিবিপ্লবের ন্যায় এই অমূল্য সত্যের প্রতিপাদক ঘটনা আর দেখা যায় না। ইহা স্বাধীনতা-ব্যাপ্তির অলঙ্ঘনীয়তা এবং আকস্মিক

পরিবর্ত্তনের বিষময় ফল-প্রসূতার যুগপৎ সমর্থন দ্বারা বর্ত্তমান সমাজ-প্রবর্ত্তকদিগের মনে ধৈর্য্য ও অপ্রমাদের ভাব গভীররূপে অঙ্কিত করিয়া, নররুধিরধারা দ্বারা মানবজাতির ভাবি উন্নতি-স্রোতের কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত করিয়াছে!

উপক্রমণিকা সমাপ্ত।

সারদা-মঙ্গল-সংগীত।

(বঙ্গসুন্দরী-রচয়িতা

শ্রীযুক্ত বাবু বেহারিলাল চক্রবর্ত্তীর প্রণীত।)

মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিরং।
ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে॥

কালিদাসঃ।

—০—

উপহার গীতি।

—০—

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার।
মধুর মুরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখ-শশী জাগে অনিবার।

কি জানি কি ঘুমঘোরে,
কি চোকে দেখিছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।

তবুও ভুলিতে হবে,
কি লয়ে পরাণ রবে,
কাঁদিয়ে চাঁদের পানে চাই বারেবার।

কুসুম-কানন মন
কেন রে বিজন বন,
এমন পূর্ণিমানিশি যেন অন্ধকার।

হে চন্দ্রমা কার দুখে
কাঁদিছ বিষণ্ণ মুখে!
অয়ি দিগঙ্গনে কেন কর হাহাকার!

হয় তো হলনা দেখা,
এ লেখাই শেষ লেখা,
অন্তিম কুসুমাঞ্জলি স্নেহ-উপহার,
ধর ধর স্নেহ-উপহার!

—০—

প্রথম সর্গ।

১

কে তুমি ত্রিদিবদেবী
বিরাজি হৃদিকমলে!
নধর নগনা লতা
মগনা কমল-দলে।

চাঁচর চিকুর-ভার,
ললাটে কমলহার,
সনাল কমল দুটি
হাসে বাম-কর-তলে।

কপোলে সুধাংশুভাস,
অধরে অরুণ হাস,
নয়ন করুণাসিন্ধু
প্রভাতের তারা জ্বলে।

মাথা থুয়ে পয়োধরে
কোলে বীণা খেলা করে,
স্বর্গীয় অমিয়স্বরে
জানিনে কি কথা বলে।

ভাবভরে মাতোয়ারা,
যেন পাগলিনী পারা,
আহ্লাদে আপনা হারা
মুগুধা মোহিনী

নিশান্তের শুক-তারা,
চাঁদের সুধার ধারা,
মানস-মরালী মোর,
আনন্দরূপিণী

তুমি সাধনের ধন,
জান সাধকের মন,
এখন আমার আর
কোন খেদ নাই ম'লে।

২

নাহি চন্দ্র সূর্য্য তারা,
অনল-হিল্লোল-ধারা,
বিচিত্র-বিদ্যুত-দাম-
দ্যুতি ঝলমল ;
তিমিরে নিমগ্ন ভব,
নীরব নিস্তব্ধ সব,
কেবল মরুতরাশি
করে কোলাহল।

হিমাদ্রি-শিখর পরে
আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতি ওই
শুভ্র শরবনে

বিকচ নয়ন চেয়ে
হাসিছে দুদের মেয়ে,
তামসী-তরুণ-উষা
কুমারী রতন ;

কিরণে ভুবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে
দিগঙ্গনাগণে ;
হাসিল অম্বর-তলে
পারিজাত দলে দলে,
হাসিল মানস-সরে
কমল-কানন।

হরিণী মেলিল আঁকি,
নিকুঞ্জে কূজিল পাকী,
বহিল সৌরভময়
শীতল সমীর ;
ভাঙ্গিল মোহের ভুল,
জাগিল মানবকুল,
হেরিয়ে তরুণ উষা
আনন্দে অধীর।

এ হেন নন্দিনী ফেলি
পাষাণী কোথায় গেলি !
এমন স্নেহের হার
দুলিল না মা'র গলে !

৩

অম্বরে অরুণোদয়,
তলে দুলে দুলে বয়
তমসা-তটিনী রাণী
কুলু কুলু স্বনে ;

নিরখি লোচন-লোভা
পুলিন-বিপিন-শোভা,
ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি
ভাবভোলা মনে।

শাখী-শাখে রস-সুখে
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে,
কতই সোহাগ করে
বসি দুজনায়!
হানিল শবরে বাণ,
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ,
রুধিরে আপ্লুত পাখা
ধরণী লুটায়;

ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে
অরণ্য পূরিল তার
কাতর ক্রন্দনে।
চক্ষে করি দরশন
জড়িমা-জড়িত-মন,
করুণ-হৃদয় ঋষি
বিহ্বলের প্রায়।

সহসা ললাট-ভাগে
জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে
জাগিল বিজলী যেন
নীল নব ঘনে।
কিরণে কিরণময়,
বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মাণ রবি-ছবি,
ভুবন উজলে;

চন্দ্র নয়, সূর্য্য নয়,
সমুজ্জল শান্তিময়,
ঋষির ললাটে আজি
না জানি কি জলে!

কিরণ-মণ্ডলে বসি
জ্যোতির্ম্ময়ী সুরূপসী
যোগীর ধ্যানের ধন
ললাটিকা মেয়ে,
নামিলেন ধীর ধীর,
দাঁড়ালেন হয়ে স্থির,
মুগ্ধ নেত্রে বাল্মীকির
মুখ পানে চেয়ে।

করে ইন্দ্রধনু-বালা,
গলায় তারার মালা,
সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলে
ঝল্‌মলে কানন;
কর্ণে কিরণের ফুল,
দোদুল্ চাঁচর চুল
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে
ঢাকিয়ে আনন।

হাসি হাসি—শশি-মুখী,
কতই কতই সুখী,
মনের মধুর জ্যোতি
উছলে নয়নে।
কভু হেসে ঢল ঢল,
কভু তেজে জ্বল জ্বল,
বিলোচন ছল ছল
করে প্রতিক্ষণে।

করুণ ক্রন্দন-রোল,
উত উত উতরোল;
চমকি বিহ্বলা
চাহিলেন ফিরে।
হেরিলেন রক্ত-মাখা
মৃত-ক্রৌঞ্চ-ভগ্ন-পাখা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চী
ওড়ে ঘিরে ঘিরে।

একবার সে ক্রৌঞ্চীরে,
আর বার বাল্মীকিরে,
নেহারেন ফিরে ফিরে,
যেন উন্মাদিনী;
কাতরা করুণা-ভরে,
গান্ সকরুণ-স্বরে,
ধীরে ধীরে বাজে করে
বীণা বিষাদিনী।

সে শোক-সংগীত কথা
শুনি কাঁদে তরু লতা.
তমসা আকুল হয়ে
কাঁদে উভরায়।
নিরখি নন্দিনী-ছবি
গদ গদ আদি কবি,
অন্তরে করুণা-সিন্ধু
উথলিয়া ধায়।

রোমাঞ্চিত কলেবর
টলমল থর থর,
প্রফুল্ল কপোল বহি
বহে অশ্রু জল।
হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢ়ুলু ঢ়ুলু ঢ়ুনয়নে
বিভোর বিহ্বল-মনে
কাঁহারে ধেয়াও!

কমলা ঠমকে হাসি
ছড়ান্ রতন-রাশি,
অপাঙ্গে ভ্রূভঙ্গে আহা
ফিরে নাহি চাও!
ভাবে ভোলা খোলা প্রাণ
ইন্দ্রাসনে তুচ্ছ জ্ঞান।
হাসিয়ে পাগল বলে
পাগল সকল।

এমন করুণা মেয়ে
আছে যার মুখ চেয়ে,
ছলিতে এসেচ তাঁরে
কেন গো চপলা!
হেরে কন্যা করুণার
শোক তাপ দূরে যায়.
কি কাজ—কি কাজ তাঁর
তোমার কমলা!

এস মা করুণা-রাণী!
ও বিধু-বদন-খানি
হেরি হেরি আঁকি ভরি
হেরি গো আবার;
শুনি সে উদার কথা
জুড়াক মনের ব্যথা,
এস আদরিণী রাণী
সমুখে আমার!

যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস মা এ যোগীজন—
তপোবন স্থলে!

৪

বৃহ্মার মানস-সরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীল-জলে মনোহর
সুবর্ণ নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়।
ষোড়শী রূপসী বামা
পূর্ণিমাযামিনী।

কোটি শশী উপহাসি
উথলে লাবণ্য-রাশি,
তরল দর্পণে যেন
দিগন্ত আবরে।
আচম্বিতে অপরূপ
রূপসীর প্রতিরূপ
হাসি হাসি ভাসি ভাসি
উদয় অম্বরে।

ফটিকের নিকেতন,
দশ দিকে দরপণ
বিমল সলিল যেন
করে তক্ তক্;
সুন্দরী দাঁড়ায়ে তায়
হাসিয়ে যে দিকে চায়
সেই দিকে হাসে তার
কুহকিনী ছায়া,

নয়নের সঙ্গে সঙ্গে
ঘুরিয়ে বেড়ায় রঙ্গে,
অবাক্ দেখিতে, হয় অমনি অবাক্;
চক্ষে পড়ে না পলক।

তেমনি মানস-সরে
লাবণ্য দর্পণ ঘরে
দাঁড়ায়ে লাবণ্যময়ী
দেখিছেন মায়া—

যেন তাঁরে, হেরি হেরি,
শূন্যে শূন্যে ঘেরি ঘেরি,
রূপসী চাঁদের মালা
ঘুরিয়া বেড়ায়;
চরণ-কমল-তলে
নীলনভ নীলজলে
কাঞ্চন-কমলরাজি
ফুটে শোভা পায়।

চাহিয়ে তাঁদের পানে
আনন্দ ধরে না প্রাণে,
আনত আননে হাসি
জলতলে চান;
তেমনি রূপসী মালা
চারি দিকে করে খেলা,
অধরে মৃদুল হাসি
আনত বয়ান।

রূপের ছটায় ভুলি
শ্বেত শতদল তুলি
আদরে পরাতে যান
সীমন্তে সবার,
তাঁরাও তাঁহারি মত
পদ্ম তুলি যুগপত
পরাতে আসেন সবে
সীমন্তে তাঁহার।

অমনি স্বপনপ্রায়
বিভ্রম ভাঙিয়ে যায়,

চমকি আপন পানে
চাহেন রূপসী ;
চমকে গগনে তারা,
ভূধরে নির্ঝর ধারা,
চমকে চরণ-তলে
মানস-সরসী।

কুবলয়-বনে বসি
নিকুঞ্জশারদশশী
ইতস্ততঃ শত শত
সুর-সীমন্তিনী
সঙ্গে সঙ্গে ভাসি যায়,
অনিমেষে দেখে তায়,
যোগাসনে যেন সব
বিহ্বলা যোগিনী।

কিবে এক পরিমল
বহে বহে অবিরল!
শান্তিময়ী দিগঙ্গনা
দেখেন উল্লাসে।
শূন্যে বাজে বীণা বাঁশী,
সৌদামিনী ধায় হাসি,
সংগীত-অমৃত-রাশি
উথলে বাতাসে।

তীরে ঘেরে, যোড়করে
অমর কিন্নর নরে
সমস্বরে স্তব করে, ভাসে অশ্রুজলে,
অমর কিন্নর নরে ভাসে অশ্রুজলে।

৫

তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী
দুই ভাল লাগে ;
গিরিমালা, কুঞ্জবন,
গৃহ, নাট-নিকেতন,
যখন যেখানে যাই,
যাও আগে আগে।

জাগরণে জাগ হেসে,
ঘুমালে ঘুমাও শেষে,
স্বপ্নে স্বয়ম্বরা-বেশে
বরমালা দাও গলে।

কত তব আছে দাস,
কারে ভাল ভালবাস!
বাস, আর নাহি বাস,
আমি ভাল বাসি ;
ভক্তি ভাবে এক তানে
মজেছি তোমার ধ্যানে,
কমলার ধন মানে
নহি অভিলাষী।

থাক হৃদে জেগে থাক,
রূপে মন ভরে রাখ,
তপোবনে ধ্যানে থাকি
এ নগর-কোলাহলে।

তুমিই মনের তৃপ্তি,
তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমা-হারা হ'লে আমি
প্রাণহারা হই ;

করুণা-কটাক্ষে তব
পাই প্রাণ অভিনব,
অভিনব শান্তি-রসে
মগ্ন হ'য়ে রই।

যে কদিন আছে প্রাণ
করিব তোমার ধ্যান,
আনন্দে ত্যজিব তনু
ও রাঙা চরণতলে।

অদর্শন হ'লে তুমি,
ত্যজি লোকালয়ভূমি
অভাগা বেড়াবে কেঁদে
নিবিড় গহনে;
মোরে হেরে তরু লতা
বিষাদে কবেনা কথা,
বিষণ্ণ কুসুম-কুল
বন-ফুল-বনে;

হা দেবী! হা দেবী! বলি
গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি,
নীরবে হরিণী-বালা
ভাসিবে নয়ন-জলে।

নির্ঝর ঝর ঝর রবে
পবন পূরিয়ে যবে
আঘোষিবে সুর-পুরে
কাননের করুণ ক্রন্দন হাহাকার,
তখন টলিবে হায় আসন তোমার,
হায়রে তখন মনে পড়িবে তোমার!

হেরিবে কাননে আসি
অভাগার ভস্ম-রাশি,
অথবা হাড়ের মালা
বাতাসে ছড়ায়;
করুণা জাগিবে মনে,
ধারা ববে দু নয়নে
নীরবে দাঁড়ায়ে রবে
প্রতিমার প্রায়।

ভেবে সে শোকের মুখ
বিদরে আমার বুক,
মরিতে পারিনে তাই
আপনার হাতে,
বেঁধে মারে, কত সয়?
জীবন যন্ত্রণা-ময়
ছার্‌খার চুর্‌মার্‌
বিনি বজ্রাঘাতে।

অন্তরাত্মা জর জর,
জীর্ণারণ্য চরাচর,
কুসুম কানন মন
বিজন শ্মশান।
কি করিব, কোথা যাব,
কোথা গেলে দেখা পাব,
হৃদি-কমল-বাসিনী
কোথারে আমার!

কোথা সে প্রাণের আলো,
পূর্ণিমা-চন্দ্রিকা-জাল;
কোথা সেই সুধামাখা
সহাস বয়ান!
কোথা গেলে সঞ্জীবনী
মণিহারা মহা ফণি
অহো, সেই হৃদি-রাজ্য
কি ঘোর আঁধার!

তুমিতো পাষাণ নও,
দেখে কোন্‌ প্রাণে সও,
অয়ি সুপ্রসন্ন হও
কাতর পাগলে!

ইতি প্রথম সর্গ।

দশ অবতার ও ডারুইন সাহেবের মত।

"যস্যালীয়ত শল্কসীম্নি জলধিঃ পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডলং
দংষ্ট্রায়াং ধরণী নখে দিতিসুতাধীশঃ পদে রোদসী।
ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ শরে দশমুখঃ পাণৌ প্রলম্বাসুরো
ধ্যানে বিশ্বমসাবধার্মিককুলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ ॥"

পাঠক ! তুমি অবশ্য শুনিয়াছ যে ডারুইন সাহেবের মতে মনুষ্যেরা বানরের অবতার-বিশেষ। সে কথায় তোমার যদি বিশ্বাস হয়, তবে মনুষ্যের পরে অবশ্য তদপেক্ষা অধিকতর-শক্তি-সম্পন্ন অন্য কোন জীব জন্মিবে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতিরা সেরূপে এক বস্তুর অবয়ব-ধ্বংস দ্বারা অন্য কোন উৎকৃষ্ট যোনির সৃষ্টি কল্পনা করেন না। ইহাঁদিগের কল্পনা অন্য-প্রকার, তাহার আধার পরমেশ্বরের ইচ্ছা। ইহাঁদিগের মতে পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস হয়। বানরের লাঙ্গূল খসিয়া পড়িলে মানুষের সৃষ্টি হয় না। তাহা যদি হয় তবে উল্লুকের লাঙ্গূল নাই সুতরাং তাহাকেও মনুষ্যের কনিষ্ঠ বলা উচিত। এসম্বন্ধে আমরা ডারুইনের সঙ্গে ঐকমত্য অবলম্বন করি বা না করি কিন্তু এই কথা একান্তই বলা কর্ত্তব্য যে ডারুইন সাহেবের মত নূতন নহে।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য-জাতির পুরাণ-রচয়িতৃগণ ও তান্ত্রিক মহোদয়বর্গের অভিপ্রায় গুলি দেখিলে উক্ত মহোদয়ের মত ইহাঁদিগের মতের ছায়াস্বরূপ বোধ হইবে।

পৌরাণিকদিগের মতে ভগবান্ প্রথমে মৎস্য-অবতার হন; তাঁহার দ্বিতীয় অবতার কূর্ম্ম; তৃতীয় অবতারে তিনি নৃসিংহরূপে অবনীতে আবির্ভূত হন। এইটী তাঁহার অর্দ্ধ-পশু ও অর্দ্ধমনুষ্যাকৃতি। ইহারই সংস্করণে এককালে তিনি বামন অবতার হন। ইহাকেই ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি কহা যায়। এইটীতে তিন খানি পা আছে। পঞ্চমে পরশুরামের জন্ম। এই-রূপটীই একেবারে মনুষ্যের প্রকৃত রূপ।

প্রিয়দর্শন পাঠক ! তুমি মনে করিয়াছ পৌরাণিকদিগের রচনা রূপক ও কল্পনাতে পরিপূর্ণ, সুতরাং প্রকৃত বিষয়ের মূল পাওয়া বড় ভার। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা তাদৃশ নির্ম্মূল বলিয়া কদাচ

বোধ হইবে না। ইহাঁদিগের মতে মৎস্য-অবতার বেদের উদ্ধার-কর্ত্তা।

জগৎ-কারণ পরমেশ্বর বেদের উদ্ধার জন্য কেন মৎস্য-অবতার ধারণ করিতে গেলেন? স্বকীয় চিন্ময় রূপে কি বেদের উদ্ধার হইতে পারিত না? অবশ্য হইতে পারিত। তবে কেন মীন-রূপ ধারণ করিলেন, তাহার নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা উচিত।

পৌরাণিকেরা কহেন জগন্মণ্ডল "প্রলয়-পয়োধি-জলে নিলীন হইলে, ভগবান্ মীন-রূপ ধারণ করিয়া অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করেন।" এখন দেখ—বিদ ধাতুর অর্থ জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয়কে বেদ বলা যায়। সৃষ্টির প্রথমে জলের আবির্ভাব, অতএব জলীয় জগতে যে প্রাণী আরাম বিরাম করিয়া জীবিত থাকিতে পারে, জগদীশ্বর তাহারই সৃষ্টি করিলেন। জীব মাত্রেরই চৈতন্য আছে, ঐ চৈতন্যকেই সুখদুঃখাদি-বোধ-বিষয়ক জ্ঞান কহা যায়। সেই বোধকেই বেদ-শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রলয়-কালীন জলে তাবৎ জীব নষ্ট হইয়া গেল। এখন জলীয় জগতের মধ্যে কোন্ প্রাণীর প্রতি জ্ঞান রাখা যাইতে পারে? দেখা গেল মৎস্যগণই জলীয় জগতের উপযুক্ত জন্তু। তাহাদিগকেই এ জগতে বুদ্ধিমান্ প্রাণী ধরা যায়। জলের পরে মৃত্তিকার উৎপত্তি। এখন পার্থিব জীবের সৃষ্টি হওয়াই সম্ভব, তদনুসারে জল ও স্থল চরের নির্ম্মাণ হইল। এবার কূর্ম্ম আসিলেন। পৌরাণিকমতে ভগবান্ কূর্ম্মাবতারে—মেদিনীমণ্ডলকে প্রলয়-পয়োধি-জল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ-পৃষ্ঠ-ভাগে ধারণ করিয়া আছেন। এবারে জলীয় পরমাণু পার্থিব পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া ঘনীভূত হইল। কাজে কাজেই এবারকার অবতারকে বলিষ্ঠ ও কঠিন করা প্রয়োজন জ্ঞানে পার্থিব-পদার্থের দ্বারা তাহার অবয়বের অধিকাংশ নির্ম্মিত হইল। পৃষ্ঠ-ভাগ এমন দৃঢ় যে উহার উপরি অত্যন্ত ভারী বস্তু রক্ষা করিলেও ভাঙ্গে না। কূর্ম্মকে ভার-সহ জ্ঞানে ভগবানের দ্বিতীয় অবতার কল্পনা করা হইল। এই কালে যে সকল জীবের সৃষ্টি হয় তাহারা এতদপেক্ষা বলিষ্ঠ হয় নাই।

ভগবান্ যখন বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, সে সময়ে পার্থিব জগতের দ্বিতীয় অবস্থা। এ অবস্থায় পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত অধিক। বিশেষতঃ জলপ্লাবন দ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগে বন ও জঙ্গলের উৎপত্তি শীঘ্র শীঘ্র হইতে লাগিল। এমন অবস্থায় কাহার উৎপত্তি সম্ভবপর? পৌরাণিকেরা দেখিলেন বনে বরাহাদি জীবের সৃষ্টি ভিন্ন অন্য প্রাণীর সৃষ্টি হইতে পারে নাই। সুতরাং তৃতীয় অবতারে বরাহ-রূপই সঙ্গত। তখন পৃথিবীর উপরি ভাগ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কঠিন হইয়াছে। এবারে দন্তজীবীর সৃষ্টি না

করিলে বৃক্ষ লতাদির ছেদন ভেদন সম্ভব নয়, সুতরাং বরাহ-মূর্ত্তি দ্বারা মেদিনী-মণ্ডলের উদ্ধার সাধন হয়। সে সাধন আর কিছুই নহে, পৃথিবীর ঐ অবস্থায় বরাহপ্রভৃতি দন্তজীবী ও নানা-প্রকার শৃঙ্গীর সৃষ্টি হয়। পুরাণের মতে এই বরাহের এক একটী কেশর গিরি-শিখর-তুল্য। পদার্থ-বিৎ পণ্ডিত দিগের মতে কেশর ও শৃঙ্গ এক পদার্থ, তদনুসারে বলা যাইতে পারে যে এই সৃষ্টি দ্বারা দন্তজীবী ও শৃঙ্গীর সৃষ্টি দেখান হয়। কূর্ম্মের সৃষ্টি দ্বারা নখীর সৃষ্টি সিদ্ধ হইয়াছে।

পৃথিবী চতুর্থ অবস্থায় মনুষ্যের আবাস-যোগ্য হইল বটে, কিন্তু তখনও আম মাংস ভোজন ব্যতীত পৃথিবীতে মনুষ্যাদির জীবন-ধারণ সুসাধ্য নয় জ্ঞানে অর্দ্ধপশু ও অর্দ্ধমনুষ্য ভাবাপন্ন জীবগণের সৃষ্টি হইল। তাহার উদাহরণ স্বরূপ নরসিংহ-মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখা যায়। এই অবস্থায় দৈত্য দানবাদির প্রাণ-সংহারের সম্বাদ পাওয়া গেল। তদবধি এই ইতিবৃত্ত কথনের সূত্রপাত হইল। এই অবতারে প্রাণি-সংহারাদি পশু বৃত্তি ও হিংসার প্রাবল্য দেখা যায়।

এই অবস্থায় মনুষ্যগণ দৈত্য-দানব ভয়ে কম্পিত-কলেবর ছিলেন। দৈত্যেরাই প্রায় হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিল।

পঞ্চম অবস্থায় এই ধরাধাম মনুষ্যাদি জীবগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুখাবাসের স্থান হইল। এই সময়ে মনুষ্যেরা আত্ম-দল-বল-সহকারে হিংস্র জীব জন্তুর প্রাণ-সংহার করিতে লাগিলেন। হিংস্র জীবগণও মনুষ্যের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া নিবিড় কাননে আশ্রয় লইল, তদবধি হিংস্র জন্তুগণের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। এই অবস্থায় যে অবতার কল্পিত হইয়াছে তাঁহার রূপ ত্রিবিক্রম-মূর্ত্তি। সময়ে এই সংসারের অনেক খানি শ্রীবৃদ্ধি হইল, অর্থাৎ মনুষ্য-শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। মনুষ্যেরা বুদ্ধি বলে আত্মজ্ঞান-প্রভাবে ইচ্ছা করিলে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল সর্ব্বত্রই যাইতে পারেন। তাহাই প্রদর্শন জন্য ভগবান্ একপ্রকার বামন-অবতার ও সেই অবস্থাতেই ত্রিবিক্রম-স্বরূপ মহাবিরাট্-আকার ধারণ করিয়া বলির প্রতিশ্রুত ও অবশ্য দেয় ত্রিপাদপিরিমিত স্থানের গ্রহণ জন্য স্বর্গে ও মর্ত্তে পাদ বিক্ষেপ করিলেন। আকাশের নাম বিষ্ণুপদ, সুতরাং বলিরাজার তাহাতে কোন অধিকার নাই। এই হেতু তিনি উহা দিতে অসমর্থ হইলেন। ত্রিপাদ ভূমির মধ্যে পাতাল ও মর্ত্ত এই দুইটীর দান সিদ্ধ হইল। আকাশ বিষ্ণুর পাদ-বিশেষ, অতএব বলির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। এক্ষণে মনুষ্যেরা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে জগদীশ্বরের সত্তার উপলব্ধি হইল। আকাশস্থ সমস্ত উজ্জ্বল পদার্থকে পরমেশ্বরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অথবা স্বরূপ জ্ঞানে উপাসনায় রত হইলেন।

এখানেই ডারুইন সাহেবের লাঙ্গুল

ভ্রষ্ট মনুষ্য-জীবের সৃষ্টির আরম্ভ হয়।

যদি মনুষ্যকে ত্রিপাদ বিশিষ্ট ধরা যায়, আর তাহাদিগকে পর যুগে না দেখা যায়, তবে অবশ্য বলা যাইতে পারে যে ডারুইন সাহেব মহোদয় হিন্দুদিগের পুরাণের ছায়া লইয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম। ইঁহার অস্ত্র কুঠার। মনুষ্যসকল যখন নিতান্ত অসভ্য নয়, ও অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছে, তখনি তাঁহার জন্মের কল্পনা। ইনি সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন মনুষ্য-দেহে আবির্ভূত হইলেন। তদবধি একেবারে ঈশ্বরে মনুষ্য-ধর্ম্ম অর্পণ করা হয়। পৌরাণিকতার যৌবন-কাল এখানে ধরা যায়। পৌরানিকদিগের মতে ঈশ্বর মনুষ্য-দেহে অবস্থান-পূর্ব্বক পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারেন।

এক্ষণে আর একটী কথা বলা উচিত যে মহামহোপাধ্যায় ডারুইন সাহেব মহোদয় যে মত এক্ষণে প্রচার করিয়াছেন, পৌরাণিকদিগের মত সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির মতের অনুকারী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?—তবে তিনি যে সময়ের লোক, তাঁহার যতদূর জ্ঞানালোক পাইবার সম্ভাবনা, আর্য্যজাতির পক্ষে তাহার পরমাণু-পরিমাণ মাত্রও পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি ইহাঁরা বুদ্ধি-বলে সংসারের যাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, তাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি কোন জাতি করিতে পারে নাই। জ্ঞান-কাণ্ডে ইহাঁদিগের অদ্ভুত শক্তি। ধন্য আর্য্যগণ! তোমাদিগের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। তোমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণে যাহা কহিয়াছ তাহার মর্ম্ম গ্রহ কে করে?

দেখ জগৎ যে কালে একার্ণবে মগ্ন ছিল, তৎকালে মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুর বিষ্ণুর কর্ণ-মল হইতে জন্ম গ্রহণ করিল। জগৎ যে সময় জলে মগ্ন ছিল তখন কীট পতঙ্গাদিরই সৃষ্টি সম্ভাবনা, সুতরাং তাহাঁদিগেরই কল্পনা দেখা যাইতেছে।

মধু ও কৈটভ—এক্ষণে ব্যুৎপত্তি অনুসারে বিচার করিতে গেলে ইহা প্রতীতি হইবে যে কীটভ (কীটবৎ ভাতি যঃ স কীটভঃ) শব্দের উত্তর স্বার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করিলে কৈটভ পদ হয়; মধু এক প্রকার কীট-বিশেষ (অর্থাৎ যাহারা মধুপান করে)। তাহার প্রমাণ জন্য কালিকা পুরাণের বচন উদ্ধৃত করা গেল।

যথা—

"তৎকর্ণ-মল-চূর্ণেভ্যো মধুনামাসুরোহভবৎ। উৎপন্নঃ সচ পানার্থং যস্মাৎ মৃগিতবান্মধু॥ অতস্তস্য মহাদেবী মধুনামাকরোত্তদা॥

মধুশব্দে জল যথা "মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" ইতি মধুসূক্তম্।

ভগবান্ বিষ্ণু পঞ্চ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত এই দুই অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহাদিগকে বিনাশ করেন। বিনাশ কালে তাহারা বিষ্ণুর নিকট

এই প্রার্থনা করে যে আমরা যেন 'পৃথিবীর উপরি তোমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হই'। এক্ষণে বিচার-মার্গে ইহাই যুক্তি-যুক্ত বোধ হয় যে যৎকালে পৃথিবীর উপরিভাগে জল ছিল, তৎকালে কেবল কীটপতঙ্গাদির জন্ম হয়। যথন অবনীমণ্ডল পাঁচ হাজার বৎসর অতিক্রম করিল, তখন জল কমিয়া গেল—মৃত্তিকা ঘনীভূত হইল। এ সময়ে কীট পতঙ্গ প্রায় বিনষ্ট হইয়া আসিল। এই জন্যই বোধ হয় মধুকৈটভদ্বয় মৃত্তিকার উপরিভাগে আপনাদের মৃত্যু-কামনা করে। দেখ দেখি পৌরাণিকেরা কেমন নিগূঢ় ভাবে কেমন রূপকে দার্শনিক মত সংস্থাপন করিয়াছেন। ডারুইন মহোদয় ও কহিবেন জলীয় জগতের প্রথম সৃষ্টিকালে কেবল কীট্‌পতঙ্গেরই উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহাতে আর্য্যদিগের মতের ছায়া স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

আমাদিগের কোন কুতর্কী পাঠক কহিতে পারেন, তাহারা ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং বাহুযুদ্ধ ও করিত। প্রিয়দর্শন পাঠক! তুমি বিচার কর দংশ মশকাদি ক্ষুদ্র প্রাণীগণ মনুষ্যের রক্ত-পান করে কি না; তাহাদের হস্ত গুলিকে বাহু শব্দে নির্দ্দেশ করা যায় কিনা। যদি যায় তবে তাহাদিগের বাহু-যুদ্ধ করায় বাধা কি? ইহাও অসম্ভব নয় যে মনুষ্যেরা যথন ঐ সকল কীটদিগকে নষ্ট করেন্‌ তখন তাঁহাদিগকে বাহুর সাহায্য লইতে হইয়াছিল। বিষ্ণুকেও সেই প্রকার স্বহস্তে মধু—জলীয় কীট ও কীট-সদৃশ প্রাণী অর্থাৎ পতঙ্গদিগকে—নাশ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

ক্রমে যথন ক্ষৌণীদেবী হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন তিনি ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর প্রাণী প্রসব করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে মহিষাসুরের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ বর্ণিত আছে। দেবাসুরের যুদ্ধ একশত বৎসর ব্যাপিয়া হয়। তৎপরে মহিষাসুর আদ্যাশক্তি কর্ত্তৃক নিধন প্রাপ্ত হয়। মহিষাসুরের নিধন-প্রাপ্তির পূর্ব্বে চিক্ষুর, চামর, বিড়ালাক্ষ ও মহাহনু প্রভৃতি মহিষাসুর-সেনা মহাশক্তি হস্তে বিনষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে মহিষাসুর স্বয়ং লয় প্রাপ্ত হয়। মহিষাসুরের উৎপত্তির পর গজের সৃষ্টি হয়। পাঠক! তুমি মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠ কর, অবশ্য ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে। দেখ কীটপতঙ্গের জন্মের পর কত শত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে মহিষের জন্ম হয়। তৎপূর্ব্বে উদগ্র, চিক্ষুর, চামর, বিড়ালাক্ষ প্রভৃতি জীবের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া হইয়াছিল। মহিষের পূর্ব্বে সিংহ ও হস্তির জন্ম হয়। পুরাণান্তরে যে প্রকার অর্দ্ধপশু ও অর্দ্ধমনুষ্য স্বরূপ নৃসিংহের রূপ-কল্পনা, এখানেও সেই প্রকার অর্দ্ধপশু-অর্দ্ধমানবাকৃতি মহিষাসুরের আকার স্বীকার। উভয় পক্ষেই সমানত্বের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মহাহনুকে হনুমান কহা যায়। সুতরাং ইহা বলিতে

কদাচ লজ্জা হইবে না যে, বানরের পর মনুষ্য নয়; কিন্তু অর্দ্ধ-পশুর অবস্থার পর মনুষ্যের অবস্থা।

সেইরূপ যদি কোন পাঠক কহেন ঐ সকল সৈন্য ও সেনাপতিগণ চতুরঙ্গ বলের আশ্রয়ে যুদ্ধ করিয়াছিল, সুতরাং এরূপ অসভ্য অবস্থার কথা হইতে পারে না। তাহার মীমাংসায় ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে যেমন বৈদিক-মন্ত্র-সকলে—সূর্য্যকে হরিত বর্ণ সপ্ত অশ্বে বহন করে, ইন্দ্রকে মেঘ জল বহন করে, অগ্নিই পরমেশ্বরের স্বরূপ এবং সমস্ত পিতৃলোক ও দেবলোকের মুখ-স্বরূপ, পরমেশ্বর দেবগণ ও পিতৃগণ অগ্নিদ্বারা ভোজ্য গ্রহণ করিয়া সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বিধান করিতেছেন; তথাচ দেখা যাইতেছে যে সূর্য্য জড়পদার্থ, সুতরাং কিরণগুলিকেই তাঁহার অশ্বস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। মেঘ এবং অগ্নিও জড়পদার্থ, সুতরাং তাহাদের শক্তিকে জড়ের গুণ ভিন্ন আর কি বলা যায়। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে এ সমুদায় বস্তুরই ঐশী শক্তি বর্ণিত আছে। ইহাদিগের আকার নানাবিধ, পরিবার ও সন্তানাদি ও অনেক। উপাসনা দ্বারায়, যাঁহারা ইহাদিগকে প্রসন্ন করিতে পারেন, ঐ সকল বস্তু তাঁহাদিগের পক্ষে কল্পতরু-স্বরূপ হইয়া উঠে। তখন উহাদিগের নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। অভিলাষও পূর্ণ হইতে পারে।

পাঠক! এখন দেখ চামর এই শব্দের ব্যুৎপত্তি কি। চামর আছে যার এই অর্থে চামর হইতে পারে। এইক্ষণে ইহা অনায়াসে প্রতীতি হইবে যে মহিষের সমকালে চমরী প্রভৃতি জীবের সৃষ্টি হয়। বিড়ালাক্ষ পশুগণের, সৃষ্টির প্রক্রিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, সিংহ ব্যাঘ্র বিড়াল ও তৎসদৃশ নয়ন বিশিষ্ট পশুবর্গের উৎপত্তি হয়। হস্তির পর অর্দ্ধ-মনুষ্য অর্থাৎ হনুমানাদির জন্ম হয়।

এক্ষণে প্রিয়দর্শন পাঠক! তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার কত কাল পরে ও কত দিনে কেমন ভাবে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বল সমুদায় বিশ্বাস করিবে। সে প্রস্তাব প্রসঙ্গতঃ বলিলে চলিবে না, উহা স্বতন্ত্র বলা আবশ্যক, তাহা পরেই বলিব। এক্ষণে এই মাত্র জানা আবশ্যক যে, যে সমস্ত বৎসরের নামোল্লেখ করা গিয়াছে, উহা দেবলোকের ও ব্রহ্মার বর্ষ। মনুষ্যদিগের এক বর্ষে দেবতাদিগের এক দিন হয়। দেবতাদিগের কালমধ্যে চারিটী যুগ আছে। সমস্ত যুগের পরিমাণ ১০০০০ দশ সহস্র বৎসর—সত্যের সীমা ৪০০০, ত্রেতার সীমা ৩০০০, দ্বাপরের সীমা ২০০০, কলির সীমা এক ১০০০ সহস্র বর্ষ। এই যুগ-সমষ্টির বার হাজার বর্ষে ব্রহ্মার এক দিন হয়।

যে অনুমান-প্রমাণ অনুসারে ডারুইন মহোদয়ের মতকে আর্য্যজাতির মতের ছায়া-স্বরূপ কহা যাইতেছে তাহার প্রমাণ-সংস্থাপন জন্য কয়েকটী মাত্র বচন উদ্ধৃত করা গেল।

মনু ১ অ ১০ শ্লো	আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥	বিষ্ণু যে জলে ছিলেন তাহার প্রমাণ।
চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্য	জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তো র্বিষয়গোচরে। ৪৭	জীব-মনে জ্ঞানের সত্বা।
ঐ	পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহু-প্রহরণোবিভুঃ। ৯৪	যতকাল জল ছিল।
ঐ	প্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্ত্বং মৃত্যুরাবয়োঃ। আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা ॥১০৪	জল-ভাগ শুষ্ক হইলে কীটপতঙ্গাদি নষ্ট হয়।
ঐ দ্বিতীয়	দেবাসুরমভূদ্যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা। মহিষে সুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে॥ ২	দৈবপরিমিত ১০০ বর্ষ অর্থাৎ মনুষ্যের ৩৬৫০০ বর্ষ পর্য্যন্ত বনও জঙ্গল ছিল।
ঐ	মহিষাসুরসেনানী চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ। ৪০ যুযুধে চামরশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ। ৪১ অযুদ্ধতাঽযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ পঞ্চাশদ্ভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ॥	চমরী প্রভৃতি ক্ষুর বিশিষ্ট পশুদিগের জন্মো-কথা এবং যাহাদিগের লোম অসিতুল্য সেই পশুদিগের বিষয়—
চণ্ডীর তৃতীয় মাহাত্ম্য	ততস্যাজ মাহিষং রূপং সোঽপি বদ্ধো মহামৃধে। ততঃ সিংহোঽভবৎসদ্যো যাবৎ তস্যাম্বিকাশিরঃ।	মহিষরূপের পর সিংহ-রূপ—
ঐ	উচ্ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত। ৩০ তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সায়কৈঃ। তং খড়্গ-চর্ম্মণা সার্দ্ধং ততঃ সোঽভূন্মহাগজঃ॥ ৩১	মনুষ্যাকার পশু, গণ্ডারাদি খড়্গ ও স্থূল-চর্ম্মীর জন্ম-বিষয়ক প্রমাণ।
ঐ	ততো মহাসুরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাস্থিতঃ। তথৈব ক্ষোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৩৩	পুনর্ব্বার মহিষের জন্ম অর্থাৎ মহিষ উভচর জলও স্থল উভয় স্থলে থাকিতে পারে।—
ঐ	ততঃ সোঽপি পাদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ। অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ॥ ৪০ অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ।	অর্দ্ধ-পশু ও অর্দ্ধ-মনুষ্যাবস্থার বিবরণ।

মহিষাসুরের যুদ্ধের পর মনুষ্যাকৃতি দানবগণের যুদ্ধ দেখা যায়। পৃথিবী একালে একেবারে শুষ্ক।

প্রিয়দর্শন পাঠক! আমি তোমাকে পৌরাণিকদিগের সমুদ্র-মন্থন-বিষয় দ্বারা এ বিষয়ের আরও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। মনোযোগপূর্ব্বক তাৎপর্য্য গ্রহণ কর।

দেখ সমুদ্র-মন্থন-কালে ভগবান্ নারায়ণ কূর্ম্ম-পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন-দণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু কল্পনা করিয়া ক্ষীর-সমুদ্র আলোড়ন করিতে লাগিলেন।

রত্নাকর হইতে যে সকল মহারত্ন উদ্ধৃত হইল, তন্মধ্যে বক্ষ্যমাণ নিধিগুলিই অগ্রগণ্য, তদনুসারে অদ্য সেই গুলির নামমাত্র করিব, পরে তাহাদিগের বিষয় ও তাৎপর্য্য বিজ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমে চন্দ্র, দ্বিতীয়ে লক্ষ্মী। সুরাদেবী ইহাঁদিগের তৃতীয়া। কৌস্তভ মণি চতুর্থ। পঞ্চমে কল্পতরু পারিজাতের উত্থান। ষষ্ঠে অশ্ব-রত্ন উচ্চৈঃশ্রবাঃ। সপ্তমবারে অমৃতভাণ্ড-সহ ধন্বন্তরি মহামহোপাধ্যায় উত্থিত হইলেন। অষ্টমে মহাগজ ঐরাবতের উত্থান হয়। এত রত্ন পাইয়াও দেবগণের মনস্তুষ্টি হইল না। তাঁহারা দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া এবার ঘোরতর রূপে মন্থন আরম্ভ করিলেন। এখন কালকূট উত্থিত হইল। সেই হলাহল উত্তেজিত হইয়া সংসার-দগ্ধ করিবার উপক্রম করিল। তখন দেবগণের অভ্যর্থনায় অনাদি অনন্ত দেব-দেব মহাদেব মহাবিষ ভক্ষণ পূর্ব্বক 'সংসার' স্থির করিয়া আপনি অচেতন হইলেন।

তখন অভিন্ন-দেহ অভিন্নাত্মা সর্ব্বশক্তি-মতী মহাশক্তি প্রভাবে বিষের শক্তি নষ্ট হইয়া গেল। ভগবতীর প্রভাবে বিষের শক্তি তাঁহাতেই লীন হইল। এক্ষণে মৃত্যুঞ্জয় গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় পূর্ব্বভাব গ্রহণ করিলেন।

পাঠক! পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা যাহা কহেন তাহার সঙ্গে মিল কর, দেখিবে বৃহত্তেজের আবির্ভাবে তন্নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তেজ তাহাতেই অন্তর্লীন হইয়া যায়।

আর্য্যজাতীয় পৌরাণিকগণ ইহা অবগত ছিলেন। কি চমৎকার বুদ্ধি ও অনুমান। আর্য্যগণ! অনুমান-খণ্ডে তোমাদিগের কি অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি!

ইতি প্রথম প্রস্তাব।

শ্রীলাল।

—:০:—

শক্রু-সিংহ।

নবম অধ্যায়।

বিজয়সিংহ কে?

বিজয়সিংহ এখন শক্রসিংহের আপনার লোকের মতন হইয়াছেন। এক দিন দুই দিন করিতে করিতে ক্রমে দুই মাস গত হইল। বিজয় প্রত্যহই শক্রসিংহের ভবন পরিত্যাগের কল্পনা করেন, প্রত্যহই শক্রসিংহের কথায় নিরস্ত হয়েন। বিজয় বলিয়াছেন দেশভ্রমণই তাঁহার উদ্দেশ্য, বিশেষ কোন গুরুতর প্রয়োজন নাই। তবে কি বলিয়া তিনি শক্রসিংহকে বুঝাইবেন—কি বলিয়াই বা সহসা তাঁহার ভবন পরিত্যাগ করিবেন।

কিন্তু বিজয় অন্তরে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন। মহাবলপুরে কি হইতেছে, অনুপমা কেমন আছেন, বীরসিংহ কেমন আছেন, জানিবার জন্য তাঁহার মন সর্ব্বদাই উৎসুক।—সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন। বাহিরে সে উদ্বেগ প্রকাশ করিবার যো নাই; শক্রসিংহ সন্দেহ করিবেন।—শক্র-সিংহ অতি চতুর লোক। কাজেই বিজয়সিংহকে স্থির থাকিতে হইয়াছে।—শক্র সিংহকে আপনার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া উচিত কি না—তাহা হইলে উপকার বা অপকারের সম্ভাবনা ইহা বিজয়সিংহ এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। এই কারণেই শক্রসিংহের মনে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত করিতে বিজয়ের একান্ত অনিচ্ছা—এই জন্যই বিজয় প্রফুল্ল—এই জন্যই শক্রসিংহের ভবনে বিজয় সুখে আছেন—প্রকাশে সুখে আছেন।

বিজয় প্রকাশে সুখে আছেন।—তাঁহার মনের ভিতর কি হইতেছে?—অদ্য প্রায় দুই মাস অতীত হইল—তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কি?—এই দুই মাস তিনি মহাবল পুরের কোন সংবাদ পান নাই। তবে কি রূপেই বা নিশ্চিন্ত থাকিবেন?—বিজয়ের মনে একটুও সুখ নাই।—কিছু করিতে পারিতেছেন না।—করিবার কোন উপায়ও দেখিতেছেন না—তাঁহার মন কি করিয়া স্থির থাকিবে?

মহাবলপুরের সংবাদ না পাইলে আর চলে না।—কিন্তু কি করিয়াই বা সংবাদ পান?—তখন ডাকের বন্দোবস্ত এমন ছিল না। এখনকার মত দুই পয়সা দামের এক খানা মহারাণীর মুক আঁকা ছোট কাগজের টুকুরা চিঠির উপর লাগিয়ে দিলেই যেথানে ইচ্ছা পত্র পাঠান যাইত না। তখন এক খানি পত্র পাঠাইতে হইলে এক জন লোক পাঠাইতে হইত। এমন বিশ্বাসী লোক বিজয়সিংহের কে আছে? কাজেই

তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইয়াছে।—আর চুপ করিয়া থাকা চলে না।—মহাবলপুরের সংবাদ অবশ্য জানা চাই। নিজে যাইয়া হউক—লোক দ্বারাই হউক মহাবলপুরের সংবাদ জানিতে হইবে—বিজয়সিংহ স্থির করিলেন।

শক্রসিংহের ভবনে প্রথম দিন যে পরিচারকের সহিত বিজয়সিংহের কথোপকথন হইয়াছিল, যাহার মুখে তিনি প্রথম শক্র-সিংহের পরিচয় পান—তাহার নাম তারাচাঁদ। তারাচাঁদ অতি সরল-প্রকৃতির লোক, এই কারণেই তাহার সহিত বিজয়সিংহের ক্রমে ক্রমে বন্ধুতা জন্মিয়া ছিল। সে বিজয়কে অতিশয় ভাল বাসিত। বিজয় সিংহ যখন মহাবলপুরের সংবাদ জানিতে স্থিরসংকল্প হইলেন, তখন স্বভাবতঃ তারাচাঁদ-কেই তাঁহার মনে হইল।

তারাচাঁদের বাটী শক্র-সিংহের বাটীর অনতিদূরে বিজয় তাহার বাটীর দিকে গমন করিলেন। পথিমধ্যেই তারাচাঁদের সহিত দেখা হইল। তারাচাঁদ প্রাতঃকালে বাটী হইতে প্রভুর আবাসে আসিতে-ছিল।

বিজয় বলিলেন, "তারাচাঁদ আমি তোমার কাছে যাইতেছিলাম, তোমার সহিত দেখা হইল ভালই হইল। তোমার নিকট আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

তারাচাঁদ অতি ভাল মানুষ লোক। তাহার কাছে বিজয়ের কি বিশেষ প্রয়োজন, বুঝিতে পারিল না। সুতরাং বিজয়ের কথায় কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বিজয় বলিলেন। "তারাচাঁদ! চল আমার ঘরে যাই, অনেক কথা বহিবার আছে।"

তারাচাঁদকে লইয়া বিজয় শক্র-সিংহের ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। বিজয় আপনার শয্যায় উপবেশন করি-লেন। তারাচাঁদ তাঁহার সম্মুখে মাটীতে বসিল।

বিজয় কালি বিলম্ব না করিয়া মৃদু-স্বরে আপনার কথার সূত্রপাত করিলেন।

"তারাচাঁদ তুমি মহাবলপুর কো-থায় জান?"

"আজ্ঞে মহাবলপুর কোথায় তা আর আমি জানি না!"

"মহাবলপুর এখান থেকে বিশ বাইশ ক্রোশ পথ হইবে।"

"এক জন লোক ক দিনে সেখানে যাইতে পারে।"

"এমন লোক আছে যার এক দিন ও পুর লাগে না।"

"তোমার সন্ধানে এমন লোক আছে?"

বিজয়ের কথা শুনিয়া তারাচাঁদ একটু হাসিল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন "তারাচাঁদ তুমি হাসিলে কেন?"

তারাচাঁদ বলিল "আজ্ঞে আমার সন্ধানে এমন পাচ শত লোক আছে যারা এক দিনের মধ্যে মহাবলপুরে যাইয়া আবার এখানে ফিরিতে পারে।"

তারাচাঁদের কথা শুনিয়া বিজয় একটু বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ শত্রুসিংহের প্রকৃত অবস্থার কথা তাঁহার মনে হইল। তারাচাঁদ শত্রুসিংহের এক জন প্রধান চাকর—তারাচাঁদ যাহা বলিল তাহা মিথ্যা হইবে কেন?—বিজয় বলিলেন।

"তারাচাঁদ আচ্ছা তুমি এমন এক জন লোক ঠিক কর, যে এক দিনের মধ্যে মহাবলপুরে যাইতে পারে এবং সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাসী হয়।"

তারাচাঁদ এতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে বিজয় সিংহের কথার ভাবগ্রহ করিতে পারে নাই। বিজয় যখন তাহাকে মহাবলপুরে যাইবার জন্য লোক ঠিক করিতে কহিলেন, তখন সে সহজেই চমৎকৃত হইল।—কারণ জানিবার জন্য তাহার ঔৎসুক্য জন্মিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বিজয় বুঝিতে পারিলেন।—বলিলেন।—"তারাচাঁদ মহাবলপুরের সংবাদ জানা আমার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। মহাবলপুরে আমার বাটী।"

তারাচাঁদ জানিত বিজয়সিংহের নিবাস কাঞ্চন নগর। বিজয়সিংহ শত্রুসিংহকে তাঁহাই বলিয়াছিলেন। শত্রুসিংহের ভবনের সকলেই তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছিল।—এখন বিজয় সিংহের মুখে অন্য প্রকার শুনিয়া তারাচাঁদ অতিশয় চমৎকৃত হইল।

বিজয় বলিলেন "তারাচাঁদ আমার প্রকৃত পরিচয় তোমরা কেহই জান না। তোমাদের প্রভুকে আমার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করি নাই, করিব কি না তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। তোমার উপর আমার অতিশয় বিশ্বাস আছে, তুমি আমার যথার্থ বন্ধু, এই জন্যই প্রয়োজনের সময় তোমার নিকট আমি কোন কথা গোপন রাখিব না।"

বিজয়ের কথা শুনিয়া তারাচাঁদ সরল মন কৃতজ্ঞতরসে গলিয়া গেল, তারাচাঁদ অতি সামান্য লোক, তাহার উপর বিজয়ের এতাদৃশ বিশ্বাস!—তারাচাঁদের চক্ষু আনন্দাশ্রু-পূর্ণ হইল। তারাচাঁদ কোন কথা না কহিয়া স্থির ভাবে বসিয়া রহিল।

বিজয় বলিলেন "তারাচাদ আমার নিবাস মহাবলপুর, রাজা মহাবল সিংহ আমার খুড়া, আমার নাম প্রতাপ সিংহ। আমার আত্মীয় বন্ধুরাই কেবল আমাকে বিজয়সিংহ বলিয়া থাকেন। আমি কোন গুরুতর কারণবশতঃ দেশত্যাগী হইয়া এখানে ছদ্মবেশে আছি। সে কারণ কি তোমাকে এখন বলিব না পরে জানিতে পারিবে।"

তারাচাঁদ কোন কথা কহিল না।—কেবল ঘাড় নাড়িল।

বিজয় বলিলেন, "তারাচাঁদ মহাবলপুরে আমার ভ্রাতা কুমার বীরসিংহকে আমি পত্র দিব। অদ্য সেই পত্র লিখিয়া রাখিব। তুমি রাত্রিতে সেই পত্র লইয়া তোমার বিশ্বস্ত লোককে দিবে।

তুমি যখন রাত্রিতে আমার নিকট পত্র লইতে আসিবে সেই সময়ে আমার যাহা যাহা বলিয়া দিতে হয় সব বলিব।—কিন্তু যেন একথা কোন মতে প্রকাশ না হয়।" এই কথা বলিয়া বিজয় তারাচাঁদকে বিদায় দিলেন।—বেলাও অনেক হইয়াছে, তারাচাঁদ স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তারাচাঁদের মনের ভাব কিরূপ হইল—তাহা লিখিবার নহে অনুভব করিবার। বিজয়ও কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইলেন।—যথা সময়ে পত্র লিখিয়া রাখিলেন।—যথা সময়ে তারাচাঁদ আসিয়া পত্র লইয়া গেল।—তারাচাঁদের হস্তে পত্র দিবার সময় যাহা যাহা বলিবার আবশ্যক বিজয় তাহা বলিয়া দিলেন।

সেই দিন রাত্রি শেষেই বিজয় সিংহের পত্র লইয়া তারাচাঁদের বিশ্বাসী একজন লোক মহাবলপুরের অভিমুখে যাত্রা করিল।

—:0:—

দশম অধ্যায়।

—০—

মন্দিরে—ইন্দিরা

মেদিনীপুরের দশ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে শীলা বতী দক্ষিণ তীরে শত্রুগঞ্জ নামে একটী গ্রাম আছে। এখানে এখন অনেক লোকের বাস হইয়াছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এই স্থান চতুর্দ্দিকে জঙ্গলময় ছিল। আমাদিগের শত্রুসিংহই প্রথমে এই স্থান বাসোপযোগী করেন। তাঁহারই নামে এই স্থান শত্রুগঞ্জ বলিয়া প্রথিত হইয়াছে। সচরাচর লোকে এই স্থানকে ছত্রগঞ্জ বলিয়া থাকে। বাস্তবিক ইহার প্রকৃত নাম শত্রুগঞ্জ।—শত্রুগঞ্জ বগড়ী পরগণার মধ্যে প্রধান স্থান।—প্রতাপ সিংহ—পাঠকগণ যাঁহাকে এত দিন বিজয় সিংহ বলিয়া জানিতেন—এই শত্রুগঞ্জে শত্রুসিংহের ভবনে বাস করিতেছিলেন।

আষাঢ় মাসের শেষ—শীলাবতীর জল কাণেকাণ। স্রোত ভয়ানক। পাহাড়ে জল, বর্ণ লাল। প্রভাত সময়। প্রতাপ সিংহ শীলাবতীর তীরে ভ্রমণ করিতেছেন।—আজ প্রায় আট দিন হইল তারাচাঁদের লোক পত্র লইয়া মহাবলপুরে গমন করিয়াছে। তাহার কোন সম্বাদ নাই। এত বিলম্ব হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।—প্রতাপের মন চিন্তায় নিমগ্ন।—ভাবিতে ভাবিতে ভ্রমণ করিতেছেন। সহসা পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।—যে দিকে তারাচাঁদের বাটী সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। খানিক দূর যাইয়াই সম্মুখে সেই মন্দির। মন্দির দেখিবা মাত্রেই তাঁহার মনে হইল প্রথম দিন কি অবস্থায় তিনি সেই মন্দিরে প্রবেশ করেন।—কি প্রকারে শত্রুসিংহের সহিত তাঁহার সেই মন্দিরে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেই দিন অবধি আজ কত দিন হইল।—এত দিন

তিনি কি করিতেছেন।—এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রতাপ মন্দিরের নিকটস্থ হইলেন।—দেবাদিদেবকে দেখিতে ইচ্ছা হইল, মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।'—' দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

দেব-মূর্ত্তির সম্মুখে এক পরম রমণীয় রমণীমূর্ত্তি।—উপবিষ্টায়-ধ্যানে নিমগ্না? সুন্দরীর আলুলায়িত কেশপাশ পৃষ্ঠদেশে ভূমি স্পর্শ করিতেছে।—বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম।—নয়ন দ্বয় অতি বিশাল, বিশাল নেত্র মুদ্রিত।

রমণীর বয়স ষোল সতর।—আকৃতি নাতিখর্ব্ব নাতিদীর্ঘ।—বরং দেশীয় অন্যান্য রমণীর অপেক্ষা কিছু দীর্ঘতর। নিকটে একজন পরিচারিকা—সহচরী— দণ্ডায়মানা।

প্রতাপসিংহ চমৎকৃত হইলেন। পূর্ব্বে এ মন্দিরে তিনি কখন এরূপ পদার্থ দেখেন নি—ইনি কে?—শত্রুসিংহের একমাত্র কন্যা ইন্দিরা?

প্রতাপ শুনিয়াছিলেন, শত্রুসিংহের একমাত্র কন্যা ইন্দিরা মঙ্গল পট্টনে মাতুলালয়ে আছেন। মঙ্গল পট্টনের রাজা তাঁহার মাতুল।—ইন্দিরার অল্প বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়, শত্রু সিংহ আর দার পরিগ্রহ করেন নি। ইন্দিরা এত কাল মাতুলালয়েই ছিলেন। কবে শত্রুগঞ্জে আসিয়াছেন, সহসা কেনই বা মাতুল ভবন পরিত্যাগ করিলেন, প্রতাপ জ্ঞাত নহেন, কাজেই দেবমন্দিরে ইন্দিরাকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

প্রতাপ আর বিলম্ব না করিয়া চলিয়া আসিতেছেন, সহসা তাঁহার দিকে ইন্দিরার নয়ন পতিত হইল, উভয়েই উভয়কে নিরীক্ষণ করিলেন, ইন্দিরার নয়ন তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবৃত্ত হইল—নিমীলিত হইল। তিনি প্রতাপের দিকে আর চাহিতে পারিলেন না। প্রতাপও সেই ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন।

প্রতাপ এখন অনুমান করিলেন কাহাকে দেখিলেন।—তথাপি তাঁহার মন স্থির হইল না। ঔৎসুক্য প্রবল বেগে তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত করিতে লাগিল।—মনে করিলেন তারাচাঁদের কাছে সমস্ত জানিতে পারিবেন। তারাচাঁদের বাটীর দিকে গমন করিলেন।

ইন্দিরাকে দেখিয়া প্রতাপের মন আরও বিচলিত হইল। অনুপমাকে মনে হইল।—মহাবল সিংহকে মনে হইল। প্রতাপের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার যো হইল। দ্রুত পদে তারাচাঁদের বাটী উপস্থিত হইলেন। তারাচাঁদকে দেখিতে পাইলেন না। সে প্রাতঃকালে উঠিয়াই প্রভুর আবাসে গমন করিয়াছে। প্রতাপও শত্রুসিংহের বাটীতে গমন করিলেন। আপনার ঘরে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, মন একটু স্থির হইলে, তারাচাঁদকে ডাকাইলেন।

তারাচাঁদ উপস্থিত হইল। প্রতাপ ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন; "তারাচাঁদ মহাবলপুর হইতে লোক ফিরিয়াছে?"

তারাচাঁদ কোন উত্তর দিল না। তারাচাঁদ যে লোককে পাঠাইয়াছিল, তাহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া আর এক জন লোক পাঠাইয়াছিল। প্রতাপকে তাহা বলে নাই। কিন্তু তারাচাঁদ নিশ্চিন্ত নহে। দ্বিতীয়বার যাহাকে পাঠাইয়াছে সেও এখন ফেরে নাই।—তারাচাঁদ ভাবিয়া অস্থির হইয়াছে। যদি প্রতাপকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলে, প্রতাপ ভাবনায় অস্থির হইবেন। অথবা নিজে মহাবল পুরে যাইতে উদ্যোগ করিবেন। এই ভয়ে তারাচাঁদ নিরুত্তর রহিল।

প্রতাপ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন।—তারাচাঁদ বলিল। "আজ্ঞে মহাবল-পুরের সংবাদ এখনও পাই নাই। বোধ হয় আর দুই এক দিনের মধ্যেই আমার লোক ফিরিবে।"

"এত বিলম্বের কারণ কি ?

"বর্ষায় পথ ঘাট বন্ধ হইয়া থাকিবে, সেই জন্যই বিলম্ব হইতেছে।"

তারাচাঁদের এই উত্তর কতক সন্তোষ কর হইল। প্রতাপ ইহাতে কতক বিশ্বাসও করিলেন, বলিলেন "তারাচাঁদ যদি দুই তিন দিবসের মধ্যে তোমার লোক না ফেরে তাহা হইলে কি হইবে?"

"তাহা হইলে আর এক জন লোক পাঠাইব।"

"আচ্ছা তবে আর এক জন লোক ঠিক করিয়া রাখ।"

"আজ্ঞে আপনার আশীর্ব্বাদে ঠিক করাই আছে। লোকের অভাব নাই। আপনি তাহার জন্য ভাবিত হইবেন না।"

"আচ্ছা তারাচাঁদ তোমার প্রভুর কন্যা এখন কোথায়?"

এরূপ অসঙ্গত প্রশ্নের ভাব তারাচাঁদ বুঝিতে পারিল না। তারাচাঁদ—সরলপ্রকৃতি—অশিক্ষিত।—অনুমান খণ্ডে তাহার দৃষ্টি নাই। সে কি করিয়া অনুমান করিবে। যাহাই হউক সে সকল চিন্তা না করিয়া—তারাচাঁদ প্রতাপের প্রশ্নের উত্তর করিল "আমার প্রভুর কন্যা ইন্দিরা দেবী এত দিন মঙ্গলপট্টনে মামার বাড়ী ছিলেন, কাল এখানে এয়েছেন।"

প্রতাপ নিঃসংশয় হইলেন। তিনি শত্রু-সিংহ-দুহিতা ইন্দিরাকেই মন্দিরে দেখিয়াছেন।—জিজ্ঞাসা করিলেন "তারাচাঁদ তোমাদের প্রভু-কন্যা এমন সহসা মাতুলালয় পরিত্যাগ করিলেন কেন?"

কি কারণে ইন্দিরা মঙ্গলপট্টন পরিত্যাগ করিয়াছেন তারাচাঁদ তাহা জানে, কিন্তু প্রকাশ করিতে প্রভুর নিষেধ। তারাচাঁদ বলিল "অধীন তাহা বলিতে পারে না।"

প্রতাপও আর অধিক পীড়া পীড়ী করিলেন না। তিনি আপনার ভাবনাতেই ভোর হইয়া আছেন। অন্যের চিন্তার অবকাশ কোথায়?

একাদশ অধ্যায়।

প্রতাপের উৎকট রোগ।

প্রতাপের মন ক্রমেই চিন্তায় আকুল হইতে লাগিল। এক দিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন গেল, তথাপি তারাচাঁদের লোক ফিরিল না। আরও দুই দিন দেখিলেন, তবুও কাহারও দেখা নাই। '?' তারাচাঁদ আর এক জন লোক পাঠাইল।

শক্রসিংহ এ সকল বৃত্তান্ত কিছুই জানেন না। কিন্তু শক্রসিংহও নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহার মুখ সর্ব্বদাই গভীর বিমর্ষ ভাব ধারণ করিয়া আছে। তিনি সর্ব্বদাই আপনার ঘরে নির্জ্জনে চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। প্রতাপসিংহকে—তাঁহার প্রিয় বিজয়সিংহকেও—আপনার উদ্বেগের কারণ অবগত করান না। প্রতাপ সিংহ নানা প্রকার সন্দেহ করেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারেন না।

প্রতাপ সিংহের মন দ্বিগুণ চিন্তায় আকুল হইল।—তাঁহার নিজের অবস্থার বিষয় চিন্তা। আবার তাঁহার পরমহিতৈষী—এক মাত্র সহায় শক্রসিংহের অবস্থার বিষয় চিন্তা—প্রতাপ যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন কেহই কোন উত্তর দিতে পারে না। শক্রসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও কোন উত্তর দেন না। একটু হাসিয়াই প্রতাপের প্রশ্নের শেষ করিয়া দেন।

প্রতাপ দেখিতে পাইলেন শক্রসিংহের ভবনে বিষাদ আসিয়া ক্রমে স্থান গ্রহণ করিতেছে।—আর সেরূপ পূর্ব্বের মত চির-প্রফুল্লতা নাই। শক্রসিংহের সেরূপ প্রশান্ত ভাব নাই। পরিচারকেরা সর্ব্বদাই যেন চকিত।—সর্ব্বদাই সাবধান।—সর্ব্বদাই কাণেকাণে কথা।—এরূপ সর্ব্বনেশে কাণে কাণে কথা দেখিয়া প্রতাপ আরও ভীত হইতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন কোন গুরুতর বিপদ্ শীঘ্রই উপস্থিত হইবে।—বিপদ্ কার? শক্রসিংহের কন্যা মাতুলালয় কেন সহসা পরিত্যাগ করিলেন? মঙ্গলপট্টনের রাজা কি শক্রসিংহের শত্রু হইলেন? এমন আত্মীয় কি পর হইল?—অমৃত-বৃক্ষ কি বিষ-বৃক্ষে পরিণত হইল?—প্রতাপ বুঝিতে পারিলেন না; বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

প্রতাপের প্রকৃত অবস্থা কি শক্রসিংহ জানিতে পারিয়াছেন? তারাচাঁদ কি গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়াছে?—মহাবল সিংহকে শত্রু মধ্যে গণ্য করিবার ভয়েই কি শক্রসিংহ ভীত হইয়াছেন?—প্রতাপ বুঝিতে পারিলেন না।

এইরূপ ভাবনায় প্রতাপের হৃদয় জর্জরিত হইতে লাগিল। সহজেই তাঁহার মন,দুঃখে—হতাশে—ভাবনায় জীর্ণ হইয়া আছে। শুষ্ক বৃক্ষ আর কত ঝড় সহ্য করিতে পারে?—প্রতাপ সহসা পীড়িত হইলেন তাঁহার জ্বর হইল।

প্রথম দুই তিন দিন জ্বর কম হইল।

চতুর্থ দিবসেও জ্বরের তেজ বড় অধিক ছিল না। পঞ্চম দিবসে ভয়ানক তেজে জ্বর ফুটিল। শত্রুসিংহ প্রথম কএক দিবস বড় একটা ভাবিত হন নাই। জ্বরের তেজ এত প্রবল দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল। পরিচিত এক জন কবিরাজকে ডাকাইলেন।

কবিরাজ মহাশয় জাতিতে কৈবর্ত্ত। বয়স পঞ্চাশ বৎসরের ও অধিক। বিদ্যা সাধ্য কিছুই নাই।—তবে চিকিৎসা করা তাঁহাদের কৌলিক কর্ম্ম। তাঁহার বাপ পিতামহ চিকিৎসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনিও "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই প্রবাদ-বচনের অনুসরণ করিতেছেন।

কবিরাজ মহাশয় আড়াই ঘণ্টা ধরিয়া নাড়ী টিপিলেন। মুখ বিকৃত করিয়া দুই চারি বার ঊর্দ্ধে, দুই চারিবার নিম্নে, দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। প্রতাপের শয্যার পার্শ্বে তারাচাঁদ ও শত্রুসিংহ উপবিষ্ট। কবিরাজ মহাশয় উভয়ের দিকেই আশঙ্কা-সূচক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন।—

"বিকার উপস্থিত। সান্নিপাতিক জ্বর। রসায়ন করিতে হইবে, শক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।"

শত্রুসিংহের চক্ষু স্থির, তারাচাঁদের চক্ষু স্থির। কবিরাজের উপর তারাচাঁদের প্রগাঢ় বিশ্বাস শত্রুসিংহের তত নহে। তারাচাঁদ রসায়ন করিতে জিদ করিতে লাগিল। শত্রুসিংহ বলিলেন আরও দুই চারি দিন বিলম্ব করিতে হইবে। তারাচাঁদ ও কবিরাজ উভয়েই তাহাতে সম্মত হইল।

জ্বর ক্রমে প্রবল হইতে লাগিল। নবম দিনে রসায়ন করা হইল।—পূর্ব্বে যে একটু জ্ঞান ছিল রসায়ন-ক্রিয়ার পর রোগীর সে জ্ঞান টুকুও লুপ্ত হইল।

সকলেই হতাশ হইল। তারাচাঁদ ইতি কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইল। প্রতাপের প্রকৃত পরিচয় তারাচাঁদ কি প্রভুকে জানাইবে। তারাচাঁদ মনে মনে ভাবিল বলিল না।—"পূর্ব্বে যখন কোন পরিচয় দিই নাই, এখন দিলেই বা ফল কি? ভগবান যা করেন—কপালে যা থাকে?" এইরূপ স্থির করিয়া তারাচাঁদ প্রভুকে প্রতাপের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিল না।"

প্রতাপ বাহির হইতে অন্দরে আনীত হইলেন। ইন্দিরা ও তাঁহার সখী প্রতাপের সুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। প্রতাপ অজ্ঞান হইয়াই আছেন। মধ্যে মধ্যে প্রলাপ বকেন!—"অনুপমা!—বীরসিংহ! মহাবলসিংহ!—পাষণ্ড নরাধম!" এইরূপ অসংলগ্ন বাক্য সকল তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হয়।

ইন্দিরা—কিছুই বুঝেন না—কিছুই অবগত নহেন। তিনি প্রতাপকে এক বার মাত্র, নিমেষ মাত্র, মন্দিরে দেখিয়াছিলেন। একবার মাত্র পিতার কাছে শুনিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বিজয়সিংহ, নিবাস কাঞ্চন নগরে।—দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া শত্রু-গড়ে অবস্থিতি করি-

তেছেন। ইন্দিরা যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন প্রতাপ তাঁহার পিতার অতি প্রিয় পাত্র। কেবল ইহাই বুঝিয়াছিলেন, ইহাতেই যথেষ্ট হইয়াছিল। অধিক জানিতে বাসনা হয় নাই।

প্রতাপ পিতার প্রিয় পাত্র--সুতরাং প্রতাপ ইন্দিরার যতনের ধন। ইন্দিরা প্রাণপণে প্রতাপের সুশ্রূষায় নিরত হইয়াছেন। আহার নিদ্রা বন্ধ—দিবারাত্রি প্রতাপের শয্যার পার্শ্বে।

আনাড়ী চিকিৎসকে প্রতাপের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। রসায়ন-ক্রিয়ার পর হইতেই প্রতাপের অজ্ঞানাবস্থা,—কতক ইন্দিরার সুশ্রূষায়, কতক স্বভাবের গতিতে, পঞ্চদশ দিবসের পর প্রতাপের একটু সংজ্ঞা হইল। ইন্দিরার মনে আনন্দ হইল। প্রতাপ চক্ষু চাহিলেন, ইন্দিরার মুখ একটু প্রফুল্ল হইল।

প্রতাপ চাহিলেন, দেখিলেন তাঁহার পার্শ্বে,—মাতার নিকটে একটী সুন্দরী নারী। অনেক ক্ষণের পর চিনিতে পারিলেন। বুঝিলেন ইন্দিরা।—বুঝিলেন ইন্দিরা তাঁহার সুশ্রূষায় নিযুক্ত আছেন। দুই তিন বার ইন্দিরার মুখের দিকে চাহিলেন।—প্রতাপের চক্ষে জল আসিল। ইন্দিরা ইহা দেখিলেন, কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না। তিনি প্রতাপের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত নহেন, কেমন করিয়া জানিবেন প্রতাপের চক্ষে কিসের জল, কেন আসিল?

পাঠক! তুমি বল দেখি সে জল কিসের জল? এ কি আনন্দাশ্রু? ইন্দিরা শত্রু সিংহের একমাত্র কন্যা, শত্রু সিংহের আদরের ধন, তাঁহার সুশ্রূষা করিতেছেন, ইহাতেই কি প্রতাপের মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসের উদ্রেক হইল? সেই আনন্দ রস পবিত্র কৃতজ্ঞতা-রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া কি নয়ন দিয়া বাহির হইল?—মনে স্থান না পাইয়া কি চক্ষু দিয়া নির্গত হইল?—না ইন্দিরাকে দেখিয়া তাঁহার অনুপমার রূপ মনে হইল, মহাবলপুর মনে হইল, আপনার প্রকৃত অবস্থা মনে হইল—আর চক্ষে জল আসিল?

এ অশ্রু কিসের অশ্রু? সুখাশ্রু কি দুঃখাশ্রু?—আমার জ্ঞান হয় ইহা উভয় মিশ্রিত।—আধ সুখের আধ দুঃখের—আধ হাসি আধ কান্না।

আজ অবধি প্রতাপের অবস্থা ক্রমে ভাল হইতে লাগিল। প্রতাপের ক্রমে ক্রমে আহারে শক্তি হইল, আহারে রুচি জন্মিল, প্রতাপ ক্রমে সারিতে লাগিলেন। অল্পে অল্পে রোগ কমিতে লাগিল।

ইন্দিরা পূর্ব্বের ন্যায় দিবারাত্রি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উভয়েই নীরবে। প্রতাপের কথা কহা নিষেধ—কথা কহিতে শক্তি নাই—কায়িক শক্তি নাই।—ইন্দিরারও কথা কহিতে শক্তি নাই--মনের শক্তি নাই—সাহস নাই। উভয়েই নীরবে! প্রতাপের জীবনের আর কোন শঙ্কা নাই। ইন্দিরার সুশ্রূষায় দিনে দিনে সুস্থ হইতে

লাগিলেন। ইন্দিরার যত্ন একটুও কমে নি, কিন্তু এখন অবধি ইন্দিরা আর সর্ব্বদাই প্রতাপের পানে চান না। যখন ঔষধ কিম্বা আহার দিবার আবশ্যক, তখনই ইন্দিরা প্রতাপের নিকট।—পূর্ব্বে প্রতাপের শয্যার এক পার্শ্বেই ইন্দিরার আসন ছিল, এখন তিনি স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করেন। এরূপ পরিবর্ত্তের ভাব কি প্রতাপ বুঝিলেন না। কেমন করিয়াই বা তিনি বুঝিবেন? কেই বা বুঝিতে পারে? যাহাই হউক আমরা ইহাঁদিগকে এখন এই ভাবেই রাখিয়া চলিলাম।

ক্রমশঃ।

আর্য্যবংশ।

তৃতীয় প্রস্তাব।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

অ্যালেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যু। মিগাস্‌থেনিসের আগমন; এবং চন্দ্রগুপ্ত।

অ্যালেক্‌জাণ্ডার আরবসাগরের উপকূলস্থ জিড্রোসিয়া (Gedrosia) মরুভূমির উপর দিয়া পারস্য-রাজধানী পার্সিপোলিস্ (Persepolis) নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন (পূ, খ্রী ৩২৫)। অবিশ্রান্ত রণে ও পথশ্রমে তাঁহার বজ্রময় দেহও অবসন্ন হইয়া পড়িল। শরীরের অবসন্নাবস্থায়ও তিনি তদাপরিজ্ঞাত সমস্ত ধরাতলকে এক বাণিজ্যসূত্রে সম্বদ্ধ করিবেন কল্পনা করিতেছিলেন, এমন সময় ভীষণজ্বর তাঁহার শরীর আক্রমণ এবং খ্রীষ্ট শকের ৩২৪ বৎসর পূর্ব্বে ২৮এ মে তারিখে তাঁহার অমূল্য জীবনের সীমা নির্দ্দেশ করিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় বিশাল সাম্রাজ্য শতধা বিভক্ত হইল। এসিয়ার উত্তর পূর্ব্ব খণ্ড বিজয়ী সেলিউকসের (Seleucus Nicator) হস্তে পতিত হইল। এই নরপতিই সুবিখ্যাত দার্শনিক মিগাস্‌থেনিস্‌কে (Megasthenis) মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের নিকট দূতরূপে প্রেরণ করেন। বীরবর অ্যালেক্‌জাণ্ডারের আগমন ভারতের তমসাচ্ছন্ন পুরাবৃত্তে অরুণোদয় মাত্র হইয়াছিল; কিন্তু মিগাস্থেনিসের আগমন ইহাতে মরীচিমালীর পূর্ণ কিরণ বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। মিগাস্থেনিসের আগমনেই ইউ-

রোপীয় পুরাবিদ্‌গণ ভারতবর্ষের বিশেষতঃ মগধরাজ্যের অধীশ্বর চন্দ্রগুপ্তের বিষয়ে সবিশেষ অবগত হন।

ইউরোপীয় পুরাবিদ্‌গণ চন্দ্রগুপ্তের বিষয় উল্লেখ না করিলে ভারতবর্ষের কালবিজ্ঞান চিরকালই নিবিড়অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত। এক্ষণে দেখা যাউক ইউরোপীয় পুরাবিদেরা যে মগধেশ্বরের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বাস্তবিক চন্দ্রগুপ্ত কি না। তাঁহারা তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্ত নামে নির্দ্দেশ করিলে এরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারিত না। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা মগধেশ্বরকে সন্দ্রকত্তস্ (Sandracottus) বা সন্দ্রকিপ্তস্ (Sandrocyptus) নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্রীকদিগের সন্দ্রকত্তস্ বা সন্দ্রকিপ্তস্—ভারতবর্ষীয়দিগের চন্দ্রগুপ্ত কি না, ইহার নির্ণয় করিতে হইলে, সন্দ্রকত্তস্ বা সন্দ্রকিপ্তস্ সম্বন্ধে গ্রীক পুরাবিদেরা যাহা লিখিয়াছেন, এবং চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারগণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এবং উভয়বর্ণনার সাদৃশ্য নিরূপণ দ্বারা উভয়দেশীয় গ্রন্থকারদিগের বর্ণনার বিষয়ীভূত ব্যক্তিদ্বয়ের একতা প্রতিপন্ন করিতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, সন্দ্রকত্তস্ বা সন্দ্রকিপ্তস্ সম্বন্ধে গ্রীক্ পুরাবিদেরা কি লিখিয়াছেন।

যষ্টিন্ (Justin) বলেন:—"সন্দ্রকত্তস্ অ্যালেক্‌জাণ্ডারের গৃহ-প্রতিগমনের পর ভারতে স্বাধীনতা পুনঃসংস্থাপন করেন। কিন্তু ভারতবিজয়ের পর তিনি অচিরকালমধ্যেই সেই স্বাধীনতাকে দাসত্বে পরিণত করিয়া, যাহাদিগকে বিদেশীয়দিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকেই নিজ দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করেন। এই নরপতি নীচকুলোদ্ভব হইয়াও দৈবীশক্তিবলে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। যে সন্দ্রকত্তস্ নিজ সোৎপ্রাস বাক্যে অ্যালেক্‌জাণ্ডারের ক্রোধানল উদ্দীপিত করায় আলেক্‌জাণ্ডার তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রচার করেন, এবং যিনি কেবল পলায়ন দ্বারাই আপনার প্রাণরক্ষা করেন; সেই সন্দ্রকত্তস্ দৈবীশক্তিবলেই মগধসিংহাসনে আরূঢ় হন। অ্যালেক্‌জাণ্ডারের নিকট হইতে পলায়নের পর একদিন তিনি যেমন পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ভূমি-শয্যায় শয়ান ছিলেন, তখন এক বিশালমূর্ত্তি সিংহ জিহ্বার লেহন দ্বারা তদীয় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরকে নির্ঘর্ম্ম করিয়া তাঁহার অঙ্গে বিন্দুমাত্র আঘাত না করিয়াই অন্তর্হিত হইল। এই অদ্ভুত ঘটনা তাঁহার অন্তরে উন্নত আশার সঞ্চার করিয়া দিল। তিনি দস্যুদল সংগ্রহ করিয়া ভারতবাসীদিগকে অ্যালেক্‌জাণ্ডারের বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়া দিলেন। তিনি এইরূপে সসৈন্য অ্যালেক্‌জাণ্ডারের সেনানীগণের বিরুদ্ধে সমরে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে এক প্রকাণ্ড হস্তী তাঁহার সম্মুখীন হইয়া পোষিত হস্তীর ন্যায় তাঁহাকে পৃষ্ঠ দেশে উত্তো-

লন পূর্ব্বক সমরোন্মুখী হইল। তিনি অসমসাহসিক সৈনিকপুরুষ ও অতি প্রসিদ্ধ সেনানায়ক ছিলেন। এইরূপে প্রভুতা-সম্পন্ন হইয়া সন্দ্রকত্তস্—যে সময়ে সেলিউকস এসিয়ায় নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন—সেই সময়েই ভারত-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সেলিউকস্ সন্দ্রকত্তসের সহিত সন্ধি-বন্ধন-পূর্ব্বক সিন্ধুতীরবর্ত্তি স্বরাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া অ্যান্টিগোনসের (Antigonus) বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন।"(১)

ডাওডোরস্ সিকিউলস্ (Diodorus Siculus) (২) বলেনঃ—"যখন অ্যালেক্‌জাণ্ডার ভারতের আভ্যন্তরিক বিষয়ের অনুসন্ধান করেন, তখন অবগত হন যে, সিন্ধুর পূর্ব্বতীরে দ্বাদশদিন-গম্য-পথ-পরিমিত এক সুদীর্ঘ মরুভূমি ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাহার পরেই গঙ্গানদী প্রবাহিত হইতেছে। গঙ্গা পার হইলেই প্রাচ্য (Prasii) এবং অনুগাঙ্গদিগের আবাস স্থান পাওয়া যায়। তাহাদিগের রাজার নাম ঋন্দ্রমাঃ (Xandramas)। ইনি রণস্থলে ২০০০০ বিংশতি সহস্র অশ্ব, ২০০০০০ দুই লক্ষ পদাতিক, ২০০০ দ্বিসহস্র রথ এবং ৪০০০ চতুঃ-সহস্র হস্তীর সমাবেশ করিতে পারেন। অ্যালেক্‌জাণ্ডার প্রথমে ইহা বিশ্বাস করেন নাই। পরে পুরুর নিকট এ বিষয়ের তথ্য জিজ্ঞাসা করায়,—তিনি বলিলেন 'এ সমস্তই সত্য, কিন্তু ঐ রাজা অতি নীচকুলোদ্ভব। শুনিতে পাই, তিনি ক্ষৌরকারৌরস-সম্ভূত। তদীয় জননী মগধেশ্বরী কোন ক্ষৌরকারের প্রণয়ে আসক্ত হইয়া জার-সহযোগে স্বভর্ত্তা মগধেশ্বরের প্রাণবধ করেন, এবং স্বগর্ভে সেই ক্ষৌরকার কর্তৃক জনিত ঋন্দ্রমাঃ নামক পুত্রকেই মগধ-সিংহাসন প্রদান করেন।"

'কুইণ্টস্ কর্সিয়াস্ (Quintus Curtius) (৩) বলেন ঃ—

"ঋন্দ্রমার পিতা মগধেশ্বরের প্রাণবধ পূর্ব্বক অভিভাবক-চ্ছলে তদীয় পুত্রগণকে নিজ করতলস্থ করিয়া শমন-সদনে প্রেরণ করেন। তাহাদিগের বিনাশ সাধনের পর তিনি মহিষীর গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করেন, তিনিই তৎকালে মগধ-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। ইনি রাজ-সিংহাসন অপেক্ষা পিতার ব্যবসায়েরই (ক্ষৌর-কার্য্য) উপযোগী ছিলেন বলিয়া প্রজা-মণ্ডলীর বিদ্বেষ-ভাজন ও ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ষ্ট্রাবো (৪) বলেন, "গঙ্গা এবং অন্য এক নদীর সঙ্গমস্থলে প্রাচ্য-দিগের রাজধানী (Palibothra) পালিবথ্র। (পাটলিপুত্র) নগর অবস্থিত ছিল।"

(১) Justini Hist. Philipp. Lib. XV. Cap IV.

(২) Diodorus Siculus, XVII. 93.

(৩) Quintus Curtius, IX. 2.

(৪) Strabo, XV. 1. 36.

এরিয়ান্ বলেন (৫) "এই অন্য নদীর নাম (Erannoboas) ইরান্নোবোয়াস্ (আধুনিক শোণ)। এরূপ প্রবাদ আছে যে, প্রাচ্যদিগের রাজা, তাঁহার জন্ম-নাম ব্যতীতও তাঁহার নগরের নামে খ্যাত ছিলেন অর্থাৎ লোকে তাঁহাকে পাটলিপুত্রীয় বলিয়া ডাকিত।" যে সন্দ্রকত্তসের নিকট মিগাস্থেনিস্ প্রেরিত হন, যে সন্দ্রকত্তসের সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক সেলিউকস্ নিকেটর সিন্ধুতীরবর্ত্তী স্বকীয় সমস্ত রাজ্য তাঁহাকে সমর্পণ করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে ৫০০ পঞ্চ শত মাত্র হস্তী প্রাপ্ত হন (৬), সেই সন্দ্রকত্তসের ঘটনাবলীর সহিত পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলীর সম্পূর্ণ একতা উপলক্ষিত হয়। এরিয়ান্ (৭) বলেন, "মিগাস্থেনিস্ অনেকবার সন্দ্রকত্তসের রাজধানীতে গমন করেন।" এবং প্লুটার্ক ঐ রাজার বিষয়ে লিখিয়াছেন (৮) যে "তিনি ছয় লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে ভারতের দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া সমস্ত ভারতে আপনার অপ্রতিদ্বন্দিনী প্রভুতা সংস্থাপন করেন।"

ভারতের কোন্ রাজা ইউরোপীয় পুরাবিদ্গণের এই সকল বর্ণনার বিষয়ীভূত তা। সহজেই উপলব্ধি হয়। পুরাকালে ভারতে কবিরাই পুরাবিদ্ ও কবি এই উভয়েরই কার্য্য সম্পাদন করিতেন বলিয়া, ভারতের পুরাবৃত্ত কবিত্ব-সুলভ অত্যুক্তি দোষে দুষ্ট। এই জন্য ভারতীয় পুরাবিদ্গণের বর্ণনার বিষয়ীভূত রাজাদিগের পরস্পর বৈষম্য কিছুই উপলব্ধ হয় না। তাঁহাদিগের বর্ণনার মহিমায় সমস্ত রাজাই প্রায় একরূপ প্রতীয়মান হয়। সকল রাজাই আসমুদ্রক্ষিতীশ,—সকল রাজাই আজন্ম-শুদ্ধ; সকল রাজাই শুদ্ধ প্রজাদিগের মঙ্গলার্থই কর গ্রহণ করিতেন,—সকল রাজারই অর্থ ও কাম ধর্ম্মেই পর্য্যবসিত হইত; সকলেই বিষয়-ভোগে অনাকৃষ্ট, এবং সকলেই বিদ্যার পারদর্শী। রাজা হইলেই অশেষ-গুণ-সম্পন্ন হইতে হইবে—যেন জগতে নিগুর্ণ রাজা নাই। সুতরাং শুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা কোন রাজা বিশেষের নিরাকরণ করা সহজ নহে। নাম নির্দ্দেশ ব্যতীত কোন ভারতবর্ষীয় রাজার স্থিরীকরণ হয় না। আর্য্যদিগের গ্রন্থসকলে চন্দ্রগুপ্তের নাম উল্লেখ না থাকিলে, চন্দ্রগুপ্ত ও মগধবংশবিষয়ক ইতিবৃত্ত চিরকাল তমসাচ্ছন্ন থাকিত। তাহা না হইলে গ্রীকদিগের উল্লিখিত সন্দ্রকত্তস্ বা সন্দ্রকিপ্তস্ এবং আর্য্যদিগের চন্দ্রগুপ্ত যে একই তাহা কেহই জানিতে পারিতেন না। তাহা না হইলে সন্দ্রকত্তস্ ও চন্দ্রগুপ্ত এই নামদ্বয়ের শব্দ ও বর্ণসাদৃশ্য,—এবং উভয় নরপতির বর্ণনার

(৫) Arrian, Indica, X. 5.
(৬) Strabo, XV. 2. 9.
(৭) Arrian, Exped. V. 6, Indica, V. 3.
(৮) Plutarch, Vita Alexandri, C. 62.

সাদৃশ্য—দ্বারা তাঁহাদিগের একতা ও অভিন্নতা কে প্রতিপাদন করিতে পারিতেন? সার উইলিয়ম্ জোন্‌সই (১) সর্ব্ব প্রথমে সন্দ্রকত্তস্ ও চন্দ্রগুপ্তের এই সাদৃশ্য নির্দ্দেশ করেন। তৎপরে অধ্যাপক উইলসন্, লাসেন এবং উইল্‌ফোর্ড ও জোন্‌সের এই মতের অনুমোদন করেন। ভারতবর্ষীয়দিগের চন্দ্রগুপ্ত ও গ্রীকদিগের সন্দ্রকত্তস্—ইহাঁদিগের ঘটনাবলীর সাদৃশ্য এত অধিক যে কেহই জোন্‌সের মতের অনুমোদন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সন্দ্রকত্তস পালিবথ্রা নগরে এক নূতন রাজবংশ সংস্থাপন করেন,—চন্দ্রগুপ্তও পাটলিপুত্র নগরে নূতন মৌর্য্যবংশ সংস্থাপিত করেন। সন্দ্রকত্তস্ দস্যুদল সংগ্রহ পূর্ব্বক পালিবথ্রার সিংহাসন অধিকার করেন,—চন্দ্রগুপ্ত ও ঠিক সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সন্দ্রকত্তস্ অমানুষী ঘটনা ও দৈবীশক্তিবলে সাম্রাজ্য লাভ করেন,—চন্দ্রগুপ্ত ও অদ্ভুত ঘটনা ও দৈববলে সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হন। সুতরাং রাজতরঙ্গিণীর সম্পাদক ট্রয়ার (Troyer) প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত এই মতের প্রতিবাদ করিলেও ইহা এক্ষণে প্রায় সর্ব্বত্রই অসন্দিগ্ধরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে যষ্টিন্, এরিয়ান্, ডাওডোরস সিকিউলস্, ষ্ট্রাবো, কুইন্‌টস্ কসিয়স এবং প্লুটার্ক প্রভৃতি পুরাবিদেরা লিখিয়াছেন—খ্রীষ্টের ৩২৮ বৎসর পূর্ব্বে যৎকালে বীরবর আ্যালক্‌জাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তৎকালে মগধের সিংহাসনে ঋন্দ্রমাঃ (Xandrames) নামক একজন নরপতি অধিষ্ঠিত ছিলেন। এবং পুরাণে ও মুদ্রারাক্ষস নামক নাটক গ্রন্থেও লিখিত আছে, যে একজন পুরুরাজের আত্মীয় প্রতীচ্য হিন্দু নরপতি যবনগণ কর্ত্তৃক (Greeks) রাজ্যচ্যুত হইয়া মগধ-সম্রাট্ নন্দের রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাতে স্পষ্টই অনুমান হইতেছে যে, গ্রীকেরা ঋন্দ্রমাঃ শব্দে মগধসম্রাট্ নন্দকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নন্দের সর্ব্বশুদ্ধ নয় পুত্র ছিল, তন্মধ্যে অষ্ট সবর্ণাজাত এবং একজন অসবর্ণা-গর্ভজাত। গ্রীক ও ভারতবর্ষীয়দিগের গ্রন্থে লিখিত আছে, নন্দ মন্ত্রী কর্ত্তৃক নিহত হইলে, সবর্ণাজাত পুত্রগণের অন্যতম তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতৃহন্তা মন্ত্রির অসহ্য আধিপত্য অধিক দিন সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই ঘটনার পর তিনি সোদর ভ্রাতৃগণের সহিত একত্র রাজ্যপালন আরম্ভ করেন। চন্দ্রগুপ্ত দাসীর গর্ভজাত বলিয়া সবর্ণাজাত ভ্রাতৃগণের সহিত পিতৃসিংহাসন অধিকার করিতে পান নাই। ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে পর্য্যাপ্ত বৃত্তি প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত অপমান বোধে ইহাতে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকৃত

(১) Asiatic Researches, Vol. IV. P. II.

হইলেন। ভ্রাতৃগণ ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া তদীয় নিধনে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত ইহা অবগত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রতীচ্য দেশে পলায়ন করেন।

খ্রীষ্টশকের ৩২৮ বৎসর পূর্ব্বে অ্যালেকজাণ্ডার ভারতের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন। এই বৎসরের শেষেই পূর্ব্বোল্লিখিত পুরুরাজের আত্মীয় প্রতীচ্য নরপতি অ্যালেকজাণ্ডার কর্তৃক উদ্বেজিত হইয়া মগধরাজধানী পাটলিপুত্র নগরে (Palibothra) আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং এই বৎসরেই মন্ত্রি-কর্তৃক নন্দের গুপ্তহত্যা সংসাধিত হয়। ইহার পর বৎসরেই (৩২৭ খ্রীঃ, পূ) অ্যালেকজাণ্ডার হাইফেসিস (Hyphassis) নদীর তীরে সমবেত পুরুসৈন্যের উপর বিজয় লাভ করেন। চন্দ্রগুপ্তও ভ্রাতৃভয়ে পলায়িত হইয়া এই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত বিজয়ী অ্যালেক্‌জাণ্ডারের শিবিরে গমন করেন এবং তাঁহার স্বাধীন ও নির্ভীক কথোপকথনে অ্যালেকজাণ্ডারকে এতদূর সংক্ষোভিত করিয়াছিলেন, যে যদি তিনি অতি ত্বরায় পলায়ন না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অ্যালেকজাণ্ডার তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করিতেন।

যাহা হউক চন্দ্রগুপ্ত অ্যালেকজাণ্ডারের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া অসংখ্য বিপদ্ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অবশেষে মগধে প্রত্যাগত হইলেন। এই সময়ে সিংহাসনারূঢ় নন্দপুত্রগণ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন চাণক্য নামে একজন ভীষণ-প্রকৃতি ব্রাহ্মণের ক্রোধানল উদ্দীপিত করেন। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া নন্দবংশোচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক চন্দ্রগুপ্তকে মগধ সিংহাসন প্রদান এবং স্বয়ং তাঁহার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন (৩১৪ পূ, খৃঃ)। চাণক্যের মন্ত্র-বল ও নিজ বাহুবল চন্দ্রগুপ্তকে অচিরকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের অপ্রতিদ্বন্দী সম্রাট্ করিয়া তুলিল, চন্দ্রগুপ্তের নাম শুদ্ধ ভারতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল এরূপ নহে—সিন্ধুর পশ্চিম পারস্থ সমস্তদেশেই ইহার প্রতিধ্বনি শ্রুতিগোচর হইয়াছিল।

অ্যালেক্‌জাণ্ডার পঞ্জাবে যে গ্রীক উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া যান, এবং যে গ্রীক উপনিবেশ পরে সেলিউকসের রাজ্যের অন্তর্গত হয়, তাহারই উপর চন্দ্রগুপ্তের বাহুবল অবশেষে বিনিয়োজিত হয়। তিনি তাহাদিগকে সমরে পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এ দিকে সেলিউকস ভারতবর্ষীয় অধিকার-নাশে ক্রোধান্ধ হইয়া সেই সকল অধিকার পুনরাহরণার্থ চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে রণথ্যাপনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন, এবং অসংখ্য সৈন্যের ধুরীণ হইয়া ভারতে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু প্রবেশ করিয়া দেখিলেন চন্দ্রগুপ্তও অসংখ্য সৈন্যসহ তাঁহাকে যুদ্ধ-প্রতিদানে প্রস্তুত রহিয়াছেন। পশ্চিমে অ্যান্‌টিগোনস্ ও তদীয় নগরবিজয়ী পুত্র ডেমিট্রিয়স্ পলিয়র্সিটস্—

এবং পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার সমরোৎসাহী সেনাগণ—দ্বারা যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া সেলিউকস্ অগত্যা চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধিসংস্থাপনে বাধ্য হইলেন, এবং নিজ ভারতীয় সমস্ত অধিকারের উপর স্বকীয় স্বত্ব ত্যাগ করিলেন। সেলিউকসের এই অবনতি-স্বীকারে চন্দ্রগুপ্ত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পঞ্চশত হস্তী উপহার প্রদান করেন। এবং ষ্ট্রাবো বলেন তাঁহারা বন্ধুত্ব চিরস্থায়ি করিবার জন্য পরস্পর বৈবাহিক-সূত্রে সম্বদ্ধ হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কিরূপে এই বৈবাহিক সম্বন্ধ সংঘটিত হয় অর্থাৎ তাঁহাদিগের মধ্যে কে সম্প্রদাতা আর কেই বা পরিণেতা তিনি তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। যৎকালে সেলিউকস্ ভারত আক্রমণ করেন, তৎকালে চন্দ্রগুপ্তের বয়স অধিক হয় নাই, সুতরাং সে সময়ে তাঁহার পরিণয়-যোগ্যা কন্যা থাকার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই জন্য চন্দ্রগুপ্তের সম্প্রদাতা না হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। ষ্ট্রাবো বলেন সেলিউকসের পারস্য-পত্নী-সম্ভূত অসামান্য-রূপলাবণ্য-সম্পন্না এক দুহিতা ছিলেন। বোধ হয় তিনি ইহাকেই চন্দ্রগুপ্তের করে অর্পণ করেন।

কিন্তু কোন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ না থাকায় আমরা নিশ্চয়রূপে ষ্ট্রাবোর মতের সমর্থন করিতে পারিলাম না। যাহা হউক এই সময় হইতেই যে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদিগের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। চন্দ্রগুপ্তের অধীনে যে অসংখ্য যবন-সেনা সতত নিযুক্ত থাকিত, সংস্কৃত কোন কোন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

খ্রীষ্ট শকের ৩০২ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সেলিউকসের এই সন্ধি সংস্থাপন হয়। চন্দ্রগুপ্ত খ্রীষ্ট শকের ৩১৪ বৎসর পূর্ব্বে মগধ-সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক চতুরধিক বিংশতিবৎসর ইহা অলঙ্কৃত করিয়া খ্রীষ্ট শকের ২৯২ বৎসর পূর্ব্বে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ক্রমশঃ।

বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এরূপ প্রবাদ আছে যে, বিক্রমাদিত্যের পিতা এক জন বারাণসীবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণ হইতে চারিটী পত্নী মনোনীত করেন। ব্রাহ্মণীর গর্ভে বলঋষির, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিক্রমাদিত্যের, বৈশ্যার গর্ভে বলির, এবং শূদ্রাণীর গর্ভে ভর্ত্তৃহরির জন্ম হয়। ভর্ত্তৃহরি বিদ্বান্, বীর, ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া, তিনিই সর্ব্ব প্রথমে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আ-

রোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার অন্তরে সংসার-বৈরাগ্য জন্মাইয়া দিল। তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তি বনে ঘোরতর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। ভর্ত্তৃহরি সিংহাসন পরিত্যাগ করিলে, বিক্রমাদিত্য নির্ব্বিবাদে তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিক্রমাদিত্যের—বিক্রমার্ক, বিক্রমসেন ও বিক্রমসিংহ আরও এই তিন নাম ছিল; এবং তাঁহার ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরিরও শুকাদিত্য এবং শুকরাজ রূপ আর দুইটী নাম ছিল।

দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে পাটলিপুত্র নগরে বিক্রমতুঙ্গ নামে এক নরপতি ছিলেন। ইনি সিংহের ন্যায় বলবান্ ছিলেন বলিয়া লোকে ইহাঁকেও বিক্রমসিংহ নাম প্রদান করিয়াছিল। যৎকালে মহাভাত, মহাবীরবাহু, সুবাহু, সুভাত এবং প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি মহাপরাক্রমশালী তদীয় জ্ঞাতিবর্গ অসংখ্য মুসলমানসেনার সহিত তাঁহাকে অবরুদ্ধ করেন; তৎকালে তিনি অতি কষ্টে আপনার নিষ্ক্রমণ সাধন পূর্ব্বক উজ্জয়িনীতে পলায়ন করিয়া তথায় এক ধনাঢ্য বণিকের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তাঁহারই ঐশ্বর্য্য বলে এক মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের সাহায্যে মুসলমানদিগের উপর সম্পূর্ণ জয় লাভ করেন। এদিকে তাঁহার পত্নী শশিলেখা মুসলমানদিগের সহিত সমরে পতির মৃত্যু হইয়াছে এই জনরব শুনিয়া চিতাধিরোহণ পূর্ব্বক আপনাকে ভস্মীভূত করিলেন। যে বণিকের সাহায্যে বিক্রমতুঙ্গ সৈন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, উজ্জয়িনীরাজ শালিবাহন কোন অপরাধে তদীয় পুত্রকে কারারুদ্ধ করেন। বিক্রমতুঙ্গ সমর হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বকীয় বিজয়িনী সেনার সাহায্যে সেই বণিক্-পুত্রকে বিক্রমাদিত্যের শৃঙ্খল হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক নিজ রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে প্রস্থান করেন।

বৃহৎকথার সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে, পাটলিপুত্র নগরে বিক্রমাদিত্য নামে এক নরপতি ছিলেন। ইনি প্রতিষ্ঠাননগরীর অধীশ্বর নৃসিংহরাজের অভ্যুদয়ে উদ্বেজিত হইয়া, নিজ সাহায্যার্থ তিব্বতরাজ গজপতি ও পারস্যরাজ অশ্বপতিকে আহ্বান করেন। সমবেত রাজবৃন্দ নৃসিংহনৃপের (শালিবাহন) সহিত সমরে অবতীর্ণ হন। কিন্তু নৃসিংহ ভীষণ রুধিরপ্লাবনে সকলকেই ভাসাইয়া দেন। বিক্রমাদিত্য রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে পাটলিপুত্র নগরে পলায়ন করেন। বিক্রমাদিত্য প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন মানসে স্বনগর পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তবেশে প্রতিষ্ঠান নগরের এক বণিকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দৈববশাৎ নৃসিংহনৃপ (শালিবাহন) কোন কার্য্যোপলক্ষে সেই বণিকের গৃহে আগমন করেন। তিনি বিক্রমাদিত্যকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন; এবং তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে ও অসমসাহসিক-

তায় তাঁহার নিকট আপনাকে পরাজিত স্বীকার করিলেন। উভয়ের গুণে উভয়ে মুগ্ধ হইয়া, উভয়েই পরস্পরকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর নৃসিংহ বিক্রমাদিত্যকে নিজ প্রাসাদে লইয়া গিয়া যথোচিত আতিথ্য বিধান পুরঃসর মহা-সমারোহে তাঁহাকে স্বনগরাভিমুখে প্রেরণ করেন।

ক্রমশঃ।

আর্য্যগণের আয়ুর্ব্বেদ।

তৃতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

প্রৌঢ়াবস্থা।

আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদের প্রৌঢ় অর্থাৎ পূর্ব্বাবস্থার বিষয় বর্ণন করিব।

এই সময় মহাভারতের আবির্ভাব হইতে চরক ও সুশ্রুতের প্রকাশ কাল পর্য্যন্ত কল্পিত হইল। ইহা প্রায় খ্রীষ্টীয় শকের সাত আট শত শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে দ্বিশতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। এই অবস্থাই আয়ুর্ব্বেদের চরম সীমা এবং এই অবস্থাতেই আয়ুর্ব্বেদের অবনতির সূত্রপাত।

এখন ভারতবর্ষের অবস্থা স্বতন্ত্র,—আর্য্যদিগের অবস্থাও স্বতন্ত্র। এখন ঋষিগণের আশ্রম সকল রমণীয়-সৌধময় নগর হইয়াছে। পান ভোজন ও পরিচ্ছদ বিভিন্ন; ফল মূল ও সুস্নিগ্ধ নদীজলের পরিবর্ত্তে মাংস ও মদ্য, এবং চীর ও বল্কলের স্থানে চীন ও কৌশেয় প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। সভ্যতা ও বিলাসিতার অনুচর সকলও আসিয়া জুটিয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান রোগ-নিচয়। অসভ্যতাবস্থায় সুখ সচ্ছন্দতার ভাগ যেমন কম থাকে, দুঃখ ও যন্ত্রণার ভাগও তেমনি কম দেখা যায়। বিপরীতে সভ্যতাবস্থায় সুখ-সচ্ছন্দতার ভাগ যেমন দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে, দুঃখ ও যন্ত্রণার ভাগও সেইরূপ দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে।

তৎকালের আর্য্যসন্তানগণের অবস্থাও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। এক্ষণে তাহারা ভোগসুখে প্রগাঢ় নিরত, শারীরিক নিয়মের দিকে দৃষ্টিপাত নাই, প্রাচীন ঋষিগণের ন্যায়ও সংযমে আস্থা নাই।—নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল অচিরাৎ ফলিল।—রোগ ও শোকে সুখময় সংসার বিরস হইয়া উঠিল,—মরকে দেশ সকল উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। আর যন্ত্রণা—দুঃসহ যন্ত্রণা—সহ্য হয় না। ক্রমশঃ চেতনা হইল।

কি সে লোক-স্থিতি রক্ষা হয়—কিসে লোক সকলের প্রগাঢ় দুঃখান্ধতমস দূর হইয়া সুখ-সূর্য্যের উদয় হয় এই চিন্তায় জ্ঞানিগণ নিমগ্ন হইলেন।

এক দিকে বানপ্রস্থাশ্রমবাসী কাশী-রাজ দিবোদাস সুশ্রুত প্রভৃতি শিষ্যগণের সহিত শল্যতন্ত্রের অনুশীলনে নিযুক্ত,—অপর দিকে হিমালয়-প্রকোষ্ঠে অত্রিনন্দন পুনর্ব্বসু অগ্নিবেশ প্রভৃতি শিষ্যদিগকে কায়-চিকিৎসার উপদেশে নিরত।

কাশীরাজ দিবোদাস ও আত্রেয় পুন-র্ব্বসু আয়ুর্ব্বেদের উপদেশক মাত্র ছিলেন, গ্রন্থ-প্রণেতা নহেন। দিবোদাসের শিষ্য-গণ শল্যচিকিৎসক-সম্প্রদায়-ভুক্ত, পুন-র্ব্বসুর শিষ্যগণ কায়চিকিৎসক-সম্প্রদায়-ভুক্ত; এবং তাঁহারাই ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর চিকিৎসা গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করেন। দি-বোদাসের শিষ্য ঔপধেনব, বৈতরণ,ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুর-রক্ষিত এবং সুশ্রুত। পুনর্ব্বসুর শিষ্য অগ্নিবেশ, ভেল, জতূকর্ণ, পরাশর, হারীত এবং ক্ষারপাণি।

কথিত আছে ইহাঁরা সকলেই এক এক খানি চিকিৎসা-গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহার এক খানিও এখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যে দুই খানি, সুশ্রুত ও অগ্নিবেশের নামে প্রচলিত আছে, তাহা যে তাঁহাদের লেখনী-নির্গত, এরূপও বোধ হয় না। যেহেতু উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের উপক্রমণিকা পাঠে অবশ্যই প্রতীতি হইবে, যে তাহাদের রচয়িতা সুশ্রুত ও অগ্নিবেশ হইতে স্বতন্ত্র। সুশ্রুত ও অগ্নিবেশের মতানুসারে গ্রন্থদ্বয় রচিত হইয়াছে, মাত্র। উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের নাম সুশ্রুত ও চরক। কিম্ব-দন্তী যে সুশ্রুতের রচয়িতা নাগার্জ্জুন। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ সুশ্রুতের ভিতর পাওয়া যায় না। এবং চরকের রচয়িতা চরক, ইহার প্রমাণ চরকের মধ্যে দৃষ্ট হয়। যদি সুশ্রুতের রচয়িতা সুশ্রুত হন, তাহা হইলে "যথোবাচ ভগবান্ ধন্বন্তরিঃ সুশ্রুতায়।" সুশ্রুতের প্রথমাধ্যা-য়ের এই প্রথম সূত্র কিরূপে সংগত হইতে পারে? চরকেও প্রতি অধ্যায়ের শেষে "অগ্নিবেশ-কৃতে তন্ত্রে, চরক-প্রতিসং-স্কৃতে।" এবং সিদ্ধিস্থানের শেষ অধ্যা-য়ে "সংস্কর্ত্তা কুরুতে তন্ত্রং পুরাণং চ পুনর্ণবম্"—সংস্কর্ত্তা চরক পুরাণ তন্ত্র পুনরায় নূতন করিলেন —এরূপ লিখিত আছে। সুতরাং সুশ্রুত ও অগ্নিবেশ, দিবোদাস ও পুনর্ব্বসুর মুখে আয়ুর্ব্বেদ শ্রবণ করিয়া যে গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়া-ছিলেন, সেই গ্রন্থদ্বয় হইতে এক্ষণকার সুশ্রুত ও চরক নামক গ্রন্থদ্বয় যে স্বতন্ত্র তাহার আর সন্দেহ নাই।

চরকে আরও একটা কথা দেখিতে পাওয়া যায় যে, "চরক অসম্পূর্ণ ছিল, পঞ্চনদ নগরে দৃঢ়বল নামক এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বহু চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া চরকের কল্প ও সিদ্ধি স্থানের ঔষধবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায় পূরণ করেন।"* ইহা দ্বারা আরও প্রমাণ

* "অখণ্ডার্থং দৃঢ়বলো জাতঃ পঞ্চনদে

হইতেছে যে এক্ষণকার চরক অগ্নিবেশের কৃত চরক নহে।'

নাগার্জ্জুন সুশ্রুত-প্রণেতা বলিয়া সুশ্রুতের মধ্যে কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। কেবল সুশ্রুতের টীকার নিবন্ধ-সংগ্রহকার উল্‌বনাচার্য্য "যথোবাচ ভগবান্‌ ধন্বন্তরিঃ সুশ্রুতায়" বাক্য অবলম্বন করিয়া—নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের রচয়িতা বলিয়া গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন মাত্র কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ দর্শাইতে পারেন নাই। ফলতঃ নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রণেতা হউন আর নাই হউন, তদ্বিষয়ে আমরা এক্ষণে কোন তর্ক করিতেছি না। কিন্তু সুশ্রুত-গ্রন্থ যে সুশ্রুতের রচিত নহে তাহা উক্ত বাক্য দ্বারা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে। আর সুশ্রুত-নামক কোন ব্যক্তি-বিশেষ বস্তুতঃ ছিলেন কি না সে বিষয়েও অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন। কিন্তু সুশ্রুতের অসত্তা বিষয়ে কোনরূপ বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইলে আমরা সে সন্দেহ করিতে পারি না। বরং যখন অস্তিত্ব বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তখন ওরূপ সন্দেহ করাই অন্যায়।—গারুড় পুরাণে লিখিত আছে, "ধন্বন্তরি ক্ষীরসমুদ্র মন্থন কালে দেবগণের জীবনের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়া বিশ্বামিত্রতনয় সুশ্রুতকে আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ দেন।"*

যাহা হউক এ সকল বিষয়ের আলোচনায় আমরা পশ্চাৎ প্রবৃত্ত হইব।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রাচীন আর্য্য-চিকিৎসকগণ—"শল্য-চিকিৎসক" ও "কায়-চিকিৎসক" এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। শল্য-চিকিৎসকদিগকে আবার ধন্বন্তরীয় সম্প্রদায় বলিত। প্রাচীন গ্রন্থ চরক ও সুশ্রুতের মধ্যে ধন্বন্তরীয় সম্প্রদায়ে দিবোদাস ও তাঁহার সুশ্রুতপ্রভৃতি শিষ্যগণের নামোল্লেখ এবং কায়-চিকিৎসক সম্প্রদায়ে পুনর্ব্বসু অগ্নিবেশ প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যগণ, চরক এবং দৃঢ়বলের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। উল্লিখিত নামধারী ব্যক্তিগণের অস্তিত্ব ও সাময়িক পৌর্ব্বাপর্য্যের বিষয় সুশ্রুত ও চরকের সমালোচনায় সমালোচিত হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীব্—

পুরে। কৃত্বা বহুভ্যস্তন্ত্রেভ্যো, বিশেষাচ্চ বলোচ্চয়ং। সপ্তদশৌষধাধ্যায়ৈঃ সিদ্ধি-কল্পৈরপূরয়ৎ।'

শেষাধ্যায়, চরক, সিদ্ধিস্থান।

* যথা ধন্বন্তরিজ্জাতো বংশে ক্ষীরাব্ধি-মন্থনে, দেবাদীনাং জীবনায় আয়ুর্ব্বেদ মুবাচহ, বিশ্বামিত্র-সুতায়ৈব সুশ্রুতায় মহাত্মনে।"

গারুড়ে ১৫০ অধ্যায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

উদাসিনী—মূল্য ১ টাকা মাত্র। বাল্মীকি যন্ত্রে প্রাপ্তব্য। গ্রন্থ খানি পদ্যময়। গ্রন্থকারের নাম অপ্রকাশিত। বোধ হয় সম্পাদকদিগের দৌরাত্ম্যই গ্রন্থকার-দিগের এইরূপ প্রচ্ছন্নভাব অবলম্বন করার প্রধান কারণ। যাঁহারা বলপূর্ব্বক সুলেখক হইতে চান, যাঁহাদিগের লেখনীর জ্বালায় বঙ্গভূমি অস্থির, তাঁহাদিগের পক্ষেই এরূপ প্রচ্ছন্নভাব অবলম্বন করা সঙ্গত। কিন্তু উদাসিনী-রচয়িতার ন্যায় সুলেখক ও সুকবি এরূপ প্রচ্ছন্ন-ভাবে থাকেন, ইহা বোধ হয়, কোন সহৃদয় ব্যক্তিই ইচ্ছা করেন না। এই কবিতা-কুসুমটী প্রায় তিন মাস হইল আমাদের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। প্রায় তিন মাস পর্য্যন্ত ইহার সৌরভ আমাদের গৃহ আমোদিত করিতেছে। কিন্তু আ-মরা অবকাশাভাবে যথাসময়ে ইহার সৌরভ সর্ব্বত্র বিধুনিত করিতে পারি নাই।

এই গ্রন্থের নায়ক সুরেন্দ্র এবং নায়িকা সরলা। শৈশবেই সরলার মাতৃ-বিয়োগ হয়। সরলার পিতা এক দেশের রাজা ছিলেন। তিনি ভ্রাতৃ-কর্তৃক সিংহা-সন-চ্যুত হইয়া এক মাত্র দুহিতা সরলা সমভিব্যাহারে মনের দুঃখে সুরধুনীতীরে বিজন প্রদেশে কুটীরবাসী হন। সরলা ভিক্ষান্ন দ্বারা বৃদ্ধ পিতার ভরণপোষণ করেন। 'একদা আশ্বিন মাসে, মুষ্টান্ন ভিক্ষার আশে' সরলা সমস্ত নগর পরি-ভ্রমণ করিয়া অবশেষে শ্রান্তি দূরকরণ-মানসে জাহ্নবী-পুলিনে উপবিষ্ট হইয়া সন্ধ্যা-সমীরণ সেবন করিতেছিলেন। শরীর অব-সন্ন—সুতরাং শীঘ্র নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় বাণ আসিয়া তাঁ-হাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। সহসা সুরেন্দ্র নামক এক বীর পুরুষ জলে ঝাঁপ দিয়া, তাঁহাকে তীরে উত্তোলিত করিলেন। সুরেন্দ্র সরলার প্রাণদান করিলেন। দীনা অনাথা সরলা সুরেন্দ্রকে আর কি দিবেন? প্রাণদান করিলেন। সুরেন্দ্র এবং সরলার প্রণয় অতি গভীর ও রমণীয় ভাব ধারণ করিল। সরলার পিতৃ-বিয়োগ হইল। কিছুদিনের জন্য সরলা ও সুরেন্দ্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলেন। বিচ্ছেদে প্রণয় আরও ঘনীভূত হইল। সরলা অতুল বিভবের অধিকারিণী হইবেন,—রাজমহিষী হইবেন—এরূপ প্রস্তাব হইতে লাগিল। কিন্তু সরলা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার মন, প্রাণ, দেহ, যৌবন সমস্তই সুরেন্দ্রের নিকট পূর্ব্বেই বিক্রীত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার এ সকলের উপর আর স্বাধীনতা নাই।

সুলক্ষণা নামে সরলার এক সখী ছিলেন। তিনি সরলার মনের বেগ পরিবর্ত্তন করিতে অনেক চেষ্টা করি-

লেন। কিন্তু সুরেন্দ্রময়-জীবিতা সরলা তাঁহাকে কি উত্তর দিলেন? কি উত্তর দিলেন পাঠক শুনুন ঃ—

"কেমনে থাকিব সুখে, কহিলেন নম্র মুখে,
কিসে বল সুখী হব আর।
যার তরে দুনয়ন, ঝরিতেছে অনুক্ষণ,
সে যদি করিল পরিহার॥
রাজ-পুত্র-বধূ হব, অসীম ঐশ্বর্য্যে রব,
ও কথা তুলনা আমা কাছে।
ও যে অলক্ষণ কথা, যাইব সুরেন্দ্র যথা,
সরলার সুরেন্দ্র ত আছে॥
রাজপুত্র-বধূ হব, অসীম ঐশ্বর্য্যে রব,
ছি ছি আর বলনা আমায়।
কি হবে বৈভব লয়ে, কি কায ইন্দ্রাণী হয়ে,
অনন্ত সৌভাগ্য কেবা চায়॥
বরঞ্চ ভিক্ষার তরে, নগরের ঘরে ঘরে,
ফিরিব গো ভিখারিণী বেশে।
বরঞ্চ যোগিনী হয়ে, অক্ষ কমণ্ডলু লয়ে,
পর্য্যটিব অরণ্য প্রদেশে॥
অনাহারে অনিদ্রায়, বরঞ্চ ত্যজিব কায়,
সিন্ধুতীরে রহিব শয়ান।
শকুনি গৃধিনী রাশি, করিবে সকলে আসি,
সরলার অন্ত্যেষ্টি বিধান॥
তবুও থাকিতে প্রাণ, প্রণয়ের অপমান,
কখন হবে না সুলক্ষণে।
যার প্রেমে অনুরাগী, সর্ব্বত্যাগী যার লাগি,
বাঁচিব মরিব তারি সনে॥

* * *

যাও সখি! ফিরে যাও, আমারে কাঁদিতে দাও,
কাঁদাই কপালে যদি আছে।"

ধন্য সরলে ধন্য! তোমার অদ্ভুত প্রণয়ে বিগলিত হইয়া পাষাণ-হৃদয়ও তোমার সহিত সহানুভূতি না করিয়া থাকিতে পারে না। বঙ্গকামিনি! তুমি এই গভীর ও অবিচলিত প্রণয়েই জগতের কুলকামিনীদিগের আদর্শ-স্থল হইয়াছ।

সুলক্ষণা সরলার কথায় বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। সরলা কেবল সুরেন্দ্র-ধ্যানে মগ্ন রহিলেন।

কিন্তু সুরেন্দ্র এখন কোথায়? সরলা ক্রমে সুরেন্দ্রের জন্য উন্মাদিনী হইয়া উঠিলেন। এক দিন তিনি অদৃশ্যভাবে পাগলিনীর ন্যায় কৌতুককাননে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় সরসীকূলে অশোকের গায় দিব্য অক্ষরে যে কথা গুলি অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"যে আশা সুবর্ণলতা সাদরে সতত,
পালিয়াছি দরিদ্রের সর্ব্বস্বের মত—
অভাগা অদৃষ্টফলে, বজ্র প্রহরণ বলে,
এত দিনে হলো তাহা সমূলে নিহত॥

কি আশার আশে আর থাকিব আলয়ে,
প্রমাদ ঘটেছে মম সরলা প্রণয়ে।
বিদীর্ণ ভূধর সম, ভেঙ্গেছে হৃদয় মম,
আর কি লাগিবে জোড়া এ পোড়া হৃদয়ে?

যাই তবে প্রেয়সি রে! জন্মের মতন,
অবাধে পশিব যথা যাবে দুনয়ন।
অরণ্যে বা হিমাচলে, অথবা জলধি-জলে,
উদাসীন যোগিবেশে করিব ভ্রমণ॥—

উদাসীন যোগিবেশে, সরলা সুন্দরি !
ওরূপ করিব ধ্যান সর্ব্বস্ব পাশরি।
অমলা অমৃত ধাম, সরলা সরলা নাম,
উর্দ্ধকণ্ঠে উচ্চারিব দিবস শর্ব্বরী।।

আবার সে নাম প্রতিধ্বনিত হইবে,
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে নিস্তব্ধে শুনিবে।
শান্তমনে সে সময়, মুদিব নয়নদ্বয়,
সরলা সরলা নাম শ্রবণে পশিবে।।

এই মাত্র চিরখেদ রবে মম চিতে,
মনের সকল কথা নারিনু কহিতে।
ইহ জন্মে থাক্ থাক্, মরমে মিশায়ে যাক্,
জন্মান্তরে দেখা হোলে কব, সুচরিতে !

যাই তবে প্রেয়সি রে ! জন্মের মতন,
ঘুরিব অদৃষ্ট-চক্রে সমস্ত ভুবন।
সোহাগের পতি লয়ে, থাক তুমি সুখী হয়ে,
অভাগারে একেবারে হও বিস্মরণ।।"

আহা হতাশ প্রণয়ের কি স্বর্গীয় ভাব! ইহা আমাদের মনকে পার্থিব ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ণ রূপে আধ্যাত্মিক-ভাবময় করিয়া তুলে।

এই অঙ্কিত পত্র কাহার পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। এই অঙ্কিত পত্র পাঠে সরলার মৃতপ্রায় জীবনে চৈতন্য সঞ্চার হইল। তিনি 'অদৃষ্টে যা আছে হোক্' বলিয়া রাজপ্রাসাদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সুরেন্দ্র-সন্ধানে নির্গত হইলেন। অবশেষে নানা দেশ, নানা গ্রাম নগর, এবং নানা নদ নদী পর্য্যটন করিতে করিতে, এক ঘোর বনপ্রান্তে উপনীত হইয়া তথায় কতক গুলি অস্থি দেখিতে পাইলেন। অনুসন্ধান দ্বারা জানিলেন যে ইহা এক তপস্বীর অস্থি। সুরেন্দ্রই সেই তপস্বী এই মনে করিয়া সরলা চিতানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে আরোহণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় বনদেবী আসিয়া তাঁহাকে সেই মরণ-ব্যবসায় হইতে বিরত করিলেন। বনদেবী 'সুরেন্দ্র জীবিত আছেন' সরলাকে এই আশ্বাস দিয়া সরলার সহিত সুরেন্দ্রের অন্বেষণে নির্গত হইলেন। অনেক পর্য্যটনের পর হিমালয় প্রদেশে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তাহার পর সরলা ও সুরেন্দ্র পরস্পর পরিণয় সূত্রে সম্বদ্ধ হইলেন।

এরূপ উপন্যাস-ঘটিত কবিতাগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল। এরূপ উৎকৃষ্ট উপন্যাসের সহিত রমণীয় কবিতা মিশ্রিত হইয়া ইহাকে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ করিয়া তুলিয়াছে। উপসংহার-ভাগটা এত না বাড়াইলে ভাল হইত। কারণ এই ভাগটী পাঠ করিতে ধৈর্য্য থাকে না। যাহা হউক গ্রন্থকার এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া বঙ্গের একটী ভূষণ স্বরূপ হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

বিজয়সিংহ—ঐতিহাসিক নবন্যাস। কলিকাতা শিবাদহ দত্তযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৸৵০ আনা মাত্র। গ্রন্থখানিতে প্রণেতার নাম নাই। গ্রন্থ খানি বিশেষ উচ্চদরের না হইলেও পাঠের উপযোগী

তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রচনা মন্দ নহে। ইহার স্থানে স্থানে অতি উৎকৃষ্ট স্বভাববর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ ইহার শ্মশান বর্ণনাটী অতি সুন্দর হইয়াছে। গল্প-গ্রন্থি স্থানে স্থানে ছিন্ন হওয়ায় গ্রন্থকারকে অপরিণত-বয়স্ক বা নবলেখক বলিয়া প্রতীতি হই-তেছে। যাহা হউক গ্রন্থকার নবন্যাস-রচনায় নিবিষ্ট থাকিলে, কালে উৎকৃষ্ট নবন্যাস-লেখক হইতে পারেন এরূপ আশা নিতান্ত অসঙ্গত নয়।

সতী কি কলঙ্কিনী ?—শ্রীনগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত। আগামী ১৯ এ সেপ্টেম্বর শনিবার রজনীতে গ্রেট্ ন্যাসানেল্ নাট্যশালায় অভিনার্থ শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ।।০ আনা মাত্র। এখানি গীতাভিনয়—রাধিকার কলঙ্কভঞ্জনের ঘটনাটা অবলম্বন করিয়া লিখিত হই-য়াছে। গীত গুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। বঙ্গদেশে যে কুৎসিত যাত্রার প্রথা প্রচ-লিত আছে, গীতাভিনয় সেই যাত্রারই সং-স্কার। গীতাভিনয় প্রচলিত হইলে, কুৎ-সিত যাত্রার প্রথা বঙ্গদেশ হইতে অবশ্যই তিরোহিত হইবে। যাত্রার প্রথা তিরো-হিত হইলে, এদেশের রুচি ও নীতি অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ হইয়া আসিবে। এই রুচি ও নীতি পরিবর্ত্তন জন্য গ্রেট্-ন্যাসানেল্ নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা আমা-দের ধন্যবাদের পাত্র। স্ত্রীলোকের অঙ্গ স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনয় করার সুপ্রথা বিষয়ে বঙ্গরঙ্গভূমির অনুবর্ত্তন করায় গ্রেট্ ন্যাসানাল্ নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা আমাদের অধিকতর প্রীতি-ভাজন হইয়াছেন। হতভাগিনী বঙ্গকা-মিনীদিগের বিশুদ্ধ স্বাধীন জীবিকা নির্ব্বাহের এই উপায়টী প্রবর্ত্তিত হওয়ায় আমাদের অন্তরে যে কি গভীর আনন্দের উদয় হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। চিরদুঃখিনী দয়ার্হা বারবিলাসিনীগণ পূর্ব্বে স্বাধীন জীবিকার অভাবে ইচ্ছা হইলেও আপনাদিগের জঘন্য ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে পারিত না। কত কত কুলকামিনী, অসহ্য যন্ত্রণায় পড়িয়া মনের অনিচ্ছা-তেও, এই বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু অচিরকালমধ্যেই তাহারা মনস্তাপে দগ্ধ হইতে থাকে। তখন ইচ্ছা হয়, গৃহে ফিরিয়া আসে। কিন্তু নৃশংস সমাজ—পুরুষ সহস্রবার স্খলিতপদ হইলেও তা-হাকে অনায়াসে গ্রহণ করিবে; কিন্তু সুকুমারমতি কামিনী একবার স্খলিতপদ হইলে তাহাকে আর গ্রহণ করিবে না। সুতরাং মনস্তাপে দগ্ধ হইলেও তাহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারে না; পূর্ব্বে এমন কোন স্বাধীন জীবিকাও ছিল না, যে তাহা অবলম্বন করিয়া এই জঘন্য ব্যবসায় পরিত্যাগ করে। এত দিন পরে তাহাদিগের জন্য একটী স্বাধীন জীবিকার দ্বার উন্মুক্ত হইল। আশা করি তাহারা যেন আপনাদিগের চরিত্র-সংশোধন-পূর্ব্বক এই দ্বার অবলম্বন করিয়া ক্রমে সমাজগৃহে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এই কয়টী প্রধান, দীননাথ, তারানাথ, বেচারাম, ফটিকচাঁদ, জয়রাম, পুরুষগণ ; কমলিনী কুমুদিনী ও চিন্তা, স্ত্রীগণ।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি।

কবিতা ও গানগুলি সরস ও সুন্দর হইয়াছে।

সোম প্রকাশ।

The General Style of the Book is good and unaffected.

INDIAN DAILY NEWS.

নাটক খানি অতি সুললিত ও সু ভাষায় লিখিত। অধুনা এরূপ নাটক অতি বিরলপ্রচার। রচনাটী কবিসুলভ কৌশল ময়।

কুলীনকন্যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরিত্র নায়ক দীননাথ। কমলিনীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ, প্রগাঢ়, বিশুদ্ধ, পবিত্র। কমলিনীর চরিত্র সরলতাময়, তাঁহার প্রতি কথায় প্রতি আচরণে সরলতা কমলিনী সরলতা নির্ম্মিতা। তারানাথের স্ত্রী আমোদময়ী। কুমুদ যেখানে যায় কুমুদ সেই খানেই যেন আমোদরাশি ছড়াইতে থাকে।

এডুকেশন গেজেটের চড়কডাঙ্গাস্থ লেখক।

কুমুদিনীর প্রফুল্লতা ও রহস্যপ্রিয়তা, তারানাথের মিত্রভাব, বেচারামের কর্ত্তব্য জ্ঞান ধর্ম্মভাব, উন্নত শিক্ষা ও কৌশল, জয়রামের মর্য্যাদাবোধ তাঁহার স্ত্রীর বাৎসল্য এবং কমলিনীর প্রণয় ও সতীত্বধর্ম্ম তাহাদিগের চরিত্রে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত আছে।

কবি নাট্যনিয়ম সকল পরিজ্ঞাত আছেন, ইহা রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। রচনার নিপুণতা আছে বিশেষতঃ কবিতা গুলি অত্যন্ত সুমধুর লাগিল। স্ত্রীলোকের কথা গুলিও অনুরূপ বোধ হইল। দীননাথের অভিনয় বিশিষ্টরূপে চিত্তাকর্ষণ করিবে।

ভারত সংস্কারক।

বাদ নিউ মেডিকেল হলে, লক্ষ্ণৌ শ্রীযুক্ত ডাক্তার রুবিনী সাহেবের মতানুসারে এক মাত্র কর্পূরের আরক দ্বারা ওলাউঠা রোগের চিকিৎসা। ডাক্তারের সাহায্য ভিন্ন এই ঔষধ দ্বারা ওলাউঠার চিকিৎসা করা যাইতে পারে। যে সকল স্থানে সহসা ডাক্তার পাওয়ার সুবিধা নাই, সেই সকল স্থানবাসিদিগের এই মহৌষধ রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ব্যবহার প্রণালীশুদ্ধ ১ আউন্‌স শিশির মূল্য বার আনা ডাক মাসুল সমেত এক টাকা।

চিনা বাজার শ্রীযুক্ত নরসিংহপ্রসাদ দত্তের দোকানে এবং আমাদিগের নিজ ঔষধালয়ে পাওয়া যাইবেক।

আমরা বিলাত হইতে ঔষধ আনাইয়া ঔষধ-ব্যবসায়ী এবং চিকিৎসকদিগের নিকট অল্প লাভে মফস্বলে পাঠাইয়া থাকি।

মহলানবিশ এণ্ড কোং
ড্রগিষ্টস

আমরা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্য আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিক সংখ্যায় প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। পাঠ যতদূর পরিশুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহা হইবে; যত্নের ত্রুটি হইবে না এবং স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দ ও দুরূহ পদের অর্থ দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক কবির এক একটী সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, কাব্যের গুণবিচার ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইবে। চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে; মুদ্রাঙ্কন যাহাতে পরিপাটী হয় তাহাও করা যাইবে। কবিগণের সমগ্র রচনা প্রচারিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু সাধারণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য নিতান্ত অশ্লীল ও ও সুরুচিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যক্ত হইবে। প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত যে কোন ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শারদাচরণ মিত্র এম্ এ,
৩৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্
কদমতলা, চুঁচুড়া।

শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্র
৩০ নং রাজা কালীকৃষ্ণের লেন
শোভাবাজার কলিকাতা।

—০—

শত্রুসংহার।

এই নাটক গ্রেট ন্যাসনেল থিয়েটার প্রোপ্রাইটর শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন নিয়োগীর ব্যয়ে ও যত্নে মুদ্রিত হইল। অন্য কেহ ইহা অভিনয় করিতে পারিবেক না।

শ্রীহরলাল রায়।

ভারতচন্দ্র রায়।

বাঙ্গলাভাষায় কে প্রথম কবিতা-রচনার প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না। কিন্তু বঙ্গভাষার পুরাতন সাহিত্যসমালোচনায় প্রতীতি হয় যে কবিতার উন্নতির সহিত বাঙ্গালা ভাষায় উন্নতি-সাধন হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতার ক্রমোন্নতির প্রতিপদ স্পষ্টাক্ষরে আমাদিগের ভাষায় প্রতীয়মান রহিয়াছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী অপেক্ষা বৃন্দাবন ও কৃষ্ণদাসের কবিতায় অধিকতর বাঙ্গলা কথা ও রচনার প্রাচুর্য্য দেখা যায়। তৎপরে কৃত্তিবাস ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি যে রচনাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, কাশীদাস এবং রামপ্রসাদ সেন তাহা অনেক দূর পরিশুদ্ধ করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র সেই রচনাপ্রণালীকে উন্নতির চরম সীমায় আনয়ন করিলেন। তিনি সেই রচনা-প্রণালীর দোষ সমূহ অনেক পরিবর্জ্জন করিলেন এবং তাহার যতদূর উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে তাহা সম্পাদন করিলেন। তিনি অদ্যাপি এই রচনা-প্রণালীর আদর্শস্বরূপ হইয়া আছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রায় গুণাকরের অনুকারী হইয়া ও তাহার আর ও উৎকর্ষ সাধিত করিলেন।

পৌরাণিক অথবা স্থানীয় উপন্যাসই এই সকল রচনাপ্রণালীর বিষয়। কৃত্তি-বাস, মুকুন্দরাম, কাশীদাস প্রভৃতি লেখকেরা পুরাণ অবলম্বন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মনসার ভাসানকার ক্ষেমানন্দ ও কেতকদাস প্রভৃতি লেখকগণ কেবল স্থানীয় উপন্যাস অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছেন। এই সমস্ত উপন্যাস অবলম্বন করিয়া রসবর্ণন এবং রসোদ্দীপন করাই কবিদিগের উদ্দেশ্য অনুমিত হয়। সুন্দর অলঙ্কৃত ভাষায় তাঁহারা এই রসবর্ণনা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। সরল ও চলিত শব্দ প্রয়োগ তাঁহাদিগের ভাষায় একটী প্রধান ধর্ম্ম। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন বটে তথাপি তাঁহাদিগের কবিতায় বৃহৎ বৃহৎ কর্কশ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। তাঁহাদিগের চেষ্টা ছিল, যাহাতে তাঁহাদিগের ভাষা সুললিত, মৃদু, মধুর এবং সুশ্রাব্য হয়। তাঁহাদিগের এরূপ শ্রুতিমধুরতা ছিল যে কবিতার অনুপযোগী কঠিন শব্দ সকল তাঁহারা অনায়াসে নির্ব্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। তাঁহাদিগের কবিতায় তিন ও দুই অক্ষরের শব্দ অপেক্ষাকৃত অধিক প্রচুর। স্বরচিত কবিতাকে প্রসাদগুণ-

সমন্বিত করিবার জন্য তাঁহারা ইহাতে অনুপ্রাসের বহুল প্রয়োগ করিতেন। বাস্তবিক তাঁহারা কাব্যভাষার শিল্প-রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শব্দালঙ্কার তাঁহাদিগের কবিতার প্রধান গুণ। তাঁহাদিগের পদ সকল অনায়াসপ্রসূত হইত। আধুনিক কবিতার ন্যায় তাঁহাদিগের কবিতাবলি শ্রমসম্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। এই কবিতাবলি এত সুমধুর যে সহজেই কণ্ঠস্থ হইয়া পড়ে।

কিন্তু তাঁহারা কেবল শব্দ দ্বারা আমাদিগকে মোহিত করিবার চেষ্টা পান নাই। তাঁহাদিগের কাব্যে অর্থালঙ্কারও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যে স্থলে যে প্রকার রসোদ্দীপনার আবশ্যকতা তাহা তথায় সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে। রসবর্ণনার উপযোগী দৃশ্য সকল কল্পিত হইয়াছে। যে দৃশ্য যখন বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কল্পনা সেই দৃশ্যেরই উপযোগী ও স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। অভৌতিক দৃশ্যে অভৌতিক কল্পনা, এবং মানুষী দৃশ্যে মানুষী কল্পনা—এরূপ স্বভাবসিদ্ধ দৃশ্যকল্পনা রসবর্ণনার একটি প্রধান অঙ্গ। এরূপ দৃশ্য কল্পনা বর্ণনীয় কাব্যাবলিতে প্রচুর-রূপে পরিদৃষ্ট হয়।

এই রচনাপ্রণালীর প্রধানত্ব ভারতচন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন। উত্তম কবিতা রচনা পরীক্ষা করিতে হইলে দুইটি বিষয় বিশেষ রূপে অনুধাবন করিয়া দেখা উচিত। কবিতার ছন্দোগুলি তদ্বিষয়োপযোগী কি না, এবং পদাবলি অলঙ্কারসম্পন্ন কি না? ভারত-চন্দ্রের কবিতাকলাপ নিশ্চয় এরূপ পরীক্ষাসহ। তিনি অযথাস্থানে কোন ছন্দ সংযোজিত করেন নাই। বর্ণনীয় রসের উপযোগী ছন্দই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে কাহার যদি সংশয় থাকে, তিনি একবার রামপ্রসাদসেন-কৃত বিদ্যাসুন্দরের সহিত ভারতচন্দ্র-কৃত বিদ্যাসুন্দরের তুলনা করিয়া দেখুন। আমার অভিপ্রায় বিশদ করিবার জন্য নিম্নে উভয়েরই গ্রন্থ হইতে সদৃশস্থল উদ্ধৃত করা হইল।

ভারতচন্দ্র :—

"প্রভাত হইল বিভাবরী,
বিদ্যারে কহিল সহচরী।
সুন্দর পড়েছে ধরা,
শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা,
সখী তোলে ধরাধরি করি॥

কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে,
ধরা তিতে নয়নের জলে।
কপালে কঙ্কন হানে,
অধীরা রুধির বাণে,
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে॥"

ইত্যাদি।

রামপ্রসাদ :—

"দয়িত-দুর্গতি দেখি, দগ্ধ দ্বিজরাজমুখী,
দুঃখ-সিন্ধু উথলিয়া উঠে।
ধরাতলে ধনী পড়ে, ধীহারা ধূচয় বাড়ে,
ধড়ে প্রাণ নাহি, ঘর্ম্ম ছুটে॥"

ইত্যাদি।

বিদ্যার দুঃখ যেমন গভীর, ভারত-

চন্দ্রের খেদোক্তি ও তেমনি মৃদুগতি এবং ছন্দটিও বিশিষ্টরূপে ইহার উপযোগী হইয়াছে। ত্রিপদীর পদাবলি তত মৃদু-গতি নহে। ভারতচন্দ্রের পদাবলি কেমন সরল ও মধুর ভাষায় লিখিত। রামপ্রসাদ-সেনের কবিতায় অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট। যেখানে অর্থবোধ দুর্ঘট সেখানে বর্ণনার আস্বাদ পাওয়া যায় না। সুতরাং সে বর্ণনার সৌন্দর্য্য থাকে না। কিন্তু যেখানে সাধারণের পক্ষে অর্থবোধ দুরূহ করা প্রয়োজনীয়, সে স্থলে ভারতচন্দ্র তাঁহার ভাষাকে কৌশল ক্রমে কেমন দুর্ব্বোধ করিয়া তুলিয়াছেন। সে স্থল সকল আমাদিগের বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

সুন্দর বকুল তলায় বসিয়া আছেন, নাগরীগণ তাঁহার রূপদর্শনে বিমোহিত হইয়াছেন, এইটি একটী সুন্দর কল্পনা। এই কল্পনায় কবি কৌশলক্রমে সুন্দরের রূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কবি—সুন্দর কিরূপ তাহা স্বয়ং বলিলেন না বটে, কিন্তু নাগরীগণের মনকে সুন্দর কত দূর চঞ্চল করিয়াছিলেন কবি তাহাই বর্ণন করিলেন। সুন্দরের রূপের অনুভব কবি আমাদিগের কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া গেলেন। পাঠকগণ আপনাদিগের সৌন্দর্য্যানুভাবকতা দ্বারা সেই রূপের অনুমান করিয়া লইবেন। যে রূপ—যাঁহার মনে অত্যন্ত সুন্দর, তাঁহাকে সেই রূপের প্রতিমা দ্বারা সুন্দরের রূপ অনুভব করিয়া লইতে হইবে; সুতরাং এই প্রকার রূপবর্ণনা সর্ব্বজনপক্ষে মনোজ্ঞ হইবে, সন্দেহ নাই। সুন্দরকে অকস্মাৎ সন্দর্শন করিয়া নাগরীগণের মনে তৎক্ষণাৎ যে প্রকার চিত্তচাপল্য সঞ্জাত হইল, তাহা বর্ণন করিতে গিয়া কবি সুন্দরের রূপপ্রভাবের কি মনোহর চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই প্রকার আনুমানিক রূপবর্ণনা ভারতচন্দ্র রাম-প্রসাদ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন।

মালিনীকৃত সুন্দরের রূপবর্ণন অনেকে, সুন্দরের প্রকৃত রূপবর্ণনা মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তাহা করি না। মালিনী বিদ্যার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সুন্দরের রূপের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিল অন্য পুরুষের রূপও ঠিক সেইরূপ বর্ণন করিত। আমরা অদ্যাপিও ঘটকীদিগের নিকট বরের রূপ বর্ণন এইরূপই শুনিয়া থাকি। তৎকালে যে সমস্ত উপমা প্রচলিত ছিল, মালিনী তাহাই গ্রহণ করিয়াছিল। মালিনী যে প্রকার রূপের বর্ণনা দশজনের মুখে শিক্ষা করিয়াছে, সেই প্রকার রূপই বর্ণনা করিবে। কবিকল্পিত আনুমানিক চিত্রের সহিত, মালিনী-কৃত চিত্র কখন সমতুল্য হইতে পারে না। এজন্য প্রচলিত এবং পুরাতন উপমা-সমূহ দ্বারা মালি-নীর রূপবর্ণনা—কল্পনার সহিত বিলক্ষণ সমঞ্জসীভূত হয়। সেই রূপ বর্ণনা দ্বারা বিদ্যার মন পূর্ব্ব হইতে কথঞ্চিৎ বিচলিত করিয়া রাখা আবশ্যক ছিল। পূর্ব্ব হইতে এইরূপে বিদ্যার কল্পনাকে প্রস্তুত

করিয়া না রাখিলে, সুন্দরের রূপ বিদ্যার চক্ষে বোধ হয় তত বিমোহনীয় বোধ হইত না। যাহাহউক এই কল্পনা-চাতুর্য্যের গৌরব আমরা ভারতচন্দ্রকে কখনই দিতে পারি না, যেহেতু ইহা কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরেও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কল্পনার প্রতি আধুনিক কতক গুলি লেখকের নিন্দা অপনয়ন করাই আমার এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। তাঁহারা বিবেচনা করিবেন, সেরূপ বর্ণনা কবির নহে, তাহা মালিনীর রূপবর্ণনা।

ভারতচন্দ্রের কবিতা-রচনায় যেমন নিপুণতা, রসবর্ণনায়ও তদ্রূপ পারদর্শিতা দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, ভারতচন্দ্রের আদিরসবর্ণন যেমন সুমধুর, এরূপ অন্য রসবর্ণন নহে। আমরা তৎসম্বন্ধে এই বলিতে চাহি যে যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা বোধ হয় ভারতচন্দ্রকৃত বিদ্যাসুন্দর যেরূপ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তৎকৃত অন্নদামঙ্গল সেরূপ মনোনিবেশের সহিত অধ্যয়ন করেন নাই। যদি সেরূপ আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বলিব যে তাঁহাদিগের রুচি আদিরসে যেমন প্রমত্ত হয়, অন্যরসে বোধ হয় তেমন হয় না। কিন্তু আমরা বিদ্যাসুন্দর হইতেই দেখাই, একটি রসগর্ভ সুন্দর দৃশ্য কেমন স্বাভাবিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অথচ ইহা আদিরস-বিশিষ্ট নহে।

"ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে, আঁচল ধরায় পড়ে,
আলু থালু কবরী বন্ধন।
চক্ষু ঘুরে যেন চাক, হাত নাড়া ঘন ডাক,
চমকে সকল পুরজন।।"
ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্রের আদিরস-বিষয়ক কোন পদাবলির সহিত এই কয়েক পংক্তির তুলনা কর, নিশ্চয় এই পংক্তিচয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হইবে। ইহাতে মনে যে দৃশ্য উদিত হয়, তাহা ক্রোধের স্বাভাবিক দৃশ্য। সহসা আমাদিগের সম্মুখ দিয়া যেন বিদ্যুৎ-অগ্নি ঝলসিয়া গেল। ক্রোধ যেন দিগম্বর বেশে, তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সহসা মেদিনী কাঁপাইয়া গেল। এই দৃশ্যে ক্রোধের সুন্দর ছবি প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা সন্দেহ করি, ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবি এরূপ ক্রোধের দৃশ্য দিয়াছেন কি না? পাঠকগণ! এস্থলে কবি-রঞ্জনের বর্ণনা দেখুনঃ—

"নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে।
অসম্বর অম্বর অম্বর পড়ে শিরে।।
জ্ঞানহারা তারাকারা ধারা শত শত।
গোযুগে গলিত ধারা তৃষ্ণা নিষ্ঠাগত।।
বিগলিত কুন্তল জলদপুঞ্জ ছটা।
নিরানন্দ গতি মন্দ জিনিয়া বরটা।।"

কবিরঞ্জনের রাণী শান্ত প্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার কোপভাব প্রগাঢ়তর এবং ভাবনায় প্রদমিত হইয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে রাজার নিকট উপনীত হইতেছেন। কিন্তু বিদ্যাকে সহসা গর্ভবতী দেখিয়া রাণীর হৃদয়ে যতদূর ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হওয়া স্বাভাবিক ভারতচন্দ্র সেই প্রজ্জ্বলিত ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া

গিয়াছেন। কিছুকাল বিগত হইলে এই ক্রোধ যেরূপ শান্ত প্রকৃতি ধারণ করে, কবিরঞ্জন সেই শান্ত ক্রোধেরই বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক ততদিন বিগত হয় নাই, যাহাতে সেই কোপভাব প্রশান্ত হইয়া পড়ে। ভারতচন্দ্রকে এইজন্য এই স্থলে কবিরঞ্জন হইতে উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বে বিদ্যার যে আক্ষেপোক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, ভারতচন্দ্র করুণরসও কেমন উৎকৃষ্টরূপে বর্ণন করিতে পারিতেন। কোটালের উৎসববর্ণনও কি চমৎকার! ভারতচন্দ্রের আদিরসগর্ভ কোন্ পংক্তিচয় তাহার সহিত তুল্যমূল্য হইতে পারিবে?

ভারতচন্দ্রের কোন জীবনীলেখক বলেন, "ভারতচন্দ্র-প্রণীত কাব্যমধ্যে কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয় না।" ভারতচন্দ্র রায়ের কল্পনাশক্তি ছিল কি না, তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্যে তাহা প্রকাশিত আছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর মূল বিদ্যাসুন্দর হইতে অনেক বিভিন্ন। কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরেরও সহিত তাহার তুলনা করিলে, ঘটনাপরম্পরায় অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবে। কবিরঞ্জন-বর্ণিত ঘটনার পরিবর্ত্তে ভারতচন্দ্র যে সমস্ত ঘটনা কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ কবিত্বেরই পরিচয় হইয়াছে। এ বিষয় বিশদরূপে প্রদর্শন করিতে হইলে হীরা মালিনীর চরিত্র বর্ণনই গ্রহণ করা আবশ্যক।

বিদ্যাসুন্দরে যেমন হীরা মালিনীর চরিত্র বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ কাহারও নহে। বলিতে কি, কাব্যোল্লেখিত অন্যান্য ব্যক্তিগণের চরিত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ভারতের হীরা মালিনী প্রায় সম্পূর্ণ-চরিত্র। ইহাই বিদ্যাসুন্দর-উপন্যাসের একমাত্র চরিত্র। মধ্যবর্ত্তিনীর এরূপ চরিত্র আমরা কোন কাব্যে প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু এই চরিত্রটি সম্পূর্ণ ভারতের তাহা বলিতে পারি না। এই চরিত্রটি রামপ্রসাদ সেন হইতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু রাম প্রসাদ সেনের মালিনী, ভারতচন্দ্রের মালিনী হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। রাম প্রসাদ সেন যে মালিনীর চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, শেষবর্ণসংযোগ দ্বারা সেই চিত্রফলকই ভারতচন্দ্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছেন। কিরূপে, তাহা ক্রমে প্রদর্শন করা যাইতেছে:—

সুন্দরের সহিত যখন মালিনীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়, আমরা ও তখন মালিনীর প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করি। মালিনী সুন্দরের নিকট কিরূপে আসিতেছে, কবিরঞ্জনের বর্ণনা দেখ:—

"মালাকরদারা হীরে, পুষ্প দিয়া ঘরে ফিরে,
যেতে পথে শুনে লোকমুখে।
তরুতলে রূপরাশি, নিরখে নিকটে আসি,
আপনা পাসরে বামা সুখে॥
জিজ্ঞাসে জুড়িয়া কর, হ্যাদেহে পুরুষবর,
কোথা ঘর কাহার নন্দন।' ইত্যাদি,

সেই মালিনী যখন সুন্দরাভিমুখে আসিতেছে, ভারতচন্দ্র তাহাকে

কিরূপ দেখিতেছেন, পাঠকগণ! চাহিয়া দেখুন্ঃ—

"মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া।
তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সেই পাড়া॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ী, কড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে॥
চুড়াবান্ধা চুল পরিধান শাদা শাড়ী।
ফুলের চুপুড়ী কাঁকে ফেরে বাড়ী বাড়ী॥

* * * *

কাছে আসি, হাসি হাসি, করয়ে জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কোথায় যাবে কোনখানে বাসা॥"

ইত্যাদি।

কবিরঞ্জনের মালিনী পূর্ব্বে সম্বাদ পাইয়াছিল, একটি সুন্দর পুরুষ বকুল তলায় বসিয়া আছে। তাহাকে দর্শনার্থ হীরা সেই দিকেই আসিতে ছিল। কিন্তু আসিবার সময়ে হীরাকে কিরূপ দেখাইল কবিরঞ্জনে তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। ভারতচন্দ্র সেই অবসরেই মালিনীর অঙ্গভঙ্গি চিত্রিত করিয়া দিলেন। মালিনী বর্ষীয়সী, কিন্তু তাহার অঙ্গবিলাস এখনও যায় নাই।

এরূপ বিলাসিনীগণ যখন দূর হইতে নিকটবর্ত্তিনী হইতে থাকে, তখনই তাহাদিগকে ভাল দেখায়, নিকটস্থ হইলে ততদূর সুন্দরী দেখায় না। ভারতচন্দ্র রায় এইটি বিলক্ষণ জানিতেন; জানিয়া এই অবসরেই হীরার চিত্র প্রদর্শন করিয়া যথার্থ ভাবুকেরই কার্য্য করিয়াছেন। কবিরঞ্জন যে স্থলে হীরার চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, সে স্থল নিতান্ত অনুপযোগী বোধ হয়। ভারতচন্দ্রের দৃশ্যকল্পনা কতদূর কবিত্বব্যঞ্জক তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। আমরা এরূপ দৃশ্যকল্পনাকেই প্রকৃত কবিত্বশক্তির ব্যঞ্জক বিবেচনা করি।

ক্রমশঃ

শ্রীপূ

বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বৃহৎকথার দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে, "যে বিক্রমকেশরী—পাটলীপুত্র-রাজ মৃগাঙ্কদত্তের প্রধানতম মন্ত্রী ছিলেন। মৃগাঙ্কদত্ত উন্মাদগ্রস্ত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। বিক্রমকেশরীও তাঁহার অনুসন্ধানে সমস্ত বন প্রদক্ষিণ করিতেন। একদিন তিনি রাজার অন্বেষণ করিতে করিতে ব্রহ্মস্থল নামক এক পবিত্র তীর্থে উপনীত হইলেন। তথায় এক কূপোপকূলে তরুতলে একজন ব্রাহ্মণকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সম্মুখগমনে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ বলিলেন মহাশয়! আমার নিকটে আসিবেন না, আমি সর্পদষ্ট হইয়াছি।' বিক্রমকেশরী সর্পচিকিৎসায় বিশারদ ছিলেন, এইজন্য তিনি ব্রাহ্মণের প্রতিষেধ অবহেলা করিয়া,

তৎসম্মুখীন হইলেন; এবং অসাধারণ চিকিৎসাবলে তাঁহাকে অচিরাৎ বিষমুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন মানসে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'মহাশয়! আপনি কি নিমিত্ত সাম্রাজ্য ও প্রভুতা লাভের আকাঙ্ক্ষী নন?' বিক্রমকেশরী বলিলেন, 'ব্রহ্মন্! আমি সাম্রাজ্য ও প্রভুতার সম্পূর্ণ অভিলাষী। তবে কি রূপে তাহা লাভ করিতে পারা যায়, আপনি তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন।' ব্রাহ্মণ বলিলেন 'মহাশয়! আপনি বেতাল দেবের পূজা করুন; আপনার সমস্ত মনোরথ সফল হইবে। আপনি বিষমশীলের ন্যায় ত্রিবিক্রম উপাধি প্রাপ্ত, ও সিদ্ধিসম্পন্ন হইবেন। মহাশয়! এই ত্রিবিক্রম বিষমশীলের উপাখ্যান শ্রবণ করুন। এই ত্রিবিক্রম বিষমশীল বিক্রমসেনের পুত্র। ইনি গোদাবরীতীরবর্ত্তি প্রতিষ্ঠান নগরের অধীশ্বর ছিলেন। একটী ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে প্রতিবার অন্তর্নিগূহিতরত্ন এক একটী পুষ্প উপহার দিতেন। রাজা পুষ্পগুলি সসম্মানগ্রহণপূর্ব্বক গৃহকোণে নিক্ষেপ করিতেন। পুষ্পগুলি সেই নিভৃতস্থানে অযত্নে পড়িয়া থাকিত, কেহ তাহাদিগকে স্পর্শও করিত না। একদিন রাজা হঠাৎ সেই পুষ্পরাশির মধ্যে একটী রত্ন দেখিতে পাইলেন; এবং প্রত্যেক পুষ্প বিলোড়ন করিয়া প্রত্যেকের অভ্যন্তরেই এক একটী রত্ন দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণ পুনরায় রাজসভায় আসিলে রাজা তাঁহাকে এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ ও তাঁহার অভিসন্ধি জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন 'মহারাজ! আপনি যদি মন্নির্দ্দিষ্ট নিভৃত স্থানে আগমন করেন, তাহা হইলে আপনাকে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বলিতে পারি।' রাজা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন 'মহারাজ! এই নিগূঢ় তত্ত্ব আপনার নিকট প্রকাশ করার পূর্ব্বে আপনাকে আর একটী কার্য্য করিতে হইবে। ঐ যে সম্মুখবর্ত্তী নিকুঞ্জাভ্যন্তরে একটী বৃক্ষ দেখিতেছেন, উহাতে একটী শব রশ্মিসংযত হইয়া লম্বমান রহিয়াছে, আপনি রশ্মিচ্ছেদ করিয়া, ঐ শব আমার নিকট আনয়ন করুন।' রাজা অগত্যা ইহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং রশ্মিচ্ছেদ পূর্ব্বক সেই মৃতদেহ স্কন্ধে আরোপিত করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট আসিতেছেন, এমন সময় সেই মৃতদেহাবিষ্ট বেতাল কথা কহিতে আরম্ভ করিল, এবং পঞ্চাধিক বিংশতি উপাখ্যানে রাজাকে প্রীত ও তাঁহার পথশ্রম অপনীত করিল। প্রত্যেক উপাখ্যানের শেষে সেই শব রাজস্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষে আরোহণ করিল। প্রত্যেক বার রাজা রশ্মিচ্ছেদপূর্ব্বক সেই শবকে স্কন্ধে আরোপিত করিলেন। শেষবার রাজা শবকে দৃঢ়সংবদ্ধ করিলেন। বেতাল দেব রাজার অসমসাহসিকতা ও অসাধারণ অধ্যবসায়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে

বলিলেন 'মহারাজ! ঐ দুষ্টাশয় ব্রাহ্মণ আপনার প্রাণ বিনাশ পূর্ব্বক ভবদীয় সিংহাসন অধিকারের অভিলাষী হইয়াছে, এই জন্য সে মারণযাগ সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই যাগে একটী মৃতদেহের বিশেষ প্রয়োজন; এই জন্যই সে আপনাকে এই শব লইয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছে।' মহারাজ ত্রিবিক্রমসেন বেতালের এই কথায় প্রতীত হইয়া ব্রাহ্মণের প্রাণ বধ করিলেন। এই ঘটনার পর দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন 'রাজন্! তুমি আমার অংশবিশেষ, তুমি পূর্ব্ব জন্মে বিক্রমাদিত্যনামে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলে। এক্ষণে আমি পাপীর দণ্ডবিধানার্থ তোমাকে নিজ অঙ্গ হইতে ত্রিবিক্রমরূপে ধরাধামে অবতারিত করিলাম। তুমি আবার জন্মান্তরে বিক্রমাদিত্য নামে ধরাতলে অবতীর্ণ হইবে। এবং সেই অবতারের কার্য্য সকল সাধিত হইলে পুনরায় আমাতেই লীন হইবে'।"

এই প্রবাদে বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন এই উভয় নরপতিরই উল্লেখ দেখা যাইতেছে। কিন্তু উভয় নরপতিরই জীবনসম্বন্ধিনী ঘটনাবলী ইহাতে এরূপ সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে এতদুভয় বিশ্লিষ্ট করা অতি কঠিন। বিষমশীল প্রথমতঃ গোদাবরী তীরবর্ত্তী প্রতিষ্ঠান নগরীর অধীশ্বর ছিলেন, সুতরাং ইনি ও শালিবাহন একই বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। এই প্রবাদের প্রথমাংশে স্পষ্টতঃ শালিবাহনেরই উল্লেখ দেখা যাইতেছে। বিক্রমকেশরী ও রাজশ্রী কর্ণদেব একই ও অবিভিন্ন। ইনি স্বকীয় রাজাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যনামে খ্যাত হন। বেতালপঞ্চবিংশতিতে ইনি পাটলিপুত্র-ভূমণ্ডল বা পাটলিপুত্র-রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। ইহাঁরই স্ত্রী বিখ্যাত-নাম্নী মাগধী চন্দ্রপ্রভা।

এরূপ প্রবাদ আছে, দেবতারা ম্লেচ্ছদিগের (বিদেশীয় অপবিত্র জাতি) উপদ্রবে জ্বালাতন হইয়া সকলে সমবেত হইয়া কৈলাসে ভবানীপতি মহাদেবের নিকটে গমন করেন। তাঁহারা তথায় উপনীত হইয়া বলিলেন 'ভগবন্! আপনি ও বিষ্ণু অসুর (দৈত্য] দিগকে বধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহারা আবার ম্লেচ্ছরূপে ধরণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের উপর অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম ও যাগযজ্ঞের ব্যাঘাত সম্পাদন করিতেছে এবং মুনিকন্যাগণকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে' ত্রিপুরারি এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং সমাগত দেবগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিয়া স্বয়ং উজ্জয়িনীরাজ মহেন্দ্রাদিত্যের মহিষীর গর্ভে অনুপ্রবেশ করিলেন। রাজা নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া সন্তানকামনায় এই সময় ঘোরতর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। মহিষী

গর্ভবতী হইলে সমস্ত দেবগণ স্বর্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা আরম্ভ করিলেন। রাজপুরোহিত এবং রাজমন্ত্রী-ও নিঃসন্তান ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীরাও রাজমহিষীর সহিত এক সময়েই অন্তঃসত্ত্বা হইলেন; এবং এক দিবসেই ইহাঁরা তিনজনে পূর্ণ-চন্দ্রনিভ তিন পুত্র প্রসব করিয়া রাজা রাজপুরোহিত ও রাজমন্ত্রী এই তিন জন-কেই পিতৃঋণ হইতে মুক্ত করিলেন।

রাজা রাজকুমারের নাম বিক্রমাদিত্য বিষমশীল রাখিলেন। বিক্রমাদিত্য অচির-কালমধ্যেই নানাশাস্ত্রে ও নানা বিদ্যায় গুরুদিগকেও পরাস্ত করিলেন। বৃদ্ধ রাজা যুবরাজকে নানাগুণে অলঙ্কৃত ও রাজকার্য্যে বিশারদ দেখিয়া তাঁহাকে সিংহাসন অর্পণ পূর্ব্বক বারাণসীতে জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে বিক্র-মাদিত্যও সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেন। অধিক কি ক্ষীরসমুদ্রস্থিত শ্বেতদ্বীপও তদীয় যশে ধবলিত হইল। তদীয় সেনাপতি বিক্রমশক্তি দক্ষিণাপথ (দাক্ষি-ণাত্য), মধ্যদেশ (মধ্য ভারত), কাশ্মীর, সৌরাষ্ট্র এবং গঙ্গানদীর পূর্ব্বস্থিত দেশ সকল পরাজিত ও অধিকৃত করিলেন। বি-ক্রমাদিত্য সিংহলেশ্বর বীরসেনকে সন্ধিসং-স্থাপনে ও নিজ করে তদীয় দুহিতা সমর্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি অসংখ্য ম্লেচ্ছ জাতির উচ্ছেদ সাধন এবং অন্যান্য অসংখ্য জাতিকে সমরে পরাজিত করিয়া নির্জ্জ পদতলস্থ করেন। তিনি প্রথমতঃ গুণবতী, চন্দ্রাবতী ও মদনসুন্দরী নামে উজ্জয়িনীবাসিনী তিন রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। পরে চতুর্থ দার-পরিগ্রহের অভিলাষী হইয়া অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারি-লেন, যে বিশ্বকর্ম্মার গৃহে একটী পরমা-সুন্দরী কামিনী অবস্থিতি করিতেছেন। ইনি স্তম্ভস্থ (Cambay) প্রদেশের অধীশ্বর কলিঙ্গসেনের দুহিতা। বিক্র-মাদিত্য কলিঙ্গসেনের নিকট বিশ্বস্ত দূত দ্বারা তদীয় দুহিতার কর প্রার্থনা করি-লেন। কলিঙ্গসেন প্রথমতঃ অস্বীকৃত হইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু পরে বিক্রমাদিত্য বিভীষিকা প্রদর্শন করিলে, অগত্যা স্বীকৃত হইলেন।

দ্বাত্রিংশৎ-সিংহাসনে চতুর্ব্বিংশতি পুত্ত-লিকা ভোজরাজের নিকট বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন সম্বন্ধে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছে—"মহারাজ! পুরন্দরপুরে এক অতি ধনবান্ বণিক্ বাস করিতেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনার চারি পুত্রকে সংরু-দ্ধমুখ চারিটী মৃণ্ময়ভাণ্ড প্রদান পূর্ব্বক আদেশ করেন যেন তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহারা সেই ভাণ্ডগুলি উদ্ঘাটন না করে। তদনুসারে বণিকের মৃত্যুর পরই ভাণ্ডগুলি এক এক করিয়া উদ্ঘাটিত হইল। প্রথমটীর অভ্যন্তরে শুষ্ক মৃত্তিকা, দ্বিতীয়টীর অভ্যন্তরে অঙ্গার, তৃতীয়টীর অভ্যন্তরে অস্থি, এবং চতুর্থটীর অভ্যন্তরে একটী শস্যবীজ দেখিতে পাওয়া গেল। বণিক্পুত্রগণ বিক্রমাদিত্যের নিকট আসিয়া এই বিষয়ের

নিগূঢ়তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিল। বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার সভাসদগণের মধ্যে কেহই ইহার গূঢ়ভাবের উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। সুতরাং চারি বণিক্‌পুত্র অবশেষে প্রতিষ্ঠানগরের রাজার নিকট গমন করিল। কিন্তু রাজা এবং তাঁহার সভাসদগণের কেহই ইহার অর্থোৎঘাটনে সমর্থ হইলেন না।

সেই নগরে দুই জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। গৃহে তাঁহাদিগের একটী বিধবা ভগিনী ছিলেন, ইনি অল্প বয়সেই বিধবা হন। কালে এক নাগকুমারের (তক্ষক) সহযোগে ইঁহার গর্ভসঞ্চার হয়। ভ্রাতৃদ্বয় ভগিনীর কার্য্যে লজ্জিত হইয়া দেশ পরিত্যাগ করেন। হতভাগিনী বিধবা, এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া, এক দীন কুম্ভকারের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানে তিনি এক অপূর্ব্ব পুত্র সন্তান প্রসব করেন এবং কালে তাহার নাম শালিবাহন রাখেন। এই অদ্ভুত শিশুই পূর্ব্বোক্ত আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ করিয়া রাজসকাশে উপনীত হইল; এবং অসংখ্য সম্ভ্রান্ত লোকের সম্মুখে বণিকের সেই উপদেশের মর্ম্মোদ্ভেদ করিল। শিশু নির্ভীকভাবে ও মধুর স্বরে কথা কহিতে লাগিল; এবং সভাসদ্ সকলেই স্তব্ধভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। সে বলিল,—'প্রথম ভাণ্ড মৃত্তিকাপূর্ণ করার অভিপ্রায় এই যে, ইহার অধিকারী পিতার সমস্ত ভূমিসম্পত্তির অধীশ্বর হইবে। দ্বিতীয় ভাণ্ড অঙ্গার-পরিপূর্ণ করার অভিপ্রায় এই যে, ইহার অধিকারী পিতার বৃক্ষাদি সমস্ত উদ্ভিদের অধীশ্বর হইবে। তৃতীয় ভাণ্ড অস্থিপূর্ণ করার অভিপ্রায় এই যে, ইহার অধিকারী পিতার হস্তী, অশ্ব, গবাদি প্রাণীর অধীশ্বর হইবে। এবং চতুর্থ ভাণ্ড শস্য-বীজপূর্ণ করার অভিপ্রায় এই যে, ইহার অধীশ্বর পিতার ধান্যাদি সমস্ত শস্যের অধিকারী হইবে।'

বিক্রমাদিত্য এই অদ্ভুত শিশুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহাকে আনয়নার্থ দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু সেই বালক রাজসকাশে যাইতে অস্বীকৃত হইল; এবং রাজদূতকে বলিল—'যাও দূতবর! তুমি তোমার রাজাকে গিয়ে বল যে, যখন আমার সময় উপস্থিত হইবে, তখন তিনি স্বয়ংই আমার নিকট উপস্থিত হইবেন, আমার যাইবার প্রয়োজন নাই। বিক্রমাদিত্য এই কথায় ক্রোধান্ধ হইয়া সেই বালকের প্রাণবধে কৃত-নিশ্চয় হইলেন; এবং অসংখ্য সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তক্ষককুমার সসৈন্য বিক্রমাদিত্যকে আগত দেখিয়া মৃত্তিকায় সৈন্য নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাদিগের অন্তরে প্রাণ সঞ্চার করিয়া, বিক্রমাদিত্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইল। উভয় সৈন্যের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অবশেষে তক্ষকশিশু সম্মোহন অস্ত্রে বিক্রমাদিত্যের সৈন্যদিগকে বিচেতন করিয়া ফেলিল। বিক্রমাদিত্য নিজ সৈন্যগণকে নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া অনন্তদেবের নিকট সাহায্য

প্রার্থনা করিলেন। বাসুকী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অমৃত প্রদান করিলে, তিনি তদ্দ্বারা নিজসৈন্যদিগের নিদ্রা অপনীত করিলেন। শালিবাহন এই কথা শ্রবণ করিয়া বিক্রমাদিত্যের নিকট অনন্তদেব-প্রদত্ত সুধার কিয়দংশ প্রার্থনা করিলেন। বিক্রমাদিত্য অতি উদার-প্রকৃতি ছিলেন, সুতরাং তিনি শালিবাহনের প্রার্থনায় অস্বীকৃত হইলেন না।

দ্বাত্রিংশৎ-সিংহাসনের প্রথম অধ্যায়ে আর এক বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি গর্দ্দভরূপের পুত্র। এরূপ প্রবাদ যে, ইহাঁর ও মুখাকৃতি গর্দ্দভের ন্যায় ছিল।

বিখ্যাতনামা ভোজরাজ, আর এক বিক্রমাদিত্য। এরূপ প্রবাদ আছে, ইনি মায়াময় সিংহাসনে আসীন হইয়া শ্বেতদ্বীপে গমন করেন, এবং গমনকালে পাতালপুরীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শয়ন-মন্দির ও তাহার অনতিদূরে বলিরাজের গৃহ দেখিতে পান। বলিরাজ ভোজরাজকে অতি সমাদরে গ্রহণ ও 'বিক্রমাদিত্য' এই উপাধি প্রদান করেন।

ভোজরাজের পুত্র জয়ানন্দও 'বিক্রমাদিত্য' এই উপাধি প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ জয়ানন্দকে ভোজরাজের দত্তক পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং কোন কোন মতে তিনি ভানুমতীনাম্নী ভোজরাজ-দুহিতার পাণি গ্রহণ করেন।

এই সকল প্রবাদ ও উপন্যাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে 'বিক্রমাদিত্য' কোন রাজবিশেষের নাম ছিল না—ইহা উপাধিমাত্র। কোন২ রাজা অতিশয় প্রতাপশালী হইলে স্বয়ং 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিতেন, অথবা সাধারণে তাঁহাকে এই উপাধি প্রদান করিত। যাহা হউক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রত্যেক বিক্রমাদিত্যই এক এক শালিবাহনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেন। সেই শালিবাহনগণ—কথন নৃসিংহ, কখন নাগকুমার, কখন নগেন্দ্র, কখন বা অন্য নামে, পরিচিত হইতেন। কেবল একজন বিক্রমাদিত্যকে মহম্মদের সমসাময়িক ও তদীয় অনুচরবর্গের বিরুদ্ধে সমরে অবতীর্ণ হইতে দেখা যায়। পারসীকদিগের ইতিহাসে লিখিত আছে—যে ভাতবর্ষের শেষ হিন্দু সম্রাট্ জয়চন্দ্রের সময়েও শালিবাহন নামে দিল্লী প্রদেশের এক রাজা ছিলেন। দিল্লী প্রদেশে বুধায়ন (Budhaon) নাম একটী জেলা আছে। সেই জেলায় (Cote-Salbahan) কোটশালবাহন নামে একটী ক্ষুদ্র নগর অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এরূপ প্রবাদ যে সেই নগর শালিবাহন নরপতিই নির্ম্মাণ করেন। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে 'শালিবাহন'ও কোন রাজবিশেষের নাম নহে—উপাধিমাত্র।

বিক্রমচরিত, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি গ্রন্থ ভিন্নও, অগ্নি ও ভবিষ্যপুরাণের শেষ অধ্যায়ে, আইন আকবরিতে,

বংশাবলী বা রাজাবলীতে, এবং মালব দেশের রাজগণের তালিকায়, বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আইন আকবরি—সম্রাট্ আকবরের আদেশে তদীয় মন্ত্রী আবুল ফজেল্ কর্ত্তৃক, এবং বংশাবলী বা রাজাবলী ১৬৫৭খ্রী সম্রাট্ আরঙ্গ্জিবের আদেশে রাজা রঘুনাথ কর্ত্তৃক, সংগৃহীত ও সংরচিত হয়।

খ্রীষ্ট শকের ৩১৪ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্তের মগধসিংসানে আরোহণ হইতে ১১৯২ ও ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পৃথুরাজ ও জয়চন্দ্রের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটনাবলী বর্ণন করা—অগ্নি ও ভবিষ্য পুরাণদ্বয়ের, আইন আকবরির এবং রাজাবলীর উদ্দেশ্য। এই রাজাবলীই হিন্দুদিগের পুরাবৃত্তের মূল-ভিত্তি। এতদ্ভিন্নও স্কন্দ, ভাগবৎ, বায়ু, বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণও হিন্দুদিগের ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত।

রঘুনাথের রাজাবলীতে বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। 'বিক্রমাদিত্য' শুদ্ধ আদিত্য শব্দে ও 'শালিবাহন' ধনধর বা ধনঞ্জয় শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। আবুল ফজেল্ বলেন, ধনধর বা ধনঞ্জর শালিবাহনের পিতামহ ছিলেন। রঘুনাথ ও আবুল্ ফজেলের বিসম্বাদি মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, ধনঞ্জয় এবং তাঁহার পৌত্র উভয়েই 'শালিবাহন' এই উপাধি প্রাপ্ত হন। ধনঞ্জয়ের পৌত্র যে বিক্রমাদিত্যের—সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন—সেই বিক্রমাদিত্য কাহার মতে ১৮৪, কাহার মতে ১৯১, এবং কাহার মতে ২০০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনাধিরূঢ় হন। প্রতীচ্য ভারতে রঘুনাথের যে রাজাবলী প্রচলিত, তাহাতে শালিবাহনের পরিবর্ত্তে 'সমুদ্রপাল' শব্দ লিখিত আছে; এবং গাঙ্গেয় প্রদেশে যে রাজাবলী প্রচলিত, তাহাতে বিক্রমাদিত্যের পরিবর্ত্তে 'শূদ্রক' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শূদ্রক ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট্ ছিলেন; এবং ইনিও 'বিক্রমাদিত্য এই উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই সমুদ্রপাল যে কে তাহা সবিশেষ জানা যায় না।

এরূপ প্রবাদ আছে, যৎকালে বিক্রমাদিত্যের বয়স বা রাজত্বকাল নবতিবৎসরে উপনীত হয়, তৎকালে সমুদ্রপালনামক এক ঐন্দ্রজালিক তাঁহার সভায় উপস্থিত হন। এই ঐন্দ্রজালিক আপনাকে বার্দ্ধকে যৌবন-সঞ্চার-সমর্থ বলিয়া পরিচয় দেন। বিক্রমাদিত্য অতিশয় বৃদ্ধ ছিলেন, সুতরাং তিনি স্বভাবতঃই বার্দ্ধক্যের বিনিময়ে যৌবন লাভে একান্ত সমুৎসুক হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি সমুদ্রপালকে অতি যত্নে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমুদ্রপাল রাজার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই সময়ে এক সবলকায় যুবা পুরুষের মৃত্যু হয়। সমুদ্রপাল বিক্রমাদিত্যকে এই যুবা পুরুষের মৃতদেহে আত্মা অনুপ্রবেশিত করিতে বলিলেন, এবং কিরূপে করিতে হইবে তাহাও স্বয়ং প্রদর্শন করিলেন। বিক্রমাদিত্য সেই যুবা পুরুষের মৃতদেহে

নিজ আত্মা বিনিয়োজিত করিলে, যুবা পুরুষ সজীব হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ইত্যবসরে সমুদ্রপালও নিজের আত্মা বিক্রমাদিত্য-পরিত্যক্ত দেহে সন্নিবেশিত করিলেন; এবং সেই ভগ্ন ও জীর্ণ দেহে প্রায় পঞ্চাধিক পঞ্চাশৎ বৎসর অবস্থিতি-পূর্ব্বক, বিক্রমাদিত্যের আকারে, অপ্রতিহত প্রতাপে, বিক্রমাদিত্যের রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। তৎকালে বিক্রমাদিত্যের বয়স বা রাজ্যকাল ৯০ বৎসর হইয়াছিল। সেই ৯০ বৎসরের সহিত সমুদ্রপালের রাজত্বকালের এই ৫৫ বৎসর যোগ করিলে, ১৪৫ বৎসর হয়। দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীরা বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের শকাব্দা ও শকের অন্তর এই ১৪৫ বৎসরই গণনা করিয়া থাকে। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে এতদুভয়ের অন্তর ১৩৫ বৎসর মাত্র দেখিতে পাওয়া হয়।

কুমারিকাখণ্ডে শূদ্রক রাজা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই গ্রন্থে লিখিত আছে যে ইনি খ্রীষ্ট-শকের ১৯১ ০ বৎসরে ভারতের সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হন; এবং ২৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যের অবসান হয়। এই বৎসরেই সমুদ্রপালের রাজ্যের আরম্ভ হয়; এবং ৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তদীয় রাজ্যের অবসান হয়। রঘুনাথ শূদ্রকের সিংহাসনাধিরোহণকাল ২৯১ খ্রীষ্টাব্দ, নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং তাঁহার মতে ৯০১৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-রাজ্যের অবসান হয়। সুতরাং প্রকৃত সময়ের সহিত রঘুনাথ-নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় ১০০ বৎসর অন্তর দেখা যাইতেছে। ইহাতে বোধ হয় ইনি সিবেক্তেখিন ও তদীয় পুত্র মামুদ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের আক্রমণ এবং প্রায় ১০০ বৎসর পরে সাহেবুদ্দীন কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় হিন্দু সাম্রাজ্যের মূলোৎপাটন—এই ঘটনাদ্বয়কে মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন।

রঘুনাথের রাজাবলীতে বিখ্যাত সম্রাট্ ভোজ বিক্রমাদিত্যের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন রঘুনাথ—'দেব ধারাসিংহ' শব্দেই ভোজরাজের উল্লেখ করিয়াছেন। ভোজপ্রবন্ধের অনেক স্থলে ভোজরাজ 'দেবভোজ' শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। বোধ হয় এই জন্যই রঘুনাথ ধারাসিংহের পূর্ব্বে 'দেব' এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং ভোজরাজ ধারানগরীর (Dhar) অধীশ্বর ছিলেন বলিয়া, রঘুনাথ তাঁহাকে 'ধারাসিংহ' এই নাম প্রদান করিয়াছেন। এই বিখ্যাত নগরীর আর একটী নাম শৈলধারা ছিল। এই জন্যই ভোজরাজ বিক্রমাদিত্য শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য-নামক গ্রন্থে 'শৈলাদিত্য' এই নামে আখ্যাত হইয়াছেন। এইরূপ শালিবাহনও প্রতিষ্ঠান বা পত্তন স্থল (Pattan) নগরের অধীশ্বর ছিলেন বলিয়া, 'পত্তনসিংহ' বা 'পত্তনসেন' নামে খ্যাত হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোন বিদেশীয় লেখকই ভোজরাজ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। এই জন্য ভোজ

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের নির্ণয় হওয়া সুকঠিন। কারণ ভ্রম-সঙ্কুল হিন্দু কালবিজ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কাহারও সময় নির্দ্ধারণ করিলে সেই নির্দ্ধারণের সম্পূর্ণ ভ্রম-শূন্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসমূহে হিন্দু পুরাবৃত্ত সপ্তভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তাহা নিম্নে বিবৃত করিয়া অদ্যকার মত এ প্রস্তাবের উপসংহার করা গেল।

প্রথমভাগে—খ্রীষ্টশকের ৩৫৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ২৯২ বৎসর পর্য্যন্ত সময়ের ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। মগধরাজ মহাবলী খ্রীষ্টশকের ৩৫৫ বৎসর পূর্ব্বে মগধ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৩২৭, পূ খ্রী পরলোক প্রাপ্ত হন। ৩২৭ হইতে ৩১৫ পূ খ্রী পর্য্যন্ত নন্দ ও তাঁহার সন্ততিগণ মগধসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। ইহার পর বৎসরেই ৩১৪ পূ খ্রী চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের মন্ত্রণাবলে মগধবংশের উচ্ছেদসাধন পূর্ব্বক মগধ-সিংহাসন অধিকার করেন; এবং চতুরধিক বিংশতি বৎসর ইহা অলঙ্কৃত করিয়া খ্রীষ্টশকের ২৯২ বৎসর পূর্ব্বে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

দ্বিতীয় ভাগে—শালিবাহন ও প্রথম বিক্রমাদিত্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইতিবেত্তৃগণ ও সংগ্রহকারেরা এই দুই নরপতির ইতিবৃত্ত এতদূর তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, যে তাঁহাদিগের প্রকৃত বিষয়ের নির্ণয় হওয়া সুকঠিন। শালিবাহন—গ্রন্থবিশেষে পত্তনসিংহ ও পত্তসেন, সমশীল ও বিষমশীল, ধনঞ্জয় ও ধনধর, শকও শক্তিসিংহ, ও হাল ও শাল, হলী ও শালী এবং নৃসিংহ ও নরবাহন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নামে খ্যাত হইয়াছেন। বিক্রমাদিত্যও ঐরূপ গ্রন্থবিশেষে আদিত্য ও বিক্রম, বিক্রমমিত্র ও বিক্রমতুঙ্গ, বিক্রমসিংহ ও বিক্রমসেন, এবং বিক্রমকেশরী ও বিক্রমার্ক প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নামে খ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই ইনি শালিবাহনের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

তৃতীয় ভাগে—মহারাজ শূদ্রকের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই নরপতি খ্রীষ্টীয় শকের ১৯১ বৎসরে ভারতসিংহাসনে আরোহণ করেন। শূদ্রকও স্থানবিশেষে আদিত্য ও বিক্রমাদিত্য, এবং বিক্রম ও রাজবিক্রম প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নামে খ্যাত হইয়াছেন।

চতুর্থ ভাগে—যে বিক্রমাদিত্য গর্দ্দভরূপের পুত্র ছিলেন, তাঁহারই বিষয় বিবৃত হইয়াছে। খ্রীষ্ট শকের ৪৪১ বৎসরে ইহাঁর রাজ্য আরম্ভ হয়।

পঞ্চমভাগে—মহাভাত বা মহম্মদের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ ভাগে—ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম ভাগে—১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে পৃথুরাজের, এবং ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জয়চন্দ্রের, পরাজয় ও মৃত্যু—এই শোচনীয় ঘটনা দ্বয় বর্ণিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

প্রণয়োচ্ছ্বাস।

১

অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জ্বলিল ?
অকস্মাৎ কেন মন বিষাদিত হইল ?
আন্‌ চান্‌ করে প্রাণ ;
ধরা শর-শয্যা জ্ঞান ;
কিসে হৃদয়েতে মম এত ব্যথা জন্মিল ?
অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জ্বলিল ?

২

কেমনে জন্মিল ব্যথা আমি কি তা জানি না ?
কিন্তু যার জন্যে জ্বলি, সে যে জেনে জানে না।
প্রেয়সী রে নিরদয় !
প্রেম ভুলিবার নয়,
কত চাহি ভুলিবারে ভুলিতে যে পারি না।

৩

প্রিয়তমে ! এই কি রে ছিল তব অন্তরে ?
আশা-ইন্দ্রধনু দূরে দেখাইয়া অম্বরে
কেন তৃষা বাড়াইলে ?
যদি নাহি যুড়াইলে
প্রণয়-শীতলবারি বরষিয়া আদরে।

কি আর বলিব প্রিয়ে ! কত আর বলিব ?
তাপিত তৃষিত চিত্তে কত আর সহিব ?
এই পাই, এই নাই,
হারাইয়া পুনঃ পাই,
মরে বেঁচে, বেঁচে মরে, কতকাল থাকিব ?

৫

কি দুঃখেতে, প্রিয়তমে, গত নিশি গিয়েছে !
কি অনলে এ হৃদয় সারা নিশি দহেছে !
তব চন্দ্রানন প্রিয়ে !
অন্ধকারে নিরখিয়ে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস, প্রিয়ে ! সারা নিশি বহিছে !
কি দুঃখেতে, প্রিয়তমে, গত নিশি গিয়েছে !

৬

কতবার স্বপনেতে মুখ-শশী হেরেছি ;
কতবার স্বপ্ন-ভঙ্গে, সুখ-ভঙ্গে কেঁদেছি।
এইরূপে কেঁদে, হেসে,
দুঃখের সাগরে ভেসে,
প্রেয়সী রে ! মন-দুঃখে গত নিশি কেটেছি।

৭

হবে না আমার, প্রিয়ে ! যদি মনে জেনেছ ;
এ অধীনে, তবে কেনে, এত দুঃখ দিতেছ ?
বল প্রাণ ! একবার,
হবে না আমার আর,
ভস্ম হ'ক্ এ হৃদয়, যাহা দগ্ধ হতেছে।

শ্রীনঃ

বঙ্গে তান্ত্রিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও বৈদিকশ্রেণী ব্রাহ্মণগণের আবাস গ্রহণ।

"পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই তা ছাড়া বামন নাই।" তবে বৈদিকেরা কি ভাল ব্রাহ্মণ নহেন? ইহাঁরা ব্রাহ্মণ কি না তাহা পরে দেখান যাইতেছে। অগ্রে ইহাঁদিগের শ্রেণীগত বিভাগ দেখান যাউক।

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিল-
উৎকলাঃ।
পঞ্চ-গৌড়-সমাখ্যাতা বিন্ধস্যোত্তরবাসিনঃ॥
কার্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ।
আন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণ-
বাসিনঃ॥"

প্রিয়দর্শন পাঠক! বঙ্গদেশে কান্যকুব্জাগত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের সন্তান-পরম্পরা যে প্রকার রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত, বৈদিকেরাও সেইরূপ দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য ভেদে দুই প্রকার। যাহাদিগের গর্ব্ভে গর্ব্ভেই সম্বন্ধ নির্ণয় হয়, অর্থাৎ বালক ভূমিষ্ট হইলেই কন্যা-পক্ষীয়েরা কহেন যদি এই গর্ব্ভে কন্যা জন্মে তবে আপনার এই সন্তানের সহিত তাহার বিবাহ দিব। যাঁহারা এই প্রকার বাগ্‌দান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেই দাক্ষিণাত্য কহা যায়।

পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে এ প্রকার গর্ব্ভে গর্ব্ভে সম্বন্ধ করার প্রথা প্রচলিত নাই। যাঁহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী কালে পশ্চিম হইতে বঙ্গে আগমন করেন, তাঁহাদিগকেই পাশ্চাত্য কহা যায়।

বৈদিকেরা কোন গাঁই বা গ্রামীণ বলিয়া খ্যাত নন, নির্গাঁই বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যদি ইহাঁরা বঙ্গাধিপ কর্ত্তৃক আনীত হইতেন তবে অবশ্য ইহাঁদিগেরও রাজদত্ত সম্মান-সূচক গ্রাম থাকিত। যখন উহা নাই অথচ সম্মানেরও লাঘব দেখা যায় না, তখন অবশ্য ইহাঁদিগের বিষয়ে কোন নিগূঢ় কথা আছে।

দেখ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দিগের সহিত তুলনা করিতে গেলে ইহাঁদিগের সংখ্যা অল্প, বংশাবলীর সংখ্যা অল্প, আগমন-কালের সীমাও অল্প, বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু ইহাঁরা অল্প কাল মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের কতিপয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বংশের সন্তান-পরম্পরার আচার্য্য বা তান্ত্রিক গুরুর পদে কি প্রকারে ব্রতী হইলেন, এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করা সহজ নহে। তবে সামান্য অনুমানেও বৈদিক দিগের প্রদত্ত

শাস্ত্রের বচন প্রমাণ অনুসারে যত দূর বোধগম্য হইতে পারে তাহাই লিখিত হইল।

বৈদিকেরা কহেন কান্যকুব্জদিগের আগমনের পূর্ব্বে যে প্রকার এ দেশীয় ব্রাহ্মণগণমধ্যে অর্থাৎ সাতশতীগনমধ্যে বিদ্যাব্রাহ্মণ্যের লোপ হইয়াছিল, কালক্রমে কান্যকুব্জসন্তানগণমধ্যেও সেই প্রকার বেদাদির চর্চ্চার হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তখন ইহাঁদিগের অন্য উপদেষ্টার আবশ্যক হয়। তৎকালে দ্রাবিড়াদিদেশে বেদের বহুল আলোচনা ছিল। কান্যকুব্জেরা দ্রাবিড় দেশ হইতে আগত বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের নিকট বেদের যথার্থ উপদেশ পাইয়া তাঁহাদিগকে স্বকীয় আবাসের নিকটেই বাস করাইলেন। তদবধি ইহাঁরা বৈদিক নামে খ্যাত হইলেন। ইহাঁরা কোন্ সময়ে এ দেশে আগমন করেন তাহা নির্ণয় করা প্রকৃতপক্ষে বড় কঠিন। তবে ইহাঁরা কহেন, মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্ববর্ত্তী প্রায় সমস্ত জনপদে বিদ্যাব্রাহ্মণ্য ও বেদাদির চর্চ্চা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া পড়িয়া ছিল। তৎকালে দ্রাবিড়াদি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বেদের বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহাঁরা এদেশের খাদ্য-সুখ বাস-সুখ ও অনুগাঙ্গ প্রদেশকে পুণ্যভূমি মনে করিয়া দক্ষিণ হইতে এদেশে আগমন করিলেন। প্রথমে উড়িষ্যায় ও তৎপরে বঙ্গে আসিয়া বাস করেন।

বৈদিক কার্য্যে ইহাঁদের বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল এবং এখানে আসিয়া বেদের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তৎকালে অনেক ভদ্রসন্তান ইহাঁদিগের নিকট বেদশিক্ষার্থী হন। এইসূত্রে ইহাঁরা অনেক স্থলে পৌরহিত্য ও আচার্য্যকার্য্যে ব্রতী হইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাঁরা যে সময়ে এখানে আসিলেন সে সময়ে এদেশে তান্ত্রিকমত সকল এত প্রবল হইয়াছিল যে নবাগত দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগকেও অনেক সময়ে বৈদিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিকমতে চলিতে হইয়াছিল। তথাপি ইহাঁদের সময়ে বৈদিক কার্য্যের যথেষ্ট আদর ছিল।

তান্ত্রিককার্য্যে মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, শবসাধন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্যের বিস্তর প্রসঙ্গ অনুষ্ঠান ও প্রশংসা এবং রসায়নবিদ্যার অনেক অদ্ভুত ব্যাপারের উপযোগিতা নির্দ্দিষ্ট থাকায়, তৎকালে বঙ্গসমাজে তান্ত্রিক কার্য্য গুলি প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইত। অনেকে তন্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এরূপ নানা অলৌকিক জনশ্রুতিও শ্রবণ করা যায়।

কেহ কেহ অনুমান করেন জগন্নাথদেব বুদ্ধাবতার। ইহাঁর প্রভাবে উৎকলের বৈদিক ক্রিয়া লোপ পায়। তদনুসারে মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার উৎকলে বৈদিকক্রিয়ার অনুষ্ঠান-প্রচার জন্য ইহাঁদিগকে তথায় সংস্থাপন করেন।

ইহাঁরা কহেন, মথুরাবাসী চৌবে বা মাথুরব্রাহ্মণ, মাগধ বা গয়ালী ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমস্ত ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বে সামান্যতঃ

গৃহস্থগণ প্রায় অগ্রসর হইতেন না। ইহাঁরা তৎকালে উদাসীনের মধ্যে গণ্য সুতরাং এসকল কার্য্য করণে ইহাঁরা লোক-সমাজে অনাদৃত হইতেন না; প্রত্যুতঃ যজমানের নিকট সম্মানিত হইতেন, এইরূপে ইহাঁদিগের এদেশে বসতির সূত্রপাত হয়। আর গৃহস্থ অপেক্ষায় উদাসীনকে গুরু করায় বিশেষ সুবিধা আছে। গুরুর পুত্র পৌত্রাদিকে গুরুর সদৃশ জ্ঞান করিয়া পূজা করিতে হয়। উদাসীন গুরু হইলে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। কিন্তু নূতন শিষ্যেরা যাহাই ভাবুন নূতন গুরুরা প্রকৃত পক্ষে উদাসীন নহেন। (৫)

কাল ক্রমে ইহাঁরা সপরিবারে এদেশে বদ্ধমূল হন, উত্তর কালে ইহাঁদিগের বংশ-পরম্পরা গুরুকুল হইলেন। লোকে বিবেচনা করিল গুরুকুলে বিবাহ নিষিদ্ধ (৬) ইহাঁরা যখন এদেশের অধিবাসী হইলেন, তখন ইহাদিগের নিকটেই মন্ত্র গ্রহণ যুক্তিসিদ্ধ, কারণ ইহাঁরা বিভিন্নসম্প্রদায়ী ইহাদিগের সংঙ্গে যখন আহার ব্যবহার নাই তখন বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না, এবং যখন একবার গুরু বলিয়া স্বীকার করা গিয়াছে তখন ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করা শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে উচিত হয় না। তদবধি ইহাঁদের প্রভাবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ইহাঁরা আপনাদিগকে তেজীয়ান বলিয়া বড় একটা দোষ গ্রাহ্য করিতেন না। অন্যেরা ভীত ছিলেন। এক্ষণে ও অনেককে দেখাযায়, দণ্ডীর নিকট তান্ত্রিক মন্ত্র গ্রহণ করিবেন তথাপি গৃহস্থের মন্ত্রে শিষ্য হন না।

সে যাহাই হউক বৈদিকদিগের প্রাধান্য ইত্যাদি প্রকারে এদেশে সংস্থাপিত হইলে অনেক উদাসীন ব্যক্তিও আসিয়া বৈদিক বলিয়া পরিচয় দিয়া নানা স্থানে আবাস গ্রহণ করিয়া বদ্ধমূল হইয়াছেন।

বৈদিকশ্রেণীর মধ্যে অনেক গোত্র আছে তন্মধ্যে চতুর্বিংশতি গোত্র আদরণীয়। যথা—

শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, সৌকালীন, কৃষ্ণ, অগ্নিবেশ্য, কৃষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, মৌদ্গল্য আলম্যান. পরাশর, সৌপায়ন, অত্রি, বাসুকী, রোহিত, বৈয়াঘ্রপদ্য, জামদগ্ন্য, এই চতুর্ব্বিংশতি গোত্র।

কুলদীপিকায় ৪২ টী গোত্রের নির্দ্দেশ আছে। ঔপনিবেশিকদিগের নির্ণয়স্থলে সমুদায় গোত্রের নাম ও প্রবর এবং কোন কোন গোত্রের সঙ্গে কি কি প্রবরের সাদৃশ্য এবং প্রবরের বৈসাদৃশ্য থাকিলে কি কি গোত্রের সাদৃশ্য আছে, তৎসমস্ত তথায় দেখান গেল।

(৫) গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু গুরুবৎ তৎসুতাদিষু।

(৬) মৎস্য সূক্তের প্রমাণ যথা :—
সমানপ্রবরাবাপি শিষ্যসন্ততিরেবচ।
ব্রহ্মদাতুগুরোশ্চৈব সন্ততিঃ প্রতিষিধ্যতে॥
উদ্বাহতত্ত্বধৃত বচন।

পাশ্চাত্য বৈদিকেরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত জোঁয়াড়ী ও কোঁয়াড়ী। জোঁয়াড়ীদিগের মধ্যে শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ ও মৌদ্গল্য গোত্রের বংশগুলি বিশেষ মান্য অর্থাৎ কুলীন-স্থানীয় (৭)। ইহাঁদিগের মধ্যে যদিচ বেদত্রয়েরই নাম শুনা যায় অর্থাৎ কেহ সামবেদী, কেহ ঋক্‌বেদী, কেহ বা যজুর্ব্বেদী, তথাপি ইহাঁরাও ঐ সকল বেদের এক একটী শাখার এক দেশ ব্যতীত সমগ্র শাখা অনুসারে গৃহ্য কর্ম্ম করেন না। সামবেদীরা কুতুম শাখার এক দেশ, যজুর্ব্বেদীরা কাণ্ব শাখার এক দেশ, ঋগ্বেদীরা আশ্বলায়নশাখার একদেশ পাঠ করেন। জোঁয়াড়ীরা কহেন নিমাই সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করায় তিনি নিঃসন্তান হেতু সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্র লোপ হইয়াছে। তবে যদি কোন স্থানে কেহ থাকেন তিনি বড় প্রসিদ্ধ নহেন।

কোঁয়াড়ীদিগের মধ্যে গোত্রানুসারে বংশাবলীর তারতম্য হয় না। ইহাঁদিগের মতে যিনি সদাচার-সুসম্পন্ন ও গুণশালী তিনিই মর্য্যাদাপন্ন ও গৌরবান্বিত। যিনি কদাচার ও কুক্রিয়াশালী তিনিই হেয় ও অশ্রদ্ধেয়।

বৈদিক শ্রেণীর মধ্যে অন্যপূর্ব্বা-বিবাহকারী নিষ্প্রভ ও হীন-ক্রিয় মধ্যে পরিগণিত।

শ্রীলাল—

(৭) শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যঃ সাবর্ণকস্তথা।
ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালীনস্তথাপরঃ॥
কল্পিষশ্চাগ্নিবেশ্যশ্চ কৌশিকশ্চ তথাপরঃ।
বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ কৃষ্ণাত্রেয়বশিষ্ঠকৌ॥
ঘৃতকৌশিকমৌদ্গল্যো আলম্যানঃ পরাশরঃ।
সৌপায়ন স্তথাত্রিশ্চ বাসুকী রৌহিতস্তথা॥
বৈয়াঘ্রপদ্যকশ্চৈব জামদগ্ন্য স্তথাপরঃ।
চতুর্বিংশতিবৈর্গোত্রাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বপণ্ডিতৈঃ॥

সারদামঙ্গল সঙ্গীত।

দ্বিতীয় সর্গ।

১

একি! একি! কেন! কেন!
বিষণ্ণ হইলে হেন!
আনত আননশশী,
আনত নয়ন;
অধরে মন্থরে আসি,
মিলায় কপোলে হাসি,
থর থর ওষ্ঠাধর
স্ফোরে না বচন।

২

তেমন অরুণ-রেখা,
কেন কুহেলিকা ঢাকা;
প্রভাতপ্রতিমা আজি
কেন গো মলিন!

বরষে মন্দার ধারা
আবরি গগণ;
আমোদে আমোদময়,
অমৃত উথুলে বয়,
ত্রিদশ-আলয় আজি
আনন্দে মগন।

১৫

জ্যোতির্ম্ময় সপ্তঋষি
প্রভায় উজলি দিশি,
সম্ভ্রমে কুসুমাঞ্জলি
অর্পিছেন পদতলে।

১৬

শতসূর্য্য পরকাশী
অপরূপ রূপরাশি,
দ্যাখ দেবী! দ্যাখ দ্যাখ
তুলি বিলোচন!
কল্পনা-কমল-বনে
আনিয়াছি যে তপনে,
এই কি তোমার সেই পুরুষরতন—
ইনিই কি সেই তব রসিক-রমণ?

১৭

এ মহাপুরুষ নন?
কে তবে সে অভাজন
লুঠিবে নলিনীবন
সুমুখে আমার?
"বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা
কে খণ্ডাতে পারে তাহা"
এ অতি অসার কথা—ঘোর
কাপুরুষি কথা,
সহে নাক আর—প্রাণে সহে নাক আর!

১৮

অহহ! কাহার তরে
অভাগা নরকে জ্বরে

মরু—মরু—মরুময়
জীবনলহরী;
এ বিরস মরুভূমে
সকলি আছন্ন ধূমে,
কোথাও একটীও আর
নাহি ফোটে ফুল;
কভু মরীচিকা মাজে
বিচিত্র কুসুম রাজে,
উঃ! কি বিষম ধাজে
যেই ভাঙে ভুল!
এত যে যন্ত্রণা জ্বালা,
অবমান অবহেলা,
তবু কেন প্রাণ টানে
কি করি—কি করি!

১৯

তেমন আকৃতি! আহা!
ভাবিয়ে ভাবিয়ে যাহা
আনন্দে উন্মত্ত মন,
পাগল পরাণ;
সে কি গো এমন হবে!
মোর দুখে সুখে রবে,
কাঁদিয়ে ধরিলে কর
ফিরাবে বয়ান!

২০

ভাবিতে পারিনে আর!
অন্ধকার—অন্ধকার—
ঝটিকার ঘূর্ণী ঘোরে
মাথার ভিতর;
তরঙ্গিয়ে রক্ত-রাশি
নাকে মুকে চোকে আসি

বেগভরে ঠেলে ফ্যালে
থর থর থর !

২১

ধর, আত্মা ধৈর্য্য ধর,
ছিছি একি কর কর ;
মর যদি, মরা চাই
মানুষের মত !
থাকি বা প্রিয়ার বুকে,
যাই বা মরণ-সুখে,
এ আমি আমিই রব ;
দেখুক্ জগৎ !

২২

মহান্ মনেরি তবে
জ্বলা জ্বলে চরাচরে,
পুড়ে মরে ক্ষুদ্রেরাই
পতঙ্গের প্রায়।
জ্বলুক্ যতই জ্বলে,
পর-জ্বলা-মালা গলে !
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠে জলে
হলাহল-দ্যুতি
যেন মরকত-মালা

হেরে হাসে গিরিবালা ;
আকুল অমর-কুল
তরাসে পলায়।
অস্তাচলে চলে রবি,
কেমন প্রশান্ত ছবি !
তখনো কেমন আহা
উদাস বিভূতি !

২৩

হা ধিক্ অধীর হেন !
দেখেও দেখনা কেন
দুখে দুখী অশ্রুমুখী
প্রেমপ্রতিমায় !
প্রণয়পবিত্রধনে
সন্দেহ কর না মনে,
নাগর-দোলায় দোলা
শিশুরি মানায়।

২৪

সরল কোমল প্রাণে
বিঁধ না ও বিষবাণে
ব্যথা পাবে দেববালা
চিত্ত শতদলে !

ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

শত্রুসিংহ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রতাপের পত্র কোথায়?

বর্ণনীয় বিষয়ের অনুরোধে সময়ের ঠিক রাখিতে পারি নাই; অপরাধ মার্জ্জনীয়। পাঠক! আমাকে দিন কুড়ী পঁচিশ পিছাইয়া যাইতে হইল। অনুরোধ করি আপনারাও আমার সহিত আসুন।

শত্রুগঞ্জ হইতে বর্দ্ধমান যাইতে পথে বদনগঞ্জ বলিয়া একটী গ্রাম আছে। এই গ্রাম শত্রুগঞ্জ হইতে প্রায় ছয় সাত ক্রোশ উত্তরে। গ্রামের অবস্থা এখন মন্দ নহে। দুই একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। দুই একটী বাঁধান পুষ্করিণীও অদৃশ্য নহে। কিন্তু একশত বৎসর পুর্ব্বে গ্রামটী কেবল নামেই ছিল। দুই চারি খানা অতি সামান্য খড়ো ঘর, তাহাতেই সামান্যাবস্থার দুঃখী লোক কষ্টে কাল যাপন করিত। এখনকার মত গ্রামে যাত্রী লোকের সুবিধার জন্য চটী কিম্বা বাজার কিছুই ছিল না। পথিককে গাছতলায় থাকিতে হইত, অথবা কাহারও বাটী আতিথ্য স্বীকার করিতে হইত। পথে দস্যু-ভয় ভয়ানক প্রবল ছিল। কত লোককে কত সময়ে যে এই পথে প্রাণ দিতে হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। অদ্যাবধিও ঐ সম্বন্ধে নানা প্রকার কথা এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

বদনগঞ্জের বিষয় এত অধিক বলিবার প্রয়োজন ছিল না। কথায় কথায় কথা বাড়িয়া গেল, অপরাধ স্বীকার করি। বদনগঞ্জের যে স্থানে এখন স্কুল গৃহ, ঐ স্থানেই একশত বৎসর পূর্ব্বে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল। পথিকেরা উহার ছায়াতে বিশ্রাম করিত। পাক শাক করিয়া আহারাদি করিত।

যে দিন তারাচাঁদের সহিত প্রতাপসিংহের মহাবলপুর সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হইল, তাহারই পর দিন বেলা আন্দাজ দেড় প্রহরের সময় একজন যুবা পুরুষ আসিয়া এই বটতলায় বিশ্রামার্থে উপবেশন করিল। যুবককে দেখিলেই বোধ হয় ভদ্রবংশীয় নহে। বাস্তবিক ও সে এক জন মেদিনী পুরে চোয়াড়। বয়স সাতাশ আটাশ। আকৃতি কিছু দীর্ঘ। বর্ণ কৃষ্ণ, মস্তকে লম্বা চুল, ঝুঁটী বাঁধা। চক্ষুদ্বয় বিশাল ও আরক্ত-বর্ণ। হস্তে এক খানি টাঙ্গি। এক খানি বস্ত্র মালকোচা করিয়া পরা, আর এক খানি কোমরে জড়ান।

যুবক ক্ষণকাল মাত্র বিশ্রাম করিয়া

কটিদেশ হইতে একটু তামাকু ও একটী কলিকা বাহির করিল। কলিকায় তামাকু সাজিয়া অগ্নির অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, দুই জন পথিক পশ্চিম মুখ হইতে সেই দিকে আসিতেছে। এক জনের হস্তে একটী ক্ষুদ্র হুকা, তাহাতে তামাকু চলিতেছে।

যুবক আর অগ্নির অনুসন্ধান না করিয়া উহাদেরই অপেক্ষা করিতে লাগিল। পথিকদ্বয় আসিয়া বটতলায় উপবিষ্ট হইল। যুবক উহাদের কাছে একটু অগ্নি চাহিয়া লইল।

নবাগতদিগের বেশ ভূষা প্রায়ই যুবকের অনুরূপ। মস্তকে লম্বা চুল ঝুটী বাঁধা। আকৃতি যুবকের অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ। এক জনের হস্তে এক গাছী দীর্ঘ বংশ-যষ্টি, অপরের হস্তে এক খানি দীর্ঘ ধনুক এবং গুটী কতক তীর। দুজনেরই কোমরে দুইটী গাঁটরী। তিন জনেই এক স্থানে উপবিষ্ট। নবাগতদিগের মধ্যে এক জন যুবককে জিজ্ঞাসা করিল। "তুমি কোথায় যাইবে ভাই?" যুবক উত্তর করিল, আমি মহাবল পুরে যাইব।' যুবকের কথা শুনিয়া প্রশ্নকারীর মুখের ভাবান্তর হইল। যেন কি সংশয় উপস্থিত হইল, মনে মনে কি তর্কের আবির্ভাব হইল।

মনে মনেই আবার সেই সংশয় ছেদ হইল। প্রশ্নকারীর সঙ্গী এই অবকাশে যুবকের নাম জিজ্ঞাসা করিল। জানিল উহার নাম দনু। আসল নাম জনার্দ্দন,—দনু জনার্দ্দনের অপভ্রংশ।

প্রথমপ্রশ্নকারী দনুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার বাড়ী কোথায়?'

দনুর তাতে কিছু মাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। উত্তর করিল, ' আমার বাড়ী শত্রুগঞ্জ।'

প্রশ্নকারী তাহার সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিল—চারি চক্ষু সমান্তরাল হইল। নেত্র-চতুষ্টয় পরস্পরের ভাব অবগত হইল,—দনু এ সব কিছুই দেখিল না,—বুঝিল না—দনুর মনে সন্দেহ হয় নাই।

প্রথম প্রশ্নকারী আবার জিজ্ঞাসা করিল "মহাবল পুরে তোমার কোন বিশেষ দরকার নাই?" নির্ব্বোধ দনু এখনও বুঝিল না। বলিল "দরকার আছে বই কি, আমি কুমার বীরসিংহের নিকট পত্র লইয়া যাইতেছি।"

সুচতুর পাঠক! দনুর উপর তোমার রাগ হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। এরূপ আহাম্মক নির্ব্বোধের উপর কেনই না রাগ হইবে? কিন্তু সংসারে দনুর মত নির্ব্বোধ অনেক। "নাপৃষ্টঃ কস্যচিৎ ব্রূয়াৎ নচান্যায়েন পৃচ্ছতঃ". এ বাক্যের মর্ম্ম-গ্রহ করিতে অনেকেই অক্ষম, মর্ম্ম-গ্রহ হইলেও অনেকে এ উপদেশের অনুগামী হন না। সাবধান হইয়া কথা কহিতে কয় জন জানেন। যদি সকলেই সমান চতুর হইত তাহা হইলে অপরাধীর দণ্ড হওয়া কঠিন হইত। স্বভাবের নিয়ম—স্বভাবের দোষ—দনুর কোন অপরাধ নাই।—দনু শিক্ষা পায় নাই।—দনু সত্য কহিল।

তারাচাঁদের উপর বিরক্ত হইলে? সে কেন দমুকে শিখাইয়া দেয় নাই।—তারাচাঁদের দোষ নাই। তারাচাঁদ জানিত না যে দমু এরূপ সঙ্কটে পড়িবে। তারাচাঁদ জানিত না যে দমু এত নির্ব্বোধ।—

দমুকে কেহ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

দমু তাহার সঙ্গীগণকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কোথায় যাইবে?"—উত্তর পাইল "আমরা গড়বেতা হইতে আসিতেছি, ঘাটাল যাইব" দমু আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

বেলা ক্রমে অধিক হইতে লাগিল, দমুর তাড়া আছে, অদ্য মহাবলপুরে যাইতে হইবে। দমু গাত্রোত্থানের উদ্যোগ করিল। অপর দুই জন নিবারণ করিল। সেইখানেই আহারাদির প্রস্তাব হইল। দমু আহার করিতে অনিচ্ছুক; দমুর সঙ্গে কোন আহারীয় নাই।

আগন্তুকেদের সহিত চিঁড়া ছিল। দমুকে তাহার অংশ দিতে চাহিল। দমুও অস্বীকার করিল না।

আগন্তুকেরা দুই জনেই আপন আপন কটিদেশস্থ পুটুলি হইতে চিঁড়া বাহির করিল। একটী পুটুলিতে অধিক চিঁড়া, একটাতে কিছু কম। কম চিঁড়া গুলি দমুর ভাগ্যে পড়িল।

অনতিদূরস্থ পুষ্করিণীতে যাইয়া, গাম্‌ছা শুদ্ধ চিড়া ভিজাইয়া আনা হইল। আগন্তুকেরা আপনাদের চিড়া ভোজন করিল। দমুও তাহার অংশের চিড়া গুলি সানন্দ মনে ভোজন করিল।

আহার শেষ হইতে না হইতেই দমুর অঙ্গ সকল ক্রমে অবশ হইতে লাগিল। দমু বসিতে অশক্ত।—শয়ন করিল, হস্ত পদাদি ক্রমে আস্ফালন করিতে লাগিল। চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। নাসিকা স্ফীত হইল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। ক্রমে মুখ হইতে ফেণা নির্গত হইতে লাগিল। দমু চেতনা-রহিত। কেবল এক একবার বলিতে লাগিল।—বুক যায়—প্রাণ যায়—মরি—মা—বাবা—তারাচাঁদ—আ—মা—কে—মে—লে।—বাবারে—বিষ খা—ও—য়ালে। দমুর আর সংজ্ঞা নাই। অচেতন—জড়বৎ—ভূতলে পতিত।—দমুর প্রাণ বহির্গত।—দমুর জীবন শেষ হইল। ইহ লোকের সকল সুখ নির্ম্মূলিত হইল। পরকালে দমুর কি হইবে? কে জানে—দমু জানে না—দমুর সুখের বিষয়। আমি জানি না—আমি নির্ব্বোধ। পরকালে দমু সুখেই থাকুক—দুঃখেই থাকুক কেহ জানিতে পারিবে না—এই দমুর পরম সুখ।—প্রিয় পাঠক! তুমি জানিতে পারিবে না, দমুর দুঃখ দেখিয়া তুমি হাসিতে পাইবে না—দমুর সুখ দেখিয়া তুমি কাঁদিতে পাইবে না—এই দমুর পরম সুখ।

দমুর প্রাণ-পক্ষী উড়িয়া যাইল—সম্মুখে দুই কালান্তক।—তাহাদের ঈর্ষা-শরে প্রাণপক্ষী বিদ্ধ হইল—হত হইল।

দস্যুর মৃত দেহ লইয়া কালান্তকেরা কোথায় চলিয়া গেল। গ্রামের কেহই কিছু জানিতে পারিল না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মঙ্গলপট্টনে।

যে দিকে অবলোকন কর সেই দিকেই শাল-তরু। বিশাল শালবৃক্ষ চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। দুর্ভেদ্য তরু-দুর্গ ভেদ করিয়া সহজে প্রবেশ করিবার পথ নাই। এক দিকে একটী মাত্র গুপ্ত পথ। তাহাও অতি সঙ্কীর্ণ—এ পথ অপরিচিতের দৃষ্টিতে সহজে পতিত হয় না। পথের গতি এরূপ জটিল যে অপরিচিত পথিকের এ পথ অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থানে যাওয়া প্রায় অসম্ভব।

এই নিবিড় শালবন অতিক্রম করিয়া এক ক্রোশ গমন করিলে একটী প্রাচীর-বেষ্টিত পুরী দেখিতে পাইবে। প্রাচীর মৃত্তিকার, পুরীও মৃত্তিকার। মৃত্তিকার হইলে কি হয়—পাষাণ অপেক্ষা দৃঢ়। বাটীর সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ কর, চতুর্দ্দিকে মেটে ঘর,—খড়ে ছাওয়া—শ্রেণী-বদ্ধ। উঠানের মধ্য স্থলে এক খানি বৃহৎ আটচালা মোটা মোটা শালের খুঁটীর উপর বিরাজ করিতেছে।

ইহাই মঙ্গলপট্টনের রাজপুরী।—পাঠক! চমকিয়া উঠিলে?—রাজার মাটীর ঘর! খড়ে ছাওয়া! আমি কি করিব?—যাহা প্রকৃত তাহাই বলিলাম। তোমাকে তাহাই বিশ্বাস করিতে হইবে।

বেলা প্রায় অবসান—চতুর্দ্দিক্ মেঘাচ্ছন্ন। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। চতুর্দ্দিকে উন্নত শাল বৃক্ষ, সহজেই দিবসে অন্ধকার, তাহাতে আবার সন্ধ্যা উপস্থিত, সন্ধ্যা-কালেই যেন রাত্রি এক প্রহর।

আটচালার মধ্যস্থলে শয্যা বিস্তীর্ণ। শয্যায় দুই জন পুরুষ উপবিষ্ট। একজনের পৃষ্ঠদেশ একটি দেড় হস্ত ব্যাসের তাকিয়ার উপর—অপর ব্যক্তি তাহার সম্মুখে বিনীত ভাবে বসিয়া আছেন।—মঙ্গলপট্টনের রাজা বাহুবলেন্দ্র এবং তাঁহার মন্ত্রী জগন্নাথ নিকটবর্ত্তী। দুই পার্শ্বস্থ দুইটী দীপ আলোক প্রদান করিতেছে।—নিকটে আর কেহই নাই। চতুর্দ্দিক্ স্থির, নিস্তব্ধ, কেবল বৃষ্টির মন্দ মন্দ টিপ্ টিপ্ শব্দ কর্ণগোচর হইতেছে।

রাজার বয়স পঞ্চাশবৎসরের সমীপস্থ, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। দেহের দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত অল্প, বিস্তার অপেক্ষাকৃত অধিক—কিন্তু স্থূল নহে। নাসিকা উন্নত। চক্ষু বিশাল কিন্তু আকর্ণ নহে। দেহের ন্যায় চক্ষুর বিস্তারও অপেক্ষাকৃত অধিক। গোল চক্ষু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, চক্ষু দ্বয় রক্ত বর্ণ; ক্রোধের কি সিদ্ধির প্রভাবে বলিতে পারি না। গণ্ডদ্বয় শ্মশ্রুতে আচ্ছন্ন। চিবুক মুণ্ডিত, ভ্রূযুগল সংযুক্ত, বিশাল—কেশ সংকুল। কপালদেশ প্রায় সর্ব্বদাই বলীবদ্ধ। কর্ণ দুইটী কিছু

ক্ষুদ্র। দুই কর্ণে দুইটী বীরবৌলী ঝুলিতেছে। দুইটী বীরবৌলীতে দুই যোড়া বড় বড় মুক্তা। মস্তকে উষ্ণীষ, গাত্রে অঙ্গরাখা, পরিধান ধুতী মালকোছা করিয়া পর।

মন্ত্রীর আকৃতি রাজার অপেক্ষা দীর্ঘ, গৌর, সৌম্য। বয়স রাজার অপেক্ষা অল্প। বোধ হয় চল্লিশ অতিক্রম করিয়াছে মাত্র। মস্তকে শ্বেত বস্ত্রের উষ্ণীষ, গাত্রে শ্বেত বস্ত্রের অঙ্গরাখা, শ্মশ্রু সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডিত। রাজাকে দেখিলে ভয় হয়—সন্দেহ হয়। মন্ত্রীকে দেখিলেই ভক্তি হয়, বিশ্বাস হয়।

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মন্ত্রিবর! আর অমত করিও না, আর নিবারণ করিও না, এখন নিবারণ করিলে কোন ফল নাই। যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি অবশ্য সম্পন্ন করিব।"

রাজা মন্ত্রীর দিকে চাহিলেন, মন্ত্রী এখনও নীরবে, রাজা আবার বলিলেন. "জগন্নাথ! তুমি চুপ করিয়া রহিলে যে?' জগন্নাথ বলিলেন, "মহারাজ! আমি কি উত্তর দিব?।"

"এখনও কি তুমি আমাকে নিবৃত্ত হইতে বল?"

"মহারাজ! আমি এখনও আপনাকে এই গর্হিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে বলি।"

রাজার আরক্তনেত্র আরও রক্তবর্ণ হইল। কপালের বলী আরো আকুঞ্চিত হইল, কণ্ঠের স্বর দ্বিগুণ কর্কশ হইল। আবার বলিলেন:—

"জগন্নাথ! তুমি পূর্ব্বাপর দেখিয়াও এখনও বলিতেছ আমার কার্য্য গর্হিত। শত্রুসিংহ আমার অপমান করিতেছে, শৃগাল হইয়া সিংহের মস্তকে পদে পদে পদক্ষেপ করিতেছে, আমি ইহা সহ্য করিব? মহারাজ বীরবাহুর পুত্র একজন দস্যুর নিকট অবমানিত হইবে, তোমার স্বর্গীয় পিতা হইলে আমাকে এরূপ পরামর্শ দিতেন না।"

"মহারাজ! আমার পিতাই আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেবকে শত্রুসিংহের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।"

"শত্রুসিংহ আমার এরূপ অপমান করিবে, তাঁহারা কখনও মনেও করেন নাই। তাহা হইলে এরূপ সম্বন্ধ কখনও ঘটিত না।"

"যাহা ঘটিয়াছে তাহার উপায় নাই। স্বর্গীয় মহাত্মাদের কার্য্য ভাল বলিয়াই শিরোধার্য্য করিতে হইবে।"

"আমি এরূপ অপমান কোন মতেই সহ্য করিতে পারিব না।"

"মহারাজ কি ইন্দিরা দেবীকে পিতৃহীনা করিতে চাহেন? মাতৃহীনা বালিকাকে নিঃসহায়া করিতে চাহেন?"

"জগন্নাথ! আমি আপন ঔরসজাত একমাত্র পুত্রের মস্তকও স্বহস্তে ছেদন করিতে পারি, কিন্তু এরূপ দুঃসহ অপমান সহ্য করিতে পারি না।"

"এই ভয়েই বোধ হয় জগদীশ্বর

আপনাকে পুত্ররত্নে বঞ্চিত করিয়াছেন।'

বাহুবলেন্দ্রের চক্ষুদ্বয় তীক্ষ্ণশরের ন্যায় জগন্নাথের মুখের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। জগন্নাথ স্থির স্তিমিত নেত্রে সেই শর প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। বাহুবলেন্দ্র ক্রোধ প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেন। মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া ধীরভাবে বলিলেন:—

"মন্ত্রিবর! যাহা হইবার হইয়াছে। শত্রুসিংহের সহিত আমি রণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, শত্রুসিংহের সহিত শত্রুতা একেবারে অনিবার্য্য হইয়াছে, এখন যাহাতে আমার মঙ্গল হয় তাহা কর।"

"মহারাজের মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল—রাজ্যের মঙ্গল। মহারাজের মঙ্গলের জন্যই, এই অন্যায় সমরে প্রবৃত্ত হইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া আসিতেছি। ভৃত্য হইয়াও মহারাজের মতে অমত করিতেছি। মহারাজের কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছি।"

"জগন্নাথ! তুমি আমাদের বংশের যথার্থ হিতৈষী, স্বর্গীয় পিতার উপযুক্ত পুত্র। যাহা হইয়াছে তাহার চারা নাই। এখন যাহাতে মঙ্গল হয় প্রাণ পনে চেষ্টা কর।"

"মহারাজের মঙ্গল-চিন্তা নিরন্তর আমার হৃদয়ে জাগরূক। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। প্রভুকে সুপরামর্শ দেওয়া ভৃত্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রভুর আজ্ঞা অন্যায় হইলেও নিবিষ্ট চিত্তে প্রতিপালন করা ভৃত্যের অবশ্য-প্রতিপাল্য ধর্ম্ম, প্রত্যবায়ে অধর্ম্ম।"

"এখন যাহাতে আমি বিবাদে পরাস্ত না হই এরূপ করা কর্ত্তব্য, তাহাতে তুমি কি পরামর্শ দেও—কি উপায় করিতে বল?"

"মহারাজ! আত্মপক্ষ প্রবল ও পরপক্ষ ক্ষীণ করা উচিত। এবং সেই কারণেই যাহাতে মহাবলপুরের রাজা মহাবলসিংহ শত্রুসিংহের শত্রু হন, এবং মহারাজের মিত্র হন এরূপ উপায় করা প্রথমেই উচিত।"

"জগন্নাথ! এই জন্যই লোকে তোমাকে বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ বলিয়া থাকে। আচ্ছা জগন্নাথ! যাহাতে মহাবলপুরের রাজা আমাদের মিত্র হন এবং শত্রুসিংহের শত্রু হন এরূপ উপায় শীঘ্র করা ত উচিত?"

"মাহারাজ! অধীন পূর্ব্ব হইতেই সে বিষয়ে উদ্যোগী আছে। পূর্ব্বেই জানিতাম মহারাজ বিবাদে ক্ষান্ত হইবেন না।"

"আচ্ছা কি উপায় করিয়াছ?"

"চতুর্দ্দিকে বিশ্বস্ত চতুর চর পাঠাইয়াছি। শত্রুসিংহ কখন কি করেন, তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার জন্য তাহারা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। যদি এমন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখে যাহাতে মহারাজের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, কিম্বা শত্রুসিংহের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, তাহা তাহারা নিবারণ করিবে।"

বাহুবলেন্দ্রের মুখ প্রফুল্লিত হইল। জগন্নাথকে বহুবার সাধুবাদ প্রদান করিলেন, আহ্লাদে গদ্‌গদ্ হইলেন। মনে

হইতে লাগিল যেন কার্য্য-সিদ্ধি হইয়াছে, শক্রসিংহ যেন তাঁহার পদানত হইয়াছেন। বর্ত্তমান ছাড়িয়া তাঁহার মন ভবিষ্যতে বিচরণ করিতে লাগিল, মনে মনে কতই সুখী হইলেন।

জগন্নাথ অনুমানে মহারাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন।

নানা প্রকার কথা বার্ত্তায় ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। উভয়েই উত্থান করিতে উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে দুই জন অস্ত্রধারী চোয়াড় সোদ্বেগে সসম্ভ্রমে আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

মন্ত্রী দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। পাঠক! তুমিও বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছ? ইহাদের সহিত বদনগঞ্জে বটতলায় তোমার দেখা হইয়াছিল। ইহারা সেই দস্যুর যম। জগন্নাথ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা আদ্যোপান্ত সমস্ত সবিস্তর বর্ণনা করিল। জগন্নাথ চমকিয়া উঠিলেন, মনে মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল, মনে মনে আপনাকে নরহত্যায় পাতকী স্থির করিলেন। কিন্তু কি করিবেন, প্রভুর কার্য্য অবশ্য করিতে হইবে, মন্ত্রি-ধর্ম্ম অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে। বাল্যাবধি এইরূপে শিক্ষিত। পিতার কাছে এই রূপই উপদেশ পাইয়াছেন। উপদেশমত কার্য্য তাঁহাকে অবশ্যই করিতে হইবে। প্রভুর হিতার্থ গর্হিত কার্য্যও তাঁহাকে করিতে হইবে।

পাঠক! দস্যুর মৃত দেহ কি হইল তোমরাও জান না, মন্ত্রীও জানিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন না। জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। দস্যুকে উহারা প্রাণে মারিল কেন তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। —প্রাণে না মারিলে দস্যুর কাছ হইতে প্রতাপসিংহের পত্র নেয় কাহার সাধ্য?

জগন্নাথ প্রতাপসিংহের পত্র পাঠ করিলেন, মুখ ঈষৎ সহর্ষ হইল। রাজার হস্তে পত্র প্রদান করিলেন। রাজার মুখ আহ্লাদে আটখানা হইল। আহ্লাদে পত্রের মর্ম্ম পাছে প্রকাশ করিয়া ফেলেন এই ভয়ে জগন্নাথ রাজাকে ইঙ্গিত করিলেন। বাহুবলেন্দ্র বুঝিতে পারিলেন। সাবধান হইলেন।

লেখন-সামগ্রী আনীত হইল। মন্ত্রী আর এক খানি স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়া সেই পত্র খানি, এবং প্রতাপসিংহের পত্র একত্র করিয়া একটী খামে আটিয়া সমীপবর্ত্তী দস্যু—হন্তা অনুচরদ্বয়কে প্রদান করিলেন। পত্র যাহাতে মহাবলসিংহের নিজের হস্তে পতিত হয় তাহা করিতে বলিলেন। যদি অন্যের হস্তে সেই পত্র পড়ে তবে তাহাদের নিশ্চয়ই প্রাণসংশয়।

পত্র মহাবলপুরে চলিল। রাজাও মন্ত্রীর সহিত গাত্রোত্থান করিলেন।

ক্রমশঃ।

বেদের ইতিবৃত্ত ও প্রকৃতি।

অনুক্রমণিকা।

বেদ আর্য্যবংশীয়দিগের পরম ধন। কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, কি ব্যাকরণ, কি ছন্দ, কি চিকিৎসা, আর্য্যজাতীয়দিগের তাবৎ শাস্ত্রই বেদমূলক। বেদকে আর্য্যেরা অনাদি, অনন্ত, ও অপৌরুষেয় বলিয়া বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। ফলতঃ ভারতবাসী হিন্দুদিগের বিষয়ে যাহা কিছু অবগত হওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে বেদ অপেক্ষা প্রাচীনতর পদার্থ কিছুই নাই। বেদ প্রণয়ন ও সংগ্রহের পর অবধি অধুনাতন সময় পর্য্যন্ত কত কাল অতীত হইয়া গিয়াছে তাহার নির্ণয় নাই, কিন্তু আর্য্যপুত্রদিগের রীতি নীতি আচার ব্যবহার প্রভৃতি নিখিল বিষয়ই অদ্যাপি বেদমূলক রহিয়াছে। বেদবিরোধী পদার্থমাত্রই আর্য্যদিগের নিকট ম্লেচ্ছ ও অশ্রদ্ধেয় বলিয়া পরিগণিত। মন্বাদিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রসমুদয়ও যে যে স্থলে বেদের বিরোধী তত্তৎস্থলে গণনীয় ও মাননীয় নহে। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে নিঃসন্দেহ প্রতীতি জন্মে, যে আর্য্যজাতীয়দিগের বিষয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অবগত হইতে হইলে বেদশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নতুবা ভারতবর্ষের প্রাচীন বৃত্তান্ত সকল কোন প্রকারেই বোধগম্য হইতে পারে না।

কিন্তু আর্য্যবংশীয়দিগের প্রকৃত ইতিহাস নাই। ইতিহাসের অভাবে অপেক্ষাকৃত অধুনাতন বিষয় সকলই বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায় না, সুতরাং বেদের সময়, প্রকৃতি প্রভৃতি, প্রকৃতরূপে নির্ণয় করা যে কতদূর দুঃসাধ্য তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ফলতঃ আমরা নানাবিধ অনুসন্ধান ও চেষ্টা দ্বারা বেদের বিষয়ে যাহা কিছু অবগত হইতে পারিয়াছি, তৎসমুদয়ই অনুমানমূলক। অধুনাতন পণ্ডিতমণ্ডলীর নিরন্তর চেষ্টায় যত দূর অবগত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা এই মাত্র প্রতীতি হয়, যে বেদ কোন এক খানি নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ নহে। ইহা তত্তৎকালের ভারতবাসীদিগের যাবতীয় জ্ঞানের সমষ্টি। বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ বেদশব্দের প্রতিপাদ্য। অতি প্রাচীন কালে এতদ্দেশে লিখিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই। সুতরাং তাবৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ই গুরুশিষ্যপরম্পরায় এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরের নিকট সংক্রামিত হইত। বেদও এই সর্ব্বাভিভাবী নিয়মের অধীন। অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে এক্ষণে বেদ আর সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন অবস্থায় অবস্থিত নহে। আমরা বেদ বলিয়া যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকি, তৎসমুদয় সমগ্র সমষ্টির বিশেষ বিশেষ অবয়ব

মাত্র। বেদের রচয়িতা ও সংগ্রহকর্ত্তা ঋষিরা ইহার অনাদিত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়েই বোধ হয়, ইহার সময়াদিঘটিত কোন বিষয়ই ভবিষ্যদ্বংশের হস্তে প্রদান করিবার চেষ্টা করেন নাই, বরং যাহাতে কেহই কোন প্রকারে তাঁহাদের বাক্যের যাথার্থ্যের প্রতি কিছুমাত্র সন্দিহান না হয়, তাঁহাদিগের মনে এইরূপ চেষ্টাই ছিল। যাহা হউক ঋষিগণ তাঁহাদিগের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার বিষয়ে বিলক্ষণ সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। এক্ষণে যিনি যত চেষ্টাই করুন না কেন, বেদের প্রকৃত সময় নিরূপণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এইমাত্র নিশ্চয় বোধ হয়, যে বেদ অপেক্ষা প্রাচীনতর পদার্থ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। বেদই তাবৎ প্রাচীন পদার্থ অপেক্ষা চিরজাততর। মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র ও রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ পাঠ করিলে বেদের পুরাবৃত্তবিষয়ে কোন বিশেষ জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দের মধ্যভাগে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তয়িতা বুদ্ধদেব মানবলীলা সম্বরণ করেন, এই সময়ের কিছুদিন পূর্ব্ব অবধি ব্রাহ্মণধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। পরিশেষে বৌদ্ধধর্ম্মেরই জয়লাভ হয়। এই সময় হইতে কিছুকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম আপন অপ্রতিহত প্রভাব প্রচার করে। পরে চন্দ্রগুপ্ত ও শঙ্করাচার্য্যের সময়ে ইহার বিলোপসাধন হয়। যেরূপ খৃষ্টীয় অব্দ দ্বারা সমুদয় পাশ্চাত্য প্রদেশের ইতিহাস দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, সেইরূপ বৌদ্ধ অব্দ দ্বারাও সমুদয় ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক্ষণে যদি অতি প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় সংস্কৃত গ্রন্থাদিকে বেদের অঙ্গীভূত বলিয়া গণনা করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পাঠ দ্বারা বৈদিক তত্ত্বসমূহের মূলোচ্ছেদ করিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির কোন্ অংশ বেদ অপেক্ষা প্রাচীন, আর কোন্ অংশই বা বেদের পরে সংঘটিত তাহার কিছুমাত্র বিনিগমনা নাই। বরং রামায়ণের কোন কোন স্থলে বুদ্ধদেব ও তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপ্রণালীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা এই রূপ প্রতীয়মান হয় যে যৎকালে রামায়ণাদি রচিত বা সংগৃহীত হইয়াছিল তখন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষবুদ্ধি বিলক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। বেদের অঙ্গীভূত ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থে গাথা, ইতিহাস, আখ্যান প্রভৃতি বাক্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথার্থ বটে, কিন্তু মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি ইতিহাস ও আখ্যান, এবং তৎপরকালীন পুরাণসমূহ ঐ সকল বাক্যের প্রতিপাদ্য নহে। বৈদিক

গ্রন্থে গাথা পুরাণাদি যে সমস্ত সন্দেহপদ শব্দের উল্লেখ আছে, তৎসমুদয়ের দ্বারা বেদেরই বিশেষ বিশেষ অংশকেই বুঝিতে হইবে। ঐ সকল অংশে দেবচরিত্র বা জগৎসৃষ্টির বিষয় বর্ণিত আছে। বৈদিক কালে আর্য্যসমাজে যেরূপ আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি প্রচলিত ছিল, তৎসমুদয় সমাজের শৈশবাবস্থার উপযুক্ত, তাহাতে সভ্যতার চিক্কণতা কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রামায়ণে ও মহাভারতের সময়ে ঐ সকল আচার ব্যবহারাদির বিলক্ষণ পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। রাজা দশরথ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-তনয়ের বধসাধন, দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডবের বিবাহ, কুন্তীসত্ত্বে মাদ্রীর স্বামীর সহিত সহমরণ, এই সকল ব্যাপার যে বেদের অনুমোদিত নহে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বোধ হয় বিদেশীয়দিগের সহিত সম্পর্ক বশতই তদানীন্তন আর্য্যবংশীয়েরা কোন কোন বেদবিগর্হিত আচার ব্যবহার স্বদেশে পরিচালিত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন গার্হস্থ্যধর্ম্মবিষয়ে ও বেদবর্ণিত পরিবারদিগের রামায়ণাদিকালীন অধস্তন পরিবারবর্গের সহিত সবিশেষ বিভিন্নতা সংলক্ষিত হয়। মন্বাদিসংহিতাতে যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটীই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম ও নবম মণ্ডলে বর্ণিত কাক্ষীবৎ রাজার উপাখ্যান উপরি উল্লিখিত মানব অনুশাসনের সম্পূর্ণ বিপরীত। বেদের অধস্তনী মুনি ঋষিগণ কাক্ষীবৎকে দীর্ঘতমসনামক ব্রাহ্মণের ঔরসজাত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু সেটী কেবল বেদবিরোধ অপ্রমাণ করিবার চেষ্টামাত্র। এই কাক্ষীবৎ রাজা জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াও তাঁহার সময়কালীন অন্যতম ক্ষত্রিয় রাজার নিকট দানপ্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাভারতাদির সমসাময়িক ব্রাহ্মণগণ স্বকীয় অপ্রতিহত ক্ষমতাপ্রভাবে শূদ্রদিগকে বেদ পাঠের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। এমন কি তদানীন্তন দ্বিজাতিরা যে স্থানে বসিয়া শ্রুতিপাঠ করিলে উহা শূদ্রের শ্রবণগোচর হইতে পারে, কখনই এরূপ স্থানে বসিয়া বেদাধ্যায়ন করিতেন না, ফলতঃ শূদ্রের বেদশ্রবণ ও শূদ্রকে বেদশ্রাবণ গোহত্যা ব্রহ্মহত্যাদির ন্যায় দুস্তর পাপ বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু বেদের সমসাময়িক লোকদিগের মধ্যে এরূপ জাতিবৈর ও স্বার্থপরতা প্রচলিত ছিল না, তৎকালে নিকৃষ্টজাতির লোকেরাও বিদ্যোপার্জ্জনের সম্পূর্ণ অধিকারী ছিল। ঋগ্বেদসংহিতার দশম অধ্যায়ে এই বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিক কি ঋগ্বেদসংহিতার দশম অধ্যায়ের কোন কোন স্থল ঐলূষ কবষ নামে একজন ক্রীতদাসীপুত্রের রচনা, ইহা ব্রাহ্মণেরা ও স্বীকার করিয়া থাকেন। দেবদেবীর পূজাদি বিষয়েও বেদের সমসাময়িক ও রামায়ণাদির সমসাময়িক আর্য্যদিগের মধ্যে অনেক প্রভেদ

লক্ষিত হয়। বেদোক্ত দেবাদির বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে, যে তদানীন্তন আর্য্যেরা যেরূপ দেবদেবীর অর্চ্চনা করিতেন সমাজ-মাত্রেরই শৈশবাবস্থায় ঐরূপ পূজাবিধি সংঘটিত হইয়া থাকে। তাঁহারা অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য প্রভৃতি পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে পূজা করিতেন, কিন্তু ইতিহাসপুরাণাদির সমসাময়িক লোকেরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি নানাবিধ দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছিলেন। এবম্বিধ ও অন্যান্য নানাবিধ কারণের সমবায়ে স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে, যে ইতিহাস, পুরাণ, মানব ধর্ম্মশাস্ত্র, প্রভৃতি কোন প্রকার শাস্ত্রই বেদগহন প্রবেশের নিমিত্ত আলোক-স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ফলতঃ বেদের রচনা ও সংগ্রহ ও ইতিহাসাদির রচনা ও সংগ্রহ এই উভয়ের মধ্যে যে কত কাল অতীত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। তবে বেদবর্ণিত সমাজ ও ইতিহাস-পুরাণাদি বর্ণিত সমাজের মধ্যে আচারব্যবহারাদিগত এতদূর বৈসাদৃশ্য দর্শনে এইমাত্র নিশ্চিত বলিতে পারা যায় যে ঐ উভয়ের মধ্যে বহুকাল অতীত হইয়া থাকিবে, নতুবা অন্য কোন প্রকারে ঐরূপ বৈসাদৃশ্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যদি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি রচনার প্রকৃত সময় নিরূপণ করিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে বেদ—মহাভারতাদি অপেক্ষা কত প্রাচীন তাহা কথঞ্চিৎ নির্ণয় করিতে পারা যাইত, কিন্তু মহাভারতাদি বুদ্ধদেবের ঊর্দ্ধতন কি অধস্তন, তাহা নিঃসন্দেহরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। মহাভারতাদির বস্তু ও রচনাদৃষ্টে কেবল এইমাত্র বুঝিতে পারা যায় যে উহাদের কোন কোন অংশ বুদ্ধদেব অপেক্ষা প্রাচীন, আর কোন কোন অংশ বুদ্ধদেব অপেক্ষা অধস্তন। এই সকল কারণে বেদের সময় নিরূপণ ও প্রাচীনতা সংস্থাপন করিতে হইলে ইতিহাস পুরাণাদির সাহায্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পদার্থান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। 'কিন্তু সেই পদার্থান্তর কি? কোন্ আলোকের সাহায্যে আমরা বেদরূপ-তমসাবৃত গহনে প্রবেশ করিয়া ভারতের বিলুপ্তপ্রায় প্রকৃত প্রাচীন ইতিবৃত্তের উদ্ধার করিতে সক্ষম হইতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তর-স্থলে শাস্ত্রকারেরা বেদকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ফলতঃ বেদের সময় ও প্রকৃতি প্রভৃতি নিরূপণ করিতে হইলে বেদ এই সাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্গত তাবৎ রচনাই বিশেষ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। যদি বৈদিক গ্রন্থ সকল বিলোড়ন করিতে করিতে দুই একটী ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনার কাল নিরূপণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে উহার সহিত অন্বয়ব্যতিরেক সম্বন্ধ সংস্থাপনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন তাবৎ ঘটনারই সময় নির্দ্ধারণ করা সহজ

হইয়া উঠে। বেদ একটী স্বতন্ত্র ভুবন-স্বরূপ। ইহার সহিত ভারতবর্ষীয় অপরাপর শাস্ত্রসমূহের যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে অনায়াসেই এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যে অন্যান্য শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ উদ্ভেদ করিবার নিমিত্ত ঐ বেদেরই আলোক গ্রহণ করা উচিত, নতুবা বেদের অন্তর্গত অন্ধকার দূর করিতে হইলে অন্যান্য আলোক কোনরূপে কার্য্যকর হইতে পারে না। বেদ প্রদীপের ন্যায় স্বপ্রকাশ, ইহাকে প্রকাশ করিতে হইলে অন্য আলোকের আবশ্যকতা নাই, কিন্তু ইহার আলোকে অন্যান্য পদার্থ আলোকময় হইয়া উঠে।

বেদ ভারতেতিবৃত্তের রহস্যোদ্ভেদ করিবার বিষয়ে নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া ভারতবাসীদিগের পক্ষে বিশেষ আদরের পদার্থ, কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ যাবতীয় সভ্যসমাজের পুরাবৃত্তও বেদদ্বারাই প্রাচীনতম কালের সহিত সম্বন্ধ হইতেছে বলিয়া, ইহা কি ইংলণ্ডীয় কি জর্ম্মন্, কি ফরাসী, কি পারসীক, অধিক কি চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত তাবৎ সমাজের অধিবাসীদিগের পক্ষেই ধর্ম্মপুস্তকের ন্যায় অবশ্য পাঠ্য। মনুষ্যের বুদ্ধি পৃথিবীর নিতান্ত শৈশবাবস্থায় কিরূপ ছিল ইহা জানিবার জন্য কাহার হৃদয়ে না ঔৎসুক্যরসের আবির্ভাব হয়, কাহার না জ্ঞানপিপাসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে? সহৃদয় মনুষ্যমাত্রেরই হয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? বেদ ও বেদাঙ্গ প্রভৃতি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিলে এই পিপাসা নিবারণের উপায় হইতে পারে, নতুবা কোরান বাইবেল প্রভৃতির নিকট এই তৃষ্ণা নিবারণের আশা করা যাইতে পারে না।

আমরা মহাকবি কালিদাসের মধুময়ী রচনাশক্তি ও অলৌকিক কবিত্বের প্রভাবে বিমোহিত হই; গোতম, কণাদ, কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত দর্শনশাস্ত্রের প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্যদর্শনে আমরা বিস্ময়ান্বিত হইয়া থাকি; বাল্মীকি ও ব্যাসের অলঙ্কারবিরহিত বিশুদ্ধ কবিত্ব আমাদের অন্তঃকরণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত করে যথার্থ বটে; কিন্তু বেদের আলোকভিন্ন এই সমুদয়ের প্রকৃত শোভা আবিষ্কার করা সুকঠিন।

বেদের সময় নিরূপণ করিবার উপায় বেদের মধ্যেই নিগূঢ়ভাবে নিহিত আছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন বটে; কিন্তু সংবৎ, শকাব্দ, খৃষ্টীয়াব্দ, প্রভৃতি কোন প্রসিদ্ধ শকের সহিত তুলনা করিয়া বেদের প্রকৃত সময় নিরূপণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। বেদের অপেক্ষা অধিকতর পুরাতন পদার্থ জগতে দ্বিতীয় নাই। সংস্কৃত ভাষা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা জেন্দ ভাষাকেই তাবৎ হিন্দু-ইউরোপীয় জাতির মাতৃভাষা বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সংস্কৃতের আবিষ্কার অবধি যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে সকলেই একবাক্যে স্বীকার

করেন, যে সংস্কৃত ভাষা জেন্দ ভাষা অপেক্ষাও প্রাচীনতর। সুতরাং বেদ জেন্দা-ভেস্তা, হোমের, প্রভৃতি যাবতীয় প্রাচীন পদার্থ অপেক্ষা কত প্রাচীন তাহা নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। এরূপ প্রাচীন পদার্থের প্রকৃত সময় নিরূপণ করা কাহার সাধ্য? তবে বেদ ও ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিলে, ঐতিহাসিক ঘটনা সকলের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন ইহার অভ্যন্তরে যে অসংখ্য নিধি সকল নিহিত রহিয়াছে তৎসমুদয় উদ্ধার করিতে পারিলে উহাদের আলোকে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সমূহ আলোকময় হইতে পারে।

পল্লীসমাজ।

প্রথম প্রস্তাব।

আমাদের দেশে যে সকল চিরাগত আচার ব্যবহার ও নিয়মাবলী এতদিন সমাজের প্রধান ভিত্তি ও প্রতিভূস্বরূপ ছিল, তাহা একে একে অন্তর্হিত হইতেছে। কি ধর্ম্ম, কি নীতি, কি সমাজস্থিতি সকল বিষয়েই অধুনা যাদৃশ ঘোরতর মতভেদ ও বিপরীত ভাব লক্ষিত হইতেছে, তাদৃশ মতভেদ ও বৈপরীত্য পূর্ব্বে কদাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ভারতবর্ষ যেরূপ বিশাল দেশ, ইহাতে যেরূপ উপর্য্যুপরি রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহাতে ইহার একত্ব অব্যাহত রাখা সম্ভাবিত নহে। বাহ্যদর্শী লোকেরা ভাবেন এই মহাদেশে কদাপি একতা ছিল না। কিন্তু ইতিহাস ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। আধুনিক অষ্ট্রিয়া, রুষিয়া, ও ব্রিটন এবং প্রাচীন পারস্য ও রোম রাজ্যের যে একতা—উহা গবর্ণমেণ্ট ও শাসন প্রণালীর একতা নিবন্ধন। আর জর্ম্মণি ও আমেরিকা এবং পূর্ব্বতন এথেন্স ও স্পার্টা রাজ্যের যে একতা, উহা চুক্তি-মূলক ও সুবিধা-নিবন্ধন। পক্ষান্তরে আমরা আর এক প্রকার একতা দেখিতে পাই; উহা ধর্ম্ম-মূলক। মুষলমান রাজ্য, পোপসাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষ—এই দ্বিতীয় প্রকার একতার দৃষ্টান্ত-স্থল। মুষলমানদিগের অধিরাজ্য, অন্তঃসার-বিহীন ছিল, এই জন্য উহাদিগের মধ্যে জয়োৎসাহ নির্ব্বাণ হইতে না হইতেই উহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। পোপের আধিপত্য চতুর্দ্দিগে বিবিধ নিয়মে সুরক্ষিত হওয়াতে প্রায় সহস্র-বৎসর ইয়ুরোপে বিরাজমান ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক বলের অসদ্ভাব এবং বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব অনুশীলন বশতঃ

উহাও ক্রমশঃ ছিন্নমূল হইল। পোপের ন্যায় ব্রাহ্মণের আধিপত্য রাজনীতি হইতে পৃথক্‌ভূত ছিল না; ব্রাহ্মণ ঐহিক ও পারলৌকিক রাজ্যতন্ত্র ও ধর্ম্মসংহিতা উভয়েই সমানরূপে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং বর্ণাশ্রম প্রভৃতি বিষয়ে নানাবিধি ব্যবস্থা প্রকটন পূর্ব্বক সেই প্রভুত্ব অব্যাহত রাখিবার জন্য নানা উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ইত্যাদি কারণে ব্রাহ্মণের আধিপত্য তিন হাজার বৎসরেরও অধিককাল বিরাজমান থাকিয়া পরিশেষে কেবল বৈদেশিকদিগের নিকটেই মস্তক অবনত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কখন এক রাজার অধীনস্থ হইয়াছিল কিনা ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব এত অনিবার্য্য হইয়াছিল, তাঁহাদের সম্প্রদায় এরূপ সুশৃঙ্খল ও নিয়মবদ্ধ ছিল, এবং তাঁহাদের সাধারণ মত ও তৎপ্রণীত শাস্ত্রের প্রধান প্রধান অংশে ঈদৃশ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইত, যে পূর্ব্বকালে বহুরাজ-বিভক্ত এই ভারতভূমি একচ্ছত্রা ছিল, এবং সর্ব্বত্র একরূপ আইন ও একরূপ সাধারণমত প্রচলিত ছিল, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবেক না।

কিন্তু ভারতের সেই প্রধান ছবি, সৌরাজ্যের সেই প্রধান প্রতিভূ, সাধারণ মতের সেই প্রধান ভিত্তি, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী সেই ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় অধুনা সজীবতাহীন হইয়াছেন। এস্থলে স্পষ্টাভিধানে বলা উচিত যে আমরা ব্রাহ্মণ-জাতিকে নির্দ্দোষ পক্ষপাতহীন, বা স্বার্থশূন্য বলিয়া বর্ণন করিতেছি না। ভূমণ্ডলে কোন্ সম্প্রদায় স্বার্থ-চিন্তাবর্জ্জিত? তথাপি আমরা ইহাও বলি যে মধ্য ইয়ুরোপের প্রধানগণ (Aristocracy) এবং আধুনিক ইয়ুরোপের জেসুয়িট সম্প্রদায় অপেক্ষা ভারতের ব্রাহ্মণজাতি অনেক অংশে ধর্ম্মভীরু ও সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

উপরি উক্ত প্রস্তাবটি যেমন দুরবগাহ ও বিসম্বাদ-পূর্ণ তেমনি বহুবিস্তৃত। এই বিষয়ে আমরা আপাততঃ অধিক বাক্যব্যয় করিব না। উহার দৃষ্টান্ত দিবার এই মাত্র তাৎপর্য্য যে, যে সকল প্রাচীন রীতিনীতি ও বিধি ব্যবস্থা ভারত রাজ্যের সুশাসনের ও সুশৃঙ্খলার প্রতিভূ ছিল, উহা ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে এমন কিছু স্থায়ী বিধান দৃষ্ট হইতেছে না, যাহার উপর সমাজ নির্ভর করিতে পারেন। উহা যাদৃশ দেশকাল পাত্রের অনুরূপ ছিল, তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে। আমরা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পক্ষপাতী নহি। আমরা জানি যে উহার দিন অতীত হইয়াছে; তথাপি "একটিকে বিনষ্ট করিবার পূর্ব্বে তদনুরূপ আর একটি সংযোগ কর" নিপোলিয়নের এই হিরণ্ময় উপদেশটি আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না। অতএব আমরা বিবেচনা করি, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে ভিত্তি-

স্বরূপ অবলম্বন করিয়া নূতন সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। তাহা হইলে সমাজস্থিতি স্থায়ী ও ক্রমশঃ কালের অনুরূপ হইতে থাকিবে। এবিষয়ে ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে অনেক সদুপদেশ লাভ করা যাইতে পারে। তৃতীয় হেনিরির পার্লিয়ামেণ্ট, অষ্টম হেনিরির ধর্ম্ম-বিপ্লব, এলিজেবেথের বাণিজ্য এবং প্রথম জেম্‌সের বিদ্যানুশীলন এই কয়েকটি ঘটনার সহিত ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের চক্ষু উন্মীলিত হইতে পারে; এবং আমাদের মনে আশারও সঞ্চার হইবে। আমাদের চক্ষুর উপর গড়গোবিন্দপুরের জলা চৌরঙ্গীর প্রাসাদ-মণ্ডলীতে পরিণত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আমরা কি এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারিনা, যে কালে অধ্যবসায়ের গুণে আমাদের এই সমাজও সভ্যতা-পদবীতে উন্নমিত হইতে পারিবেক ?

আমরা এই প্রস্তাবনাতে যে মতটি প্রকাশ করিলাম, উহার অর্থ বিশদ করিবার নিমিত্ত একটি দৃষ্টান্ত সবিস্তর বর্ণন করিব। আমাদের ভরসা এই যে তদ্দ্বারা প্রাচীন-ভারতসম্বন্ধীয় অনেক কুসংস্কার অপনীত হইবেক। ভারতবর্ষীয় আর্য্যসমাজের স্থায়িত্ব ও সুশৃঙ্খলার জন্য যতগুলি প্রতিভূ ছিল, পল্লী-সমাজ তাঁহাদের মধ্যে একটি প্রধান। এই পল্লী-সমাজ যে ভারতের সর্ব্ব বিভাগে একদা প্রতিষ্ঠিত ছিল তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। অধিক কি উহা যে আর্য্যজাতির একটি পুরাতন সম্পত্তি-স্বরূপ ছিল, ভন মাউরার, ন্যাস প্রভৃতি জর্ম্মাণ পণ্ডিতেরা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। কৌন্সিলের ভূতপূর্ব্ব মেম্বর শ্রীযুক্ত মেন সাহেব ও তাঁহাদের অনুসরণ পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে এই পল্লী-সমাজ প্রণালী রোমানদিগের বিধিব্যবস্থা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া উত্তরকালে মধ্য ইয়ুরোপের সুপ্রসিদ্ধ ফিয়ুডাল (Feudal) পদ্ধতির আকার-ধারণ করে এবং ইহাই ইংলণ্ডের ম্যানর (Manor) নামক মহল সকলের ও ব্যারণ আদালতের (Court-Baron) অব্যবহিত কারণ।

অধুনা পল্লী-সমাজটি কি পদার্থ তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। একটি, দুইটি বা ততোধিক পল্লী সমবেত হইয়া এক সীমানার অন্তর্ভুক্ত হয়। এক জন মণ্ডল বা প্রধান তাহার সমুদয় কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করেন। শান্তিরক্ষা, জমির বিলিকরণ, বিবাদভঞ্জন, রাজস্ব সংগ্রহ সামান্য অপরাধকারীর দণ্ড, উৎকট অপরাধীর গ্রেপ্তার ও আদালতে চালান ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্যের নিমিত্ত তিনিই দায়ী হন। তিনি গ্রামের অধিবাসীদিগের দ্বারা মনোনীত হন। কখন বা রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। তিনি গ্রামের ও গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি-স্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকেন। তাঁহার ভৃতির জন্য গ্রাম হইতে কিয়দংশ ভূমি ও রাজস্ব

হইতে কিঞ্চিৎ অংশ প্রদত্ত হয়। কখন কখন তাঁহার বেতন রাজসরকার হইতে মিলে। কিন্তু রাজসংসার হইতে নিয়োগ ও বেতন প্রদান অপেক্ষাকৃত বিরল, এবং বোধ হয় নিতান্ত আধুনিক। প্রত্যেক পল্লীতে সমাজের মধ্যে সম্ভ্রান্ত প্রধান অধিবাসীদিগের একটি সভা প্রতিষ্ঠিত থাকে। মণ্ডল সেই সভার অধিপতি। উক্ত সভার অভিমতানুসারে এবং সময়ে সময়ে নিযুক্ত পঞ্চায়েতদিগের সাহায্যে মণ্ডল সকল বিষয়ের সমাধা করেন। ধর্ম্মশাস্ত্র ও পরম্পারাগত রীতিনীতি অবলম্বন করিয়া তাবৎ কার্য্যের মীমাংসা হইয়া থাকে।

এ স্থলে ইহা বিবেচনা করা উচিত যে ধর্ম্মশাস্ত্র এক প্রকার অপরিবর্ত্তনীয়; টীকাকারেরা সময়ে সময়ে উহার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া পরিবর্ত্তনশীল সমাজের সহিত উহার অবিসম্বাদিতা বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন। তথাপি সংসারের দৈনন্দিন ব্যাপারের মধ্যে কতশত এরূপ অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হয়, যে শাস্ত্রকার বা সংগ্রহকারদিগের মনেও উহা উদিত হয় নাই। সেই সকল স্থলে চিরাগত আচার ব্যবহারই প্রধান প্রমাণ। উহা লিপিবদ্ধ না থাকাতে চিরকালই সজীবভাবে শ্রুতি-পরম্পরায় চলিত হইয়া আসিতেছে। সংসারের ব্যাপার দিন দিন যেমন নূতন নূতন ভাব ধারণ করে, চিরাগত আচার ব্যবহার তেমনি নূতন নূতন আকার গ্রহণ পূর্ব্বক তৎসমুদায়ের মীমাংসা করিতে থাকে। তথাপি লোকে ভাবে উহা চিরকালই একরূপ রহিয়াছে। চিরাগত আচার ব্যবহার এক প্রকার স্থিতিস্থাপক; স্থিতিস্থাপকতাগুণে যে দিকে ইচ্ছা সে দিগে, যত ইচ্ছা তত, উহাদের প্রসারণ বা আকুঞ্চন করা যাইতে পারে, তত্রাপি স্বরূপের বিপর্য্যয় ঘটে না। পল্লীসমাজ সেই সকল চিরাগত রীতিনীতির আধার। পল্লীসভা, মণ্ডল ও তাঁহার সহকারিগণ উহার প্রধান ব্যাখ্যাতা বা প্রণেতা। কিন্তু অধুনা সেই সকল রীতি নীতির সজীবতা ও স্থিতিস্থাপকতা-শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ সাম্রাজ্যের আদালত সমূহের দপ্তরে উহা লিপি-বদ্ধ হইয়াছে; এবং ইংরাজী আইনের বিধি ব্যবস্থাতে বিমিশ্রিত হইয়া অনেকাংশে রূপান্তর ধারণ করিয়াছে।

পল্লীসমাজের মধ্যে পাটোয়ারী আর এক জন প্রধান কর্ম্মচারী; ইনি মণ্ডলের প্রধান সহকারী। জমির চৌহদ্দী, জমাবন্দী, ভোগদখল, উর্ব্বরতা-শক্তি, রাজস্ব, নানাবিধ হিসাব তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকে। তিনি দলীল লিখিয়া দেন এবং আবশ্যক মত অধিবাসিদিগের চিটী পত্রও লিখিয়া থাকেন। তৎপ্রযুক্ত তাঁহার ক্ষমতা বড় সামান্য নয়। এমন কি, যখন ইংরাজ পুরুষেরা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রথম বন্দোবস্ত করেন, তখন প্রকৃত ভূস্বামীকে স্থির করিতে না পারিয়া পাটোয়ারিকেই তৎস্থলাভিষিক্ত বলিয়া ঠাওরাইয়াছিলেন। তাঁহার বেতন নির্দ্ধারিত আছে; কখন

বা বেতনের পরিবর্ত্তে এক খণ্ড জমি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

গ্রামের কোটাল আর এক জন প্রধান গণনীয় কর্ম্মচারী। তিনি শান্তিরক্ষণের জন্য দায়ী। এতদ্ভিন্ন তাঁহাকে গ্রামের সীমানা ও প্রত্যেকের চৌহদ্দী বজায় রাখিতে হয়। এবং ক্ষেত্রস্থ শস্যের খবরদারী করিতে হয়। তিনি সাধরণের ও গবর্ণমেণ্টের সম্বাদ-বাহক। কোথায় কে নূতন আসিল, কোন্ স্থান হইতেই বা কে চলিয়া গেল, তাঁহাকে তাহার খবর লইতে হয়। এই পদটি এদেশীয় অন্যান্য পদের ন্যায় বংশানুক্রমিক। কোটালের বৃত্তির জন্য কিয়দংশ ভূমি প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহার জীবন-যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হয়। তাহার একটি শুভ ফল এই যে কোটালের পরিবারস্থ যাবতীয় পুরুষ শান্তিরক্ষা-কার্য্যে তৎপর হয়। এবং পল্লীসমাজের অন্তর্গত যে স্থানে যে রকম লোকের বাস, তাহা অনায়াসেই পরিজ্ঞাত থাকে। আরও অনেক কর্ম্মচারী পল্লীসমাজে নিযুক্ত থাকে; তাহার সংখ্যা সর্ব্বত্র একরূপ নহে। বেনে মণ্ডলের একজন বিশেষ কার্য্যকর সহকারী। সে টাকা কড়ি পরীক্ষা করিয়া লয় এবং গ্রামের স্বর্ণকারের কার্য্য সম্পাদন করে। এতদ্ভিন্ন পুরোহিত, গণক, গুরুমহাশয়, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, চর্ম্মকার, প্রভৃতি সমগ্র গ্রামের কার্য্যের জন্য নিযুক্ত থাকে। এবং কোন কোন স্থানে নটী ও নর্ত্তকী ও সাধারণের উৎসবাদির জন্য, স্থায়ীরূপে নিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

পল্লীসমাজের অন্তর্গত ভূমির স্বত্বাধিকারী তিন জন; রাজা, মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারী ও প্রজা। রাজস্ব পাইলেই রাজার দাওয়া ফুরাইয়া গেল, তিনি সমাজের আভ্যন্তরিক কার্য্য-প্রণালীতে হস্তক্ষেপ করিতে অধিকারী নহেন। মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারীগণ নিরিখ মত খাজানা পাইলেই চরিতার্থ হইলেন। রায়তের উপর আর কোন দাবি দাওয়া করিতে পারিবেন না। কিন্তু প্রজাই স্বত্ব নিতান্ত অনিশ্চিত। কোন্ জমিতে চাস করিতে হইবে, এবং কি হারে খাজনা দিতে হইবেক, উহার কোন স্থায়ী নিয়ম নাই। সর্ব্বদাই জমির নূতন বিলি ও জমার নূতন বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। সরকারে যে রাজস্ব দিতে হইবেক, উহার পরিমাণ অনুসারে মণ্ডল কি কেতা জমির উপর নূতন নূতন কর ধার্য্য করিয়া দেন এবং কে কোন্ কেতা জমিতে চাস করিতে পাইবে তাহাও বিলি বন্দোবস্ত করেন। সুতরাং জমিসকল মধ্যে মধ্যে হস্ত হইতে হস্তান্তরে ফেরাফেরি করে। কিন্তু ঐ বিষয় লইয়া, আমরা অধুনা যতদূর আশঙ্কা করি পূর্ব্বে তত গোলযোগ ঘটিত না। পল্লীসমাজের শাসনপ্রণালী হইতেই ঈদৃশ বিশৃঙ্খলতার তাদৃশ সম্ভাবনা ছিল না। পল্লীসমাজ সকল এক প্রকার সাধারণতন্ত্র। তন্নিমিত্তই পূর্ব্বকালে গ্রীকদিগের নিকট ভারতভূমি ভূরি ভূরি ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রে ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ

হইয়াছিল। মণ্ডল, পাটোয়ারি ও কোটাল ইহারা তিন জনেই প্রভুত-ক্ষমতা-সম্পন্ন; কিন্তু পরস্পর পরস্পরের উপর নিয়ন্তা-স্বরূপ থাকাতে, কেহই স্বীয় ক্ষমতার অযথাভূত ব্যবহার করিতে পারিতেন না। পল্লীসভা আবার ইহাদের সকলের উপর নজর রাখিতেন। সুতরাং অন্যায় ও উৎপীড়ন হইবার বড় সুবিধা ছিল না। অতএব এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে যদিও পল্লীসমাজে দখলী স্বত্বের অসদ্ভাব ছিল, তথাপি যে প্রজা কোন জমি চাস করিয়া আসিতেছে, এবং কায়িক পরিশ্রমে বা অর্থব্যয়ে উহার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে, তাহাকে প্রায়ই উহা হইতে বঞ্চিত করা যাইত না। এদেশে জমিদারী স্বত্বের প্রাধান্য বশতঃ যত প্রকার বাবসবাব আদায় হয় এবং মাচট মাঙন প্রভৃতির ছলে রায়তগণকে যে উৎপীড়ন করা হয়, পল্লীসমাজে তাহার কিছুই হইতে পারিত না। তবে সময়ে সময়ে রাস্তা ঘাট প্রভৃতি সাধারণের হিতকর কার্য্যের জন্য টেক্স আদায় হইত; তাহাতে প্রজাদিগের উপর অধিক উপদ্রব হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

কিন্তু আর এক দিক্ হইতে পল্লীসমাজের বিপদের আশঙ্কা ছিল। যখন রাজা অত্যন্ত অধিক রাজস্ব দাওয়া করিতেন, অথবা মণ্ডলকে হাত করিয়া সাধারণের প্রতিকূলে স্বার্থ সাধনের চেষ্টা দেখিতেন; তখন অব্যাহতি পাইবার বড় সুযোগ ছিল না। পল্লীবাসীগণ নানা আপত্তি করিয়া পরিশেষে হয় সম্মত হইত, না হয়, গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে প্রস্থান করিত।

সৈন্যের অভিযানকালে পল্লীসমাজকে রসদ যোগাইতে হইত; তথাপি সময়ে সময়ে লুট পাট ঘটিত। কিন্তু সেনানীগণ হইতে পল্লীসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্ ও অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল। আকবর সাহের উর্দ্ধতন মুসলমান ভূপতিগণ রাজকোষ হইতে সৈন্যের বেতন দিতেন না; এক এক মহলের রাজস্বের উপর বরাত দিয়া সেনানীকে উহা সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত থাকিতেন। সেনানীগণ যে নিয়মিত অপেক্ষা অধিক আদায় করিতেন এবং তদুপলক্ষে প্রজার প্রতি উপদ্রব করিতেন, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। পল্লীসমাজের কোন প্রকার সৈনিক বল ছিল না; পল্লীর অধিবাসীগণ সচরাচর নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতি ছিল। তাহারা রাজা বা রাজসেনানী কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া, তৎপ্রতিকূলে কদাপি অস্ত্রধারণ করিয়াছে, ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয় না। পল্লীসমাজ সকল পরস্পর এক প্রকার অসম্বদ্ধ ছিল; এবং বহুকাল শান্তি-সুখ ভোগ করিয়া এবং একরূপ নিয়মে শাসিত হইয়া আসিতেছিল। কৃষি ও সামান্য শিল্প দ্বারা সহজে ও স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত বলিয়া, বাণিজ্য, বিদেশ-যাত্রা প্রভৃতি ক্লেশকর ও উৎসাহ-জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত

হইবার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং অধিবাসীগণ ক্রমে নিস্তেজ, অন্তঃসার-শূন্য ও সাহসহীন হইয়া পড়িয়াছিল। কোন সঙ্কট উপস্থিত হইলে, অকুতোভয়ে ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতাসহকারে, তৎপ্রতি-বিধানার্থ অভ্যুত্থান করিতে সমর্থ হইত না।

যাহাহউক উক্ত প্রকার উৎপাত নিয়ত ঘটিত না। চিরাগত প্রণালী ও বন্দোবস্ত এবং সাধারণ বিধি ব্যবস্থার এমনি গুণ ও প্রভাব যে রাজা বা সেনানায়ক বিশেষ কারণ ব্যতীত সহসা পল্লীসমাজের উপর হস্তক্ষেপ ও অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। তন্নিবন্ধন পল্লীতে সচরাচর শান্তি ও কুশল বিরাজমান থাকিত। এবং অধিবাসীগণ নিরাপদে ও নির্ব্বিবাদে আপনাদের পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে পারিত।

পল্লীসমাজের সহিত ইংরাজী মিয়ুনি-সিপালিটীর কোনও সৌসাদৃশ্য নাই। মিয়ুনিসিপালিটীর সহিত ভূমির স্বত্ত্ব ও ভূমির করের কোন সংস্রব নাই। কেবল পুলিস ও রাস্তা ঘাটের জন্য টেক্স আদায় করাই উহার কার্য্য। কিন্তু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, লাভের গুড়, পিপালিকায় ভক্ষণ করে। টেক্স আদায়ের বড় কড়াকড়ি! গরিব গুর্ব্বো লোকের ঘরের জানালা দরজা ও ঘটি বাটী নিলামের বড় ধূম! শমন ও ওয়ারাণ্টের বস্তা বস্তা জারি হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত কার্য্যের বেলা কি দেখা যায়? জন কত লালপাকৃড়িওয়ালা দেশওয়ালী বেড়াইতেছে এবং দুই এক রাস্তায় ঝোড়াকতক করিয়া খোওয়া বিছান আছে। গ্রামের অধিবাসীদের, মিয়ুনি-সিপালিটির কার্য্যে কোন ক্ষমতাই নাই। তবে তাহাদের মধ্যে দুই চারিজন লোক সময়ে সময়ে হুজুরের মতে ডিটো দিয়া আসেন এই মাত্র। মিয়ুনিসিপালিটির এলাকার অন্তর্ভূক্ত পল্লীগুলি সচরাচর অসম্বদ্ধ ও বহুবিস্তৃত এবং নাম মাত্র এক সীমানার অন্তর্ভুক্ত। তন্নিবন্ধন অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটে। অতএব মিয়ুনি-সিপালিটিকে প্রাচীন পল্লীসমাজের সহিত তুলনা করা বিদ্রূপ মাত্র।

আমরা পল্লীসমাজের যে মনোহর ছবি প্রস্তুত করিলাম, তাহা অযথাভূত ও কল্পনা-বিজৃম্ভিত বলিয়া পাঠক সন্দেহ করিতে পারেন। তন্নিরাসার্থ আমরা এই কথা বলি, যে আমরা যেরূপ পল্লী-সমাজের বর্ণন করিলাম, উহা আদর্শ মাত্র; স্থানে স্থানে পল্লীসমাজ ঈদৃশ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা সর্ব্বত্র ঘটে নাই। কোন কোন স্থানে অধিবাসীদের সভা বিদ্যমান ছিল না; কোন স্থানে বা পাটোয়ারির বারম্বার পরিবর্ত্তন প্রযুক্ত, সমাজের সিরিস্তা ও হিসাবের কাগজ পত্র নিতান্ত বিশৃঙ্খল হইয়া থাকিত।

কোথাও বা মণ্ডল অনপেক্ষ ভাবে ও যোগ্যতানুসারে মনোনীত হইত না, গ্রামের অন্তর্গত কোন প্রধান পরিবারের মধ্য হইতে উত্তরাধিকারক্রমে উক্ত পদ

লব্ধ হইত। কোন পল্লীতে মণ্ডল সমাজের কর্ম্মচারী না হইয়া, রাজার বেতনভোগী ভৃত্যস্বরূপ গণ্য হইতেন এবং প্রজাদের বিরুদ্ধে সরকারের স্বার্থসাধনে প্রয়াস পাইতেন। তথাপি এই সকল বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পল্লীসমাজ পদ্ধতি পূর্ব্বে যে সুশাসনের ও শান্তির একটি প্রধান প্রতিভূ এবং উৎপীড়ন ও অতিরিক্ত কর সংগ্রহের একটি প্রবল অন্তরায় ছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

আমরা জানি আমাদের এই মতের প্রতিকূলে একটি প্রবল প্রমাণ রহিয়াছে। অতএব এখন উহার উল্লেখ ও সমাধান করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে পল্লীসমাজ-পদ্ধতি প্রাচীন আর্য্য জাতির একটি সাধারণ সম্পত্তি স্বরূপ ছিল। উহা অধুনা আর্য্যসন্তানগণের আবাসভূত সকল দেশ হইতেই প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল ভারতবর্ষ ও রুসিয়ায় অনেক স্থলে এখনও নির্জীব হইয়া পড়ে নাই। ১৮৭২ অব্দের প্রারম্ভে রুসিয়ার সম্রাট্ স্বরাজ্যস্থিত পল্লীসমাজের অবস্থা বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিবার জন্য, নিজ সচিব জেনেরেল পিটার ভালিক্‌কে অধ্যক্ষ করিয়া একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। মেম্বরেরা বহু অনুসন্ধান পূর্ব্বক এই মত প্রকাশ করেন যে, "অল্পকাল-ব্যবধানে সর্ব্বদাই পল্লীসমাজের অন্তর্ভুক্ত ভূমি সকল নূতন নূতন বিলি হওয়াতে কৃষকগণ ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধন করে না, এবং নিয়ত নূতন বন্দোবস্তের গোলযোগে অনেক সময় বৃথা অতিবাহিত হইয়া যায়। তন্নিবন্ধন কৃষিকার্য্যের যৎপরোনাস্তি হীন অবস্থা হইয়াছে। চিরকালই সেকেলে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চলিয়া আসিতেছে; কোন পরিবর্ত্তন হইবার সুযোগ নাই এবং কোন প্রকার উন্নতিরও আশা নাই। পল্লীসমাজের অধ্যক্ষেরা যাহাকে যে সময়ে যে জমি দিবেন, তাহাকে সেই সময়ে সেই জমিতে চাস করিতে হইবেক। তদ্বিষয়ে ব্যক্তি-বিশেষের কোন রূপ স্বাতন্ত্র্য নাই। কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের স্বাধীনতা এরূপ নিয়ন্ত্রিত হইলে, কেবল সাধারণের উদ্যোগে কোন প্রকার স্থায়ী উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। ঈদৃশ প্রকার নিয়ন্ত্রণার ফল এই যে, যে স্থানে পল্লীসমাজ প্রণালী প্রচলিত, তথায় প্রজা সাধারণে নিতান্ত নিরুপায় ও দুঃস্থ হইয়া পড়িতেছে; কেবল কতিপয় অধিবাসীর হস্তে সমুদয় সম্পত্তি সংগৃহীত হইতেছে ইহাতে সমাজের কোন উপকার বা উৎকর্ষ হইতেপারে না।"

এতদুত্তরে আমরা কেবল এই বলি, যে এক প্রকার নিয়ম পদ্ধতি সকল কালের উপযোগী হইতে পারে না। ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী আর্য্য ঔপনিবেশিকদিগের যাহা উপযোগী ছিল, তাহা বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব কালের অনুরূপ হয় নাই। আবার বৌদ্ধবিপ্লবকালে যাহা উপযোগী ছিল, বিক্রমাদিত্যের আধিপত্য সময়ে তাহা হিতকর বলিয়া প্রতীত হয় নাই। কালের গতির নামই পরিবর্ত্তন। অতি

প্রাচীন বৈদিক সময়ে আর্য্য ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে পরিজনতন্ত্র প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ পরিবারের মধ্যে প্রধান পুরুষ সকলের উপর অপ্রতিহত প্রভুত্ব করিতেন। কিন্তু কোন্ রাজনীতিবেত্তা উহা অধুনাতন সমাজে প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করেন? পরিজনতন্ত্র (Patriarchal) ইদানীং কেবল স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তাদিগের মুখেই শুনা যায়। সেইরূপ পল্লীসমাজ প্রণালী কাল-বিশেষের অনুরূপ ছিল; এবং যথোচিত মার্জ্জিত ও সংস্কৃত হইলে এখনও অনেক সমাজের উপযোগী হইতে পারে। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি না, কারণ আমাদের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই; তথাপি আমাদের বিশ্বাস এই যে ইয়ুরোপের সভ্যতার প্রধান ভিত্তি যে মধ্যকালের পুরতন্ত্র (Town-ships) পল্লীসমাজই তাহার আদর্শ ও পরম্পরা কারণ। ইয়ুরোপের পল্লীসমাজ প্রণালী রোমীয়দিগের বিধিব্যবস্থা দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া, পরে উত্তরাখণ্ডের দিগ্বিজয়ী সেনানীগণ কর্ত্তৃক ফিয়ুডাল পদ্ধতিতে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের বহুকাল তাদৃশ কোন বিপ্লব ঘটে নাই। বৌদ্ধদিগের অভ্যুত্থান কেবল ধর্ম্মকে স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু সমাজস্থিতির কোন স্থায়ী পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে নাই। হিন্দুদিগের আধিপত্য ইহার পর প্রায় দেড় হাজার বৎসরেরও অধিককাল ভারতভূমিতে বিরাজমান ছিল। তৎপরে মুসলমানদিগের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যবনরাজাদিগের যথেচ্ছাচার নিবন্ধন পল্লীসমাজের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং ক্রমে অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। আকবর সাহের সুপ্রসিদ্ধ বন্দোবস্ত সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে, পল্লীসমাজ প্রণালী নিতান্ত হীন অবস্থাতে পতিত হইয়াছিল। কারণ মণ্ডল বা পাটোয়ারির সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া, প্রজাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার জন্য সম্রাট্ নিজ কর্ম্মচারীদিগকে বারম্বার আদেশ করেন। পল্লীসমাজে পূর্ব্বের ন্যায় প্রভাব ও সুশৃঙ্খলা থাকিলে এরূপ কদাচ ঘটিত না।

অতএব ইহা কদাচ সম্ভাবিত নহে যে প্রাচীনতম পল্লীসমাজ প্রণালী রুসিয়ার আধুনিক সভ্যতার উপযোগী ও অনুকূল হইবেক। বিশেষতঃ রুসিয়ার রায়তগণ আবহমান দাসত্ব-শৃঙ্খলে সংযত ছিল। অল্পকাল হইল, মহারাজ দ্বিতীয় আলেক্জাণ্ডর তাহাদিগের দাসত্ব মোচন করিয়া দিয়াছেন। রায়তদিগের এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত পল্লীসমাজেরও সংস্করণ উচিত ছিল। অন্ততঃ তাহাদিগকে নিজ জোতের জমিতে দখলীসত্ব ও কৃষি বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া বিধেয়। রুসিয়ার গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ যথেচ্ছচারী; যথেচ্ছাচার শাসন হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজা-সাধারণের হিতসাধন হইতে পারে না। পরন্তু পল্লীসমাজ হইতেই যে রুসিয়ার প্রজাপুঞ্জের এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদি-স-

মত নহে। প্রত্যুত রুসিয়াবাসী অনেকানেক ভূয়োদর্শী লোক এখনও পল্লীসমাজের উপযোগিতা ও উপাদেয়তা স্বীকার করেন। আমরা এবিষয়ে আর অধিক বাক্য-ব্যয় করিব না; কেবল এই বলিয়াই উপসংহার করিব যে, পল্লীসমাজ যে সুদীর্ঘ কালের অনুরূপ ছিল, তাহাতে উহা দ্বারা অনেক হিতসাধন হইয়াছে। এবং সুশাসন ও সুশৃঙ্খলা অব্যাহতভাবে রক্ষিত হইয়াছে। পল্লীসমাজ আধুনিক রুসিয়া বা ভারতবর্ষের উপযোগী হইতে পারে না, কিন্তু উহাকে আদর্শ করিয়া এমন কোন নিয়ম পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, যে তদ্দ্বারা গ্রাম ও নগরের আভ্যন্তরীণ কার্য্যপ্রণালীর উৎকর্ষ সমাহিত হওয়া সম্ভব। ক্রমশঃ।

সঙ্গীত পথিক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চীন-সঙ্গীত।

এত দিনের পর, পাঠক! অসংখ্য ক্লেশ, অসংখ্য যন্ত্রণা, অসংখ্য বিপদ-পরম্পরা সহ্য করিয়া আমার চিরাভিলাষের অণুমাত্রও সংসাধন করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইলাম। ভাষা শিক্ষা করিলাম, বোধ হইল যেন দুঃখের দুস্তর অসীম সমুদ্র পার হইলাম, কষ্টের পরা কাষ্ঠা—এখন তাহার অবসান হইল। দৈব এত কাল যে বল আমার জীবনে প্রয়োগ করিতে ছিল এখন তাহার প্রতিঘাত-ক্রিয়ার সমাবর্ত্তন আরম্ভ হইল। যাহার প্রকৃতি ও উন্নতি সন্দর্শন করিবারমানসে কতকাল হইল, প্রিয়তম স্বজনবর্গ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি—পথে দৈব-দুর্ব্বিপাকের বশবর্ত্তী হইয়া স্মরণ-মাত্রেই হৃদয়ের শোণিত-শোষকর বিপদে নিপতিত হইয়া সহযাত্রী বন্ধুবর্গকে চিরজীবনের মত হারাইয়াছি! যাহার আশায় এতকাল জলাঞ্জলি দিয়াছিলাম—যে দৈব এক কালে প্রতিকূল হইয়া এরূপ ভয়াবহ বিপদ ঘটাইয়াছিল—এখন কি, আমার প্রাণ পর্য্যন্ত ও সংশয়স্থলে উপস্থাপিত করিয়াছিল, সেই আবার এখন অনুকূল হইয়া সে বিষয়ে আমাকে আজ সফল-কাম করিল! আজ অন্ততঃ একটীও মাত্র দেশের সঙ্গীত শিক্ষা করিতে পাইলাম।

এত দিন চীন আমার নিকট সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ বিদেশ ছিল। কি দেশের বাহ্যিক দৃশ্যে, কি লোকের প্রকৃতিতে, কি সমাজের রচনায় এবং কি ভাষায়—সকল বিষয়েই চীন-দিগের সঙ্গে আমাদের কোন সৌসাদৃশ্যই লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু সঙ্গীতে চীনদেশ ও ভারতবর্ষ—বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতবর্ষ একই। চীন ও ভারতবর্ষ, এই উভয় দেশেরই সভ্যতার প্রারম্ভ যদি মনুষ্যের কাল-নির্ণয়-বুদ্ধির

অধিকার বহির্ভূত না হইত তাহা হইলে, কে যে কাহার নিকট ঋণী তাহা স্থিরীকৃত হইত। কত সহস্র বৎসর অতীত হইল এ উভয় দেশে যে সভ্যতার সূত্রপাত হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কোন্ সময়ে যে ইহাদের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহা কে নির্ণয় করিতে পারিবে? যাহা হউক, চীন-সঙ্গীত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া যতই অগ্রসর হই, ততই দেখিতে পাই যে ইহা ভারত-সঙ্গীতের প্রতিরূপমাত্র। স্থানে ২ যাহা কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, সে কেবল কালের তারতম্য ও দেশের রীতি-ভেদনিবন্ধন। 'কারণ 'যাহা কিছু পিতৃ-পৈতামহাদিক্রমাগত তাহাই পূজ্য এবং তাহাই সর্ব্বথা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় সংরক্ষণীয়' ইহাই চীনদের চিরন্তন ধর্ম্ম— রেখামাত্র ও অতিক্রম করা তাহারা পরম অধর্ম্ম-কর্ম্ম জ্ঞান করে। তাহাদের সেই ভাব চিরকাল অটল রহিয়াছে। যখন তাহারা অন্যান্য দেশের সঙ্গে কোন সংশ্রবই রাখিতে চায় না তখন তাহাদের ভাবের পরিবর্ত্তন বা সংশোধন কিরূপেই বা আশা করা যাইতে পারে? সুতরাং যে সঙ্গীত অতি পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল, যাহা প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসর অতীত হইল প্রসিদ্ধ চং সম্রাটকে আমোদিত করিয়াছিল, কথিত আছে, যে সঙ্গীত নিজ স্বাভাবিক মনোহারিতা গুণে মহাত্মা কনফিউসসকে এত মোহিত করিয়া ছিল যে তিনি তিন মাস কাল আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গীত ব্যতীত আর কিছুই ভাল বাসিতেন না; এবং যে সঙ্গীত চীন-স্বাধীনতা সংরক্ষণে সম্রাটের চতুরঙ্গের মধ্যে এক প্রধান অঙ্গ স্বরূপ হইয়াছিল এবং এখনও রহিয়াছে সেই চীনসঙ্গীত অদ্যাপিও প্রায় সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। যে কয়টী স্বর তাহারা পূর্ব্বে ব্যবহার করিত, যে সকল রাগে তাহারা গান কল্পিত, যে সকল শ্রুতি, মূর্চ্ছনা, তাল, লয় প্রভৃতি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল সে সমুদয় আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে; পূর্ব্বে যেরূপ আমোদ প্রদান করিত আজও সেইরূপ আমোদই প্রদান করিতেছে। চীনেরা সঙ্গীতকে সমধিক আদর করে। ইহার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্রাট অনেক চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, বিবিধ নিয়ম সংবদ্ধ হইয়াছিল। কনফউসসের মত এই ছিল যে, সঙ্গীতের সমধিক উৎকর্ষ সাধিত না হইলে দেশ কখনই স্বাধীন থাকিতে পারিবে না, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি কখনই সংস্কৃত ও স্থির হইবে না। এই মত তিনি সততই প্রচার করিতেন। সেই অবধি সঙ্গীত চীনদের শিক্ষিতব্য বিষয়ের মধ্যে একটী প্রধানতম সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যালয়াদিতে ইহার আলোচনা প্রভূতপরিমাণে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু চীনেরা যন্ত্র-সঙ্গীতে অধিক উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই। সেদেশে সঙ্গীত যন্ত্রের সংখ্যা অতি অল্পই। কিন্তু কণ্ঠ-সঙ্গীতে ইহ অন্যান্য সভ্যতাভিমানীদেশসকল হইতে কোন

অংশেই নিকৃষ্ট নহে। কণ্ঠ-সঙ্গীতকে চীনেরা এত আদর করে যে, তাহা বলা যায় না। তাঁহারা বিশেষতঃ চংসম্রাট্ মনে করিতেন যে যদি রাজ্যের স্বাধীনতা ও সুশৃঙ্খলতা সম্পাদন করিতে অথবা জাতির প্রকৃত ও বিশিষ্ট গুণ জানাইতে হয়, তাহাহইলে সঙ্গীতের সমধিক চর্চ্চা করা উচিত। তিনি তাঁহার সচিব-বর্গকে সর্ব্বদাই বলিতেন "যদি তোমরা তোমাদের অরাতিদিগের শোণিত-পাত না করিয়া তাহাদিগকে অনায়াসেই বশীভূত করিতে চাও, যদি চীনদেশকে অপ্রতিহতও অটল স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকারী করিতে চাও তাহা হইলে তোমাদের বৈরিদিগেকে কোমল, মনোহারি ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর সঙ্গীত শ্রবণ করাও; সেই সঙ্গীতে তাহারা বিমোহিত হইলে তাহাদের মন হীন-বীর্য্য শরীর অবশ হইয়া পড়িবে, সেই সময়ে তোমরা তাহাদিগের নিকট রূপবতী রমণীদিগকে পাঠাইয়া দাও—দেখিবে, তোমাদের জয় সম্পূর্ণরূপে তোমাদের করতলস্থ হইয়াছে।*

এক্ষণে চীন-সঙ্গীত যে কি এবং আমাদের দেশের সঙ্গীতের সঙ্গে যে তাহার কত দূর সাদৃশ্য তাহা সেই সঙ্গীতের অবয়ব দেখাইলেই, পাঠক! অনায়াসে বুঝিতে পারিবে।

* The shoo-king—a collection of Chinese odes.

† Kin instrument.

সমুদয় সঙ্গীতের ন্যায় চীন-সঙ্গীত ও দুই ভাগে বিভক্ত—যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ-সঙ্গীত। ইহাদিগের যন্ত্রসঙ্গীত তত হৃদয়গ্রাহী নহে। তাহাদের ঢোলক, তান্পুরা, ঘণ্টা, সেতারের অনুরূপ কোন যন্ত্র, বংশী প্রভৃতি নানাবিধ সঙ্গীত যন্ত্র আছে কিন্তু তাহাদের নির্ম্মাণ-শৃঙ্খলা তত পরিপাটী নহে সুতরাং তাহাদের হইতে অতি সুশ্রাব্য ও আধুনিকজনগণের বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত কোন রাগ বা গত বাদিত হইতে পারে না। যাহা হউক, তাহারদের কণ্ঠসঙ্গীত ইহা অপেক্ষা অধিক হৃদয়তোষকর।

আমাদের সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, † এই সাতটী স্বরের ন্যায় চীনেরাও নিজ সঙ্গীতে সাতটী স্বর ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহারা,—

উ, পি এন্চে, চে, কুঙ্, চ্যাং, কিউ, পিএন্ কুঙ্

কিন্তু তাঁহারা সচরাচর পাঁচটীকেই সঙ্গীতের উপযোগী বলিয়া থাকেন।

তাঁহারা পিএন্চে ও পিএন্ কুঙ্ এই দুই স্বর পরিত্যাগ করিয়া কুঙ্ কে অর্থাৎ আমাদের মধ্যমকে প্রধানস্বরস্বরূপ করিয়া গ্রাম বাঁধিয়া থাকেন। আমরা ও সময়ে সময়ে দুইটী স্বর পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চস্বরে গ্রাম স্থির করি। কিন্তু আমাদের পক্ষে সচরাচর সেরূপ পরিত্যাগ

† ইহারা ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম পঞ্চম, ধৈবত নিষাদ এই কয়টী স্বরের আদ্য অক্ষর। ষড়জের জন্য 'সা' এইরূপ লেখা আর্য।

এক বা দুই স্বর অন্তরই সংঘটিত হইয়া থাকে। কুঙ্ অর্থাৎ মধ্যমকে নায়ক স্বরস্বরূপ স্থির করিয়া গ্রাম সম্বন্ধ করিলে তখন তাহাদের স্বরগ্রাম নিম্ন লিখিত প্রকার হয়।

কুঙ, চ্যাং, কিউ, চে, ইউ

অর্থাৎ

ম প ধ সা ঋ

এরূপে তাহাদের পিএন্‌চে, ও পিএন্‌কুঙ্ আর আমাদের নিখাদ ও গান্ধার এই দুই স্বর পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু তাহারা যখন চে অর্থাৎ আমাদের ষড়জকে প্রধান স্বরস্বরূপ করে তখন তাহাদের কুঙ্ ও পি এন্ কুঙ্ অর্থাৎ মধ্যম ও নিখাদ এই দুই স্বর পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে স্বর গ্রাম এইরূপ দাঁড়ায়,—

চ্যাং কিউ, চে, ইউ, পিএন্‌চে

প ধ সা ঋ গ

এইরূপে দ্বিবিধ পর্য্যায়ানুসারে দুই বিভিন্ন স্বর পরিত্যক্ত হইল; অথচ তাহার সঙ্গীতত্ত্ব কিরূপে সংসিদ্ধ হইয়াছে তাহা এখন দেখা যাউক। কিন্তু এ বিষয় বলিবার পূর্ব্বে একটী বিষয়ে পরিচয় দেওয়া উচিত।

আমাদের ন্যায় ইহাদের সঙ্গীতে অনুরণনাত্মক স্বরার্দ্ধ, স্বর-তৃতীয়াংশ বা স্বর-চতুর্থাংশ, এমন কি, তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর কতকগুলি রঞ্জক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ শ্রুতি (enharmonic tones) বলে। ইহারা দ্বাবিংশতি-সংখ্যক। সেই সকল শ্রুতির উচ্চোচ্চ বিভাগ-পরম্পরাকে সা, ঋ, গ, ম ইত্যাদি নাম প্রদান করা হইয়াছে—সেই সকল বিভাগ সর্ব্বত্র সমান নহে। ইহাদের শ্রুতি-বিভাগ অবিকল আমাদের ন্যায়। যাহা হউক বিশেষ বিশদ করিবার নিমিত্ত আমাদের শ্রুতিবিভাগ নিম্নে প্রকটিত হইল।

ষড়্জ হইতে ঋষব করিতে হইলে চারি শ্রুতি
ঋষব ,, গান্ধার ,, ,, তিন ,,
গান্ধার ,, মধ্যম ,, ,, দুই ,,
মধ্যম ,, পঞ্চম ,, ,, চারি ,,
পঞ্চম ,, ধৈবত ,, ,, চারি ,,
ধৈবত ,, নিখাদ ,, ,, তিন ,,
নিখাদ ,, সা(উচ্চতর সপ্তকের),, দুই ,,*

ষড়্জ ঋষব, মধ্যম পঞ্চম, পঞ্চম ধৈবত, এই সকল স্থলে চারি শ্রুতি; ঋষব, গান্ধার, ও ধৈবত নিখাদ, এ উভয় স্থলে তিন শ্রুতি; এবং গান্ধার মধ্যম ও ধৈবত নিখাদ এ উভয় স্থলে দুই শ্রুতি। এইরূপে দ্বাবিংশতি-সংখ্যক শ্রুতির বিনিযোজনা হইয়া থাকে। এ সকল স্থলে চারি শ্রুতি-সম্পন্নস্বরগুলিই অধিক প্রশস্ত। এইরূপ সাত স্বরে বাইশটী শ্রুতির পর্য্যবসান হওয়ার রীতি স্বাভাবিক, এবং

* ইহাদের মধ্যে যেখানে চারিশ্রুতি আছে সেখানে সেই এক এক শ্রুতিকে স্বরচতুর্থাংশ (quarter tones), যে স্থানে তিন শ্রুতি সেখানে সেই এক এক শ্রুতিকে স্বরতৃতীয়াংশ (third of a tone); এবং যে স্থলে দুই শ্রুতি সেখানে এক এক শ্রুতিকে স্বরার্দ্ধ (semitones) বলে।

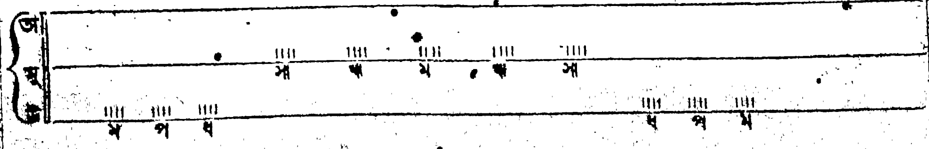
প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত আছে। যাহারা বিভিন্ন বিধ সঙ্গীতের জন্য বিভিন্ন বিধ স্বরগ্রাম স্থির করিতে যায় তাহারা তদনুসারে শ্রুতিরও বিভাগ করিয়া থাকে। তখন তাহাদের স্বাভাবিক বিভাগের লোপ পায়। চীনেরা যখন দুই স্বর পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চস্বরে গ্রাম বাঁধে এবং মধ্যমকে প্রধান স্বর করে তখন তাহাদের পিএন্‌চে ও পিএন্‌ কুঙ্‌ অর্থাৎ নি ওগ পরিত্যক্ত হয় অর্থাৎ সে দুইটী সেখানে প্রত্যক্ষীভূত হয় না। কিন্তু বাইশটী শ্রুতি সেখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবে তাহাদের বিভাগ আর পূর্ব্ববৎ প্রকৃত নাই।† ইহাদের সঙ্গীতে এরূপ শ্রুতি-বিভাগ আছে বলিয়া আমাদের সঙ্গীতের ন্যায় ইউরোপীয়দের কর্ণে চীন-সঙ্গীত তত ভাল লাগে না। ইউরোপীয়দিগের হৃদয়গ্রাহী না হইলেও ইহা যে প্রকৃত সঙ্গীত ও নিতান্তমনোহারি তাহা এখন দেখা যাউক।

চীনেরা যখন মধ্যমকে প্রধান স্বর করে তখন কুঙ্‌, চ্যাং, কিউ, চে, হউ ইত্যাকার হয়। এখানে কুঙ্‌ অর্থাৎ মধ্যম নায়ক স্বর হইলে কিউ অর্থাৎ ধৈবত গান্ধারবৎ এবং পঞ্চম ঋষববৎ হয় সুতরাং পঞ্চম ও ধৈবতে চারি শ্রুতি না থাকিয়া তিন শ্রুতি এবং ধৈবত হইতে তিন শ্রুতি না হইয়া চারি শ্রুতি করিয়া এবং নিখাদ হইতে উচ্চতর সপ্তকের ষড়্‌জের দুই শ্রুতি লইয়া এই ছয় শ্রুতিতে উচ্চতর সপ্তকের ষড়্‌জ হয়। আবার উচ্চতর সপ্তকের ঋষব হইতে গান্ধার এই তিন্‌ এবং গান্ধার হইতে মধ্যম এই দুই শ্রুতি একত্রে পাঁচ শ্রুতিতে উচ্চতর সপ্তকের মধ্যম হইয়া থাকে। দ্বিতীয় স্থলে, গান্ধার হইতে মধ্যম দুই শ্রুতি এবং মধ্যম হইতে পঞ্চম চারি শ্রুতি এই ছয় শ্রুতিতে পঞ্চম স্থিরীকৃত হয়, আর ধৈবত হইতে নিখাদ তিন শ্রুতি ও নিখাদ হইতে ষড়্‌জের দুই শ্রুতি এই পাঁচ শ্রুতিতে উচ্চতর সপ্তকের ষড়্‌জ হয়। সুতরাং উভয় স্থলে সর্ব্বসমেত একাদশ সংখ্যক শ্রুতির স্থান ও ভাগভেদ সংঘটিত হইয়া থাকে। ইউরোপীয়সঙ্গীতজ্ঞেরা এই বিশেষ টুকু বুঝিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদের নিকট চীন-সঙ্গীত তত আদরণীয় হয় না। এই শ্রুতির জন্য ইউরোপীয় দিগের পূর্ব্বাঞ্চলীয় সঙ্গীত বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। যাহাহউক, এরূপে চীন সঙ্গীত আমাদের দেশের অতি মনোরম ভূপালী রাগিণী ও বিভাস রাগের ন্যায় মধুর হয়।

সুতরাং পাঠক! দেখ চীনসঙ্গীত কেমন সুমধুর! আমাদের দেশে ভূপালীর ন্যায় মনোরমা রাগিণী অতিঅল্পই আছে। নিম্নে চীনের এক রাগের ও আমাদের ভূপালীর স্বরলিপি প্রকটিত হইল তাহা দেখিয়া পরস্পরের সহিত পরস্পরের কত সাদৃশ্য তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইবে।

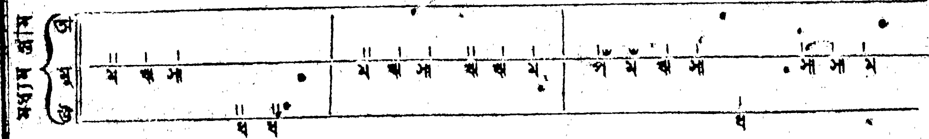
† আমরা ও কোন ওডব-গ্রামীয় রাগ গান করিবার জন্য পঞ্চস্বর ব্যবহার করিয়া থাকি। সেখানেও শ্রুতিবিভাগের ব্যতিক্রম ঘটে।

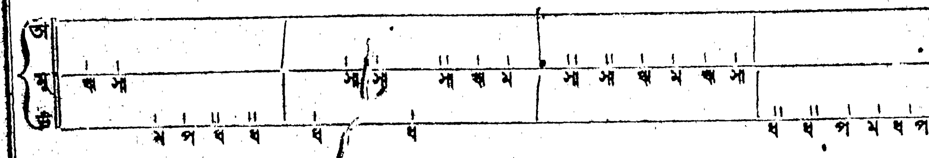
চীনদেশীয় স্বরগ্রাম।

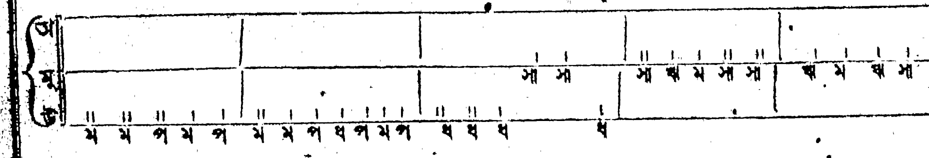


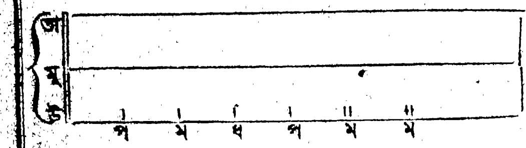
কুং, চোং, কিউ, চে, ইউ, কুং, ইউ, চে, কিউ, চোং, কুং।

মু-লি-হোয়া রাগ।

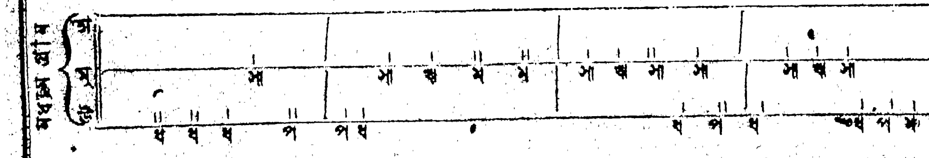


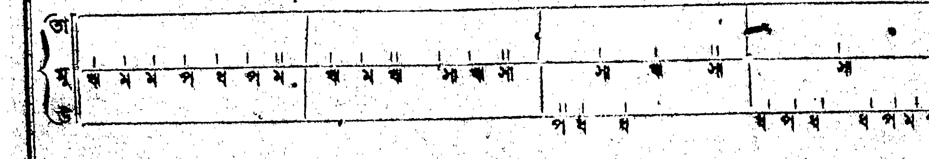






ভূপালি।





(ক্রমশঃ)

শ্রীশৌঃ—

শ্রীযুক্ত বাবু হরিশচন্দ্র শর্ম্মা কলিকাতা ২৮৶
,, দুর্গাচরণ গুপ্ত নড়াল ... ৩৶১০
,, জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় বহু-
বাজার ... ৩৲
,, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ নিমুখানসামার
গলি ... ১॥০
,, আনন্দচন্দ্র মিত্র চাঁপাতলা ২৲
,, রাসবিহারী গোস্বামী কলি-
কাতা ... ৩৲
,, উপেন্দ্রনাথ দাস ঐ ৩৲
,, সোনারচাঁদ শর্ম্মা কলিকাতা
নিমুখানসামার গলি
৩৭ নং ... ২৲
,, বিষনচাঁদ গোলেচা বহুচর ৮৲
,, হরিশচন্দ্র রায় কলি-
কাতা ... ৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায়
চাঁপাতলা ... ১॥০
,, নীলমাধব রায় সেক্রেটারি
রীডিং ক্লব গাজিপুর ... ৩৶০
,, পঞ্চানন পথুরিয়াঘাটা ... ৩৲
,, রাখালদাস অধিকারী চন্দন
নগর ... ৩৲
,, যদুনাথ সেন জয়পুর ... ১৸৶০
রঘুনসিংহ গোস্বামী শান্তিপুর ২৶০
,, রামলাল চক্রবর্ত্তী এলাহা-
বাদ ... ১৸৶০
,, রায় মেঘরায় বাহাদুর আ-
জিমগঞ্জ ... ৩।৶০
,, নগেন্দ্র নারায়ণ অধিকারী ব-
ড়াই গ্রাম রাজসাহী ... ৩।৶০

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজকিশোর চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা ... ৩৲
,, আশুতোষ লাহিড়ী কৃষ্ণনগর ২৲
,, হরিমাধব লাহিড়ী কলিকাতা ৩৲
,, শশীভূষণ মিত্র, হেয়ার স্কুল ৩৲
,, পুরুষোত্তম ধর কলিকাতা ১৲
,, তপজেল হোসেন মহেশপুর ১৲
,, তারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মজিল-
পুর ... ৩।৶০
,, ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
দিনাজপুর ... ৩।৶০
,, কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা ... ৩৲
,, সীতানাথ দাস কলিকাতা ৩৲
,, নগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ কলিকাতা ১৲
,, বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়
তালতলা লেন ... ৩৲
,, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত কলিকাতা ২।০
শ্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু রায় রংপুর
মাহিগঞ্জ ... ১।৴০
,, যোগেন্দ্রপ্রসাদ রায় জামাল-
পুর ... ১।৶০
,, কমলচাঁদ হালদার দারজিলীং ৩।৶০
,, প্রসাদদাস মল্লীক কলি-
কাতা ... ৩৲
,, অতুলচন্দ্র সিংহ কমিল্লা ৩৲
,, অমৃতলাল সরকার মালঞ্চী ৶০
,, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
গোবরডাঙ্গা ... ৩।৶০
,, দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তী ঢাকা টেলি-
গ্রাফ আফীষ ... ৩।৶০

সন ১২৮১ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

কার্ত্তিক মাস।

শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ বোস কলিকাতা ... ১৸৹
,, রামজয় বাগচি মোক্তার রামপুর বোয়ালিয়া ... ৩।৴৹
,, কিশোরীলাল সরকার এম, এ, বিএল, উকীল, ঐ ৩।৵৹
,, ক্ষেত্রনারায়ণ রায় হেডমাষ্টার লোয়ার ... ১৷৵১৹
,, চন্দ্রকুমার চৌধুরী কলিকাতা ২৲
,, জ্যোতীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকো ... ৬৲
,, প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন ২ নং ... ৩৲
,, উমেশচন্দ্র মিত্র কলিকাতা ৩৲
,, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ... ১৲
,, বঙ্কুবিহারী দত্ত কলিকাতা ৩৲
,, প্রিয়নাথ সেন ঐ ... ২৲
,, রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কালীগঞ্জ বিষ্ণুপুর ... ১৷৹
,, ছন্নুলাল জহুরী কলিকাতা শিবতলা ... ৩৲
,, সনাতন দাস কলিকাতা ১৲
,, মহিমচন্দ্র ঘোষ ঢাকা ইস্‌লামপুর ... ১৲
,, ভুবনমোহন গুপ্ত সাহেবগঞ্জ সাকরী গলি ... ৩।৵৹

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণরমণ গোস্বামী যগোদল ... ১৷৴১৹
,, ফণীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় পাথুরিয়াঘাটা ... ৩৲
,, কুঞ্জলাল সাহা কলিকাতা ... ৩৲
,, কৈলাসচন্দ্র সেন ঢাকা ... ৩৷৹
,, রাধানাথ সেন কলিকাতা ৩৲
,, রমণীমোহন ঘোষ খিদিরপুর ৩।৵৹
,, রামকুমার সরকার কলিকাতা ... ১৲
,, উমাচরণ রায় চট্টগ্রাম ... ১৷৵১৹
,, পূর্ণচন্দ্র পাল মুঙ্গের ... ৩।৵৹
,, দ্বারিকানাথ বাগচি মুঙ্গের ২৲
,, শশীভূষণ চৌধুরী ইছাপুর ১।৵৹
,, দীননাথ চট্টোপাধ্যায় কাকুরুল ।৵১৹
,, দক্ষিণাপ্রসাদ নেয়োগী মৈমনসিংহ ... ৵১৹
,, মহেশচন্দ্র লাহিড়ী মাহিগঞ্জ ১৷৵১৹
,, পণ্ডিত কালীদাস দত্ত মাথুরুল বঙ্গবিদ্যালয় বর্দ্ধমান ৩৲
,, ক্ষেত্রচন্দ্র বোস লক্ষ্ণৌ ... ৩।৵৹
,, যদুনাথ মুখোপাধ্যায় যশোহর ২৲
,, বিহারীলাল মজুমদার সংস্কৃত কালেজ ... ২৲
,, সর্ব্বচন্দ্র রায় জোড়া ... ৩৷১৹
,, হরিশচন্দ্র নেয়োগী বাগবাজার ... ২৲
,, বিপীনবিহারী আঢ্য কলিকাতা ৩৲

ভারতচন্দ্র রায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সুন্দর যখন আত্মপরিচয় দিলেন যে আমি বিদ্যার জন্য বর্দ্ধমানে আসিয়াছি, কবিরঞ্জনের হীরা সে কথার শ্লেষ বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিয়া সে কি রূপ উক্তি করিল পাঠক দেখুনঃ—

"বুঝিয়া বাক্যের ছল, হীরাবতী খল খল,
হাসে, ভাষে বটে হে বুঝেছি।
বিদ্যায় ভকতি আছে, বিদ্যালাভ হবে পাছে
আমি পরিচয় সে দিতেছি॥
হীরাবতী নাম ধরি, বাসে বৰ্ষি একেশ্বরী,
পতি পুত্র কন্যা কেহ নাই।
উদর উপায় মূল, রাজকন্যা লয় ফুল,
যাতায়াত নিত্য সেই ঠাঁই॥
পরমরূপসী বামা, তুষ্টা শ্যামা গুণধামা,
বিচারে জিনিবে যেই জন।
সেই তার হৃদয়েশ, খ্যাত ইহা সর্ব্বদেশ,
বিসম্বা ধনুক ভাঙ্গা পণ॥
* * * * *
আরি শুন গুণযুত, তব নামে ভগ্নীসুত,
কহিতে বড়ই ভয় বাসি।
যদ্যপি না ঘৃণাকর, থাকহ আমার ঘর,
ধর্ম্মতঃ তোমার আমি মাসী॥"

ভারতচন্দ্রের হীরাও বুঝিয়াছিল, কোন্ বিদ্যালাভের আশায় সুন্দর বকুল তলায় বসিয়া আছেন। কিন্তু সহসা এক জন আগন্তুকের নিকট কোন কথা পূর্ব্বেই না ভাঙ্গিয়া কেবল সুন্দরকে নিজালয়ে আকর্ষণ করিবার জন্য আশা দিল যে আমি—

"নিয়নিত ফুল রাজবাটীতে যোগাই।
ভালবাসে রাজা রাণী সদা আসি যাই॥"

বিদ্যার কথা কিছুই বলিল না। ভারতের মালিনী অত্যন্ত চতুরা, এজন্য সে বিষয় সুন্দর নিজে উত্থাপন না করিলে সে কোন কথাই নিজমুখে ব্যক্ত করিল না। কবিরঞ্জনের হীরা আপনিই একটা ছল করিয়া সুন্দরকে অগ্রেই ভগ্নীসুত বলিল। কিন্তু গুণাকরের হীরা তেমন পাত্রী নহে। সে হীরা কেবল প্রলোভন দিয়া সুন্দরকে বাড়ি লইয়া যাইতেছিল। এমত সময়ে সুন্দর দুর্ম্মতি ভয়ে আগে ভাগে হীরাকে মাসী বলিয়া সম্বোধন করিল।

কবিরঞ্জনের হীরা অগ্রেই মাসী বলিয়া সম্বন্ধ ঘটাইল বটে, কিন্তু তৎপরেই অনুচিত ব্যবহার আরম্ভ করিল। পরদিন পুষ্পচয়নান্তর মালিনী বাড়ি ফিরিয়া আসিল। অনন্তর মাল্যগ্রহণ ছলেঃ—

"বার দিয়া বসিল বিনোদবর-পাশে।
বাঙ্গলা বলিতে নারে ফিক্ ফিক্ হাসে॥
কটীর কাপড় গাণ্ঠি কতবার খোলে।

ভুজ পাশ উদাশ, গা ভাঙ্গে, হাই তোলে॥
হেসে হেসে আরো এসে ঘনায় নিকটে।"
ইত্যাদি।

এই চিত্র মালিনী মাসীর অনুরূপ চিত্র বটে, কিন্তু যথাস্থলে প্রযুক্ত হয় নাই। হীরা নিজেই সুন্দরের সহিত যে সম্বন্ধ ঘটায়েছে, তাহাতে এপ্রকার ব্যবহার কখন স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। কবিরঞ্জন বোধ হয় অবসর খুঁজিতেছিলেন, কোথায় হীরার চিত্র সন্নিবেশিত করিবেন। এস্থানে সে চিত্র প্রদর্শন করায় তাঁহার কল্পনা দোষার্হ হইয়াছে। গুণাকরের হীরা যখন প্রথম দিন মালা গাঁথে, সুন্দরের সহিত এবম্বিধ অবৈধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় নাই। সেই হীরা, সুন্দর মাসী বলাতেই বুঝিয়াছিল, সুন্দর তাহার জন্য নহে। তদবধি মাসী সম্পর্কে যে প্রকার ব্যবহার করা উচিত, সেই রূপই করিতে লাগিল।

রামপ্রসাদের সুন্দর যখন দেখিলেন, হীরা তাঁহার সহিত অসমুচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল, তখনই বিপাক ভয়ে ছল করিয়া হীরাকে বাজারে পাঠাইলেন। হীরা অনতিবিলম্বেই পণ্যবীথিকা হইতে ফিরিয়া আসিল এবং তৎক্ষণাৎ বোনপোর সহিত পরিহাস আরম্ভ করিয়া দিল। ভারতের হীরাও বাজারে গিয়াছিল। কিন্তু সেই হীরা কিরূপে বেসাতি করিতেছে তাহার চিত্র ভারতচন্দ্র প্রদান করিয়াছেন। এই চিত্রে হীরা বাজারে ফিরিতে ফিরিতে কিরূপ ব্যবহার করে, তাহার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতকৃত হীরার চিত্রের একাংশ এই স্থলে লিখিত হইয়াছে। এ চিত্রটি কতদূর স্বাভাবিক এবং সঙ্গত তাহা এই স্থানের বর্ণনা পাঠেই উপলব্ধি হয়। ভারতচন্দ্র এই দৃশ্যটি যোজনা করিয়া কবিত্বেরই পরিচয় দিয়াছেন। নির্জ্জনে পুরুষসঙ্গে আমরা হীরাকে দেখিয়াছি, গৃহেও তাহাকে দর্শন করিয়াছি, এক্ষণে গৃহের বহির্দ্দেশে জনতার মধ্যে আসিয়া আমরা হীরার চরিত্র বিশিষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিলাম। হীরার যৌবন-লাবণ্য যখন বিনষ্ট হইয়াছে, দোকানীদের আর ভুলাইতে পারে না, সুধু কথার ছলে কিরূপে বেসাতি করিয়া হীরা এখন অতি কষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা আমরা সুন্দররূপে দেখিতে পাইলাম।

সুন্দর আহারান্তে যখন শয়ন করিলেন, তখন আস্তে আস্তে মাসীকে ডাকিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিগত হইলে যখন মালিনীর সহিত বিলক্ষণ আলাপ হইল, তখন সুন্দর ধীরে ধীরে হীরাকে কথাপ্রসঙ্গে বিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হীরাও অবসর বুঝিয়া এক্ষণে বিদ্যার রূপ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইল। কবিরঞ্জন এই দৃশ্যটি প্রথমেই নিপাতিত করিয়াছেন। হীরার সহিত সাক্ষাৎকার হইবামাত্র সুন্দর যখন বিদ্যার প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন অমনি তাহার রূপের কথা জিজ্ঞাসা করাতে কবিরঞ্জনের হীরা তাহা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভারতচন্দ্র এই সময়ের

ঘটনা গুলি যেমন বিজ্ঞতার সহিত কল্পনা করিয়াছেন, রামপ্রসাদ সেরূপ পারেন নাই।

সে যাহা হউক, কিন্তু রামপ্রসাদী হীরার বিদ্যার রূপবর্ণন, ভারতীয় হীরার বিদ্যার রূপবর্ণনাপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। উভয়েই নিজ সময় ও রুচির অনুরূপ এবং প্রচলিত উপমা সকল প্রয়োগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদী হীরা মধ্যে মধ্যে সরল ভাষায় এক একটি সৌন্দর্য্য যে রূপ বর্ণন করিয়াছে, ভারতীয় হীরা উপমাছটায়ও ততদূর কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ভারতীয় হীরা বিদ্যার নিতম্ব বর্ণন স্থলে কহিতেছেঃ—

"মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।"

রামপ্রসাদী হীরা তথায় কহিয়াছেঃ—

"নিবিড় বিপুল চারু যুগল নিতম্ব।"

ভারতীয় হীরা বিদ্যার গতি এইরূপে বর্ণন করিয়াছেঃ—

"যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥"

তথায় রামপ্রসাদী হীরা বলিতেছে ঃ—

"মন্দ মন্দ গমনে যদ্যপি বাঁকা চায়।
মনোভব পরাভব লইয়া পলায়॥"

পাঠকগণ এই প্রসঙ্গভঙ্গ দোষ মার্জ্জনা করিবেন। আমি হীরার চরিত্র পুনরায় গ্রহণ করিলাম। হীরাকে নির্জ্জনে দেখিয়াছি, হাটে বাজারে দেখিয়াছি, এক্ষণে তাঁহাকে রাজবাটীতে দেখিব। হীরা, সুন্দর-গ্রথিত হার লইয়া বিদ্যার মন্দিরে উপনীত হইল। হীরা জানিত সেই হারে সুন্দর কৃত কারুকার্য্য করিয়াছেন, সেতো হার নয়, বিদ্যা ধরিবার মোহন বাগুরা। হীরা যে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই হার দ্বারা তাহার প্রথম সূত্রপাত হইবে। কারণ, কবিরঞ্জনের হীরা, রাজবাটী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুন্দরের সহিত সম্ভাষণে কহিতেছেঃ—

"তব পত্র পাবামাত্র, সিহরিল সর্ব্বগাত্র"

কিন্তু সেই রামপ্রসাদী হীরা মাল্যহস্তে বিদ্যার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, কালবিলম্ব হেতু বিদ্যা যথোচিত তিরস্কার করিলেন। হীরা তৎক্ষণাৎ করপুটে মার্জ্জনা চাহিয়া কোপভরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কিন্তু ভারতের হীরা অন্যরীতিতে কার্য্য করিয়াছিল। ভারতের হীরাও জানিত সুন্দর মালার মাঝে কি খেলা খেলিয়াছিলেন। জানিয়া, সে যখন তিরস্কৃত হয়, তখন বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া, মিষ্টভাষে সুন্দরীকে মালা দিল এবং মালা দেখিয়া সুন্দরী কি বলেন, তজ্জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তদন্তর যাহা ঘটিয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ভারতের হীরার কল্পনা এস্থলে কেমন স্বভাবসিদ্ধ তাহা বলিয়া দিবার আবশ্যক করে না।

হীরার চরিত্রবিষয়ক প্রস্তাব আর আমি বৃদ্ধি করিতে চাহিনা। বিদ্যাসুন্দরের নায়ক নায়িকার যদি কিছু চরিত্র থাকে তাহা গুটিকত শব্দেই ব্যক্ত হইতে পারে। সুন্দর ইন্দ্রিয় সুখপরায়ণ সুরসিক পুরুষ; বিদ্যা সুকুমারমতি ও পতিব্রতা। সুন্দরের ইন্দ্রিয়-

পরতা ও রসিকতা বিদ্যাসুন্দরের সর্ব্ব-স্থলেই পরিদৃষ্ট হয়। ভারতচন্দ্র যে বিদ্যার চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা কি মনোহর! বিদ্যা শিক্ষিতা হইয়াছিলেন, এজন্য তিনি বিদ্যার গর্ব্বে প্রথমে কত পতিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু অবশেষে তাহার হৃদয় আর স্থির থাকিল না। প্রতিজ্ঞা যে হৃদয়কে দৃঢ় করিয়াছিল, প্রেম আসিয়া তাহাকে বিগলিত করিল। তিনি সুন্দরকে দেখিয়া প্রেমাকৃষ্ট হইলেন। তখন তিনি বিষম পণ বিস্মৃত হইলেন। যাঁহার প্রতি একবার অনুরাগিণী হইলেন, তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণ করিলেন। মিলনে বিদ্যা সুখিনী হইলেন। তিনি সুন্দরের মত ইন্দ্রিয়-পরায়ণা নহেন। সুন্দরের ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় তাঁহার লজ্জা বোধ হইত। একদা তিনি কি ভাবিতেছিলেন দেখুনঃ—

"দিবসে নিদ্রার ঘোরে, আলু থালু পেয়ে মোরে,
একর্ম্ম কেবল অপমান॥
ঘৃণা লজ্জা দয়া ধর্ম্ম, নাহি বুঝে মর্ম্ম কর্ম্ম,
নিদারুণ পুরুষের মন।
এতবলি মনোদুঃখে, মৌন হোয়ে হেটমুখে,
ত্যজে হার কুণ্ডল কঙ্কণ॥"

অপর এক স্থলে বিদ্যার প্রণয়ের কি প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে।

"নিদ্রায় অবশ দেখি রাজার নন্দন।
ধীরে ধীরে তার মুখে করিল চুম্বন॥
সিন্দুর চন্দন সতী পতি ভালে দিয়া।
দ্রুত গেলা চিহ্ন রাখি নয়ন চুম্বিয়া"

তাঁহার এই প্রেম ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যে সুন্দরের সহিত তাঁহার গোপনে বিবাহ হইয়াছিল সেই সুন্দরকেই তিনি পতিরূপে গ্রহণ করিলেন। অন্যজনের পাণি গ্রহণে তিনি বিরত হইলেন। এজন্য রাজা যখন সম্বাদ দিলেনঃ—

"এসেছে সন্ন্যাসী এক করিতে বিচার।"

তখন তিনি কি প্রত্যুত্তর দিলেন?

"বিদ্যা বলে আমার বিচারে কাজ নাই।
এমনি থাকিব আমি যা করে গোঁসাই॥"

বিদ্যার পতিপরায়ণতার ভাব দেখুনঃ—

"রমণীর রমণ পরাণ, তাহা বিনা কেবা আছে আন; সে পরাণ ছাড়া হয়ে, যে রহে পরাণ লয়ে, ধিক্ ধিক্ তাহার পরাণ॥"

সুন্দরকে ধরিবার জন্য কোটাল যখন ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে, সেই পতি-পরায়ণা বিদ্যার হৃদয়ে তখন কি ভাবনা উপস্থিত?

"ওখানে ভাবেন বিদ্যা একি পরমাদ।
না জানিল প্রাণনাথ এসব সংবাদ॥
না জানি আমার লোভে আসিবেন ঘরে।
হায় প্রভু কোটালের পড়িলা চাতরে॥"

সুন্দরকে যখন বন্ধনাবস্থায় রাজ-সভায় আনীত হয়, তখনকার বিদ্যার মনের ভাব আমরা পূর্ব্বে স্থলান্তরে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই আক্ষেপোক্তি তাঁহার প্রণয়-গভীরতার কি সুন্দর পরিচয়!

আমাদিগের পূর্ব্বতন বঙ্গীয় কবিগণ পাত্র ও পাত্রীগণের চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কাব্যের প্রধান লক্ষণ জ্ঞান করি-

তেন না। ইহা আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কার। ইউরোপের মধ্যেও এরূপ সংস্কার ডন কুইক্সটের ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে প্রচারিত ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সংস্কৃত ভাষার প্রধান কবিগণ স্ববর্ণিত পাত্র ও পাত্রীগণের চরিত্র অতি সুন্দর রূপে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। বিশাল রামায়ণ ও মহাভারত এই বাক্যের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। সে যাহা হউক, উল্লিখিত মালিনীর চরিত্রে প্রকাশ হইয়াছে—বিদ্যাসুন্দর রচনায় ভারতচন্দ্রকে কতদূর বিচার করিয়া লিখিতে হইয়াছে। এই বিচারে প্রতীতি হয়, কেবল মানব প্রকৃতি বোধে নিয়মিত হইয়া তিনি সকল স্থলেই রচনার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। এই বোধ দ্বারা তিনি কবিরঞ্জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। ভারতীয় বিদ্যাসুন্দরে উপন্যাসগর্ভে যে সমস্ত বৈসাদৃশ্য আছে, সে সমুদায় ভারতের উচ্চতর মানবপ্রকৃতি বোধ প্রণোদিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যে সকল দৃশ্য স্বাভাবিক তাহা কাজেই কবিত্বব্যঞ্জক এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরের সামাজিক বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল, তৎপরেও কবিরঞ্জন উপন্যাসকে বিস্তৃত করিয়া আপন নায়ক নায়িকাকে স্বর্গে না তুলিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। ভারতের গ্রন্থে এরূপ অস্বাভাবিক দৃশ্য স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি জানিতেন তাঁহার নায়ক নায়িকার চরিত্র বর্ণনে এমত কোন বিশেষ গুণের ব্যাখ্যা নাই, যে জন্য তাহাদিগের রামপ্রসাদের মত স্বর্গারোহণ বর্ণন ও সম্ভবপর হইতে পারে। যেখানে বাস্তবিক উপন্যাসের কল্পনা সমাপ্ত হইয়াছে, ভারতচন্দ্র সেই খানেই তাহাকে সমাপ্তি দিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরের গোপনীয় মিলনের পর বিদ্যার গর্ভ পর্য্যন্ত যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে, সে কালের বৃত্তান্ত রামপ্রসাদ কোন্ বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই। তাহার সেই স্থলীয় উপন্যাসভাগ নীরস বলিয়া বোধ হয়। ভারতচন্দ্র কেমন কৌশল করিয়া, এই স্থলে সন্ন্যাসীর গল্পটি সংযোজন পূর্ব্বক উপন্যাসের বৈচিত্র্য সাধন করিয়াছেন। সুন্দরই সেই সন্ন্যাসী হওয়াতে দৃশ্য কল্পনা অধিকতর মনোহর হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরের মিলন বিষয়ক সমস্ত বৃত্তান্ত ভারতীয় হীরার নিকট সুগোপন থাকাতে, তাহার উপন্যাসের উপরি উক্ত স্থলের বৈচিত্র্য সংঘটনের একটি উপযোগিতা ঘটিয়াছে। এই সমস্ত দৃশ্যকল্পনায় কি ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তির প্রকাশ হয় নাই? তাঁহার কি কল্পনাশক্তির পরিচয় হয় নাই? যে সমস্ত ঘটনা যোজনায় কাব্য—বর্ণিত ব্যক্তিগণের হৃদয়ভাব উত্তমরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়; এবং পাঠকের মনে সমভাবের উদ্দীপন করে এমত সকল ঘটনা যোজনা কবিকল্পনার কার্য্য। সন্ন্যাসীর গল্পটী সংযোজিত হওয়াতে, মালিনীর কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাতাশঙ্কা, সুন্দরের প্রতি বিদ্যার প্রেমা-

নুরাগ, সুন্দরের রহস্য-প্রিয়তা ও বিদ্যার প্রণয়-পরীক্ষা এবং রাজা ও রাণীর হৃদয়-ভাব এই সমস্ত একদা সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ আখ্যায়িকার বৈচিত্র্য সাধিত হইয়া সেই স্থলের উপন্যাসভাগ কতদূর মনোহর হইয়াছে। এবম্বিধ কল্পনা দ্বারা যদি কল্পনাশক্তির পরিচয় না হয়, আমি জানি না কিসে হইতে পারে?

আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি রসবর্ণনায় ভারতচন্দ্রের বিলক্ষণ পারদর্শিতা লক্ষিত হয়। ভারতচন্দ্র আমাদিগকে ভাব এবং কল্পনা দ্বারা বিমোহিত করিয়াছেন। বাস্তবিক ভাবের উদ্দীপন এবং সেই উদ্দীপন দ্বারা হৃদয়কে বিমুগ্ধ করাই কাব্য-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানশাস্ত্র এক দিকে মানবের যেমন জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত আছে, কাব্য তেমনি অপরদিকে মানবের হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া আছে। গদ্যের বিপরীত পদ্য, বিজ্ঞানের বিপরীত কাব্য। বিজ্ঞান আমাদিগকে সত্য আনিয়া দেয়, কাব্য সেই সত্যের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে। বিজ্ঞান, মনকে আলোকিত করে; কাব্য হৃদয়কে প্রমত্ত করে। কাব্য, কিরূপে আমাদিগের হৃদয়ভাবকে বিচালিত করে? কাব্য, ভাবেতে কল্পনা মিশায় এবং কল্পনাতে ভাব মিশায়। কাব্য, এমত সকল কল্পনার সৃষ্টি করে, যাহাতে ভাবের এরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হয় যে মানব মন তাহাতে বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। কল্পনা-সহকৃত ভাব দ্বারা কাব্য, মানব-হৃদয়কে বিচালন ও প্রমত্ত করে। কল্পনাশক্তি কবির এই জন্য প্রধান সহায়। যে হেতু কল্পনা-শক্তির সৃষ্টি যেমন মানব-হৃদয়কে আকৃষ্ট করে এমত আর কিছুতেই সমর্থ হয় না। এই কল্পনা দ্বারা কবি, মানব হৃদয়ে এক সময়ে এক ভাবের উদ্দীপন করিলেন, আবার অপর কল্পনা দ্বারা সেই ভাব হইতে হৃদয়কে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই প্রকার ভাবোদ্দীপনকেই রস কহে। কল্পনা, রসসঞ্চারের প্রধান সাধন; ছন্দ তাহার অপ্রধান সাধন। কল্পনা, রসের বৈচিত্র্য বিধান করে; ছন্দ কল্পনার বৈচিত্র্য সাধন করে। ছন্দ, কল্পনাকে কখন গুরু, কখন লঘু, কখন উগ্র, কখন মৃদু, করিতেছে; এবং কল্পনা, কখন হৃদয়ে গভীর কখন প্রমোদকর, কখন কঠিন কখন তরল ভাব, সঞ্চার করিতেছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই গুণ প্রধানতঃ লক্ষিত হয়।

হীরা মালিনীর চরিত্র শেষ হইলে পর বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান প্রকৃতপক্ষে আরব্ধ হইল। এই আখ্যায়িকার পূর্ব্বভাগে যেমন আমরা কেবল মালিনীর চরিত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকি, ইহার পুরোভাগে আমাদিগের হৃদয় কেবল রসাভাসে প্রমত্ত হইয়া উঠে। আমরা চরিত্র বিস্মৃত হই, কেবল ভাবের প্রাচুর্য্যে মন পরিপূরিত হয়। নায়ক নায়িকার প্রেম হইতে রাণীর কোপভাব, রাণীর

কোপভাব হইতে রাজার প্রচণ্ড রোষানল, রাজার রোষানল হইতে কোটালের আস্ফালন ও উল্লাস, কোটালের উল্লাস হইতে মালিনী ও সুন্দরের নিগ্রহ ও নির্যাতন, তৎপরে নায়ক নায়িকার প্রতি অনুকম্পা ও তাহাদিগের সুখময় মিলন—বিদ্যাসুন্দর পাঠে এই সমস্ত বিবিধ ভাবে হৃদয় পুলকিত এবং বিচলিত হইয়া উঠে।

ভাবের বৈচিত্র্য এই আখ্যায়িকাভাগের একমাত্র লক্ষণ নহে। ভাবের পরিবর্ত্তন এবং পরিণতি ও বিশেষ দ্রষ্টব্য। ঘটনাবিশেষের উদয়ে হৃদয়মধ্যে কোন একটী বিশেষ ভাব প্রাধান্য লাভ করে। সময় এবং অবস্থাভেদে এই ভাবের ক্রমশঃ ব্যত্যয়ও পরিবর্দ্ধন অথবা পরিণতি ঘটে। যে ভাব প্রাধান্য লাভ করে তাহা স্থায়ী ভাব, এবং তদধীন ভাবগুলি সঞ্চারী ভাব। বিদ্যার গর্ভ সংবাদ শুনিবামাত্র রাণীর মনে যে স্থায়ী কোপভাব উদ্রিক্ত হইল, তাহা বিবিধ সঞ্চারী ভাবে পরিণত ও পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ সেই সংবাদ শুনিবা মাত্র দেখুন রাণী কি করিলেন :—

"শুনি চমকিয়া, চলে শীহরিয়া,
মহিষী যেন তড়িৎ।।
আকুল কুন্তলে, বিদ্যার মহলে,
উত্তরিলা পাঠরাণী।"

রাণীহৃদয়ের এই চিত্রখানি কি স্বাভাবিক! "শুনি চমকিয়া, চলে শীহরীয়া"—গর্ভসংবাদ শুনিবামাত্র রাণীর হৃদয় সহসা চমকিয়া উঠিল; পাছে সংবাদ সত্য হয় ভাবিয়া তিনি শীহরিয়া অথচ তড়িৎগতিতে বিদ্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। আসিয়া যখন সন্দেহ নিরাকরণ করিতেছেন, তখন দেখুন রাণীর কি ভাব :—

"গালে হাত দিয়া, মাটিতে বসিয়া,
অধোমুখে ভাবে রাণী।
গর্ভের লক্ষণ, করি নিরীক্ষণ,
কহে, ভালে কর হানি।।"

এই স্থলে রাণীর হৃদয়ভাব যেন স্ফটিকবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে। রাণীর সন্দেহ অপনীত হইল। সন্দেহ নিরাকরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কোপভাব প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি কি বলিতেছেন শুনুন :—

ওলো নিঃশঙ্কিনী, কুলকলঙ্কিনী,
সাপিনী পাপকারিণী।
শাঁখিনীর প্রায়, হরিয়া কাহায়,
আনিলি ডাকি, ডাকিনী।।
ডরে মোর ঘরে, বায়ু না সঞ্চরে,
ইহার ঘটক কেবা।
সাপের বাসায়, ভেকেরে নাচায়,
কেমন কুটিনী সে বা।।
না মিলিল দড়ি, না মিলিল কড়ী,
কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ, কেমনে এ কাজ,
করিলি খাইয়া মোরে।।"

ইত্যাদি।

বিদ্যার প্রতি কিয়ৎক্ষণ তিরস্কারের পর যখন এই কোপভাব একটু প্রশান্ত হইয়াছে, তখন তাহা ক্ষোভ ও দুঃখের সহিত মিশ্রিত হইল। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন :—

"রাজার ঘরণী, রাজার জননী,
রাজার শাশুড়ী হব।
যত কৈনু সাদ, সব হৈল বাদ,
অপবাদ কত সব॥
বিদ্যার মা—ছলে, যদি কেহ বলে,
তখনি খাইব বিষ।
প্রবেশিব জলে, কাতী দিব গলে,
পৃথিবি!—বিদার দিশ॥"
ইত্যাদি

অনন্তর বিদ্যার মিথ্যা জল্পনায় রাণীর কোপভাব আরও উদ্রিক্ত হইল। তখন তাঁহার রাজার প্রতি সেই ভাব নিপতিত হইল। রাজার প্রতি কোপোজ্জলিত রাজ্ঞী নৃপতির শয়নমন্দিরে কি ভাবে, গমন করিলেন, ও তথায় তাঁহার ঘন ডাকে সকলে কেমন চমকিয়া উঠিল, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রদর্শন করিয়াছি। কিন্তু রাজার নিকট যখন রাণী উপনীত হইয়াছেন, তখন বিদ্যার প্রতি জননীর স্নেহ স্বাভাবিক ভাবে উদ্রিক্ত হইল। এজন্য তিনি রাজাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন:—

"কি কহিব হায় হায়, জলন্ত আগুণ প্রায়,
আইবড় এত বড় মেয়ে।
কেমনে বিবাহ হবে, লোকধর্ম্ম কিসে রবে,
দিনেক দেখিতে হয় চেয়ে॥
* * * *
বিদ্যার কি দিব দোষ, তারে বৃথা করি রোষ,
বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে।"
ইত্যাদি।

উল্লিখিত কতিপয় দৃশ্যে রাণীর যে কোপভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কেমন উজ্জল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। এই সমুদায় কল্পনায় কেবল রাণীর চিত্তচাপল্য চিত্রিত হইয়াছে এমত নহে, এতদ্বারা পাঠকের হৃদয়ও নিশ্চয় সমভাবে এবং সমবেদনায় উদ্বেলিত হয়। তাঁহার হৃদয়ে রাণীর কোপভাব অঙ্কিত হইয়া যায়। রাণীর সমুদায় চিত্র দ্বারা পাঠকের মনে যে একটি স্থায়ী ভাবের উদয় হয়, তাহাই উদ্রিক্ত করা কবির উদ্দেশ্য। এই ভাব প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইলে কবিকে অন্যবিধ কল্পনার সৃষ্টি করিতে হয়। কল্পনার প্রাবল্য নিবন্ধন যে পরিমাণে হৃদয়ে ভাবেরও প্রাবল্য হয়, সেই পরিমাণে ভাবান্তর ঘটে। পাঠক এক সময় বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়ভাবে বিমুগ্ধ ছিলেন, যখন বিদ্যার গর্ভ হইল, তখন অপর দৃশ্য সকল তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া অন্যবিধ ভাবোদয় সংঘটন করিল। এই এক প্রকার ভাব হইতে ভাবান্তরে হৃদয়কে প্রত্যাবর্ত্তিত করার নাম ভাবের বৈচিত্র্য সাধন। এবং এক ভাবের নানাবিধ অবস্থা ঘটিত রূপান্তরের প্রদর্শন করাকে ভাবের পরিণতি অথবা ভাবের পরিবর্ত্ত কহে। এই দ্বিবিধ রসবর্ণনাতেই ভারতচন্দ্র সুনিপুণ ছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীপূ

পল্লীসমাজ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আমরা "পরিবারবর্গ" নামক প্রবন্ধে নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছি যে, প্রাচীন কালের আর্য্য-পরিবারবর্গ হইতে পল্লীসমাজ পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে। কি প্রকারে এরূপ ঘটিয়াছিল, অধুনা তদ্বিষয়ে দুই একটি কথা বলিব। বিদেশে অথবা সাধারণসঙ্কটে পরস্পরের প্রতি যাদৃশ সমদুঃখসুখতা জন্মে, সেরূপ স্বদেশে বা সম্পদের সময় দেখা যায় না। পশ্চিমাঞ্চলবাসী বাঙ্গালী বাবু স্বদেশের অতি সামান্য লোককে চাকরী স্থানে উপস্থিত দেখিয়া কত সমাদরে গ্রহণ করেন এবং পতিগৃহাগত নববধূ বাপের বাটীর কোন লোককে পাইলে, কিরূপ অন্তরঙ্গতার সহিত আলাপকুশল করেন, তাহা সকলেরই বিদিত। পক্ষান্তরে পরিবারের মধ্যে কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে, চিরবিরোধী জ্ঞাতির সহিত হঠাৎ আপনা হইতেই মিল হইয়া যায়; অথবা গ্রামের কোন অমঙ্গল ঘটিলে, যাহার সঙ্গে বহুকাল বাক্যালাপ ও মুখদেখাদেখি নাই, তাহার নিকটেও সহজে মনের কবাট উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে। ইংরাজজাতি স্বভাবতঃ আলাপকুণ্ঠ ও আত্মাভিমানী এবং স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় হইলেও পদমর্য্যাদার অতীব গৌরব করেন। তন্নিবন্ধন বিলাতে উচ্চতর ও নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা জন্মে না। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ইংরাজদিগের মধ্যে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ানেরা (Anglo-Indian) যে পরস্পরের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক আতিথেয়, সদালাপী, ও পদমর্য্যাদার আড়ম্বর-শূন্য, ইহা তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে অস্বীকার করেন না। এরূপ না হওয়াই বিচিত্র, হওয়া প্রকৃতির অনুযায়িমাত্র। পারস্যরাজ জরাক্ষসের দুর্জ্জয় আত্মাভিমান হইতে গ্রীসের একতা, হানিবলের আততায়িতা হইতে রোমের একাধিপত্য, পোপের বিধর্ম্মিতা হইতে ইউরোপের সংস্করণ, ইংলণ্ডের যথেচ্ছাচার হইতে আমেরিকার স্বাধীনতা, এবং নেপোলিয়নের দুরাকাঙ্খা হইতে প্রুসিয়ার সাম্রাজ্য—এইগুলি প্রসিদ্ধ ঘটনা উক্ত নিয়মের সুমহৎ দৃষ্টান্ত মাত্র।

উপরিউক্ত নিয়মের প্রভাবেই ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে সমধিক সমদুঃখসুখতা ও সাম্যভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রাজার অত্যাচার, ধর্ম্মবিপ্লব, অথবা অসমাবেশ যে কোন কারণেই হউক যখন প্রাচীন আর্য্যগণ সপ্তসিন্ধু প্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, তখন পথের ক্লেশে, আদিমবাসীদিগের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামে, স্বদেশ পরিত্যাগের

দুঃখে এবং বিদেশের অপরিচিতভাব-নিবন্ধন অসংস্থানে, তাঁহাদের মধ্যে সম-দুঃখসুখতা ও সাম্যভাবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইল। তাঁহাদের বংশবিস্তার ও অধিকার বিস্তারের সহিত উক্ত ভাব বরং বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই একজাতীয়, সকলেই একরূপ স্বাধীন, সকলেই আদিম অসভ্যদিগের উচ্ছেদে সমানভাবে দায়ী, সকলেই স্বজাতির উৎকর্ষ-সাধনে তুল্যরূপে তৎপর। বিজিত ভুভাগের মধ্যে যে অংশ যাঁহার ভাগ্যে পড়িল, তিনি স্বগণ * ও পরিজনের সহিত তথায় আসিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। অসভ্যজাতির অতর্কিত আক্রমণ হইতে সেই স্থান রক্ষা করিবার জন্য কেবল দায়ী হইলেন এমন নয়, তথায় আবাদ করিয়া, নিজের ও স্বজনের ভরণপোষণেরও উপায় দেখিতে লাগিলেন। নূতন ঔপনিবেশকের ক্ষমতা ও উপায় অনুসারে তাঁহার অনুজীবিবর্গের সংখ্যা উপচিত হইতে লাগিল এবং ক্রমে বিজিত অসভ্যগণের মধ্যে অনেকে বশীভূত হইয়া তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং তাঁহার পরিজনবর্গ উত্তরোত্তর বাড়িবারই সম্ভাবনা রহিল। তিনি আপন অধিকারের মধ্যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা চালাইতে লাগিলেন এবং সকল বিষয়ে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিবার জন্য সময়ে সময়ে বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। ইহাকেই আমরা পরিজনতন্ত্র (Patriachal government) নামে নির্দ্দেশ করি। কিন্তু আর্য্য ঔপনিবেশিক সম্পূর্ণ যথেচ্ছাচারী ছিলেন না। তাঁহার এই নূতন অবস্থাতে যতদূর সম্ভব, তৎপরিমাণে মাতৃভূমির রীতিনীতি অনুসারে তাঁহাকে চলিতে হইত। বিশেষতঃ আমাদের যত দূর দৃষ্টি, তাহাতে তৎকালে আর্য্য সমাজে কোন জাতিবিভাগ ছিল এমন বোধ হয় না। সকলেই একজাতীয় ছিলেন; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই প্রকার জাতিভেদ প্রথম আর্য্য উপনিবেশের অনেক পরে ঘটিয়াছিল। আমরা এরূপ বলি না যে, তদানীং আর্য্যগণের মধ্যে প্রধান নিকৃষ্ট ভাব ছিল না। প্রধান ও নিকৃষ্ট সম্বন্ধ ব্যতীত কোন মানব সমাজ সংঘটিত ছিল বা হইতে পারে, এরূপ সম্ভব বোধ হয় না। কিন্তু এক জাতীয়দিগের মধ্যে প্রধাননিকৃষ্টভাব ব্যক্তিবিশেষের স্বাতন্ত্র্যবিরোধী নহে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে যে সম্বন্ধ, স্পাটান ও হিলটে যে সম্বন্ধ, রোমীয় ও গ্লাডিয়েটরে যে সম্বন্ধ, লর্ড ও ভিলেনে যে সম্বন্ধ, উহা ভিন্নজাতীয়, যথেচ্ছারমূলক ও স্বাতন্ত্র্যবিরোধী। আদিম আর্য্য ঔপনিবেশিক ও তাঁহার অনুচরবর্গের পরস্পর সম্পর্ক সেরূপ ছিল না; উহা অনেকাংশে মধ্য-ইউরোপের অধিনায়ক ও তাঁহার অনুযাত্রীগণের যে সম্পর্ক তদনুরূপ ছিল। তবে মধ্য-ইউরোপে

* স্বগণ শব্দে এখানে জ্ঞাতি, কুটুম্ব, ও অনুচর। ইহারা সকলেই তখনকার পরিজনের মধ্যে গণ্য।

ফিয়ুডাল প্রণালী আর প্রাচীন ভারতের পল্লীসমাজপদ্ধতি প্রচলিত হইল কেন?

আমরা এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে সাহস করি না। তবে এতদ্বিষয়ে দুই একটি কথা বলিব মাত্র। আর্য্য ঔপনিবেশিক ও মধ্য ইউরোপের অধিনায়ক এই উভয়ের মধ্যে কে অধিক সভ্য ছিলেন, বলিতে পারি না। উভয়েই বলিষ্ঠ, সাহসী ও আধিপত্যপ্রয়াসী এবং উভয়েরই ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার বিজিত জাতি হইতে পৃথক্। কিন্তু এক বিষয়ে সুমহৎ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। মধ্য-ইউরোপের অধিনায়ক যে সকল জাতিকে আক্রমণ করেন; তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অনেক সভ্য ছিলেন এবং তাঁহাদের দেশ বহুকাল পূর্ব্ব হইতে রোমীয় বিধি ব্যবস্থা দ্বারা মার্জ্জিত ও উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তাঁহারা আক্রমণকারীর প্রভূত পরাক্রমের নিকট মস্তক অবনত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের স্বদেশীয় রীতিনীতির প্রাধান্য লোপ হইল না, কেবল বিজেতৃদিগের সংস্রবে আংশিক পরিবর্ত্তন হইল মাত্র। সেই আংশিক পরিবর্ত্তনের ফল ফিয়ুডাল পদ্ধতি।

পক্ষান্তরে আর্য্য ঔপনিবেশিক যে যে প্রদেশ আক্রমণ করিলেন, উহার অধিবাসীরা নিতান্ত অসভ্য ও বর্ব্বর ছিল। তাহারা সাধারণ্যে হয় পর্য্যুদস্ত বা তাড়িত, না হয়, উৎখাত বা দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছিল। তাহাদের আচার ব্যবহার দ্বারা আর্য্যসমাজের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আর্য্য ঔপনিবেশিকেরা মাতৃভূমি হইতে যে সকল আচার ব্যবহার লইয়া আসিয়াছিলেন, তৎসমস্ত দেশ কাল পাত্রের প্রভেদ নিবন্ধন অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইল বটে; কিন্তু সে পরিবর্ত্তন ফিয়ুডাল পদ্ধতির ন্যায় জটিল ও মার্জ্জিত প্রণালীর উপযোগী নহে। সুতরাং উহা হইতে অপেক্ষাকৃত কম জটিল ও কম মার্জ্জিত পল্লীসমাজ প্রণালী উদ্ভূত হইল। পরন্তু গথ, বেণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক অধিনায়কেরা ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করিলে পর জ্যেষ্ঠাধিকার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। উহার ফল মধ্য-ইউরোপের লর্ড সম্প্রদায়। লর্ড সম্প্রদায় হইতে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজস্থিতির যে অবস্থান্তর ঘটে, তাহাই ফিয়ুডাল পদ্ধতিরূপে পরিণত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে এই অনৈসর্গিক নিয়ম কখন প্রচলিত হয় নাই। আর্য্য ঔপনিবেশিকের যত বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তৎপরিমাণে তদীয় অধিকার তাহার বংশধরগণের মধ্যে সমান অংশে বিভক্ত হইতে লাগিল। সমাংশব্যবস্থা, সাম্য ও শান্তির হেতু। কিন্তু সমসম্বন্ধিগণের মধ্যে একের সমগ্র অধিকার ও অন্যান্যের নিরাস কেবল বৈষম্য ও বিরোধের কারণ হইয়া থাকে। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে, ফিয়ুডাল পদ্ধতির ইতিবৃত্ত কেবল অত্যাচার ও বিদ্রোহের কাহিনীতে পরিপূর্ণ; কিন্তু পল্লীসমাজের ইতিহাস শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের

বর্ণনাতে পরিপূর্ণ। প্রথমের উপায় পুরুষকার ও রাষ্ট্রবিপ্লব; কিন্তু দ্বিতীয়ের উপায় দৈব ও নেত্রজল। একের ফল উদ্যোগ ও উন্নতি; কিন্তু অন্যের ফল নিশ্চেষ্টতা ও সমভাব। পুরুষকার ও উন্নতির বিস্তর বৈচিত্র্য আছে; তন্নিমিত্ত উহার বর্ণনা এত সরস ও কৌতুকাবহ। দৈব ও সমভাব সর্ব্বদা একরূপ, উহাতে কিছুই নূতন নাই। সুতরাং উহার বর্ণন নিতান্ত নীরস ও অমোনরম। এই কারণেই ফিয়ুডালপদ্ধতির ইতিহাস এত বহুল ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এবং পল্লীসমাজের ইতিহাস এত সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ।

সংস্কৃত সাহিত্য সংসারের সহিত আমাদের যতদূর পরিচয়, তদনুসারে বলিতে পারি যে, কোন স্থানেই পল্লীসমাজের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়না। কি বেদ কি মনু মিতাক্ষরা, কি রামায়ণ মহাভারত, কি পুরাণ ও উপপুরাণ, কি কাব্যনাটক কোন স্থলেও উহার বিশিষ্ট প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সুপ্রসিদ্ধ প্রণালীর ইতিহাস শৃঙ্খলের কেবল তিনটি মাত্র গ্রন্থি পাওয়া যায়। একটি গ্রীকদিগের বর্ণণাতে, দ্বিতীয়টি আকবরসাহের রাজস্বপ্রণালীতে এবং তৃতীয়টি ইংরাজ কর্ত্তৃক উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বন্দোবস্তসময়ে। কিন্তু এতদ্বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় করিবার পূর্ব্বে একটি সেকেলে ভ্রমের প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। এই ভ্রমটি এদেশীয় নহে; কিন্তু অনেক এদেশীয়ের চিত্ত আক্রমণ করিয়াছে। কারণ, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"।

প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক এল্‌ফিনিষ্টন সাহেব বলেন যে "মনুসংহিতায় পল্লীসমাজ পদ্ধতির প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তরাধিকার ও বন্ধক প্রকরণে এবং যে যে স্থলে নির্ব্বাসিতের বিষয় বাজেয়াপ্ত করিবার কথা আছে, কিম্বা, কোনব্যক্তির ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হইয়াছে, তথায় অন্যান্য সম্পত্তির কথা লেখা আছে, কিন্তু ভূসম্পত্তির কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, তৎকালে পল্লীসমাজ প্রণালী প্রচলিত ছিল; ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিবিশেষের পৃথক স্বত্ব ছিল না। তবে দুই এক স্থলে যে ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বাধিকার নির্দ্দিষ্ট বোধ হয়, তাহার এই রূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে"।

মনুর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।——

"যেঽক্ষত্রিণো বীজবন্তঃ পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ। তে বৈ শস্যস্য জাতস্য ন লভন্তে ফলং ক্বচিৎ" ॥৪৯॥

"ওঘবাতাহৃতং বীজং যস্য ক্ষেত্রে প্ররোহতি। ক্ষেত্রিকস্যৈব তদ্বীজং ন বপ্তা লভতে ফলং" ॥৫৪॥ অর্থাৎ—

"যে ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে অন্যের ক্ষেত্রে বীজ বপন করে, সে তৎক্ষেত্রোৎপন্ন ধান্যাদি পাইবেনা; উহা ক্ষেত্রস্বামীরই হইবেক।

জলের বা বায়ুর বেগবশতঃ একক্ষেত্রে উপ্ত বীজ যদি ক্ষেত্রান্তরে আনীত হইয়া অঙ্কুরিত হয়; তবে তদুৎপন্ন শস্য সেই-

ক্ষেত্রের স্বামীরই হইবেক, প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে বীজ বপনকারীর উহাতে কোন অধিকার নাই।'"

পুনশ্চ চতুর্থ অধ্যায়ে—

"ভূমিদো ভূমিমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুর্হিরণ্যদঃ। গৃহদোঽগ্র্যাণি বেশ্মানি রূপ্যদোরূপমুত্তম"॥৩০॥

"সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে। বার্য্যন্নগোমহীবাসস্তিলকাঞ্চনসর্পিষাং॥৩৩॥

অর্থাৎ—

"ভূমিদানে ভূস্বামিত্ব প্রাপ্ত হয়, স্বর্ণদানে দীর্ঘায়ু, গৃহদানে উত্তম গৃহ, রূপ্যদানে উত্তম রূপ লাভ হইয়া থাকে।

জল দান, অন্নদান, গোদান, ভূমিদান বস্ত্রদান, তিলদান, স্বর্ণদান, ঘৃতদান এই সকলদান অপেক্ষা বেদবিদ্যাদান প্রশস্ত"।

উপরি-উদ্ধৃত চারিটি শ্লোকে যে ভূমিবিষয়ক স্বত্বাধিকার উল্লিখিত আছে, উহা উক্ত ইতিহাসবেত্তার মতে রাজার, বা পল্লীসমাজের; ব্যক্তিবিশেষের নহে।

পরন্তু মনুর অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত আছে যে—

"ক্ষেত্রকূপতড়াগানামারামস্য গৃহস্য চ। সামন্তপ্রত্যয়ো জ্ঞেয়ঃ সীমাসেতুবিনির্ণয়ঃ॥২৬২॥

"গৃহং তড়াগমারামং ক্ষেত্রং বা ভীষয়া হরন্। শতানি পঞ্চ দণ্ড্যঃস্যাদজ্ঞানাদ্দ্বিশতো দমঃ॥২৬৪॥

"সীমায়ামবিষহ্যায়াং স্বয়ং রাজৈব ধর্ম্মবিৎ। প্রদিশেদ্ভূমিমেতেষামুপকারাদিতি স্থিতিঃ"॥২৬৫॥

অর্থাৎ—

"ক্ষেত্র, কূপ, তড়াগ, উদ্যান ও গৃহ ইহাদের সীমা সন্নিহিত অধিবাসীদের সাক্ষ্য দ্বারা নিরূপণ করিবেক।

যদি কেহ ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্যের গৃহ, তড়াগ, উদ্যান বা ক্ষেত্র হরণ করে, তাহার পঞ্চ শত পণ দণ্ড হইবেক; আর অজ্ঞান পূর্ব্বক হরণ করিলে, দুই শত পণ দণ্ড হইবেক। সীমা নির্ণয়ের কোন প্রমাণ না থাকিলে, ধর্ম্মজ্ঞ রাজা স্বয়ং গমনপূর্ব্বক বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে যাহাতে যাহার সুবিধা বা অসুবিধা. তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সীমাংসা করিবেন"।

এই স্থলে ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিবিশেষের পৃথক্ সত্বের যে নির্দ্দেশ আছে, তাহা পল্লীসমাজ বা রাজা হইতে প্রাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিলে, কোন বিপ্রতিপত্তি থাকেনা।

এল্‌ফিনিষ্টন সাহেব যে অভিমত প্রকাশ করিতেছেন, তাহার সারার্থ, এই— "ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বাধিকার পল্লীসমাজ প্রণালীর বিরুদ্ধ; মানবধর্ম্ম শাস্ত্রে উহার কথা প্রায় লিখিত হয় নাই, তবে দুই এক স্থলে যে উল্লেখ আছে, অন্যরূপে তাহার সামঞ্জস্য হইতে পারে। অতএব মনুতে পাকতঃ পল্লীসমাজের প্রমাণই রহিয়াছে"। এস্থলে বক্তব্য এই যে, ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ব শব্দে যদি সম্পূর্ণ ও অনিয়ন্ত্রিত স্বত্ব এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয়,

তাহা হইলে, উহা পল্লীসমাজের বিরুদ্ধ বটে; শুদ্ধ পল্লীসমাজের কেন? ওরূপ স্বত্ব যে কোন সমাজের বিরুদ্ধ। বিজিত-দেশে বিজেতারই ওরূপ স্বত্ব সম্ভবিতে পারে। রুমরাজ্য হইতে ভারতবর্ষীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত যত যথেচ্ছার শাসনপ্রণালী ভূমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত হুই-য়াছে, তাহাতেই তাদৃশ স্বত্বের দাওয়া হইয়া থাকে। ভারতের হিন্দুরাজ্যসকল স্বাধীনতানুরাগী ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট যত কেন একতন্ত্রী (Despotic) বলিয়া প্রতীয়মান হউক না, কদাপি যথেচ্ছাচারী ছিলনা। ব্রাহ্মণসম্প্রদায়, মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র এবং চিরাগত রীতি নীতি অতি-ক্রম করিতে কোন্ রাজা সাহস করিতে পারিতেন? সুতরাং রাজার স্বত্ব ষষ্ঠভাগে পর্য্যবসিত হইত, মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারীর স্বত্ব নিরিখমত খাজনাতে ও রায়তের স্বত্ব উৎপন্ন সশ্যের অবশিষ্ট অংশে চরি-তার্থ হইত। ইহার মধ্যে রাজার ও ভূম্যাধিকারীর স্বত্ব স্থায়ী—কিন্তু প্রজার স্বত্ব সচরাচর অস্থায়ী। ভূম্যধিকারীর স্বত্ব স্থায়ী, কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত নয়। তিনি আপনার জমি ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন না। মণ্ডল, পল্লীসভা বা পঞ্চায়তের মতানুসারে উচিত হারে, যা-হাকে ইচ্ছা, উহা বিলি করিতে পারিতেন এবং প্রজা হইতে নিজে খাজনা গ্রহণ পূর্ব্বক রাজকর আদায় করিয়া লইতেন। মধ্যবর্ত্তী ভূম্যাধিকারী ইচ্ছামত নিজের ভূমি দান বিক্রয় বা বিভাগ করিয়া লইতে পারিতেন; কিন্তু কোন আগন্তুককে দান বিক্রয় করিতে হইলে, পল্লীসভা ও মণ্ড-লের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। উক্ত প্রকার নিযন্ত্রিত স্বত্ব পল্লীসমাজপ্রণালীর বিরুদ্ধ নয়; এবং এরূপ মূল্যহীনও বোধ হয় না যে, উহার দানাদি সম্ভবিতে পারে না। আমরা বর্ত্তমান কালেও দেখিতেছি, যে বঙ্গদেশ ভিন্ন সর্ব্বত্র সংসৃষ্ট ভূসম্পত্তির দানবিক্রয়াদি স্থলে অন্যান্য অংশীর অ-পেক্ষা করিতে হয়, এবং পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তিতে পিতা ওপুত্রের তুল্যরূপ স্বামিত্ব আছে। এ বলিয়া কি মিতাক্ষরার বিধি-ব্যবস্থা ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বাধিকারের বি-রুদ্ধ ও পল্লীসমাজের অনুযায়ী এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে? ফলতঃ মা-নবধর্ম্মশাস্ত্রে ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বাধিকারের বিরুদ্ধ কিছুই নাই; বরং আবশ্যকমত উহার বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,

"এবং সহ বসেয়ুর্বা পৃথগ্বাধর্ম্মকাময়া। পৃথক বিবর্দ্ধতে ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্যাঃ পৃথক্-ক্রিয়াঃ" ॥ ১১১। ৯।

অর্থাৎ

"হয় এই প্রকারে একত্র বাস করিবেক; নতুবা পৃথক্ ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার জন্য পৃথক্ হইয়া অবস্থান করিবেক"। ভূসম্পত্তির অন্ততঃ গৃহাদির বিভাগ ব্য-তীত কিরূপে পৃথক হওয়া সম্ভব? এবং উহাতে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বত্ব না থাকি-লেই বা কিপ্রকারে বিভাগ হইতে পারে?

"বস্ত্রং পত্রমলঙ্কারং কৃতান্নমুদকং স্ত্রিয়ঃ।

যোগাক্ষেমপ্রচারঞ্চ ন বিভাজ্যং প্রচক্ষতে ॥" ২১৯ ॥ ৯ ॥

অর্থাৎ "পারিধেয় বস্ত্র, বাহন, আভরণ, ভক্ষ্য দ্রব্য, কূপাদির জল, দাসী, মন্ত্রী পুরোহিতাদি এবং গোচারণ ভূমি এই কয়েক বস্তুর বিভাগ হয় না।" এস্থলে গোচারণ ভূমির বিভাগ নিষেধ করাতে, অন্যবিধ ভূসম্পত্তির বিভাগ বিহিত হইতেছে। মনুতে স্থাবর ও অস্থাবর শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। ঋক্‌থ, বিত্ত, ধন, দ্রব্য প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত আছে। এই সকল শব্দে স্থাবর অস্থাবর উভয়ই বুঝাইয়া থাকে।

আমরা আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিব না। যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই নিঃসংশয়িত রূপে সাব্যস্ত হইতেছে যে, মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ব আবশ্যক মত বারম্বার স্বীকার করা হইয়াছে। উহার বিরুদ্ধে কোন আভাসই দেওয়া হয় নাই। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিবিশেষের যে কোন স্বত্বাধিকার পল্লীসমাজ প্রণালীর বিরুদ্ধ নহে; বিরুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেও, মনুতে তদ্বিপক্ষে এমন কোন উল্লেখ নাই যে, তাহাকে পল্লীসমাজের অনুকূল প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে।

আমরা এখন প্রদর্শন করিব যে, মনুতে পল্লীসমাজের বিরোধী অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

"গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাৎ দশগ্রামপতিং তথা। বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেবচ॥" ১১৫ ॥ ৮ ॥

"গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনৈকঃ স্বয়ং। শংসেৎ গ্রামদশেশায় দেশেশো বিংশতীশিনম্ " ॥ ১১৬ ॥ ৮ ॥

"বিংশতীশস্তু তৎসর্ব্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ। শংসেৎ গ্রামশতেশস্তু সহস্রপতয়ে স্বয়ম্ ॥" ১১৭ ॥ ৮ ॥

"যানি রাজপ্রদেয়ানি প্রত্যহং গ্রামবাসিভিঃ। অন্নপানেন্ধনাদীনি গ্রামিকস্তান্যবাপ্নুয়াৎ " ॥ ১১৮ ॥ ৮ ॥

"তেষাং গ্রাম্যাণি কার্য্যাণি পৃথক্ কার্য্যাণি চৈব হি। রাজ্ঞোঽন্যঃ সচিবঃ স্নিগ্ধস্তানি পশ্যেদতন্দ্রিতঃ " ॥ ১২০ ॥ ৮

অর্থাৎ

"রাজা প্রত্যেক গ্রামের অধিপতি, দশ গ্রামের অধিপতি, বিংশতি গ্রামের অধিপতি, শত গ্রামের অধিপতি ও সহস্র গ্রামের অধিপতি নিযুক্ত করিবেন"।

'নিজে প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ হইলে, আপনার অধিকারের মধ্যে উদ্ভূত চৌরাদি-দোষ গ্রামিক দশগ্রামপতির নিকট জানাইবেন, দশগ্রামপতি বিংশতিগ্রামপতির নিকট, বিংশতিগ্রামপতি শতগ্রামপতির নিকট, শত গ্রামপতি সহস্র গ্রামপতির নিকট, নিবেদন করিবেন।"

"অন্ন, পানীয়, ইন্ধন প্রভৃতি যাহা কিছু গ্রামবাসীদের নিকট হইতে রাজার প্রত্যহ প্রাপ্য, তৎসমস্ত হইতে গ্রামিক জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।"

"গ্রামবাসীদিগের গ্রামসম্বন্ধীয় ও অ-

ন্যান্য কার্য্য, রাজার হিতকারী একজন সচিব অনলসভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।”

মনুর মতে প্রত্যেক গ্রামে এক এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিবেন। তিনি রাজার নিযুক্ত এবং রাজপ্রাপ্য দ্রব্য হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। তাঁহাকে দশগ্রামপতির অধীনে শান্তিরক্ষা প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবেক এবং এক জন স্বতন্ত্র রাজকর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানের মধ্যে থাকিয়া, চলিতে হইবেক। অতএব স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে, এরূপ শাসনপ্রণালী পল্লীসমাজের অনুরূপ নয়। ইহাতে রাজাই সর্ব্বে সর্ব্বা, গ্রামবাসীদের কোন প্রকার অধিকারই নাই।

পুনশ্চ,

“গ্রামীয়ককুলানাঞ্চ সমক্ষং সীম্নি সাক্ষিণঃ। প্রষ্টব্যাঃ সীমলিঙ্গানি তয়োশ্চৈব বিবাদিনোঃ”॥ ২৫৪ ॥ ৮ ॥

“সাক্ষ্যভাবে তু চত্বারো গ্রামাঃ সামন্তবাসিনঃ। সীমাবিনির্ণয়ং কূর্য্যুঃ প্রযতা রাজসন্নিধৌ” ॥ ২৫৮ ”॥ ৮ ॥

“সামন্তানামভাবেতু মৌলানাং সীম্নি সাক্ষিণাং। ইমানপ্যনুযুঞ্জীত পুরুষান্ বনগোচরান্ ”॥ ২৫৯ ॥ ৮ ॥

“ব্যাধান্ শাকুনিকান্ গোপান্ কৈবর্ত্তান্ মূলখানকান্। ব্যালগ্রাহানুঞ্ছবৃত্তীনন্যাংশ্চ বনচারিণঃ ”॥ ২৬০ ॥ ৮॥

“দুই গ্রামের সীমা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, উভয়গ্রামবাসী জনসমূহের নিকটে এবং উভয় গ্রামের মনোনীত বাদী প্রতিবাদীর সমক্ষে সাক্ষীদিগকে সীমার চিহ্নবিষয়ক প্রশ্ন করিবেন। সাক্ষীর অভাব হইলে, সীমার সন্নিকটস্থান-বাসী চারি জন লোক রাজার সন্নিধানে ধর্ম্মানুসারে সীমা নির্ণয় করিবেক। তদভাবে, ব্যাধ, শাকুনিক, গোপ, ধীবর, সাপুড়ে, বেদে, উঞ্ছবৃত্তিশীল এবং অন্যান্য বনচারীগণের সাক্ষ্য হইতে সীমা নিরূপণ করিবেন।” আমরা এই উদ্ধৃত অংশটি পল্লীসমাজের সম্পূর্ণ বিপরীত মনে করি। পল্লীসমাজ প্রণালী তৎকালে প্রচলিত থাকিলে, উভয় গ্রামের মণ্ডল, পাটোয়ারী কোটাল ও পল্লীসভাকে কোন কথা না বলিয়া রাজা নিজে সীমা নির্ণয় করিবেন, এরূপ কখনই বর্ণিত হইত না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যদি এক গ্রাম স্থিত ক্ষেত্র, কূপ তড়াগ প্রভৃতির সীমা লইয়া বিবাদ ঘটে, তাহা হইলে রাজা সীমার সন্নিহিতস্থান-স্থিত গ্রামের অধিবাসীদের সাক্ষ্য দ্বারা নিরূপণ করিবেন; আর যদি কোন প্রমাণ পাওয়া না যায়, তবে স্বয়ং গমন পূর্ব্বক বাদী প্রতিবাদীর সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সামঞ্জস্য করিবেন। পল্লীসমাজের অন্তর্গত ক্ষেত্রাদির সীমাবিষয়ক কাগজপত্র পাটোয়ারীর হস্তে ন্যস্ত থাকে, এবং যাহাতে কোন সীমার অতিক্রম না হয়, কোতোয়াল তাহার খপরদারী করেন। মণ্ডল এই উভয়ের উপর তত্ত্বাবধারণ করেন। মনুমতে গ্রামসকল পল্লীসমাজভুক্ত হইলে, তদন্তর্গত ক্ষেত্রাদির সীমানির্ণয়স্থলে উক্ত কর্ম্মচারীদিগের যে একবারে উল্লেখ পর্য্যন্ত হই-

থেক না, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

তবে কি মানবধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্কলন কালে পল্লীসমাজের কোন চিহ্ন ছিলনা? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এপর্য্যন্ত বলিতে পারি যে "ছিল" কি "ছিলনা" তদ্বিষয়ে কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়না; কিন্তু "ছিল" যে তাহার অস্পষ্ট ও আনুমাণিক প্রমাণের অভাব নাই। পল্লীসমাজে সাধারণ অধিবাসীদের যে প্রকার স্বাধীনতা আবশ্যক, উহা ভারতরাজ্যে কথনই সম্ভবপর বোধ হয় না; কেবল আদিম আর্য্য ঔপনিবেশিকগণের অধিকার বিস্তার কালের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীতি হয়। যৎকালে মনুসংহিতা সঙ্কলিত হয়, তখন একতন্ত্রী শাসনপ্রণালীর প্রাদুর্ভাব এবং ব্রাহ্মণজাতির প্রভাব অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যে রাজ্যে রাজা ও পুরোহিতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তথায় প্রজাসাধারণের কোন স্বাধীনতা ও স্বত্বাধিকার দেখা যায় না। সুতরাং মনুর সময়ে পল্লীসমাজের নিতান্ত হীন অবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু একবারে লোপ হয় নাই। যদি তাই হইবে, তবে পরে উহার উল্লেখ পাওয়া যাইবে কেন? মনুর পরে ভারতভূমিতে হটাৎ স্বাধীনতা বিরাজমান হইয়া পল্লীসমাজপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। এই মহাদেশের ইতিহাসের মধ্যে আর যাহা কিছু জানা যাউক আর নাই যাউক, ইহাতে যে আবহমান একতন্ত্রী শাসনপ্রণালী ও ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের প্রভুত্ব খাটিয়া আসিতেছে, তদ্বিষয়ে দ্বৈধ নাই।

অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি বিবরণ।

আর্য্য জাতিরা যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়াছেন এমন বিষয়ই অপ্রসিদ্ধ। পূর্ব্বকালে ভারতের আর্য্যেরা অনুমান বলে জগতের যে সকল তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, নানাবিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাও অধুনা তাদৃশ তত্ত্বাবধারণ হইতেছেনা।

এই প্রস্তাবটী যে বিষয় অবলম্বন করিয়া লিখিত হইতেছে তাহা পাঠ করিলে সাধারণতঃ এই বোধ হইবে যে একটী সামান্য প্রবাদ বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়া ভারতীয় কৃষকেরা প্রত্যেক বর্ষের ভাবিনী অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি নিরূপণ করিয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহারা যে প্রবাদ বাক্যকে সারাৎ সার জ্ঞানে বর্ষমধ্যে সুভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষাদি ঘটনা ধ্রুবনিশ্চয় করিয়া দেয় তাহা কদাচ অমূলক নহে। অবশ্য তাহার মূল আছে। যে মূল হইতে কৃষকগণের প্রবাদ বাক্য

নির্গত হইয়াছে উহা লোকহিতৈষী মহামহোপাধ্যায় মহর্ষি পরাশর ঋষি প্রণীত স্মৃতিসংহিতার কৃষিসংগ্রহের বৃষ্টিবিষয়ক প্রস্তাব হইতে উদ্ধৃত। প্রবাদবাক্যটী বাঙ্গালা কবিতায় রচিত। কবিতাটী কত কালের তাহার স্থিরতা নাই। স্থির করাও সহজ ব্যাপার নহে। এজন্য সে চেষ্টা পরিত্যাগ করা গেল কবিতাটী দেখিয়া যিনি যাহা অনুমান করেন করুন, আমরা তদ্বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে একথা অবশ্য বলা উচিত যে এটী বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। অন্যান্য প্রদেশেও নিম্নলিখিত প্রবাদ বাক্যের সমানার্থক অথবা মর্ম্মানুযায়ী কোন কথা অবশ্য আছে। পরাশরের মত অতীব প্রাচীন ও মান্য; সুতরাং তদীয় সংস্কৃত বচনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যান দ্বারা প্রচলিত ভাষা সমূহের মধ্যে নিতান্ত পক্ষে এক একটী প্রবাদ বাক্যও রচিত হইয়া থাকিবে। উক্ত মুনিবরের বচনানুসারে বঙ্গভাষায় যে প্রবাদবাক্য সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার সহিত সংস্কৃত বচন মিলন করিয়া দেখিলে আর্য্যদিগকে ধন্যবাদ দিতে হইবে।

বাঙ্গালা প্রবাদ-বাক্য-সমূহের এক লেশ মাত্র প্রদর্শিত হইল। যথা,—

আষাঢ় নবমী শুকুল পখা।
তাতে আছে জলের লেখা॥
যদি বর্ষে ইমি ঝিমি।
শস্যের ভার না সহে মেদিনী॥
যদি বর্ষে কণা।
পর্ব্বতে লাগে সমুদ্রের ফেণা॥
যদি বর্ষে মুষলধারে।
মধ্য সমুদ্রে বগুলা চরে॥
যদি সূর্য্য হেসে বসে পাটে।
চাসার গোরু বিকায় হাটে॥

চাসাদিগের প্রবাদ বাক্যের সাধুভাষা করিলে এইমাত্র জানা যায় যে, আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয় নবমী তিথিতে বৃষ্টির গণনা স্থির করিতে পারিলে বর্ষাকালের সমুদায় লক্ষণ পরিস্ফুট রূপে স্থির করা যায়। ইহারা যে তিথিটীকে অবলম্বন করিয়া বৃষ্টি গণনা করে সে তিথিটী ভারতবর্ষের সকল লোকের স্মরণ থাকিবার সম্ভাবনা। ঐ দিন রথযাত্রার নবমী (উল্টারথের পূর্ব্ব দিবস)।

ইমি ঝিমি বৃষ্টি—স্বল্পপরিমিত-ধারা-সম্বলিত মন্দ মন্দ বৃষ্টি।

কণা—বাষ্পাকারে অনেকক্ষণ-স্থায়িনী বৃষ্টি সম্পাত।

পর্ব্বতে লাগে সমুদ্রের ফেণা—অত্যন্ত জলপ্লাবন হয়।

মধ্য সমুদ্রে বগুলা চরে—অনাবৃষ্টি হেতু প্রশস্ত নদ নদী প্রভৃতি জলাশয় পরিশুষ্ক হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং তথায় বক প্রভৃতি সামান্য জলচর পক্ষী মধ্যস্থলে বসিয়া বিরাম করিতে পারে।

যদি সূর্য্য হেসে বসে পাটে—অস্ত গমন কালে যদি সূর্য্য প্রখর তেজ প্রকাশ পূর্ব্বক মেঘাদি হইতে অনাবৃত ভাবে অন্তর্হিত হন, তবে সে বৎসর নিশ্চয়

দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা এবং তন্নিবন্ধন চাসা নিরন্ন হয়।

এখন পরাশরের বচন দেখ।

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে নবম্যাং যদি বর্ষতি।
বর্ষত্যেব সদা দেব স্তত্রাবৃষ্টৌ কুতোজলং ॥
শুক্লাষাঢ়ীনবম্যামুদয়গিরিতটী নির্ম্মলত্বং প্রয়াতে।
স্বীয়ং কালং বিধত্তে খরতরকিরণো মণ্ডলাকারমুখ্যাম্ ॥
জীমূতৈ র্বেষ্টিতোঽসৌ যদি ভবতি রবির্গম্যমানোঽস্তশৈলে।
তাবৎপর্য্যন্তমেব প্রপতি জলদো যাবদস্তং তুলায়াঃ ॥

পরাশরস্মৃতিঃ; কৃষিসংগ্রহঃ।

বাঙ্গালা প্রবাদ বাক্যটী সংস্কৃত বচন অপেক্ষা তত্ত্ব নির্ণয় পক্ষে বিশেষ অগ্রসর বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সংস্কৃত বচনে সামান্যতঃ উল্টারথের দিনের বৃষ্টি পতন ও তদ্দিবসীয় বৃষ্টির অভাব মাত্র কথিত হইয়াছে। বাঙ্গালা প্রবাদ বাক্যে (জনশ্রুতিতে) ঐ দিনের বৃষ্টিগত অবস্থার তারতম্য দ্বারা অনেক বিষয়ের বিপর্য্যয় গণনা ও সুস্থিরীকৃত হইয়াছে; সুতরাং অভিজ্ঞতা বিষয়ে জনশ্রুতি রচনা কালীন কৃষকেরা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল একথা অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালা জনশ্রুতিটীতে সূর্য্যের উদয় কালের নির্ণয় নাই, কিন্তু ঐ দিনের অস্তগমনটী পরিস্ফুট রূপে কথিত হইয়াছে। বোধ হয় কেবল অস্তকালের গণনা দ্বারাই অধিকাংশ স্থলে অনুমান হইতে পারে বলিয়াই উদয় কালের কথা পরিত্যক্ত হইয়াছে অথবা আমরা জানিনা।

উদয়কালে উদয়াচল ও তৎপ্রদেশ মেঘনির্মুক্ত থাকিবে, সূর্য্যও তদীয় উদয় কালে প্রখর কিরণমালায় বেষ্টিত হইয়া সম্পূর্ণ মণ্ডলাকারে পরিদৃশ্যমান হইবেন। অস্তগমন কালে মেঘরাজী দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অস্তগমন করিবেন এবং তৎকালে যদি ঐ সমস্ত জীমূতবৃন্দের ধ্বনি শুনিতে শুনিতে সূর্য্য অস্তাচল-চূড়ায় আরোহণ করেন তাহা হইলে কার্ত্তিকমাসের শেষ পর্য্যন্ত জলদাগমের সম্ভাবনা থাকে, যে প্রদেশের লোকেরা উল্টারথের দিন এইরূপ অবস্থা দেখে তৎপ্রদেশস্থ সুবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির বিষয় বুঝিতে হইবে অন্যত্রস্থ বিষয় নহে।

পৌষ মাসে বার মাস কর পরিমাণ।
আড়াই দিনেতে ধর মাসের গণন ॥
আড়াই দিনেরে কর সম ত্রিশ খণ্ডা।
প্রতি মাসের দিনের সংখ্যা সয়া গণ্ডা ॥
ইথে শীত বাত যাহা কর নিরূপণ।
সেই অনুসারে হৈবে শৈত্যাদি গণন ॥

এই জনশ্রুতিটীরও মূল আছে। ইহাও অল্প দিন রচিত হয় নাই। বোধ হয় কিছুকাল পূর্ব্বে সামান্য আকারে ছিল, ক্রমে পণ্ডিতবর্গের বাক্চাতুরীতে কালের গতি ও লোকের রুচি অনুসারে পরিষ্কৃত ছন্দোবদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। এই প্রবাদ বাক্যের মূল অনুসন্ধান করিলে পরাশরকেই ধরিতে হয়।

মানবগণ সাংসারিক অনেক কার্য্যে উক্ত ঋষিপ্রবরের নিকট দায়ী। তদীয় বচন গুলি নিম্নে লিখিত হইল। মিলন করিয়া দেখিলে তাঁহার শ্রীচরণে শত শতবার প্রনিপাত করিতে কাহার না ইচ্ছা জন্মিবে, তাহা বলিয়া উঠিতে পারিনা।

সার্দ্ধ দিনদ্বয়ং মানং কৃত্বা পৌষাদিনা বুধঃ।
গণয়েন্মাসিকীং বৃষ্টিমবৃষ্টিং বানিলক্রমাৎ॥
সৌম্যবারুণয়োর্ব্বৃষ্টিরবৃষ্টিঃ পূর্ব্বযাম্যয়োঃ।
নির্ব্বাতে বৃষ্টিহানিঃস্যাৎ সঙ্কুলেসঙ্কুলংজলং॥
একৈকং পঞ্চদণ্ডেন মাসস্য দিবসো মতঃ।
পূর্ব্বার্দ্ধে বাসরী বৃষ্টিরুত্তরার্দ্ধেচ নৈশিকী॥
দণ্ডাদণ্ডে পতাকাস্থ বাতস্যানুক্রমেণ চ।
বিজ্ঞেয়া মাসিকী বৃষ্টিদৃষ্ট্বা বাতং দিবানিশং॥
ধূলীভিরেব ধবলীকৃতমন্তরীক্ষং
বিদ্যুচ্ছটাচ্ছুরিতবারুণদিগ্বিভাগম্।
পৌষে যদা ভবতি মাসি সিতেচ পক্ষে।
তোয়েন তত্র সকলা প্লবতে ধরিত্রী॥
পৌষে মাসি যদা বৃষ্টিঃকুজ্ঝটিকা যদা ভবেৎ।
তদাদৌ সপ্তমে মাসি তাং তিথিং প্লাব্যতে মহীম্॥

লোকে কহিয়া থাকেন পৌষ মাসের যে দিন বৃষ্টি অথবা কুজ্ঝটিকা হয় তদবধি করিয়া ১৮১ দিনের দিন নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে। কিন্তু এ প্রকার গণনা পরিশুদ্ধ নহে। বচনানুসারে ধরিতে গেলে ইহাই স্থির করিতে হয় যে পৌষ মাসের যে পক্ষের যে তিথিতে কুজ্ঝটিকাদি হয় তদাদি করিয়া সপ্তমাসের সেই পক্ষে সেই তিথিতে নিশ্চয় বৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু পৌষ মাসের দিনসংখ্যার গণনার স্থির করা যায় না। পরাশর ঋষি তিথির উপরে নির্ভর করিয়া কৃষিসংগ্রহের বচন স্থির করিয়াছেন। অন্যান্য বিষয় পরে কহিব ইতি।

শ্রীলাল—

শত্রুসিংহ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নিশীথে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রাত্রি দুই প্রহর এখন প্রকৃতির অচেতন অবস্থা—প্রকৃতি নিস্পন্দ নিশ্বাসরহিত। প্রকৃতি নির্জীবের ন্যায় ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। প্রকৃতির প্রাণ-বায়ু ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যেন লোকান্তরে গিয়াছে, প্রাতঃসমীরণের সহিত আবার স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইবে। এখন সময়ের গতি তিরোহিত হইয়াছে, অতীত ও ভবিষ্যৎ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল বর্ত্তমান স্থির—নিশ্চল অক্ষয় বর্ত্তমান স্থিরভাবে রাজত্ব করিতেছে। সকলেই নিদ্রিত। আকাশের গ্রহ নক্ষত্র সকল নিদ্রিত, পৃথি-

রীয় বৃক্ষ পর্ব্বতাদি নিদ্রিত, অগাধ অতল-স্পর্শ, অসীম মহাসমুদ্র নিদ্রিত। পৃথিবীর জীব জন্তু সকলেই নিদ্রিত।

এ ঘোর নিশীথ সময়ে কাহার নিদ্রা নাই?

যাহার মন সর্ব্বদা কুকর্ম্মে নিরত, সেই অধার্ম্মিকের নিদ্রা নাই।—দুরাকাঙ্ক্ষা যাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে সেই অতৃপ্ত-হৃদয়ের নিদ্রা নাই।— অর্থলালসা যাহার জীবনের বলবতী বৃত্তি সেই লোভ-গ্রস্তের নিদ্রা নাই।— শত্রু-নিপীড়নে যাহার হৃদয় সদা দগ্ধ হইয়া যাইতেছে সেই নিপীড়িত বীর্য্যবানের নিদ্রা নাই।— কারাবরুদ্ধ নির্দ্দোষ-হৃদয়ের নিদ্রা নাই।— পর-হিত-জীবন মহীয়ানের নিদ্রা নাই।— প্রভুর হিতাকাঙ্ক্ষী কর্ত্তব্য-প্রিয় গুরুভার-গ্রস্ত হিতাহিতজ্ঞ ধার্ম্মিকবর ভৃত্যের নিদ্রা নাই।—হতাশ-প্রণয় যুবক যুবতীর নিদ্রা নাই।—

মঙ্গলপট্টনের মন্ত্রিবর জগন্নাথের নিদ্রা নাই।— রাজমহিষীর ভগ্নীসুত বলদেব সিংহের নিদ্রা নাই।— বাহুবলেন্দ্রের হিত-চিন্তা জগন্নাথের নিদ্রা লোপ করিয়াছে।—বলদেবের প্রণয়াঙ্কুরে নিরাশা-কীট আসিয়া তাহার হৃদয়ের শান্তি বিনষ্ট করিয়াছে। বলদেবের নিদ্রা লোপ করিয়াছে।

বাহুবলেন্দ্রের নিকট হইতে বিদায় হইয়া জগন্নাথ আপন আবাসে আপন শয়ন-গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। জগন্নাথের আবাস বাটী রাজবাটীর অতি সন্নিকট— রাজবাটীর সহিত সংলগ্ন। রাজবাটীর এক অংশ মাত্র।

জগন্নাথের শয়নগৃহ অতি সামান্যভাবে সজ্জিত—গৃহসজ্জা নাই বলিলেই হয়। এক খানি খাটের উপর শয্যা। জগন্নাথ তাহাতেই একাকী শয়ন করেন। তিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই। ঘরের দেওয়ালের গায়ে কতক গুলি তক্তা লাগান তাহাতে কতক গুলি খেরোয় জড়ান হস্ত-লিখিত পুথী সাজান রহিয়াছে। শয্যার নিকটে একটী ত্রিপদের উপর একটী আলোক জ্বলিতেছে। জগন্নাথ শয্যায় অর্দ্ধ-শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার নয়নদ্বয় অর্দ্ধ-মুদ্রিত।—রাত্রি দুই প্রহরেরও অধিক, জগন্নাথের এখনও নিদ্রা নাই, নিদ্রার উদ্রেকও নাই। তাঁহার মন চিন্তায় নিমগ্ন। জগন্নাথ স্বভাবতঃ ধর্ম্মভীরু—দয়ালু—নির্ব্বিবাদী। পরপীড়ন—পরের সহিত বিবাদ করিতে তাঁহার আন্তরিক অনিচ্ছা—ভয়। প্রভু শত্রুসিংহের সহিত ঘোর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন—জগন্নাথের চিত্তের শান্তি দূর হইল।—অনেক চেষ্টা করিয়াছেন—অনেক বুঝাইয়াছেন বাহুবলেন্দ্র কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। জগন্নাথ কি করেন।—প্রভুর যাহাতে মঙ্গল হয়—যাহাতে তিনি বিবাদে পরাস্ত না হন এই চেষ্টা করাই এখন জগন্নাথের একমাত্র কর্ত্তব্য।—বাহুবলেন্দ্র অন্যায় বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—অধর্ম্মে ঝাঁপ দিতেছেন—জগন্নাথ তথাপি প্রভুকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।—প্রভুকে

পরিত্যাগ করিলে মন্ত্রি-ধর্ম্ম রক্ষা হয় না,—জগন্নাথের গুরুতর পাপ হয়।

জগন্নাথের মনে সুখ নাই—শান্তি নাই।—এক দিকে কর্ত্তব্যানুরোধ, শিক্ষা-বল—অপর দিকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ভীরুতা তাঁহার চিত্তকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতেছে—আন্দোলিত করিতেছে।—ক্রমে শিক্ষাবল ও কর্ত্তব্যানুরোধ ধর্ম্মভীরুতাকে পরাজিত করিল—জগন্নাথের মন কতক পরিমাণে শান্ত হইল।

শক্রসিংহ অতি পরাক্রমশালী সুচতুর। শক্রসিংহের লোকবল অনেক অধিক। বাহুবলেন্দ্র একাকী তাঁহার সহিত বিবাদে নিশ্চয়ই পরাস্ত হইবেন। বাহুবলেন্দ্রের সহায় লাভ নিতান্ত আবশ্যক। জগন্নাথ যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন—তাহাতে মহাবলসিংহ নিশ্চয়ই বাহুবলেন্দ্রের সহায় হইবেন।—বাহুবলেন্দ্রের জয়াশা অনেক বলবতী হইয়াছে।—জগন্নাথের মন কতক পরিমাণে শান্ত হইল।

শক্রসিংহ বিবাদে পরাস্ত হইবেন। প্রভুর জয় হইবে—জগন্নাথের আনন্দ হইল।—কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর এক চিন্তা তাঁহার মনকে আকুল করিল।—শক্রসিংহ তেজস্বী—বলদৃপ্ত। তিনি জীবন থাকিতে কখনই বাহুবলেন্দ্রের নিকট পরাজয় স্বীকার করিবেন না। যদি শক্রসিংহ এই বিবাদে জীবন বিসর্জ্জন করেন তবে ইন্দিরা দেবীর কি হইবে?

জগন্নাথ ইন্দিরাকে কন্যার অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। ইন্দিরার মঙ্গল-চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগরূক।—ইন্দিরার অমঙ্গল-আশঙ্কা করিয়া তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল, চক্ষে জল আসিল।

সহসা জগন্নাথের ঘরের কবাট উদ্ঘাটিত হইল।—কবাট অনর্গল ছিল। এক জন যুবা পুরুষ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।—জগন্নাথ চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন কিছুই জানিতে পারিলেন না।

যুবকের বয়স প্রায় বাইশ বৎসর। আকৃতি খর্ব্ব, স্থূল। বর্ণ গৌর কিন্তু কান্তিশূন্য, মস্তকের কেশ ঈষৎ পিঙ্গল-বর্ণ। ওষ্ঠে ও চিবুকে অল্প অল্প শ্মশ্রু, তাহাও মস্তকের কেশের সমবর্ণ। নেত্রদ্বয় উজ্জ্বল, মার্জ্জার-নেত্রের ন্যায়; কিন্তু তাহাতে মনোহারিত্বের লেশমাত্র নাই। যুবককে দেখিলেই বোধ হয় মূর্ত্তিমতী ধূর্ত্ততা হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছে, সরলতার সহিত তাঁহার চির-শক্রতা। যুবকের পরিচ্ছদ সুচিক্কণ, রঙ্গীন রেশমী কাপড়ের পায় জামা ও চাপকান স্থূল অঙ্গ আবৃত করিয়াছে, পায়ে জরীর জুতা। কর্ণে বহুমূল্য বীরবউলী। মস্তকে উষ্ণীষ নাই। পিঙ্গলবর্ণ কেশগুলি কার্ত্তিকের চুলের মত চারিদিকে ঝুলিতেছে। কটিদেশে সুবর্ণ-খচিত একটী কটিবন্ধন তাহাতে একখানি অসি লম্বমান, অসির মুষ্টিপ্রদেশ সুবর্ণ-নির্ম্মিত।

যুবক ঘরে প্রবেশ করিলেন, জগন্নাথ এখনও চিন্তায় নিমগ্ন। জগন্নাথকে সম্বোধন করিতে যুবকের সাহস হইল না। তিনি স্থির ও নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন,

জগন্নাথের চিন্তা-স্রোতের বেগ ক্রমে হ্রাস হইল। তাঁহার নেত্র সহসা উদ্‌ঘাটিত কবাটের দিকে ধাবিত হইল। দেখিলেন রাজমহিষীর ভগ্নীসুত বলদেবসিংহ কবাটে পৃষ্ঠ দিয়া দাণ্ডায়মান আছেন।

বলদেবসিংহকে দেখিবামাত্র জগন্নাথের মুখে বিরক্তির চিহ্ন উদিত হইল। কিন্তু সে চিহ্ন ক্ষণিক। জগন্নাথ তৎক্ষণাৎ মনের ভাব গোপন করিলেন, কৃত্রিম প্রফুল্লতায় মুখ প্রফুল্লিত করিলেন। জগন্নাথ চতুর—মনে করিলেন,বলদেব কিছুই দেখিতে পান নাই, কিছুই বুঝিতে পান নাই। জগন্নাথ ঠকিলেন। বলদেব দেখিয়াছেন বুঝিয়াছেন। বলদেব জানেন জগন্নাথ তাঁহাকে দেখিতে পারেন না। কিন্তু বলদেব এখন দেখিয়াও দেখিলেন না, বুঝিয়াও বুঝিলেন না।

যে কারণে ইন্দিরা দেবী জগন্নাথের অকৃত্রিম স্নেহের পাত্র, জগন্নাথের কন্যার ন্যায় প্রিয়তমা, সেই কারণেই বলদেব তাঁহার বিদ্বেষের আধার, সে কারণ কি পাঠক শীঘ্রই জানিতে পারিবেন।

জগন্নাথ বলদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যেন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"এত রাত্রিতে আপনি এখানে ?"

বলদেব উত্তর করিলেন—প্রশ্নান্তর দ্বারা উত্তর করিলেন।

"মঙ্গলপট্টনের মন্ত্রিবরের গৃহে কি বলদেবসিংহের সকল সময়েই অবারিত দ্বার নহে ?"

বলদেবসিংহের উত্তর জগন্নাথের কাণে বড় ভাল লাগিল না। জগন্নাথ বলদেবের প্রকৃতি বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন, বলিলেন।

"জগন্নাথের নিকট সকলেরই সকল সময়ে সমান অধিকার।"

জগন্নাথের উত্তর শুনিয়া বলদেব কিছু সংকুচিত হইলেন, কিছু কুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার মনে ক্রোধেরও ঈষৎ সঞ্চার হইল। মনে মনে যাহাই হউক বাহিরে কিছুই প্রকাশ পাইল না।

জগন্নাথ বলদেবকে বসিতে বলিলেন। বলদেব তাঁহার শয্যার এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

জগন্নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "এত রাত্রিতে আমার নিকট আপনার কি কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে ?"

"মহারাজের সহিত আপনার অদ্যকার পরামর্শের ফল কি হইল জানিতে ইচ্ছা করি।"

"আপনার অজ্ঞাত কিছুই থাকিবেনা। আমি না বলিলেও আপনি সমস্ত অবগত হইবেন।"

"মঙ্গলপট্টনের মন্ত্রিবর কি বলদেবসিংহের নিকট মহারাজের কোন অভিসন্ধি গোপন করিতে ইচ্ছা করেন ?"

"গোপন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও জগন্নাথের সে ক্ষমতা কোথায় ?"

"বলদেব সিংহ কি বাহুবলেন্দ্রের পর ?"

"বলদেবসিংহ বাহুবলেন্দ্রের মহিষীর পরমাত্মীয়।"

বলদেবসিংহের শরীর সহসা কম্পিত হইল। মার্জ্জার-নয়নের-স্বাভাবিক ভাব ঈষৎ বিকৃত হইল। জগন্নাথ দেখিলেন মনে মনে হাসিলেন।

জগন্নাথের স্থির—উজ্জ্বল—শঙ্কা-শূন্য প্রশান্ত নয়নদ্বয় বলদেবের মুখের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল—অমনি বলদেবের মুখের স্বাভাবিক ভাব প্রত্যাবৃত্ত হইল।

ঈষৎ মৃদুস্বরে বলিলেন।

"আপনি কি এখনও মহারাজের অভিলাষের প্রতিরোধ করিতেছেন?"

"জগন্নাথের সে ক্ষমতা থাকিলে মঙ্গলপট্টনের মঙ্গল হইত।"

বলদেবের মুখ অল্প প্রফুল্ল হইল। জগন্নাথ বাহুবলেন্দ্রের অভিসন্ধি পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই শুনিয়া বলদেবের হৃদয় আশ্বস্ত হইল, বলদেবের মনে একটু সাহসও হইল—বলিলেন।

"মহারাজের অভিলাষানুরূপ কার্য্য হইলে মঙ্গলপট্টনের কিসে অমঙ্গলের সম্ভাবনা?"

"শত্রুসিংহের পরাক্রম বিশেষরূপে অবগত থাকিলে এরূপ প্রশ্ন করিতে হয় না।"

"যখন যুদ্ধ-ঘটনা উপস্থিত হইবে তখনই—এ প্রশ্নের মীমাংসা হইবে।"

জগন্নাথ আর থাকিতে পারিলেন না। উত্তর করিলেন।

"যে যুদ্ধে বলদেবসিংহ সেনাপতি-সেখানে পরাজয়ের সম্ভাবনা কি?"

জগন্নাথের এই অবজ্ঞা-সূচক ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণ করিয়া বলদেবের আপাদ মস্তক জলিয়া উঠিল। মনে করিলেন কটিদেশস্থ অসি দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তক ছেদন করেন, মনে করিলে কি হয় জগন্নাথের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে তাঁহার সাধ্য কি?

জগন্নাথের একগাছী—কেশ স্পর্শ করিতে বাহুবলেন্দ্রের সাহস হয়না—বলদেবত কোন ছার। মঙ্গলপট্টনের ভাল, মন্দ, সুখ, দুঃখ, সকলই জগন্নাথের হাত। বাহুবলেন্দ্রের রাজ্য-চক্র জগন্নাথের ইচ্ছানুসারে ঘুরিতেছে। জগন্নাথের হস্তে চক্রের যষ্টি। জগন্নাথ থামিলে চক্র থামে, জগন্নাথ চালাইলে চক্র চলে। প্রজামণ্ডলী, ভৃত্যবর্গ, সৈন্য সামন্ত সকলই জগন্নাথের অনুগত জগন্নাথের প্রিয়, জগন্নাথের মঙ্গলে তাহাদের মঙ্গল। বলদেব ইহা বিশেষ রূপে জানেন। জগন্নাথের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে—প্রকাশ্যে তাঁহার সহিত কোন রূপ বিপক্ষতাচরণ করিতে সাহস করিলেন না। জানিয়া শুনিয়া কিরূপে সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইবেন। চারিদিক বিবেচনা করিয়া বলদেবসিংহ পূর্ব্বাপেক্ষা বিনীতভাব ধারণ করিলেন। শত্রুসিংহের কথা পরিত্যাগ করিয়া তিনি তাঁহার কার্য্যের কথা উত্থাপন করিলেন।—বলদেবসিংহের মুখ বিমর্ষ ভাব ধারণ করিল। নেত্রদ্বয়ও ঈষৎ জ্বল জ্বল করিতে লাগিল। কণ্ঠস্বরও কিছু বিকৃত হইল। স্বর আপাদ-মস্তক হইলনা বটে কিন্তু প্রায় সেইরূপ। বলিলেন "মন্ত্রি-

বস্ত্র। আমার সুখ দুঃখ—আমার জীবন আপনার উপর নির্ভর করিতেছে। ইন্দিরাকে না পাইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। আপনি দয়া না করিলে আমার আর উপায় নাই।”

বলদেবের ধূর্ত্ততা দেখিয়া—এই কপট বিনীত ভাব—দেখিয়া জগন্নাথ মনে মনে হাসিতে লাগিলেন—বলদেবের প্রতি তাঁহার ঘৃণা আরও বাড়িতে লাগিল। তাহাকে পশুর অপেক্ষা নীচ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, বলিলেন।

“সর্পের সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহার মাতার মণি-গ্রহণে অভিলাষ—নিতান্ত বাতুলের কায। মহারাজ শত্রুসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন আর তুমি তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী—ইহা শুনিলে লোকে হাস্য করিবে।”

“শত্রুসিংহ যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাঁহার কন্যা-রত্ন দুর্লভ হইবেনা।”

জগন্নাথের মুখে হাসি আসিল—তিনি আর কিছুই বলিলেন না।

বলদেব দেখিলেন জগন্নাথের মন নরম হইবার নহে। তাঁহার সহিত আর বাক্য-ব্যয় করাও অনর্থক। রাত্রিও ক্রমে অধিক হইতে লাগিল। জগন্নাথকে প্রণাম করিয়া—গাত্রোত্থান করিলেন। জগন্নাথও মনে মনে আনন্দিত হইলেন। পাপ বিদায় হইলেই বাঁচেন। বিদায় কালে বলদেবকে বলিলেন—

“অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া উপস্থিত বিপদ্ হইতে মহারাজ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে পরিত্রাণ পান কায়মনোবাক্যে সেই চেষ্টা করুন। মহারাজের মঙ্গলে আমাদের মঙ্গল। রাজ্যের মঙ্গল।”

“আপনার আশীর্ব্বাদে বলদেব সিংহ সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত আছে।”

এই বলিয়া বলদেব জগন্নাথের নিকট হইতে বিদায় হইলেন। ইন্দিরাকে ভাবিতে ভাবিতে শত্রুসিংহকে পরাজয় করিয়া ইন্দিরা লাভ করিবেন এই দুরাশায় মনকে নাচাইতে নাচাইতে, মনে মনে জগন্নাথের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে, রাজমহিষীর ভগ্নীসুত বলদেব সিংহ স্বগৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

পাপ বিদায় হইল—জগন্নাথ এক দায় হইতে উদ্ধার পাইলেন, কিন্তু তাঁহার মন নিশ্চিন্ত হইল না।

“কি আশ্চর্য্য! পক্ষপাত যাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহার কি কিছুমাত্র বিবেচনা শক্তি থাকেনা। এই অধার্ম্মিক ধূর্ত্ত, স্বার্থপর, অকাল কুষ্মাণ্ডটাকে মহারাজ পুত্রার্থে গ্রহণ করিবেন। মহাবাহু, বীরবাহু প্রভৃতি নৃপ শার্দ্দূলেরা যে সিংহাসন ভূষিত করিয়াছেন, সেই সিংহাসনে এই শৃগাল-সম বলদেব উপবেশন করিবে। ইহা আমি চক্ষে দেখিব? উপায় কি? মহারাজকেও কোন প্রকারেই সুমতি প্রদান করিতে পারিলাম না। আবার কত দূর দুরাশা! লক্ষ্মীসমা ইন্দিরা দেবীর পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী। যুদ্ধে শত্রুসিংহকে পরাজিত করিয়া তাহার

কন্যা-রত্ন হরণ করিবেন, পাগলেরও এতদূর সাহস হয় না।

মহারাজেরও বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। তিনি মহিষীর পরামর্শেই এই দুস্তর বিপদ্-সাগরে অবগাহন করিলেন, সকলই ভগবানের ইচ্ছা, মহারাজ যদি আমার পরামর্শ শুনিতেন তাহা হইলে ইন্দিরা দেবীই মঙ্গলপট্টনের রাজ্যেশ্বরী হইতেন, শক্রুগঞ্জ হইতে মঙ্গলপট্টন পর্য্যন্ত এক শাসনের অধীন হইত। ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি হইতে পারে। মহারাজ ইহা বুঝিলেন না, আমার অপরাধ নাই। জগন্নাথের যতদূর সাধ্য, করিয়াছে, করিবে। বাহুবলেন্দ্রের মঙ্গলের জন্য জগন্নাথের প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইবে। জগন্নাথ মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিতেছেন, আর এক একবার নিস্তব্ধ হইয়া সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়কেই প্রবল করিতেছেন। কিন্তু কোন শব্দই তাঁহার কর্ণগোচর হইতেছেনা। এক একবার অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন "এখনও এলোনা কারণ কি? রাত্রিত অনেক হইয়াছে।"

জগন্নাথ এরূপ সোৎকণ্ঠ হৃদয়ে কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন?

ক্রমশঃ।

সারদা মঙ্গল সংগীত।

গীতি

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা।

সুর—"মান ত্যাজ মানিনীলো যামিনী যে যায়।"

কি জানি কি মনে মনে ভেবেছে আমায়
না দেখিলে মরে প্রাণে,
দেখিতে না চায়—
তবু কেন দেখিতে না চায়!

আপনি দেখিতে গেলে,
কত যেন নিধি পেলে;
আদর করিতে এসে,
কেঁদে চ'লে যায়।

কাঁদিয়ে ধরিলে করে,
থরথর কলেবরে
চেয়ে থাকে মুখ পানে
পাগলের প্রায়;

সহসা চমুকে ওঠে,
সভয়ে চৌদিকে ছোটে;
আবার সমুখে এসে
কাঁদিয়ে দাঁড়ায়;

ছল ছল দুনয়ন,
ম্লান চারুচন্দ্রানন,
আকুল কুন্তল জাল,
অঞ্চল লুটায়;

আবার সমুখে নাই,
কেবল শুনিতে পাই
হৃদি ভেদি কণ্ঠধ্বনি
ওঠে উভরায়।

সাধে কে সাধিল বাদ!
কেন হেন পরমাদ!
কেনরে বেঘোরে মোরা
মরি দুজনায়!

তৃতীয় সর্গ।

১

আজি এ বিষণ্ণ বেশে
কেন দেখা দিলে এসে,
কাঁদিলে কাঁদালে দেবি
জন্মের মতন!
পূর্ণিমা-প্রমোদ-আ'ল
নয়নে লেগেছে ভাল;
মাঝেতে উথলে নদী, দুপারে দুজন-
চক্রবাক চক্রবাকী দুপারে দুজন!

২

নয়নে নয়নে মেলা,
মানসে মানসে খেলা,—
অধরে প্রেমের হাসি
বিষাদে মলিন;
হৃদয় বীনার মাঝে
ললিত রাগিণী বাজে,
মনের মধুর গান
মনেই বিলীন!

৩

সেই আমি, সেই তুমি,
সেই এ স্বরগ ভূমি,
সেই সব কল্পতরু,
সেই কুঞ্জবন;
সেই প্রেম, সেই স্নেহ,
সেই প্রাণ, সেই দেহ,
কেন মন্দাকিনীতীরে
দুপারে দুজন!

৪

আকুল ব্যাকুল প্রাণ
মিলিবারে ধাবমান;
আচম্বিতে অভিমান
সমুখে উদয়,
শান্তি কান্তি ময় তনু
অপরূপ ইন্দ্রধনু,
তেজে যেন জ্বলে মন,
অটল হৃদয়;

৫

কাতর পরাণ পরে
চেয়ে আছে স্নেহভরে,
নয়ন-কিরণ যেন
পীযূষ-লহরী।
এমন পদার্থে হেলি
যাবনা যাবনা ঠেলি!
উভয় সঙ্কটে আজ
মরি যদি, মরি!

৬

কেন গো পরের করে
সুখের নির্ভর করে!
আপনা আপনি সুখী
নহে কেহ নর!
সদাশিব সদানন্দ,
সতী বিনা নিরানন্দ;
শ্মশানে ভ্রমেন ভোলা
খেপা দিগম্বর!

৭

হৃদয়-প্রতিমা ল'য়ে
থাকি থাকি সুখী হ'য়ে;
অধিক সুখের আশা
নিরাশা শ্মশান;
ভক্তিভাবে সদা স্মরি,
মনে মনে পূজা করি,
জীবনকুসুমাঞ্জলি
পদে করি দান।

৮

বাসনা বিচিত্র ব্যোমে
খেলা করে রবিসোমে,
পরিয়ে নক্ষত্র তারা
হীরকের হার,
তবুও তিমিররাশি
ভুবন ভরিল আসি;
অন্তরে জ্বলিছে আলো
নয়নে আঁধার।

৯

বিচিত্র এ মত্ত দশা—
ভাবভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতি
কি বিচিত্র জ্বলে!

১০

তবে কি সকলি ভুল?
নাই কি প্রেমের মূল?
বিচিত্র গগন ফুল
কল্পনা লতার।
মন কেন রসে ভাসে
প্রাণ কেন ভাল বাসে
আদরে পরিতে গলে
সেই ফুলহার?

১১

শত শত নর নারী
দাঁড়ায়েছে সারি সারি,
নয়ন খুঁজিছে কেন
সেই মুখখানি।
হেরে হারানিধি পায়,
না হেরিলে প্রাণ যায়;
এমন সরল সত্য
কি আছে না জানি।

১২

ফুটিলে প্রণয়ফুল
ঘুমে মন ঢুল্ ঢুল্,
আপন সৌরভে প্রাণ
আপনি পাগল;
সেই স্বর্গসুধা পানে
কত যে আনন্দ প্রাণে,
অমায়িক প্রেমিকে তা
জানেন কেবল।

১৩

নন্দন-নিকুঞ্জবনে
বসি শ্বেত শিলাসনে
খোলা প্রাণে রতিকাম
বিহরে কেমন!

আননে উদার হাসি,
নয়নে অমৃতরাশি,
অপরূপ আলো এক
উজলে ভুবন।

১৪

পারিজাতমালা করে,
চাহি চাহি স্নেহ ভরে
আদরে পরস্পরে
গলায় পরায়;
মেজাজ্ গিয়েছে খুলে,
বসেছে দুনিয়া ভুলে,
সুধার সাগর যেন
সমুখে গড়ায়।

১৫

হৃদয়ে কুসুম ডোর,
নয়নে নেশার ঘোর,
না জানি কি ভাবে ভোর,
রসে নিমগন;
গলে গলে বাহুলতা,
জড়িমা-জড়িত কথা,
সোহাগে সোহাগে রাগে
গলগল মন।

১৬

করে কর থরথর,
টলমল কলেবর,
গুরুগুরু দুরুদুরু
বুকের ভিতর;
তরুণ অরুণ ঘটা
আননে আরক্ত ছটা,
অধর কমলদল
কাঁপে থরথর।

১৭

প্রণয়-পবিত্র কাম!
সুখ স্বর্গ মোক্ষ ধাম,
আজি কেন হেরি হেন
ম্যাতোয়ারা বেশ!
ফুলধনু ফুলছড়ি
দূরে যায় গড়াগড়ি;
রতির খুলিয়ে খোঁপা
আলুথালু কেশ!

১৮

কুঞ্জের আড়াল থেকে
চন্দ্রমা লুকায়ে দেখে,
প্রণয়ীর সুখে সদা
সুখী সুধাকর।
সমীরের গানে ভুলে
আহ্লাদেতে হেলে দুলে
চৌদিকে নিকুঞ্জলতা
নাচে মনোহর।

১৯

সে আনন্দে আনন্দিনী
উথলিয়ে মন্দাকিনী
কুলুকুলু কলধ্বনি
করে কুতূহলে।

———

২০

এ ভুল, প্রাণের ভুল!
মর্ম্মে বিজড়িত মূল
জীবনের সঞ্জীবনী
অমৃত বল্লরী;

এ এক নেশার ভুল!
অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল,
স্বপনে বিচিত্ররূপা
দেবী যোগেশ্বরী।

২১

কভু বরাভয় করে
চাঁদে যেন সুধাক্ষরে
করেন মধুর স্বরে
অভয় প্রদান,
কখন গেরুয়া পরা,
ভীষণ ত্রিশূল ধরা,
পদভরে কাঁপে ধরা
ভূধর অধীর;
দীপ্ত সূর্য্য হুতাশন
ধক্ ধক্ দুনয়ন,
হুঙ্কারে বিদরে ব্যোম,
লুকায় মিহির;
ঘোরঘট্ট অট্ট হাসি
ঝলকে পাবক রাশি,
প্রলয়-সাগরে যেন
উঠেছে তুফান।

২২

কভু আলু থালু কেশে
শ্মশানের প্রান্তদেশে
জ্যো'স্নায় আছেন বসি
বিষণ্ণ বদনে,
গঙ্গার তরঙ্গমালা
সমুখে করিছে খেলা,
চাহিয়ে তাহার পানে
উদাস নয়নে।

২৩

পবন আকুল হ'য়ে
চিতা-ভস্মরজ ল'য়ে
শোকভরে ধীরে ধীরে
শ্রীঅঙ্গে মাখায়,
ধবল করবী পাঁতি
শেফালি মল্লিকা জাতি
ছড়াইয়ে চারিদিকে
কাঁদিয়ে বেড়ায়।

২৪

হায়, ফের বিষাদিনী!
কে সাজালে উদাসিনী!
সম্বর এ মূর্ত্তি দেবী
সম্বর সম্বর!
বটে এ শ্মশান মাঝে,
ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি সাজে
দানব রুধির রঙ্গে
নাচে ভয়ঙ্কর।

২৫

আবার নয়নে জল!
ওই সেই হলাহল,
ওরি তরে জীর্ণজরা
জীবন আমার;
গরজি গগন ভোরে
দাঁড়াও ত্রিশূল ধোরে!
সংহারমূরতি অতি
মধুর তোমার!

২৬

আমার এ বজ্র বুক,
ত্রিশূলেরো তীক্ষ্ণ মুখ,
দাও দাও বসাইয়ে,
এড়াই যন্ত্রণা;

সমুখে আরক্তমুখী,
মরণে পরম সুখী ;
এ নহে প্রলয়-ধ্বনি,
বাঁশরী-বাজনা।

২৭

অনন্ত নিদ্রার কোলে
অনন্ত মোহের ভোলে
অনন্ত শয্যায় গিয়ে
করিব শয়ন !
আর আমি কাঁদিবনা,
আর আমি কাঁদাব না ;
নীরবে মিলিয়ে যাবে
সাধের স্বপন।

২৮

তপন-তর্পণ-আ'ল
অসীম যন্ত্রণা জাল,
প্রশান্ত অনন্ত ছায়া
অনন্ত যামিনী ;
সে ছায়ে ঘুমাব সুখে,
বজ্র বাজিবেনা বুকে,
নিস্তব্ধ ঝটিকা ঝঞ্জা ;
নীরব মেদিনী।

২৯

বাঁধ বুক, ত্যজ ভয়,
পুণ্য এ, পাতক নয় ;
খুনে আর পরিত্রাণে
অনেক অন্তর।
ভালবাসা তারি ভাল,
সহে যারে চির কাল ;
বাঁচুক্, বাঁচুক্ তারা
হউক্ অমর !

৩০

উঠ ! আন ! যাও যাও !
বেগে বুকে বিঁধে দাও !
ওই সে ত্রিশূল দোলে
গগনমণ্ডলে !

ইতি তৃতীয় সর্গ।

রুচি।

পাঠকমাত্রেই কোন প্রবন্ধ কিম্বা কবিতাদি পাঠ করিলে তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ভাষা প্রভৃতির ন্যায় রুচিরও গুণদোষ বিচার করিয়া থাকেন। কোন কোন গ্রন্থকারের রুচি সুমার্জ্জিত বলিয়া আমরা প্রশংসা করিয়া থাকি এবং কুৎসিত রুচি বলিয়া কাহারও বা রচনার নিন্দা ঘোষণা করি। অতএব রুচি কি এবং তাহার গুণ দোষ বিচারের বা উপায় কি—তাহা বিচার করা অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয় না। বিশেষতঃ লোকের রুচির সহিত ধর্ম্মনীতির কত নিগূঢ় সম্পর্ক যথন স্মরণ করি তখন এই ইচ্ছা আরও বলবতী হয়। বিখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত এমারসন একস্থলে বলিয়াছেন "কোন্ জাতি কি-প্রকার গ্রন্থকারদিগকে প্রশংসা করে,

জানিতে পারিলে, তাহার ধর্ম্মনীতির অবস্থারও পরিমাণ পাওয়া যায়”। যতই অনুধাবন করিয়া দেখা যায় ততই এই কথার গভীরতা অনুভূত হয়।

রুচি কি?—মনুষ্যমনের সুন্দর অসুন্দর—পবিত্র অপবিত্র—সঙ্গত অসঙ্গতপ্রভৃতি বুঝিবার যে ক্ষমতা তাহার নাম রুচি। কেহ কেহ বলেন এই ক্ষমতা স্বাভাবিক। যেমন নাসিকার সুগন্ধ দুর্গন্ধ বিচারের ক্ষমতা শিক্ষিত কিম্বা উপার্জ্জিত নয় সেইরূপ মনেরও সুন্দর অসুন্দর বিচারের ক্ষমতা শিক্ষিত কিম্বা উপার্জ্জিত নয়। কিন্তু এই মত যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না, কারণ দেশভেদে ও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কথায় বলে “ভিন্নরুচি হি লোকঃ”। বিশেষতঃ যদি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা যায় তাহা হইলে অবশেষে সকল প্রকার রুচিরই মূলে কতকগুলি সংস্কার (Idea) দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যহৃদয়ের সেই সংস্কারগুলি মিশ্রিত থাকাতে একপ্রকার কার্য্য অবস্থা বা ভাব দর্শনে বা চিন্তনে আনন্দ হয় এবং অপরপ্রকার কার্য্যাদি দর্শনে বা চিন্তনে বিরক্তি জন্মে। তাহাকেই আমরা রুচি বলিয়া থাকি।

এই বিষয়টী বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্ত্রীলোকের রূপবিষয়ক রুচিকেই গ্রহণ করা যাউক। ইংরাজ কবিরা কোন রমণীর রূপ বর্ণনা করিতে হইলে বলিয়া থাকেন (nimble-footed) চঞ্চলচরণা; আমাদের কবিরা সেস্থলে কি বলিবেন? তাঁহারা বলিবেন মরালগমনা বা গজেন্দ্রগমনা; ইংরাজেরা বলিবেন (her golden locks) সুবর্ণকুন্তলা, আমরা বলিব সুনীলকুন্তলা; ইংরাজেরা চান যে তাঁহাদের গৃহিণী tall and swan-necked দীর্ঘাকৃতি ও হংসকণ্ঠী হইবেন, আমরা চাই আমাদের গৃহিণী নাতিদীর্ঘা নাতি হ্রস্বা ও কম্বুকণ্ঠী হইবেন। এইরূপ আরও অনেক রুচির বৈসাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে কিন্তু আর অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে যদি আমরা সূক্ষ্মরূপে বিচার করি তাহা হইলে এই বিভিন্নপ্রকার রুচির মূলে কি কোন প্রকার কারণ দেখিতে পাই না? প্রথমতঃ গতির বিষয় বিচার করা যাউক। গতিসম্বন্ধে ইংরাজদিগের রুচি যে প্রকার আমাদের রুচি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ইহার কারণ কি? ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ; সেখানে উত্তাপ অত্যন্ত প্রিয় পদার্থ। ত্বরিত গতিতে উত্তাপ জন্মে। এইজন্য সেখানে পথিকদিগকে প্রায় মৃদুপদে চলিতে দেখা যায় না;—রাজপথে গিয়া দেখ আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলেই ছুটিতেছে—ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া রহিয়া বসিয়া চলার প্রথা সেদেশে নাই। উত্তাপ প্রিয় পদার্থ সুতরাং ত্বরিত গতিও প্রিয় পদার্থ। ইহাতে আর একটী সংস্কারও

মিশ্রিত থাকিতে পারে। সেখানে স্ত্রীলোকদিগের নৃত্য করিবার প্রথা আছে,—ত্বরিত গতি নৃত্যের উপযোগী,—সুতরাং রমণীর পক্ষে তাহা প্রশংসনীয়; কিন্তু এদিকে আমাদের দেশের অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা চলিতে পারিলে ছুটি না; দাঁড়াইতে পারিলে চলি না; বসিতে পারিলে দাঁড়াই না; কিম্বা শয়ন করিতে পাইলে বসি না। দুই পদ বেগে অগ্রসর হইলে শরীর স্বেদার্দ্র হয় ও আমরা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি; সুতরাং মন্থর গতি আমাদের পক্ষে অধিক মধুর। বিশেষতঃ আকৃতি কিঞ্চিৎ মাংসল হইলেই গতি মন্থর হইয়া থাকে। মাংসল আকৃতির শরীর সচরাচর স্নিগ্ধ হয় এই জন্যই বোধ হয় মন্থর গতিই আমাদের অধিক সুন্দর বোধ হয়। কুন্তলের স্থলেও এই রূপ। সূর্য্যালোক ইংলণ্ডের লোকের অতি প্রিয় পদার্থ। সেই জন্যই বোধ হয় তদনুরূপ বর্ণবিশিষ্ট পদার্থও ভাল লাগে। আমরা ছায়াপ্রিয় মেঘপ্রিয় সুতরাং তৎসদৃশ কুন্তলই আমাদের ভাল লাগে। এইরূপে অপরাপর রুচিরও মূল আবিষ্কার করা যাইতে পারে।

উপরে যে সকল রুচির উল্লেখ করা গেল:—তাহা এক প্রকার জাতিগত (National) বলিলে হয়; কারণ যে যে বিশেষ সংস্কার অবলম্বন করিয়া তাহাদের জন্ম হয় সে সমুদায় সংস্কার জাতিসাধারণ। এতদ্ভিন্ন ব্যক্তিগত (Individual) রুচিও আছে। লোকের মানসিক প্রবৃত্তি অনুসারে রুচিরও তারতম্য হইয়া থাকে। যাঁহার কল্পনা অধিক তিনি তদুত্তেজক প্রবন্ধ কবিতাদি ভাল বাসেন; যাঁহার কাম রিপু প্রবল তিনি তদুদ্দীপক বর্ণনাদি ভাল বাসেন। তিনি যদি নিজে কবি হন এবং কোন কামিনীর রূপ বর্ণনায় নিযুক্ত হন তাহা হইলে তাঁহার শরীরের যে সকল অঙ্গ সেই রিপুর উদ্দীপক তাঁহার দৃষ্টি প্রথমেই সেই দিকে পতিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রত্নাবলীর একটী কবিতা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

স্থিতমুরসি বিশালং পদ্মিনীপত্রমেতৎ
কথয়তি ন তথান্তর্ম্মথোত্থামবস্থাম্।
অতিশয়পরিতাপম্লাপিতাভ্যাং যথাস্যাঃ
স্তনযুগপরিণাহং মণ্ডলাভ্যাং ব্রবীতি॥
রত্নাবলী ২য় অঙ্ক।

"সেই বিরহিণীর হৃদয়স্থিত এই পদ্মপত্রের মলিনতা দেখিয়া অন্তরের যাতনা তত বুঝিতে পারা যাউক আর না যাউক তাহার স্তনযুগল যে সুবিস্তৃত এই মণ্ডলাকার চিহ্নদ্বয় দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে"। এস্থলে প্রণয়ী প্রণয়িণীর বিরহ বর্ণনচ্ছলে কেমন বিশুদ্ধ প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন পাঠকগণ বিবেচনা করুন্। প্রণয় এত নিকৃষ্ট পদার্থ নয়—মাংসপিণ্ড শরীরের কোন অঙ্গ বিশেষের জন্য তাহা ব্যাকুল হয় না। সে বিরহে কোন বিশেষ অঙ্গের কথা স্মরণ থাকে না। যদি প্রণয়ীকে জিজ্ঞাসা কর—তুমি প্রণয়িণীর কি চাও? মুখ চাও—হস্তপদ

চাও—স্তনযুগল চাও? সে বলিবে আমি কোন বিশেষ অঙ্গ চাই না—কিন্তু তাহাকে চাই;—কেন চাও? সে বলিবে জানি না অথচ চাই। মহাকবি ভবভূতি এক স্থলে বলিয়াছেন—

অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি। তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়ো জনঃ॥

"কিছু করে না অথচ তাহার দর্শনে অতুল সুখোদয় হয় এবং দুঃখ কষ্ট থাকে না; যে যাহার প্রিয় সে তাহার পক্ষে যেন কি এক সামগ্রী।" প্রকৃত প্রণয়ের গতি এইরূপ ঃ—

কামরিপু সম্বন্ধে যেরূপ বলা হইল অপরাপর বৃত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ। এইরূপ বিশেষ বিশেষ বৃত্তিবিশিষ্ট লোকেরা যদি প্রতিভাশালী ও সুলেখক হন তাহা হইলে, তাঁহাদের রুচি দ্বারা শত শত লোকের রুচি গঠিত হইতে থাকে; এক কালিদাস ও এক বাইরণে শত শত যুবা পুরুষের ইন্দ্রিয়শৈথিল্য জন্মাইয়াছেন। আবার সেই প্রতিভাশালী লেখকেরা যদি সমুদায় জাতির শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হন তাহা হইলে তাঁহাদের রুচি দ্বারা সমুদায় জাতির রুচি গঠিত হইতে পারে। বাল্মীকির সীতা ভারতবাসিদিগের মনে চিরকাল কিরূপ কার্য্য করিতেছেন ভাবিলে এই কথার যাথার্থ্য অনুভব করা যায়। যে ভারতবাসী অসহ্য অত্যাচার বহন করিতে পারে—ধন মান যথাসর্ব্বস্বে বঞ্চিত হইলেও অম্লানবদনে বিচরণ করিতে পারে, স্ত্রীলোকের সতীত্বে হস্তার্পণ কর—তাহার দুর্ব্বল শরীরে সিংহের বল উপস্থিত হইবে—গভীর ক্রোধে তাহার হৃদয় মন আন্দোলিত হইবে এবং প্রাণের ভয় থাকিবে না।—এই সতীত্বপ্রিয়তার মূলে আমরা সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতিকে দেখিতে পাই। বাস্তবিক ক্ষমতাশালী ও প্রতিভাসম্পন্ন গ্রন্থকারদিগের হস্তে দেশের রুচি ও ধর্ম্মনীতি উন্নত করিবার অতি গুরুতর ভার। যাঁহারা এই ভার অনুভব না করিয়া কেবল লোকের নীচ আমোদ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা পান;—লোকের কল্পনাচক্ষের সমক্ষে কুৎসিত চিত্র সকল উপস্থিত করিয়া হৃদয়ের বিকৃত ভাব সকলকে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পান—তাঁহারা দেশের শত্রু। তাঁহাদের লেখনী অমৃতের নামে গরল উদ্গীরণ করে। দুঃখের বিষয়—আমাদের দেশের গ্রন্থকারদের রুচি আজিও পরিষ্কৃত হয় নাই। সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের দেশে বাস করিয়া ভাষার শরীরে যে অশ্লীলতার গন্ধ লাগিয়াছে তাহা আজিও সম্পূর্ণরূপ দূর হয় নাই। কবি মহাশয়েরা কবিতা লিখিতে বসিলেই রসের কবিতা করিবার জন্য ব্যস্ত হন এবং বাইরণের কিম্বা কালিদাসের ছাঁদে কবিতা ঢালিয়া বসেন। আমি কালিদাসের রুচিকেও নিকৃষ্ট রুচি বলি। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।—

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈরনামুক্তং রত্নং মধুনবমনাস্বাদিতরসম।

অথণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি
ভুবি ॥”

দুষ্মন্ত শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন “সেই নিষ্কলঙ্ক রূপ অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায়, নখাচ্ছিন্ন নব পল্লবের ন্যায়, অপরিহিত রত্নের ন্যায়, অনাস্বাদিত নব মধুর ন্যায় এবং বহু পুণ্যের ফলস্বরূপ। হায়! না জানি এ জগতে কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহা উপভোগ করিবে” অর্থাৎ আমার ভাগ্যে যদি তাহা ঘটে তাহা হইলে কৃতার্থ হই। কবি শেষের চরণটী না বলিলে ভাল করিতেন। পাঠকগণ এই ভাবের সহিত ভবভূতির একটী ভাবের তুলনা করুন।

“ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তি র্নয়নয়ো-
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পরমসহ্যস্তুবিরহঃ ॥”

সীতা বাহুলতা দ্বারা রামচন্দ্রের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইয়াছেন রামচন্দ্র বার বার তাঁহার সুষুপ্তাবস্থ মুখের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে বলিতেছেন —“ইনি আমার গৃহের গৃহলক্ষ্মী—ইনি আমার নয়ন-দ্বয়ের অমৃতাঞ্জন-স্বরূপ—ইঁহার শরীর চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ—কণ্ঠস্থিত ভুজলতা মুক্তামালার ন্যায় শীতল—জানকীর সকলই মধুর—কেবল মাত্র বিরহই ভয়ানক। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। ইংরাজী কবিদিগের মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কলরীজ ও বাইরণে এইরূপ প্রভেদ। অবশেষে কুরুচি ও সুরুচির দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটী কবিতা দেওয়া যাইতেছে দেখিলে পাঠকগণ উভয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন।—

প্রেমের নবাঙ্কুর।

সুরুচি-সম্ভূত।

আমরি সুন্দর, মুখ মনোহর
কিম্বা বিম্বাধর অমিয় ফল;
হাঁসি রাশি দিয়ে, যেন মিশাইয়ে,
পাতিয়াছে ধনী প্রেমের কল।
প্রেমে আকুঞ্চিত, হরিণীনিন্দিত,
কিবা সুবিস্তৃত, যুগল আঁখি;
করে ঢল ঢল, হইয়ে কজ্জল,
হেন ইচ্ছা হয় মিশায়ে থাকি।
বসনেতে ঢাকা, প্রেমরসে মাখা,
দুটি পয়োধর সুধার খনি;
হয়ে কণ্ঠহার, লুঠি ব'র বার,
জুড়াক্ আমার তাপিত প্রাণি।
মন চুরি করি, পলাল সুন্দরী,
চিত চমকিত মাতিল প্রাণ;
যদি দেখা পাই, শ্রীঅঙ্গে মিশাই,
নিজদেহে করি প্রলেপ দান।

প্রেমের নবাঙ্কুর।

কুরুচি-সম্ভূত।

ধিক্ মন সেদিকেতে চেওনা।
কুমারী-নিন্দিত ধন
চেওনা অবোধ মন

যার তুমি তার থাক অন্যদিকে চেওনা,
সাধ করে এ যাতনা পেওনা।

২

কুমারীনিন্দিত কেন বলিব,
যে আমারে ভাল বাসে
মন যদি তার পাশে
নিজে চায় সাধ্য কি যে তারে আমি ধরিব;
এ বিপদে কিবা আজ করিব ?

৩

একি ভাব প্রাণে আজ উঠিল,
সঙ্গের সঙ্গিনী যারা
কোথা পড়ে রয় তারা
মোর প্রাণবিহগিনী আকাশেতে উড়িল;
নব ভাবে নব গীত ধরিল।

৪

কারে বলি বলিবার নয়রে
নিজে দেখি নিজে লাজ
করি লুকাবার ব্যাজ
ভাবি হাসিঃ—তার কথা কেন মনে হয় রে
পাছে জানে এই সদা ভয় রে !

৫

লুকাব কি ? মন তাহা দিল না;
লুকাতে প্রয়াস করি,
আরো যেন ধরা পড়ি,
বলিলাম; "কিছু নয়!" লোকেত মানিল না;
পোড়া মন লুকাইতে দিল না।

৬

জানুক না;—এক দিন জানিবে।
আমি ভাল বাসি তারে,
পাছে সে জানিতে পারে,
এই ভয়, আমারে সে না জানি কি মানিবে
রমণী দুর্ব্বল বলে জানিবে।

৭

অতএব লুকাইব যতনে,
এজনমে ভাঙিব না,
আর কাছে যাইব না,
দূরে থাকি জুড়াইব দেখি হৃদিরতনে,
দূরে থাকি দাসী রব-চরণে।

৮

কবি বলে তাও নাকি হয় লো,
এ বড় বিষম টান,
বিফল আশ্বাস দান,
পর হাতে গেছে প্রাণ ফিরিবার নয় লো,
প্রণয়ীর এই দশা কয় লো।

শ্রীশি—

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত।

জেম্‌স্ মিলের স্বভাব ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক মত এবং মিলের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা।

মিল্ আশৈশব কোন ধর্ম্মপ্রণালীতেই দীক্ষিত হন নাই। তাঁহার পিতা বাল্যে স্কচ্ প্রেস্‌বিটেরিয়ান মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি চিন্তা ও শিক্ষা বলে অচিরকালমধ্যেই শুদ্ধ প্রত্যাদেশ (Revelation) মতের কেন,—প্রাকৃতিক

ধর্ম্মেরও (Natural Religion) শৃঙ্খল হইতে আপনাকে মুক্ত করেন। তিনি স্বয়ং বলিতেন যে বট্‌লার-লিখিত অ্যানালজি (Analogy) নামক গ্রন্থ পাঠেই তাঁহার এই আকস্মিক মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। যাঁহারা এক সর্ব্বশক্তিমান্, অনন্ত দয়ার নিদান ও সর্ব্বদর্শী বা ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, অথচ খ্রীষ্টধর্ম্ম বিশ্বাস করিতে চাহেন না, বট্‌লারের যুক্তিসকল তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সবল সন্দেহ নাই; কিন্তু যাঁহাদিগের নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্বই সপ্রমাণ করিতে হইবে, তাঁহাদিগের নিকট বট্‌লারের যুক্তিসকলের কোন মূল্যই নাই। বট্‌লারের পুস্তক-পাঠেই জেম্‌স মিলের মনে এই চিন্তা প্রথম উদিত হয় যে অদ্যাবধি খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে, সে সমুদায়েই ঈশ্বরের অস্তিত্ব মূলভিত্তি-স্বরূপ পরিগৃহীত হইয়াছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে অদ্যাবধি কোন বিতর্কই উপস্থিত হয় নাই; ইহা এতাবৎকাল স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। জেম্‌সের মন ইহাতে পরিতৃপ্ত হইল না। তাঁহার নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্বও প্রমাণ-সাপেক্ষ বলিয়া প্রতীত হইল। এবিষয়ের অসন্দিগ্ধ প্রমাণ তিনি কুত্রাপি পাইলেন না। তিনি কিছুকাল সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে অনেক চিন্তার পর তিনি এই মত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন যে—এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান জগতের আদি কারণ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই টুকুই তাঁহার বিশ্বাসের সার। যাহারা তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করে তাহারা নাস্তিকতা ও পূর্ব্বোক্ত-মত-গত বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি করিতে পারে না। কারণ 'এই অনন্ত জগতের আদি কারণ নাই' এবং 'এই অনন্ত জগতের আদি কারণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' এই দুই মত পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথম মতটিকেই—প্রকৃতপক্ষে নাস্তিবাদ বলা যাইতে পারে। জগতে এই মতের পরিপোষক ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প। জেম্‌স মিল্ এমতের পরিপোষক ছিলেন না; অধিক কি তিনি এ মতকে সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন। দ্বিতীয় মতটি বর্ত্তমান প্রত্যক্ষবাদের সার। জেম্‌স মিল্ এই মতেরই পক্ষপাতী ছিলেন। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা তাঁহাকে কতকগুলি পরস্পর-বিসম্বাদী গুণের আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ (Almighty), সর্ব্বদর্শী বা ত্রিকালজ্ঞ (Omniscient) এবং অনন্ত দয়ার আধার (Almerciful)। জেম্‌স মিল্ জগৎ-কার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা একাধারে এরূপ পরস্পরবিসম্বাদী গুণত্রয়ের সমাবেশ সম্ভবপর মনে করিতে পারিলেন না। অনন্ত শক্তি, অনন্ত দয়া, এবং অনন্ত জ্ঞান এই তিনের পরস্পর স্বভাবসিদ্ধ কোন বিসম্বাদ আছে বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল

না। তিনি কেবল কার্য্যতঃ এই তিনের বিসম্বাদ দেখিতে পাইতেন। যে ঈশ্বর জগতে রোগ, শোক, প্রভৃতি অনর্থের মূল সৃষ্টি করিয়াছেন—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে কিরূপে অনন্ত দয়ার আধার তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি অনন্ত-দয়াবান্ হইলে জগতে রোগ, শোক কিছুই থাকিত না। তিনি অনন্ত দয়ার আধার, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও ত্রিকালজ্ঞ হইলে জগতে দুঃখের মূলেই কুঠারপাত-হইত সন্দেহ নাই। যে সকল কূট যুক্তি-দ্বারা ধর্ম্মব্যবসায়ীরা এই বিসম্বাদের সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করিতেন জেম্‌স মিলের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি সেই সকলের অসারতা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিল। লোকে সাধারণতঃ যাহাকে ধর্ম্ম বলে—জেম্‌স মিল্ এইরূপে সেই ধর্ম্মের বিদ্বেষ্টা হইয়া উঠিলেন। তিনি ইহাকে বি-শুদ্ধ নীতির উম্মূলক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। বাহ্য আড়ম্বর যে ধর্ম্মের জীবন-সর্ব্বস্ব—মানব-প্রেম যে ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য নহে—সেই ধর্ম্মকে তিনি ধর্ম্ম বলিয়াই কোনমতে স্বীকার করিতে পারিলেন না। যে ধর্ম্মের দেবতা—ভীষণ নরকের সৃষ্টিকর্ত্তা; যে ধর্ম্মের উপাস্য দেবতা মনুষ্যজাতির অধিকাংশকে ভয়ানক চিরস্থায়ী যন্ত্রণা ভোগ করাইবার মানসে, তাহাদিগকে দুর্দ্দমনীয় পাপপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন; সে ধর্ম্মকে তিনি ঘৃণার সহিত না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। এরূপ ভীষণপ্রকৃতিক ঈশ্বরকে লোকে কিরূপে যুগপৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণের আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করে তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিতেন না। এরূপ ধর্ম্ম—নীতির ভাবকে অতিশয় অবনত করিয়া ফেলে। অন্ধ বিশ্বাসীরা নীতিকে এই অবনতির অবস্থা হইতে উত্তো-লিত হইতে দেন না। তাঁহাদিগের ভয়—পাছে তাঁহাদিগের ঈশ্বরের নীতির সহিত এই উন্নত ও স্বার্থশূন্য নীতির বিসম্বাদ উপস্থিত হয়।

জেম্‌স মিল্ আপনার ধর্ম্মবিষয়ক এই সকল মতের বিরুদ্ধে পুত্রের ধর্ম্মশিক্ষা বিধান করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এইজন্য তিনি প্রথম হইতেই পুত্রের মনে এই সংস্কার দৃঢ় অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি-লেন— যে এই প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান জগ-তের সৃষ্টিপ্রকরণ বিষয়ে আমরা কিছুই জানিতে পারিনা। 'কে আমার স্রষ্টা?' এ প্রশ্নেরও কোন প্রকৃত উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ এবিষয়ে আমরা কোন বিশেষ প্রমাণ পাইনা। যদি বলি এই প্রশ্নের উত্তর 'ঈশ্বর' তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমাদিগের মনে আর একটী, প্রশ্ন উদিত হয়—'ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তা কে?' সুতরাং অনাদি কারণের কোন স্থিরতাই হয় না। যদিও তিনি পুত্রের অন্তরে এই সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি মনুষ্যজাতি এই দুর্ভেদ্য তত্ত্ব-বিষয়ে কি২ মত প্রচার করিয়াছেন পুত্রকে তত্ত্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ করিতে

বিশেষ চেষ্টা করিতেন। এইজন্য তিনি তাঁহাকে শৈশবেই খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকসকল পাঠ করিতে বলিতেন।

এইরূপে মিল্ কোনপ্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসে দীক্ষিত না হওয়ায়, ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া উঠিলেন। সুতরাং ধর্ম্মবিশেষের উপর তাঁহার বিশেষ আস্থা বা ঘৃণা জন্মিল না। সকল ধর্ম্মই তিনি সমভাবে দেখিতে লাগিলেন। খ্রীষ্টান্, মুসলমান্, ও হিন্দু তাঁহার নিকট একই প্রতীত হইতে লাগিল। ইতিহাসে তিনি মনুষ্যজাতির পরস্পর মতভেদের অনেক দৃষ্টান্ত পাইয়াছিলেন। সুতরাং মতভেদ জন্য কাহারও উপর তাঁহার বিদ্বেষ ভাব জন্মিত না। কিন্তু মিলের নীতিশিক্ষার একটী অঙ্গহীনতা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। জেম্স মিল্ জানিতেন যে তাঁহার মতসকল প্রায় অধিকাংশলোকের মতের বিরোধী ছিল। তিনি জানিতেন যে এ সকল মত প্রকাশ্যরূপে প্রচার করিলে অনেক কষ্ট ও অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। এইজন্য তিনি পুত্রকে সেই সকল মতে দীক্ষিত করিবার সময়, এই সকল মত প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে সাবধান হইতে বলেন। মিল্ যেরূপ নিভৃতভাবে গৃহে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহাতে শৈশবে বহুলোকের সহিত তাঁহার মিশ্রণের সম্ভাবনা ছিল না; এই জন্য যদিও তাঁহাকে প্রকাশ বা গোপন—এই সন্ধিস্থলে সর্ব্বদা দণ্ডায়মান হইতে হইত না, তথাপি এই গোপন রাখিবার উপদেশ যে তাঁহার নৈতিক উন্নতির অনেক ব্যাঘাত সম্পাদন করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মিলের শৈশবকালীন ইংলণ্ডের নীতির অবস্থা অপেক্ষা তাঁহার বার্দ্ধক্যকালীন ইংলণ্ডের নীতির অবস্থা অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। মিল্ বলিয়াছেন স্বাধীন চিন্তা—স্বাধীন তর্ক এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় পাপ বলিয়া পরিগণিত হইত না। জেম্স মিল্ এ সময় জীবিত থাকিলে তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক মত ব্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না—যদিও এখনও স্বাধীনভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করার অপরাধে সময়ে সময়ে কেহ কেহ জীবিকানাশ, পদচ্যুতি, গৌরবহানি, ও জাতিভ্রংশ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত হইয়া থাকেন; তথাপি সাধারণতঃ এক্ষণে এসকল বিষয়ে যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহারা জ্ঞানমার্গে অতিশয় অগ্রসর—পদ ও গৌরবের জন্য যাঁহাদিগের মত অবহেলা করা অনেকের পক্ষে কঠিন অথচ ধর্ম্মবিষয়ক চলিত মতসকল যাঁহাদিগের নিকট ভ্রমসঙ্কুল ও মানবজাতির অহিতকর বলিয়া প্রতীত হয়,—তাঁহাদিগের নির্ভয়ে আত্মমত প্রকাশ করিবার সময় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে। আর তাঁহাদিগের গুপ্তভাবে থাকা ভাল দেখায় না। অনেকের সংস্কার এই যে—যাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাঁহার অন্তর ও মন

কখনই পবিত্র হইতে পারে না। জেম্‌স মিল্ প্রভৃতি মহোদয়েরা নির্ভয়ে আত্ম-মত প্রকাশ করিলে এই সংস্কার অচিরাৎ লোকের মন হইতে দুরীভূত হইত সন্দেহ নাই। যে সকল মহাত্মা জগতের অলঙ্কার বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছেন,—যাঁহাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রখ্যাত রহিয়াছে,—বিশেষ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে তাঁহাদিগের অধিকাংশই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত-বিশ্বাস-বিরহিত ছিলেন। তাঁহাদিগের সংস্কার ছিল যে তাঁহাদিগের এই মত ব্যক্ত করিলে লোকের মনে ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিলিত হইয়া জগতের অমঙ্গল সংঘটিত হইবে। এই জন্যই তাঁহারা আপনাদিগের ধর্ম্ম-বিষয়ক মত সকল এত গোপন করিতেন। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাঁহাদিগের এ সংস্কার সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রতীত হইবে।

জেম্‌স মিলের ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক মত সকল গ্রীক দার্শনিকদিগের ন্যায় ছিল। এই জন্য তিনি পুত্রকে শৈশবেই গ্রীক দার্শনিকদিগের গ্রন্থ সকলে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ঝিনোফন-লিখিত মেমোরাবিলিয়া (Memorabilia of Xenophon) নামক পুস্তক পাঠে মিলের মনে সক্রেটিসের উপর অতি গভীর ভক্তি জন্মে। এই সময় হইতেই মিল্ সক্রেটিস্‌কে উৎকর্ষের অতি উচ্চ আদর্শ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি প্লেটোর পুস্তক সকল পাঠ করিয়া নীতিমার্গে আরও অগ্রসর হইলেন। ন্যায়পরতা, পরিমিতাচারিতা, সত্যপ্রিয়তা, অধ্যবসায়-শীলতা, দুঃখ ও পরিশ্রম সহিষ্ণুতা, সাধারণের হিতচিন্তা, ব্যক্তি ও দ্রব্যের গুণগ্রাহিতা এবং আলস্য ও বৃথা আমোদ প্রমোদে ঘৃণা—এই গুণ গুলিকেই সক্রেটিস্ প্রকৃত ধর্ম্মপদের বাচ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জেম্‌স মিল্ এই সকল সক্রেটিক ধর্ম্মেই (Socratic Viri) পুত্রকে আশৈশব দীক্ষিত করেন। মিল্ বিশেষ যত্নের সহিত আজীবন সেই ধর্ম্মগুলি প্রতিপালন করিয়াছিলেন। জেম্‌স মিল্ পুত্রকে এই সকল ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন এরূপ নহে; তিনি স্বয়ং সেই ধর্ম্ম গুলি প্রতিপালন করিয়া পুত্রকে জীবন আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। মিল্ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—যে পিতার উপদেশ অপেক্ষা, পিতার দৃষ্টান্তে তাঁহার অধিকতর উপকার দর্শিয়াছিল।

জেম্‌স মিলের চরিত্রে ষ্টোয়ীক, এপিকিউরীয় ও সিনীক এই তিন প্রকার লক্ষণই উপলক্ষিত হইত। তিনি কার্য্যের সুখ-দুঃখোৎপাদন-প্রবণতা হইতে ইহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা স্থির করিতেন সুতরাং তিনি এপিকিউরিয়ান্ (Epicurian) ছিলেন। জগতে সুখ আছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, সুতরাং তিনি সিনীক (Cynic) পদের বাচ্য। কিন্তু তিনি কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ ষ্টোয়িক

(Stoic) ছিলেন। তিনি সুখের আস্বাদ গ্রহণে অসমর্থ ছিলেন এরূপ নহে, কিন্তু তিনি উচ্চ মূল্যে ইহা ক্রয় করিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহার মতে জগতের অধিকাংশ দুঃখই—সুখের উচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণের—ফল। যৌবনের নবীনতা অতীত হইলে এবং জ্ঞানপিপাসা শান্ত হইলে জীবন তাঁহার নিকট অতীব শোচ্য পদার্থ বলিয়া প্রতীত হইত। কিন্তু তিনি কখনই যুবা ব্যক্তির সম্মুখে জীবনের এই ভীষণ চিত্র প্রদর্শন করিতেন না। তিনি বলিতেন যে যদি কখন কোন জীবন—সুশিক্ষা ও সুশাসন দ্বারা সংঘটিত হয়, সে জীবন সার্থক হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আশার সঞ্চার হইত না। তিনি বিদ্যালোচনার—সুখব্যতিরিক্ত ও—কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী উৎকৃষ্ট ফলের উপলব্ধি করিতে পারিতেন; কিন্তু বিদ্যালোচনা-জনিত সুখকে অন্যান্য-কারণোৎপন্ন সুখ অপেক্ষা উচ্চতর পদবী প্রদান করিতে পারিতেন না। সৎকর্ম্ম-জনিত সুখকেই তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিতেন এবং বলিতেন যাহারা যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে নাই তাহাদিগের বার্দ্ধক্য কি শোচনীয়! তিনি সর্ব্বপ্রকার অত্যাসক্তিকেই অন্তরের সহিত ঘৃণা এবং উন্মাদ-বিজৃম্ভিত বলিয়া মনে করিতেন। প্রাচীন সময়ের সহিত তুলনা করিলে, বর্ত্তমান যুগে অত্যাসক্তির ভাব অধিকতর প্রবল হইয়াছে বলিতে হইবে। এই অংশকে তিনি বর্ত্তমান যুগের নীতি-ভ্রংশের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে শুদ্ধ মনের ভাবের জন্য কেহ নিন্দা বা সুখ্যাতির ভাজন হইতে পারেন না। ন্যায় ও অন্যায় এবং ভাল ও মন্দ—কার্য্যের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কর্ত্তব্যের করণ ও অকর্ত্তব্যের অকরণকেই ন্যায্য ও ভাল এবং তাহার বিপর্য্যয়কেই অন্যায্য ও মন্দ কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কর্ত্তব্যের করণ ও অকর্ত্তব্যের অকরণ বা তদ্বিপরীত ইচ্ছা জন্য কেহ সুখ্যাতি বা নিন্দার ভাজন হইতে পারেন না। কারণ অনেক সময়ে সাধু ইচ্ছা হইতে অসাধু কার্য্যের এবং অসাধু ইচ্ছা হইতে সাধু কার্য্যের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য তিনি সাধু বা অসাধু ইচ্ছার জন্য কর্ত্তাকে সুখ্যাতি বা নিন্দা করিতেন না। কিন্তু কার্য্যের সাধুত্ব বা অসাধুত্ব দেখিয়াই কর্ত্তার সুখ্যাতি বা নিন্দা করিতেন। তাঁহার মতে সাধু কার্য্যের প্রবর্ত্তন ও অসাধু কার্য্যের নিরাকরণই সুখ্যাতি বা নিন্দার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যে অসাধু কার্য্য সাধু অভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে অসাধু কার্য্য অসাধু অভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই অসাধু কার্য্যদ্বয়ের তিনি কোনও প্রভেদ করিতেন না। তিনি কার্য্যের গুণাগুণ-বিচারে অভিপ্রায়ের সাধুত্বাসাধুত্ব গণনা করিতেন না বটে; কিন্তু কর্ত্তার চরিত্র নির্ণয়ে ইহার বিশেষ আবশ্যকতা

সন্ততঃ স্বীকার করিতেন। অতি অল্প লোককেই তাঁহার ন্যায়, কর্ত্তব্যবুদ্ধির ও অভিপ্রায়ের সাধুত্বের গৌরব করিতে দেখা যাইত। এবং এই দুই জানিতে না পারিয়া লোকের চরিত্র বিষয়ে কোন মত প্রচার করিতে অল্পলোকেই তাঁহার ন্যায় সঙ্কুচিত হইতেন। কিন্তু তিনি যদি জানিতেন যে কাহারও কর্ত্তব্যবুদ্ধি নিশ্চয়ই অসাধু কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। যাঁহাদিগের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জীবন্ মনুষ্যের অগ্নিদাহের অনুমোদন করে,—যাঁহাদিগের কর্ত্তব্যবুদ্ধি অচির-প্রসূত শিশুসন্তানের জলনিক্ষেপ প্রোৎসাহিত করে,—যাঁহাদিগের কর্ত্তব্যবুদ্ধি দীনা অনাথা বালবিধবার বৈধব্যদশা চিরস্থায়িনী করিতে চাহে,—যাঁহাদিগের কর্ত্তব্যবুদ্ধি লোক-লজ্জাভয়ে নিরীহ কুক্ষিস্থ জীবের প্রাণনাশ করিতে উল্লাসিত হয়, তিনি তাঁহাদিগকে ঘৃণা—অন্তরের সহিত ঘৃণা—না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

এরূপ পিতা—পুত্রের মনে যে প্রবল নীতির ভাব অঙ্কিত করিয়াছিলেন সে বিষয়ে আর বলা বাহুল্য। কিন্তু জেম্‌স মিলের সন্তানগণের সহিত নৈতিক সম্বন্ধের একটী অঙ্গহীনতা মিল্ স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি সন্তানগণের উপর কখনই স্নেহপ্রকাশ করিতেন না। তিনি যে অন্তরে তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতেন না—এরূপ নহে; কিন্তু তিনি ইংরাজদিগের জাতীয় স্বভাব বশে তাহা ব্যক্ত করিতে লজ্জিত হইতেন। এইরূপে তাঁহার অন্তরের স্নেহ পরিব্যক্তি-বিরহে ক্রমে অন্তরেই শুষ্ক হইয়া গেল। বিশেষতঃ জেম্‌স স্বভাবতঃ কোপনস্বভাব ছিলেন এইজন্য তাঁহার সন্তানেরা তাঁহাকে অতিশয় ভয় করিতেন। একে তাঁহারা পিতার মুখমণ্ডলে কখন স্নেহের ভাব উপলব্ধি করিতে পারিতেন না, তাহাতে আবার তাঁহাদিগকে সেই মুখমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে ক্রোধের জ্বালা দেখিতে হইত; সুতরাং কালে তাঁহাদিগেরও অন্তরে নবোদিত স্নেহের অঙ্কুর পরিপুষ্টি অভাবে বিশুষ্ক হইয়া গেল। জেম্‌স মিলের জীবনের শেষভাগে হৃদয়ের এই অস্বাভাবিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। এই জন্য তাঁহার শেষাবস্থার সন্তানগণ—তাঁহাকে অধিকতর ভাল বাসিতেন। মিল্ জননীর নিকট প্রায় থাকিতেন না। বাহ্য জগতের সহিতও তাঁহার বিশেষ সংশ্রব ছিলনা। তিনি পিতার নিকট পড়িতেন, পিতার সহিত আহার বিহার করিতেন। তিনি পিতা বই আর কিছুই জানিতেন না। কিন্তু সেই পিতা স্নেহ কাহাকে বলে পুত্রকে তাহা কখন দেখান নাই। সুতরাং পুত্রও পিতাকে কিরূপে ভাল বাসিতে হয় তাহা জানিতেন না। পিতাকে কিরূপে ভাল বাসিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন না বটে, কিন্তু পিতাকে কিরূপে ভক্তি ও ভয় করিতে হয় তাহা তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। অধিক কি তিনি পিতাকে

প্রভুস্বরূপ মনে করিতেন। এরূপ কঠিন শাসনে মিল্ উপকৃত বা অপকৃত হইয়াছিলেন তাহা তিনি স্বয়ংই বুঝিতে পারেন নাই; সুতরাং সে বিষয়ে আমরা কোন মত প্রকাশ করিতে চাহি না। তবে সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে—শাসন ও ভয়প্রদর্শন বালকদিগের শিক্ষার একটী অঙ্গ হওয়া উচিত। কারণ দেখিতে পাওয়া যায় অনেক সময় শুদ্ধ মিষ্ট ও অনুনয়ব্যঞ্জক বাক্যে তাহাদিগকে অপ্রীতিকর পাঠে নিয়োজিত করিতে পারা যায়না। বর্ত্তমানসময়ে—বালকদিগের পাঠনার বিষয় সকল তাহাদিগের সুখবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করিবার যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছে তাহা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তিনি ইহার অতিবৃদ্ধির কোনমতে অনুমোদন করিতেন না। যাহা সুখবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী তাহা বই আর কিছুই পড়িব না—বালকদিগের এরূপ মত দাঁড়াইলে শিক্ষাপ্রণালীর অবনতি বই উন্নতি হইবে না, এবিষয়ে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। তিনি শারীরিক দণ্ডবিধানের অতিশয় বিপক্ষ ছিলেন; এবং ভয়প্রদর্শন যদিও বালশিক্ষার একটী অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতেন, তথাপি ইহা স্নেহ ও বিশ্বাসের ভাব বিরহিত হইলে বালকদিগের অন্তরে সরলতার উৎস সংরুদ্ধ করিয়া, জগতের ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সংঘটিত করিবে তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিলনা।

ক্রমশঃ।

সঙ্গীতপথিক।

চীনসঙ্গীত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পাঠক! চীন-সঙ্গীতকে যখন আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলাম তখন অতি চমৎকার বোধ হইল—তখন আমাদের সঙ্গীতের অতি উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী সারঙ্গ ও ভূপালীর ন্যায় সুমধুর হইল ও আমাদের কর্ণ পরিতৃপ্ত করিল। যদি ও চীন-সঙ্গীত আমাদের বা অপরাপর আধুনিক জাতির সঙ্গীতের ন্যায় সমধিক উন্নতিশালী হইতে পায় নাই, তথাপি ইহা যে আদৌ মধুর তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত, চীন-সঙ্গীতসম্বন্ধে নানাবিধ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাদের অনেকেই এমতের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করেন। আমার আশ্রয়দাতার নিকট এতৎ-

সম্বন্ধে ইংরাজী জর্ম্মণি ও ফরাসিভাষায় রচিত কতকগুলি পুস্তক ছিল তিনি তাঁহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পড়িতে দেন। তিনি আমার মত জানিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সেমতের অনুমোদন করেন নাই বলিয়া আমাকে সেই সকল পুস্তক পাঠ করিতে দেন। অনন্তর আমি সে সকল পুস্তক পাঠ করিলাম—দেখিলাম, তাহারা অনেক স্থলে আমার মতের কোন পোষকতাই করে না। কেহ চীন-সঙ্গীতকে এক সময়ে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, আবার অন্য সময়ে অতি কদর্য্য বলিয়া নিন্দাও করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের অনেকেই চীনভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহাদের নিজের সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করিতে গিয়াই চীনসঙ্গীত ভাল বোধ করেন নাই। বস্তুতও সেরূপ করিলে শ্রুতিসমন্বিত পূর্ব্বাঞ্চলীয় কোন সঙ্গীতই তাঁহাদের শ্রবণপ্রেয় হইতে পারে না—হয় ও না। ডাক্তর ব্যর্ণি (Dr. Burney) তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "সঙ্গীত যত অসভ্য সাময়িক হয়, ততই অবৈজ্ঞানিক ও পদ্ধতিশূন্য হইয়া থাকে—চীনসঙ্গীতসম্বন্ধে অবিকল সেই রূপ, চীনজাতি যতই কেন স্বীয় সঙ্গীতের প্রশংসা করুণ না, চীনসঙ্গীত এখনও নিতান্ত অসভ্য সুতরাং বিজ্ঞান শূন্য রহিয়াছে।" *

পেরি আমিওট (Pere Amiot) † চীনসঙ্গীত বিষয়ে সুবিস্তীর্ণ পুস্তক লিখিয়াছেন, তিনি উক্ত সঙ্গীতের উৎপত্তি ও ক্রমান্বয় পরিবর্ত্তন প্রভৃতি বিস্তীর্ণ রূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন—চীনস্বরসম্বন্ধে অনেক লিখিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি পরিশেষে বলিয়াছেন যে, "আমি যাহা কিছু বলিয়াছি তাহার এখন কিছুই বুঝিতে পারি না" আবি রুসিএর্ নামক প্রসিদ্ধ ফরাসি দেশীয় চীন ইতিবৃত্ত লেখক বলিয়াছেন যে, চীনসঙ্গীত গ্রীকদিগের সঙ্গীতের ন্যায় কোন এক সম্পূর্ণ সঙ্গীতের অংশ মাত্র এবং সেই সম্পূর্ণ সঙ্গীত যে কোন্ জাতির ও কত কালের তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ডাক্তর ব্যর্ণি ডাক্তর লিণ্ডের (Dr. Lind)‡ মতের পোষকতা করিয়া বলেন যে, "চীনদেশীয় সমুদয় গৎ স্কটলণ্ডের পুরাতন গতের ন্যায়। চীনস্বরগ্রামকে স্কচ্ স্বর গ্রাম বলিলে অণুমাত্রও অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। চীন ও স্কচ্ এই উভয় জাতীয় গৎ অবিকল পুরাতন গ্রীসের গতের ন্যায়। এই তিন জাতিরই সঙ্গীত প্রাকৃতিক ও প্রকৃতি-মধুর"।

* Dr. Burney—Oriental music &c.

† Amiot (Messionaire á Pikin) mémoire Musique des Chinois tant anciens que modernes, Paris 1780 4 to. Mémoires concernant histoire, les sceinces, les arts, les mours, les usages, &c. des Chinois নামক প্রধান পুস্তকের ষষ্ঠখণ্ড।

‡ ইনি অনেকদিন চীনদেশে বাস করিয়াছিলেন এবং চীনসঙ্গীত ও চীনদেশীয় অন্যান্য বিষয়ে অধিক জানিয়া ছিলেন।

চীনসঙ্গীত সম্বন্ধে আরও অনেকে অনেক পুস্তক * লিখিয়াছেন তাঁহারা বলেন, চীনসঙ্গীতে পঞ্চস্বরে এক স্বরগ্রাম প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই স্বরগ্রাম পাঁচটী চীনঅক্ষরে পরিচিত হয়। চীনসঙ্গীতে দুই অর্দ্ধস্বর (Semi-tones) ব্যবহৃত হয়। কোন গৎ লিখিতে হইলে চীনেরা কোন রূপ রেখা বা চ্ছেদ ব্যবহার করে না, যেমন তাহারা বাদন করে সেই রূপে পর পর স্বর বিন্যাস করিয়া যায়। তাঁহারা কাল, লয় প্রভৃতি কিছুরই অনুধাবন করে না, পরিশ্রম ও অনুকরণ দ্বারা অভ্যস্ত করিয়া লয়।

চীনদের যন্ত্রসঙ্গীত কণ্ঠসঙ্গীত অপেক্ষা অণুমাত্রও ভাল নহে, বরং অনেকাংশে মন্দ ও অসম্পূর্ণ। সুতরাং যন্ত্রসঙ্গীতে যে স্বরগ্রাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাও নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও অসম্বদ্ধ—কখন কোমল কখন তীব্র; সেই জন্য বাজাইবার সময় মধ্যে মধ্যে ভঙ্গ হইয়া থাকে তাহারা সমানকার্য্য দেখাইবার নিমিত্ত ঘণ্টা বা অন্য কোন অনুগতসিদ্ধ যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা অনেকে সমবেত হইয়া বাদন করিতে যায় কিন্তু প্রকৃত সঙ্গীত বোধ তাহাদের অণুমাত্রও নাই। যখন লর্ড মাকার্টণের (Lord Macartney) দল তাহাদিগকে ইউরোপীয় সঙ্গীত শ্রবণ করাইয়া ছিলেন তখন তাহাতে তাহাদের অণুমাত্রও আমোদ বোধ হয় নাই, "গড্ সেভ্ দি কিং" (God save the king) এই জাতীয় গান তাহাদের নিকট গীত হইয়াছিল।

চীনদের কতকগুলি যন্ত্রে কখন কখন অকটেভ্ও বাদিত হইয়া থাকে।

চীনদের শুষির যন্ত্রসকল প্রায়ই

* Lay (G. Tradescant) The Chinese as They are; their Moral, Social, and Literary character, London 1841, 4 vo. Chapter VIII.

Music of the Chinese. For an interesting dissertation on the same subject by the same writer, see 'The Chinese Repository,' Cantor, 1840, 4 vo, P 38.

On the Musical Notation of the Chinese; by the Rev. E. W. Syle. See 'Journal of the North—China Branch of the Royal Asiatic Society.' Shanghai 1859, No 2 P. 176.

Histoire générale de la Chine, on Annales de cet Empire; traduites du *Tong-Kien-Kangmow* parle few Pére Joseph—Anne Marie de Moyriac de Mailla. Paris, 1777—83, 4 to 12 Vols, Vol. I P G, 26 III P, 8, IX P 607.

Du Halde (J. B.) Description de l' Empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise. A la Haye, 1736, 4 to 4 vols, vol, I PP 269—274; and vol III P 328 *De Leur Musique.*

Barrow (John) Travels in China. London, 1804, 4 to pp 81, 315, 318, 332, 483.

Bonnet. Histoire de la Musique et de ses effects. Paris 1715, 12 mo chapter VIII treats on the music of the Chinese.

Fink (G. W.) Die chinesesche Musik See 'Encyelopädie von Ersch und Gruber' vol XVI. P 373.

কর্কশ, তীব্র ও কুস্বর। ঢোলক, ঘণ্টা প্রভৃতির স্বর উচ্চ ও কর্ণবেধকর; এবং তত যন্ত্র সমূহ অতি সামান্য ও অল্প স্বর-সমন্বিত। ইহারা অনেকেই অতি পুরাতন, ইহাদের উৎপত্তিকাল মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য বলিলেও হয়।

কিন্তু চীনদেশে যতগুলি সঙ্গীতযন্ত্র আছে তন্মধ্যে আইসাক্ ভসিয়স্ (Issac Vossius) যে যন্ত্রকে আধুনিক ইউরোপের যাবতীয় সঙ্গীতযন্ত্রের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন সেই যন্ত্রই সমধিক সুমধুর; তাহার নাম টিবিয়া। এই যন্ত্র আয়তনে অতি ক্ষুদ্র ও কতকগুলি অসমদৈর্ঘ্য নল দ্বারা সুবদ্ধ। সেই নলসমষ্টির শিরোদেশে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত শূন্যগর্ভা বাটিকা আবদ্ধ থাকে। কিন্তু ডাক্তার ব্যর্নি যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াও তাহা বাজাইতে সমর্থ হন নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা চীনসঙ্গীত সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহাই হউক, উক্ত সঙ্গীত আমার নিকট অতি চমৎকার ও অতি সুশ্রাব্য বোধ হইয়াছে এবং আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আসিয়াস্থ এমন কোন লোকই নাই যাঁহার নিকট ইহা আদরণীয় হইবে না।

শ্রীশৌঃ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

শিশুপাঠ বাঙ্গালার ইতিহাস— শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত। বীডনযন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ।/৵০ আনা মাত্র। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, 'অল্প-বয়স্ক বালকবালিকাগণের অন্তঃকরণে ঐতিহাসিক বিবরণ সংলগ্ন করিয়া দেওয়া অতিশয় শ্রমসাপেক্ষ। গল্পচ্ছলে তদ্বিষয় লিপিবদ্ধ করিলে, তাহাদের সুকোমল হৃদয়-ক্ষেত্রে উহার বীজ যে বিলক্ষণ-রূপে সংরোপিত হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই"। গ্রন্থকারের এই মত অবিসম্বাদী। তিনি যে প্রণালীতে ঐতিহাসিক উপন্যাস গুলি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহাতে যে ইহা বালকবৃন্দের অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইবে তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ইহাতে কতকগুলি ভ্রম দৃষ্ট হইল। আশা করি গ্রন্থকার তৃতীয় সংস্করণের সময় সেই গুলির সংশোধন করিবেন।

রুদ্রপাল নাটক—ইংরাজি ম্যাক্‌বেথ নাটক অবলম্বন করিয়া শ্রীহরলাল রায় প্রণীত। কলিকাতা রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। সেক্‌সপীয়ার যে চারিখানি নাটক গ্রন্থের জন্য জগতে কবি-চূড়ামণি বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন, ম্যাক্‌বেথ্ তাহাদিগের অন্যতম। ম্যাক্‌বেথ্ যে পরিমাণে ইংরাজী

ভাষায় এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, সেই পরিমাণে ভাষান্তরে ইহার অনুবাদ অতি দুরূহ। কালিদাসের শকুন্তলা, ভবভূতির উত্তররামচরিত এবং সেক্সপিয়ারের হ্যাম্‌লেট্, ম্যাক্‌বেথ, ওথেলো ও কিং-লিয়ার কি রমণীয় দ্রব্য, অনুবাদ পাঠে তাহা কখনই উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। যাঁহারা মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট এরূপ উদ্যম বিড়ম্বনা মাত্র বলিয়া প্রতীত হইবে সন্দেহ নাই। তবে এরূপ উদ্যমের প্রয়োজন নাই একথা আমরা বলি না। মনুষ্যের প্রকৃতি এই যে কোন প্রিয়তম পদার্থ দেখিবার উপায় না থাকিলে, তাহার প্রতিকৃতি দ্বারাও চিত্তবিনোদন করিতে ইচ্ছা হয়। যাঁহারা মূল ভাষায় অনভিজ্ঞতানিবন্ধন মূল গ্রন্থ পাঠে অসমর্থ, অনুবাদ তাঁহাদের বিশেষ হিতকর ও হৃদয়গ্রাহী হইবে তদ্বিষয়ে আর দ্বৈধ নাই। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে কেবল এই মাত্র সাবধান করিয়া দিতেছি যে অনুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহারা যেন মূল কাব্যের উপর কোন মত সংস্থাপিত না করেন।

হরলাল বাবু বর্ত্তমান সময়ের এক জন প্রধান নাটকলেখক। তাঁহার রচনার মাধুর্য্যবিষয়ে আমরা অনভিজ্ঞ নহি। তাঁহার উপন্যাসগঠনচাতুরীও আমাদের অবিদিত নাই। তাঁহার এই গ্রন্থেও রচনামাধুর্য্য ও উপন্যাসগঠনচাতুরী দৃষ্ট হয় না এরূপ নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই গ্রন্থের যেখানেই পড়ি, সেই খানেই সেক্সপিয়রের ম্যাক্‌বেথ্ মনে আসে; অমনি নিদারুণ যাতনা উপস্থিত হয়। তখন অনুবাদক কি বঙ্গভাষা—কাহার উপর দোষারোপ করিব কিছুই স্থির করিতে পারিনা। যে মহাত্মা অচিরপ্রসূতা বঙ্গভাষার পরিপোষণের জন্য অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কঠিন বাক্যপ্রয়োগ করিতে আমাদের হৃদয়ে বেদনা উপস্থিত হয়। আর যে বঙ্গভাষা আমাদের হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তু, তাহাকেও নিন্দা বা ঘৃণা করিতে আমাদের অতিশয় কষ্ট বোধ হয়। তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হইল যে চিনাবাজারের ফটোগ্রাফ ও সাহেব বাড়ীর ফটোগ্রাফে যে অন্তর,—হরলাল বাবুর রুদ্রপাল ও সেক্সপিয়ারের ম্যাক্‌বেথে সেই অন্তর! ম্যাক্‌বেথের নায়ক (Hero) ও নায়কা (Heroine) ম্যাক্‌বেথ্ ও লেডি ম্যাক্‌বেথ; এবং রুদ্রপালের নায়ক ও নায়িকা রুদ্রপাল ও চতুরিকা। মূল ও অনুবাদ—উভয় গ্রন্থ হইতেই উভয় গ্রন্থের নায়ক ও নায়িকার দুই একটী বক্তৃতা পাঠ করিয়া পরস্পর তুলনা করিলেই পাঠকবর্গ আমার এই তুলনার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা দুঃখিত হইলাম যে স্থানাভাবে সেগুলি এখানে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

যে যে স্থলে সেক্সপিয়ারের ম্যাক্‌বেথের উচ্চ আদর্শ আমাদের মনোনয়নের সম্মুখে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, সে সে স্থলে হরলালবাবুর রচনা ও চিত্র আমাদের

নিকট ম্লান ও নির্ব্বীর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু গ্রন্থকার যে ২ স্থলে আদর্শের অনুবর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিয়াছেন—যে যে স্থলে কোন উচ্চ আদর্শের সহিত তুলনা আমাদের যুক্তিকে বিচলিত করিবার নাই—সে ২ স্থলে তিনি[illegible]র রচনা ও চিত্র আমাদের অধিকতর হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বোধ হইল। যে স্থলে গ্রন্থকার ম্যাক্‌বেথের ডাকিনীদিগের (Witches) দৃশ্যের অনুসরণ না করিয়া ভৈরবীত্রয়ের দৃশ্য আবির্ভূত করিয়াছেন,—যে স্থলে তিনি পর্য্যঙ্কে নিদ্রাবস্থায় শয়ান রণবীরের (Macduff) শিশুসন্তানের নিদ্দয় ঘাতক দ্বারা হত্যাকাণ্ড সংসাধিত না করিয়া, তাহা দ্বারাই রুদ্রপালের ভীষণ হস্ত হইতে তদীয় মুক্তি বিধান করিয়াছেন—সেই ২ স্থলে তিনি মূল অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। সেক্‌সপিয়ার যে সময় জীবিত ছিলেন সে সময়ে লোকে ডাকিনীদিগের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিত; সুতরাং ডাকিনীদিগের দৃশ্য সে সময়ের লোকদিগের নিকট কোনপ্রকারে অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীত হয় নাই। কিন্তু সেই দৃশ্য এক্ষণে বঙ্গভাষায় অঙ্কিত হইলে অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীত হইত সন্দেহ নাই।—গ্রন্থকার তৎপরিহারপূর্ব্বক ভৈরবীর দৃশ্য আবিষ্কৃত করিয়া সহৃদয়তারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সেক্‌সপিয়ারলিখিত যে নাটক গুলি অতিদারুণ (Over-tragic) বলিয়া খ্যাত, ম্যাক্‌বেথ তাহার অন্যতম। উপর্য্যুপরি হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ-গোচর করিলে মনে করুণার সঞ্চার না হইয়া —বরং নিস্পৃহতা জন্মে। এইটীই সেক্‌সপিয়ারের নাটক-রচনার প্রধান দোষ। গ্রন্থকার এই দোষের অনুবর্ত্তন না করিয়া রণবীরের পরিবারবর্গের যে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। কিন্তু ইনি পিশাচদিগের অস্বাভাবিক দৃশ্যের কেন অবতারণা করিলেন বলিতে পারি না। এরূপ দৃশ্য কোনপ্রকারেই এ সময়ের উপযোগী নয়। যাহা হউক যদি সেক্‌সপিয়ারের ম্যাক্‌বেথের সহিত তুলনা না করা যায়, তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে, যে রুদ্রপাল বাঙ্গালা ভাষায় একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় নাটক। উপসংহারকালে আমরা গ্রন্থকারকে বন্ধুত্বভাবে এই মাত্র অনুরোধ করি—তিনি যেন নির্ব্বীর্য্য বাঙ্গালাভাষাকে আরও নির্ব্বীর্য্য করিতে চেষ্টা না করেন, এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে গ্রাম্যতা দোষ পরিহার করেন।

মনোরমা।—শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী প্রণীত। নূতন ভারত যন্ত্রে শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রিত। মূল্য ৷৷৵০ আনা মাত্র। আমরা গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। কবিতাগুলি যদিও উৎকৃষ্ট হয় নাই, তথাপি স্ত্রীলোকের রচিত বলিয়া আমরা ইহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশা করি বঙ্গকামিনীগণ আলস্য পরিত্যাগ করিয়া হেমাঙ্গিনীর দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিবেন।

সন১২৮১ সালের মূল্যপ্রাপ্তি।

অগ্রহায়ণ মাস।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্ন
কৃষ্ণনগর ৩।৵০
„ বাবু উপেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র ঢাকা ৩।৵০
„ কেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলি-
কাতা সংস্কৃত কালেজ ২৲
„ কুঞ্জবিহারী ঘোষ বাবুগঞ্জ—
হুগলি ৩।৵০
„ কুমুদচন্দ্র বসু চট্টগ্রাম ৩।৵০
„ যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বসিরহাট ১৸৵০
„ অঘোরনাথ অধিকারী
তমোলুক ১।৷৵১০
„ বসন্তকুমার মিত্র রাজঘাট
যশোহর ৩।৵০
„ প্রিয়নাথ ঘোষ আলাটি স্কুল ১৸৶০
„ রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়
ধাত্রীগ্রাম ৩।৵০
„ গৌরীপ্রসাদ মজুমদার
ধাত্রীগ্রাম ৩।৵০
„ দক্ষিণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ফিরোজপুর ১৸৵০
„ যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বিষ্ণুপুর ৩।৵০
„ ফকিরচন্দ্র পাল
জন এলিয়টের বাটী ৩৲
„ সনাতন দাস কলিকাতা ১৲
„ রাখালদাস অধিকারী
চন্দননগর ৶০
„ নেপালচন্দ্র হালদার কলিকাতা ৩৲
„ কৈলাসচন্দ্র ঘোষ রায়না ৵০
„ নৃসিংহচন্দ্র হালদার
কলিকাতা ১৲
„ শ্রীনাথ মিস্ত্রী মগরার হাট ৩৵১০
„ নীলমণি মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা ১।০
„ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ মজুমদার
রহনপুর— ৩।৵০
„ মহেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়
পূর্ণীয়া ৩।৵০
„ শশীভূষণ বসু চন্দননগর ১।৵০
„ রামগোপাল বেদান্ত লক্ষ্মৌ ৩।৵০
„ বেচারাম চক্রবর্ত্তী নবগ্রাম ৩৲
„ ষষ্টিবর ভট্টাচার্য্য কলিকাতা ১৲
„ মহিমচন্দ্র মজুমদার চৌয়া ৩।৵০
„ রাজেন্দ্রচন্দ্র শ্রীবাটী ৵১০
„ হরিপ্রসন্ন রায় চন্দনপুর ৩।৵০
„ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোধ্যায়
চাঁচল ৩৲
„ মতিলাল চৌধুরী কলিকাতা ১৸০
„ সুবলচন্দ্র ঘোষ ঐ ১৲

বিজ্ঞাপন।

সুদর্শন।

আগামী পৌষ মাস হইতে প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে এক এক ফর্ম্মা আকারে উক্ত নামে এক খানি মাসিক পত্র প্রচারিত হইবে। ইহাতে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও নীতি সম্বন্ধীয় বিষয় অল্প অল্প করিয়া সরল ভাষায় লিখিত হইবে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ছয় আনা ডাকমাশুল সমেত বার আনা। গ্রহণার্থীগণ পটলডাঙ্গায় ক্যানিং লাইব্রেরীতে আমার নামে পত্রাদি লিখিবেন।

শ্রীঅধরচন্দ্র বসু।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজয়সিংহ। মূল্য ৸৶৹। গল্পটী সাজান মন্দ হয় নাই। সাধারণতঃ ভাষা ও বর্ণনাদি বিষয়ে গ্রন্থ খানি মন্দ হয় নাই। অনেক গ্রন্থের কয়েক পত্র পড়িয়াই, তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু সে ধাতুর নহে। ইহার শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল—বিরক্তি বা অরুচি জন্মে নাই।

মধ্যস্থ।

গ্রন্থ খানি বিশেষ উচ্চ দরের না হইলেও পাঠের উপযোগী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রচনা মন্দ নহে। ইহার স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট স্বভাব বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ ইহার শ্মশান বর্ণনাটী অতি সুন্দর হইয়াছে।

আর্য্যদর্শন।

১° নং মৃর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট নূতন ভারত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, কালেজ ষ্ট্রীট ৫৫ নং ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১০ নং ভবনে কৃষ্ণমোহন কুণ্ডের দোকানে প্রাপ্তব্য।

হিতবোধ।

মাসিক পত্র। প্রতি মাসের শেষ দিবসে প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য মায় পোষ্টেজ ১৷৴৹ আনা। ইহাতে গদ্য পদ্য রচিত বিবিধ হিতকর প্রবন্ধ সকল লিখিত হইতেছে। কয়েকটী ইংরাজী স্কুলের কৃতবিদ্য হেড মাষ্টার ও কয়েক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ—বি, এ, ও এম, এ উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তি ইহার রীতিমত লেখক। নিম্ন স্বাক্ষরিতের নিকট প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মেমারী অন্তর্গত ভাঙ্গামোড়া ডাকঘর	শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত হেডমাষ্টার ভাঙ্গামোড়া স্কুল।

মৃণ্ময়ী।

কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ।
শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা এবং মফঃস্বলের ডাক মাশুল ৶৹ তিন আনা। কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে এবং নং ১ মৃজাপুর ষ্ট্রীট নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

ভারতচন্দ্র রায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিদ্যার সহিত সুন্দরের প্রেমমিলন সংঘটন করিবার পূর্ব্বে, ভারতচন্দ্র কথঞ্চিৎ বিদ্যার পূর্ব্বরাগ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। এই পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় বিদ্যার প্রণয়-সুকুমার হৃদয়ের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতচন্দ্র বিদ্যাকে আমাদিগের সমক্ষে আনিয়াই একেবারে সেই ললনারত্নের হৃদয়-কবাট উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। আমরা কোথায় তাঁহার রূপলাবণ্য ক্ষণেক অনুভব করিব, না একেবারে তাঁহার হৃদয়ের উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইয়া যাই। প্রথম সাক্ষাতেই আমরা বিদ্যার রূপ যৌবন ভুলিয়া যাই। রূপ যৌবন ভুলিয়া তাঁহার হৃদয়ভাবের প্রতি আমাদিগের একেবারে দৃষ্টি পড়ে। পূজার বেলা অতীত হওয়াতে মালিনার প্রতি কুপিতা রাজনন্দিনী যে প্রকার তিরস্কার করিয়াছিলেন—তাহাতে কেমন একটি মধুরতা, নম্রতা, ও সহৃদয়তা আছে, যাহা বিদ্যার মত রাজনন্দিনীরই উপযুক্ত।

"শুনোলো মালিনী কি তোর রীতি।
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হলো পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥
বুক বাড়িয়াছে কা[illegible]গে।
কালি শিখাইব মা[illegible]গে॥
* * * * * *
দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা।
মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস হেলা।"

ইত্যাদি

আমরা পূর্ব্বে রাজরাণীর কোপভাব প্রদর্শন করিয়াছি, সে চিত্রের সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখুন, তাহা হইলে ইহার প্রভেদ স্পষ্ট প্রতীত হইবে। উদ্দীপক কারণ এবং বিষয়ের তারতম্য বশতঃ হৃদয়ভাবেরও তারতম্য হয় বটে, যদিও রাজনন্দিনীর ক্রোধোদ্দীপক কারণ তত গুরুতর নয় সত্য, কিন্তু ক্রোধরিপু অত্যন্ত অন্ধ। এই রিপুর তারতম্য তত বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। যাহাকে আক্রমণ করে, তাহার প্রকৃতির উপর এই রিপুর প্রভাব নির্ভর করে। অন্যান্য রাজনন্দিনীর ন্যায় বিদ্যা যদি কোপনস্বভাব, গর্ব্বিণী অথবা অভিমানিনী হইতেন, তাহা হইলে মালিনীর এই সামান্য দোষেই তাঁহার ক্রোধের প্রবল প্রভাব প্রকাশ হইত। কিন্তু বিদ্যার হৃদয় সে প্রকার ছিল না। বিদ্যার সুকুমার প্রকৃতির সহিত কর্কশতা ও কাঠিন্য সমঞ্জসী-

ভূত হয় না। লাঞ্ছনা তাঁহার কোমল স্বভাবের উপযোগী নহে। মালিনীর কতিপয় বিনয়-নম্র বাক্যে সে হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল। অমনি

"বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ।
অস্ত গেল রোষ উদয় রস॥
বিদ্যা বলে গাঁথি চিকণ হার।
এ গাঁথনি আই নহে তোমার॥
পুনঃ কি যৌবন ফিরি আইল।
কিবা কোন বঁধু শিখায়ে দিল॥"

তৎপরে বিদ্যা যখন সুন্দর-গ্রথিত মোহন মালা অবলোকন করিলেন অমনিঃ—

"শীহরিল ধনী দেখিয়া কল।"

ইহার কারণ এই, তাঁহার হৃদয় পূর্ব্বেই প্রেমবিনত হইয়াছিল; এক্ষণে সেই হৃদয় বিষয় পাইল। এজন্য, মালিনী যখন সুন্দরের পরিচয় দিলেন তখন তাঁহার হৃদয় কিরূপ সুকুমার ভাবে বিগলিত হইয়াছে দেখুনঃ—

"হীরা এত বলি, ছলে যায় চলি,
আঁচল ধরিল ধনী।
মাথার কিরায়, হীরায় কিরার,
মণি ধরে যেন ফণী॥
এস এস এয়ো, ছোক মেনে যেয়ো,
বল সে কেমন জন।
কি কথা কহিলে, কি ফেরে ফেলিলে,
উড়ু উড়ু করে মন॥"

তখন হীরা সুন্দরের রূপ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইল। হীরার রূপ বর্ণনায় বিদ্যার মন মোহিত হইল। বিদ্যার হৃদয় হইতে পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞার দৃঢ়ভাব তিরোহিত হইয়াছিল। এজন্য তিনি বিদ্যায় জয়লাভ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং রূপবর্ণনা শেষ হইবা মাত্র বলিলেনঃ—

"জিনিবেন যেজন সে জন বুঝি এই।
বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই॥
ভাবিয়া মরিয়া ছিনু প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া॥
* *
কেমন প্রকারে তারে দেখাবে আমায়।
ভাবহ মালিনী আই তাহার উপায়॥
মোর বালাখানার সম্মুখে রথ আছে।
দাঁড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাছে॥"

এই কথা বলিয়া মালিনীকে বিদায় দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় প্রেমময় হইয়া রহিল। তাঁহার এই স্থলের চিত্তভাব কেমন সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে দেখুনঃ—

"এই রূপে মালিনীরে করিয়া বিদায়।
বড় ভক্তিভাবে বিদ্যা বসিল পূজায়॥
*
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন আসন ভূষণ।
দেবীরে অর্পিতে করে বরে সমর্পণ॥
সুগন্ধ সুগন্ধি মালা দেবী গলে দিতে।
বরের গলায় দিনু এই লয় চিতে॥"
ইত্যাদি

ইহার পরে, সঙ্কেত স্থলে বিদ্যাসুন্দরের শুভ দর্শন ঘটে। নায়ক নায়িকার প্রথম দর্শনচ্ছলে যদি কোন বঙ্গীয় কাব্যে কোন সুন্দর দৃশ্য কল্পিত হইয়া থাকে, তাহা বিদ্যাসুন্দরে পরিদৃষ্ট হয়। বিদ্যা ও সুন্দ-

রের প্রথম দর্শনদৃশ্য চিত্রকরের একটি সুন্দর বিষয়। সেকস্পিয়ার রোমিও এবং জুলিয়েট নামক দৃশ্যকাব্যে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য্য কেমন উদ্দীপক এবং ভাবপূর্ণ ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন! সেকস্পিয়ার এ দৃশ্যকে নাটককারের সমুচিত ভাবে প্রদর্শিত করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র ইহাকে চিত্রকরের ন্যায় চিত্রিত করিয়াছেন। সেকস্পিয়ারের নায়ক, দৃশ্যের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া সমুচিত ভাষায় হৃদয়ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের নায়কনায়িকার হৃদয়ভাব অব্যক্তব্য। তাহা কেবল ভারতচন্দ্রের কল্পনাচক্ষে সুবর্ণরেখায় পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল। দর্শনস্থলে বিদ্যা ও সুন্দর উভয়েই নীরব; কিন্তু তাঁহাদিগের নীরবভাব কেমন প্রেমপূর্ণ দেখুনঃ—

"শুভক্ষণে দরশন হইল দুজনে।
কে জানে যে জানাজানি সুজনে সুজনে॥
অনিমিষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ॥
বিপরীত বিপরীত উপমা কি দিব।
উর্দ্ধে কুমুদিনী হেটে কুমুদ বান্ধব॥
দুঁহার নয়ন ফাঁদে ঠেকিয়া দুজনে।
দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনের মনে॥
মনে মনে মনআশা রঙ্গে করিয়া।
ঘরে গেলা দুঁহে দুঁহা হৃদয় লইয়া॥
আঁখি পালটিয়া ঘরে যাওয়া হল কাল।
ভারত জানয়ে প্রেম এমনি জঞ্জাল॥"

চিত্রকর এবং অভিনেতার এই একটি সুন্দর দৃশ্য। নায়ক নায়িকার এই রূপ দর্শন, তাঁহাদিগের নিকট স্বর্গীয় সুখপূর্ণ। তাঁহাদিগের সমস্ত জীবনে এপ্রকার ভাবপূর্ণ সুন্দর সময় আর কখন ঘটে না। সুন্দরকে দেখিয়া বিদ্যা একেবারে বিমোহিতা হইয়াছিলেন। তাঁহাকে তিনি অমনি আত্মসমর্পণ করিলেন। এখন তাঁহার মনে ভাবনা হইল, কেমনে সুন্দরকে লাভ করিবেন। পাছে তাঁহাকে লাভ করিতে না পারেন, এই আশঙ্কায় তিনি আর প্রকাশ্য বিবাহ পথে যাইতে সাহসিনী হইলেন না। পাঠকগণ! এই স্থলে তাঁহার হৃদয়ভাব অবলোকন করুন্ঃ—

"হীরা বলে ঠাকুরাণী,
কিবা কর কানাকানি,
শুভকর্ম্ম শীঘ্র হৈলে ভাল।
আপনি সচেষ্ট হও,
রাজারে রাণীরে কও,
আঁধার ঘরেতে কর আল॥
বিদ্যা বলে চুপ চুপ,
যদি ইহা শুনে ভূপ,
তবে বিয়া হয় কিনা হয়।
গুণসিন্ধু মহারাজ,
তারপুত্র হেন সাজ,
বাপার না হইবে প্রত্যয়॥

এমতি বুঝিলে বাপা,
এমনি রহিবে চাপা,
অন্য দেশে যাইবে কুমার।
সব কর্ম্ম হবে নট,
তুমিত সুবুদ্ধি বট,
তবে বল কি হবে আমার॥

তেঁই বলি চুপে চুপে,
বিয়া হক্ কোন রূপে,
শেষে কালী যা করে তা হবে।
হীরা কহে শীহরিয়া,
'লুকায়ে করিবে বিয়া,
একি কথা ছাপাত না রবে॥"

সুন্দরের প্রতি বিদ্যার আত্মসমর্পণ এস্থলে কেমন প্রত্যক্ষ-প্রতীয়মান হইতেছে। ভারতচন্দ্র এস্থলে বিদ্যার হৃদয়ের অতি প্রচ্ছন্ন দেশ পর্য্যন্ত আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। আমরা একত্রে বিদ্যার আশঙ্কা, আত্মসমর্পণ, প্রগাঢ় প্রেমানুরাগ সকলই সন্দর্শন করি। আহা, এই চিত্রটি পূর্ব্বরাগের কি সুন্দর চিত্র! তাহার পূর্ব্বরাগের কমনীয়তা আমরা বিলক্ষণ অনুভব করি। এই প্রেমানুরাগ ক্রমশঃ গভীরতর হইতে লাগিল। মিলন ভিন্ন তাহার আর তৃপ্তি সাধন হয় না। এজন্য বিদ্যা অস্থির হইলেন। রজনীতে তাঁহার নিদ্রা নাই। এমত সময়ে সুন্দর অকস্মাৎ সুড়ঙ্গপথে বিদ্যার মন্দিরে উপনীত হইলেন। এই অবধি বিদ্যাসুন্দরের প্রেমমিলন আরম্ভ হইল।

ভারতচন্দ্র, বিদ্যাসুন্দরের প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন। যে সমস্ত বঙ্গীয় কবি প্রেম বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কেহ প্রেমের পূর্ব্বরাগ, কেহ বা সম্ভোগ কেহ বা বিপ্রলম্ভ বর্ণনে সফলতা লাভ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র, বিদ্যার পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় যে প্রকার চমৎকার কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্ভোগে বা মিলনে যে দাম্পত্যপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বর্ণন করা, পূর্ব্বরাগ এবং বিপ্রলম্ভ বর্ণনাপেক্ষা কঠিনতর। পূর্ব্বরাগ ও বিপ্রলম্ভে কবি, নায়ক ও নায়িকার নানাবিধ অবস্থা, সময় ও স্থান কল্পনা করিয়া তাহাদিগের চিত্তবেগ স্পষ্টরূপে দেখাইতে পারেন। কিন্তু মিলনে দম্পতি উভয়ে একত্র উপস্থিত। উভয়ের হৃদয়ের ভাব বিশদরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য যে প্রকার বিবিধ অবস্থায় উভয়কে সংস্থাপিত করা আবশ্যক, মিলনে তাহা সংঘটন করা সুকঠিন। এই সমস্ত অবস্থা অথবা সংস্থান-কল্পনায় সমধিক নিপুণতা চাই। এই সংস্থান সকল যদি উপযোগী ঘটনা দ্বারা সংঘটিত না হয়, তাহা হইলে দম্পতির হৃদয়ভাব প্রকাশের অবসর ঘটে না; সুতরাং সে স্থলে সামান্যতঃ মিলন ঘটে। সে প্রকার মিলনে কেবল ইন্দ্রিয়পরতার পরিচয় হয়, হৃদয়ভাব কেবল ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে পরিব্যক্ত হয়। বিদ্যাসুন্দরের মিলন-বর্ণনায় এই দোষ ঘটিয়াছে ঃ—

বিদ্যা ও সুন্দর, যুবক ও যুবতী; তাঁহাদিগের নব প্রেম। যৌবনরাগের প্রাবল্য অধিকন্তু ইন্দ্রিয়সুখ-লালসাও তাহারই তৃপ্তি সাধনে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসুন্দরে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই, তরুণবয়স্ক সুন্দর তরুণী বিদ্যাকে পাইয়া ইন্দ্রিয়-সুখে একে-

বারে উন্মত্ত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র এই উন্মত্ততা যে প্রকার বর্ণন করিয়াছেন, তাহা যুবজনোচিত তাহার আর সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু এতদূর অশ্লীল না হওয়াই ভাল ছিল। সে যাহা হউক; যৌবনরাগের এরূপ প্রমত্ততা নিশ্চয় স্বাভাবিক বলিতে হইবে। এজন্য সুন্দর প্রমত্ত প্রেমিক এবং ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার প্রেম দূষিত নহে। সুন্দর লম্পট নহে। সুন্দরের প্রেম, নবানুরাগী যুবজনের প্রেম, তাহা লম্পটের প্রেম নহে। বিদ্যা যেমন সুন্দরের প্রীতি অনুরাগিণী, সুন্দরও তেমনি বিদ্যার জন্য লালায়িত। সমানুরাগে ইহাঁরা পরস্পরের প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। সুন্দরের পুরুষজাতীয় ধর্ম্ম—তাঁহার অধীরতা, এবং ইহা ভাবপ্রাবল্যে প্রকাশিত হয়; বিদ্যার স্ত্রীজাতীয় ধর্ম্ম—তাঁহার ধীরতা, এবং ইহা ভাবের সৌকুমার্য্যে প্রকটিত হয়। সুন্দরের ইন্দ্রিয়পরতা ও অধীরতার অপর দিকে বিদ্যার বিশুদ্ধ প্রেম-সুকুমার হৃদয় স্থাপিত হইলেও একটি বিষম দোষ বর্ত্তিয়াছে। সুন্দরের ইন্দ্রিয়পরতার দৃশ্য সকল বারম্বার বর্ণিত এবং তাহাতে এত উজ্জলবর্ণ বিনিয়োগ করা হইয়াছে, যে তাহাতে পাঠকের হৃদয়ে অতি প্রবল ভাবের উদ্রেক হয়। সুন্দরের ইন্দ্রিয়পরতার দৃশ্যসমূহ দ্বারা যে ভাবোদয় হয়, বিদ্যার বিশুদ্ধ প্রণয়ের উদ্দীপনা দ্বারা যদি তাহা বিনষ্ট হইত অথবা সেই ইন্দ্রিয়পরতার হীনতা প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে এই ইন্দ্রিয়পরতার ভাবোদ্দীপনায় কথঞ্চিৎ শমতাবিধান হইত। কিন্তু ভারতচন্দ্র, বিদ্যার প্রণয়-কল্পনার দৃশ্য সকলকে তত প্রবল ভাবোদ্দীপক করিতে পারেন নাই, সুতরাং সুন্দরের ইন্দ্রিয়সম্ভোগিতাই প্রবল হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য এই নায়ক নায়িকার প্রেম বর্ণনায় তাঁহার কাব্যকে তিনি কলঙ্কিত করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়পর-প্রেম-সূচক রসবর্ণনার জন্য ভারতচন্দ্র কলঙ্কিত বটে: কিন্তু পুরাতন বঙ্গীয় কোন্ কবি এই দোষে দূষিত নহেন? বঙ্গবাসী চিরকাল বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পর। সুন্দর সেই বঙ্গবাসীরই প্রতিকৃতি। ভারতচন্দ্রের সময়ে, অথবা তৎপূর্ব্বকালে বঙ্গধাম বিলাসিতায় পূর্ণ ছিল। ইন্দ্রিয়সুখাসক্তি তখনকার বঙ্গবাসিগণের রুচিকে পরিচালন করিত। যে কাব্যে ইন্দ্রিয়পর প্রেম নাই, সাধারণ জনগণ তাহা রসবিহীন জ্ঞান করিত। ভারতচন্দ্র সেই সময়ের লোক। বিদ্যাসুন্দর সেই সময়ের ফল। সেকালে অন্য কোন প্রকার কাব্য রচনা করিতে হইলে, তাহাতেও আদিরস মিশ্রিত করিতে হইত। কবিকঙ্কনের চণ্ডীতেও আমরা এই আদিরসের অসদ্ভাব দেখি না। শিব-বিবাহ এবং কুমারের জন্মকথনচ্ছলে কবিকঙ্কন কি অশ্লীলতার কিছু বাঁকি রাখিয়া গিয়াছেন? তখনকার কবিরা জ্ঞান করিতেন যে, নবরস বিদ্যমান না থাকিলে কোন কাব্যের গৌরব হয় না। অতএব, ইউরোপীয়

কাব্যাবলির গুণনিচয় দ্বারা দেশীয় কাব্যাবলির গুণাগুণ পরীক্ষা ও বিচার করা কখন যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। ভারতচন্দ্র সে সমস্ত গুণের কুত্রাপি আদর্শ প্রাপ্ত হন নাই। যে নিয়ম দ্বারা যিনি চালিত হন নাই, সে নিয়ম দ্বারা তাঁহাকে পরীক্ষা করা অন্যায়। ভারতচন্দ্র যে প্রকার কবি ছিলেন তাঁহাকে তৎ-সমুচিত সম্মান দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। ভারতচন্দ্রের যাহা দোষ তাহা সময়ের রুচির দোষ।

ভারতচন্দ্র যখন যাহা বর্ণনা করিতেন, তাহা স্বাভাবিক, তাহাতে অচিরাৎ হৃদয়-ভাব উদ্বোধিত করিয়া দেয়। তাঁহার ভাববর্ণনা পড়িবার সময় আমাদিগের স্মরণ থাকে না যে, আমারা কিছু অধ্যয়ন করিতেছি। এই বর্ণনাসমূহ এরূপ সরল অথচ অনুরূপ ভাষায় বিরচিত যে, পাঠ মাত্রেই তদ্বিষয়ক হৃদয়ভাব আমাদিগের মনে সহজেই প্রতিভাত হইয়া পড়ে। পড়িবার সময় মনে হয় আমরা যেন এক খানি চিত্র দেখিতেছি। এই এক একটি ভাব-সঞ্চারী বর্ণনা এক একটি কল্পনা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জ্ঞানোদ্রেক অথবা জ্ঞানের বিশুদ্ধি সাধন করা কবি-কল্পনার উদ্দেশ্য নহে। ভারতচন্দ্র ইহা বিলক্ষণ জানিতেন। প্রমাণ স্বরূপ আমরা তদ্বিরচিত মানসিংহ কাব্য হইতে কতিপয় পঁক্তি উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে, সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥"
প্রাচীন পণ্ডিত গণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা, কাব্য, রস লয়ে॥"

বাস্তবিক, ভাবের উদ্রেক করা, এবং অন্যূন কিছুকালের জন্য হৃদয়ে ভাবের স্থায়িত্ব বিধান করা কবিকল্পনার উদ্দেশ্য। যে কাব্যে যত গুলি ও যত প্রকার কল্পনা থাকে, তৎপাঠে ততগুলি ও তত প্রকার ভাবউদ্রিক্ত হয়। সেই সমস্ত ক্রম-সঞ্চারিত ভাব পরিশেষে যে স্থায়ীভাবে পর্য্যবসিত ও পরিণত হয় তাহাই কাব্য পাঠের ফল, এবং তদ্দারাই কাব্যবিশেষের পরীক্ষা হয়। বিদ্যাসুন্দরে প্রথমে নায়ক নায়িকার প্রেমভাব বর্ণিত হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু তদ্দারা যে ভাবোদ্রিক্ত হয়, সেই ভাব ক্রমশঃ কেমন অপরাপর অন্য-বিধ ভাবসঞ্চার দ্বারা প্রশমিত, স্থানান্তরিত এবং বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। "কাব্যের উন্নতি ক্রমে আমরা দেখিতে পাই, নায়কের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা লাঞ্ছিত হইয়া কেমন বিশুদ্ধ প্রেমে পরিণত হইতেছে। সর্ব্বশেষে নায়ক ও নায়িকাকে বিশুদ্ধ প্রেমিক ও প্রেমিকা রূপে আমাদিগের হৃদয়াসনে স্থানদান করিয়া পুস্তক পরিসমাপ্ত করি।"

বিদ্যাসুন্দরের প্রেমবৃত্তান্ত পাঠকালীন আমাদিগের হৃদয় যে ভাবে সঞ্চালিত হয়, বিদ্যার গর্ভসংবাদ শুনিবামাত্র তাহা অমনি হৃদয়ে বিলীন হইয়া যায়। অমনি বোধ হয় অচিরাৎ আমাদিগের

শিরে বজ্রাঘাত হইল। আমরা চমকিয়া উঠিলাম। এই ভাবের একটু প্রশান্তি হইলে, স্থির বুদ্ধিতে তখন ভাবিতে থাকি; এই ঠিক হইয়াছে, গোপনীয় প্রণয়ের এই প্রকৃত প্রতিফল। স্বেচ্ছাচারিতার পথে এই কণ্টক। বিশ্বনিয়ন্তার এই ধর্ম্মনৈতিক শাসন। প্রণয়ের এই এক পরিসীমা। আমারাও তখন সখিগণের সঙ্গে বলিয়া উঠিঃ—

"লুকায়ে এসব কথা রাখা নাকি যায়।
লোকে বলে পাপ কায কদিন লুকায়॥"

তখন সখিগণের সহিত আমরাও "বিরসবদন" হই। পূর্ব্বকার সমুদায় ভাব এখন হৃদয় হইতে অন্তরিত হয়। পূর্ব্বে আমরা পার্থিব সুখে চঞ্চল হইয়াছিলাম, এসময় হইতে ভারতচন্দ্র আমাদিগকে এক স্বতন্ত্র রাজ্যে আনয়ন করিলেন। এই ক্ষণ হইতে আমরা এক ধর্ম্মনৈতিক রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। এই রাজ্যে উপস্থিত হইয়া একদা বিদ্যার সখিগণকে তিরস্কার করিতেছি, একবার বিদ্যাকে গঞ্জনা দিতেছি, পরে ভূপতিকে ধিক্কার দিই, অনন্তর চোরকে সলজ্জভাবে রাজসভায় আনয়ন করি, মালিনীকে দেশান্তর করিয়া দিই, সুন্দরকে মশানে লইয়া যাই; কিন্তু তাহাকে কাটিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই অমনি স্বাভাবিক ভাবে ব্যথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ "নয়ন ঠারিয়া" নিবারণ করিয়া মনে মনে কহিতে থাকি :—

"কাটিতে বাসনা নাহি ঠেকেছি মায়ায়।"

হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, মমতা সঞ্চারিত হইতে থাকে। রাজার সহিত বিগলিত হইয়া ভাবিতে থাকি, বাস্তবিক বিদ্যাসুন্দরের প্রেমসংঘটনায় কি কিছু দূষণীয় আছে? কখনই নহে। ইহাদিগের প্রেম বিশুদ্ধ প্রেম। যে প্রেমের জন্য বিদ্যা আকুলিত কুন্তলে কাঁদিয়াছিলেন সে প্রেম কি পবিত্র নহে? বিদ্যার সেই প্রেমপবিত্র হৃদয় ব্যথিত হইবার কখন উপযুক্ত নহে। যে সুন্দর বিদ্যার জন্য এত উন্মত্ত হইয়াছিলেন যেঃ

"কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছয়মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিলা অশ্বমনোরথ॥"

যিনি একদা ধ্যানে, জ্ঞানে বিদ্যাকে জপমালা করিয়াছিলেন, যাঁহার মুখে আর কিছুই ছিল না—কেবল,—

"হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা
কবে বিদ্যা পাব।
কি বিদ্যা প্রভাবে বিদ্যা-
বিদ্যমানে যাবো॥"

কোটাল কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া নিতান্ত অশান্তচিত্ত হইলেও যাঁহার বাসনা কেবল বিদ্যার দিকেই ধাবিত হইয়াছিল, যখন প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা তখনও যিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেনঃ—

"যাঁর লাগি, দুঃখভাগী,
সে অভাগী, চায়।
এ সময়, কথা কয়,
তবু ভয়, যায়॥
তার সমা, নিরুপমা,
প্রিয়তমা, কেবা।
দেখা নৈল, মনে রৈল,

যত কৈল, সেবা ॥
সে আমার, আমি তার,
কেবা আর, আছে।
সেই সার, কেবা আর,
যাব কার, কাছে ॥”

বিদ্যার প্রতি এতদুর, যাঁহার অনুরাগ; যিনি কুলে, শীলে, ও বিদ্যায় কিছুতেই বিদ্যার অনুপযুক্ত নহেন, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বিদ্যার পতিত্বে বরণীয় হইবার যোগ্যপাত্র। ইহঁাদিগের পূর্ব্বকার প্রেম সংঘটনা যৌবনের লীলা মাত্র। এই রূপ ভাবিয়া আমরা ভূপতির সহিত একমত হই, বিদ্যা ও সুন্দরের পরিণয় উৎসবে প্রমত্ত হইতে যাই, এবং তাঁহাদিগের প্রেমমিলনে পরম সুখানুভব করিয়া থাকি। আজিও এই বিদ্যাসুন্দরের নামে বর্দ্ধমান কবিত্বপূর্ণ হইয়া আছে। ভারতচন্দ্র এই বর্দ্ধমানকে ইন্দ্রজালে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। আজিও বর্দ্ধমান আমাদিগের কল্পনা-রাজ্যের পরম রমণীয় স্থান। আজিও আমরা বর্দ্ধমান দেখিবার জন্য এত ব্যস্ত হই কেন? ইহা প্রেমময় রাজ্য, ইহা ভারতচন্দ্রের কল্পনাময় দেশ, ইহা বিদ্যাসুন্দরের পরম সখের নিকেতন।

ক্রমশঃ।

শ্রীপূ——

পল্লীসমাজ।

তৃতীয় প্রস্তাব।

আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলিয়াছি যে সংস্কৃতসাহিত্যসংসারের কোন স্থলেই পল্লীসমাজ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়না। এই কথাটি আপাততঃ যত বিস্ময়কর বোধ হয়, বাস্তবিক তত নয়। ঐতিহাসিক ধনে ভারতের দারিদ্র ত প্রসিদ্ধ। অন্যান্য দেশেরও পুরাতন সমাজের প্রকৃত ইতিবৃত্ত উচিতমত প্রাপ্ত হওয়া যায়না। কোন্ কোন্ ঘটনার বিবরণ মানবজাতির যথার্থ প্রয়োজনীয়, তাহা কোন দেশেরই প্রাচীন-ইতিহাসলেখকেরা প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা সন্ধিবিগ্রহ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। রাজসভা, সৈন্য ও ও সম্ভ্রান্তগণের ষড়্‌যন্ত্র এবং পাষণ্ড ও পুরোহিত গণের বিবাদ বিসম্বাদ বর্ণন করিতে গিয়া তাঁহাদের সমুদয় সময় ও শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে; তন্নিমিত্ত সকল দেশেরই আদি ইতিবৃত্ত অন্ধতমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে। গ্রীকদিগের উপনিবেশও বীরচরিত (Heroic-age) রোমীয়দিগের উপনিবেশ ও রাজাবলী; ইংলণ্ডের রাজ্যসপ্তক (Heptarchy) ও সাক্ষণরাজগণ— ঐতিহাসিক পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে;

কিন্তু রামরাবণের যুদ্ধ অপেক্ষা বড় অধিক পরিষ্কার বোধ হয়না। পরন্তু উক্ত ঘটনা সকল প্রমাণ দ্বারা উদ্ভাসিত হইলেও মানবজাতির বিশেষ উপকারে লাগিবেক না। সন্ধিবিগ্রহের বিবরণ লইয়া মানব ইতিহাসের কেবল একটি মাত্র পরিচ্ছেদের পূরণ হইতে পারে। রাজবংশ, বীরাবলী, সৈন্যশ্রেণী ও পুরোহিতসম্প্রদায় মানবসমুদ্রের কেবল একটী তরঙ্গ মাত্র। মানবসমাজের যে আরও অনেক পরিচ্ছেদ আছে, তাহার সঙ্কলন; এবং মানবসমুদ্রের যে আরও অনেক তরঙ্গ আছে, তাহার পরিগণন না হইলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবেক।

পূর্ব্ব কালের আবার ব্যবহার-বিষয়ক বিবরণ কেবল আভাসে ও প্রসঙ্গক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাতন সভ্যজাতির মধ্যে গ্রীক ও রোমীয় দিগের ইতিবৃত্তে সেই সকল আভাস ও প্রাসঙ্গিক বিবরণ এত অধিক পরিমাণে লব্ধ ও আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, তাহাদের আচারব্যবহার সম্বন্ধীয় ইতিহাস এক প্রকার সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে। এই বিষয়ে মিসর পারস্য ও ভারতের বড়ই হীনতা রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ আছে। তৎসমস্তই নিতান্ত বিশৃঙ্খল ভাবে রহিয়াছে। যদি নিবোরের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন এক জন পণ্ডিত এই দুর্ভাগ্য দেশের প্রতি মনোযোগী হন, তাহা হইলে ইহার ইতিহাসের কতক পরিমাণে উদ্ধার হইতে পারে সন্দেহ নাই।

আমরা প্রাচীন সভ্যজাতির কথা বলিতেছি। স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও জর্ম্মণি প্রভৃতি অধুনাতন সভ্যদেশের ইতিহাসও বরাবর অসম্পূর্ণ ছিল। মানবসমাজের যথার্থ প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত,—রাজ্যের আয়-ব্যয়স্থিতি, লোকসংখ্যা, কৃষি, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, শিল্প, আজীবনের উপযোগী ব্যবসায়, শান্তিরক্ষা, ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতি। এই সকল অত্যাবশ্যক বিষয় গুলির বিবরণ সে দিন হইল প্রকৃত প্রস্তাবে ও স্পষ্টাভিধানে লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভল্টেয়ারের বিশ্বব্যাপিনী প্রতিভাই প্রথম পথ প্রদর্শন করে। তিনি চতুর্দ্দশ লুইয়ের রাজত্ব উক্ত প্রণালীতে রচনা করিয়া যে মহৎ হিতকর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, চতুর্দ্দিক্ হইতে উহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল এবং মানব ইতিহাস সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইবার সোপান হইল। ইহা সকলেরই সুবিদিত যে ভল্টেয়ারের দৃষ্টান্ত, মেকলের রচিত ইতিহাসের দুই অধ্যায়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া কিছু দিনের জন্য ইংলণ্ডবাসীদিগকে মোহিত করিয়াছিল।

কিন্তু ভল্টেয়ারের দৃষ্টান্ত কেবল দেশবিশেষের, জাতিবিশেষের এবং যুগবিশেষের ইতিবৃত্তের উপযোগী। তাহা হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে এমন কোন শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায় না যে, তদ্দ্বারা মানবজাতির ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে। জাতি-

বিশেষের অস্তিত্ব মনুষ্য-সমাজের পরমায়ুর সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে প্রতসঞ্জীবনের ন্যায় বোধ হয়। কিন্তু জাতীয় ইতিহাসের উপযোগিতা চিরস্থায়িনী। ভিন্ন ভিন্ন জাতির এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগের ঐতিহাসিক ঘটনা গুলি পরস্পর তুলনা করিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞান-বলে, যে সকল সাধারণ নিয়ম অবগত হওয়া যায়, মানব ইতিহাস সম্বন্ধে সেই গুলি এক একটি ঘটনা মাত্র। জাতিবিশেষের এক একটী অতীত ঘটনা মানব-ইতিহাসের পক্ষে অতি ক্ষুদ্র, তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। নেপোলিয়নের চরিত কিছু কালের জন্য ফ্রান্সের ও ইয়ুরোপের প্রধান ইতিবৃত্ত। কিন্তু মানব-ইতিহাসের নিকট উহা ফরাসিস রাষ্ট্রবিপ্লবের একটী অবান্তর ঘটনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসিস বিপ্লব আবার রাজা ও লুইসম্প্রদায়ের অত্যাচার নিবারণার্থ সাধারণের অভ্যুত্থান মাত্র। যেমন একটী পক্ক আতাফলের ভূমিতে পতন হইতে সূর্য্যগ্রহণ পর্য্যন্ত সমুদয় ঘটনা হইতে মাধ্যাকর্ষণশক্তি অবগত হওয়া গিয়াছে; তদ্রূপ রোমের প্লিবীয়দিগের মণ্টসেসারে প্রস্থান হইতে পারিসের জাতীয় সভা পর্য্যন্ত তাবৎ বৃত্তান্তই মনুষ্য জাতির নমতা প্রকাশ করিয়া দিতেছে। আতার পতন ও সূর্য্য গ্রহণ জ্যোতিঃশাস্ত্রের পক্ষে যেমন সমান; প্লিবীয়দিগের প্রস্থান ও জাতীয় সভার অধিবেশন মানব-ইতিহাসের পক্ষে ঠিক সেই প্রকার। সে দিন হইল আচার্য্য কোম্‌ত মানব ইতিহাসের উপক্রমণিকা ভাগমাত্র এবং কৃতধী বকেল উহার কতিপয় অধ্যায় মাত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। তাহাতে জ্ঞানের নূতন নির্ম্মল জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া মানবসমাজ সমুজ্বল করিয়া দিয়াছে।

যখন ইয়ুরোপেই প্রকৃত ইতিহাসের উন্মেষ এত মন্থর ও এত আধুনিক, তখন ভারতে যে, উহার এত অসদ্ভাব হইবেক, তাহা বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের আধিপত্য, একতন্ত্রি রাজত্ব এবং বিদ্যার অনুশীলন এই বিষয় সমকালিক বোধ হয়। যে সময়ে জ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইল, তখন ব্রাহ্মণের ও রাজার নিরঙ্কুশ শাসন বশতঃ স্বাধীনতার আধার পল্লীসমাজ সকল ক্রমে তেজোহীন হইতেছিল এবং উহার সংখ্যা উপযোগিতা ও প্রভাব কমিতেছিল। তথাপি অতি প্রাচীন কালের ইতিবৃত্তে যে সকল অভাব পাওয়া যায়, এবং বর্ত্তমানে যে সকল নিদর্শন দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা পল্লীসমাজ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ লব্ধ হইতেছে বলিতে হইবেক।

গ্রীক ও অন্যান্য ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতে যে সাধারণতন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পল্লীসমাজ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ এদেশে যে কখন বাস্তবিক সাধারণতন্ত্র ছিলনা, তাহা সর্ব্বসম্মত। অধিক কি দেশীয় কোন ভাষাতে তদ্বোধক একটিও শব্দ লক্ষিত হয় না। পল্লীসমাজসম্বন্ধেও এইরূপ

আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু তদুত্তরে আমরা বলি, পল্লীসমাজ শব্দটি সাধারণতন্ত্রের ন্যায় নবনির্ম্মিত হইলেও, পল্লীসমাজ প্রণালী বর্ত্তমানে প্রচলিত রহিয়াছে এবং আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রমাণ দ্বারা উহার অস্তিত্ব সাব্যস্ত হইতেছে। পরন্তু গ্রাম, পুর প্রভৃতি শব্দদ্বারা পল্লীসমাজ; এবং গ্রামীণ, গ্রামপতি প্রভৃতি শব্দ দ্বারা মণ্ডল, বুঝাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতন্ত্রবিষয়ে বর্ত্তমানে কেবল কোন নিদর্শন ও কোন জনশ্রুতি চলিত নাই, এমন নয়; সাধারণতন্ত্র-শাসন-প্রণালীর একটিও সম্বন্ধ প্রকাশ করিতে পারে এমন পদ এদেশীয় ভাষাসমূহে পাওয়া যায়না। অতএব ইয়ুরোপীয় পুরাবিদ্‌গণ যে সাধারণতন্ত্রের উল্লেখ করিতেছেন, উহাতে পল্লীসমাজ ব্যতীত আর কোন পদার্থেরই প্রতীতি হইতে পারেনা।

পল্লীসমাজপদ্ধতি যে অতি প্রাচীন ও আর্য্য উপনিবেশের সমসাময়িক তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, উহা আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে যেমন প্রচলিত ও বদ্ধমূল দাক্ষিণাত্যে সেরূপ নয়। এবং আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে আর্য্যগণের প্রথম উপনিবেশিত স্থান ব্রহ্মর্ষিদেশে ও মধ্যদেশে যেমন; অঙ্গ, বঙ্গ, ও উৎকল প্রদেশে তাদৃশ নয়। কিন্তু অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি বিভাগে যে একদা কিছু পরিমাণেও প্রচলিত ছিল, তাহা অনুমিত হইতে পারে। মণ্ডল উপাধিটি এখন যত প্রচলিত, মণ্ডল্যের পদটি তত নয়। কিন্তু পূর্ব্বে যে প্রতিগ্রামে এক এক জন মণ্ডল ছিল এবং উক্ত পদের অনেক সম্ভ্রম ও প্রভাব ছিল, তাহা প্রাচীনলোকের মুখে শুনা যায়, এবং এখনও অজ পাড়াগাঁয়ে দেখা যায়। মণ্ডল গবর্ণমেণ্টের কোন ধার ধারিতেন না এবং বর্ত্তমানে অনেক স্থলে জমিদারের মুখাপেক্ষী হইলেও, তাঁহার আজ্ঞাবহ নন। ইহা বলা বাহুল্য যে এদেশে জমিদারী প্রথার প্রভাবে ও পুলিশের হাঙ্গামায় মণ্ডলের ক্ষমতা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। পরন্তু বঙ্গদেশে যে এক প্রকার পল্লীসমাজপ্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহার আর একটি নিদর্শন, ডাক্তার হণ্টর সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পাঠকের সুবিধার্থ তাঁহার পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"গ্রামের শাসনপ্রণালী পরিজনতন্ত্রের প্রতিরূপ। প্রত্যেক পল্লীর এক এক জন স্থাপয়িতা আছেন। তাঁহাকে মঞ্চিহনান বলে। তিনি দেবতার ন্যায় পূজ্য এবং তাঁহার আধিপত্য পুত্র পৌত্র ক্রমে অধিকৃত হইয়া থাকে। গ্রামের অধিপতিকে মঞ্চিবলে; তিনি পুরুষানুক্রমিক শাসনকর্ত্তা, কিন্তু কেবল প্রধান প্রধান কার্য্যের সময়েই স্বীয় ক্ষমতা চালাইয়া থাকেন। দৈনন্দিন ব্যাপার সকল তাঁহার সহকারী পরামানিক কর্ত্তৃক সমাহিত হয়। ইহাঁরা আপনাদের ক্ষমতার অযথাভূত ব্যবহার করেন না। যদি কোন পথিক বিপন্ন হইয়া গ্রামপতিকে জানান তিনি হুকুম

না দিতে দিতে খাদ্য, যান, পথদর্শক প্রভৃতি যে যে বস্তুতে পথিকের প্রয়োজন, তৎসমস্ত আসিয়া হাজির হয়। সাঁওতাল বালক বালিকাগণের মধ্যেও এইরূপ এক জন মাঝি ও পরামাণিক আছে। যত দিন পর্য্যন্ত না বিবাহ হয়, তাহাদিগকে নিজ নিজ মাঝি ও পরামাণিকের তত্ত্বাবধানের মধ্যে থাকিতে হয়। পল্লীর কর্ম্মচারীগণের মধ্যে চৌকিদার এক জন, কিন্তু যথার্থ সাঁওতালগণের মধ্যে অপরাধের সংখ্যা অতি কম।"

সাঁওতালেরা বঙ্গদেশের নিকবর্ত্তী; তাহাদের মধ্যে পল্লীসমাজের প্রতিবিম্ব যে বঙ্গসমাজ হইতে পতিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

আমরা এই স্থলে একটি আপত্তির উত্থাপন করিতেছি। আপত্তিটি এই—বঙ্গদেশে মণ্ডল উপাধি ও পদ কৈবর্ত্ত, পোদ, চাসাধোপা প্রভৃতি নীচ জাতীয়দিগেরই স্বত্বাস্পদীভূত; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি আর্য্যজাতি ও কায়স্থ, সদ্গোপ প্রভৃতি সঙ্কর জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। কৈবর্ত্ত পোদ প্রভৃতি নীচ জাতি আদিম অসভ্য জাতির দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া বোধ হয়। তাহা আর্য্যজাতির সহিত কতক একত্রবাসে ও কতক প্রতি-লোম সংসর্গে ঘটিয়াছিল, এরূপ অনুমান হয়। তবে কি পল্লীসমাজপ্রণালী আদিম অসভ্যজাতির স্বত্বাস্পদীভূত; আর্য্যগণের নহে? আমরা উক্তপ্রকার আপত্তি ও সন্দেহের বিশেষ কারণ দেখিতেছি না। পল্লীসমাজপ্রণালী আদিম অসভ্যদিগের হইলে, বঙ্গের সন্নিকৃষ্ট সাঁওতাল ব্যতীত অন্যান্য অসভ্য জাতির মধ্যে দৃষ্ট হইত এবং পল্লীসমাজের প্রকৃত আড্ড উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেও মণ্ডলের পদ ও উপাধি নিয়ত নীচ জাতির মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত থাকিত।

পরন্তু ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, দাক্ষিণাত্যবাসীরা আর্য্যজাতিভুক্ত নহেন; তাঁহারা এদেশের আদিম বাসীদিগের মধ্যে সভ্য ও উন্নত। কারণ তাঁহাদের ভাষার প্রকৃতি সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহা হইলে পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা, দাক্ষিণাত্যে পল্লীসমাজপ্রণালী অধিক প্রচলিত হওয়া উচিত ছিল। আর যদি সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম অসভ্যজাতি দাক্ষিণাত্যবাসী হইতে পৃথক্ জাতীয় বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও এরূপ বিবেচনা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে যে, উত্তরাঞ্চলস্থিত আর্য্য ঔপনিবেশিক অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যবাসীর সহিত আদিম জাতির অনেক অধিক কাল হইতে একত্র বাস ও সংসর্গ হইয়াছিল। অতএব এ কল্পনাতেও উত্তরাঞ্চল অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে অধিক পরিমাণে পল্লীসমাজপ্রণালী প্রচলিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা না হইয়া, বিপরীতই ঘটিয়াছে। পুনশ্চ পল্লীসমাজের যেরূপ প্রকৃতি ও অবয়ব-সংস্থান তাহাতে উহা ঔপনিবেশিক ও অপেক্ষাকৃত সভ্যজাতির মধ্যেই প্রথম প্রচলিত হইবার যোগ্য*।

* পল্লীসমাজ দ্বিতীয় প্রস্তাব দেখ।

সমুদয় আর্য্যজাতির ইতিহাসও এই কথা বলিয়া দিতেছে। ইত্যাদি কারণে আমরা বিবেচনা করি যে, পল্লীসমাজপ্রণালী, আর্য্য ঔপনিবেশিক দিগেরই স্বত্বাস্পদীভূত; আদিম অসভ্য জাতির নহে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে বঙ্গদেশে কেবল নীচ জাতীয়দের মধ্যে মণ্ডল পদ ও উপাধি নিয়মিত হইল কেন? আমরা এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি না, কেবল তদুপযোগী দুই একটি আভাস দিব মাত্র। আর্য্যজাতির ভারতে প্রথম উপনিবেশের সহিত তুলনা করিলে বঙ্গদেশে তাঁহাদের নিবাস নিতান্ত আধুনিক বোধ হয়। বেদে বিহারের পূর্ব্বভাগ সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। মনুসংহিতাতে যেরূপ সীমা নির্দ্দেশ আছে, তাহাতে বঙ্গদেশ আর্য্যাবর্ত্তের অন্তঃপাতী হইতে পারে। কিন্তু তাহার কোন সবিশেষ উল্লেখ নাই। মহাভারতের সভাপর্ব্বে বঙ্গের নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু তৎকালে এ দেশের কোন বলবিক্রম ছিল বোধ হয় না। তাহা হইলে বঙ্গদেশ তত সহজে পাণ্ডবদিগের নিকট বশীভূত ও রাজসূয় যজ্ঞে কর প্রদানে সম্মত হইত না। বিক্রমাদিত্যের সময়ে এ দেশের কোন গৌরব ছিল না। কালিদাস কেবল এই মাত্র বর্ণন করিয়াই পর্য্যাপ্ত বোধ করিলেন, যে রঘুরাজ বলদ্বারা বঙ্গীয়দিগকে উৎখাত করিয়া চলিয়া গেলেন। অধিক কি পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে চিন দেশীয় পর্য্যটকদিগের নিকটও এ প্রদেশের তাদৃশ সমৃদ্ধি প্রকাশ পায় নাই।

অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, বঙ্গদেশে আর্য্য উপনিবেশ অতি আধুনিক। এমন কি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্বর্ত্তী মদ্র, কর্ণাট, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের উক্ত ঘটনা অপেক্ষাও আধুনিক। কারণ, প্রাচীন সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের সহিত এ প্রদেশের কোন সম্পর্ক ছিলনা। এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ও অন্য কোন পৌরাণিক ব্যাপারে কোন সংস্রব দৃষ্ট হয়না। যৎকালে বঙ্গদেশে প্রকৃত প্রস্তাবে আর্য্য উপনিবেশ হইয়াছিল, তখন পল্লীসমাজ প্রণালীর এমনি হীন অবস্থা, যে উহা দেশান্তরে প্রচলিত হইবার উপযুক্ত ছিলনা। সুতরাং বঙ্গদেশীয় আর্য্য ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে উহা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তবে আমরা একথা বলিতেছিনা যে, তৎপূর্ব্বকাল হইতে এ প্রদেশের সহিত আর্য্যজাতির কোন সংস্রব ছিলনা। প্রত্যুত আমাদের বোধ হয়, মহাভারতেরও পূর্ব্বকাল হইতে বঙ্গদেশ আর্য্যজাতির অধিকার-ভুক্ত ছিল, এবং মনুর সময়েও তাঁহাদের ইহার সহিত পরিচয় ছিল। তবে কদর্য্য হাবহাওয়া ও অন্যান্য স্থানীয় অসুবিধা বশতঃ পূর্ব্বে প্রকৃত প্রস্তাবে এদেশে তাঁহাদের নিবাস হয় নাই।

মুসলমানদের ইতিহাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পাঠান ও মোগলকর্ম্মচারীগণ সহজে এদেশে আসিতে চাহিতেন না। যেমন আধুনিক সাইবিরিয়ায়, তেমনি মধ্যকালের বঙ্গদেশে যাঁহারা দুষ্কর্ম্মপরায়ণ

বা সম্রাটের বিরাগভাজন, তাহারাই নির্ব্বাসন দণ্ডের ন্যায় রাজকর্ম্মচারী হইয়া প্রথমে প্রেরিত হইতেন। এই সকল কারণে আমরা বিবেচনা করি প্রথমতঃ এদেশে আর্য্য উপনিবেশ অনেক আধুনিক; দ্বিতীয়তঃ প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যজাতির সংস্রব থাকাতে এদেশীয় আদিম অসভ্য জাতির মধ্যে পল্লীসমাজ প্রণালীর একপ্রকার নকল প্রবর্ত্তিত হয়। তাহাতেই কেবল কৈবর্ত্ত, পোদ প্রভৃতি নীচ জাতীয়দিগের মধ্যে মণ্ডলপদ ও উপাধি নিযন্ত্রিত দেখা যায়, দ্বিজাতির মধ্যে দেখা যায় না।

ইয়ুরোপীয় ইতিবৃত্তলেখকেরা যে সকল স্থানকে সাধারণতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু যাহা বাস্তবিক এক একটি পল্লীসমাজ, বৈশালী তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; এত প্রাচীন যে শাক্যসিংহের সময়ে বৈশালীর অধিবাসীগণের প্রভূত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য ছিল এরূপ আভাস পাওয়া যায়। বৈশালী,—অযোধ্যা, বিদেহ, ও মগধের মধ্যবর্ত্তী। উক্ত পল্লীসমাজ সম্বন্ধে এই গল্পটি চলিত আছে। "বিদেহের রাজমন্ত্রী দস্যু কোন কারণে স্বদেশ ছাড়িয়া বৈশালীতে আসিয়া বসতি করেন। তিনি প্রথমে তত্রত্য অধিবাসিসভার সহিত কোন সংস্রব রাখিতে সম্মত হন নাই; কিন্তু পরে সাধারণের কর্ম্মাধ্যক্ষ (মণ্ডল) নিযুক্ত হইয়া সমাজের মহৎ হিত সাধন করিয়াছিলেন। দস্যুর মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজগৃহ নগরে উঠিয়া গেলেন।" পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিঙ বৈশালীতে আগমন করেন, তখনও ইহার বিলক্ষণ সমৃদ্ধি ছিল। কিন্তু দুইশত বৎসরের মধ্যে উহার বড় হীন অবস্থা হয়। হিয়ুন-সঙ বলিতেছেন "বৈশালীর প্রধান নগরের পরিধি ১২।১৩ মাইল হইবেক, উহার সর্ব্বত্র ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। বৈশালী-জনপদে অনেক বৌদ্ধ কীর্ত্তিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে; কিন্তু উহার অন্তঃপাতী ধর্ম্মশালা সকলের নিতান্ত ভগ্ন দশা, কেবল তিন চারিটিতে লোকজন রহিয়াছে। তথায় অনেক বিধর্ম্মীর সমাগম দেখিলাম; বিশেষতঃ যাহারা উলঙ্গ সন্ন্যাসী তাহাদেরই আধিক্য"।

বালবিধবার স্বপ্ন

অথবা

মনের মানুষ।

উঠ উঠ প্রাণসখি! রজনী পোহাল লো
অরুণ উদয়!
উঠ সই আঁখি মেল, উঠানেতে রোদ এল,
এখনো ঘুমান বোন উচিত ত নয়।

২

সখীর মধুর ডাকে মেলিয়া নয়ন লো
চাহিল সুন্দরী।
নিরখি সখীর মুখ উথলিল যেন দুখ
আসিল নয়নযুগ ছল ছল করি।

৩

ছল ছল নেত্রে বালা ফিরিয়া শুইল রে
কাঁদিতে লাগিল।
যেন বা বিদরে বুক উপাধানে ঝাপি মুখ
ঘন ঘন বাষ্পভরে কতই ফুলিল।

৪

একি সখি! একি সখি! কেন তুমি কাঁদলো
সহসা এমন।
একে ত তোমার তরে আছি বোন প্রাণে মরে
ওই চক্ষে পুন অশ্রু অসহ্যবেদন।

৫

আমার প্রাণের সই কেঁদনা কেঁদনা লো
বুক ফেটে যায়!
কি কথা পড়িল মনে ফের সই মোর সনে
ভেঙে বল ভেঙে বল ধরি দুটী পায়!

৬

কাঁদে আর ডাকে সখী আকুল হইয়া রে
টানে বারম্বার।
পাশ ফিরি কতক্ষণে উদাস উদাস মনে
সখীর বদন পানে চাহিল আবার।

৭

ফিরে বলে প্রাণ সই! অভাগীর তরে লো
কেন কাঁদ আর।
আমি চির-অভাগিনী তাই কাঁদি একাকিনী
তুমি কেন পদ্মনেত্রে ফেল অশ্রুধার।

৮

নিশা শেষে আজ সখি! দেখেছি স্বপন লো
মায়ার ছলনা।
বিধি প্রতিকূল যারে বৃথা আশা দিয়া তারে
আরো কি যন্ত্রনা দেয়! একি প্রবঞ্চনা।

৯

দেখিলাম প্রাণ সই! যেন কোন বনে লো
ভ্রমি একাকিনী।
যে কিছু হারাইয়ে ভ্রমিতেছি অন্বেষিয়ে
অস্থির হৃদয় সখি যেন পাগলিনী।

১০

কি ধন সে ধন সখি! জানিনে জানিনে লো
কিন্তু তার তরে।
মন প্রাণ উচাটন শুধু করি অন্বেষণ
কাঁদিয়া ভ্রমণ করি কানন ভূধরে।

১১

যাহা দেখি তাহা ধরি ভাবি মনে মনে লো
এ বুঝি সে ধন।
ভুলিয়া হৃদয়ে ধরি প্রাণিকে জিজ্ঞাসা করি
আবার দুরন্ত প্রাণ হয় উচাটন।

১২

পুন যাই পুন চাই কি জানি কি চাই লো
বিষম যাতনা।
কভু বসি তরুতলে ভাসি শুধু অশ্রুজলে
পুন উঠি ভ্রমি বনে কাতরচরণা।

১৩

হেন কালে কিছু দূরে বাঁশরী বাজিল লো
সুললিত স্বরে।
শুনি চমকিল প্রাণ, কিযে সে মধুর গান
আমারে ফেলিল সখি! পরাধীন করে।

১৪

সত্য সত্য প্রিয় সখি! কখনো শুনিনে লো
এমন সুস্বর।
যেন প্রাণ কেড়ে লয়ে নব রসে মিশাইয়ে
উড়াইয়ে লয়ে গেল গগণ উপর।

১৫

কি করে বর্ণিব সখি! সে ভাব এখন লো
না হয় বর্ণনা।
প্রাণের নিভৃত দ্বারে খুলি যেন একেবারে
ভাবরাশি ডুবাইল সকল কামনা।

১৬

পাতাল ফুঁড়িয়া সই যথা উঠি বারি লো
ধরণী ভাসায়।
পাষাণ হৃদয় হতে ভাবস্রোত সেই মতে
উঠে সখি! একেবারে ডুবালে আমায়।

১৭

যাই কি না যাই সখি দোনা মনা করি লো
তথাপি চরণ
যেন সেই দিকে টানে কে যেন আমার কাণে
এসে বলে যাও যাও পাবে সেই ধন।

১৮

কিছু দূর গিয়ে দেখি পুরুষ রতন লো
নবীন সুন্দর।
সুপ্রসন্ন সৌম্যাকৃতি ভেবে পুলকিত স্মৃতি
এখনো ভাবিলে ভাব জুড়ায় অন্তর।

১৯

পুরুষ-রতন হেন সহসা আসিয়া লো
পথ আগুলিল।
লাজে জড় সড় হয়ে দাড়ালাম ভয়ে ভয়ে
ভাবিলাম এ অরণ্যে কি দায় ঘটিল।

২০

এমন সুজন সখি! দেখিনে দেখিনে লো
বলিলা—সুন্দরি!
বল কার অন্বেষণে ফিরিছ বিজন বনে
আমি দিব তব ধন এস ত্বরা করি।

২১

সখি লো সে মুখচন্দ্র পরম সুন্দর,
সখি নয়ন-মোহন
কিন্তু তাহা হেরে সই! এরূপ মোহিত নই
সুন্দর হৃদয় হেরে বিমোহিত মন।

২২

আমাকে লইয়া সখি! চলিল সেজন লো
কি জানি কোথায়।
মধুর আশ্বাস দানে তুষিলা আমার প্রাণে
এখনো ভাবিলে সখি হৃদয় জুড়ায়।

২৩

যাই যাই কোথা যাই তাহাত জানিনা লো
তবু কেন যাই।
হেঁট মুখে তাঁর সনে চলিলাম ঘোর বনে
পর তিনি তবু যেন পর ভাব নাই।

২৪

অবশেষে উত্তরিনু মালতীনিকুঞ্জে লো
কতক্ষণ পরে।
চলিতে পারি না আর চরণ যুগল ভার
দেখিয়া বলিলা সখি! পরম আদরে।

২৫

এখনো কি শশিমুখি! পারনা চিনিতে লো
আমি যে সে ধন।
আমার কণ্ঠেতে ভর করে হও অগ্রসর
আমি ধন্য তব ভার করিয়ে বহন।

২৬

যেমন বল্লরী উঠে নিজ তরুবরে লো
দাঁড়াবার তরে।
ওই বাহুলতা এই কণ্ঠে আলিঙ্গিয়া
ধীরে চল বিধুমুখি! এঘোর প্রান্তরে।

২৭

কি বলিব প্রিয় সই আশ্চর্য্য দেখিনু লো
পরাণ আমার।
তখনি চিনিনু তাঁরে চিনি মাত্র একেবারে
বলিয়া উঠিল যেন "পেয়েছি এবার।"

২৮

"পেয়েছি এবার" বলে উঠিব যেমন লো
ধরি তাঁর কর।
অমনি ডাকিলে সই—সে বননিকুঞ্জ কই
কই সে পুরুষনিধি সৌজন্যসাগর।

শ্রীশিঃ

শত্রু সিংহ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সন্ন্যাসি-সংবাদ।

জগন্নাথের গৃহোপান্তে এক সন্ন্যাসী মন্দ মন্দ পদবিক্ষেপ করিতেছেন। সন্ন্যাসীর নূতন কিছুই নাই, মহাদেবের আমল হইতে সন্ন্যাসীদের আবহমান যাহা চলিয়া আসিতেছে এই সন্ন্যাসীর তাহা সমস্তই আছে।—সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম, মস্তকে জটাভার, গলে হাড়মাল, কটিদেশে বাঘছাল, করে নর-কপাল, সমস্তই আছে। কিছুরই ত্রুটী নাই। দেখিলে বয়স অনুমান করিবার যো নাই। সন্ন্যাসী ঠাকুরদের চেনে কার সাধ্য! সন্ন্যাসীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবলি, সুঠাম। ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও অঙ্গের কান্তি অগ্নির ন্যায় আপন তেজ বিস্তার করিতেছে।

সন্ন্যাসী জগন্নাথের শয়নাগারের নিকটে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন শয়নাগার নিস্তব্ধ, ভাবিলেন জগন্নাথ নিদ্রিত। সন্ন্যাসী একটু অসন্তুষ্ট হইলেন।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া আগমন বার্ত্তা জগন্নাথকে সঙ্কেত দ্বারা জানাইতে ইচ্ছা করিলেন। ভারবির একটী কবিতা তাঁহার মনে হইল। কল-গম্ভীর স্বরে সেই কবিতাটী পাঠ করিলেন—

"স কিং সখা সাধু ন শাস্তি যোঽধিপং
হিতান্ন যঃ সংশৃনুতে স কিম্প্রভুঃ।
সদানুকূলেষু হি কুর্ব্বতে রতিং
নৃপেষ্বমাত্যেষু চ সর্ব্বসম্পদঃ॥"

জগন্নাথ অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া এক প্রকার নিরাশ হইয়াছিলেন, তন্দ্রাবেশে চিন্তা-বেগে অর্দ্ধনিদ্রিতপ্রায় হইয়াছিলেন। সহসা তাঁহার সে ভাবের তিরোভাব হইল। সন্ন্যাসীর কবিতাটী সমগ্র তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই, শেষ চরণ দুইটী স্পষ্টরূপে শুনিয়াছিলেন। যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাতেই বুঝিতে পারিলেন কবিতা কে পাঠ করিল, কাহাকে লক্ষ্য করিল। তিনি শয্যা পরিত্যাগ করিয়া পথের ধারের দরজাটী খুলিয়া দিলেন। দরজা খুলিবার সময় সন্ন্যাসীর পঠিত কবিতার প্রথম চরণদ্বয় উত্তর-ব্যপদেশে আবৃত্তি করিলেন।

"স কিং সখা সাধু ন শাস্তি যোঽধিপং-
হিতান্ন যঃ সংশৃনুতে স কিম্প্রভুঃ।"

স্বাগত প্রশ্নান্তর সন্ন্যাসী আসন গ্রহণ করিলেন।

জগন্নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুনিয়ার ভাব কি?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন। "নূতন কিছুই নাই। সকলই পূর্ব্বের ন্যায়, পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল রাজা, দুর্ব্বল প্রজা, ধনবান্ প্রভু, নির্ধন ভৃত্য। জ্ঞানী চতুর, অজ্ঞান অন্ধ।—পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য সহস্র-রশ্মি, চন্দ্র তারাগণের অধিপতি। পূর্ব্বের ন্যায় ময়ূর পক্ষিরাজ, বাসুকি সর্পরাজ, তিমি মৎস্যরাজ, সিংহ পশুরাজ।"

"পূর্ব্বের ন্যায় কি চন্দ্র সূর্য্যের রাহুর ভয় নাই? সিংহের কি বিপদ্ নাই?"

"বিপদে ধৈর্য্য, সম্পদে ক্ষমা না থাকিলে কি সিংহ পশুরাজ হইতে পারিত?"

"ব্যাধের বাগুরা বন বেষ্টন করিলে সিংহের পরিত্রাণের পথ কোথায়?"

"পশুপাল সহায় থাকিলে পশুরাজের ভয় কোথা? সামান্য মূষিকেও ব্যাধের বাগুরা খণ্ড খণ্ড করিতে পারে।"

"সিংহ কি এখনও গুহাশায়ী?"

"সিংহ গুহাশায়ী হইলেও শৃগাল শার্দ্দূল প্রভৃতিরা সর্ব্বদা সতর্কভাবে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে, সমস্ত, গুহাশায়ী প্রভুর কর্ণগোচর করিতেছে।"

"সিংহ তবে ব্যাধের ভয়ে ভীত নহে?"

"সিংহ কবে ব্যাধের ভয়ে ভীত হইয়া থাকে?—তাহাতে আবার এখন সিংহের প্রবল পৃষ্ঠবল।"

"সিংহের সহায় কে হইল?"

"সিংহ ভিন্ন কে সিংহের সহায় হইয়া থাকে?"

"সিংহ তবে নিশ্চিন্ত?"

"সিংহ আপনার জন্য নিশ্চিন্ত।"

"কাহার জন্য নিশ্চিন্ত নহে?"

"নববন্ধুর জন্যে—আর একটী বালিকা সিংহিকার জন্যে।"

"সিংহিকাটী কে?"

"সিংহের দুহিতা।"

"তুমি তাহাকে দেখিয়াছ?"

"দেখিয়াছি।"

"দেখিলে কিরূপ?"

"সিংহের দুহিতা যেমন হইয়া থাকে। বীর্য্যে পিতার অনুরূপ, কিন্তু নম্রতায় হরিণীর ন্যায়।"

"তোমাকে কিছু বলিল না?"

"নিরীহ অহিংসা-ব্রত সন্ন্যাসী দেখিয়া আমার নিকটে আসিতে শঙ্কা করিল না।"

"তুমি তাহাকে কি বলিলে?"

"শিক্ষার অনুরূপ যাহা বলিতে হয় বলিয়া দিলাম।"

"বুঝিতে পারিল?"

"বুঝিল,—চমৎকৃত হইল।"

"আর কেহ তোমাকে দেখিত পায় নাই?"

"দেখিলেও কোন সন্দেহ করিতে পারে নাই।"

"কে দেখিয়াছে?"

"সিংহের অনুচর এক শার্দ্দূল।"

"সে তোমাকে কিছু বলিয়াছিল?"

"না কিছু বলে নাই, কিন্তু দুই তিন বার আমার মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়াছিল, মনে হইল যেন সে আমাকে চিনিতে পারিল—কিন্তু পরক্ষণেই—'উহুঁঃ—না' বলিয়া চলিয়া গেল।"

জগন্নাথ একটু ক্ষুব্ধ হইলেন, সন্ন্যাসীকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বিদায় দিলেন।—বিদায়-কালে তাঁহাকে চুপি চুপি কি বলিয়া দিলেন।

সন্ন্যাসী যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই দ্বার দিয়াই প্রস্থান করিলেন।

জগন্নাথও নিদ্রা-দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চিন্তা-জাল হইতে ক্ষণকালের জন্যে মনকে মুক্ত করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

কমলার পতিপূজা।

অনুপমা, বীরসিংহ, কমলা, ও মহাবল সিংহকে অনেক দিন ছাড়িয়া আছি। মহাবলপুরের সহিত অনেক দিন আমাদের সাক্ষাৎ নাই।—এত দিনে কত ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে! কালের স্রোত নিরন্তর চলিতেছে, এক টানা স্রোত—জোয়ার নাই, সর্ব্বদাই ভাঁটা। এ স্রোতের মূল কোথায়?—কে বলিতে পারে? স্রোতের শেষ নাই!

ঘটনার সমষ্টি দেখিয়াই কালের পরিমান।—ঘটনার পরম্পরাই কাল। কাল স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে।

মানব-জীবনে কত ঘটনা ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা করে কাহার সাধ্য? প্রতি নিমেষে কত ঘটনা ঘটিতেছে,—কত চিন্তা মানব-মনকে আন্দোলিত করিতেছে—কত চিন্তা কার্য্যে পরিণত হইতেছে তাহার ঠিক নাই। লিখিতে পারিলে, মনুষ্য-জীবনের প্রতি নিমেষে শত ভাগে বিভক্ত এক এক গ্রন্থ রচিত হইতে পারিত।

এই নাটকের যে কয় জন নট মহাবল-

পুরে আছেন তাহাঁদের জীবনের এই ভাগের সমস্ত বিবরণ লিখিয়া উঠি আমার সাধ্য নহে। শতাবধি বাল্মীকি, শতাবধি বেদ-ব্যাস একত্র হইলে শত বৎসরে কি করিতে পারেন বলিতে পারি না। আমি ত কোন্ ছার। যত দূর জানিব প্রকাশ করিতে অধীন অক্ষম। যতদূর প্রকাশ করিতে পারিব ততদূর শুনিয়াই পাঠক মহাশয় আমাকে ক্ষমা করিবেন। নিজ গুণে মার্জ্জনা করিবেন।

কমলা দেবী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন পতিকে সুখী করিবেন, অনুপমাকে পতির সন্তোষার্থ উৎসর্গ করিবেন।—তাঁহার অন্য চিন্তা নাই। এক চিন্তাই মনকে অধিকার করিয়া আছে।

অনুপমার উপর কমলার স্নেহ ক্রমে বাড়িতে লাগিল। এক দণ্ড তাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারেন না।—এ কেমন স্নেহ! যাহার জীবনের সুখ জন্মের মত বিনষ্ট করিতে যাইতেছ তাহার উপর এত স্নেহ কেন? একি স্বাভাবিক? —স্বাভাবিক না হইবে কেন?—ক্ষত্রিয়-জননী প্রিয়তম পুত্রকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন—শত্রুর করাল কবলে নিক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হন না; তাই বলিয়া কি তাঁহার স্নেহের হ্রাস হয়;—স্বাভাবিক স্নেহ কি তখন শতগুণে প্রবলবেগ ধারণ করে না? জননীর এক মাত্র ইচ্ছা জন্মভূমির গৌরব-রক্ষা, কুলের গৌরবরক্ষা, ইহাই তাঁহার উপাস্য দেবতা—ইষ্টদেবতা। ইষ্টদেবের তুষ্টিই তাঁহার এক মাত্র উদ্দেশ্য। করাল-বদনা কালীর নিকট পূর্ব্বে লোকে আত্ম প্রাণ বিসর্জ্জন দিত, তাই বলিয়া কে বলিবে আপনার প্রাণের উপর কাহারও স্নেহ ছিল না?—জলন্ত চিতার উপরি পতিপ্রাণা হিন্দুরমণী পতির সহমৃতা হইতেন, তাই বলিয়া কে বলিবে সতীর আত্মজীবনে স্নেহ ছিলনা।—আত্মজীবনে স্নেহ না থাকিলে সকলেই জীবন পরিত্যাগ করিতে পারে তাহাতে আর গৌরব কি?——কর্ণ-পদ্মাবতী ব্রাহ্মণের তৃপ্ত্যর্থে বৃষকেতুর মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন বৃষকেতুর প্রতি কি তাঁহাদের স্নেহের হ্রাস হইয়াছিল? পুত্র-স্নেহ তখন সহস্রগুণ প্রবল হইয়া তাঁহাদের চিত্ত উচ্ছলিত করিয়াছিল—তথাপি ব্রাহ্মণ ইষ্ট দেব তাঁহার তুষ্টি করিতে হইবে।—অনুপমার প্রতিও কমলার স্নেহ সেই রূপ স্বাভাবিক, সেই রূপ প্রবল।

কমলার শরীর ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। যাঁহার মনের ভিতর এরূপ আগুণ জ্বলিতেছে তাঁহার শরীর ক্রমে ক্ষীণ হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? পাবক-সন্তপ্তা মাধবী লতা কতক্ষণ সজীব থাকে?—

কমলার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল—মুখের কান্তি তিরোহিত হইল—গাত্রের বর্ণ ক্রমে পাণ্ডু হইল। ক্রমে আহারে অরুচি হইল—আহার বন্ধ হইল। কমলা শয্যাগত হইলেন। জানিতে পারিলেন তাঁহার ক্ষয়‍ রোগ হইয়াছে,

কিন্তু কাহাকেও বলিলেননা। দুই এক-জন পরিচারিকা তাঁহার সুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল।—কমলা তাহাদিগকে মাতার দিব্য দিয়া নিষেধ করিয়া দিলেন যেন কোন কথা রাজার কর্ণগোচর না হয়।—রাজার কর্ণগোচর হইলেই বা কি হইত!

অনুপমা প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, রাজমহিষীর কোন সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে ইহা তাঁহার সন্দেহও হয় নাই। দিনে দিনে কমলাদেবীর শরীর ক্ষীণ হই-তেছে দেখিয়া মনে করিলেন চিন্তাজ্বরেই তাঁহার এরূপ হইতেছে। আর কিছু মনে করিলেন না।—কমলাদেবীর অনেক দিন হইতেই ক্ষয়রোগের সঞ্চার ছিল তাহা অনুপমা জানিতেননা, কেহই জানি-তেননা। এখন অবসর পাইয়া যে সেই পুরাতন শত্রু এরূপ প্রবল হইয়াছে তাহা কিরূপে জানিবেন?

রাজমহিষীর পীড়া ক্রমে ক্রমে ভীষণ ভাব ধারণ করিতে লাগিল, পরিচারি-কারা—ভীত হইয়া রাজাকে জানাইল। চিকিৎসক আসিয়া রোগ অসাধ্য বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কমলাদেবী জীবনের আশা অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছেন, এখন একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি যে এ যাত্রায় কোন মতেই রক্ষা পাইবেন না ইহা শুনিয়া তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল।—শীঘ্র মরিবেন ইহাতে পরম আহ্লাদ হইল।

কমলা অভীষ্ট সিদ্ধির প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল; কিন্তু মন এখনও সুস্থির হইল না। মনের কথা অনুপমাকে এখনও জানান নাই—জানানই বা কি করিয়া। প্রতি-দিন মনে করেন বলি বলি কিন্তু অনুপ-মার মুখ দেখিয়া প্রতিদিনই জিহ্বা জড় হইয়া যায়।

দেবী জীবনের শেষ সীমায় আগতপ্রায় হইয়াছেন — প্রাণ-বায়ু পলাইবার পথ অন্বেষণ করিতেছে।—আর অধিক বিলম্ব নাই।

কমলার শয্যার পার্শ্বে মস্তকের নিকট অনুপমা বসিয়া অলক্ষিত ভাবে রোদন করিতেছেন। ঘরে আর কেহই নাই।

অনুপমার মনের ভিতর যে কি হই-তেছে তাহা কে প্রকাশ করিতে পারে। মাতৃহীনা বালিকা কমলাকে জননীর ন্যায় ভাল বাসিতেন। কমলাকে পাইয়া মাতৃ-শোক বিস্মৃত হইয়াছিলেন। অনুপমার পিতা নাই। কমলাই তাঁহার পিতা, কম-লাই তাঁহার মাতা। কমলা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন—অনুপমার চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার, জগৎ শূন্য।—দুস্তর মরুভূমিতে অবলা হরিণ-বালিকা মাতৃস্তন পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছিল; নিষ্ঠুর ব্যাধের শর আসিয়া জননীর জীবন হরণ করিল।—অসহায়া মৃগ-বালিকা কোথায় যায়, কি করে।—আবার সম্মুখে এক নির্দ্দয় মহাবল সিংহ।—বালিকা হতচেতনা।

অনুপমার দুঃখ-সাগরে প্রলয়-বাত্যা উত্থিত হইয়াছে।—এসময়ে তাহার সহায়তা কে করে? প্রতাপসিংহ কো-

থায়?—প্রতাপসিংহকে অনুপমার মনে হইল—অনুপমা আত্মবিস্মৃত হইলেন কোথায় আছেন কি করিতেছেন কিছুরই জ্ঞান হইল না।

তাঁহার চেতনা বাস্তবিকই কিয়ৎকালের জন্যে স্বকার্য্যে বিরত হইল।—কিন্তু এভাব অধিক ক্ষণ থাকিল না।—বীরসিংহের কথা মনে হইল।—অনুপমার হৃদয় কাঁদিতে অবসর পাইল। এতক্ষণ তাঁহার নয়নে বাষ্পলেশও ছিলনা। অসহ্য শোকের উত্তাপে বাষ্পবারি শুষ্ক হইয়াছিল। এখন আবার নয়নে জল আসিল। অনুপমার মনে হইল—"তাঁহার জীবন তাঁহার হাতে,—যখন ইচ্ছা ছাড়িয়া দিতে পারেন কিন্তু শেষ না দেখিয়া ছাড়িবেন না।" অনুপমার চিত্ত আবার কতক পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইল।—রাজমহিষীর শোকই তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিল, আত্মচিন্তা তিরোহিত হইল। অনুপমার নয়নদ্বয় হইতে দর দর অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

অনুপমা এই ভাবে অবস্থিত আছেন, কমলার নেত্রদ্বয় তাঁহার মুখের দিকে উন্মিত হইল। অনুপমা অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলেন। রাজমহিষী কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টিতে অনুপমার দিকে চাহিয়া রহিলেন,—যেন কি বলিবেন। অনুপমা বুঝিতে পারিলেন, শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।—কমলা কি বলিবেন অনুপমা স্বপ্নেও কখন তাহা ভাবেন নাই।

কমলা অতি মৃদুস্বরে অনুপমাকে সম্বোধন করিলেন।—

"ভ———অনুপমা।"

কমলার মুখ দিয়া "ভগিনী" শব্দ বাহির হইতেছিল কমলা তাহা বাহির হইতে দিলেন না।—অনুপমা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেবী কি বলিবেন ইহাই শুনিবার জন্যে তিনি একেবারে কর্ণময় হইয়া রহিলেন। কমলা বলিলেন "অনুপমা আমার আর বড় দেরি নাই। শীঘ্রই ইহলোক পরিত্যাগ করিব।"

অনুপমা কিছুই বলিলেন না বলিতে পারিলেন না—কিন্তু তাঁহার নয়নে বাষ্পধারা দ্বিগুণবেগে বিগলিত হইতে লাগিল।

কমলা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন—

"অনুপমা তুমি আমাকে মায়ের মত ভক্তি করিতে—ভাল বাসিতে। আমিও তোমাকে মেয়ের মত স্নেহ করিতাম।"

কমলা আর বলিতে পারিলেন না তাঁহার কণ্ঠরোধ হইবার যো হইল।—অনুপমার নেত্রদ্বয় বাষ্পাকুল হইয়া অন্ধ হইল। তাঁহার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিল।—কমলার কণ্ঠরোধ কেন হইল কমলা বলিতে পারেন; কমলার মত অবস্থায় কমলার মত মনস্বিনী কোন কামিনী বলিতে পারেন।—

প্রিয়তমা অনুপমাকে কমলা

জানিয়া শুনিয়া জন্মের মত দুঃখিনী করিতে যাইতেছেন।—কিন্তু তাহা না করিলে ইষ্টদেবের তুষ্টি হয় না।—কমলার কণ্ঠ-রোধ না হইবে কেন?

যখন ইষ্টদেবের কথা মনে হইল তখনই কমলার মন স্থিরভাব ধারণ করিল। কমলার কণ্ঠের স্বর পরিষ্কৃত হইল। বলিলেন—

"অনুপমা মায়ের একটী কথা তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

অনুপমা সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কমলা বলিলেন,

"আমার গায়ে হাত দিয়া দিব্য কর।"

অনুপমা এখনও কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কমলা জননী হইয়া কন্যার সর্ব্বনাশ করিবেন, ইহা তাঁহার মনেও হইল না। তিনি কমলার গায়ে, হাত দিয়া শপথ করিলেন।

কমলা ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন,

"আমার অবর্ত্তমানে তোমাকে মহারাজের পাণিগ্রহণ করিতে হইবে।"

শুনিবামাত্র অনুপমা মূর্চ্ছিতা হইলেন।

"অনুপমা! অনুপমা! আমি তোমাকে প্রাণে মারিলাম মা—হইয়া—"

উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া রাজমহিষী শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিলেন। পারিলেন না—উঠিবে কে?—কমলার জীবন-লীলা শেষ হইল। যে জন্যে তাঁহার জীবন-দীপ এত দিন কোন রূপে প্রজ্বলিত ছিল, সে কার্য্য সিদ্ধ হইল। কার্য্য সিদ্ধ হইল,—কার্য্য সিদ্ধ করিতে দীপের সমস্ত তৈল ফুরাইয়া গেল, দীপ নির্ব্বাপিত হইল।

রাজমহিষীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া পরিচারিকারা দৌড়িয়া আসিল, দেখিল কি সর্ব্বনাশ।—রাজমহিষী গতজীবনা।—অনুপমা গত-চেতনা।—পরিচারিকারা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তাহাদের করুণস্বরে রাজপুরী প্রতিধ্বনিত হইল।—মহাবলসিংহ চিকিৎসকের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন আসিয়া আর কি হইবে! সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

মহিষীর অবস্থা দেখিয়া মহাবল সিংহের চক্ষেও জল আসিল।

চিকিৎসক অনুপমার মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন। পরিচারিকারা অনুপমাকে লইয়া, গৃহান্তরে রাখিয়া আসিল, কেহ কেহ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

মহাবলসিংহ চিকিৎসকের সহিত চলিয়া গেলেন। জানিলেন না কাহার জন্যে মহিষীর প্রাণবায়ু চিরকালের মত অকালে বহির্গত হইল। জানিলেন না, কাহার জন্যে অনুপমার প্রাণবায়ু এরূপ স্তম্ভিত হইয়াছিল।

সুবর্ণ-প্রতিমা অগ্নিতে দগ্ধ হইলেন! মহাবলপুরের রাজলক্ষ্মী ভস্মসাৎ হইলেন!

দৃষ্টি।

এবার প্রস্তাব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, পূর্ব্ববারের রুচিনামক প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। প্রস্তাবের শেষে কুরুচি ও সুরুচির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যে দুইটী কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে কম্পোজিটরগণ একটী চমৎকার ভুল করিয়াছেন। আমি যেটীকে কুরুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, তাঁহারা সেইটীকে সুরুচি এবং আমি যেটীকে সুরুচি বলিয়াছিলাম সেইটীকে কুরুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বোধ হয় 'আমরি সুন্দর মুখ মনোহর' প্রভৃতি কবিতাটীকে কুরুচি বলা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন নাই। পাঠকগণ! বোধ হয় আমার বলিবার পূর্ব্বেই সে ভ্রমটী বুঝিতে পারিয়াছেন। সে যাহা হউক গতবারে কবিদের রুচি সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে, এবারে দৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু বলা যাইবে। বিষয় দুইটী একই বলিলে হয় নামান্তর মাত্র।

রুচি স্থলে যেমন বলিয়াছি যে কুরুচি-সম্পন্ন ও সুরুচি-সম্পন্ন দুই প্রকার কবি আছেন; যাঁহারা কুরুচি-সম্পন্ন তাঁহারা কেবল মাত্র কতিপয় ইন্দ্রিয়সুখ-জনক বিষয়ে বদ্ধ থাকেন; কিন্তু যাঁহাদের রুচি সুন্দর তাঁহারা বহির্ব্যাপার অপেক্ষা অন্তরবর্ত্তী ভাবেই অধিক মুগ্ধ হন; দৃষ্টিস্থলেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে।

জনসমাজে মনুষ্যের কার্য্য ব্যবহার ও ভাব প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে আমরা সেই সকলের মধ্যে মনুষ্য-প্রকৃতির অতিরিক্ত আরও অনেক সামগ্রী দেখিতে পাই। মনুষ্যের প্রকৃতিতে হর্ষ শোক আছে বটে, কিন্তু মনুষ্য-সমাজের যে হর্ষ শোক তাহার মধ্যে আইন আছে—চিরাগত প্রথা আছে—কুসংস্কার আছে—কিম্বা পূর্ব্ব পুরুষদিগের কথা আছে। আমাদের যে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট—মনের কষ্ট—সুশিক্ষার কষ্ট—সভ্যতাংশে হীন সমাজে জন্ম গ্রহণ করা কি তাহার বার আনার কারণ নয়? জননীর গর্ভ হইতে শিশু যেমন পূঁয রক্তে মাখা হইয়া আসে, আমরাও সেইরূপ সমাজের অনেক পূঁয রক্তে মাখা হইয়া আসিয়াছি; পরিষ্কার করিতে অনেক দিনও অনেক আয়াস লাগিবে। সে যাহা হউক জনসমাজে আমরা যাহা দেখি তাহা নিরবচ্ছিন্ন মনুষ্য-প্রকৃতি নহে; তাহাতে সেই প্রকৃতি—আইন,আচার ধর্ম্ম প্রভৃতির ছালে ঢাকা আছে।

প্রতিভাশালী লোকের দৃষ্টি সেই ত্বক্ ভেদ করিয়া মানব-প্রকৃতি পর্য্যন্ত গমন করে। মনুষ্য-সমাজে তাঁহারাই বিজ্ঞ পণ্ডিত অথবা জ্ঞানী যাঁহারা মনুষ্যের হর্ষ শোক—বন্ধুতা ও বিবাদ—হাস্য ও ক্রন্দনের মধ্যে মানব-প্রকৃতিকেই দর্শন করেন; দিগ্বিজয়ী বীরের ভিতর স্বার্থপর

ক্ষমতাপ্রিয় মনুষ্য আবিষ্কার করিতে পারেন; এবং সকল বিষয়ে মনুষ্যপ্রকৃতির শক্তি ও কার্য্য দেখিয়া অবাক্ হন। জগতে এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। তোমার আমার দৃষ্টি ত্বকে গিয়া পর্য্যবসান হয়, তাঁহাদের দৃষ্টি ত্বকে বদ্ধ থাকে না। কবিদের মধ্যেও এই দুই প্রকৃতির লোক আছেন। অধিকাংশই আইন আচার প্রভৃতি বহিরাবরণেই পড়িয়া থাকেন; অতি অল্পসংখ্যক লোক সে আবরণ ভেদ করিয়া গমন করিতে সক্ষম। মনুষ্যের হৃদয়ে যত প্রকার ভাবের উচ্ছাস হয় (Emotions) তাহার কতকগুলি সাধারণ-প্রকৃতি-সম্ভূত এবং অধিকাংশ সমাজের শিক্ষা-সম্ভূত। হীনদর্শী কবিরা (Short-Sighted poets), এই গৌণ ভাব দ্বারা অধিক উত্তেজিত; সেই মুখ্য ভাবের আস্বাদন তাঁহারা বড় জানেন না। কতকগুলি ভাব আছে তাহাতে ইংরাজ—চীন—মার্কিন বা বাঙ্গালির গন্ধ নাই;—আবার কতকগুলি ভাবে ইংরাজ চীন মার্কিন কিম্বা বাঙ্গালি ইহাঁদিগকে চিনিতে পারা যায়। যে যে কবি এই সকল বিশেষ ভাব বর্ণনে পটু, তাঁহারা সেই সেই বিশেষ জাতির প্রিয় হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে মনুষ্য-জাতির কবি বলা যায় না। তুমি আমি বাঙ্গালি, কিন্তু আমাদের মধ্যে হয় ত দুই এক জন আছেন কিম্বা জন্মিবেন, যাঁহারা জগতের সম্পত্তি। সেই রূপ যুগ যুগান্তরে এক এক জন কবি জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁহারা জগতের সম্পত্তি। লোকে সচরাচর বলেন "Cowper is the most English of English Poets"—"ইংরাজ কবিদিগের মধ্যে কাউপার অত্যন্ত ইংরাজ" ইহার অর্থ এই—কাউপার ইংরাজদিগের বিশেষ বিশেষ ভাব বর্ণনে সুনিপুণ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কাউপারের দুই একটী কবিতা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। পাঠক মাত্রেই জানেন যে ফরাসিদিগকে ঘৃণা করা ইংরাজদিগের একটী জাতীয় ভাব। কাউপার সেই ভাব কিরূপে বর্ণন করিয়াছেন দেখুন:—

The Frenchman easy debonair and brisk
Give him his lass, his fiddle and his frisk,
Is always happy, reign whoever may;
And laughs the sense of misery far away.
He drinks his simple beverage with a gust
And feasting on an onion and a crust.
We never feel the alacrity and joy
With which he shouts, Vive le Roy.

ইংরাজদিগের আর একটী বিশেষ ভাব—স্বাধীনতা-কথা-প্রিয়তা। স্বাধীনতা-কথা-প্রিয়তা বলিলাম তাহার কারণ এই, যে সকল লোকেরা কিসে স্বাধীনতা হয় কিম্বা কিসে স্বাধীনতা যায় তাহা জানে না, তাহারাও স্বাধীনতার নামে উন্মত্ত হইয়া উঠে। কাউপার প্রভৃতিও এই ভাব বর্ণনে পটু ছিলেন। এক স্থানে কাউপার লিখিয়াছেন:—

O Liberty! the prisoner's pleasing dream,
The poet's muse, his passion and his theme
. . . .
Place me where winter breathes his keenest air

And I will sing if liberty be there ;
And I will sing at liberty's dear feet,
In Afric's torrid clime or India's fiercest heat.

স্বাধীনতা ! কয়েদীর সুখের স্বপন
কবির ভারতী তুমি সর্ব্বস্ব-রতন ;
লও মোরে—যথা শীত কাঁপায় দুর্জ্জয়
গাইব সেখানে যদি স্বাধীনতা রয় ;
স্বাধীনতা পদে বসি গাব কুতূহলে
আফ্রিক কি ভারতের প্রচণ্ড অনলে।

এই রূপ ভাব কাউপরের যেখানে সেখানে। এই জন্য বোধ হয় কাউপার ইংরাজদিগের ঘরে ঘরে। এ সকল ভাব অন্য-দেশ-বাসীদিগের পক্ষে গ্রহণ করাই দুষ্কর। এই দৃষ্টির সহিত সুবিখ্যাত সেক্‌সপিয়রের দৃষ্টির তুলনা করিলে আমার বক্তব্য কথা বিষদরূপে বুঝিতে পারা যায়। সেক্‌সপিয়রের অধিকাংশ কবিতা কি ইংরাজ, কি জর্ম্মাণ, কি মার্কিন, কি ভারতবর্ষীয় সকলের পক্ষে সমান, সকলেই তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। এস্থলে বলা উচিত যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরা অর্থাৎ ত্বক্‌মাত্রদর্শী কবিরাও কখন কখন প্রথম শ্রেণীতে উঠেন অর্থাৎ সার পর্য্যন্ত দেখিতে পান।

বাঙ্গালা কবিদের মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্তের অসম্ভাব নাই। অনেকের দৃষ্টি "আনারস" "পাঁটা" "সার জর্জ্জ কাম্বেল" "দুর্ভিক্ষ" প্রভৃতি পর্য্যন্ত গিয়াই পর্য্যবসিত হয়। অতি অল্প লোকের দৃষ্টি মনুষ্য-প্রকৃতির গভীর অন্তঃপুর পর্য্যন্ত গমন করে। আইন—আচার—প্রভৃতি লইয়াই যাঁহাদের আকর্ষণ; সে ত্বক্ খসিয়া পড়িলেই তাঁহাদের আকর্ষণ চলিয়া যায়। মনুষ্য-প্রকৃতি লইয়া যাঁহাদের আকর্ষণ, তাঁহাদের আকর্ষণ চিরদিন থাকে। তোমার আমার মত কত কবি কত কবিতাই প্রসব করিয়া গিয়াছেন, তুমি আমিও বর্ষে বর্ষে কতই প্রসব করিতেছি, ফল কথা এই হয় ত আমার একটী, তোমার দুইটী, হেমবাবুর তিনটী, মাইকেলের চারিটী পংক্তি কালস্রোতে ভাসিয়া যাইবে। আর সমুদায়—লোকের বিস্মৃতির তলে ডুবিবে। অর্থাৎ আমাদের যে কয় পংক্তিতে মনুষ্য-প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি আছে, সেই কয় পংক্তি থাকিবে। ভাবী বংশধরদিগের চালুনী বড় সূক্ষ্ম! স্থূল বিষয় সকল বদ্ধ হইয়া থাকে, ভবিষ্যৎ-সমাজক্ষেত্রে পড়িতে পায় না। কবি! তুমি দুঃখ করিও না। মনুষ্যজাতি এমন অবিবেচক নয়; দেখাও আজি পর্য্যন্ত মানবকুল কোন্ সত্য, কোন্ ভাল ভাব বা ভাল কথা ভুলিয়াছে, কিম্বা অগ্রাহ্য করিয়াছে? এক একটী ভাল কথা চারি হাজার বৎসর আসিতেছে; কি আশ্চর্য্য! কে বাল্মীকি? নাম করিলে হৃদয়ে উল্লাস হয় কেন? কি আশ্চর্য্য! কে যীশু? তাঁহাকে লোকে প্রভু প্রভু বলে কেন, কি আশ্চর্য্য!—কে সেক্‌সপিয়ার? কোথায় তাঁর জন্ম?—আমরা আজি ভারতবর্ষে বসিয়া তাহাঁর প্রশংসা করিতেছি কেন? কি আশ্চর্য্য! মনুষ্য জাতি

অবিবেচক নয়। বরং একগুণ উপকারের দশগুণ—পুরস্কার পাওয়া যায়। তবে কি চাই? মনুষ্য জাতির সাধারণ সম্পত্তি হওয়া চাই। অর্থাৎ—মনুষ্য-প্রকৃতি পর্য্যন্ত দেখিবার শক্তি চাই।—

হৃদয়ের ভাব সম্বন্ধে যে রূপ ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধেও সেই রূপ। মনুষ্যের ধর্ম্মনীতি দুই প্রকার মানব-প্রকৃতি-সম্ভূত ও সমাজ-সম্ভূত। প্রকৃতি-সম্ভূত ধর্ম্মনীতির কালে কালে সৌসাদৃশ্য আছে। সমাজসম্ভূত ধর্ম্মনীতির যুগে যুগে ব্যতিক্রম, দেশে দেশে ব্যতিক্রম। সন্তান-ঘাতিনী মাতা ইংলণ্ডে রাক্ষসী; মার্কিন দেশে রাক্ষসী; ভারতবর্ষেও রাক্ষসী; কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা বঙ্গদেশে দূষ্য, ইউরোপে দূষ্য নহে। ধর্ম্মনীতিসম্বন্ধে কবিদিগেরও দুই প্রকার দৃষ্টি আছে। এখানে দুই খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করা যাউক। রামায়ণ ও বিদ্যাসুন্দর স্বর্গ ও নরক। রামায়ণে কি দেখি, প্রথম বহুবিবাহের দোষ, দ্বিতীয় স্ত্রৈণতার দোষ, তৃতীয়তঃ পিতৃভক্তি, চতুর্থ কৌশল্যার পুত্রবৎসলত্ব, পঞ্চম লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, ষষ্ঠ সীতার পতিভক্তি, সপ্তম ভরতের নিঃস্বার্থতা, অষ্টম রাজার প্রজারঞ্জন। এক দিকে এই গুলি, অপর দিকে রাবণের দৌরাত্ম্য ও তাহার ফল, সতীর শাপে সবংশে বিনাশ। বাইবলের নীচে এক স্থানে এত ধর্ম্মনীতি-পূর্ণ গ্রন্থ আর এক খানি আছে কিনা সন্দেহ। ইহার সহিত বিদ্যাসুন্দরের দৃষ্টির তুলনা করা যাউক। ইহাতে প্রথম স্ত্রীশিক্ষার অনিষ্ট ফল,—বিদ্যার গর্ব্ব; দ্বিতীয় রূপ ও রসিকতা দর্শনে ধৈর্য্য-চ্যুতি; তৃতীয় পিতামাতার অগোচরে আত্ম-বিক্রয়—চতুর্থ গর্ভ গোপন করিবার জন্য বৃথা বাক্‌জাল ইত্যাদি। বাল্মীকি—সীতার প্রণয়ের ভাব দেখাইবার জন্য তাঁহার চারিদিকে শত শত বিপদ্ আনিয়াছেন; ভারতচন্দ্র বিদ্যার প্রণয়ের প্রমাণ দিবার জন্য সহজ——বিপরীত——, দিবা—, প্রভৃতি কত প্রকার আয়োজন করিয়াছেন। আমার বোধ হয় স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার তিরস্কার করিবার জন্যই ভারতের লেখনী ধারণ। এইরূপে দৃষ্টি-ভেদে কাব্য সকলের ধর্ম্মনীতিরও ভেদ হইয়া থাকে। শ্রীশিঃ—

সারদামঙ্গল সঙ্গীত।

গীতি।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

[কোথাগো প্রকৃতি সতী
সে রূপ তোমার!
যে রূপে নয়ন মন
ভুলাতে আমার।

সেই সুরধুনী কুলে
ফুলময় ফুলে ফুলে,
বেড়াইতে বনবালা
পরি ফুলহার।
নবীন নীরদ কোলে
সোনার যে দোলা দোলে,
ক্ষণেক দুলিতে; ক্ষণে
পালাতে আবার।
সুধাংশুমণ্ডলে বসি
খেলিতে লইয়ে শশী,
হাসিয়ে ছড়িয়ে দিতে
তারকারতন;
হাসি দিগঙ্গনাগণে
ধরি ধরি সে রতনে
খেলিত কন্দুক খেলা;
হাসিত সংসার।
এ তমান্ধ তলাতলে
কি বিকটই জ্বালা জ্বলে!
কেবল জ্বলিয়ে মরি,
ঘোচে না আঁধার।
অয়ি আহা কেন কেন
নিদয় হয়েছ হেন,
তোমা বিনে ত্রিভুবনে
কে আছে এ অভাগার!
চল দেবী লয়ে চল!
যথা জাগে হিমাচল
উদার সে রূপরাশি
রহস্য ভাণ্ডার।

চতুর্থসর্গ।

১

এস সহৃদয় গণ!
খোলাপ্রাণ ভোলামন,
এসহে বেড়িয়ে আসি
গিরি হিমালয়ে!
নয়ন-হৃদয়-লোভা;
দেখিবে উদার শোভা;
প্রকৃতি উদার সাজে,
উদার হৃদয়ে।

২

মালঞ্চে ফুটিলে ফুল
গুঞ্জরিয়ে অলিকুল
মধুপানে মত্ত মনে
কতগুণ গায়,
শূকর পশিয়ে তায়
ঘোঁৎ ঘোঁৎ কোরে ধায়,
আঁচুড়ে ছিঁচুড়ে খুঁড়ে দাঁহুড়ে বেড়ায়
কি জানি কি টুঁড়ে টুঁড়ে দাঁহুড়ে বেড়ায়!

৩

ভানুর তরুণ আ'ল
নয়নে লাগেনা ভাল,
কোটরে কুটুরে পেঁচা
মারে মালসাট;
প্রফুল্ল নলিনী দল,
রসভরে ঢল ঢল,
খুলিয়ে দিয়েছে কিবে
মনের কবাট!

৪

কর সহৃদয় গণ
সারদারে দরশন,
তোমরাই সদসৎ
বিচারে নিপুণ ;
অনলেরি অভ্যন্তরে
সুবর্ণ স্ববর্ণ ধরে ;
ভস্মে নাহি লক্ষ্য হয়
তার দোষ গুণ—
জ্বলন্ত অনল মাঝে
সীতা স্বর্ণলতা রাজে,
ভস্মে নাহি লক্ষ্য হয়
তাঁর দোষ গুণ—
অনল হিল্লোল কোলে,
সোনার প্রতিমা দোলে,
ভস্মে নাহি লক্ষ্য হয়,
তাঁর দোষ গুণ!
তোমরাই সদসৎ বিচারে নিপুণ!

৫

বিশ্বের মাধুরী যাহা,
তোমরাই জান তাহা ;
তোমাদেরি দৃষ্টিপাতে
জগত জুড়ায়—
জুড়ায় তাপিত প্রাণ ;
অবোধের ফোটে জ্ঞান
তোমাদেরই স্নেহ-মাখা
মধুর কথায়!

৬

জানেনাক কোন জ্বালা
সরদা সরলা বালা
সঁপিলেম তোমাদেরি
স্নিগ্ধ করতলে।

৭

কি দীর্ঘ নিশ্বাস শ্বাস!
এখনি হইবে নাশ
ত্রিদিবের শুক্তারা
পবিত্র জীবন!
অরুণ উদয় হবে,
অমনি নিবিয়ে যাবে ;
ক্ষণেকের তরে, মরি
জ্বলিছে কেমন!

৮

বিষাদ-তিমির-রাশি
সকলি ফেলেছে গ্রাসি,
তবুও জ্বলিছে কিবে জীবনের আ'ল—
সতীর এ সুমধুর জীবনের আ'ল!
তমোময় ধরাতলে
একমাত্র আলো জ্বলে,
ওইগো তাহাও আহা
ফুরাল ফুরাল!

৯

ত্রিদিব হইতে তারা
মাখিয়ে সুধার ধারা
কেন তুমি দেখা দাও
এমন সময়ে!
লয়ে পশু পক্ষী প্রাণী
ঘুমায় ধরণী রাণী,
নীরবে সমীর সহ
খেলিছে হৃদয়ে।

১০

নিরিবিলি ভাল বাস,
তাই নিরিবিলে আস,
নিরিবিলে চলে যাও
আপনার মনে!
যে ফুল আপন মনে
হাসিছে গহন বনে,
কদাচ কথন পড়ে
মানব নয়নে!

১১

অয়ি, অয়ি, কোথা যাও!
অভাগার পানে চাও!
দাঁড়াও দাঁড়াও! ফেলে
যেওনা আমায়!
হয়নি যামিনী ভোর,
ভাঙেনি ঘুমের ঘোর,
সাধের স্বপন মোর
কেনগো ফুরায়!

১২

চল যাই দুজনায়
হিমালয়-মেখলায়,
বিজন—বিজন—আহা
বিজন সে স্থান!
বিরল সে গিরিভূমি,
বিরলে বেড়াবে তুমি,
বিরলে হেরিব আমি
ভরিয়ে নয়ান!

১৩

দেখিয়ে মেটেনা সাধ,
কি জানি কি আছে স্বাদ,
কি জানি কি মাখা আছে
ও বিধুবদনে!
কি এক বিমল ভাতি!
প্রভাত করেছে রাতি,
হাসিছে অমরাবতী
নয়ন-কিরণে।

১৪

এমন সাধের ধনে
প্রতিবাদী জনে জনে,
দয়ামায়া নাই মনে
কেমন কঠোর।
আদরে গেঁথেছে বালা
হৃদয় কুসুম মালা,
কৃপাণে কাটিবে কেরে
সেই প্রেমডোর।

১৫

থিটুথিটে লোক নাই,
মিটুমিটে চোক নাই,
পিটুপিটে কথা নাই,
বিজন এ স্থান।
প্রমোদ প্রফুল্ল মুখে
বেড়াই মনের সুখে,
নয়নে নয়ন থুয়ে
জুড়াই পরাণ।

১৬

উত্তরেতে অধিত্যকা,
দক্ষিণেতে উপত্যকা,
গণ্ডশৈল শ্রেণী দুই
ব্যাপা পূর্ব্বাপরে;
মাঝে এ মেখলামালা,
এস কৌতুকিনী বালা

দাঁড়ায়ে চৌদিক দেখি
সম্মুখ-শিখরে !

১৭

দেখ অয়ি, অহো, ওহো,
কি মহান্ সমারোহ,
ঘোর ঘটা মহাছটা
কেমন উদার !
নিসর্গ মহান্ মূর্ত্তি
চতুর্দ্দিকে পাঁয়স্ফূর্ত্তি,
একত্তরে এ অন্তরে ধরেনা আমার—
ধরিতে অধীর মন; ধরেনা আমার।

১৮

যতই যতই চাই
বিহ্বল হইয়া যাই,
বোবার স্বপন, মুখে
কথা নাহি সরে;
দৃষ্টিপথ-প্রান্তভাগে
মায়ায় মিশিয়া জাগে
উদার পদার্থ রাজি
সাজি থরে থরে।

১৯

উদার—উদারতর
মূর্ত্তি তব মনোহর,
নিসর্গ-সাগর-লক্ষ্মী
জগত-সুসমা।
এ নিসর্গ-রঙ্গভূমি,
মনোরমা নটী তুমি,
শোভায় দাঁড়ায়ে এক
শোভা নিরুপমা !

২০

আননে বচন নাই,
নয়নে পলক নাই,
কান নাই মন নাই
আমার কথায় ;
মুখখানি হাসহাস,
আলুথালু বেশ বাশ
আলুথালু কেশ পাশ
ধরণী লুটায় !

২১

নাজানি কি অভিনব
খুলিয়ে গিয়েছে ভব
আজি ও বিহ্বল মত্ত
চকোর নয়নে।
আদরিণী পাগলিনী
এনহে শশীযামিনী,
ঘুমাইয়ে একাকিনী
কি দেখ স্বপনে।

২২

এই যে ফুটিল হাসি,
বড় আমি ভাল বাসি
হাসি হাসি মুখ খানি
প্রেয়সী তোমার।
বিষাদের আবরণে
বিমুক্ত এ বন্দ্রাননে
দেখিবার আশা আর
ছিলনাক মনে,
দরিদ্র ইন্দ্রত্ব লাভে
কতটুকু সুখ পাবে ?
আমার সুখের সিন্ধু
অনন্ত উদার ;

হে প্রশান্ত গিরি ভূমি,
জীবন জুড়ালে তুমি
জীবন্ত করিয়ে মোর
জীবনের ধনে।

২৩

প্রিয়ে সঞ্জীবনী লতা,
কত যে পেয়েছি ব্যথা
হেরে সে বিষাদময়ী
মূরতি তোমার।
হেরে কত দুস্বপন
পাগল হয়েছে মন,
কতই কেঁদেছি আমি
কোরে হাহাকার।

২৪

আজি সে সকলি মম
মায়ার লহরী সম,
আনন্দ সাগর মাঝে
খেলিয়া বেড়ায়।
দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী
ত্রিভুবন আলো করি।
দুনয়ন ভরি ভরি
দেখিব তোমায়।

২৫

পুন কেন অশ্রুজল
বহ তুমি অবিরল।
চরণ কমল আহা
ধুয়াও দেবীর।
মানস সরসী কোলে
সোনার নলিনী দোলে,
আনিয়ে পরাও গলে
সমীর সুধীর।

২৬

বিহঙ্গম, খুলে প্রাণ
ধররে পঞ্চম তান
সারদা মঙ্গল গান
গাও কুতূহলে।

———

ইতি চতুর্থসর্গ।

বেদের পুরাবৃত্ত

ও

প্রকৃতি॥

আমরা বেদকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত বা সংগৃহীত বহুসংখ্যক গ্রন্থের সমবায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। ফলতঃ বৈদিক গ্রন্থসমুদায়ের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ প্রদান করিলে ইহাই অনুভব হয়, যে তৎসমুদয় কখনই এক ব্যক্তি বা এক সময়ের রচিত বা সঙ্কলিত নহে। পরন্তু তদানীন্তন আর্য্যপুঙ্গবেরা নিজ নিজ পিতৃ পিতামহাদি কর্ত্তৃক রচিত গ্রন্থ-গৌরব-সংবর্দ্ধনার্থ তৎসমুদয়কে বেদ সংব-

শব্দে নির্দ্দেশপূর্ব্বক উহাদের রচনা বা সংগ্রহের প্রকৃত সময়ের বৃত্তান্ত অন্ধকারকূপে নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমরা বেদশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত অদ্ভুতরূপ আলোক আবিষ্কার পূর্ব্বক তাহারই সাহায্যে বেদকে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপ হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিব। এই দুরূহ উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশে আমাদিগকে বেদগহনে প্রবেশ-পূর্ব্বক এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিতে হইবে, যদ্দ্বারা আমরা বৈদিক-গ্রন্থসমুদয়ের রচনাপ্রণালী প্রভৃতি প্রকৃতিগত এরূপ সামান্য ও বিশেষ বৈলক্ষণ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইব, যাহার বলে বৈদিক ও বৈদিকভিন্ন গ্রন্থসমুদয়ের পরস্পর প্রভেদ নির্ণয় করা যাইবে। ফলতঃ এইরূপ বিশেষ বিশেষ সূক্ষ্ম তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিলে তাহাই আমাদের পক্ষে বেদগহন প্রবেশের আলোক স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারিবে। তাহা হইলেই আমরা বেদের প্রকৃত পুরাবৃত্ত ও প্রকৃতি বিষয়ে অন্বর্থ জ্ঞানোপার্জ্জনের অধিকারী হইতে পারিব বলিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হয়। সংহিতা উপনিষদ্ প্রভৃতি বিশেষ মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করিলে পূর্ব্বোক্তরূপ সামান্য ও বিশেষ তথ্য সমুদয় স্বতঃই পাঠকের মনে উদিত হইতে থাকে, যাঁহারা উক্তরূপে বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা ইহা অবশ্যই অনুভব করিয়া থাকিবেন। কোন বিশেষ গ্রন্থ পাঠ করিয়া উহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে ব্যবচ্ছেদ না করিলেও এরূপ অনেকানেক উপরিভাসমান তত্ত্বের উচ্ছেদ হইয়া থাকে যাহাদ্বারা স্পষ্টই গ্রন্থখানির প্রকৃতি ও সময়াদির বিষয় নিরূপণ করিতে পারা যায়। বেদের রচনা আধুনিক রচনা হইতে অনেক বিভিন্ন, ইহা দৃষ্টিমাত্রেই বোধ হয়। চসর বা উইক্লিফের রচনা ইদানীন্তন কালের ইংরাজী রচনা অপেক্ষা যেরূপ বিভিন্ন, বেদের রচনা ও অপেক্ষাকৃত অধুনাতন সংস্কৃত রচনারও পরস্পর প্রভেদ সেই প্রকৃতির বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও গাঢ়তর। বেদের ব্যাকরণ স্বতন্ত্র। যেরূপ এঙ্‌লোসাক্‌শন ভাষার ব্যাকরণ পাঠ না করিলে চসর প্রভৃতির রচনা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না, সেই রূপ বৈদিক পদ্ধতি পাঠ না করিলে বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক উহাতে সুচারুরূপ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব এই একমাত্র ব্যাকরণের উপর নির্ভর করিলেও কোন বিশেষ গ্রন্থকে বৈদিক কি বৈদিকভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই উপায়টী সকল সময়ে অব্যর্থ হয় না। মানবধর্ম্মশাস্ত্রে ও অন্যান্য অনেক প্রাচীন গ্রন্থে অনেক বৈদিক পদ্ধতির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও বা বৈদিক-প্রক্রিয়া-নিষ্পন্ন পদ বা পদাংশের অবিকল প্রয়োগও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সে যাহা হইক এরূপ কাঠিন্য দর্শনে লুপ্তপদবিক্ষেপ হইবার আবশ্যকতা নাই, কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে

পারিলে অন্যান্য উপায়ও সুলভ হইতে পারে। মানবধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থে বৈদিক পদ্ধতির প্রয়োগ আছে, সূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিলে পরিশেষে এরূপ অনুভব হয় যে, উহা বেদের রচনা-প্রণালীর অনুকরণ মাত্র। ফলতঃ আদর্শ ও অনুকৃতির পরস্পর প্রভেদ লক্ষ্য করিতে পারিলে আমাদের উপায় অব্যাহতই থাকে। বেদের রচনায় গদ্য ও পদ্য উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়, বৈদিক গদ্যরচনা একটি বিশেষ পদার্থ। উহার প্রকৃতি বেদের অধস্তন তাবৎ গদ্যরচনা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বৈদিক সময়ের অধস্তন চরম সীমার পরে যত প্রকার গদ্য রচনা হইয়াছে, তৎসমুদয়ের কোনটীতেও বৈদিক গদ্যের অনুকরণ নাই, সুতরাং কোন বিশেষ গ্রন্থের গদ্যরচনা-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহাকে বৈদিক বা বৈদিকভিন্ন ইহা নির্ণয় করিতে পারা যায়। বৈদিক পদ্যের ছন্দঃপ্রণালীও একটী সম্পূর্ণ প্রাচীন বৈদিক পদার্থ। বেদের অধস্তন গ্রন্থসমূহে বৈদিক ছন্দের দুই চারিটী অনুকৃত হইয়াছে যথার্থ বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক ছন্দঃই কুত্রাপি অনুকৃত হয় নাই; সুতরাং বৈদিক গ্রন্থের ছন্দঃপ্রণালীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি-পাত করিলে অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের মূলোচ্ছেদ হইতে পারে। অতএব আমাদের বিবেচনায় বৈদিক ব্যাকরণ ও গদ্য এই উভয়ের প্রতি যেরূপ মনোযোগের প্রয়োজন ছন্দঃপ্রণালীর প্রতি তদপেক্ষা অধিকতর মনোযোগের বিশেষ আবশ্যকতা। এক্ষণে এরূপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে, যে বেদের ব্যাকরণও গদ্য প্রভৃতির অপেক্ষা উহার ছন্দঃপ্রণালী কি প্রকারে অধিকতর কার্য্যকর হইল? কিঞ্চিৎ অনুধ্যান করিলে সহজেই এই প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা হইতে পারে। মানুষের রুচিপরিবর্ত্ত অনুক্ষণ হইয়া থাকে, শরীরের সহিত রুচিরও পরিবর্ত্ত হইতে দেখা যায়, এই নিয়মটীর কার্য্যকারিতার জন্য সময়ের উপযোগিতা নাই বটে, কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিতে পারা যায়না, যে যতদিন মানুষের স্বভাব বদ্ধমূল হইয়া আকার গ্রহণ না করে তত-দিন পর্য্যন্ত সেরূপ অনুক্ষণ রুচি-পরিবর্ত্ত লক্ষিত হয়, স্বভাবের পরিণাম ও পক্কতা জন্মিলে আর ততদূর থাকেনা, এই জন্যই শৈশবে মনুষ্যের রুচিপরিবর্ত্ত সর্ব্বদাই দেখা যায়। এক্ষণে সমাজকেও মনুষ্যের ন্যায় একটী প্রকাণ্ড সজীব দেহ মনে করিলে অনায়াসেই উপরি-উল্লিখিত প্রশ্নে-সমাধান হইবে। আর্য্যসমাজের শৈশবর কালে বৈদিক ছন্দের রচনা হয়, সুতরাং কিছুকাল পরেই অভিনব সমাজের রুচি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ব্যাকরণ কি গদ্যরচনা প্রণালীর পরিবর্ত্ত হইতে অনেক সময়ের প্রয়োজন, কিন্তু ছন্দঃ-প্রণালীর পরিবর্ত্ত অতি অল্প সময়ের মধ্যে হওয়া অসম্ভাবিত নহে। একজন নূতন কবি আপন অভিরুচি অনুসারে একটী নূতন ছন্দঃ প্রণয়নপূর্ব্বক উহা শীঘ্রই সমাজে প্রবর্ত্তিত

করিতে পারেন, একবার প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে অবিলম্বেই উহার প্রতি লোকের আস্থা জন্মে, ক্রমে অন্যান্য কবিও উহার প্রদর্শিত পথের অনুগামী হইয়া ঐরূপ ছন্দে নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করিতে থাকেন, এবং অল্পকালের মধ্যেই সমাজের রুচির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। অভিনব ছন্দঃ ভিন্ন অন্যবিধ ছন্দঃ তখন আর প্রীতিকর থাকেনা, সুতরাং কোন প্রাচীন গ্রন্থ বুঝিতে হইলে উহাও ঐ অভিনব ছন্দে পরিবর্ত্তিত করিয়া বুঝিবার চেষ্টা হয়, কার্য্যেও তাহাই হইয়া থাকে। ফলে এই রূপ ছন্দের পরিবর্ত্তনে ভাষার অবয়বও অঙ্গসংস্থান ঘটিত বিশেষ পরিবর্ত্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা নাই, উহাদ্বারা ভাষার বেশপরিবর্ত্তনমাত্র ব্যতীত অন্য কিছুই হয়না, কিন্তু ব্যাকরণাদির পরিবর্ত্ত ভাষার অবয়ব ও অঙ্গসংস্থান ঘটিত, সুতরাং ব্যাকরণাদির পরিবর্ত্ত হইতে অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক সময়ের প্রয়োজন। বেদের ছন্দঃপ্রণালীর বিষয়েও অবিকল এইরূপ পরিবর্ত্তের অনুমান করা যায়। বেদের ছন্দঃরচনার কিছুদিন পরেই সমাজের রুচিবিরোধ হওয়াতে ক্রমে নূতন নূতন ছন্দের উদ্ভাবন হইয়াছিল, অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, যে ছন্দোঘটিত পরিবর্ত্তই সংস্কৃতভাষার প্রথম পরিবর্ত্ত, ব্যাকরণাদিঘটিত পরিবর্ত্ত ইহা অপেক্ষা অনেক অধস্তন। এক্ষণে দেখিতে হইবে কিরূপে বৈদিক ছন্দের পরিবর্ত্ত হইয়াছিল? বৈদিক কোন গ্রন্থেই প্রায়ই অনুষ্টুপ ছন্দের প্রয়োগ নাই, যদিও কোন গ্রন্থের কোন অংশে দুই একটী ইতস্ততঃ ব্যস্ত অনুষ্টুপের আবিষ্কার হইতে পারে, কিন্তু বৈদিক কোন গ্রন্থেই যে আদ্যন্ত প্রণালীবদ্ধ অনুষ্টুপের ব্যবহার নাই ইহা একপ্রকার নিঃসন্দিগ্ধ। অতএব এইরূপ আদ্যন্ত প্রণালীবদ্ধ অনুষ্টুপছন্দে রচিত গ্রন্থমাত্রেই বেদের অধস্তন, এরূপ নির্দ্দেশ করা কোন রূপেই অযৌক্তিক হইতে পারে না। বৈদিক সূত্র ও ব্রাহ্মণের কোন কোন অংশে ত্রিষ্টুপছন্দের সহিত একত্র অনুষ্টুপের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদের উপরি-উল্লিখিত প্রতিজ্ঞারই বরং বিশেষ সমর্থন হইতেছে। কারণ ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে কোন রূপে আদ্যন্ত প্রণালীবদ্ধ প্রয়োগই কোন নূতন ও স্বতন্ত্র সাহিত্য সংসারের পরিচায়ক। নতুবা বেদের কোন কোন অংশে দুই একটী অনুষ্টুপ ব্যস্ত দেখিয়াই উহার অধস্তন আদ্যন্ত অনুষ্টুপ রচিত গ্রন্থের সহিত উহার একতা সংস্থাপন করিবার ইচ্ছা করা কোন ক্রমেই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজী জর্ম্মন প্রভৃতি ভাষার পরিবর্ত্তের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেও আমাদের প্রতিজ্ঞার সমর্থন হওয়ার সম্ভাবনা, অতএব যখন বহুসংখ্যক ভাষাতেই এইরূপ ব্যাপার স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, তখন এইটীই ভাষাগত সাধারণ নিয়ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। পাণিনি-প্রণীত

ব্যাকরণে ছন্দোবদ্ধ বৈদিক রচনাকে অধস্তন পদ্যসকল হইতে পৃথক্ করিয়া শেষোক্তটীর শ্লোক এই নাম দেওয়া হইয়াছে, ইহা দ্বারা স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে বেদের অধস্তন আদ্যন্ত অনুষ্টুপে রচিত গ্রন্থ সমুদায়ই শ্লোক শব্দের অভিধেয়. সুতরাং বৈদিক গ্রন্থের কোন কোন অংশে অনুষ্টুপ ছন্দের ব্যবহার থাকিলেও আমাদের প্রতিজ্ঞার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইতেছে না। খৃষ্টের প্রায় আট শত বৎসর পূর্ব্বে আর্কিলোকস নামে একজন কবি গ্রীক ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, অধুনাতন ইউরোপীয় ভাষায় যে ছন্দের বহুলপ্রচার দেখিতে পাওয়া যায় প্রাচীন পুরাবৃত্তরচয়িতার ছন্দটিকে উক্ত আর্কিলোকসের উদ্ভাবিত বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু আরিষ্টটল আর্গাইটিস নামে যে গ্রন্থখানি হোমর প্রণীত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহারও কোন কোন অংশে উক্ত ছন্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। জর্ম্মন ভাষায় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে রচিত কয়েকখানি পদ্য গ্রন্থ ত্রয়োদশ শতাব্দেই সমাজের রুচিপরিবর্ত্তহেতুক নূতন ছন্দে পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে আদ্যন্ত অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত তাবৎ গ্রন্থই বৈদিক গ্রন্থ সমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র, আর আদ্যন্ত অনুষ্টুপে রচিত ব্যতীত তাবৎ গ্রন্থই বৈদিক গ্রন্থের অন্তর্নিবেশ্য। এই নিয়ম অনুসারে বিবেচনা করিতে হইলে রামায়ণ, মহাভারত, মানবপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র, অষ্টাদশ পুরাণ, ষড়্দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র—এই সমুদায় বৈদিকভিন্ন গ্রন্থ বলিয়া প্রতীতি হয়, এতদ্ভিন্ন সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য সংসারের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিতেছে তাহাই বেদশব্দের প্রকৃত প্রতিপাদ্য। বেদের রচনার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমুদয় সময় ও সমুদয় বেদের রচনাকেই সর্ব্বশুদ্ধ চারি অংশে বিভাগ করা যাইতে পারে। সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে রচনাপ্রণালীর যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহাই এই সময়বিভাগের মূল। এই মূল অবলম্বন করিয়া যে চারিটী ভাগ করা যাইতে পারে, তৎসমুদয়ের যথাক্রমে ছান্দস, মান্ত্র, ব্রাহ্মণ, ও সৌত্র এই চারিটী নাম প্রদত্ত হইতে পারে। এই চারিটী বিভাগের মধ্যে ছান্দস বিভাগ উর্দ্ধতন অর্থাৎ ইহার অন্তর্গত সমুদায় কালই বেদরচনার আদিকাল, আর সৌত্র বিভাগ সকলের শেষ, অর্থাৎ বেদরচনার অন্তিম কাল, সৌত্র বিভাগের রচনাকে আর বেদশব্দে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারেনা। মান্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুইটী বিভাগ পূর্ব্বোক্ত চরম সীমাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী। এই চারিটী বিভাগ এরূপে পরস্পরসম্বদ্ধ যে ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটীর অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে পর পরটীর অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না, সুতরাং ইতিহাসঘটিত প্রমাণ প্রয়োগপূর্ব্বক ইহাদের একটীরও অস্তিত্ব প্রমাণ

করিতে পারিলে প্রত্যেকটীরই অস্তিত্ব স্বতঃসাধিত হইবে।

এক্ষণে প্রাচীন ইতিবৃত্তোল্লিখিত প্রসিদ্ধ ঘটনার সহিত সমন্বয় করিয়া এই চারিটী বিভাগের বিশেষ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত চারিটী বিভাগের মধ্যে সৌত্র বিভাগটী সর্ব্বাপেক্ষা অধস্তন, সুতরাং এই বিভাগের গ্রন্থাদির রচনাপ্রণালী অধুনাতন সংস্কৃত রচনার সহিত নিকট সন্নিহিত, ইহাদের উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে, সুতরাং বেদের পুরাবৃত্ত ও প্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে হইলে এই শেষোক্তটী হইতে আরম্ভ করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ আমরা অধুনাতন সংস্কৃত রচনার সহিত পরিচয়হেতুক এইটীর বিষয় অনায়াসে বুঝিতে সক্ষম হইব, এবং শেষোক্তটী বোধগম্য হইলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অপর কয়েকটীর বিষয়ও বুঝিয়া উঠা সহজ হইয়া উঠিবে। অতএব আগামী বারে আমরা সৌত্রবিভাগের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন-বৃত্ত।

বাল্যসংসর্গ।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে মিল্ শৈশবে ও বাল্যে বাহ্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। পিতা বই তাঁহার শৈশবসঙ্গী বা বাল্যসহচর আর কেহই ছিলেন না। কোন সমবয়স্ক বালকের সহিত তাঁহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত না। এরূপ অবস্থায় তাঁহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁহার পিতৃবন্ধুদিগের দ্বারা এই অভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূরীকৃত হওয়ায়, তাঁহার শিক্ষার পরিপূর্ণতা বিষয়ে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। বেন্থাম্, হিউম্, ও রিকার্ডো প্রভৃতি ইংলণ্ডের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ জেম্স মিলের বন্ধুশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইহাঁরা জেম্স মিলের গৃহে সর্ব্বদা আগমন এবং ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন। তাঁহারা মিল্‌কে পুত্রনির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত গুরুতর বিষয়ে কথোপকথন ও তর্ক বিতর্ক করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতেন। রিকার্ডো অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার (Political Economy) শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মিল্ এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলে, রিকার্ডো প্রায় তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া যাইতেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার সহিত নানাপ্রকার

কথোপকথন করিতেন। হিউম্ স্কটলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং জেম্‌স মিলের স্বদেশী। ইহাঁরা দুইজনে বাল্যকালে এক পাঠশালায় ও এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। পরে কিছুদিন পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া আবার পুনর্ম্মিলিত হন। এই সময়ে মিল্ হিউমের অতিশয় অনুগত হইয়া উঠেন এবং প্রায়ই তাঁহার বাটীতে গমনাগমন করিতেন; কিন্তু বেন্‌থামেরই সহিত তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম আনুগত্য হইয়া উঠে। বেন্‌থাম তাঁহার পিতার প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। এই গভীর বন্ধুত্বের মূলে সহানুভূতি অবস্থিত ছিল। কারণ ইংলণ্ডের প্রধান লোকদিগের মধ্যে জেম্‌স মিলই সর্ব্বপ্রথমে বেন্‌থামের ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও ব্যবহার শাস্ত্রাদি বিষয়ক মত সকলের সারবত্তা উপলব্ধি করেন এবং তাহাদিগকে কার্য্যেও পরিণত করেন। যে সময়ে বেন্‌থাম অতি নিভৃতভাবে থাকিতেন,—যে সময়ে তিনি অতি অল্প দর্শকেরই স্বগৃহে আগমন অনুমোদন করিতেন—সে সময়েও এই সহানুভূতি জেম্‌স মিলকে তাঁহার নিত্য সহচর করিয়া তুলিয়াছিল। জেম্‌স মিল্ পুত্রের সহিত প্রায় মধ্যে মধ্যে প্রিয়বন্ধু বেন্‌থামের বাটীতে যাইতেন। ১৮১৩ খ্রীঃ মিল্—পিতা ও পিতৃবন্ধু বেন্‌থামের সহিত অক্‌সফোর্ড, বাথ্, ব্রিষ্টল, এক্‌জিটর, প্লিমাউথ্ এবং পোর্টসমাউথ্ প্রভৃতি নগরী পর্য্যটন করিয়া নানাবিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হন। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মোহিনী মূর্ত্তি এই সময়েই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট করে। ১৮১৪ হইতে ১৮১৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বেন্‌থাম প্রতি বৎসর ছয় মাস করিয়া সমরসেট্‌সায়র প্রদেশের "ফোর্ড আবে" নামক স্থানে বাস করিতেন। সেই সেই সময় মিল্ ও তাঁহার সহিত তথায় অবস্থিতি করিতেন। এই প্রদেশের প্রশস্ত অত্যুচ্চ ও বায়ুসঞ্চালিত অট্টালিকা, নির্ম্মক্ষিক ছায়াবহল প্রশান্ত উপবন এবং জলপ্রপাত ও নির্ঝরিণী সকলের ঝর্ঝর শব্দ মিলের অন্তরে স্বাধীনতা উদারতা ও কবিতার উদ্দীপনা করিয়া দিয়াছিল!

এই ফোর্ড আবেতে অবস্থিতিকালে বেন্‌থামের ভ্রাতা জেনেরাল সার সামুয়েল বেন্‌থাম ও তদীয় পরিবারবর্গের সহিত মিলের পরিচয় ও আত্মীয়তা হয়। এই সাক্ষাৎকারের কিছুদিন পরে জেনেরাল বেন্‌থাম ও তদীয় পরিবারবর্গ কার্য্যোপলক্ষে দক্ষিণ ফ্রান্সে গমন ও কিছুদিনের জন্য তথায় অবস্থিতি করেন। ১৮২০ খ্রীঃ তাঁহারা মিল্‌কে তাঁহাদিগের সহিত অন্ততঃ ছয় মাসের জন্য অবস্থিতি করিতে আহ্বান করেন এবং মিল্ ও তাঁহাদিগের আহ্বানের অনুবর্ত্তন করিয়া ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পিরিনিস-উপত্যকাস্থ রমণীয় প্রাসাদে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের রমণীয় দৃশ্য মিলের হৃদয়ে গভীরতম ভাব অঙ্কিত এবং তাঁহার রুচিকে চিরজীবনের মত উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত

করিয়াছিল। মিল্ চতুর্দ্দিকে মনোহর পর্ব্বতদৃশ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, একদিকে ফরাশি জড়জগতের অসীম সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন; অন্যদিকে ফরাশি ভাষা অধ্যয়ন পূর্ব্বক ফরাশি সাহিত্য ও বিজ্ঞান সাগরে অবতরণ করিলেন। তিনি মণ্টপিলিয়ার নগরে "ফ্যাকল্টি ডেস্ সায়েন্সেস্" কালেজে মসো আংগ্লেডার রসায়ণবিদ্যাবিষয়ক, মসো প্রভেন্কালের ভূতত্ত্ববিদ্যাবিষয়ক ও মসো জারগোনের ন্যায়দর্শন বিষয়ক বক্তৃতা সকল শ্রবণ করিয়া জ্ঞানমার্গে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিলেন; এবং এদিকে "লিসি" কালেজের অধ্যাপক মসো লেন্থেরিকের নিকট অঙ্কশাস্ত্রের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে মিলের এক বৎসরেরও অধিককাল ফ্রান্সে অতিবাহিত হইয়া গেল। ফরাশি জাতির সরল, সামাজিক ও অমায়িক ভাব মিলের হৃদয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। ফরাশিজাতির একটী বিশেষ গুণ মিলের হৃদয় আকৃষ্ট করে। এই আকর্ষণের বিশেষ কারণ এই যে ইংলণ্ডে এই গুণ অতি বিরলপ্রসর। ফরাশিজাতি শত্রুতার কারণ না থাকিলে সকলকেই বন্ধুভাবে দেখেন এবং সকলের নিকটই বন্ধুজনোচিত ব্যবহারের প্রত্যাশা করেন কিন্তু ইংরাজজাতি সাধারণতঃ সকলকেই প্রথমে শত্রুভাবে দেখেন এবং কাহারও নিকট কোন বিষয়ের প্রত্যাশা করেন না। এই বৈষম্য জন্য ফরাশিরা জাতীয় তুলায় মিলের নিকট ইংরাজদিগের অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতীত হইয়াছিলেন।

মিল্ এইরূপে এক বৎসরেরও অধিক কাল ফ্রান্সে অবস্থিতি করিয়া অবশেষে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। পারিস নগর দিয়া যাইবার সময় বিখ্যাত অর্থতত্ত্ববিৎ মসো সে এবং বিখ্যাত দার্শনিক সেণ্ট সাইমনের সহিত তাঁহার পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মে। ফ্রান্সে অবস্থিতি ও এই মহাত্মাদিগের সহিত কথোপকথন দ্বারা স্বাধীন চিন্তার ভাব মিলের মনে অধিকতর উদ্দীপিত হইয়া উঠে। এই উদ্দীপিত স্বাধীন চিন্তার ভাব তাঁহাকে চিরজীবন অশ্রান্তভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর করে।

আত্মশিক্ষা।

মিল্ ফ্রান্স হইতে গৃহ প্রত্যাগমনের পর দুই এক বৎসর প্রধানতঃ পুরাতন পাঠ সকলের আলোচনা করিতে লাগিলেন। নূতন পুস্তকের মধ্যে পিতৃদেব-রচিত অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার বিষয়ক নবপ্রকাশিত পুস্তক এবং কণ্ডিলাক্-লিখিত "ট্রেট্ ডেস্ সেন্সেসনস্" ও "কোর্স ডেটিউড্স" নামক ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রবিষয়ক পুস্তকদ্বয় সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার হস্তে পতিত হয়। ইহার পর ফরাশি বিপ্লববিষয়ক ইতিহাস পাঠ করিয়া তিনি বিস্ময় ও আনন্দ রসে আপ্লুত হন। এই প্রলয়সদৃশ ঘটনার

বিষয়ে তিনি পূর্ব্বে সবিশেষ অবগত ছিলেন না। তিনি কেবল এইমাত্র জানিতেন যে, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ লুইয়ের যথেচ্ছাচারিতায় জর্জ্জরীভূত ফরাশিজাতি ফরাশিরাজ ষোড়শ লুই, ও তদীয় সহধর্ম্মিণী রাজ্ঞী মেরিয়া অ্যান্টয়নেটির প্রাণ বিনাশ পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারিতার শৃঙ্খল হইতে আপনাদিগকে উন্মুক্ত করেন, এবং অসংখ্য স্বজাতির রুধিরে হস্ত কলুষিত করিয়া অবশেষে নেপোলিয়নের করে আত্ম-সমর্পণ করেন। পূর্ব্বে তিনি ফরাসিবিপ্লবের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র অবগত ছিলেন। এক্ষণে সবিশেষ জানিতে পারিয়া, ফরাশি জিরণ্ডিষ্টেরা যে স্বাধীনতা ও যে সাধারণতন্ত্রের জন্য ধন প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন,—সেই স্বাধীনতা ও সেই সাধারণতন্ত্রের পিপাসু হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সজীব কল্পনা, তাঁহার মনে এই চিত্র অঙ্কিত করিল—যেন ফরাশিবিপ্লবের ন্যায় একটী ঘটনা অচিরকালমধ্যেই ইংলণ্ডে সংঘটিত হইবে এবং তিনি ইংলণ্ডীয় মহাসভায় ফরাশি জিরণ্ডিষ্টের আসন গ্রহণ করিবেন!

ইংরাজব্যবহারশাস্ত্রের উপর জেম্‌স্‌ মিলের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিলনা। তথাপি তিনি পুত্রকে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যবহারবিভাগেরই যোগ্য মনে করিয়া, নূতন বন্ধু অষ্টিনের নিকট রোমীয় ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে বলেন। তদনুসারে মিল্‌ ১৮২১-২২খ্রীষ্টাব্দে অষ্টিনের নিকট ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ডিউমণ্ট—"ট্রেট্‌ ডি লেজিসলেসন" নামক যে পুস্তকে বেন্‌থামের বিধি বিষয়ক মত সকল ব্যক্ত করিয়াছেন, এই সময়ে সেই পুস্তক মিলের হস্তে পতিত হয়। এই পুস্তক মিলের মনোজগতে একটী নূতন যুগের অবতারণা করে। মিল আশৈশব বেন্‌থামিক প্রণালীতেই দীক্ষিত ছিলেন। "যে কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অধিক লোকের সুখের উৎপাদক, তাহাই ধর্ম্ম ও লোকের করণীয়" মিল্‌ সকল কার্য্যেই বেনথামের এই মত প্রয়োগ করিতেন। সাধারণ লোকে যখন নীতি ও ব্যবহার বিষয়ক কোন প্রিয় মত যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে অক্ষম হয়, তখন ইহা "প্রকৃতির নিয়ম" "অভ্রান্ত যুক্তি" ও "কর্ত্তব্য বুদ্ধি" প্রভৃতির অনুমোদিত বলিয়া প্রতিদ্বন্দীর চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কার্য্য বা মতের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন না করিয়া, আমরা যাহা ভাল বুঝিতেছি বা যাহা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই "কর্ত্তব্যবুদ্ধির" "প্রকৃতির নিয়মের" ও "অভ্রান্ত যুক্তির" অনুমোদিত, শুদ্ধ ইহা বলিলেই এক্ষণে আর পর্য্যাপ্ত হয় না। বেন্‌থাম্‌ এরূপ অসার বেদবাক্যসকলের মূলে সর্ব্বপ্রথমে কুঠারাঘাত করেন। তিনি নৈতিক রাজ্যে এক নূতন যুগের আবির্ভাব করেন। "যাহা জগতের অত্যন্ত হিতকর ও অপরিসীম সুখের উৎপাদক" তাঁহার মতে তাহাই "কর্ত্তব্যবুদ্ধির" "প্রকৃতির নিয়মের" ও "অভ্রান্ত যুক্তির" অনুমোদিত। কারণ

প্রকৃতি বা ঈশ্বর যাহাকেই আমরা জগতের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিনা কেন, জগতের হিত ও সুখ যে তাঁহার জগৎকার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য তদ্বিষয়ে আর মতান্তর নাই। সুতরাং "যাহাই জগতের হিত ও সুখের উৎপাদক" তাহাই "কর্ত্তব্যবুদ্ধির" "প্রকৃতি বা ঈশ্বরের নিয়মের" "ও "অভ্রান্ত যুক্তির" অনুমোদিত এবিষয়েও আর মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কোন্ কার্য্য জগতের হিত ও সুখের উৎপাদক, কেবল ইহার নির্ণয় যুক্তি ও প্রমাণ সাপেক্ষ। সুতরাং কোন কার্য্য উচিত কি না, ইহার মীমাংসাস্থলে সেই কার্য্যের "কর্ত্তব্যবুদ্ধি" প্রভৃতির অনুমোদনীয়তা ব্যক্ত না করিয়া, তাহা, জগতের হিত ও সুখকর কিনা যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা কেবল তাহাই প্রতিপন্ন করা উচিত। যুক্তি ও প্রমাণের পরিবর্ত্তে " কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রকৃতি বা ঈশ্বরের নিয়ম, ও অভ্রান্ত যুক্তির অনুমোদনীয়" শুদ্ধ এই কথা গুলি নির্দ্দেশ করিলেই চলিবে না। মিল্ বেন্থামের নিকট নীতিবিষয়ক পূর্ব্বোক্ত দুইটী মতের —হিতবাদ (principle of utility) এবং সুখবাদ (doctrine of happiness) —শিক্ষা করেন। এই দুইটী মত তাঁহার হৃদয়ে ও মনে গ্রথিত হইয়া যায়। ইহাই তাঁহার ধর্ম্মের, ইহাই তাঁহার নীতির, এবং ইহাই তাঁহার বিজ্ঞানের, মূলভিত্তি স্বরূপ হইয়া উঠে। তিনি জীবনে যে কার্য্য করিতে যাইতেন, তাহাতেই হিতবাদ ও সুখবাদ তাঁহার 'কর্ত্তব্যবুদ্ধির নোদক হইয়া উঠিত। তাঁহার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে তিনি এই মতদ্বয়ের কার্য্যে প্রয়োগ দ্বারা জগতের অসীম মঙ্গল সংসাধিত করিতে পারিবেন। তাঁহার মনোজগতের পরিসর ইহা দ্বারা অতি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। অধিক কি ইহা তাঁহার শরীর ও মনে নূতন জীবন সঞ্চারিত করে।

মিল্ বেন্থামের বিধি, নীতি ও ন্যায়-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ক্রমে লক্, হেল্ভেসিয়স্, হার্টলে, কণ্ডিলাক, বার্কেলে, হিউম্, রীড্, ডিউগাল্ট ষ্টুয়ার্ট, ব্রাউন্ প্রভৃতি বিখ্যাতনামা দার্শনিকদিগের গ্রন্থসাগরের পারদর্শী হইলেন। এই স্থানেই তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইল। ক্রমশঃ।

মগধরাজ্য।

আমরা 'আর্য্যবংশে' যে মগধরাজ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সবিস্তর বর্ণনা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। মগধ-রাজ্য গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত ছিল। প্রথমে মগেরা এই রাজ্যে অবস্থিতি করিত বলিয়া ইহার নাম মগধ হইয়াছিল। পরে

আর্য্যতরঙ্গিণী ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখিনী হইলে মগেরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-উপদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। মঙ্গেরা শাকদ্বীপ হইতে আসিয়া মগধে উপনিবেশ সংস্থাপন করে ; এই জন্য মগধদেশকে শাকেতও বলিত। আইন আক্‌বরীতে মগধদেশের নাম 'মক্‌তা' লিখিত আছে। বর্ণপরিবর্ত্তনের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে এই 'মক্‌তা' শব্দ 'মগধ' শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়—(যথা মগধ = মগধা = মগ্‌ধা = মক্‌তা)। ডি গুইগ্‌নেস (De Guignes) বলেন চীনেরা মগধদেশকে 'মকিয়াত' বা 'মকিত' বলিয়া থাকেন, এবং কেম্পফার (Kempfer) বলেন জাপানীয়েরা—যে দেশে শাক্য মুনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দেশকে মগত-কফ্‌ (মগত-মগধ, কফ-দেশ) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পারসীক ইতিবেত্তৃগণ মগধদেশকে 'মাবাদ বা মুবাদ' নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এই 'মাবাদ' বা 'মুবাদ' যে 'মগাবাদ' শব্দের সংক্ষেপ —তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই মগধরাজ্য প্রথমে বিহারের এক অংশ মাত্র ছিল। কিন্তু কালে মগধসম্রাট্‌গণ সমস্ত গাঙ্গেয় প্রদেশের অধীশ্বর হইলে মগধরাজ্য ও অনুগাঙ্গপ্রদেশ এক হইয়া উঠে। এই অনুগাঙ্গ প্রদেশকে তিব্বতীয়েরা অদ্যাপি 'অনুখেঙ্ক' বা 'অনখেক' (Anukhenk or Anonkhek) এবং তাতারের অধিবাসীরা 'এনাকাক' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছে। তাহারা পূর্ব্বোক্ত শব্দগুলি শুদ্ধ অনুগাঙ্গপ্রদেশে প্রয়োগ করে এরূপ নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ বুঝাইতে হইলেও ঐ শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া থাকে।

সিসিলীয় ডাওডোরস্‌ বলেন মগধের রাজধানী পালীপুত্র ভারতবর্ষীয় হার্কিউলেস্‌ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। সিসিরো এই হার্কিউলেসের নাম 'বেলঃ' (Belus) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'বেলঃ' আর সংস্কৃত 'বলঃ' একই বলিয়া বোধ হইতেছে। 'বলঃ' কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠের নাম ছিল, সুতরাং এই 'বলঃ' কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেবই বলিয়া অনুমান হইতেছে। বলদেবকে কথন কথন বলীও বলিত। এই জন্য বলদেবের পুত্র অঙ্গদ বলীপুত্র নামে আখ্যাত হইয়াছেন, এবং বলদেব নিজ পুত্র বলীর জন্য পালীপুত্র বা পাটলিপুত্র নগর নির্ম্মাণ করেন বলিয়া, ইহা পুরাণাদিতে বলীপুত্র-পুর নামে লিখিত হইয়াছে। আমাদের অনুমান হয় যে এই নগরের আদি নাম শুদ্ধ বলীপুত্র-নগরই ছিল, 'পালীপুত্র' ও 'পাটলিপুত্র' উহার অপভ্রংশ মাত্র। চীন, ব্রহ্মদেশ, ও সিংহল প্রভৃতির লোকেরা এই 'পালীপুত্র' নগর হইতেই মগধরাজ্যের নাম পালীরাজ্য ও মাগধী ভাষার নাম পালীভাষা, রাখিয়াছে।

এরূপ প্রবাদ আছে যে বলদেব আপনার পুত্রদিগের জন্য তিনটী নগরী সংস্থাপিত করেন। ইহারা পূর্ব্বে বলদেব-

পত্তন নামে আখ্যাত হইত, কিন্তু এক্ষণে সাধারণে এই নগর গুলিকে বলিপুর বা মহাবলিপুর (Mavelivoram) এই আখ্যা প্রদান করিয়াছে। এই নগর তিনটীর মধ্যে একটী মান্দ্রাজনগরীর দক্ষিণে—করমণ্ডল-উপকূলে,—একটী বিদর্ভদেশে, এবং অপরটী গঙ্গাতীরে অবস্থিত। শেষোক্তটীর বর্ত্তমান নাম রাজগৃহ বা রাজমহল। পুরাণাদিতে এরূপ লিখিত আছে যে, যে যে স্থলে বলদেব পূর্ব্বোক্ত নগরীত্রয় সংস্থাপিত করেন, সেই সেই স্থলে পূর্ব্বে বানাসুরের নগরীত্রয় সংস্থাপিত ছিল। বলদেব বানাসুরের সেই নগরীত্রয়ের বলপূর্ব্বক গ্রহণ ও ধ্বংসবিধান পূর্ব্বক তত্তৎস্থলে নিজনামে নূতন নগরীত্রয় সংস্থাপিত করেন। বানাসুর পূর্ণিয়াপ্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন এবং তাঁহার রাজধানী অধুনাতন পূর্ণিয়া-নগরের অদূরে অবস্থিত ছিল। এই বানাসুর সম্বন্ধে নানাপ্রকার অদ্ভুত উপাখ্যান পূর্ণিয়ার অধিবাসীদিগের মুখে অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়।

বিদর্ভদেশে যে বলিপুর বা বলিগৃহ নগর অবস্থিত আছে, তাহা সাধারণতঃ মুজঃফরনগর বলিয়া আখ্যাত। এই নগর রুক্মিনীপিতা ভীষ্মকরাজের রাজধানী কুণ্ডলপুরের অনতিদূরে অবস্থিত। অতিসান্নিধ্যবশতঃ ভ্রমঃক্রমে কেহ কেহ কুণ্ডলপুরকেই বলিগৃহ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই বলিগৃহ বা বলিপুরে বহুদিন পর্য্যন্ত জয়দ্রথবংশ রাজত্ব করিয়াছিল।

আলেকজাণ্ডারের আগমন কালে যে রাজবংশ মগধসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিল, তাহা বলদেবের বংশ নহে। ভাগবতে এরূপ লিখিত আছে, যে মহানন্দ বলী বা মহাবলী উপাধি গ্রহণ করেন। এই জন্যই মহানন্দের উত্তরাধিকারীগণ বলীপুত্র নামে এবং তাঁহাদিগের রাজধানী বলীপুত্রপুর নামে আখ্যাত হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের সময় ইঁহারাই মগধসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন এবং ইহাঁদিগকেই গ্রীকেরা পালিবথ্রা বা বালিপুত্রা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে মহানন্দ বা মহাবলী শোন নদীর তীরে একটী গ্রাম্য প্রাসাদ নির্ম্মিত করান। অচিরকালমধ্যেই সেই প্রাসাদ চতুর্দ্দিকে অসংখ্য গৃহে পরিবেষ্টিত হইয়া একটী ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত এবং প্রথমে মহাবলিপুর ও অবশেষে গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্ত্তনের পর পাটলিপুত্র বা পাটনা নামে আখ্যাত হয়। কিন্তু কোন কোন মতে মহাবলীর পিতামহ উদশী খ্রীষ্ট শকের ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে কুসুমপুরী নামে একটী নগরী সংস্থাপিত করেন। পুরাকালে এই নগরী পদ্মাবতী বা পুষ্পবতী নামেও আখ্যাত হইত। এই নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পাটলীদেবীর পুত্র হইতে ইহা অবশেষে পাটলীপুত্রপুর এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

ক্রমশঃ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কুলীনকন্যা বা কমলিনী।— নন্দবংশোচ্ছেদ-রচয়িতা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা রায়যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৵৹ আনা মাত্র। ইহা একখানি নাটক গ্রন্থ। কৌলীন্যপ্রথার ভয়ানক উপদ্রব প্রদর্শন করাই ইহার উদ্দেশ্য। কমলিনী নায়িকা, দিননাথ নায়ক। কমলিনী জয়রাম মুখোপাধ্যায়-নামক একজন সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা। কমলিনী ও দিননাথ বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই বিশুদ্ধ প্রণয়-সূত্রে সম্বদ্ধ হন। কিন্তু দিননাথ কুলীন ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার সহিত কমলিনীর বিবাহ দেশাচারমতে কষ্টসাধ্য। দেশাচার মতে এক বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত কমলিনীর সম্বন্ধ স্থির হয়। ইহাতে কমলিনী হতাশ হইয়া মরণে কৃতসঙ্কল্প হন। এই হতাশ অবস্থায় একদিন জয়রামের বাটীর ছাদে দিননাথ ও কমলিনীর পরস্পর সন্দর্শন ও প্রেমালাপ হয়। এবং অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর উভয়ে প্রেম বিনিময় পূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন হন। দিননাথ প্রতিজ্ঞা করেন যে প্রাণ থাকিতে কমলিনীকে অন্য-হস্তে সমর্পণ করিবেন না। কমলিনীর প্রস্থানের পর দিননাথের স্বগত বক্তৃতাটী প্রণয়ে ও পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ। দিননাথ জয়রামের সাহায্যে পালিত ও শিক্ষিত হন। তিনি শৈশব হইতেই পিতৃ-মাতৃ-বিহীন হইয়া জয়রামের বাটীতে পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইতেছিলেন; এক্ষণে জয়রাম তাঁহাকে কন্যার হৃদয়াপহারক জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে গৃহ পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। দিননাথ জয়রামের আদেশের অনুবর্ত্তন করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইয়া একেবারে কাশীপুরে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। দিননাথ কমলিনী-বিরহে অতিশয় উন্মত্ত হইয়া উঠেন। এরূপ ভীষণ উন্মাদ দিননাথের ন্যায় সুশিক্ষিত পুরুষের উন্নত চরিত্রের উপযোগী কি না বলিতে পারি না।

দিননাথের প্রস্থানের পর ফটিকচন্দ্র রায় চৌধুরী নামক একজন দুরাচার-ভূম্যধিকারী—অতি ঘৃণিত উপায়ে কমলিনীকে পিতৃগৃহ হইতে বহির্গত করে। অবশেষে অনেক কষ্টের পর দিননাথ ও কমলিনীর মিলন ও বিবাহ হয়।

কমলিনী দিননাথের প্রতি যেরূপ অনুরাগিণী ছিলেন, আর গৃহে থাকিলে যেরূপ বরের সহিত তাঁহার বিবাহ অনিবার্য্য হইয়া উঠিত, তাহাতে দিননাথ পাল্‌কী পাঠাইয়াছেন শুনিয়া কমলিনীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করা, বঙ্গকামিনীর পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। অসহয়া কুলীনকন্যারা এরূপ আসন্ন বিপদে পলায়নব্যতীত আর

কি উপায় অবলম্বন করিতে পারেন জানিনা। কিন্তু সুশিক্ষিত দিননাথের উন্মাদ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীত হইল। ফটিকচন্দ্রের চরিত্র অতি সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। কুমুদিনীর চিত্রটীও মন্দ হয় নাই। সংক্ষেপতঃ এই নাটক গ্রন্থ খানি উচ্চদরের না হইলে ও নিতান্ত নিন্দনীয় নহে।

কুলকালিমা—কলিকাতা, ১২৮০ বঙ্গাব্দ। মূল্য দশ আনা।

গ্রন্থখানির নাম শুনিয়া আপাততঃ উপন্যাস বা নাটক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা নহে এই গ্রন্থখানি সারগর্ভ, উপদেশ ও যুক্তিতে পরিপূর্ণ। ইহার লেখক বহু আয়াস, অনুসন্ধান ও চিন্তা সহকারে ইহাকে বঙ্গসমাজে অবতারণ করিয়াছেন। যাঁহারা কৌলীন্য প্রথার বিরোধী ও সমাজসংস্করণের জন্য অবহিত, তাঁহাদের পক্ষে কুলকালিমা উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে।

লেখক অবতরণিকায় লিখিয়াছেন "লেখকের এই প্রথম উদ্যম"। আমাদিগের বিবেচনায় তিনি প্রথম উদ্যমেই যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এখনকার অনেক বাঙ্গলালেখক বহু উদ্যমেও সেরূপ হইতে পারেন কি না সন্দেহ। আমাদিগের আশা আছে যে তিনি এইরূপ গ্রন্থ উপর্য্যুপরি রচনা করিলে, ভবিষ্যতে একজন চিন্তাশীল সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইবেন।

গ্রন্থকার যতগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, উহার সকলগুলি আমাদিগের অনুমোদনীয় নহে। যাহা হউক লেখক লিপিকুশল; তাঁহার রচনা অতি সুন্দর ও মনোহর। শাস্ত্রাদিতেও লেখকের কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে বলিয়া বোধ হইল। অবশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই কুলকালিমার দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কনকালে গ্রন্থকার যেন তাঁহার নামটি প্রকাশ করেন, এবং মুদ্রাঙ্কন কার্য্যের উৎকর্ষ বিধানে সচেষ্ট হন। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা ভদ্রের অপাঠ্য।

শত্রুসংহার নাটক—(সংস্কৃত বেণীসংহার নাটক অবলম্বন করিয়া) শ্রীহরলাল রায় প্রণীত। কলিকাতা নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা মাত্র। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারম্ভের নয় শত বৎসর পরে, পঞ্চালাধিপতি বীরসিংহের রাজত্বকালে, পঞ্চালদেশে (কান্যকুব্জ) ভট্টরামেশ্বরের ঔরসে পণ্ডিতকেশরী ভট্টনারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। বঙ্গাধিপতি আদিশূর পঞ্চালদেশ হইতে শাণ্ডিল্য-ভারদ্বাজ-কাশ্যপ-বাৎস্য-সাবর্ণাখ্য পঞ্চগোত্রীয় যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ভট্টনারায়ণ তাঁহাদিগের অন্যতম। বঙ্গদেশীয় শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ এই ভট্টনারায়ণই সংস্কৃত বেণীসংহারের রচয়িতা। সুতরাং বেণীসংহার শকুন্তলা প্রভৃতির ন্যায় প্রাচীন নাটক নহে একথা

বলা বাহুল্য। কিন্তু যদিও ইহা অতি আধুনিক, তথাপি ইহার রচনা এত গাঢ় ও উজ্জ্বল যে প্রাচীনকাল সম্ভূত বলিয়া অনুমিত হয়।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন যে নাটকে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, বেণীসংহারে সে সমস্তই প্রায় দৃষ্ট হয়। প্রত্যুত: বেণীসংহারের ন্যায় এত উৎকৃষ্ট বীররসাত্মক নাটক সংস্কৃত ভাষায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃত ভাষায় তিন খানি নাটক তিন রসের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। কালিদাসের শকুন্তলা, ভবভূতির উত্তররামচরিত, এবং ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার,—শৃঙ্গার, করুণ, ও বীররসবিষয়ে জগতের আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। হরলালবাবু জগতের আদর্শস্বরূপ সংস্কৃতভাষার সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকত্রয়ের অন্যতমকে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে গিয়া—"তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্" কালিদাসের এই বাক্যের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। ভেলা দ্বারা সাগর পার হওয়ার ইচ্ছার ন্যায় বঙ্গভাষায় বেণীসংহারের ন্যায় বীররসের উদ্দীপনার চেষ্টা উন্মাদবিজৃম্ভিত বলিয়া প্রতীত হয়। সিংহ ও শৃগালে যে অন্তর, বেণীসংহার ও শক্রসংহারে সেই অন্তর। ভট্টনারায়ণ-লিখিত অশ্বত্থামার প্রচণ্ড ক্রোধের ছবি বঙ্গভাষায় চিত্রিত হইতে পারে কিনা সন্দেহ। মূল ও অনুবাদ হইতে সেই সেই অংশ উদ্ধৃত করিলেই সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণ আমার এই বচনের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন:—

ততঃ প্রবিশত্যুৎখাতখড়্গঃ কলকলমাকর্ণয়ন্নশ্বত্থামা।

মহাপ্রলয়-মারুত-ক্ষুভিত-পুষ্করাবর্ত্তক-
প্রচণ্ড-ঘন-গর্জ্জিত-প্রতিরবানুকারী মুহুঃ।
রবঃ শ্রবণভৈরবঃ স্থগিত-রোদসীকন্দরঃ
কুতোদ্য সমরোদধেরয়মভূতপূর্ব্বঃপুরঃ॥

(বিচিন্ত্য)। ধ্রুবং গাণ্ডীবিনা সাত্যকিনা বৃকোদরেণ বা যৌবনদর্পাদতিক্রান্তমর্য্যাদেন পরিকোপিতস্তাতঃ,সমুল্লঙ্ঘ্য শিষ্যপ্রিয়তামাত্মপ্রভাব-সদৃশমাচেষ্টতে।

তথাহি।

যদ্দুর্য্যোধন-পক্ষপাত-সদৃশং যুক্তং যদস্ত্রগ্রহে
রামাল্লব্ধসমস্তহেতিগুরুণো বীর্য্যস্য যৎ সাম্প্রতম্।
লোকে সর্ব্বধনুষ্মতামধিপতে-র্যচ্চানুরূপংরুষঃ
প্রারব্ধং রিপুঘস্মরেণ নিয়তং তৎ কর্ম্ম তাতেন মে॥

(পৃষ্ঠতো বিলোক্য)। তৎ কোত্র ? রথমুপনয়তু। অথবা অলমিদানীং মম রথপ্রতীক্ষয়াহনয়া,সশস্ত্র এবাস্মি সজল-জলধর-প্রভা-ভাস্বরেণ সুপ্রভ-বিমল-কলধৌত-সম্পাদিত-ত্সরুণা খড়্গেন তাবৎ সমরভুবমবতরামি। (পরিক্রম্য। বামাক্ষিস্পন্দ[illegible]চয়িত্বা)। আঃ! কথং মমাপি নামাশ্বত্থাম্নঃ সমর-মহোৎসব-প্রমোদ-নির্ভরস্য তাত-বিক্রম-দর্শন-লালসস্যানিমিত্তানি সমরগমনবিঘ্নমুৎপাদয়ন্তি! ভবতু গচ্ছামি। (সাবষ্টম্ভং পরিক্রম্য, অগ্রতো বিলোক্য)। কথমবধীরিত-সকল-ক্ষাত্র-ধ-

র্মাণামুৎসৃষ্ট-সৎপুরুষোচিত-লজ্জাবগুণ্ঠনানাং বিস্মৃতস্বামিসৎকার-লঘুচেতসাং দ্বিরদ-তুরঙ্গমচরণচারিণামগণিত-কুলযশঃ-সদৃশ-পরাক্রম-ব্রতানাং রণভূমেঃ সমন্তাদপক্রামতামস্মৎ-সেনাভটানাময়ং মহান্ নিনাদঃ! (নিরূপ্য) হা ধিক্ কষ্টং! কথমেতে মহারথাঃ কর্ণাদয়োপি সমরাৎ পরাঙ্মুখা ভবন্তি। (সাশঙ্কম্)। কথংনু তাতাধিষ্ঠিতানা-মপি বলানামিয়মবস্থা ভবেৎ? ভবত্বেবং তাবৎ।

ভোঃ ভোঃ কৌরবসেনা-সমুদ্র-বেলা-পরিপালন-মহামহীধরা নরপতয়ঃ! কৃতং কৃতম্ অমুনা সমর-পরিত্যাগ-সাহসেন।

যদি সমরমপাস্য নাস্তি মৃত্যো-
র্ভয়মিতি যুক্তমিতোন্যতঃ প্রয়াতুম্।
অথ মরণমবশ্যমেব জন্তোঃ
কিমিতি মুধা মলিনং যশঃ কুরুধ্বম্? ॥

অপিচ।

অস্ত্র-জ্বালাবলীঢ়প্রতিবলজলধেরন্তরৌর্ব্বায়মাণে, সেনানাথে স্থিতেস্মিন্ মম পিতরি গুরৌ সর্ব্বধন্বীশ্বরাণাম্। কর্ণালং সম্ভ্রমেণ, ব্রজ কৃপ! সমরং, মুঞ্চ হার্দ্দিক্য! শঙ্কাং, তাতে চাপ-দ্বিতীয়ে বহতি রণধুরং কো ভয়স্যাবকাশঃ ॥

নেপথ্যে। কুতোদ্যাপি তে তাতঃ।

অশ্বত্থামা। শ্রুত্বা। কিং ব্রূথ? কুতোদ্যাপি তে তাত ইতি। আঃ! ক্ষুদ্রাঃ! সমরভীরবঃ! কথমেবং প্রলপতাং বঃ সহস্রধা ন বিদীর্ণমনয়া জিহ্বয়া।

দগ্ধুং বিশ্বং দহনকিরণৈর্নোদিতা দ্বাদশার্কা
বাতা বাতা দিশি দিশি ন বা সপ্তধা সপ্ত ভিন্নাঃ।
ছন্নং মেঘৈর্ন গগনতলং পুষ্করাবর্ত্তকাদ্যৈঃ
পাপং পাপাঃ! কথয়ত কথং শৌর্য্যরাশেঃ পিতুর্মে? ॥

[বেণীসংহার]

অর্থ। মহাপ্রলয়-বায়ু-সঞ্চালিত মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে আজ বারম্বার কার হুহুঙ্কার শোনা গেল? অর্জ্জুন, কি সাত্যকী, কি ভীমের অহংকারে কুপিত হয়ে [নেপথ্যের দিকে দেখিয়া] পিতা বুঝি শিষ্যবাৎসল্য বিস্মৃত হয়ে আপন অতুল পরাক্রম দেখাচ্ছেন। ব্রাহ্মণের অনিবার্য্য তেজ, বীরশ্রেষ্ঠ পরশুরাম-শিষ্যের অদ্ভুত অস্ত্র-নৈপুণ্য, আজ বুঝি উদ্ধত পাণ্ডবদিগকে ভালরূপ দেখাচ্ছেন। পিতার বীরদর্পে পৃথিবী টলমল করছে, এমন সময় তাঁর সন্তান কেমন করে দূর হতে যুদ্ধের কোলাহল শ্রবণ করবে। বীর যুদ্ধ দেখে না, যুদ্ধ করে। আমি সমরমধ্যে প্রবেশ করি। [নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি] কি! কৌরবসেনাগণ, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম ভুলে গিয়ে, যশেচ্ছা পরিত্যাগ করে, লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে, ভয়ে বিহ্বল হয়ে, মহাবেগে যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রস্থান করছে! এই যে কৃপ, এই যে কৃতবর্ম্মা, এই যে কর্ণ, ঊর্দ্ধশ্বাসে এদিকে দৌড়ে আসছে। সামান্য বাতাসে তৃণখণ্ডের ন্যায় সুবিশাল বটবৃক্ষও কি উড্ডীয়মান হয়? অজেয় দ্রোণাচার্য্য যাহাদের সেনাপতি তাদের এদুর্গতি কেন? ওহে কৌরব-মহাবীরগণ, তোমারা কিসের ভয়ে কাপুরুষের ন্যায় সমর পরিত্যাগ করছ? সমর ত্যাগ করে যদি মৃত্যু হস্ত হতে এককালীন পরিত্রাণ

পাও, প্রস্থান কর; নচেৎ রোগে কাতর হয়ে মরণের জন্য কি পলায়ন করছ? যখন মরতে হবে, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে যশঃভূষণে ভূষিত হয়ে মরাই উচিত। আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছনা, তোমরা কি কুরুবীর নও, তোমরা কি পুরুষ নও, তোমরা কি মনুষ্য নও? তোমরা কি স্ত্রীলোক, তোমরা কি মেয়ের দল, তোমরা কি জড় পদার্থ? তোমরা কি জড় পদার্থ অপেক্ষা অধম? পর্ব্বতকে চূর্ণ না করলে সে স্থানান্তরিত হয় না. বৃক্ষকে ছেদন না করলে সে স্বস্থান পরিত্যাগ করে না। ইত্যাদি। শত্রুসংহার।

উপসংহার কালে আমরা কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে আমরা যেরূপ নির্ব্বীর্য্য জাতি, আমাদিগের ভাষা যেরূপ নির্ব্বীর্য্য তাহাতে বেণীসংহারের আদর্শ আমাদের সম্মুখে না থাকিলে শত্রুসংহার আমাদের অভাব পূরণ করিত সন্দেহ নাই। হরলাল বাবু আমাদিগের সম্মুখে এই উচ্চ আদর্শ ধারণ না করিলেই ভাল করিতেন।

মৃদঙ্গ-মঞ্জরী—মৃদঙ্গ-শিক্ষা-বিধায়ক গ্রন্থ। শ্রীযুত শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রণীত।

আমাদের দেশে উক্তনামধারী কোন লেখক সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি ভাল গ্রন্থ লিখিয়াছেন একথা শুনিলেই আমাদের পত্রের সুযোগ্য লেখক শ্রদ্ধাস্পদ রাজা শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরকে মনে পড়ে। বস্তুতঃ ও এবিষয়ে তিনি আমাদের দেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ও একমাত্র উপযুক্ত উপদেষ্টা তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত; সুতরাং তাঁহার পরিচয় পাঠকগণের নিকট নূতন করিয়া দিবার আবশ্যক করেনা। বিশেষতঃ তাঁহাকে প্রশংসা করিতে গেলে আমাদের অনেকটা শ্লাঘা করা হয়।

মৃদঙ্গ যন্ত্র আমাদের দেশে আনদ্ধজাতীয় এক অতি পুরাতন যন্ত্র এবং ইহা পৃথিবী মধ্যে অন্যান্য দেশের এবম্বিধ যাবতীয় যন্ত্রসমূহের আদি বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত লোকে ইহাকে দেবতা মহাদেব-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া থাকে। ইহা অনুগতসিদ্ধ সভ্যযন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে এবং কাষ্ঠের হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে ইহা মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত হইত এখন ও হইতেছে। তাহাকে খোল বলে। যাহা হউক প্রথমোক্ত যন্ত্রের বাদন প্রণালীই কঠিন এবং রাজা শৌরীন্দ্রমোহন এই প্রথম তাহা সুগম করিয়া দিলেন। ইহার পূর্ব্বে কোন কালে কোন গ্রন্থই এতৎসম্বন্ধে লিখিত হয় নাই। সংস্কৃত গ্রন্থে এই যন্ত্রের কেবল উল্লেখ মাত্র আছে। তাঁহার স্বরলিপিপদ্ধতি এমনি চমৎকার যে পত্র কএক মাত্র পড়িয়া দেখিলেই সঙ্গীত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞও অনায়াসে ও বিনা গুরূপদেশে ইহার বাদন্যপ্রণালী শিক্ষা করিতে পারেন। রাজা অনেক গুলি নূতন শব্দ প্রস্তুত করিয়া বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন কিন্তু অনুক্রমণিকাভাগে মৃদঙ্গের একটু বিস্তৃত ইতিহাস দিলে বড় ভাল করিতেন।

ভারতচন্দ্র রায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিদ্যাসুন্দরের ভারতচন্দ্রের প্রস্তাবে এক স্থানে আমার মন্তব্য কিছু দুর্ব্বোধ হইয়াছিল। আমি বিদ্যাসুন্দরের প্রেমকে নির্ম্মল প্রেম বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছি। সে প্রেম যদি অবিশুদ্ধ হয়, শকুন্তলা ও ডেস্‌ডিমোনা প্রভৃতি কাব্যনায়িকাগণের প্রেমও অবিশুদ্ধ বলিয়া গণনা করিতে হইবে। কিন্তু বিদ্যার গর্ভসম্বন্ধে আমি যে প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছি, তাহা আপাততঃ সেই প্রেমবৃত্তান্তের সহিত অসঙ্গত বোধ হয়। ঐ ঘটনা, প্রণয়ের অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য ফল। তাহা স্বতঃ দোষাই হইতে পারে না। প্রণয়ের প্রকৃতি অনুসারে এবম্বিধ ঘটনার দোষ গুণ বিবেচিত হয়। ভারতচন্দ্র, যেরূপে বিদ্যাসুন্দরকাব্যের কল্পনানিচয় সজ্জিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রথমে নৃপতি ও রাজ্ঞীর পক্ষাবলম্বন করিয়া বিদ্যার প্রণয় ও গর্ভের প্রতি যৌবকষায়িত লোচনে দর্শন করিয়াছেন। পরিশেষে এই প্রেম ও ঘটনাকে নিষ্কলঙ্ক রূপে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এ প্রকার না করিলে তাঁহার সমগ্র কল্পনা স্বাভাবিক হইত না। এই ভাবের সহানুভূতি প্রকাশ করাই আমার অভিপ্রায়।

বিদ্যাসুন্দরের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমি বোধ হয় ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তির অনেক দূর পরিচয় দিয়াছি। তাঁহার কবিত্বশক্তির সম্যক্ পরিচয় দিতে হইলে তদীয় কাব্যাবলীর সমগ্র সমালোচনার আবশ্যক। কিন্তু এ কার্য্য এত বৃহৎ যে সাময়িক পত্রিকার উপযোগী নহে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর বিষয়ে যে সমস্ত দোষের কথা আজি পর্য্যন্ত উল্লেখিত হইয়াছে তাহার সমুদায় না হউক, আমার নিকট তাহার অধিকাংশ সামান্যমূল্য ও পক্ষপাতী বলিয়া প্রতীত হয়। তাহার অধিকাংশ অনুদার ও স্থূল দৃষ্টি প্রসূত ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। যাঁহারা ইংরাজীবিদ্যালয়ের নীতিশিক্ষা করিয়া সদ্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, প্রেমের প্রকৃতিবিষয়ক জ্ঞান আজিও যাঁহাদিগের অস্ফুট রহিয়াছে, সামাজিক ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান আজিও যাঁহাদিগের নিজ বুদ্ধিতে সমালোচিত হয় নাই, যাঁহারা মানবপ্রকৃতি কেবল শিক্ষালব্ধ মতামত দ্বারা বুঝেন ও পরীক্ষা করেন, তাঁহাদিগের নিকট বিদ্যাসুন্দর বিস্তর কলঙ্কপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। বিদ্যাসুন্দরে যে কলঙ্ক নাই আমি একথা বলিনা। বিদ্যাসুন্দরে যে কলঙ্ক আছে

তাহা চন্দ্রের কলঙ্ক। মানববিরচিত সকল গ্রন্থেরই এরূপ কলঙ্ক থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের দোষোদ্ঘাটন করা আমার কার্য্য নহে। সে কার্য্য আমি অন্যের জন্য রাখিয়া দিলাম।

বিদ্যাসুন্দরের রচনায় আমি ভারতচন্দ্রকে যতদূর গৌরব দিতে প্রস্তুত আছি, ভারতচন্দ্রের অন্য কোন সমালোচক ততদূর দিতে চাহেন না। তিনি কহেনঃ—"প্রাণরাম ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর রচনার পর তাঁহার বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী রচনা সমধিক সুমার্জ্জিত হইয়া থাকে। পারস্য এবং সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থে এবং কাব্যকলায় ভারতচন্দ্রের সমীচীন পারদর্শিতা ছিল, অধিকন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বিচক্ষণময়ী ও পণ্ডিতমণ্ডিতা ছিল। ভারতচন্দ্র প্রত্যহ যাহা রচনা করিয়া সেই পণ্ডিতময়ী সভায় পাঠ করিতেন, রাজা এবং কোবিদবর্গ কর্ত্তৃক তাহা সংশোধিত অথবা শোধনার্থ ভারতচন্দ্রের হস্তেই প্রত্যর্পিত হইত সন্দেহ নাই। এইরূপে তদীয় গ্রন্থ সম্মার্জ্জিত হইয়া জনসাধারণসমীপে অতি চমৎকার বলিয়া আদরণীয় হইয়াছে।" লেখকের যাহাতে সন্দেহ নাই, আমার তাহাতে বিস্তর সন্দেহ। তাহা নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লেখকের প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা ছিল। ভারতীয় বিদ্যাসুন্দর আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, প্রাণরাম ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের কল্পনা হইতে ইহার কল্পনায় সমূহ পরিবর্ত্তন উপলক্ষিত হয়। ভারতচন্দ্রের স্বাভাবিক কল্পনা এবং মনোহর রচনা কেবল ভারতচন্দ্রেরই সম্পত্তি। দুই এক স্থলে কেহ দুই একটি ঘটনা যোজনার পরিবর্ত্ত সাধনের কথা প্রস্তাব করিয়া থাকিবেন, কিন্তু ভারতচন্দ্র যে সহজে সেই স্থল পরিবর্ত্তন অথবা সংশোধন করিয়াছেন এমত অনুমান হয় না। কারণ ভারতচন্দ্র কোন্ ভাবটি স্বাভাবিক তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। বুঝিয়া তিনি যে নিজ ভাব সমর্থন ও সংরক্ষণের প্রয়াস পান নাই এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই, আমার এমত অনুমান হয় না। আর, শব্দযোজনা এবং রচনাসম্বন্ধে সভাস্থ সুধীবর্গ মধ্যে ভারতচন্দ্রের উপর যে কেহ কথা কহিতে পারিতেন আমি স্বপ্নেও এমত অনুভব করিতে পারি না। শব্দযোজনা বিষয়ে ভারতচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। রচনায় তিনি কাহারও নিকট পরাভূত হইবার পাত্র ছিলেন না। তবে ভারতচন্দ্র যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের আদেশে বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন একথা আমি স্বীকার করি। নিজের কোন অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য নদীয়ারাজ যে বিদ্যাসুন্দর প্রণয়ন করিয়া লইয়াছিলেন তাহাও প্রতীত হয়। এই অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া ভারতচন্দ্রকে বিদ্যাসুন্দরের কল্পনাবলী আয়োজিত ও সজ্জিত করিতে হইয়াছিল। ঐ কাব্যের রচনায় ভারতের কবিত্বশক্তি স্বাধীন ভাবে

কার্য্য করিতে পারে নাই। তবে রাজার অভিপ্রায় অনুসারে কল্পনাকে নিজেই বিন্যাস করিয়া তন্মধ্যে যে পর্য্যন্ত কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে, ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরকাব্যে সেই পর্য্যন্তেরই পরিচয় দিয়াছেন। বাস্তবিক কবিদিগকে কোন কাব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রচনা করিতে বলিলে এই দোষ ঘটিয়া থাকে। যে কাব্য কবিত্ব-শক্তির স্বাভাবিক এবং সহজপ্রসূত ফল নহে, সে কাব্যে যে প্রকার ত্রুটি ঘটিবার সম্ভাবনা, ভারতচন্দ্রের কাব্যাবলিতে তাহা অবশ্য বিদ্যমান আছে। যাঁহারা এই সমস্ত কাব্যাবলির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে ভারতচন্দ্র স্বাধীন লেখক ছিলেন না। এই বিষয় বিবেচনা করিলে, তৎপ্রতিপক্ষে যে সমস্ত দোষ আরোপিত হইয়াছে; তাহার অধিকাংশের গুরুত্ব লঘু হইয়া যায় এবং তদীয় কাব্যাবলির গুণাংশের সমধিক গৌরব বৃদ্ধি হয়। যে হেতু দোষদ্বারা যতদূর না হউক, এই সমস্ত গুণদ্বারাই ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তির পরিচয় লইতে হইবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আধুনিক ভারতচন্দ্রের সমালোচনায় ঠিক ইহার বিপরীত প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে; ইহাতে তাঁহার দোষ ভাগেরই সমধিক উল্লেখ হয়, কিন্তু তাঁহার গুণাংশ উপেক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণকার মধ্যে একজন সুবিজ্ঞ লেখক ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। "প্রাচীন কবি কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, রামবসু ইহাঁদের কবিতা যেন ঠিক স্বভাবের হস্ত হইতে বাহির হইয়াছে। এক্ষণকার অধিকাংশ কাব্যে সেরূপ সহৃদয়তা দেখা যায় না। এক্ষণকার অধিকাংশ কাব্যে ইংরাজী ইংরাজী গন্ধ কহে। এক্ষণকার কোন কোন কাব্যে পূর্ব্বকার কাব্য অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে অধিক ক্ষমতা প্রকাশিত আছে বটে, কিন্তু জাতীয় ভাব, সারল্য ও সহৃদয়তা বিষয়ে হীন বলিতে হইবে।" বাস্তবিক ভারতচন্দ্রের কাব্যাবলিতে আমাদিগের জাতীয়ভাব অনেক দূর অবলোকিত হয়। তিনি ইংরাজী বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ছিলেন, এজন্য ইংরাজী কাব্যের ভাব এবং ইংরাজী কাব্যশাস্ত্রের নিয়মাদি কিছুই অবগত ছিলেন না। ইংরাজী খৃষ্ট বিশুদ্ধ রুচিরও তিনি আস্বাদ পান নাই। এক্ষণকার লেখকগণ স্বকীয় কাব্যাবলিতে যে প্রকার ইংরাজী ভাবের আবরণ দিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে তাহা দৃষ্ট হয় না। এপ্রকার কাব্যাবলির গুণ ও গৌরবের যে সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু ইংরাজী রুচি ও নিয়মাদি বিরহিত ভারতীয় কবিত্বের যে স্বতন্ত্র মূল্য ও গৌরব আছে, তাহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ভারতের গ্রন্থনিচয়ে, তৎকালে যে প্রকার কবিতা প্রসূত হইতে পারিত তাহাই লক্ষিত হয়। তখনকার কালে

যে কবিত্বের গৌরব ছিল, জনসমাজে, যে কবিত্বের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিত এবং যে কবিত্ব দ্বারা তাহাদিগের হৃদয় আকৃষ্ট হইতে পারিত, ভারতের গ্রন্থে সেই প্রকার কবিত্ব প্রকাশিত আছে। তখনকার কালের জনসমাজ জানিবার জন্য যাঁহারা সমুৎসুক, তাঁহাদিগের নিকট ভারতের গ্রন্থনিচয় পরম আদরণীয়। এই গ্রন্থাবলিতে তৎকালীন জনসমাজের অবস্থা উত্তমরূপে চিত্রিত হইয়াছে। এস্থলে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত হইল তাহা কবিকঙ্কন এবং রামপ্রসাদ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে।

ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তি লইয়া এক্ষণে অনেক স্থলে অনেক বিতর্ক হইয়া থাকে। অনেকে তাঁহাকে কবি বলিয়াই স্বীকার করেন না। মনোহর এবং চমৎকার পদবিন্যাস করিবার শক্তি ব্যতীত তাঁহাকে অন্য কোন উচ্চতর শক্তির গৌরব প্রদান করিতে কেহ কেহ প্রস্তুত নহেন। ভারতচন্দ্রকে যাঁহারা কবি বলেন না, তাঁহারা অনেক কবিকেই কবি বলিবেন না। তাঁহাদিগের মতে ভবভূতি, কালিদাস এবং তদনুসঙ্গিগণই কবি। যে অর্থে ভবভূতি এবং কালিদাস কবি, সে অর্থে নিশ্চয় ভারতচন্দ্র কবি নহেন। ভবভূতি এবং কালিদাসের কবিত্ব ভারতচন্দ্রে পরিদৃশ্যমান নহে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কবিত্বও ভবভূতি ও কালিদাসে দৃষ্ট হয় না। বাস্তবিক ইহাঁদিগের কবিত্ব বিভিন্ন-প্রণালী-গত ছিল। ভবভূতি ও কালিদাস যে শ্রেণীর কবি ছিলেন, সে শ্রেণীর মধ্যে তাঁহারা নিশ্চয় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র যে শ্রেণীর কবি, সে শ্রেণীতে ভারতচন্দ্র নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ। এক শ্রেণীর কবিত্ব, অপর শ্রেণীর কবিত্ব—অপেক্ষা উচ্চতর হইতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীতে যাঁহারা নিম্নপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কবিত্বশক্তি অপেক্ষা, হীন শ্রেণীর উচ্চতম-পদগ্রাহিদিগের কবিত্বশক্তির গরিষ্ঠতা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইঁহাদিগের কবিত্বশক্তি বিভিন্নপ্রকৃতিক, ইঁহাদিগের কাব্য বিভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত, ইঁহারা কাব্যসাহিত্যে এক বিভিন্ন আদর্শ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই অদর্শের যাহা গৌরব এবং গুণ, তজ্জন্য ইঁহারা নিশ্চয় পূজ্য এবং সহৃদয় জনগণের কৃতজ্ঞতার ভাজন।

যিনি সহৃদয়ের সৌন্দর্য্যানুভাবকতা দ্বারা বাহ্য জগতের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয়েন, যিনি স্বকীয় অন্তর-নিহিত-শক্তি-অনুভাবকতা দ্বারা প্রকৃতির ঔদার্য্য, মহত্ত্ব এবং প্রকাণ্ডতায় চমৎকৃত হয়েন, স্বকীয় হৃদয়ের ভাবপ্রাবল্য হেতু, মানবীয় এবং বাহ্য প্রকৃতির প্রবল-ভাবসম্পন্ন দৃশ্যের সহিত যাঁহার সহানুভূতি জন্মে, তিনি স্বাভাবিক কবি। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া জগন্ময় পরম সুন্দর ও রমণীয় জ্ঞান করেন, তিনি প্রকৃতির মহত্ত্বে পূর্ণ হইয়া ত্রিসংসার নিজ উদাত্তভাবে পরিপূর্ণ

করেন, তিনি প্রকৃতির ভাববেগ অনুভব করিয়া ত্রিজগৎ নিজভাবে কাঁপাইয়া তোলেন। এইরূপ কবি কালিদাস, এইরূপ কবি ভবভূতি, এবং এইরূপ কবি লর্ড বাইরণ। ইঁহারা সকলেই, স্বাভাবিক কবি। ইঁহারা প্রত্যেকেই এক এক গুণে শ্রেষ্ঠ। কালিদাসের সৌন্দর্য্য, ভবভূতির, উদাত্তভাব এবং বাইরণের ভাববেগে কেনা বিচলিত হয়? বাল্মীকি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, সেক্সপিয়ার, এবং হোমর—এই চারিজন মহাকবি ঐ ত্রিবিধ গুণেই একদা ভূষিত ছিলেন। তাঁহাদিগের কাব্যে আমরা প্রকৃতির প্রভাব সম্যক্ অনুভব করি। তাঁহারা সমগ্র প্রকৃতির যথাযথ চিত্র আমাদিগকে প্রদান করেন নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও রমণীয়, যাহা কিছু উদাত্ত ও মহান, যাহা কিছু ভাবসম্পন্ন ও মোহকরী, তাঁহাদিগের কাব্যে তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা প্রকৃতির সরলতা ও মহত্ত্ব উভয় ভাবই চমৎকৃত হইয়া দর্শন করিয়াছেন। দর্শন করিয়া সেই সরলতা ও মহত্বে এতদূর পুলকিত হইয়াছেন, যে তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইলেই সেই ভাবে অপরকে পূর্ণ করিয়া তোলেন। তাঁহারা প্রকৃতির প্রভাব, শুদ্ধ ইন্দ্রিয়েতে নয়, জ্ঞানে ও হৃদয়ে অনুভব করেন। তাঁহারা আবার নিজ হৃদয়ের সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব, এবং ভাববেগ জগন্ময় ব্যাপ্ত করেন। তাঁহারা প্রকৃতির চিরস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয় ভাব সকল লক্ষ্য করেন। মানবের সর্ব্ব সময়ে এবং সর্ব্ব স্থানে যে নিত্য অবস্থা ও ভাব, তাহাই তাঁহারা প্রদর্শন করেন। তাঁহাদিগের কবিত্বশক্তির প্রভাব সকলই স্পষ্টাভিধানে অনুভব করিয়া থাকেন। আমরা ভারতচন্দ্রকে এরূপ কবিত্বশক্তির গৌরব দিতে প্রস্তুত নহি।

ভারতচন্দ্র প্রকৃতিকে ভিন্নভাবে দেখিতেন। তিনি প্রকৃতির মুখচ্ছবি কৃত্রিম শোভায় শোভিত করিয়া দেখিতেন। মনে করুন, ভবভূতি, কালিদাস এবং ভারতচন্দ্র এই তিনই দেশভ্রমণে বিনির্গত হইয়াছেন। যেথানে প্রকাণ্ড পর্ব্বতমালা গগণ ভেদ করিয়া মানবদৃষ্টি অবরোধ করিয়াছে, যেথানে বৃহৎ অরণ্যানী হরিদ্বর্ণে দেশ আচ্ছাদিত করিয়াছে, যেথানে জলপ্রপাত ভীষণরবে বজ্রনিনাদ উৎপাদন করিতেছে, যে কোন দৃশ্যে স্বভাবের মহত্ত্ব বিদ্যমান আছে, ভবভূতি সেই স্থলে ক্ষণিক স্থিরদৃষ্টিতে ভাবুকের মত নেত্রপাত করিবেন, এবং সেই সমস্ত দৃশ্যের এমত চমৎকার চিত্র সকল প্রদান করিবেন, যাহাতে মানবমনে তাঁহার স্বকীয় হৃদয়ভাবের সমভাব উদ্বোধিত করিয়া দেয়। কালিদাস ভ্রমণ করিতে করিতে সেই পর্ব্বতমালার রমণীয় প্রদেশ, অরণ্যানীর কুসুমিত তরু ও সুন্দর লতাকুঞ্জ, মুক্তাসদৃশ নির্ঝরের বারিবিন্দু, এবং যাহাতে স্বভাবের রমণীয়তা, মাধুরী ও লাবণ্য অনুরঞ্জিত আছে,

তাহাই ভাবুকের মত, কবির নয়নে ক্ষণিক অবলোকন করিবেন এবং সেই সমস্ত দৃশ্যের সৌন্দর্য্য নিজ কাব্যে বিকশিত করিবেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র কি করিবেন? তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিবেন, কোথায় একটী শোভনীয়া নগরী আছে, কোথায় উদ্যানশোভা সৌধরাজির সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধন করিতেছে এবং কোথায় তীর্থধামের তটিনীতীরে দেবমন্দির-শ্রেণী চন্দ্রপ্রভায় বিরাজিত আছে। তিনি কাঞ্চীপুর ও বর্দ্ধমান এই ছয় মাসের পথ ছয় দিনে আসিয়া বর্দ্ধমানের শোভা চিত্রাঙ্কিত করিবেন। তাঁহার কৈলাসধাম, বিদ্যাধর ও অপ্সরাগণের বাসভূমি। তাহা কোটি-শশি-শোভায় পরিশোভিত। সেখানে সকলেই সুধাপান করে। সেখানে ত্রিপুরারি মণিময় বেদীর উপর উপবিষ্ট। সেখানে কল্পতরুতে সুবর্ণময় ফল ফলে। দেশ-পর্য্যটনে এই তিন জনের প্রত্যেকেই এক এক বিশেষ প্রয়োজন সাধিত করিতেছেন। এই তিন জনের চিত্র একত্রিত করিলে তবে আমরা পর্য্যটিত দেশের সমগ্র চিত্র লাভ করিতে পারি। সাহিত্যসংসারেও এইরূপ।

কালিদাস, শকুন্তলার স্বাভাবিক নিরলঙ্কৃত সৌন্দর্য্য যেমন বর্ণন করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তেমন পারিতেন না। যে তাপসকন্যা শকুন্তলা জন্মাবধি বনবাসিনী এবং যিনি সংসারাশ্রমের সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞা, সেই শকুন্তলার হৃদয়-সারল্য,—যে শকুন্তলা প্রেমানুরাগ কিরূপ কিছুই জানিতেন না, সেই শকুন্তলার নির্ম্মল প্রেমবেগ,—যে শকুন্তলা কখন জনসমাজের কুটিলতা, এবং নৃপতিগণের প্রকৃতি এবং ব্যবহার অবগত নহেন, সেই শকুন্তলার বিশ্বস্তহৃদয়তা,—এবং যে শকুন্তলা কুরঙ্গশিশুর স্নেহ ও বনলতার মমতায় সকলের চিত্ত আর্দ্র করিয়াছেন, সেই শকুন্তলার কোমল প্রকৃতি,—কালিদাস যেমন সুকুমার তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তেমন পারিতেন না। ভারতচন্দ্র যদি শকুন্তলার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন, যে খানে শকুন্তলা দুষ্মন্তের সহিত মিলিত হইয়াছেন, যখন শকুন্তলা রাজপ্রকৃতি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন, যখন শকুন্তলা রাজমহিষীবেশে, রাজপ্রাসাদে অবস্থিত হইয়া ঐশ্বর্য্যের উন্মত্ততায় অরণ্যাশ্রম বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছেন, যখন শকুন্তলা পৃথিবীর কুটিলতা ও লোকের আচার ব্যবহার কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন শকুন্তলা কেমন দুষ্মন্তের নিকট তাপসকুমারী বনবাসিনী সাজিয়া পুনরায় আলবালে জল সেচন করিতে করিতে দুষ্মন্তের মনোহরণ করিতেছেন, ভারতচন্দ্র তাহাই দেখাইতেন। ভারতচন্দ্র দেখাইতেন, কালিদাসের নিরলঙ্কৃতা শকুন্তলা এখন রাজমহিষীবেশে কেমন মনোহরা হইয়াছেন, এখন রাজপরিজনবর্গের কুটিলতায় বন্য সরলতা কেমন বিনষ্ট হইয়াছে, এখন তিনি হয়তো স্বপত্নীর মমতা-আক

ভেদ করিতে শিক্ষা করিতেছেন, দুষ্মন্তকে কখন প্রকোপবাক্যে লাঞ্ছনা করিতেছেন, এবং কখন তাঁহাকে মন্ত্রণাবাক্যে আবদ্ধ করিতেছেন। এখন আর সে শকুন্তলা নাই। বনবাসিনী বালিকা এখন রাজমহিষী ও গৃহিণী হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র মানব-প্রকৃতির এক বিশেষ ভাগ চিত্রিত করিতে পারিতেন। তিনি মানব-প্রকৃতির অনিত্য ভাব ও বিশেষ ধর্ম্মসকল উত্তমরূপে প্রদর্শন করিতে পারিতেন।

ভারতচন্দ্র মানবপ্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা প্রদর্শন করেন নাই। নানাবিধ অবস্থায় মানবপ্রকৃতি যেরূপ কার্য্য করে, মানবের হৃদয় যে প্রকার ভাব ধারণ করে, তাহা ভারতচন্দ্রের বর্ণনীয় ছিলনা। নৃপতি যদি প্রকৃত প্রস্তাবে ভিখারীর অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সে ভিখারীর অবস্থা ও হৃদয়ভাব বর্ণন করা ভারতচন্দ্রের বিষয় নহে। ভারতচন্দ্র যদি কখন ভিখারী বর্ণন করেন, সে ভিখারী কৃত্রিম ভিখারী, তাহা নৃপতি ভিখারীর বেশধারী মাত্র। তাঁহার অন্নদা কখন বৃদ্ধাবেশ-ধারিণী হইতেছেন, বৃদ্ধা কখন অন্নপূর্ণা-রূপে আবির্ভূতা হইতেছেন। রাজনন্দিনী কখন সন্ন্যাসিনী সাজিতেছেন, সন্ন্যাসিনী কখন রাজনন্দিনী হইতেছেন। দুরবস্থা ও দুঃখে মানবপ্রকৃতি কিরূপ ভাব ধারণ করে, ভারতচন্দ্র তাহা প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। তিনি মানবের খেয়াল ও তামাসা, তাহার দম্ভ ও জাঁক জমক, তাহার আড়ম্বর ও বেশভূষা, এই সমস্ত যথাযথ বর্ণন করিতে পারিতেন। ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি। সুতরাং তিনি রাজা ও পাদসার প্রকৃতি, অভিরুচি, ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতা প্রভৃতির বর্ণনা করিতে আনন্দ পাইতেন। তাঁহার এই সমস্ত বর্ণনা এক এক খানি চিত্রফলকসদৃশ। ঐশ্বর্য্য-শালী জনসমাজের যে সমস্ত দোষ ও গুণ, তদবস্থ জনগণের প্রকৃতি ও হৃদয়ভাব তিনি অতি চমৎকার ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি উর্দ্ধতন জনসমাজের ব্যবহার, রীতি, ও নীতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজকীয় কবি হইয়া তিনি রাজকীয় বিষয় সমস্ত বিলক্ষণ অবগত ছিলেন এবং সেই সমস্ত বর্ণনায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি রাজসভা ও তৎপ্রভাব যে প্রকার যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন, অধ্যয়ন করিবার সময় অনুমান হয়, যেন ঠিক রাজসভামধ্যে আমরাও উপস্থিত আছি। তিনি দেবসভাকেও মানসী রাজসভারূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রাজপারিষদগণের প্রকৃতি ও ব্যবহার, সৈন্যের সমাবেশ, সৈন্যগণের যাত্রা, দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির বর্ণনা তাঁহার কবিত্বশক্তির বিষয় ছিল। ঐশ্বর্য্য এবং ধূমধাম সহজেই তাঁহার কল্পনাকে আকৃষ্ট করিত।

ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তির প্রকৃতি এক্ষণে বোধ হয় অনেক পরিমাণে বিশদ হইয়াছে। যে উচ্চতর শ্রেণীতে জগতের মহাকবিগণ আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সে শ্রেণীতে আমি ভারতচন্দ্রকে বসাইতে

চাহিনা। কিন্তু ভারতচন্দ্র যে, শ্রেণীর উচ্চাসনে উপবিষ্ট আছেন, তদুপদোচিত সম্মান লাভে তিনি নিশ্চয় যোগ্য পাত্র। সেই সম্মান যাহাতে তৎপ্রতি প্রদত্ত হয়, আমি তাহারই প্রয়াসী। এই জন্যই আমি ভারতচন্দ্রের শুদ্ধ গুণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত ছিলাম। তাঁহার গুণবর্ণনায় এবং আমার প্রয়াসসিদ্ধির কল্পনায় আমি যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা আমি জানি না। সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইয়া থাকি, এক্ষণকার মত পরম হর্ষের সহিত পুনরায় একার্য্যে আবশ্যক মত প্রবৃত্ত হইব। ভারতচন্দ্রের দোষের বিষয়ে বিস্তর লোকে বিস্তর কথা বলিয়াছেন। একবার তাঁহার গুণের বিষয় আলোচনা করাও কর্ত্তব্য। যে কবি বঙ্গবাসীর হৃদয় হরণ করিয়াছেন, বঙ্গধামের আবাল বৃদ্ধ বণিতা যাঁহার কবিতায় বিমুগ্ধ আছেন, যাঁহার কবিতাবলী বঙ্গধামের সর্ব্বজনের কণ্ঠস্থ সেই বঙ্গপ্রিয় কবি, সেই ভারতচন্দ্র নিশ্চয় অমর। সময়ে সময়ে তাঁহার যশঃপ্রভার মলিনতা হইতে পারে, কিন্তু প্রতিবার তিনি এইরূপে "অগ্নিপরীক্ষায় দ্বিগুণতর বিমলজ্যোতিতে পুনরুত্থান করিবেন। তাঁহার যশঃশশধরের গ্রহণ লাগিতে পারে, কিন্তু সে চন্দ্র কখন চির-দিনের জন্য অস্ত যাইবার নহে।

—সমাপ্ত।

শ্রীপূ——

এবার!

১

কল্পনে! এবার!—তুমি মজিলে এবার!
এবার বঙ্গেতে আর,
থাকা তব হলো ভার,
তোমার কুহকে বঙ্গ ভুলিবে না আর,
এবার তোমার বাছা! "কালাপানি" সার।

২

কি এনেছ? দেখি, দেখি;—ছিছি কর দূর!
"লম্বিত লবঙ্গলতা"—
গোস্বামী খুড়র মাথা,
দোলে,—দোলুক,—লতা তাঁর মলয়সমীরে;
পারিবে না ভুলাইতে বীর বাঙ্গালীরে!

৩

কি আছে তাহাতে বল কবির মতন?
নাহি তাহে "হেমলেট্,"
বীর "সেকেন্দর গ্রেট্,"
নাহি তাহে "হেমিণ্টন্"—"ক্লারেণ্ডন"—"পিট্";
নাহি "ওবেষ্টার" নাহি "বার্নার্ড স্মিথ"।

৪

আবার কি আনিয়াছ?—নাহি বুঝি নাম?
"মহাজনপদাবলি।"—
রাধাকৃষ্ণ ঢলাঢলি;
"বায়রনিক তরঙ্গেতে" ভাসিয়া বেড়ায়
বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস;—টিকি থাকা দায়!

৫

একি পুনঃ ?—"ব্রজাঙ্গনা !" ডিটো !,
ছাই পাঁশ !
"যে যাহারে ভাল বাসে,
সে যাইবে তার পাশে—"
তাহাতে কি যায় আসে সভ্য বাঙ্গালার ?
কবির কবরে পোত ব্রজাঙ্গনা তাঁর।

৬

পতির বিরহে বামা কাঁদে বনে বনে !—
নাহি আর সেই দিন,
সভ্য বঙ্গ সর্ব্বাঙ্গীন,
এবে বিরহিণী ভীমা পতি-প্রতীক্ষায়,
সম্মার্জ্জনী করে বসে দুয়ার গোড়ায়।

৭

আবার ?—"কবিতাবলী!"—হা,—না,—
ভাল,—দেখি ;
"বঙ্গদর্শনের" কবি ;
"বারের" উন্নত রবি ;
মাইকেলের ওয়ারিস,—ডিক্রি "দর্শনের"—
তাঁর কথা ? বুঝি,—আচ্ছা, দেখা যাবে ফের।

৮

আবার কি ?—"অবকাশরঞ্জিনী !"—
আমরি !
কেমন জাঁকাল নাম,
বাঙ্গালের গঙ্গাস্নান, ;
"বিচ্ছেদ যাবরি নয়, বিচ্ছেদ ত যায় না ;"—
বিচ্ছেদ কাঁঠাল-আঠা ?—বাঙ্গাল কি সেঁয়ানা

৯

দূর কর বাঙ্গালের "ফলের" ভাণ্ডার।
মরি করকণ্ডুয়নে ;
সাত সিন্ধু ভাবি মনে ;
যায় ছয় দিন আজি, কালি রবিবার ;
কোথা মম অবকাশ ? রঞ্জিব কি ছার ?

১০

"ললিতা সুন্দরী !"—দেখ ঘড় দিব্বি তব !
করি নাম রমণীর,
তেজঃপুঞ্জ বাঙ্গালীর
কর যদি তেজ হানি—বাষ্প-আবিষ্কার ;
নিতান্ত জানিও তব "কালাপাণি" সার !

১১

যদি বসন্তের কোলে পুনঃ অভাগিনি !
দোলাও লবঙ্গলতা,
কহ বিচ্ছেদের কথা,
হাসে চন্দ্র, ভাসে জলে ; গায় বিহঙ্গিনী।
ফুঠে ফুল, জুঠে অলি ; ফাঠে বিরহিণী।

১২

"বসন্ত,—জ্যোৎস্না,—হাস্য,—মধু—ফুল-
দল ;—"
তব "গীত" যদি হয়,
এই পঞ্চ দোষময়,
কি ঘটে কপালে তব বলিতে না পারি।
যাবে বাছা ! একেবারে "ডেমার্টিনের" বাড়ী

১৩

পাবে—দোকানের ধূপ, অম্বুরী তামাক,
থেলো হুঁকা বদ্ সুর,
ভগ্ন এক মতি চুর,
শিক্ষকের কাণমলা ভট্টাচার্য্য চটি,—
সৌখিন সমালোচনা,—"হলোয়ের বটি"

১৪

"বাসন্তী কবিতা" তাই কর পরিহার।
কটিতে কাপড় আঁটি,—
লও কলমের কাটি,

সাপ্তাহিক পত্রে দেও দুন্দুভি-ঘোষণা—
শিখিয়াছি "নব গীতি-কাব্যের" রচনা।"

১৫

এই গীতি-কাব্য——স্বর্ণ, রজতের কাটি।
অথবা হোঁসন খাঁর,
"জিনাইর" অবতার!
পাইবে দিল্লীর লাড্ডু যখন চাহিবে!
হারাম বাছুর হজে ফিরিয়া আসিবে!

১৬

থাকিবে প্রখর গ্রীষ্ম;—কিন্তু দেখো যেন
চোয়াত্তর মূর্ত্তিমান,
নাহি হয় অধিষ্ঠান।
অবশ্য থাকিবে বর্ষা,——কিন্তু খবরদার্!
ত্রিগত "অশ্বিনী-কাণ্ড" না হয় আবার।

১৭

বসন্ত যে একেবারে থাকিবে না, নয়।
প্রতি শ্লোকে, প্রতি পাতে,
মিশি বসন্তের সাথে,
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, কিম্বা শরত, শিশির,
থাকা চাহি—এককালে শশাঙ্ক মিহির।'

১৮

হবে গ্রীষ্ম কাব্য; লও নমুনা তাহার—
"মেঘ দুর দুর,
হৃদি গুর গুর,
বিদ্যুতের চকচকি, দর্দ্দুর মক্‌মকি,
সমুদ্রের লক্‌লকি, বজ্রের ঠক্‌ঠকি।"

১৯

বাঙ্গালির বীর মূর্ত্তি থাকিবে তাহাতে।
হংসপুচ্ছ "রাইফল,"
জিহ্বাতে দুর্জ্জয় বল,
কামান "সংবাদ পত্র",—শত্রু গ্রন্থকার;
যুগলচরণে পশি—অস্ত্র ঝনৎকার।

২০

গলাগলি করি রবে "ওথেলো, হেমলেট।
ঝুওলজি"—"ফেণলজি"—
"পজিটিব ফিলজফি,"—
মওলাবকস,—গেজেটের গত বিজ্ঞাপনী;
থাকিবে তাহাতে—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী"

২১

পঞ্চদশ শ্লোকে যদি পার প্রসবিতে—
"শকুন্তলা!" এহি! এহি!
তাতে গ্রীষ্ম, বর্ষা নাহি;
কেবল মালিনীতীরে, লতাকুঞ্জ বিনে,
কোথা আছে গ্রীষ্ম আর? আমি ত দেখিনে।

২২

পঞ্চদশ শ্লোক যদি পার প্রসবিতে
হেমলেট দশ খানি,
কিন্তু গাত্রদাহ বাণী
"ওথেলোর" রবে তাতে, জিঝিও আবার"
না পার, কল্পনে! তুমি মজিলে এবার!

গ্রীক ও যবন।

সংস্কৃত যবনশব্দের তাৎপর্য্য কি? যবনজাতি শব্দে নির্দ্দেশ করিলে কাহাদিগকে বুঝায়? এই প্রশ্নটীর প্রকৃতরূপে সমাধান করিতে পারিলে অনেকানেক ঐতিহাসিক রহস্যের উন্মেষ ও পরস্পর সমন্বয় হইতেপারে। কোলব্রুক, প্রিন্‌সেপ, উইলসন, শ্লেগ্‌ল, ল্যাসেন, ওয়েবর, ম্যাক্‌সমুলর প্রভৃতি যাবতীয় সংস্কৃতবেত্তা পাশ্চাত্য অধ্যাপকদিগের অন্তঃকরণে কখন না কখন এই প্রশ্নটী কোন না কোন প্রকারে উদিত হয়। ইহাঁরা সকলেই স্ব স্ব যুক্তি অনুসারে উক্ত দুরূহ সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, ইহাঁদিগের যুক্তিমার্গ যেরূপ সিদ্ধান্তে পরিণত হইয়াছে, তাহার প্রতি সূক্ষ্মদৃষ্টি করিলে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত সমুদয়কে আশানুরূপ প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইবে না। অদ্যাপি উক্ত প্রশ্নের মীমাংসাবিষয়ে নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং উল্লিখিত পণ্ডিতমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত, যে অভ্রান্ত ও স্থির সিদ্ধান্ত ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারা যায়? কোল্‌ব্রুক প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গ এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, সংস্কৃত "যবন" শব্দ গ্রীক "আইয়োনিয়া" শব্দের প্রতিবাক্য, সুতরাং যবনশব্দে গ্রীকদিগকেই বুঝিতে হইবে। ইহাঁরা যে প্রকার যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া উক্তপ্রকার সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন, তৎসমুদয় নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

১। গ্রীক "আইওনিয়া" শব্দের সহিত, পারসী "য়ুনান", হিব্রু "যবন্," ও সংস্কৃত "যবন" এই কয়েকটী শব্দের উচ্চারণ ও শ্রুতিস্বর অবিকল একরূপ বা অভিন্ন।

২। পালী ভাষায় "আইওনিয়া" প্রদেশের রাজা এই অর্থ বুঝাইতে হইলে সংস্কৃত "যবন" শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন "যোনা" এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৩। সংস্কৃতভাষায় জ্যোতিঃশাস্ত্রঘটিত যে সমস্ত গ্রন্থ আছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে কোন কোন স্থলে বিদেশীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিহাসদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, যে উল্লিখিত বিদেশীয় গ্রন্থ বলিতে গ্রীক্‌দিগের গ্রন্থদিকেই বুঝাইতেছে।

৪। মহাবীর সেকেন্দর ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমকোণস্থ প্রদেশ অধিকারপূর্ব্বক তথায় নিজ শাসনপতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারীদিগের সহিত অত্রত্য অধিবাসীরা যেরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা হইতেও উক্ত যুক্তির অনেকাংশে সমর্থন হয়।

এক্ষণে উল্লিখিত যুক্তিচতুষ্টয়ের প্রতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে দৃষ্টিপাত করিলে অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে, যে উহাদের মধ্যে

একটীও অভিপ্রেত সিদ্ধান্তের পক্ষে, অনুকূল তর্ক নহে। উহাদিগের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া স্থির নিশ্চয় করা ত দূরের কথা। উপরি উক্ত যুক্তিমার্গানুযায়ী পণ্ডিতেরা অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত অনুমানসিদ্ধ করিতে গিয়া যেরূপ পরামর্শ ও ব্যাপ্তিগ্রহ করিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত হয় নাই। ফলে তাঁহাদের অনুমিতিপ্রক্রিয়া হেত্বাভাসদোষে দূষিত হওয়াতে সিদ্ধান্তও ভ্রান্তিসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত যবনশব্দ গ্রীকদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে, উক্ত যুক্তিচতুষ্টয় দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্ত অনুমান করা সম্ভবপর বটে, কিন্তু কেবল তাহা হইলেই উহাঁদের কার্য্যসিদ্ধি হইল না। উহাঁদিগকে এরূপ সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, "যবন" শব্দ গ্রীকদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে এই মাত্র নহে, কিন্তু ঐ শব্দে কেবল গ্রীকদিগকেই বুঝায়, গ্রীক ভিন্ন অন্য জাতিকে বুঝায় না, ও বুঝাইতে পারে না। উপরি উল্লিখিত যুক্তিচতুষ্টয়ের উপর নির্ভর করিলে কোন প্রকারেই এরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারা যায় না। ফলে যাবতীয় পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞেরাই এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া বিষম ভ্রান্তিকান্তারে দিশাহারা হইয়াছেন বলিয়া আক্ষেপ হয়। আমরা দেখিতেছি কেবল এক জন মাত্র ইউরোপীয় পণ্ডিত এই প্রশ্নের মীমাংসা স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর কেহই এরূপ স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হন নাই। এই মহাত্মার নাম ডাক্তার কারণ। ইনি বারাণসীস্থ কুয়ীন্‌স কালেজের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। ডাক্তার কারণ বৃহৎসংহিতার এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। উহার পূর্ব্বভাবে তিনি লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত যবনশব্দে পূর্ব্বে কেবল গ্রীকদিগকেই বুঝাইত, যবনশব্দে নির্দ্দেশ করিলে অন্য কোন জাতিকেই বুঝাইত না। সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যসন্তানেরা সমুদয় গ্রীকদিগকে "আইয়োনীয়" শব্দে নির্দ্দেশ করিতেন ইহা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা আমার বিবেচনায় অতিশয় অশ্রদ্ধেয় কথা, কারণ সমুদায় গ্রীকেরা ত আর আইয়োনিয়ার অধিবাসী নহে, আর আইয়োনিয়ার অধিবাসীদিগের সহিত গ্রীকদিগের কোন অংশে কিছুমাত্র সাদৃশ্য আছে তাহাও বলা যায় না। মুসলমানেরা ভারতবর্ষ বিজয় করিলে ভারতবাসীরা উহাদিগকেও যবন শব্দে নির্দ্দেশ করিতেন। সুতরাং ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট "যবন" ও "ম্লেচ্ছ" এই উভয় শব্দই সমানার্থক। ইহা দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মহম্মদের শিষ্য ও অনুশিষ্যেরা যৎকালে ভারতবর্ষ অধিকার করে, তখন হিন্দুরা উহাদিগকেও "যবন" অর্থাৎ "ম্লেচ্ছপ্রধান" এই নামে নির্দ্দেশ করিয়াছিল। কিন্তু "যবন" শব্দের এরূপ স্বরূপযোগ্যতা কখনই ছিল না, এখনও নাই, যদ্দ্বারা "যবন" বলিতে আরবদেশের অধিবাসীদিগকে বুঝাইতে পারে। যদি

যবন শব্দের কোন প্রতিপাদ্য থাকে, তবে তাহা কেবল গ্রীকজাতীয় লোক, অন্য কোন জাতিই নহে।" অতএব সংস্কৃত যবন শব্দে, গ্রীকদিগকে বুঝাইত এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইলে যুক্তিপ্রদর্শন-পূর্ব্বক উহা সপ্রমাণ করা কর্ত্তব্য। এই প্রতিজ্ঞা কতদূর বিশুদ্ধযুক্তির অনুমোদিত, আর কতদূরই বা অযৌক্তিক ও স্বকপোলকল্পিত এক্ষণে যথাক্রমে তাহার বিচার ও সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ম্যাক্‌সমুলর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশে উপরি উল্লিখিত যে যুক্তিচতুষ্টয়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথমটীই সর্ব্বাপেক্ষা আপাতমনোহর ও ধূলিমুষ্টিপ্রক্ষেপী কিন্তু পর্য্যন্তনিষ্ফল। আমরা প্রস্তাবের প্রারম্ভে গ্রীক, পারসী, হিব্রু ও সংস্কৃত এই চারি ভাষা হইতে যে চারিটী একাকার শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছি, সে কয়েকটীর উচ্চারণগত সাদৃশ্য এত প্রগাঢ়, যে ঐ কয়েকটী শ্রবণ করিলে উহাদিগকে ঐকার্থক বলিয়া বিবেচনা করা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। প্রত্যুত স্থূলদর্শী ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণে এরূপ স্থলে উহাভিন্ন অন্য কোন প্রকার সংস্কারের উদয় হওয়া অসম্ভব। কিন্তু কেবল উচ্চারণের সাদৃশ্যমাত্রের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করা এক্ষণকার উন্নতিশালিনী শব্দবিদ্যার অনুমোদিত নহে। উচ্চারণের সাদৃশ্যদর্শনে যদি কোন ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-প্রচলিত শব্দদ্বয়ের অভিন্নতা সম্পাদন করিবার আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে অগ্রে সমোচ্চারণ শব্দদ্বয়ের মূল অনুসন্ধান-পূর্ব্বক উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই রূপে মূলানুসন্ধান করিতে গিয়া যদি এরূপ দেখা যায়, যে প্রস্তাবিত শব্দসকলের মূল এক ও অভিন্ন এবং উক্ত অভিন্ন প্রকৃতি হইতে যে সমস্ত পারম্পরিক ও ব্যবহিত অর্থ প্রসূত হইয়াছে তৎসমুদয় ও এক ও অভিন্ন, তাহা হইলে, কেবল তাহা হইলেই, প্রস্তাবিত শব্দাদির ঐক্যসংস্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে।' নতুবা উচ্চারণের সাদৃশ্যমাত্রের উপর নির্ভর করিলে কখনই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে পারা যায় না। এতাবতা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, আমাদের প্রস্তাবিত শব্দচতুষ্টয়ের প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, তৎপরে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিতে সাহসী হওয়া বিধেয়। অতএব ক্রমান্বয়ে উল্লিখিত গ্রীক, পারসী, হিব্রু, ও সংস্কৃত কয়েকটী শব্দেরই বিষয় পৃথক্ পৃথক্ বিবেচনা করা যাইতেছে।

গ্রীক "আইওনিয়া" শব্দের প্রাচীনতম আকার "য়িনিম" (Uinim)। টলেমীদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহের অনেকগুলির উপরিভাগে এই "য়িনিম" শব্দ খোদিত আছে। গ্রীসদেশের পুরাবৃত্তরচয়িতা কর্টিয়স এই শব্দে গ্রীকদিগকে বুঝাই-

তেছে এই অর্থ করেন। (Curtius Hist. Greece Ward's Trans.) কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন অনেকানেক স্তূপের উপরি খোদিত "য়িনিম্ব" শব্দ বিভিন্ন অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ টট্‌মোসিস, এবং তৃতীয় এমিনোফিস ইহাঁদিগের নির্ম্মিত স্তূপসমূহেও উক্ত শব্দের ব্যবহার আছে, কিন্তু উহার অর্থ স্বতন্ত্র। উহাদ্বারা মিসরদেশীয় ফেরো রাজগণের বিদেশাগত প্রজাদিগকে বুঝাইতেছে। বোধ হয়, যে সকল গ্রীক, ফিনীসীয়, আইয়োনীয় ও অন্যান্য জাতি তথায় গিয়া বাস করিয়াছিল তাহারাই উক্ত শব্দের প্রতিপাদ্য। ইতিবৃত্তরচয়িতা নির্দ্দেশ করেন, যে এই স্থলেও য়িনিমশব্দে কেবল গ্রীকদিগকেই বুঝাইতেছে। এক্ষণে কর্টিয়সের প্রতিজ্ঞার যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এরূপ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন, যে তৎকালে গ্রীসের অধিবাসীরা য়িনিম শব্দে অভিহিত হইত। কিন্তু এরূপ প্রমাণ করা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব, কারণ মহাকবি হোমরের সময় পর্য্যন্ত প্রকৃত গ্রীসদেশের অধিবাসীরা "একের" "আর্গিভ" ও "হেলেনীস" এই তিনটীর অন্যতম সংজ্ঞায় অভিহিত হইত। উহারা কোন কালেই "আইয়োনীয়" নামে অভিহিত হয় নাই। এরূপ স্থলে তৎকালে কেবল গ্রীকেরাই য়িনিম নামে অভিহিত হইত এরূপ নির্দ্দেশ বালপ্রলপিত ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয়না। অধস্তন সময়েও যখন গ্রীকেরা মিসরের অধিবাসীদিগের কর্ত্তৃক য়িনিমনামে অভিহিত হইত, তৎকালে য়িনিম একটী সাধারণ সংজ্ঞা ছিল, অর্থাৎ ইহাদ্বারা যেরূপ গ্রীকদিগকে বুঝাইত, সেইরূপ অন্যান্য জাতীয় লোকদিগকেও বুঝাইত।

গ্রীক শব্দবিদেরা বলেন, যে "আইয়োনিয়া" শব্দ "আইয়ো" শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আইয়ো নাম্নী একটী কুমারী ইন্দ্রদেবের (Jupitor) পত্নী হীরাদেবীর মন্দিরের অধিকারিণী ও পূজয়িত্রী ছিলেন। ঐ কুমারীর সহিত ইন্দ্রদেবের প্রণয় হয়। এই উপলক্ষে আইয়ো গাভির শরীর ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীর নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি আইয়োনীয় সাগরের উপকূলে অধিকাংশ কাল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং এই জন্যই উক্ত সাগর ও তাহার তীরবর্ত্তী প্রদেশের আইয়োনিয়া এই নাম হয়। এই প্রাচীন দৈবরহস্যের প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহা অদ্যাপি কেহই উদ্ভেদ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা হইতে এরূপ মীমাংসা করা যাইতে পারে, যে আইয়োর বংশীয় অধস্তন পুরুষেরা যদিও প্রকৃত গ্রীক বটে, কিন্তু তাহারা গ্রীসের সান্নিধ্যনিবাসী নানাবিধ অপরাপর জাতির সংশ্রবে বিমিশ্রভাব ধারণ করিয়াছিল। এই প্রতিজ্ঞার যাথার্থ্য সংস্থাপনার্থ একটী উপাখ্যানের উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইতিবৃত্তরচয়িতা হিরোদোতস ঐ উপাখ্যানটী সাধারণের গোচর করেন। উপা-

থ্যানটীর দ্বিবিধ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে জুপিটার, হীরা, আর্গস, হারমিস, প্রভৃতি উক্ত উপাখ্যানের প্রধান প্রধান নায়ক ও নায়িকগণ দেবতা বলিয়া বর্ণিত না হইয়া মনুষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ঐ উপাখ্যানটী বিশেষ মনোযোগসহকারে পাঠ করিলে অবশ্যই বোধ হইবে যে ফিনীসিয়াদেশীয় বাণিজ্যব্যবসায়ীরা গ্রীসদেশীয় রমণীগণকে ভুলাইয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশে উক্ত উপাখ্যানের উদ্ভাবন করিয়াছিল। এবং উহা দ্বারা তাহারা অনায়াসে আপনাদিগের দুষ্টাভিসন্ধি চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয়।

উল্লিখিত উপাখ্যানের যে দ্বিবিধ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রথমটীকে হিরোদোতস পারস্যদেশীয় কিম্বদন্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম পাঠটী নিম্নলিখিতপ্রকার—কোন সময়ে ফিনীসিয়াদেশীয় কতিপয় বণিক মিসর ও আসীরিয়াদেশের পণ্যজাতে জাহাজ বোঝাই করিয়া গ্রীসের অন্তর্গত আর্গস প্রদেশে বাণিজ্য করিতে যায়। তৎকালে "হেলাস" এই সাধারণ নামে অভিহিত যাবতীয় প্রদেশের মধ্যে আর্গসই সমধিক ধনসমৃদ্ধিশালী ছিল। আর্গসে উপনীত হইয়া উহারা তদ্দেশবাসীদিগের নিকট আপন আপন সামগ্রী বিক্রয় করিতে লাগিল। পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে প্রায় সমুদয় দ্রব্যই নিঃশেষরূপে বিক্রীত হইল। পাঁচ ছয় দিবস পরে উহারা যখন জাহাজ খুলিয়া স্বদেশযাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমত সময় আর্গসদেশীয় রাজকন্যা আইয়ো তাঁহার কতিপয় সহচরীকে সমভিব্যাহারে লইয়া অভিপ্রেত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিবার মানসে জাহাজে আরোহণ করেন। তাঁহারা স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ দ্রব্য অনুসন্ধান করিতেছেন এমত সময়ে ফিনীসীয়েরা উহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক জাহাজ খুলিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রতিগমন করিল। (Rawlinson's Herodotus.)

উল্লিখিত উপাখ্যানের দ্বিতীয় পাঠটী হিরোদোতসের গ্রন্থে ফিনীসীয়দিগের কর্তৃক উদ্ভাবিত বলিয়া বর্ণিত আছে। ফিনীসীয়েরা বলে যে তাহাদের দেশীয় বণিকেরা আর্গসরাজনন্দিনী আইয়োকে বলপূর্ব্বক বন্দিনী করে নাই। পরন্তু উক্ত জাহাজের কাপ্তেনের সহিত রাজকুমারীর প্রণয় হয়। কাপ্তেনের সংস্রবে তিনি অন্তঃসত্বা হয়েন, এবং লজ্জা ও অপমানের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশে ইচ্ছাপূর্ব্বক কাপ্তেনের সহিত পলায়ন করেন।

উপরি উল্লিখিত পাঠদ্বয়ের মধ্যে কোনটী প্রকৃত তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। পাঠদ্বয়ের মধ্যে যেটীই প্রকৃত হউক না কেন, উহা পাঠ করিয়া আমরা অনায়াসে এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি, যে আইয়োর বংশীয় অধস্তন পুরুষ বলিতে গ্রীক ও ফিনীসীয় প্রভৃতি

নানাবিধ ভিন্নদেশীয় জাতির সংস্রবে, উৎপন্ন জাতিদিগকে বুঝাইবে। ইহাদিগের মাতৃকুল গ্রীক ও পিতৃকুল অন্যান্যদেশীয়। সকল সমাজের শৈশবাস্থায় এইরূপ সঙ্কর জাতির উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীসদেশের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে তৎকালে ফিনীসীয় জলদস্যুরা প্রায়ই গ্রীসদেশীয় রমণীদিগকে সুযোগ পাইলেই আক্রমণ করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইত। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে যে আইয়োনিয়েরা এই বর্ণসঙ্কর দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীকেরা এই রূপে বর্ণসঙ্করদ্বারা উৎপন্ন জাতিদিগকে আপনাদের বংশীয় বলিয়া স্বীকার করিত না, সুতরাং গ্রীকেরা যে স্বয়ং আইয়োনীয় এই ঘৃণিত নাম গ্রহণ করিবে ইহা নিতান্ত অসম্ভব। মহাকবি হোমর উপরি উক্ত উপাখ্যানটীর গূঢ় ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত ছিলেন। তিনি জুপিটর বা ইন্দ্রদেবকে আর্গসহা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে হীরা দেবী জুপিটর ও আইয়োর গুপ্ত প্রণয় ও আইয়োর গাভির আকার ধারণ প্রভৃতি রহস্য সকল জানিতে পারিয়া গোরূপধরা আইয়োর প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশে আর্গসকে গুপ্ত প্রণিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রদেব ইহা অবগত হইয়া আর্গসের প্রাণসংহার করেন, (Keightley's Mythology of Greece.)। হোমর এই সকল নিগূঢ় তথ্য সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকিয়াও কুত্রাপি গ্রীকদিগকে আইয়োনীয় শব্দে নির্দ্দেশ করেন নাই। কেহ কেহ হোমরের গ্রন্থ হইতে একটি পংক্তি উদ্ধারপূর্ব্বক আপনাদিগের সিদ্ধান্ত সংস্থাপনার্থ চেষ্টা করেন,। কিন্তু ল্যাস্‌ন, শ্লেগল প্রভৃতি পণ্ডিতেরা উক্ত পংক্তিটীকে হোমরের রচনা নহে, কাহারও স্বকপোলকল্পিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গ্রীকেরা নিজে এবিষয়ে যেরূপ মত প্রকাশ করেন, আমাদের বিবেচনায় তাহা অধস্তন লোকদিগের কর্ত্তৃক প্রকাশিত মত অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। ইঁহারা সকলেই একবাক্যে নির্দ্দেশ করিছেন যে 'আইয়োনীয় এই নামটী হোমরের অধস্তন'। তাঁহাদের মতে গ্রীকেরা এসিয়ামাইনর ও তৎসন্নিহিত দ্বীপশ্রেণী অধিকার করিবার পর উক্ত নামটী সৃষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, যে সকল সঙ্কীর্ণ ও মিশ্রজাতিরা তৎকালে ইয়োলিয় ডোরীয় প্রভৃতিদিগের ন্যায় সুগৃহীতনামা ছিল না, তাহারাই জাতি হারাইয়া আইয়োনীয় এই নাম গ্রহণ করিয়াছিল। অতএব গ্রীক (*Iao-nes*) আইয়ো শব্দে কোন প্রকারে গ্রীসের অধিবাসীদিগকে বুঝাইতে পারে না ইহা স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইল।

গ্রীক (*Iaones*) অর্থাৎ যবন শব্দ, ও হিব্রুভাষায় উহার যে প্রতিবাক্য আছে উভয়ই সমোচ্চারণ, এবং উভয়ই সংস্কৃত

যবন শব্দের প্রতিরূপ, ইহা প্রস্তাবের প্রারম্ভেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হিব্রু যবনশব্দ কালক্রমে "যিহোহানেন' (*Jehohanen*) এই আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু এই আকারেও উহা গ্রীক "য়াইনান" (*'Iwan nan*) এই শব্দের প্রতিরূপ ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। গ্রীকভাষায় সপ্ত-ত্যনূদিত" (*Septuagint*) নামে ওল্ড টেষ্টামেণ্টের যে অনুবাদ আছে, তাহাতে গ্রীক "যবন" (*Iawanao*) শব্দ হিব্রু জিহোনান (*Jehonan*) শব্দের প্রতিবাক্যস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা নিঃসন্দেহ প্রতীতি হইতেছে যে যথাক্রমে "যোহানেস" (*Johannes*) "যোনেস" *Joannes*, "যন" (*John*) ও "য্যাক" (*Jack*) এই সকল সংক্ষিপ্ত আকারে পরিণত হইয়াছে।* এক্ষণে স্পষ্টই প্রমাণ হইল যে গ্রীক ও হিব্রু উভয় ভাষায় ব্যবহৃত "যবন" শব্দই পরস্পর অত্যন্ত সন্নিহিত ও সম্বদ্ধ। গ্রীক ভাষায় যবনশব্দের মৌলিক অর্থ কর্দ্দম বা পঙ্ক, ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তৎকালে গ্রীক ও য়িহুদিরা নানাবিধ বর্ণসঙ্করে সমুৎপন্ন অধম জাতিদিগকে কর্দ্দম বা পঙ্ক শব্দ হইতে উত্থিত নামে আহ্বান করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? আবার সংস্কৃত "যুবন" (যুবন্) জেন্দ 'যাবান' (*Jawan*) ও ল্যাটিন 'য়ুবেনিস' (*Juvenis*) এই কয়েকটী শব্দের তাৎপর্য্যপর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, যে এই কয়েকটী শব্দের প্রত্যেকটাই 'যৌবন' অর্থাৎ অল্প বয়স বুঝাইতেছে, কিন্তু গ্রীকেরা পূর্ব্বোল্লিখিত সঙ্করজাতিদিগের হইতে পৃথক করিবার উদ্দেশে আপনাদিগকে বৃদ্ধ অর্থাৎ প্রাচীন ও সঙ্কীর্ণজাতিদিগকে 'যুবন' অর্থাৎ নূতন এই নামে নির্দ্দেশ করিত। সুতরাং ইহা দ্বারাও স্পষ্টই অনুভব হইতেছে যে গ্রীক ও হিব্রুভাষায় ব্যবহৃত 'যবন' শব্দে প্রকৃত গ্রীকদিগকে না বুঝাইয়া উপরিউক্ত বর্ণসঙ্করোৎপন্ন জাতিদিগকেই বুঝাইতেছে।

বাইবলের ওলডেটষ্টামেণ্টের নানাস্থানে উক্ত শব্দের বারম্বার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন স্থলে উহার অর্থ একজন ব্যক্তি, কোথাও উহাদ্বারা একটী জাতি বুঝাইতেছে, কোথাও উহার অর্থ একটী দেশ বা রাজ্য; আবার কোথাও বা উহাদ্বারা একটী নগর মাত্র বুঝাইতেছে, এক স্থলে দেখা যায় যে উক্ত শব্দটী য্যাফেটের সাতটী পুত্রের অন্যতমের নামস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইনিই ইলিসা, তার্সিস কিতিম ও দোদানিমের পিতা। স্থানান্তরে আবার ইহারই পুনরুল্লেখ আছে।

* "The Babylonian God *Oannes*, who is described by Berosus to have come from the Erythrian Sea, with fish's body, a human head under cover of a piscene one, human lower limbs, and a fish's tail, is supposed to have its name connected with the term Javan." Cory's Ancient fragments and Inman's Ancient Faiths in Anciant Names.

রেভরেণ্ড হিউলেট সাহেব বাইবলের যে টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন, বাইবলের উল্লিখিত জ্যাফেট ও গ্রীক পুরাবৃত্তে উল্লিখিত আয়াপিটস্ (Iapetus) এই দুই শব্দে এক ব্যক্তিকেই বুঝাইতেছে। এই ব্যক্তিকে গ্রীকেরা আপনাদিগের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই জন্যই উহারা সিতশ্মশ্রু বৃদ্ধদিগকে উক্তনামে আহ্বান করিত। (Hewlett's. Bible. Gen. X. 2.) ইসায়ার অধ্যায়ে "ধর্ম্মত্যাগী ও অধর্ম্মাচারীদিগকে টুবাল ও যবন দেশে প্রেরণ করিব" বলিয়া শাপ ও বিভীষিকা আছে। এই স্থলে টীকাকারেরা যবন শব্দের অর্থ উত্তরদিকস্থ দ্বীপশ্রেণী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন্ দ্বীপশ্রেণীর বিষয় উল্লেখ করা টীকাকারদিগের অভিপ্রেত তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়না যথার্থ বটে, কিন্তু যবনশব্দে গ্রীকদেশ বুঝান তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিলনা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাইবলের অপর এক স্থলে বর্ণিত আছে, যে যবন ও টুবাল নামক দুই প্রকার জাতীয় লোকেরা টাইরস নগরের সহিত বাণিজ্য করিত। পূর্ব্বকালে দেশের নাম হইতে তদ্দেশবাসীদিগের নামবরণ হইত। সুতরাং এস্থলে যবনশব্দে আইয়োনিয়ার অধিবাসীদিগকে বুঝাইতেছে। কিন্তু যৎকালে বাইবলের এই অংশটী লিখিত হইয়াছিল তখন গ্রীস দেশের বাণিজ্যশ্রীর উদয় হয় নাই, তৎকালে ফিনীসিয়ার অধিবাসীরাই বাণিজ্যব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল, অতএব তৎকালপ্রযুক্ত যবনশব্দে ফিনীসিয়া ব্যতীত অন্য কোন দেশ বুঝান সম্ভবপর নহে। বাইবলের এজেকিয়েল নামক অধ্যায়ে যবনশব্দে আরবদেশের দক্ষিণ প্রান্তস্থ যেমেন (Gemen) নামক একটী নগর বুঝাইতেছে. ফিনীসিয়ার বণিকেরা এই নগরের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল। সুতরাং ইহা দ্বারাও প্রতীত হইতেছে যে যবনশব্দে যাহাদিগকে বুঝায় তাহারা গ্রীসদেশের অধিবাসী নহে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক হিব্রু গ্রন্থাদিতে প্রযুক্ত যবনশব্দে গ্রীকদিগকে বুঝাইতেছে বটে, কিন্তু উহাদ্বারা গ্রীসের অধিবাসীদিগকে যেরূপ বুঝাইতেছে, আসিয়ার অধিবাসী গ্রীকজাতীয়দিগকেও তদ্রূপ বুঝাইতেছে, কিন্তু উপরে বাইবলের যে যে স্থলের উল্লেখ করা গিয়াছে, তৎসমুদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে যে তৎকালে হিব্রুজাতীয়েরা গ্রীসের অধিবাসীদিগের বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিলনা, এমন কি তখন উহারা তাহাদের নামপর্য্যন্ত শুনিয়াছিল কিনা সন্দেহ। আর তৎকালে গ্রীসের যে সকল অধিবাসীরা আসিয়া মাইনর ও তৎসন্নিহিত দ্বীপশ্রেণীতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল তাহারাও এত দূর প্রবল হইয়া উঠে নাই, যে তাহারা

একটী স্বতন্ত্র জাতিস্বরূপে পরিগণিত হইয়া একটী স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। ডাক্তার স্মিথ সাহেব স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে অতি প্রাচীনকালে গ্রীকদিগের সহিত হিব্রু-দিগের কিছুমাত্র আলাপ ও পরিচয় ছিলনা। খৃষ্টের ৭০৯ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত সার্গন নামক স্তূপের উপরি-ভাগে খোদিত আছে, যে "পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যে একটী দ্বীপে যবন নামে এক জাতীয় লোক বাস করিত, গ্রীসের উপকূল হইতে উক্ত দ্বীপ সাত দিনের পথ, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ দ্বীপ ও উহার অহার রাজগণের নাম পর্য্যন্ত কোন্ কালে অবগত ছিলেন না।" (Rawlinson's Herodotus) এক্ষণে বিবেচনা করা উচিত যে যদি খৃষ্টের ৭০৮ বৎসর পূর্ব্বে আসীরিয়া ও ক্যাল্‌ডিয়ার অধিবাসিরা যবন এই নাম পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না, তখন এই সময়ের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে মোসেস্ বা সমসাময়িক হিব্রুরা যবন বলিতে গ্রীকদিগকে নির্দ্দেশ করিত ইহা কতদূর অসম্ভব।

অপেক্ষাকৃত অধুনাতন গ্রীক্ গ্রন্থা-দিতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে বটে, যে আইয়োনিয়া গ্রীসকাম্রাজ্যের অন্যতম অংশ, কিন্তু প্রাচীনতম রচনা মাত্রেই যে যে স্থলে আইয়োনীয় শব্দ গ্রীসের অধিবাসীদিগকে বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তত্তৎস্থলের সর্ব্বত্র উহা পারস্যবাসীদিগের মুখে বিন্যস্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরে ইজিপ্‌সিয়ান্ হিব্রু, আসিরিয়া ও গ্রীকদিগের গ্রন্থাদিতে যে সকল বিষয় উল্লিখিত হইল, তৎসমুদায় বিশেষ মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিলে অবশ্যই এরূপ নিঃসন্দেহ প্রতীতি জন্মিবে, যে ঐ কয়েকটী ভাষাতে কখনই (আইও-নিয়া) যবন শব্দের অর্থের স্থিরতা ছিলনা। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সময়ে বৈদেশিক এই অর্থ বুঝাইতে হইলে যবন-শব্দ ব্যবহৃত হইত, তাহার পর ঐ শব্দে ইয়ো-রোপীয় ও আসিয়াবাসীদিগের পরস্পর সংস্রবে যে সকল সঙ্কর জাতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাদিগকে বুঝাইত, পরি-শেষে বহুকাল অতীত হইলে যবনশব্দ গ্রীক এই সাধারণ সংজ্ঞার প্রতিবাক্যস্বরূপ হইয়া উঠে। এতাবতা এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়, যে যদি গ্রীক হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় প্রচলিত যবন শব্দের কোন কালেই তাৎপর্য্য স্থির ছিল না, তখন সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত উক্ত শব্দের তাৎপর্য্য স্থির থাকা নিতান্ত অসম্ভব। ফলে গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় উক্ত শব্দ যেরূপ কালবশতঃ নানার্থে ব্যবহৃত হই-য়াছে সংস্কৃত যবনশব্দেরও তদ্রূপ হইবার অধিকতর সম্ভব। আর সংস্কৃত যবন শব্দটী উল্লিখিত ভাষাসমূহে প্রচলিত যবন শব্দের সহিত এক ও অভিন্ন কি না এখনও তাহার স্থিরনিশ্চয় হয় নাই। আগামীবারে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, কাব্য

প্রভৃতির সমালোচনা করিয়া সংস্কৃত যবন শব্দের তাৎপর্য্যনির্ণয় ও প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত স্থির করা যাইবে। বাহুল্যভয়ে এবারে এই স্থানেই বিশ্রাম করিতেছি।

সারদা মঙ্গল সংগীত।

পঞ্চম সর্গ।

১

অসীম নীরদ নয়,
ও-ই গিরি হিমালয়,
উথুলে উঠেছে যেন
অনন্ত জলধি;
ব্যেপে দিগ্ দিগন্তর
তরঙ্গিয়া ঘোরতর
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন
জাগে নিরবধি।

২

গভীর—গম্ভীর ছাঁচে
অটল দাঁড়ায়ে আছে,
কটাক্ষে পৃথিবী যেন
করে বিলোকন;
হর হর হর হর
সুর নর থর থর
প্রলয় পিনাক-রাবে
কাঁপে'না শ্রবণ;
ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে
বুকে খেলা করে ধেয়ে,
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু
লোটে পদতলে,
জলন্ত অনল ছবি
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে রবি
কিরণ জ্বলন-জ্বালা
মালা শোভে গলে,
কালের করাল হাসি
দলকে দামিনীরাশি,
কড় কড় দন্তে দন্তে
ভীষণ ঘর্ষণ,
ত্রিজগত ত্রাহি ত্রাহি;
কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাহি;
যোগেন্দ্র পুরুষ যেন
যোগে নিমগন।

৩

ওই মেরু উপহাসি
অনন্ত বরফরাশি
সুবর্ণ তপন করে
ঝক্ ঝক্ করে!
উপরে বিচিত্র রেখা
চারু ইন্দ্রধনু লেখা,
অলকা অমরাবতী রয়েছে ভিতরে—
লুকান লুকান রয়েছে ভিতরে।

৪

ওই ওই ভৃগুভূমে,
আচ্ছন্ন তুহিন ধূমে
রয়েছে আকাশে মিশে
অপরূপ স্থান!

আব্‌ছা আব্‌ছা দেখা যায়
গুহা গোমুখের প্রায়,
পাতাল ভেদিয়া তায়
ধায় যেন বাণ।

৫

ফেনিল সলিলরাশি
বেগভরে পড়ে আসি,
চন্দ্রলোক ভেঙে যেন
পড়ে পৃথিবীতে ;
সুধাংশু-প্রবাহপারা
শত শত ধায় ধারা
ঠিকরে অসংখ্য তারা ছোটে চারিভিতে
অসংখ্য শিকর শিলা ছোটে চারিভিতে।

৬

শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঠেকে ঠেকে
উথলিয়ে ঝেঁকে ঝেঁকে
জেলের জালের মত
হয়ে ছত্রাকার
ছুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে,
ফেণার আরশি ওড়ে
উড়েছে মরাল যেন
হাজার হাজার।

৭

আবরিয়ে কলেবর
ঝরিছে সহস্র ঝর,
ভৃগুভূমি মনোহর
সেজেছে কেমন !
যেন ভৈরবের গায়
আহ্লাদে উথ্‌লে ধায়
ফণা তুলে চুল্‌বুলে
ফণী অগণন।

৮

নেমে নেমে ধারাগুলি,
করি করি কোলাকুলি,
একবেণী হয়ে হয়ে
নদী ব'য়ে যায় ;
ঝরঝর কলকল
ঘোর রাবে ভাঙে জল,
পশু পক্ষী কোলাহল
করিয়ে বেড়ায়।

৯

সিংহ ছুটী শুয়ে তটে
আনন আবরি জটে
মগন রয়েছে যেন
আপনার ধ্যানে;
আলসে তুলিছে হাই,
কাকেও দৃক্‌পাত নাই ;
গ্রীবা ভঙ্গে কদাচিৎ
চায় নদী পানে।

১০

কিবে ভৃগু-পাদমূলে
উথ্‌লে উথ্‌লে ছুলে
টলে ঢলে চলেছেন
দেবী সুরধনী !
কবির যোগীর ধ্যান,
ভোলা মহেশের প্রাণ,
ভারত-সুরভি-গাভী,
পতিত-পাবনী !

ক্রমশঃ।

শত্রু সিংহ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বীরসিংহ কোথায় ?

কমলাদেবীর লোকান্তর হইল;—বীরসিংহ কোথায় ? তিনি কি জানিতে পারিলেন না ?—কমলাদেবী জনমের মত চলিয়া গেলেন একবার কি বীরসিংহকে দেখিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না ?—কমলা বীরসিংহকে দেখিতে চাহিলেন না—বীরসিংহকে দেখিতে তাঁহার সাহস হইল না।—অনুপমার মুখ দেখিয়াই তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত হইতেছিল—ইষ্টদেবের তুষ্টির বিলম্ব হইতেছিল—বীরসিংহের মুখ দেখিলে অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত নিশ্চিত ; এই ভয়ে মরণকালেও বীরসিংহকে দেখিতে সাহস করিলেন না।

বীরসিংহ কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিলেন ?—মাতৃসমা স্নেহময়ী পিতৃব্যপত্নী নৃশংস পাষণ্ড পিতৃব্যের জন্যে প্রাণ-পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন ;—তিনি কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিলেন ?—বীরসিংহ কোথায়?

জগন্নাথের পত্র যথা সময়ে মহাবলসিংহের হস্তগত হইয়াছিল। জগন্নাথের পত্র যে রাত্রিতে মঙ্গলপট্টন হইতে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার পর দিন প্রত্যুষেই মহাবল পুরে উপনীত হয়।

প্রাবিটের বীতমেঘ প্রভাত অপেক্ষা মধুর পদার্থ আর কিছুই নাই। শরতের পূর্ণিমা, হেমন্তের কুজ্ ঝটিকা-রহিত প্রভাত, শীতের প্রভাত-সূর্য্য, বসন্তের প্রদোষানিল, গ্রীষ্মের প্রভাত-সমীর, বর্ষার নির্ম্মল প্রভাত, কাহার চিত্ত আকর্ষণ না করে? কাহার হৃদয় উচ্ছ-সিত না করে? কাহার কলুষিত মন নির্ম্মল না করে ?

মহাবলসিংহের রাত্রিতে নিদ্রা নাই ; শয্যায় যম-যন্ত্রণা ; মনের ভিতর মূর্ত্তিমান্ নরক ; কুচিন্তা সকল সজীব হইয়া তাঁহাকে দংশন করে ; তাঁহার নিদ্রা কিসে হইবে।—আজীবন যত দুষ্কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন এক রাত্রিতে এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত তাঁহার স্মৃতিপথে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠে। মহাবলসিংহের এক মাত্র দুষ্কর্ম্ম, অন্য লোকের ভাগ্যে পতিত হইলে তাহাকে পাগল হইতে হয়, এমন দুষ্কর্ম্ম মহাবলসিংহ যে কত করিয়াছেন করিতেছেন—করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করে কাহার সাধ্য ! তবে মহাবলসিংহের নিদ্রা কিরূপে হইবে ?

মহাবলসিংহ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। যে উদ্যানে পাঠক মহাশয়েরা বীরসিংহকে, অনুপমাকে দেখিয়াছেন, সেই উদ্যানেই মহাবলসিংহ প্রভাতসমীর সেবনার্থ প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে কেহই নাই।

সমস্ত রাত্রি বর্ষণ করিয়া মেঘের জল ফুরাইয়া গিয়াছে। মেঘগণ দূরে পলায়ন করিয়াছে। বিহঙ্গমকুল আনন্দিত ;

কলরবে কর্ণ পুলকিত করিতেছে। বর্ষাকালীন কুসুমসমূহে উদ্যান সুশোভিত। দেখিলে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, মন প্রফুল্লিত হয়।—মহাবলসিংহের হইল না—হওয়াই বিচিত্র।

মহাবলসিংহ সরোবরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সরোবরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন—অমনি চমকিয়া উঠিলেন।—কেন?—সহসা চমকিয়া উঠিবার কারণ কি?—সরোবরের জল পঙ্কিল, কলুষ; তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ; এই বলিয়া কি বিচলিত হইলেন? না—না। তবে কি কোন বিশেষ নিগূঢ় কারণ আছে? থাকিতে পারে? মহাবলসিংহের পক্ষে সকলই সম্ভব।

মহাবলসিংহ সরোবরের চাতালে উপবেশন করিলেন। যেখানে বীরসিংহ বসিয়াছিলেন, মহাবলসিংহ সেইখানেই বসিলেন।—বসিয়া কাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন?—অনুপমার?—না—এমন দুরাশা মহাবলসিংহের মনে এখনও উদিত হয় নাই। কমলাদেবীর? না—কমলার কথা তাঁহার মনেই নাই। পৃথিবীতে কমলা-রূপ কোন পদার্থ আছেন কি না ইহা মহাবলসিংহের চিন্তার বিষয় নহে। তবে তিনি কাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন?—

পাঠক এখনই দেখিতে পাইবে,—উতলা হইবার প্রয়োজন নাই। মহাবলসিংহকে বীরসিংহের ন্যায় অধিক ক্ষণ বিলম্ব করিতে হইল না। বীরসিংহের ন্যায় নানা প্রকার সন্দেহে মনকে ক্লান্ত করিতে হইল না। বীরসিংহের ন্যায় অপেক্ষিত ব্যক্তির প্রতি দোষারোপ করিতে হইল না। বীরসিংহের ন্যায় হতাশে আশার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইল না। মহাবলসিংহ যাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন সে আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত।—মহাবলসিংহের সম্মুখে এক রমণী।

রমণী বৃদ্ধাও নয়—যুবতীও নয়। দুয়ের মাঝামাঝি। পাদ-দেশে, নিতম্বে, বক্ষঃস্থলে যৌবনের নিদর্শন পাওয়া যায়, মুখমণ্ডলে, নেত্রোপান্তে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন অস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছে। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। হাব, ভাব, [illegible], বেশ ভূষা গুণাকরের মালিনীর ন্যায়।—এক এক করিয়া মিলাইয়া দেখ, সাদৃশ্য ঠিক হইবে।

প্রথম সম্ভাষণেই বুঝিতে পারিলাম, রাজার সহিত ইহার কিছু ঘনিষ্টতা আছে। সম্বন্ধ এখন যাহাই হউক পূর্ব্বে যেন অন্যপ্রকার ছিল। জানিতে পারিলাম নাম চপলা।

চপলাকে দেখিয়াই মহাবলসিংহ আহ্লাদে গদগদ। চপলার হস্ত ধরিয়া তাহাকে নিকটে বসাইলেন।—চপলা একটু সরিয়া বসিল।—হাসিতে হাসিতে বলিল।

"মহারাজ এ আবার কি, এত আদর কেন?"

"কোন কালেই কম?"

"কাসে ছিল, ছিল ভাল, এখন যে অকাল।"

"অকালের ফল, আদর বড়।"

"দোফলা ফলে রস কম।"

"রসে কি করে, আঁটী ও মিটে।"

"রস না থাক্‌লে কে আঁটী চোষে?"

"যে ভাল বাসে।"

"ভাল বাসার মুখে ছাই।"

"সে বলে যার নাই।"

"তবে কি হে ভাল বাস?"

"জানিয়ে কেন জিজ্ঞাস?"

"কার প্রতি ভাল বাসা?"

"যার তরে তোর আসা।"

"কার তরে আমি আসি?"

"আমি যারে ভাল বাসি।"

"কেন তুমি বাস ভাল?"

"ঘেরেছে প্রেমের জাল।"

"সে জাল ছিড়িতে হবে।"

"দেহে নাহি প্রাণ রবে।"

"তুমিত অবোধ অতি?"

"বল না কি আছে গতি?"

"গতি মাত্র বনবাস।"

"সে যে বড় সর্ব্বনাশ!"

"নাহি হবে সহবাস!"

"কেন হে কর হতাশ!"

"সাধে কি হতাশ করি?"

"বল! বল! পায়ে ধরি!"

"অধীর হয়োনা অত।"

"প্রাণ মোর ওষ্ঠাগত!"

"আমি কি করিব বল?"

"তার সমাচার বল।"

"সু-খপর কিছু নাই।"

"যা জান, শুনিতে চাই।"

"শুনিয়ে কি আছে ফল?"

"আর কেন কর ছল।"

"সে তোমারে নাহি চায়।"

"তার তরে প্রাণ যায়!"

"সেত তা বোঝেনা মনে।"

"হবে দেখা তার সনে?"

"মিছে কেন কর আশা?"

"বুঝিবে সে ভালবাসা।"

"আর ভাল বাসা আছে।"

"সেত আর নাহিক কাছে?"

"তবু যে সে তারে চায়।"

"কেন না বোঝাও তায়?"

"বোঝালে বোঝেনা মন।"

"ঘটিবেনা অঘটন।"

"সেত অঘটন নয়?"

"অঘটন কিসে হয়?"

"তোমারে বাসিলে ভাল।"

"ঘটিবে তবে জঞ্জাল।——"

শেষ বাক্য বলিতে বলিতে মহাবলসিংহের ধৈর্য্য-চ্যুতি হইল! স্বাভাবিক পশুভাব মনকে অধিকার করিল। মহাবলসিংহ ক্রোধে অন্ধ হইলেন, মনে মনে প্রতাপসিংহের শিরশ্ছেদন করিলেন, অনুপমার সতীত্ব নষ্ট করিলেন। চপলার মুণ্ডপাত করিবার উদ্যোগ করিলেন। প্রতাপসিংহ, অনুপমা তাঁহার সে ভাব দেখিতে পাইলেন না,—দেখিলে তাঁহাদের মনে কি ভাবের উদয় হইত?

অনুপমার মনে ক্রোধের আবির্ভাব

হইত না; তাঁহার কোমল মনে ক্রোধ রিপুর স্থান নাই।—হাস্যরসের উদ্রেক হইত না। ক্রোধোন্মত্ত, দুরন্ত, দুরভিসন্ধি শার্দ্দূলের সম্মুখে অসহায়া হরিণীর হাস্য কিরূপে সম্ভবে? অনুপমার মন ভয়ে বিহ্বল হইত।—প্রতাপ সিংহের ভয় হইতনা—তাঁহার হৃদয় সাহসে নির্ম্মিত; ক্রোধ হইত না—ক্রোধ হইলেও—প্রকাশ পাইতনা;—তিনি মূর্ত্তিমান্ ধৈর্য্য! মহাবলসিংহের ভাব দেখিয়া তাঁহার মনে হাস্য রসেরই বেগ অধিক হইত। যদি বীরসিংহ সমীপস্থ হইতেন?——মহাবলসিংহের জীবন শেষ হইত। চপলার সহিত পিতৃব্যের কথা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার কৃপাণ পিতৃব্য-শোনিতে লোহিত হইত।

মহাবল সিংহ ক্রোধ-রক্ত নয়ন চপলার উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন,—চপলা তিরোহিত। চতুরা চপলা আগেই বুঝিয়াছিল মহাবল সিংহের মনে কিরূপ ভাবের আবির্ভাব হইবে;—সে ভাবের আবির্ভাব হইতে না হইতেই—চপলার তিরোভাব।

মহাবল সিংহের হৃদয়ের ক্রোধ হৃদয়কেই দগ্ধ করিতে লাগিল।

ক্রোধের একটু শান্তি হইল,—চপলা চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া—মহাবল সিংহের মনে ক্ষোভ হইল; হয়ত তাহার কাছে আরও অনেক কথা শুনিতে পাইতেন।—অনুপমার হৃদয় লাভ করিবার অনেক উপায় করিতে পারিতেন, অনেক উপায় তাহাকে শিখাইয়া দিতে পারিতেন;—চপলাকে হাতে রাখা তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক।

অনুপমার হৃদয় অধিকার করিবার ইচ্ছা মহাবল সিংহের মনে কেন? তিনিত মনে করিলেই বলপূর্ব্বক অনুপমাকে গ্রহণ করিতে পারেন। অনুপমা-লাভইত তাঁহার উদ্দেশ্য। অনুপমার হৃদয় লাভ করিতে ত তিনি আকাংক্ষী নহেন। তিনিত প্রণয় চাহেন না, সম্ভোগ চাহেন, পবিত্র প্রণয়েরত তিনি উপাসক নহেন—সম্ভোগের হীন-তম দাস। তবে অনুপমার হৃদয় লাভ করিতে তাঁহার চেষ্টা কেন?

পবিত্র রমণী-হৃদয়ের এমনই অনির্ব্বচনীয় মহিমা!—সে হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা দিতে কেহ সহসা সাহসী হয়না।—কমনীয় রমণী-মুখ দেখিলে অতি পাষণ্ডের মনেও পবিত্র ভাবের উদয় হয়। কাম রিপুর প্রবল বেগও অনেক সময়ে এই কারণে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই কারণেই অসহায়া অবলা অনেক সময়ে আপনার সতীত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

মহাবলসিংহের আন্তরিক ইচ্ছা অনুপমাকে সম্ভোগ করেন।—বলপূর্ব্বক অনুপমাকে গ্রহণ করেন।—কিন্তু একবার অনুপমার পবিত্র মূর্ত্তি তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলে,—সেই শান্ত মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়মুকুরে প্রতিফলিত হইলে—আর

সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না।

আবার কমলাদেবী এখনও জীবিতা আছেন।—সত্য, কমলার প্রতি মহাবল সিংহের ভাল বাসার লেশ মাত্রও নাই। সত্য, তিনি কমলাকে সুখের কণ্টক স্বরূপ বই আর কিছুই মনে করেন না। সত্য, কমলার জীবনের প্রতি তাঁহার কিছু মাত্র যত্ন নাই।—তথাপি কমলা পতিব্রতা।—পতিব্রতা সতীর প্রতি প্রণয়, দয়া, না থাকিলেও মহাবল সিংহের মন ভয়ে, বিস্ময়ে, ভক্তিতে জড়ীভূত হইয়া আছে। বল পূর্ব্বক অনুপমাকে গ্রহণ করিলে কমলার হৃদয়ে বেদনা হইবে,—পতিব্রতা সতীর পবিত্র হৃদয়ের ঐশিক তেজ তাঁহার অপবিত্র হৃদয় দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, এই ভয়েও—মহাবল সিংহ আপনার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে অসমর্থ। এই কারণেই অনুপমাকে বিবাহ করিতে তাঁহার ইচ্ছা, এই কারণেই অনুপমাকে সম্মতা করিতে প্রয়াস, অনুপমার হৃদয়ে প্রণয়ের উদ্রেক করিতে বাসনা। এই কারণেই চপলার সহসা প্রস্থানে তাঁহার ক্ষোভ।

মহাবল সিংহের মনের সমগ্র বিদ্বেষ প্রতাপসিংহের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। প্রতাপসিংহই তাঁহার প্রধান শত্রু—প্রতাপসিংহই তাঁহার সুখের অন্তরায়। অনুপমা প্রতাপ সিংহকে ভাল বাসে—এই জন্যেই অনুপমা এখনও মহাবল সিংহের প্রতি অনুরক্ত হয় নাই।—যদি প্রতাপ সিংহ না থাকিতেন—অনুপমা যদি প্রতাপকে না দেখিত,—তাহা হইলে অনুপমা এতদিনে মহাবল সিংহের অঙ্কলক্ষ্মী হইত।

আবার প্রতাপ যুবাপুরুষ, প্রতাপ সুন্দর, প্রতাপ পরাক্রমী, প্রতাপ উদারচেতা।—প্রতাপ অনুপমার অন্ধকারের দীপ, বিপদ্ সাগরের তরণী, শীতের অগ্নি, নিদাঘের মেঘ; সুতরাং প্রতাপ মহাবলসিংহের অন্ধকারের উপদেবতা, সুখ-সাগরের বিঘ্ন বাত্যা, শীতের তুষাররাশি, নিদাঘের বজ্র।-প্রতাপ মহাবল সিংহের চক্ষুর শূল, হৃদয়ের কণ্টক।

মহাবলসিংহের ঈর্ষা-পীত নয়নে প্রতাপের এক একটী গুণ শত শত দোষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যাহাতে প্রতাপের মঙ্গল, তাহাতেই মহাবলসিংহের অমঙ্গল। যাহাতে প্রতাপের সুখ, তাহাতেই মহাবল সিংহের দুঃখ। যাহাতে প্রতাপের জীবন, তাহাতেই মহাবলসিংহের মৃত্যু।—প্রতাপের নিপাতেই মহাবলসিংহের উন্নতি।

স্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা—নিষ্ঠুরতার একশেষ!—পাষণ্ড! প্রতাপ তোর জন্যে দেশত্যাগী, রাজ্যত্যাগী, তোর জন্যে অনুপমার বিচ্ছেদ ভোগ করিতেছেন। তোর জন্যে তাঁহার সকল সুখ নষ্ট হইয়া যাইতেছে।—এখনও তাহার উপর তোর এত বিদ্বেষ! অনুপস্থিত, শত্রুর প্রতিও লোকের এরূপ ভাব হয় না!—সে যে তোর ভ্রাতুষ্পুত্র!

কামোন্মত্ত, স্বার্থপর, যথেচ্ছাচারী, ঐশ্বর্য্য-দৃপ্ত নিরঙ্কুশ পাপিষ্টের মনে দয়া! — বুভুক্ষিত ব্যাঘ্রের মনে অহিংসা বৃত্তির উদ্রেক !!—হবেনা—হবার নয়!

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বীরসিংহ কারাগারে।

মহাবলসিংহ উদ্যান হইতে বহির্গত হইয়া মন্ত্রাগারে প্রবেশ করিলেন। চক্ষু লোহিত; সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত, মস্তক এখনও ঘূর্ণায়মান, মস্তিষ্ক অন্ধকারময়। মন অস্থির, কল্পনা জড়ীভূত, স্মৃতি নির্জীব। নিষ্ঠুরতা, ক্রুরতা, বিদ্বেষ অপর বৃত্তি সকলের বল হরণ করিয়াছে।

মন্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিতে অবকাশ হয় নাই, মহাবল সিংহ এখনও দণ্ডায়মান। দণ্ডাহত কৃষ্ণ সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছেন।

এই সময়েই মন্ত্রাগারের দ্বারদেশে মহাবলসিংহের প্রিয়মিত্র মন্ত্রীমহাশয় উপস্থিত।—সঙ্গে মঙ্গলপট্টনের পত্রবাহক। "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া মন্ত্রী মন্ত্রালয়ে প্রবেশ করিলেন। মঙ্গলপট্টনের পত্রবাহক বহির্দ্দেশে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

সহসা মন্ত্রীর কণ্ঠস্বর কর্ণগোচর হওয়াতে রাজার চৈতন্য হইল; হৃদয়ের বিকার অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইল। উভয়েই উপবেশন করিলেন।

রাজাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া মন্ত্রীই অগ্রে স্বীয় জিহ্বার জড়তা দূর করিলেন।

"মহারাজ। মঙ্গল পট্টনের মন্ত্রিবর জগন্নাথের নিকট হইতে পত্র লইয়া এক লোক আসিয়াছে।"

এখন মহাবলসিংহের সম্পূর্ণরূপে আত্মাধিকার হইয়াছে, চিত্তবিকারের চিহ্ন মাত্রও নাই। বলিলেন

"পত্রের মর্ম্ম কি?"

"সে পত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে অন্যের নিষেধ।"

"পত্র কোথায়?"

"পত্র বাহক দ্বারদেশে অনুমতি অপেক্ষা করিতেছে।"

মহাবলসিংহের অনুমতিক্রমে মন্ত্রী পত্রবাহককে সঙ্কেত করিলেন। বাহক স্বপদোচিত সম্মান প্রদানান্তে পত্র মহাবল সিংহের হস্তে প্রদান করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি পত্র লইয়া কবে আসিয়াছ?"

"মহারাজ! কাল রাত্রিতে পত্র লইয়া মঙ্গল পট্টন হইতে বাহির হইয়া অদ্য প্রত্যূষেই রাজধানীতে পৌছিয়াছি। মহারাজের শ্রীচরণ-দর্শন না পাওয়াতেই পত্র দিতে পারি নাই।"

রাজা পত্রের শিরোনাম পাঠ করিলেন। দেখিলেন পত্রের শীর্ষদেশে "কেবল মহারাজের পাঠ্য" এইরূপ লিখিত আছে। পত্র যে অতিশয় প্রয়োজনীয় এবং কোন গুরুতর সম্বাদ বহন করিতেছে তাহা অনুমান করিতে আর তাঁহার তর্ক করিতে হইল না।

পত্রবাহকের পরিচর্য্যার ভার উপযুক্ত পাত্রের হস্তে অর্পিত হইল, পত্রবাহক স্থানান্তরে নীত হইল।

মন্ত্রাগারে আর কেহই নাই, কেবল রাজা ও তাঁহার মন্ত্রী।

রাজা উদ্বেগ-কম্পিত হস্তে পত্রের থাম খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন দুইখণ্ড পত্রিকা; দুই হস্তের লিখিত।—সংশয়ে, ভয়ে হৃৎকম্প হইতে লাগিল। যেখানে পাপ সেইখানে সংশয়; যেখানে সংশয়; সেই খানেই ভয়। কাকতালীয় ন্যায়ে জগন্নাথের পত্র খানিই প্রথমে রাজার নেত্রগোচর হইল।—উচ্চৈঃস্বরে পত্র পাঠ করিলেন, মন্ত্রির অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন—পত্র খানি অতি সঙ্কীর্ণ, স্বল্পাক্ষর, এই ভাবে লিখিত।

প্রবলপ্রতাপ মহাবলপুর-
সিংহ মহারাজ মহা-
বল সিংহ মহাপ্রবল-
প্রতাপেষু।

স্বস্তিঃ—

মহারাজের মঙ্গলেই এ রাজ্যের মঙ্গল। এতন্মধ্যস্থ পত্রান্তরে দেখিবেন মহাবল-পুরের অমঙ্গলের সম্ভাবনা। সুতরাং মঙ্গলপট্টনের বিশেষ ভয়। শক্রসিংহ মহারাজের চিরশত্রু। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ শক্রসিংহ মঙ্গলপট্টনেরও শত্রু হইয়াছেন। শক্রসিংহের বল বিক্রম মহারাজের অজ্ঞাত নহে। সুতরাং মহা-রাজ মহাবলসিংহ ও মহারাজ বাহুবলেন্দ্র সিংহের পরস্পর বন্ধুভাবে সংমীলন এ সময়ে একান্ত বাঞ্ছনীয়। পত্রবাহক বিশ্বাসী, সুচতুর, উত্তর-বহনে সক্ষম।

অন্য পত্র যে লোক মহাবলপুরে লইয়া যাইতেছিল, তৎকর্ত্তৃক কোন সম্বাদ শক্র-গঞ্জে নীত হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি সতর্ক হইবেন; শক্রগঞ্জের অপর দুই এক জন অনুসন্ধানার্থ মহাবলপুরে যাইতে পারে।

ইতি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রী জগন্নাথ শর্ম্মণঃ

প্রথম পত্রের পাঠ শেষ হইল। মহা-বল সিংহ অতি কষ্টে আপনার মনকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে সমর্থ হইলেন। দেখি-লেন মন্ত্রী নিকটে উপবিষ্ট। পত্রের অর্থ অবগত হইয়াছেন। ভালই হইয়াছে। দ্বিতীয় পত্র মন্ত্রীর হস্তে অর্পণ করিলেন।

মন্ত্রী দেখিলেন দ্বিতীয় পত্র কুমার প্রতাপসিংহের স্বহস্ত-লিখিত, কুমার বীর সিংহের উদ্দেশে প্রেরিত। বুঝিলেন জগন্নাথের চতুরতাতেই এ পত্র বীরসিংহের হস্তে পতিত না হইয়া মহাবলসিংহের হস্তগত হইয়াছে। মনে মনে জগন্নাথের বুদ্ধির কতই প্রশংসা করিতে লাগিলেন; আপনাদের সৌভাগ্যের মহিমা কতই অনির্ব্বচনীয়, মনে মনে অনুমান করিতে লাগিলেন। মহাবল সিংহ অস্থির হই-য়াছেন দেখিয়া মন্ত্রী পত্র পাঠ করিলেন।

পরম কল্যানীয় শ্রীযুক্ত কুমার
বীরসিংহ বাহাদুর কল্যাণবরেষু।

ভ্রাতঃ—

মহাবলপুর পরিত্যাগ করিয়া শক্রগড়ে আসিয়া শক্রসিংহের ভবনে অবস্থিতি করিতেছি। শক্রসিংহ অতি দয়ালু ও উদারচেতা। তাঁহার বিষয় আমরা পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য নহে। তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে আমাকে স্নেহ করেন।

ভরসা করি তিনিই আমাদিগকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন। অত্যাচারীর দণ্ড করিবেন। তাঁহার পরাক্রম প্রভূত, উপায় অসংখ্য। তুমি আমার জন্যে ভাবিত হইও না। সর্ব্বদা সতর্কভাবে অতি সাবধানে অবস্থিতি করিবে। শক্রমণ্ডলীতে বাস, বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। অনুপমাকে আমার সংবাদ জানাইবে। যাহাতে তাহার কোন বিপদ্ উপস্থিত না হয়, করিবে। মাতা কমলাদেবীকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইবে।—পত্রবাহক অতি বিশ্বাসী। মহাবলপুরের সংবাদ জানিবার জন্যে মন একান্ত ব্যাকুল হইয়াছে।

তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
বিজয় সিংহ।

প্রতাপের পত্র শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিতে বিলম্ব সহ্য হইল না; মহাবল সিংহ শরাহত সিংহের ন্যায় সহসা লাফাইয়া উঠিলেন। অগ্রে বীরসিংহের মস্তকচ্ছেদন, তৎপরে অনুপমার সতীত্ব নাশ, তৎপরে কমলার নির্ব্বাসন।—অবশেষে যুদ্ধসজ্জা, সৈন্যসংগ্রহ, শক্রগড় আক্রমণ, শক্রসিংহের সর্ব্বনাশ প্রতাপসিংহের নিপাত! এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এ সমস্ত সম্পন্ন না করিলে আর তাঁহার মনের স্থিরতা নাই! বিদ্বেষের শান্তি নাই; নিষ্ঠুরতার তৃপ্তি নাই।—যখন বুঝিলেন তাঁহার সাধ্যাতীত; মহাবল সিংহের হৃদয় উন্মত্ত হইল, চক্ষু বর্ষণ করিতে লাগিল, তিনি বসিয়া পড়িলেন। মন্ত্রী অনেক বুঝাইয়া, অনেক আশা দিয়া, অনেক সাহস দিয়া রাজার মন কতক শান্ত করিলেন। সহসা কোন দুঃসাহসের কার্য্য করা অনুচিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন।

জগন্নাথের পত্রের উত্তর লেখা হইল।—মঙ্গলপট্টনের সহিত মহাবলপুরের দৃঢ় সখ্য সংস্থাপন সে পত্রের মর্ম্ম।—পত্র লইয়া মঙ্গলপট্টনের লোক মঙ্গলপট্টনে প্রস্থান করিল।

এ সমস্ত ঘটনা কেহই অবগত হইল না। মহারাজ স্থির হইলেন, একের অপরাধে অপরের শাস্তি হইল না। অনুপমার সতীত্ব রক্ষা হইল। কমলাদেবীও নির্ব্বাসিত হইলেন না।

কিন্তু বীর সিংহের কি হইল?—বীরসিংহকে কারারুদ্ধ করা মন্ত্রি মহাশয়ের মত হইল।

মহাবল সিংহ সম্মত হইলেন। সে ভার মন্ত্রী নিজের হস্তে গ্রহণ করিলেন।

মহাবলসিংহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

বীরসিংহ আপনার বৈঠকখানায় বাতায়ন সন্নিধানে একাকী দণ্ডায়মান। প্রাতঃকৃত্য সমাপন হইয়াছে। বীরসিংহের মুখ-মণ্ডল চিন্তায় আবৃত। মুখের আর সে কান্তি নাই, সে প্রফুল্লতা নাই! কত দিনই বা আমরা বীরসিংহকে উদ্যানে অনুপমার সহিত দেখিয়াছিলাম! তখন বীরসিংহের মুখের কেমন উজ্জ্বলতা! কেমন প্রভা!—ক্রোধ বীরসিংহের উদার চিত্তের প্রবল বৃত্তি; কিন্তু প্রফুল্লতা—বালোচিত চিন্তা-শূন্যতা—নির্ম্মলতা সে ক্রোধের নিয়ত সহচর। বীরসিংহের স্বাভাবিক ক্রোধের চিহ্ন মুখে এক একবার অনুমিত হইতেছে;—ক্রোধের সহচর গণ একেবারে তিরোহিত হইল কেন? কেনই বা নিষ্ঠুরা চিন্তা-পিশাচী আসিয়া তাহাদের পবিত্র স্থান অধিকার করিয়াছে? এত অল্প সময়ের মধ্যে বীর সিংহের এত অধিক ভাবান্তর কেন হইল?

সময় অল্প নহে—দিবস গণনায় সময়ের পরিমাণ হয় না। বীরসিংহের মনে কত অসংখ্য বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, সাধারণ বুদ্ধির অনুমেয় নহে! এই অল্প সময়ের মধ্যেই বীরসিংহের জীবনের এক যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে!

বীরসিংহ ক্রমে হতাশ হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা এখনও সকল হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। এখনও তিনি মূর্ত্তিমান্ লক্ষ্মণ দেবের অবতার। এখনও ভাবিতেছেন কিসে অনুপমার উদ্ধার করেন—কিসে অগ্রজের অনুসন্ধান পান।

কত প্রকার উপায় স্থির করিতেছেন—কত প্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু কোনটাই সফল হইতেছে না!—বীরসিংহ অদ্য আবার কি উপায় কল্পনা করিতেছেন? কোন্ চিন্তায় মনকে নিমগ্ন করিয়াছেন? • •

বীরসিংহের বাহ্যজ্ঞান রহিত! রাজধানীর কোলাহল, পক্ষিগণের শব্দ, কিছুই তাঁহার কর্ণগোচর হইতেছে না!—এমন সময়ে চারিজন সশস্ত্র যমদূত আসিয়া তাঁহাকে অলক্ষিত ভাবে আক্রমণ করিবে বিচিত্র কি!

বিস্ময়, কোপ, হতাশতা পর্য্যায়-ক্রমে তাঁহার চিত্ত অধিকার করিল। দেখিলেন সম্মুখে মহাবলসিংহের অনুচর দুরাত্মা সচিবাধম। বুঝিলেন তাহার অভিসন্ধি কি?

"দুরাত্মন্ এখনও তোদের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই! পিতৃদেবের পবিত্র-রক্তপাত করিয়াও তোদের জিঘাংসা বৃত্তি পরিতৃপ্ত হয় নাই! পবিত্র-হৃদয়া স্নেহময়ী জননী পতিশোকে জলমগ্ন হইয়া আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন দেখিয়াও তোদের নিষ্ঠুর লোচনের সন্তোষ জন্মে নাই! প্রিয়তম অগ্রজকে নির্ব্বাসিত করিয়াও তোদের কুপ্রবৃত্তির পথ নিষ্কণ্টক হয় নাই!—আমাকে বধ করিতে পারিলেই কি তোদের সকল আশা সফল হয়! জীবনে আমার কিছুমাত্র মমতা

নাই।—স্বহস্তে পাষণ্ড, নরাধম নৃশংস, মহাবল সিংহের মস্তক খণ্ড খণ্ড করিতে পারিলাম না এই আমার একমাত্র দুঃখ! রাক্ষসের হস্ত হইতে পবিত্র-হৃদয়া অনুপমাকে উদ্ধার করিতে পাইলাম না—প্রিয়তম অগ্রজের কোন অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না এই আমার দুঃখ! নৃশংস সচিবাধম! তোর প্রতি কোপ প্রকাশ করিতেও আমার লজ্জাবোধ হইতেছে!”

বীরসিংহ মৌনাবলম্বন করিলেন। মন্ত্রীও কোন কথা না কহিয়া প্রস্থান করিল। যমদূতেরা মন্ত্রির আদেশানুসারে বীরসিংহকে লইয়া অতি গুপ্তভাবে রাজপুরীর গুপ্ত কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিল।

বীরসিংহ কারাগারে!—প্রতাপসিংহ নির্ব্বাসিত!—মহাবলসিংহ এখনও ধরণী তোকে কি সুখে বহন করিতেছেন—তোর জন্যেই কি ধরণীর সর্ব্বংসহা নাম হইয়াছিল!

অভ্যাস ও অনুশীলন।

এক প্রকার ক্রিয়ার বারম্বার সম্পাদনে অভ্যাসের উৎপত্তি হয়। যে কার্য্য দ্বারা কোন অভাবের পরিহার বা মনে স্বাচ্ছন্দ্যের উদয় হয়, তাহা সম্পাদন করিতে বারম্বার প্রবৃত্তি জন্মে। বারম্বার করিতে করিতে ক্রমশঃ তদ্বিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্বগুলির উদ্ভাবন হয়। সেই সূক্ষ্ম জ্ঞানই নৈপুণ্য ও উন্নতির সোপান। যেমন মানবজাতির তেমন তির্য্যাক্‌জাতিরও অভ্যাস শক্তি আছে। নবজাত শিশুর ক্রমে হামাগুড়ি, পরে আলগুড়ি, অনন্তর হেলিতে দুলিতে চলন, পরিশেষে অবক্র গমন কেবল অভ্যাসের ফল। তদ্রূপ গোবৎসের রোমন্থচর্ব্বন ও পক্ষিশাবকের উড্ডয়ন উপর্য্যুপরি বহুতর চেষ্টার পরিণাম মাত্র।

শিক্ষা দ্বারা অভ্যাসের তারতম্য হয়। মানুষের শিক্ষা স্বতঃ, পরতঃ ও পরম্পরাগত। কিন্তু তির্য্যক্‌ জাতির শিক্ষা সাধারণ্যে স্বতঃ ও পরতঃ। মানুষ নিজের বুদ্ধি ও যত্নের গুণে এবং অন্যের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা অনেক শিক্ষা করেন; কিন্তু পূর্ব্বপুরুষগণের সুসংগৃহীত জ্ঞানভাণ্ডারের নিকট তাঁহার যে কত ঋণ, তাহা কে বলিতে পারে? আদিম অসভ্য ও পশু উভয়েই গুহাশায়ী, উভয়েই বৃক্ষের ছায়ায় আরাম করিত, উভয়েই যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল তৃণ অথবা শিকারপ্রাপ্ত মাংস দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত, উভয়েই নদীর জলে পিপাসা দূর করিয়া লইত। তবে যে মানুষ ক্রিষ্টাল প্রাসাদে (crystal palace) বাস করিতেছেন, গোলাপবাগে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন,

পলান্ন ও লেডিকেনিও দ্বারা রসনাকে শাণিত করিয়া লইতেছেন, এবং কলের জলে সুধার আস্বাদন লইতেছেন, এসকল কেবল পরম্পরালব্ধ জ্ঞানের পরমোৎকৃষ্ট পরিণাম মাত্র। আমরা একথা বলিনা যে তির্য্যক্ জাতির পরম্পরাগত শিক্ষা সম্ভব নহে। যদি স্বজাতির ন্যায় তির্য্যক্ জাতির অতীত বৃত্তান্ত গুলি আলোচিত ও লিপিবদ্ধ করিতে আমাদের চেষ্টা থাকিত, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতাম যে বাবুই পক্ষীর কুলায় রচনা মধুমক্ষিকার মধুচক্র, ও বীবরের গৃহনির্ম্মাণ কিছু সহজে বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। আদিম অসভ্য বাবুই, মধুমাক্ষিকা বা বীবর যে এ প্রকার কৌশল এককালে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা আমরা মনে করিতে পারি না। বাবুইয়ের বাসা, মধুমক্ষিকার মধুচক্র ও বীবরের বাসগৃহ বহুকালের অভিজ্ঞতার ফল, এবং ভবিষ্যতে যে আরও উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইবেক না তাহা কে বলিতে পারে? তথাপি সাধারণ্যে বলিতে হইলে, তির্য্যক্ জাতির পরম্পরাগত শিক্ষা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। মনুষ্যসমাজের সহিত তুলনা করিলে, উহাকে সুমেরুর নিকট সর্ষপ বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

অন্যের নিকট আমরা মাতৃক্রোড় হইতে শিক্ষা পাইতেছি। স্বদেশীয়ং বিদেশীয়, সভ্য অসভ্য অধিক কি পশুপক্ষী-সকলের নিকট হইতেও আমাদের জ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু পশুপক্ষিগণ মনুষ্য হইতে যতদূর শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে, উহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর। যদি মনুষ্য অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট জাতি এই পৃথিবীতলে বাস করিতেন, আর তাঁহাদের দ্বারা মানবমণ্ডল শিক্ষা লাভ করিতেন, তাহা হইলে; খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বেও ছাপাখানা, বারুদ, বাষ্পযন্ত্র প্রভৃতির আবিষ্কার সমাহিত হইতে পারিত। কিন্তু যাহাকে শিক্ষা দিতে হইবেক, সদ্ব্যবহারদ্বারা প্রথমতঃ তাঁহার শ্রদ্ধাস্পদ হওয়া উচিত। আমরা এখনও স্বজাতির প্রতি রীতিমত সদ্ব্যবহার করিতে শিখি নাই, পশুপক্ষীর উপর সেরূপ করা শিখিতে অনেক বিলম্ব আছে। তথাপি আমরা দেখিতেছি যে শিক্ষা দিলে উহারা মানব-সমাজের কত প্রকারে উপযোগী হইয়া উঠে। শিক্ষিত হস্তী স্বজাতির উপর মনুষ্যের আধিপত্য বিস্তার করিয়া দেয়; প্রাচীনকালে যুদ্ধস্থলে প্রাণ দিয়াও শত্রুসেনা মর্দ্দন করিতে অগ্রসর হইত এবং রেলরোড সৃষ্টির পূর্ব্বে এত দুর্ব্বহ বস্তু স্থানান্তরে লইয়া যাইতে আরকে সমর্থ হইত? শিক্ষিত উষ্ট্র দুস্তর মরুসাগরের এক মাত্র কর্ণধার। উহার সাহায্য না পাইলে ভারতের ভাণ্ডার অদ্যাপি ইয়ুরোপীয়দিগের পরিজ্ঞাত হইত কি না বলা যায় না। কারণ ভারতের স্থলবাণিজ্যেই বিনিসীয় ও জেনোয়িকদিগের অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি; তদ্দর্শনে স্পেনীয় ও পর্টুগালীয়দিগের ঈর্ষা ও জলপথে এদেশে আসিবার চেষ্টা জন্মে। একের উদ্যোগে আমে-

মেরিকার আবিষ্কার এবং অন্যের উদ্যোগে উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া ভারতের পথ উদ্‌ঘাটন। যদি সুশীল উষ্ট্র দ্বারা ভারতের সহিত স্থলপথে বাণিজ্য কার্য্য তত সুগম ও তত লাভজনক না হইত, তাহা হইলে কত বিলম্বে যে নূতন মহাদ্বীপের আবিষ্কার ও ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

অশ্ব হইতে মনুষ্যসমাজের কতদূর শ্রমলাঘব ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। অশ্ব দ্বারা কৃষি, বাণিজ্য, মৃগয়া, সংগ্রাম প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য সহজে সুসিদ্ধ হয়। অশ্বারোহণ, বিশুদ্ধ বায়ুসেবন ও ব্যায়ামশিক্ষার সুচারু উপায়। অশ্বারূঢ় হইলে মানুষকে কিরূপ দিব্যশ্রী ও গৌরবে মণ্ডিত বোধ হয়, আদিম আমেরিকাবাসীরা নবাগত অশ্বারোহী স্পেনীয়গণকে প্রথম দর্শন করিয়া তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। অশ্ব হইতে মনুষ্যসমাজের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইতিহাসের নিকট তাহা অবিদিত নাই। আমরা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। আরব্যদেশীয়েরা চিরকালই, অশ্বের পালন, আরোহণ ও শিক্ষা বিষয়ে সাধারণ-কৌশল-সম্পন্ন। অশ্বের সহিত তাদৃশ ঘনিষ্ঠতাই তাহাদিগের অনুপম অধ্যবসায়, সাহসিকতা ও জয়োৎসাহের প্রধান কারণ। এই সকল অসামান্য গুণের প্রভাবেই তাঁহাদের আধিপত্য ও ধর্ম্ম—বিদ্যুৎগতিতে আসিয়া ও আফ্রিকার সারাংশ বশীভূত করিয়া ইয়ুরোপের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদ্বার অধিকার করিল। তখন আরব্যদিগের দৃষ্টান্ত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে, মধ্য ইয়ুরোপের দীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ইহা ইতিবেত্তার অবিদিত নহে যে যেমন আরব্যদিগের জয়দর্পে ইয়ুরোপের একতা ও রণোৎসাহ উত্তেজিত হইয়া উঠিল; তেমনি তাঁহাদিগের নৃশংস অথচ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদিতা হইতে খৃষ্টধর্ম্মের সংস্করণ হইতে লাগিল; আবার তাঁহাদিগেরই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট প্রণালীর কারুকার্য্যদর্শনে, ইয়ুরোপীয় শিল্প উন্নতির সোপানে আরোহণ করিল। সেই ইয়ুরোপীয় একতা, শিল্পনৈপুণ্য ও খৃষ্ট ধর্ম্মসংস্করণই অধুনাতন সভ্যতার প্রধান ভিত্তি। এখন অনুধাবন করিয়া দেখ, মনুষ্যসমাজে অশ্বের উপযোগিতা কতদূর। ইহা ভাবিলে মন বিস্ময়ে উচ্ছলিত হইয়া পড়ে। কুক্কুরজাতির উপযোগিতা তত উচ্চদরের নহে, কিন্তু দৈনন্দিন গার্হস্থ ব্যাপারে নিতান্ত সামান্য বলিয়া বোধ হয় না। গৃহপালিত কুক্কুর যেরূপ সতর্কতা সহকারে প্রভুর দ্রব্যসামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ করে, অসদভিপ্রায়ের লোককে তদীয় সীমানা হইতে তাড়াইয়া দেয়, এবং কি সম্পদে কি বিপদে সমানভাবে তাঁহার অনুসরণ করে; তাহা মানব-নামধারী ভৃত্যের অনুকরণীয়। শিক্ষিত কুক্কুর কেমন অনন্যমনে মেষপাল রক্ষণাবেক্ষণ করে, একটিকেও পাল ছাড়িয়া যাইতে দেয় না, এবং

দিনাবসানে সকলগুলিকে একত্র আনিয়া প্রভুর নিকট সমর্পণ করে। আবার কেমন ত্বরা সহকারে প্রভুর চিঠী লইয়া দোকান হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল ক্রয় করিয়া আনে; তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কুক্কুরের সতর্কতা ও প্রত্যুৎপন্নমতির গুণে যত লোক আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহার তালিকা করিবার উপায় থাকিলে, এই জন্তুর উপযোগিতা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিত। মৃগয়াকার্য্যে অশ্বের ন্যায় কুক্কুরের সাহায্য অপরিহার্য্য। সন্ধি-বিগ্রহের ইতিহাসে এই জন্তু স্থান প্রাপ্ত হয় নাই; কিন্তু মানবচরিত্রের ইতিবৃত্তে যথোচিত সমাদরে গৃহীত হইয়াছে। আরব্য-উপাখ্যানের অন্তর্গত সিন্দাবাদের গল্পে কুক্কুরের প্রভুপরায়ণতা বিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। জোজেফাইনের জীবন-চরিতেও কুক্কুরসম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ কথা আছে। জোজেফাইনের সহিত বিবাহের অব্যবহিত পরেই নেপোলিয়ন তাঁহার জোগাড়ে ইতালীস্থিত ফরাসীসৈন্যের অধিনায়ক হইয়া চলিয়া আসেন। ইতালীয় যুদ্ধে, নেপোলিয়ন যেরূপ অদ্ভুত প্রতিভা প্রকাশ করিলেন, তাহাতে ইয়ুরোপ বিস্মিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইল। সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিল "এরূপ বীর পুরুষ কি পুরাতন কি অধুনাতন কোন কালেই প্রাদুর্ভূত হন নাই।" জোজেফাইন বিরহবেদনা আর সহ্য করিতে না পারিয়া পতির মানা না শুনিয়া দ্রুত গতিতে তদীয় কীর্ত্তিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। নেপোলিয়ান চটিয়া উঠিলেন, ভাল করিয়া আলাপ করিলেন না। জোজেফাইন ম্রিয়মানা হইয়া স্বমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তিনি তাঁহার গুণের নিতান্ত পক্ষপাতিনী ছিলেন; কিন্তু তদীয় দুরাকাঙ্ক্ষার ভয় করিতেন; এবং নিজে স্ত্রী ও সাহসের চূড়ান্ত আদর্শ হইলেও তাঁহার ক্রোধাগ্নি কিরূপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে এই আশঙ্কায় যৎপরোনাস্তি ব্যাকুলা হইলেন। এই অবস্থায় রজনীযোগে শয্যার এক পার্শ্বে শয়ানা হইয়া নিমীলিত নেত্রে পতির প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহার স্বহস্তপালিতা ফ্লুরী নামে আদরের কুক্কুরী সম্মুখে নিস্তব্ধে বসিয়া যেন স্বামিনীর দুঃখের অংশভাগিনী হইয়া আছে, এমন সময়ে নেপোলিয়ন সহসা নিঃশব্দে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখভঙ্গীতে ক্রোধ ও বৈরক্তি স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে যেন কোপের স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হইতেছে। ফ্লুরী তাঁহাকে তাদৃশভাবে আসিতে দেখিয়া, স্বামিনীর অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া তৎক্ষণাৎ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভয়ানক ডাকিতে লাগিল এবং জোজেফাইন হাঁ হাঁ করিতে না করিতে, তাঁহার অঙ্গুলিতে দংশন করিল। তদ্দর্শনে তিনি আরও ভীতা হইলেন; কিন্তু নিপোলিয়নের ক্রোধ জোজেফাইনের উপর না পড়িয়া,

তদীয় কুক্কুরীর উপর পড়িল। নেপেলিয়নের ক্রোধ আর এক দিগে পতিত দেখিয়া সুচতুরা জোজেফাইন সাহস পাইলেন। পতি ও পত্নীতে সহজে মিলন হইল। কিন্তু তখনও ফ্লুরী ডাকিতেছিল; নেপোলিয়ন স্ত্রীর অনুরোধে তাহার প্রতি মৌখিক ভালবাসা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে ক্রোধানল পূর্ব্ববৎ প্রজ্জ্বলিত ছিল। জোজেফাইন তাঁহার মৌখিক অমায়িকতায় ভাবিলেন, ফ্লুরীর প্রতি তাঁহার কোপ নাই। কিন্তু সে ভুলিল না এবং আন্তরিক আশঙ্কার চিহ্নস্বরূপ মধ্যে মধ্যে আর্ত্তনাদ ও স্বামিনীর প্রতি সকরুণনেত্রে তাকাইতে লাগিল। সে ঠিক বুঝিয়াছিল; কারণ পরদিনের সূর্য্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী না হইতেই কপটী নেপোলিয়ন পত্নীর অজ্ঞাতসারে এক উদ্যানপালের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার ভীষণ গ্রে হাউণ্ড দ্বারা ফ্লুরীর প্রাণ সংহার করিলেন। শিক্ষাদ্বারা চতুষ্পদের কিরূপ অভ্যাস ও উপযোগিতা জন্মে, তাহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। অধুনা পক্ষিজাতির বিষয়ে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব। পুরাকালের শুক শারী ও বর্ত্তমানের শালিক, টেয়া, ময়না, প্রভৃতি কেমন ভাষা অভ্যাসে সুপটু হয়, তাহা সকলেরই বিদিত। যাহাদের সংসারবন্ধন শিথিল বা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, ইহারা তাহাদের কেমন আদরের সামগ্রী ও প্রীতিভাজন সহচর হইয়া উঠে তাহা মনুষ্যচরিতের দৈনন্দিন ইতিবৃত্তে দৃষ্ট হয়। পুরাতন উপাখ্যান ও গল্প লেখকেরা এই জাতির অনেক মনোহর চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। রামায়ণের সম্পাতী; ভারতের নাড়ীজঙ্ঘ ও শুক (ওরফে শুকদেব) কাদম্বরীর বৈশম্পায়ন; আরব্য-উপন্যাসের তোতা পাখী কি বলিতেছে শ্রবণ কর, মনকে কৌতুকরসে প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। ছেলেবেলার রূপকথার বেঙ্গমাবেঙ্গমীর গল্প বোধ হয় অনেকেই অদ্যাপি ভুলিতে পারেন নাই। ইতিহাসও পক্ষিজাতির অভ্যাস ও উপযোগিতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।

শ্যেনপক্ষীর শিক্ষার পরিচয় দিতে হইবে না। বন্দুকের সৃষ্টির পূর্ব্বে উহা গুলতি ও তীরের সমকক্ষ ছিল এবং জাতিবিশেষের আজীবনের একটি প্রধান উপায় বলিয়া পরিগণিত হইত। শ্যেনপক্ষীর অব্যর্থ লক্ষ্য দেখিয়া বোধ হয় শত্রুমারণার্থ শ্যেনযাগ দ্বারা বৈদিক অভিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত। পারাবতের অভ্যাসশক্তি অতীব প্রশংসনীয়। ইহার ন্যায় গূঢ়চর ও গুপ্তসম্বাদবাহক আর দ্বিতীয় নাই। এ কেমন সঙ্গোপনে চঞ্চুদ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিঠীপত্র গ্রহণ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে অর্পণ করিয়া আইসে। যখন বাণিজ্য স্বাধীন হয় নাই, বিনা মাসুলে পণ্যদ্রব্য দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যাইবার সুবিধা ছিল না, তৎকালে এই পক্ষী গুপ্ত বাণিজ্যের প্রধান সহায় ছিল। এই বিষয়টি লইয়া প্রসিদ্ধ আখ্যানলেখক থ্যাকারে

বৃদ্ধ ডুবালের কেমন ছবিটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা অনেকেরই বিদিত। ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার পূর্ব্বে লুই নেপোলিয়ানকে লোকে, এক-জন দিবাস্বপ্নপরায়ণ জাল্ম বলিয়া উপ-হাস করিত, কেহ বা বাতুল বলিয়া উড়াইয়া দিত। তিনি যখন ইংলণ্ড হইতে বলোনে অবতরণ করিবার ষড়-যন্ত্র করিতেছিলেন, কয়েকটি পারাবত তাঁহার ও চক্রান্তকারীদিগের খপরা-খপর লইয়া যাতায়াত করিত। সম্প্রতি সেই নেপোলিয়ানের সুপ্রসিদ্ধ অভিনয়-কার্য্যের উপসংহারকালে যখন পারিস নগর জর্ম্মনসৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়, তখন আবার একদল শিক্ষিত পারাবত রাজধানীর সম্বাদ লইয়া বিপক্ষের দুর্দ্ধর্ষ গুলির অলক্ষে উড্ডীন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে যাতায়াত করিয়াছিল।

তির্য্যক্‌জাতির উপযোগিতা বলিলাম; উহার আমোদকারিতার দুই একটি পরিচয় দিব। পূর্ব্বে ভারতের রঙ্গভূমিতে শ্বাপদের কৃত্রিম সংগ্রাম উপলক্ষে ঘোরতর আমোদ হইত। সম্রাট্ বাবর ও তাঁহার পৌত্র আকবরসাহ ইহার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। নুরজিহানের আদিপতি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে একটি শার্দ্দূলকে সংহার করিয়া সের খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। বঙ্গের রাজা রাজড়ারাও এতদ্বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আড়্গড়াতে অনেক ব্যাঘ্র, ভল্লূক ও হস্তীর লড়াই হইয়া গি-য়াছে। ইংরাজাধিকারের প্রথমযুগে কলি-কাতায় রাজা গোপীমোহন ও রাজা রাম-চাঁদের উৎসাহে টুন্‌টুনির লড়াই লইয়া বড়ই ধুম হইত। নব্য যুবকেরা ভাবিতে পারেন টুনটুনি পাখীর আবার লড়াই? সে আবার কেমন? বড়মানুষের উৎসাহে ও পুরস্কার লাভের লোভে অনেকে টুন্‌-টুনিকে লড়াই করা শিখাইত। বোধ হয় এই ক্ষুদ্রপক্ষীর প্রকৃতি সাহসকার্য্যে অনেক বলিষ্ঠতাভিমানী জন্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে। অবধারিত সংগ্রামের পূর্ব্বাহে উহাকে জোলাপ দেওয়া হইত, কিছুই খাইতে পাইত না। সামরিক টুন্‌টুনির ক্ষুধা রেচকের ও অনশনের উত্তেজনে চন্‌চনে হইয়া থাকিত। পরদিন রণ-ক্ষেত্রের (কোন চত্বরের) ঠিক মধ্যস্থলে একখণ্ড ময়দার লেচি ধরা হইত। অন-ন্তর দুই পক্ষীবীরকে দুইদিক হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। সেই লেচি লইয়া যে তুমুল সংগ্রাম বাধিত আমরা তাহার উপমা দিতে অক্ষম; কারণ "রামরাবণ-য়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব"। অন্যান্য সংগ্রামের ন্যায় অনেকক্ষণ জয়লক্ষ্মী দোলা-যামানা থাকিতেন। পরে যে, বিপক্ষকে হত বা পরাহত করিয়া সেই লেচিটি অধি-কার করিতে পারিত; তাহার স্বামীরই জয় ও পুরস্কার লাভ হইত। মুরগীর লড়াই আরও লোমহর্ষণ ব্যাপার ছিল। উভয় মুরগীর পাদদেশে খরধার ছুরিকা বাঁধিয়া ছাড়া হইত। তাহারা দুই মল্লের ন্যায় খড়্গাখড়্গি যুদ্ধে উদ্যম করিত। উভয়ে উভয়ের পক্ষমূলে ও বক্ষঃস্থলে

দারুণ আঘাত হানিত। পরে জয় পরাজয় পূর্ব্বোক্ত নিয়মে নিরূপিত হইত।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার কৌতুক অপেক্ষা ঘোড়দৌড়ের আমোদ ও আড়ম্বর বড় অধিক বলিয়া বোধ হয়। সমগ্র ইয়ুরোপ তন্নিবন্ধন প্রতিধ্বনিত হইতেছে, উহার সংজীবনী শক্তির প্রভাবে নির্জীব ভারতভূমিও দুই একবার গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে। কিন্তু উহাতে আমরা আমোদ করি না, দেখি মাত্র। এরূপ বিশুদ্ধ প্রবল আমোদে আমাদের অধিকার নাই। আমরা ঘোড়া চড়িতে শিখি না, সাহসীও হই না। ঘোড়া ছুটিতে দেখিলে, "শত হস্তেন বাজিনঃ" এই নীতিবাক্য স্মরণপূর্ব্বক তফাৎ থাকি। আমাদের শক্ররা বলে ইহা ভয়ের চিহ্ন; কিন্তু আমরা চাণক্য পণ্ডিতের দোহাই দিয়া তাহাদের নিন্দা অগ্রাহ্য করিতে পারি। ইংরাজিশিক্ষায় আমাদের মনে ইংরাজী তেজ জন্মিয়াছে; সুতরাং টুনটুনির লড়াই আর ভাল লাগে না; কিন্তু পক্ষান্তরে আবার ঘোড়দৌড়ের আমোদে সাহস কুলায় না। অতএব উদাসীন থাকাই ভাল। দর্শকশ্রেণি-ভুক্ত হইয়া জনতার কলেবর বৃদ্ধি করা অপেক্ষা নিরাপদ কার্য্য আর নাই।

মৃগয়া কি পুরাতন কি অধুনাতন সকল কালেই প্রবল আমোদের পরাকাষ্ঠা রহিয়াছে। বৃদ্ধ মনু মৃগয়াকে ব্যসনমধ্যে গণ্য করিয়া কেবল চিন্তাশীল আসনপ্রিয় ব্রাহ্মণজাতির অনুৎসাহ জন্মাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু সাহসরসিক বলিষ্ঠ ক্ষত্রিয়-জাতির বিরাগ জন্মাইতে কোন মতে কৃতকার্য্য হন নাই। অধিক কি ভারতের অন্তর্গত অনেকানেক আধুনিক রাজপুত রাজগণ সমুদয়-রাজধর্ম্ম-বর্জ্জিত হইয়াও মৃগয়াপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। আমরা এই প্রকরণটি কবি কালিদাসের মতানুসারী হইয়া উপসংহার করিব—

"পরিচয়ং চললক্ষ্যনিপাতনে
ভয়রুষোশ্চ তদিঙ্গিতবোধনম্।
শ্রমজয়াৎ প্রগুণাঞ্চ করোত্যসৌ
তনুমতোঽনুমতঃ সচিবৈর্যযৌ॥"ইতিরঘুঃ

"মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘুভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ, সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমৎ চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ। উৎকর্ষঃ সচ ধম্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে, মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়াং ঈদৃগ্বিনোদঃ কুতঃ॥" শকু

মানব জাতির শিক্ষা হইতে তির্য্যক্ জাতির কিরূপ অভ্যাস-পটুতা, উপযোগিতা ও আমোদকারিতা জন্মিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। কিন্তু আরও কতদূর জন্মিতে পারে, তাহা পরীক্ষার উপর নির্ভর করে। এমন অনেক জানোয়ার আছে যে, কোন মতে মনুষ্যের শাসন মানে না; বিনীত হইয়া মনুষ্যের কার্য্যোপযোগী হওয়া অপেক্ষা, আপনাদের দুর্বিনীত অবস্থার স্বাধীনতা এবং মানব জাতির সহিত অবিচ্ছিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভাল বাসে। হিন্দুকুশের অপরপারস্থিত বর্ব্বর জাতির ন্যায় তাহারা

চিরকালই সমাজের ও সভ্যতার প্রতিযোগী। ইহার পরিণাম কেবল স্বজাতির ক্রমিক উচ্ছেদ মাত্র। ব্যাঘ্র সিংহ প্রভৃতি বলশালী শ্বাপদকে বশীভূত করিতে পারিলে অনেক কাজে লাগিত। কিন্তু তাহার কোন সুবিধা দেখিতেছি না। মনুষ্যের সহিত খরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবন্ধন ঐ সকল জন্তুর ক্রমশই হ্রাস হইতেছে এবং কালে যে ম্যামথের ন্যায় বিলোপ হইবেক, তাহার সম্ভাবনা।

আমরা তির্য্যক্ জাতি লইয়া প্রবন্ধের আয়তন এত বর্দ্ধিত করিয়া ফেলিলাম যে আপাততঃ উপসংহার করিতে হইল, বারান্তরে মানবমণ্ডলীর অভ্যাসশক্তি বিষয়ে দুই একটি কথা বলিবার বাসনা রহিল।

সঙ্গীতপথিক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চীনদেশ হইতে বিদায়।

এতদিন চীনদেশে থাকিয়া দৈবপ্রসাদে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিলাম। ইহার মধ্যে কতশত নূতন বিষয় অবগত হইলাম, কত নূতন দৃশ্য আমার দর্শনপথবর্ত্তী হইল, কিন্তু আমি স্বীয় অভিলষিত সাধনে এত ব্যাপৃত ছিলাম যে এত কাল সে সমুদয়ের প্রতি অণুমাত্রও দৃক্‌পাত করিতে পারি নাই। এখন অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি—এখন পাঠক! যাহা কিছু দর্শন করিলাম ও জানিলাম তাহা সংক্ষেপে তোমার নিকট বর্ণন করিয়া এদেশ হইতে চিরজীবনের মত বিদায় গ্রহণ করিব। এই অদ্ভুতদেশে ও এই অদ্ভুত অধিবাসীদিগের মধ্যে থাকিলে ইহাদের কি উৎপত্তি কি সামাজিক অবস্থা কি রাজ্যশাসন প্রভৃতি যাহা কিছু দেখা যায় তাহাই আশ্চর্য্যকর বোধ হয়। যাহাহউক অন্যান্য বিষয় অবসর ক্রমে বলা যাইবে, আপাততঃ ইহাদের উৎপত্তি বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলাম।

চীনদের উৎপত্তি।

ইহাদিগকে দেখিলে ইহাদের উৎপত্তি কোথা হইতে সহজেই এই প্রশ্ন লোকের মনে সমুদিত হয়। আমারও মনে সেই প্রশ্ন উদিত হইল। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে জাতি আমার নিকট প্রথমতঃ অদ্ভুত, নয়নসমক্ষে ঘোর ইন্দ্রজালবিজৃম্ভণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল তাহা এক কালে আমাদেরই ভারতবর্ষবাসী ছিল। মহাত্মা সর উইলিয়ম জোন্স (Sir William Jones) বলেন * যে ইহারা পূর্ব্বকালে হিন্দু ও ভারতবর্ষবাসী ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব চীন (Chinas) নামক যে এক অতি প্রসিদ্ধ

* Asiatic Researches Vol. VIII.

জাতি ছিল তাহা হইতেই ইহাদের উৎপত্তি ও সেই নামেই ইহারা পরিচিত। বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ড সম্পাদনে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহারা ভারতবর্ষে নিতান্ত অবমানিত অবস্থায় বাস করিত; ক্রমে অতি নীচ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ে ও তাহারও উত্তরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে গিয়া বাস করিত। তাহারা যে বাস্তবিক হিন্দু ছিল, পণ্ডিতপ্রবর জোন্সের এই মত পরিপোষণ করিবার জন্য ডাক্তার মার্সমান্ (Dr. Marshman) † তাঁহার স্বীয় বিস্তীর্ণ পুস্তকে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছেন। চীনভাষা অতি পূর্ব্বে দেবনাগর অক্ষরে লিখিত হইত বলিয়া এবং অনেক দেবনাগর অক্ষরে লিখিত শব্দ প্রসিদ্ধ কাঙ্ঘি সাহেবের (Canghe) চীনদেশীয় অভিধানের প্রথমে উদ্ধৃত রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক ঐদিকে চালিত হইয়াছিল। কিন্তু এমতের সম্পূর্ণ বিপরীতবাদীও অনেক আছেন।

তাঁহারা বলেন "চীনজাতি কোন কালেই হিন্দু ছিলনা। জোন্সের মত নিতান্ত ভ্রান্তি-সঙ্কুল। চীনদের বাহ্যিক আকার ও সামাজিক অবস্থা দর্শন করিলে অথবা তাহাদের ভাষা পড়িলে কিছুতেই তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া বোধ হয় না। হিন্দুরা ধর্ম্মের দাস, ধর্ম্মের জন্য জীবন পর্য্যন্তও দিয়া থাকে, কিন্তু চীনদের প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মে কোন প্রগাঢ় আস্থাই নাই। হিন্দুরা নানাজাতিতে বিভক্ত—চীনেরা জাতিভেদ মূলেই স্বীকার করে না। কাঙ্ঘির অভিধানে যে সকল দেবনাগর অক্ষর উদ্ধৃত আছে তাহা দেখিয়া কেন যে ডাক্তার মার্সমানের মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইল তাহা বলিতে পারা যায় না। হিন্দু রামায়ণ ও চীন শি-কিং দুই ভাষার এই দুই অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে এ দুই জাতির ভাষাগত সাদৃশ্য অণুমাত্রও নাই।"* এই দলের মধ্যে দুইজন প্রসিদ্ধ ফ্রান্সদেশীয় পণ্ডিত† বলেন যে, চীনেরা মিসরদেশীয় লোক। চীনদেশে প্রথমে যে সকল রোমাণ কাথলিক পণ্ডিতগণ গমন করেন তাহারা বলেন চীনজাতি ইহুদিবংশসম্ভূত। ফ্রান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পউ (Pauw) এসকল মতের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, চীনেরা তাতার দেশের পর্ব্বতময়প্রদেশসমূহ হইতে চীনদেশে আসিয়াছে। তাতার ও চীন এ উভয়ই এক জাতি। কিন্তু তাহারা তত্তৎপ্রদেশ সমূহ হইতে প্রবহমাণ নদীস্রোত অনুসরণ করিয়া এই উর্ব্বর ও বিশুদ্ধজলবায়ুসম্পন্ন দেশে বাস করিতে আসিয়াছে অথবা তন্নিকটবর্ত্তী দেশসকল জনাকীর্ণ হওয়াতে অনেক গুলি লোক

† Dr. Marshman's clavis Sinica.

* John Barrow's Travels in China.

† M. De Guignes and M. Fréret.

প্রথমে পার্ব্বতীয় প্রদেশে আসিয়া বাস করে। পরে তথা হইতে মৃগয়ার উপলক্ষে কিম্বা, জীবিকান্বেষণে নদীস্রোত সকল অনুসরণ করিয়া এদেশে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ইহাকে উর্ব্বর ও উৎকৃষ্ট-জল-বায়ু সম্পন্ন দেখিয়া এখানে বাস করিতে আরম্ভ করে; এ উভয়ের কোন্‌টী সত্য তাহা আমরা নিশ্চয়ই জানিনা। তবে এটা সত্য যে, গ্রীক্ ইতিবৃত্ত-রচয়িতা হিরোদোতস (Herodotus) যে হাইপার্‌বোরীয় সাইথীয়দিগের আচার ব্যবহার বর্ণন করিয়াছেন তাহাদের সহিত চীনদেশবাসীদিগের আচার ব্যবহারের অনেক সাদৃশ্য আছে—এখনও সেই সকল পুরাতন সাইথীয় আচার ব্যবহার চীনদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চীনেরা সাইথীয় ড্রাগনে ও সর্পিণীতে বিশ্বাস করে।

চীনদেশীয় কোন এক নগর দর্শন করিলে বোধ হয় যে সেটী একটী তাতারদেশীয় শিবির—মৃত্তিকাবাঁধ দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। যেন এখনও পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিবাসী শত্রুবর্গের অত্যাচার ও ব্যাঘ্রগণের দৌরাত্ম্য হইতে সংরক্ষিত হইতেছে! এতাবতা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, চীনেরা আদৌ তাতারদেশবাসী ছিল।' ‡

চীনজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এইরূপ মত। ইহাদের কোন্‌টী সত্য তাহা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। অথচ আমার আর অন্য কোন উপায় নাই। চীনভাষায় চীন দেশের যে সকল ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে সে সমুদায়ই আমাদের দেশের ন্যায় উপকথায় পরিপূর্ণ। সুতরাং তাহাদিগ হইতে কোনমতেই প্রকৃত সিদ্ধান্তে আসিতে পারা যায় না।

চীনদেশের প্রসিদ্ধ সম্রাট্ কঙ্ হি সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে পিকিন্ নগরে নিমন্ত্রিত করিয়া আনিয়া মাঞ্চুভাষায় চীনদেশীয় এক বিস্তীর্ণ ইতিহাস রচনা করিতে আদেশ করেন। সুবিখ্যাত হান্‌লিন্ কালেজের পণ্ডিতগণ যে ইতিহাস পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহারা বিস্তর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সম্রাট্ ফ্রান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ রোমান্ কাথলিক্ ধর্ম্মপ্রচারক পেরি মেলাকে (Pere mailla) সমধিক ভাল বাসিতেন, তিনি তাঁহাকে রাজ্যের ব্যয়ে সমুদয় চীন দেশ ভ্রমণ করিতে আদেশ দেন। মেলাও দশ বৎসর কাল পরিভ্রমণ করিয়া যে সকল ঘটনা শ্রবণ অথবা দর্শন করিয়াছিলেন কিম্বা প্রাচীন ভগ্নাবশিষ্ট চিহ্ন সকল সন্দর্শন করিয়াছিলেন সে সমুদয় সংগ্রহ করিয়া মাঞ্চুভাষায় এক বিস্তীর্ণ ইতিহাস রচনা করেন এবং নিজদেশীয় ফ্রেঞ্চভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া যান। সেই অনুবাদিত পুস্তক অনেক দিন পরে

‡ Recherches sur les Chinois by M. De Pauw.

আবি গ্রোসিয়র্ (Abbe Grozier) প্যারিস্ নগরে মুদ্রিত করেন। * কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিনি সেই বিস্তীর্ণ পুস্তকে চীনজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন নিগূঢ় কথাই বলিয়া যান নাই। তিনি তাহাতে তৎপরবর্ত্তী সময়েরই ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের সন্নিবেশ করিয়াছেন। পৌরাণিক ইতিবৃত্তে তিনি অণুমাত্রও মনোযোগ করেন নাই। কিন্তু সকল দেশেরই আদিম অবস্থার বিবরণ পৌরাণিক আবরণে আবৃত। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহা হইতেও অনেক সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে, সচরাচর হইয়াও থাকে। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের পরস্পর বিসম্বাদিতা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কোন্‌টী যে প্রকৃত ও সাধুযুক্তির অনুমোদিত তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারা যায় না। তবে সর উইলিয়ম জোন্‌সেরই মত আমাদের নিকট অনেকটা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। যে সকল পণ্ডিত তাঁহার মতের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া স্ব স্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, বাস্তবিক ধরিতে গেলে তাহা বিরুদ্ধবাদ নহে। সকলেই চীনদের বিবরণ তাতার পর্ব্বত হইতে আসা অবধি আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু জোন্সের বিচারণা তাহার পূর্ব্ব সাময়িক। যখন আর্য্যেরা পারস্য বা মিডিয়া দেশ হইতে ভারতবর্ষাভিমুখে বাস করিতে আইসেন, তখন কোল্দ, গন্দ, ভিল, কিরাত প্রভৃতির ন্যায় চীনেরা উত্তর-পশ্চিমসীমাবর্ত্তী ভারতবর্ষীয় আদিম-নিবাসী ছিল। চীনেরা সাতিশয় বিক্রমশালী ছিল বলিয়া প্রতিরোধ করে। কিন্তু অবশেষে তাহারা পরাস্ত হইলে আর্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পান। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, আর্য্যজেতৃগণ পরাজিতদিগকে পরস্পর বিবাহাদি প্রদান দ্বারা চিরায়ত্ত করিয়া রাখিবার বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন। আধুনিক হিন্দুসমাজ দর্শন করিলে তাঁহারা যে সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারা যায়। তদানীন্তন যাবতীয় আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে চীনগণই সমধিক প্রতাপশালী ছিল। আমাদের দেশে অধুনাতন বিদেশীয়জেতৃগণ যেরূপ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় বীরদিগকে সৈন্যদলভুক্ত করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহারাও চীনগণকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত স্বকীয় সৈন্যদলভুক্ত করিয়া ছিলেন। তাহাতে তদানীন্তন সময়ে তাহারা অন্যান্য অধিবাসীগণ অপেক্ষা আপনাদিগকে বিশেষ গরীয়ান্ মনে করিত। কিন্তু তাহারা কোন সূত্রে উপস্থিত হইলে প্রভুদিগের উপর অত্যাচার করিতে ত্রুটি করিত না, অবসর প্রাপ্ত হইলেই প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণেও প্রবৃত্ত হইত। অবশেষে

* Histoire Générale de la Chine in 14 large quarto volumes.

যখন তাহারা প্রভুদিগের নিতান্ত চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইল তখন তাহারা তাহাদিগ-কর্ত্তৃক পদদলিত হইতে লাগিল এবং কিছুকাল নিতান্ত ঘৃণ্য অবস্থায় অবস্থান করিয়া যন্ত্রণা ও উৎপীড়ন নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে অবশেষে হিমালয়ে ও সন্নিকট-বর্ত্তী তাতার প্রভৃতি দেশের পার্ব্বতীয় প্রদেশে গিয়া বাস করে। এ পর্য্যন্ত সর উইলিয়ম জোন্সের সিদ্ধান্ত। ইহার প্রতিবাদ কেহই করে নাই। তৎপরে তাহারা তাতার দেশের পার্ব্বতীয় প্রদেশ হইতে তত্তৎপ্রদেশোৎপন্ন পূর্ব্ববাহিনী নদীস্রোতঃ অনুসরণ করিয়া অথবা অন্য কোন উপলক্ষে চীনদেশে গিয়া বাস করিতে পারে। তাহাতে আমাদের ও সরউইলিয়মজোন্সের কোন আপত্তি নাই। হয়তঃ এমনও হইতে পারে যে সাইবীরীয়েরা যখন মধ্য আসিয়ায় আগমন করে সেই সময় তাহাদিগ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত পার্ব্বতীয় প্রদেশ সমূহ হইতে তাহারা বিদূরিত হইয়াছিল, অথবা তাহাদিগের সঙ্গে তাহারা চীনদেশে আসিয়া বাস করে। সাইবীরীয়েরা যে এক সময়ে চীন দেশে আসিয়াছিল এবং কিছুকাল বাস করিয়াছিল তাহার অনেক চিহ্ন অদ্যাপিও চীননগর সকলে এবং চীনদিগের সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাসে সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

দেবনাগর অক্ষর চীনদেশে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল ইহাও তাহাদিগের ভারতবর্ষ-বাসিত্ব বিলক্ষণ রূপে সপ্রমাণ করিতেছে। তাহারা যখন আর্য্যদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত এবং পরে তাঁহাদিগের সৈন্য দল-ভুক্ত হয়, তখন আর্য্যেরা তাহাদিগকে স্বজাতির সমুদয় স্বত্ব উপভোগ করিতে অধিকারী করিয়াছিলেন। তাহারা ক্রমে আর্য্যদিগের ভাষা শিক্ষা করে এবং তাহাদিগের আচার ব্যবহারেও কতক অভ্যস্ত হয়। আর্য্যদিগের আসিবার পূর্ব্বে চীনদেরও এক প্রকার ভাষা ছিল। কিন্তু সে ভাষা যে কি তাহা আমরা স্থির করিয়া বলিতে পারি না। তবে পৃথিবীর প্রাচীনতম অধিবাসীদিগের যেরূপ নানাবিধ সাঙ্কেতিক ভাষা থাকে সেইরূপ কোন এক প্রকার ভাষা ছিল। সেই ভাষা নবাগত আর্য্যদিগের ভাষার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া একরূপ নূতন ভাষা সৃষ্ট হইয়া থাকিবে, অথবা দেবনাগরের ন্যায় তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট অক্ষরমালা ছিল না বলিয়া এবং তাহা ভাল বোধ হওয়াতে তাহাদের সেই ভাষা সেই অক্ষরে লিখিত হইত এবং আমাদের দেশের বঙ্গভাষার মধ্যে যেমন জেতৃগণের ভাষার অনেক কথা অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে সেইরূপ আর্য্য-দিগের ভাষার অনেক কথা তাহাদের নিজ ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে। যাহাইহউক, এ ক্ষেত্রেও কেহই জোন্সের মতের যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ করিতে পারিতেছেন না। আরও সেই দেবনাগর অক্ষর যদি ও কাল-সহকারে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পরেও

চীনদের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংশ্রব হওয়াতে অনেকটা বিকৃত হইয়া গিয়াছিল কিন্তু চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার কালীন ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ পুরোহিতগণ যখন চীনদেশে ধর্ম্মপ্রচারে ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনে সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন সেই সময়ে তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষাও প্রচলিত করিতে চেষ্টা করেন এবং অনেকটা সফলকর্ম্মাও হন। তাহাতে সেই দেবনাগর অক্ষর পুনঃসংস্কৃত হয় এবং সেই অক্ষরমালা কাঞ্জিয়র অভিধানে, দৃষ্ট হয়। * কিন্তু এক সময়ে সেই দেবনাগর অক্ষরও চীনদেশ হইতে উঠিয়াযায়। তখন হইতে চীনদের আধুনিক সাঙ্কেতিক অক্ষর পুনঃসংস্থাপিত হয়। যখন তাতারদেশীয়েরা চীনদেশ অধিকার করে সেই সময়ে সেই অসভ্য লোকদিগের ভাষা চীনের প্রচলিত ভাষার সঙ্গে অনেক মিশ্রিত হইয়াপড়ে এবং তাতারপুরুষেরা জেতা বলিয়া তাঁহাদের ভাষাও প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। সেইসময়ে দেবনাগর অক্ষরের প্রচলন একেবারে রহিত হইয়া যায়; বৌদ্ধদিগের সময়ে আবার পুনঃ সংস্থাপিত করিবার জন্য মহাত্মা কন্‌ফিউসস বিস্তর চেষ্টা পান, কিন্তু তত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কালক্রমে তাহাও বিলুপ্ত হয় এবং সাঙ্কেতিক ভাষা অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত করিয়া পরবর্ত্তী তাতারসম্রাটগণ সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচলিত করেন। চীনদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি অটল ভক্তিও তাহাদিগের আচার ব্যবহারে সমধিক আস্থাও তাহাদিগের ভারতবর্ষীয়চীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় চীনেরা স্বীয় আচার ব্যবহার সংরক্ষণ করিবে, আর্য্যদিগের আচার ব্যবহার অনুবর্ত্তন করিবেনা এইজন্যই তাহাদিগকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে হয়। সেইমানসিক ভাব তাহারা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষাকরিয়া আসিতেছে। বিদেশীয়দিগের প্রতি তাহাদের অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ভাবও আর একটী কারণ। তাহারা যখন ভারতবর্ষে ছিল আর্য্যদিগের আচারণে তাঁহাদের সেইভাব বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন যে চীনদিগের আকার ও গঠন দেখিলে তাহাদিগকে কখনই হিন্দুবলিয়া বোধহয়না। কিন্তু সেটী নিতান্ত ভ্রান্তিসঙ্কুল মত। কারণ ভারতবর্ষীয় আদিম অধিবাসিদিগের মধ্যে যাহারা অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাদিগকে দেখিলে তাহাদের সেভ্রম দূরীকৃত হইয়া যাইবে। সাঁন্তালবাসিদের মধ্যে যাহারা পর্ব্বোতোপরি এবং মনিপুর, আসাম ও ভুটান প্রভৃতি হিমালয় প্রদেশে বাস করে, তাহারা ভারতের আদিমঅধিবাসী। তাঁহাদিগের সঙ্গে চীনদের আকৃতিগত কোন প্রভেদই লক্ষিত হয় না।

শ্রীশৌরীন্দ্রঃ—

* Barrow's Travels in China.

আর্য্যগণের আয়ুর্ব্বেদ।

৫ম সংখ্যায় ২৪৪ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে আর্য্যদিগের আয়ুর্ব্বেদবিষয়ক যে সকল গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে সুশ্রুত ও চরকই অতি প্রাচীন কালের। এবং ইহাও প্রতিপন্ন করা গিয়াছে যে সুশ্রুত ও চরকের পূর্ব্বের কোন গ্রন্থের নামমাত্রও পাওয়া যায় না। সুতরাং আমরা অনুমান করিয়া লইতেছি, যে আয়ুর্ব্বেদের 'শল্য' ও 'কায়' এই দুই বিভাগের সুশ্রুত ও চরকই প্রথম লিখিত অথবা সংকলিত গ্রন্থদ্বয়; ইহাদের পূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল সমুদায়ই ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত; রীতিমত গ্রন্থ এই দুইখানিই প্রথম হইয়াছিল। যে সময় সুশ্রুত ও চরক লিখিত হইয়াছে, তখন ভারতবর্ষ সভ্যতার উচ্চতমসোপানে অধিরূঢ়। যেহেতু, উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে আহারদ্রব্য, পরিচ্ছদ ও নানাবিধ বিলাসসামগ্রীর বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা অসভ্যাবস্থা অথবা অর্দ্ধসভ্যাবস্থায় কখনই সম্ভবে না। যে সকল মাংসঘটিত এবং শাক-মূল-বীজঘটিত আহারসামগ্রীর পারিপাট্য আমরা ইদানীন্তন সভ্যজাতির মধ্যে দেখিতে পাই, উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ে তদনুরূপ বর্ণিত আছে। তৎকালে যদিও পরিস্রুত (Distilled) এবং নির্ম্মলীকৃত (Filtered) বারি ব্যবহারের কোন উপায় ছিল না, কিন্তু অভূমিপতিত আকাশবারিই শ্রেষ্ঠতম পানীয় বলিয়া ব্যবহৃত হইত। পান-ভোজনপাত্র স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, মণিময়, এবং কাংস্যময় ছিল, বাসগৃহ ও শয়নগৃহ, প্রশস্ত হর্ম্ম্য, এবং পর্য্যঙ্কে শয়ন। এক্ষণকার বিলাসিগণ আর ইহা অপেক্ষা বিলাসিতা কি দেখাইবেন? এইরূপে সভ্যতা ও সমাজের উন্নতির সহিত, কি আয়ুর্ব্বিদ্যা কি অন্যান্য শাস্ত্র সকলই উন্নত পদবীতে পদার্পণ করিয়াছিল। কিন্তু যেমন আবার সমাজের অবনতি ও সভ্যতার হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সকল বিষয়েরই অধঃপতন, আয়ুর্ব্বেদেরও অধঃপতন! এই নিমিত্তই আমরা ইতিপূর্ব্বে সুশ্রুত ও চরকের সময়কে আয়ুর্ব্বেদের প্রৌঢ়াবস্থা এবং তাহার পর হইতেই আয়ুর্ব্বেদের জীর্ণাবস্থার কল্পনা করিয়াছি। এবং এই নিমিত্তই এখন আক্ষেপ করিয়া বলিতেছি যে আর্য্য পিতামহগণ যেমন অন্যান্য অনেক বিষয়েরই সূত্রপাত করিয়া তাহার সবিশেষ উন্নতির বিষয়ে নিবৃত্তপ্রযত্ন ছিলেন আয়ুর্ব্বেদ বিষয়েও সেইরূপ। তাঁহাদের সুশ্রুত ও চরকই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির চরম সীমা। তৎপরে আয়ুর্ব্বেদ সম্পর্কে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তৎসমুদায়ই উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের প্রতিবিম্ব অথবা সংগ্রহ মাত্র! নূতন কথা কোন গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইতি পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, সুশ্রুত ও চরক অতি প্রাচীন কালের; কিন্তু কথায় বলিলেই তাহাদের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করা হইল না। প্রমাণ দ্বারা যদি তাহারা প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলেই সকলে তাঁহাতে শ্রদ্ধা করিবে।

আর্য্যদিগের অতি পুরাকালের কোন ঘটনা বিশেষের সময়াবধারণ করিতে হইলে, কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, কি দেশীয় কৃতবিদ্যগণ সকলেই বুদ্ধদেবের তিরোভাব কালকে অবধি করিয়া কাল নির্ণয় করিয়া থাকেন। আমিও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া—সুশ্রুত ও চরকের কাল নির্ণয় করিব; তদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। কারণ বৌদ্ধেরাই এ দেশে প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার ও ঘটনা বিশেষের যথাযথ বর্ণনা করিবার রীতির প্রথম প্রবর্ত্তক। যদিও বৌদ্ধদের গ্রন্থেও কল্পিত কথা অনেক দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি তন্মধ্যে সত্যের ভাগই অধিক। আর ইদানীন্তন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেক আয়াস ও যত্নের সহিত অনুসন্ধান করিয়া বুদ্ধের প্রকৃত কাল এক প্রকার স্থির করিয়াছেন; সুতরাং তাহা অবধি করিয়া এক্ষণে যদি আমরা কোন ব্যক্তির অথবা ঘটনার প্রকৃত সময় নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমাদের যত্ন (সম্পূর্ণরূপে না হউক) অনেকাংশে সফল হইবে সন্দেহ নাই।

সমালোচ্য গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে আমরা অগ্রে সুশ্রুতকেই বাছিয়া লইলাম। কেন অগ্রে সুশ্রুতের সমালোচনায় ব্রতী হইলাম তাহার বিশেষ কারণ কিছুই নাই, তবে এক এক বার মনে হয় বুঝি সুশ্রুত চরক অপেক্ষা প্রাচীন। যাহা হউক আমাদের এই অনুমান সত্য কি মিথ্যা—পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

প্রাচীন কালের কোন গ্রন্থবিশেষের সমালোচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের মনে সহজেই এই জিজ্ঞাসার উদয় হইয়া থাকে যে ইহার রচয়িতা কে, এবং কোন সময়েই বা ইহা রচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ আর্য্যদিগের অধিকাংশ গ্রন্থেরই প্রকৃত রচয়িতার ও সময়ের নির্ণয় করা অতি কঠিন। তন্মধ্যে আবার যে সকল গ্রন্থে * ষট্ সম্বাদ প্রভৃতির প্রথা আছে তাহার ত কথাই নাই। ইহার মূল কারণ কেবল গ্রন্থরচয়িতাদিগের আপন আপন গ্রন্থ সকল প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা; অন্য আর কিছুই নয়। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ সকলও উক্ত প্রণালীতে রচিত। এক জন বক্তা এক জন শ্রোতা, অন্য ব্যক্তি প্রতিসংস্কর্ত্তা, এই রূপে প্রকৃত রচয়িতা কে তাহা চিনিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে।

আমরা যে গ্রন্থখানির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি তাহার প্রথমাধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে, যে, দিবোদাস ধন্বন্তরি বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থানকালে

* যেমন পুরাণাদিতে।

সুশ্রুত প্রভৃতি কয়েকটী শিষ্যকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ দেন। শিষ্যগণ ধন্বন্তরির মুখে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শ্রবণ করিয়া—আপনারা এক এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। শিষ্যদিগের মধ্যে সুশ্রুতই প্রধান শিষ্য ছিলেন, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, সেই নিমিত্ত তাহা সর্ব্বত্র প্রচারিত ও আদৃত হইয়াছিল, এবং অদ্যাপিও তাহা বর্ত্তমান আছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা, যে, যে সুশ্রুত-নামক গ্রন্থ আমাদিগের সম্মুখে পতিত রহিয়াছে ও যাহার সমালোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা কি ধন্বন্তরিশিষ্য-সুশ্রুত-প্রণীত, অথবা অন্য কোন ব্যক্তি ইহার প্রণেতা? স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে অবশ্যই বোধ হইবে, যে ধন্বন্তরিশিষ্য সুশ্রুতই এই সুশ্রুতগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; এবং দেশীয় চিকিৎসকদিগেরও এই সংস্কার আছে যে সুশ্রুত গ্রন্থের রচয়িতা সুশ্রুত। কেবল দেশীয় চিকিৎসকগণের নহে, সুশ্রুতের এক জন টীকাকারেরও (চক্রপাণি দত্ত) ঐ সংস্কার ছিল। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে সুশ্রুতের আদ্যোপান্ত পাঠ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিলে অবশ্যই প্রতীতি হইবে যে, সুশ্রুতগ্রন্থ সুশ্রুতের রচিত নহে অন্য আর এক ব্যক্তির।

সুশ্রুতের অন্যতম টীকাকার ডল্বন তৎপূর্ব্বতন টীকাকার ও পঞ্জিকাকার জেজ্জট ও গয়দাস প্রভৃতির মত গ্রহণপূর্ব্বক বলেন যে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা নাগার্জ্জুন; তাহার প্রমাণ তিনি সুশ্রুতের মধ্য হইতেই বহিস্কৃত করিয়াছেন।

"বেদোৎপত্তি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব" সুশ্রুতের এই প্রথম প্রতিজ্ঞা সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে ডল্বন বলিতেছেন "ইহা কোন্ প্রকার সূত্র? সূত্র চতুর্ব্বিধ, যথা প্রতিসংস্কর্তৃসূত্র, * একীয়সূত্র, শিষ্যসূত্র এবং গুরুসূত্র; এই রূপে সূত্র অনেক প্রকার অতএব এইটী কাহার সূত্র? ইহাকে গুরুরই সূত্র বলাযাইতে পারে (১) গুরুএস্থলে ধন্বন্তরি। শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে কাহাকে গুরু, কাহাকে আচার্য্য, এবং কাহাকে আচার্য্যদেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা আছে যথা—ব্যাকরণ শাস্ত্রে ভর্ত্তিহরি পতঞ্জলিকে

* যে যে স্থলে অন্যের মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেই সেই স্থলে একীয় সূত্র যথা "লোহিতকপিলপাণ্ডুপীতনীলশুক্লেষু অবনীপ্রদেশেষু মধুরাম্ল লবণকটুতিক্তকষায়াণি যথাসংখ্যমুদকানি ভবন্তীত্যেকে ভাষন্তে। যেস্থানেশিষ্যমুখদ্বারা বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে তথায় শিষ্য সূত্র, যথা বায়োঃ * ০ * স্থানং কর্ম্মচ রোগাংশ্চ বদ মে বদতাম্বর!" যে স্থলে গুরু স্বয়ং বলিতেছেন, তথায় গুরুসূত্র যথা দেহে বিচরত স্তস্য লক্ষণানি নিবোধমে। সুশ্রুত।

(১) সুশ্রুত—অথাতো বেদোৎপত্তিং নামাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।—ডল্বন কতমৎ সূত্রমিদং। চতুর্ব্বিধানিহি সূত্রাণি ভবন্তি, তদ্যথা ঃ—

প্রতিসংস্কর্তৃসূত্রং, একীয়সূত্রং, শিষ্যসূত্রং, গুরুসূত্রং ইতি সূত্রামেকত্বাৎ কস্যেদং সূত্রমুচ্যতে গুরোরেবৈতৎ সূত্রং।

গুরুবলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২) এবং কৈয়ট কাত্যায়নকে আচার্য্য এবং পতঞ্জলিকে আচার্য্যদেশীয় বলিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহার মতে পানিনি ব্যাকরণশাস্ত্রের গুরু। এইরূপ মীমাংসা ও বেদান্ত শাস্ত্রের প্রবর্ত্তকেরাও গুরু ও আচার্য্য নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

ধন্বন্তরির উল্লিখিত প্রতিজ্ঞাসূত্র অবলম্বন করিয়া প্রতিসংস্কর্ত্তা "ভগবান ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে যাহা বলিয়াছেন" এই দ্বিতীয় সূত্র আরম্ভ করিতেছেন। ডল্লনের মতে "এই সূত্রটী প্রতিসংস্কর্ত্তৃসূত্র এবং যে যে স্থলে বিধেয়তা; অর্থাৎ অন্যের মত অবলম্বন করিরা বাক্য প্রয়োগ করা হইবে সেই সেই স্থলে প্রতিসংস্কর্ত্তৃসূত্র বুঝিতে হইবে এস্থলে প্রতিসংস্কর্ত্তা নাগার্জ্জুন"। (৩)

ডল্লন "বেদোৎপত্তি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব" এই প্রথম প্রতিজ্ঞাসূত্রকে গুরুসূত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যেরূপ গুরুসূত্রের স্থানান্তর দেখাইতেছেন যথা "দেহেবিচরতস্তস্যালক্ষণানিনিবধোমে" দেহে বিচরণশীল বায়ুরলক্ষণ অবগত হও" ইহা দ্বারা প্রথম প্রতিজ্ঞাসূত্র গুরুসূত্র কিরূপে হইতে পারে বরং তাহা প্রতিসংস্কর্ত্তৃ সূত্রই বোধ হইতেছে কারণ "বেদোৎপত্তি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব" এই প্রথম সূত্র তাহার পরের "ভগবান ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে যাহা বলিয়াছেন" এই দ্বিতীয় সূত্র একেরই বাক্য বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, আর যখন ডল্লন দ্বিতীয় সূত্রটীকে প্রতিসংস্কর্ত্তৃ সূত্র বলিতেছেন তখন প্রথম সূত্রটী কেন প্রতিসংস্কর্ত্তৃ সূত্র হইবে না তাহা বুঝিতে পারি না।

সুশ্রুতগ্রন্থের মধ্যে এমন ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে যদ্দ্বারা সুশ্রুতা-তিরিক্ত অন্য ব্যক্তি সুশ্রুতের কর্ত্তা অথবা প্রতিসংস্কর্ত্তা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে একটীমাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে; যথা—"ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ অমৃতের আকর ধন্বন্তরির চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া—সুশ্রুত—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন"।* এই বাক্যটী ধন্বন্তরির নহে, সুশ্রুতেরও নহে, এতদুভয়াতিরিক্ত তৃতীয় ব্যক্তির। সুতরাং যখন ধন্বন্তরি ও সুশ্রুত ভিন্ন অন্য এক ব্যক্তির বাক্য সুশ্রুত গ্রন্থের মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে তখন সুশ্রুতের প্রণেতা সুশ্রুত কিরূপে সংগত হইতে পারে। অতএব উল্লিখিত বাক্যদ্বারা

(২) কৃতেঽথ পাতঞ্জলিনা গুরুণা তীর্থদর্শিনা ইত্যাদি।

(৩) সুশ্রুত।

যথোবাচ ভগবান ধন্বন্তরিঃ সুশ্রুতায়—ডল্লন ইদং প্রতিসংস্কর্ত্তৃসূত্রং যত্র যত্র পরোক্ষে লিয়োগঃ তত্র তত্রৈব প্রতিসংস্কর্ত্তৃসূত্রং জ্ঞাতব্যং প্রতিসংস্কর্ত্তাপ্যত্র নাগার্জ্জুন এবং

* "ধন্বন্তরিং ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠমমৃতোদ্ভবং চরণাবুপসংগৃহ্য সুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি।" ইতি নিদানস্থান ১ অং ১ পৃ॥

একরূপ প্রতিপন্ন করা হইল যে সুশ্রুত গ্রন্থের প্রণেতা সুশ্রুত নহে। যদি সুশ্রুতের প্রণেতা সুশ্রুত না হইল তবে সে ব্যক্তি কে? ডল্বন বলিতেছেন নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা।

যদিও তিনি তর্ক দ্বারা সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা এক ব্যক্তি ছিলেন ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন, কিন্তু নাগার্জ্জুনই যে সেই প্রতিসংস্কর্ত্তা তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ দেখাইতেছেন না। ডল্বনের পূর্ব্বতন টীকা-কার জৈজ্জট ও গয়দাস প্রভৃতির লিখিত গ্রন্থ আমরা এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই; তাঁহারা নাগার্জ্জুনকে প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া কি রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহাও বলিতে পারিনা।

যাহাহউক যখন একজন প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক টীকাকার ডল্বন নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিতেছেন এবং নিম্নে উদ্ধৃত প্রমানান্তর দ্বারা নাগার্জ্জুন নামক এক ব্যক্তি চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে তখন নাগার্জ্জুনকেই আমরা সুশ্রুতের কর্ত্তা অথবা প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

রাজ-তরঙ্গিণী-কার কহ্লন বলেন "অভিমন্যুর সিংহাসনাধিরোহণের কিছু কাল পরেই কাশ্মীর দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার হয় এবং তাহার প্রচারক বোধিসত্ব নাগার্জ্জুন" * এবং বৃহৎ কথার রত্ন প্রভা-লম্বকের সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে নাগার্জ্জুন চিরায়ু রাজার মন্ত্রী ছিলেন; তিনি বোধিসত্ব বদান্য এবং অসাধারণগুণ-সম্পন্ন ছিলেন। এবং তাঁহার চিকিৎসা শাস্ত্রও রস শাস্ত্রে সবিশেষ জ্ঞান ছিল।

উল্লিখিত প্রমাণ-দ্বয়ের মধ্যে একটীতে নাগার্জ্জুনকে বোধিসত্ব এবং কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক, অপরটীতে তাঁহাকে বোধিসত্ব অথচ চিকিৎসাশাস্ত্রের একজন প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। সুতরাং যখন আমরা ডল্বনের গ্রন্থ ব্যতীত প্রাচীন গ্রন্থান্তরেও নাগার্জ্জুনকে চিকিৎসাশাস্ত্রিজ্ঞ বলিয়া অবগত হইতেছি তখন নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের কর্ত্তা অথবা প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে বোধ হয় কোন হানি হইতেছেনা।—

শ্রীব্রঃ—

*তস্মিন্নবসরে বৌদ্ধা অপিপ্রবলিতং যযুঃ। নাগার্জ্জুনেন সুধিয়া বোধিসত্বেন পালিতাঃ॥

বিজ্ঞাপন।

হইয়াছে তাহার মধ্যে এ খানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট না হউক, দুই এক খানি ব্যতীত ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটক এক খানি ও অদ্যাবধি বাহির হয় নাই। * * দুর্গাদাস বাবু পুস্তক খানি দ্বারা স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন যে যত্ন করিলে বাঙ্গালা ভাষাতেও উৎকৃষ্ট পুস্তক লেখা যায়।"

অমৃতবাজার পত্রিকা।

নাটককার পরলোক গত হইয়াছেন, বাঁচিয়া থাকিলে তিনি এক জন নিপুণ লেখক হইতে পারিতেন। উপস্থিত নাটক খানিতে তিনি যে কল্পনা শক্তি ও মানব চরিত্র বর্ণনে ক্ষমতা দেখাইয়াছেন তাহা প্রশংসা যোগ্য। শরৎ ও সরোজিনী, নাটকের নায়ক ও নায়িকা। পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া এই দুই জনের চিত্র সুন্দর রূপে অঙ্কিত হইয়াছে।—

সাপ্তাহিক সমাচার।

শরৎ-সরোজিনী গ্রন্থে আমরা অনেক স্থানে অশ্রুপাত করিয়াছি ও তজ্জন্য আমরা দুর্গাদাস বাবুর প্রেতাত্মাকে শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। * * সরোজিনী নাটকে ভুবনমোহিনীর মৃত্যুর দৃশ্যটিও সেইরূপ রুদ্র রসে চমৎকার। ভুবনমোহিনী নারীর সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব রত্ন হারাইয়া ছিলেন। কিন্তু নরাধমকে নাশ করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। যে দিন তিনি সেই পাপিষ্ঠ মতিলালকে স্বহস্তে কিরীচাঘাতে যম সদনে প্রেরণ করিয়া, ক্ষিপ্ত ভাবে খল খল হাস্য করিতে করিতে কাঁপিতে কাঁপিতে "হা! হা! হা! কি মজা! আর এক মজা দেখ সকলে" বলিয়া সেই শত্রুঘাতী কীরীচ স্বীয় হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন, তখন তাঁহার অধঃপতনের কথা স্মরণ করিলে, শোক হয়, পাপিষ্ঠের উপর ঘৃণা হয়, রাগ হয়; ভুবনমোহিনীর প্রতি বিধিৎসা বৃত্তি চরিতার্থ হইল দেখিয়া পরিতৃপ্ত হয়, পাপিষ্ঠের দুর্দ্দশা দেখিয়া ভয় হয়, ভুবনের প্রতি কিছু ভক্তি হয়!

এরূপ রস উদ্ভাবনাতে নাটককারের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সরোজিনী গ্রন্থে এরূপ রসোদ্ভেদ মধ্যে মধ্যে আছে দুর্গাদাস বাবু পরলোকগত না হইলে, আমরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার নাটক লিখিতে অনুরোধ করিতাম। সরোজিনী তাঁহার প্রথম কন্যা বঙ্গীয় নাটকের অন্ধকার মধ্যে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে বলিতে হইবে। সাধারণী।

আমরা এই নাটকখানি কৌতুহলের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। * * ইহা যে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক তাহা আমরা স্বীকার করি। গল্প রচনা চিত্তরঞ্জক হইয়াছে। নাট্যোল্লিখিত প্রধান পাত্রগণ শরৎ, মতিলাল ও সরোজিনীর চরিত্র সুন্দর রূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথা স্থলে করুণা, হাস্য, ও বীর রস উদ্দীপিত হইয়াছে। গ্রন্থকার অনেক গুলি ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।—

হাবড়া হিতকরী।

এখানি যে এক খানি উচ্চ দরের

সন ১২৮১ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

পৌষ ও মাঘ।

শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ২৲
" প্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সরদহ ৩।৵০
" বিনদীলাল চৌধুরী, ভগীরথপুর ৩।৵০
" নীলকান্ত চৌধুরী, কাশীমপুর ৵১০
" শ্রীশচন্দ্র দত্ত, গড়বেতা ৸৶০
" উমেশচন্দ্র গুপ্ত, শাটিঘর ৩।৵০
" সনাতন দাস, কলিকাতা ১৲
" রজনীকান্ত ঘোষ, নড়াল ৩।৵০
" দুর্গানারায়ণ চৌধুরী ঐ ১৸৶০
" হডুনাথ সিংহ, উকিল হাওড়া ৩৲
" দুর্গামোহন দাস, কলিকাতা ৩৲
" গুরুপ্রসন্ন রায়, দিনাজপুর ৵০
" সাধারণ পুস্তকালয়, ডাহাপাড়া ৩।/০
" ললিতমাধব সরকার, জগত-বল্লভপুর ১৵০
" নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ১॥০
" কিরণচন্দ্র বন্দ্যোয়পাধ্যায়, ঐ ৩৲
" কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, গাইবান্ধা ৶০
" বিহারিলাল, বসু, কলিকাতা ১৲
" প্রিয়নাথ সেন, কলিকাতা ১৲
" নিধিকৃষ্ণ বসু, ঐ ৩৲
রামচরণ ঘোষ, কলিকাতা ১৸০
অন্নদাপ্রসাদ বসু, ঐ ১॥৵০

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র তর্কালঙ্কার, শ্রীধরপুর ৩।৵০
" ঈশ্বরচন্দ্র পাড়ে, কারাগোলা ৩।৵০
" গোলোকচন্দ্র রায়. নোহাখালী ।০
" ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, কলিকাতা ১৲
" প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপুর ১॥০
" ক্ষেত্রনাথ সরকার, আমলাতোড় ৩৲
" কৃষ্ণকুমার সেন, নর্গা ৪৲
" সাগর মিত্র, কলিকাতা ৩৲
" রাখালদাস সরকার, পুরুলীয়া ৩।৵০
" প্রেমচাঁদ সাহা. পাবনা ২।/০
" বিহারিলাল বসু, কলিকাতা ১৲
রাজমোহন রায় চৌধুরি টাকী ৩।৵০
" দ্বারকানাথ বাগচি, জামালপুর ১।৵০
" পরমেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, কুচবেহার ২৲
" পঞ্চানন লাহিড়ি, ময়মনসিহ ৩৶০
" অন্নদাপ্রসাদ রায়, জমিদার কাশীমবাজার ৩।৵০
" মহিমচন্দ্র ঘোষ, ইসলামপুর ৩।৵০
" নগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, কলিকাতা ৸০
" ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ৩৲
" কালীনাথ সেন, কলিকাতা ৩৲
" নীলমনি চৌধুরি, মথুরা ৩।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসাদ সিংহ,
পূর্ব্বধলা ৩।০

„ তবজেল হুসেন, সুন্দরপুর ১৲
„ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
কাশীপুর ।/০
„ বিহারীলাল ঘোষ, কলিকাতা ১৲
মুন্সি আবদার রোজাক; পলশা, ৫৲
বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগর
নিবাধই দত্তপুকুর ১৲
„ যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরি, কলিকাতা ১৲
„ প্রতাপচন্দ্র বসু, ঢাকা ৩।৵০
„ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, কলিকাতা ২৲
„ রজনীকান্ত দাস গুপ্ত, কমিল্লা ৩।৵০
„ ইন্দীবর বড়ুয়া, শিবসাগর ।/০
„ মহেশচন্দ্র ঘোষ, বেলেডাঙ্গা ২৲
„ যোগেন্দ্রনাথ রায়, বেহালা /১০
„ উমেশচন্দ্র গুপ্ত, কলিকাতা ৩৲
„ কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, মুন্সীগঞ্জ ৫৲
„ বিপীনবিহারি গুপ্ত, কলিকাতা ৩৲
„ সোমনাথ ডেকাবরা, গৌহাটী ৪৸৵১
„ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
ভবানীপুর ১৸৶০
„ অখিলচন্দ্র সেন, কলিকাতা ৩৲
„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, ঐ ১॥০
„ সুরেশচন্দ্র দত্ত, ঐ ১৲
„ সেতারুদ্দীন মহাম্মদ,
বোদাচন্দনবাড়ি ৩৲

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার ভট্টাচার্য্য,
রঙ্গপুর ৫৲
„ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার গাইবান্ধা ১।৵১০
„ দ্বারকানাথ রায়, শোয়নি ৩৶০
„ চন্দ্রকুমার রায়, লালবাজার ৩॥০
„ কৃষ্ণচন্দ্র দাস, দিনহাটা ৩।৵০
„ বিনোদবিহারি চৌধুরি,
বারুইপুর ৪৸৵০
„ ক্ষেত্রনাথ সরকার,
আমলাজোড়া ৵০
„ মহিমাচন্দ্র মজুমদার, রঙ্গপুর ৫৲
„ যদুনাথ শর্ম্মা, শিবসাগর ৫৲
„ শেরসমসেরআলী, নওগাঁ ৩।৵০
„ হরলাল রায়, কলিকাতা ৩৲
„ রসিকনাথ দত্ত, বাটাজোড় ৩৲
„ অন্নদানন্দন সেন, আতকান্দি /০
„ উমাচরণ মণ্ডল রামজীবনপুর ৩৲
„ নগেন্দ্রনাথ মল্লিক আঁদুল ৩৲
„ দীনবন্ধু রায় বালীগঞ্জ ৶০
„ কালীদাস চট্টোপাধ্যায় খুলনা ২৶০
„ কুমার তারেশচন্দ্র পাঁড়ে
পাকুড় ৩।৵০
„ শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইটা ৩৸৵০
„ প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা ।০

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা।

বহুবাজার ষ্ট্রীট ৯২নং।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

গরমীর পীড়া, বহুমূত্র, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্রব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীরের শীর্ণতা জীর্ণতা জন্য ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় স্মরণশক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফুর্ত্তি-বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে। সেবন করিলে স্ফুর্ত্তিবিহীন মন ও শরীর স্ফুর্ত্তিযুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

ইহার মূল্য ডাকমাস্থল ইত্যাদি সহিত ৫৲ টাকা। নাম ধাম প্রকাশ হইবার কোন আশঙ্কা নাই। পীড়ার অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা পাইলেই ঔষধ পাঠান যাইতে পারে।

হেয়ার প্রিজারভার।

নিয়ম মত কিছুদিন ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদিগের আর শুক্রবর্ণ চুল থাকিবে না। চুল ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্ম প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।
ডাকমাস্থল ইত্যাদি ॥৵০

হিমসাগর তৈল।

অতিশয় অধ্যয়ন ও মানসিক চিন্তা জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতার পক্ষেও বায়ুপ্রধান ধাতুর পক্ষে ইহা অতীব উপকারী।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা
ডাক মাশুল ইত্যাদি,, ,, ॥৵০ আনা।

অর্শরোগের মহৌষধ।

মূল্য প্রতি শিশি ডাকমাস্থল সহিত ৫৲

কুষ্ঠরোগের তৈল।

মূল্য প্রতি শিশি ডাকমাশুল সহিত ৫৲

কুষ্ঠরোগের ঔষধ।

মূল্য প্রতি ৪ ছটাক শিশির ২৲
ডাকমাস্থল ইত্যাদি ৸০

সুবিখ্যাত ভারতবর্ষীয় মঞ্জন।

(Tooth powder)

ইহা শিথিল দন্ত শক্ত করে, দন্তের বেদনা নিবারণ করে, মুখের দুর্গন্ধ, ক্ষুদ্র ঘা, রক্ত ও পূজপড়া নিবারণ করে এবং দন্ত পরিষ্কার করে। ইহা ব্যবহারে দন্তের উপর কোন প্রকার দাগ হয় না বা দন্ত কাল হয় না।

মূল্য প্রতি ডিবে ।০
ডাকমাস্থল ইত্যাদি প্রতি ৪ ডিবে ।/০

কলিকাতা ৯২ নং বহুবাজারে পাওয়া যাইবেক।

বিজ্ঞাপন।

শরৎ-সরোজিনী নাটক।

মূল্য ১৷৴০ ডাকমাসুল ৵০।

১নং মৃজাপুর নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে, নিমুখানসামার গলি ২৪নং ভবনে ও প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য।

আমরা এই নাটক খানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। * * নাটকের অনেক গুণ ইহাতে আছে। ইহা দ্বারা দুর্গাদাস বাবুর কল্পনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক স্থলে উত্তম উত্তম ভাব আছে। ভাষাও অধিকাংশ স্থলে উত্তম। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের চরিত্রও আদ্যন্ত রক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং বহুগুণে এখানি উত্তম নাটক। * * মধ্যে মধ্যে যে সব দোষ আছে তাহা সামান্য। নাটক রচনাতে ইঁহার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। ইনি বাঁচিয়া থাকিলে আরো দুই এক খানি পুস্তক লিখিয়া বঙ্গভাষাকে পরিপুষ্ট করিতে পারিতেন। মধ্যস্থ। (সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু "রামাভিষেক" "প্রণয় পরীক্ষা" ইত্যাদি নাটকের রচয়িতা)।

ইহাতে যেমন সময়ের চিত্র আছে, তেমন যে সকল ভাবের কালে বিলয় নাই, সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তে পরিবর্ত্তন নাই, রুচির স্বাস্থ্য ও বিকারের সহিত সম্বন্ধ নাই, মধ্যে মধ্যে তাহারও দুই একটি অতি সুন্দর প্রতিমা মেঘাবৃত জ্যোৎস্নার ন্যায় শোভা পাইতেছে। * * ইহার রচয়িতা বাস্তব জীবিত কি মৃত তাহা আমরা বুঝিলাম না। কিন্তু তিনি জীবিত আর মৃত যাহাই হউন তাঁহাকে আমরা নিপুণ কারুকর বলি। বাঙ্গালির মধ্যে অনেক লোক লেখনী লইয়া এইরূপ চিক্কণ কারুকার্য্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। শরৎ-সরোজিনীকে নিন্দাই কর, আর প্রশংসাই কর, ইহাকে পড়িতে হইবে। ইহার আদি হইতে অন্ত সমস্তই কৌতুহলোদ্দীপক। আরম্ভ করিয়াছ, কি ঠেকিয়াছ। কোন মতেই নিঃশেষ না করিয়া থাকিতেপারিবে না। আনুপূর্ব্বিক সমতার সহিত চরিত্রের বৈচিত্র্য রক্ষা নাটক ও উপন্যাসের এক প্রধান গুণ। ইহাতে সেই গুণ বহুল পরিমাণে লক্ষিত হইল। ঐ সরোজিনী, এই সুকুমারী। দুইটিই অতি কমনীয় প্রকৃতি। কবি দুটিকেই সমান আদরে, সমান আভরণে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তথাপি, স্থির চক্ষে চাহিয়া দেখ, এটির সহিত ওটি কখনও কোন অংশে মিশিয়া যায় না। সরোজিনী ফুল্ল কমলিনী; সুকুমারী লাবণ্যলজ্জিত প্রভাত-শিশির-সিক্ত গোলাপ। সরোজিনী মুকুর-প্রতিভাত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ঝলমল করে, সুকুমারীর আলোক নীলোপল-প্রতিফলিত চন্দ্রিকার ন্যায় অতি মৃদু মৃদু বিলসিত হয় হয়। * * মতিলালের ছবিটি ঠিক হইয়াছে। এইরূপ পুরুষ সংসারে নিতান্ত বিরল নহে। শিক্ষা ও সতেজ বুদ্ধির সহিত নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নিতান্ত পাশব স্বভাবের মিশ্রণ হইলেই এইরূপ ফল

বিজ্ঞাপন।

ফলে। ফ্রান্সের মেরাট ও মোরাবো প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল;—নিরাশ, নির্ম্মম, বিষাদপূর্ণ, ভয়ঙ্কর! * * 'যে সকল সামান্য দোষ আছে, আমরা তাহা গণনায় আনিলাম না। যে গ্রন্থের গুণ-রাশি উপরে ভাসে, আর দোষ গুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, সে গ্রন্থকে আমরা কথনই নিন্দা করিতে পারি না। * * বঙ্গভাষায় 'প্রতিবৎসর এইরূপ এক খানি নাটক প্রকটিত হইলে, আমরা যার পর নাই সৌভাগ্য বিবেচনা করিব। বান্ধব। (ঢাকা—সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ "নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব" ইত্যাদি পুস্তকের রচয়িতা)।

বঙ্গকাব্যোদ্যানে নাটকের ছড়াছড়ি দর্শনে আমাদের ন্যায় সাধারণেরই বোধ হয় এইরূপ মত হইয়াছে যে রসভাব-বিহীন নাটকের সংখ্যা যতই অল্প হয় ততই বঙ্গীয় যুবকগণের মঙ্গল। এদেশীয় যুবকগণ মধুপান করিতে যাইয়া যদি বিষপানে হতাশ হন তাহা হইলে আর এরূপ পয়োমুখ বিষপূর্ণ নাটকের প্রয়োজন কি? আজি কালি আবার ঐরূপ নাটকের সংখ্যাই অধিক। সে যাহা হউক শরৎসরোজিনীকে আমরা সেরূপ চক্ষে দেখিতেছি না। এতৎ পাঠে প্রীতি জন্মে। বিন্দুবাসিনীর অকৃত্রিম সতীত্ব দর্শনে তৎপ্রতি বাস্তবই ভক্তি হয়—মতিলালের অসচ্চরিত্রতা এবং ভুবনমোহিনীর চরিত্র সন্দর্শনে ভুবনমোহিনীর নিষ্ঠুরতাকেও প্রশংসা করিতে হয়। * * নাটক খানি বঙ্গভাষার নাটকসংসারে রত্নস্বরূপ হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের বিজ্ঞাপন পাঠে অবগতি হইল গ্রন্থকার মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। * * জীবিত থাকিলে তাঁহা হইতে বঙ্গ-কাব্যোদ্যানের আরও শোভা সন্দর্শন করিতে পারিতাম।—ঢাকা প্রকাশ।

পারিজাত হরণ

বা

দেব দুর্গতি—

নাট্যরাসক।

মূল্য ৷৷০ আনা।

বাগবাজার সিতাকান্ত বসুর ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

পলাসির যুদ্ধ,

নূতন মহাকাব্য মূল্য ১৲

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত।

আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে ও নং ১ মির্জাপুর ষ্ট্রীট নূতন ভারতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

অবকাশ রঞ্জিনী।

(অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ) মূল্য ১৲

সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও ক্যানিং লাইব্রেরি কলেজষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

সৃষ্টি ও প্রলয়।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বিষয়ে যত মত প্রচলিত আছে; তৎসমস্ত পাঁচটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম মত এই—যেমন কুম্ভকার ঘটের তেমনি, ঈশ্বর বিশ্বের নির্ম্মাণকর্ত্তা; তিনি চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র, পৃথিবী প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে নানা নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সূর্য্য গ্রহণ হইতে পতঙ্গক্রীড়া পর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতেছে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপ এই মতের অনুসরণ করেন; ভারতীয় পুরাণাদিও ইহার পক্ষপাতী। কিন্তু ইহাতে একটি আপত্তি আছে। কুম্ভকারের সহিত ঈশ্বরের সাদৃশ্য হইতে পারে না। কারণ সে মৃত্তিকা না পাইলে ঘট নির্ম্মাণ করিতে পারে না; সে ঘটের নিমিত্ত কারণ মাত্র; উহার উপাদান কারণ মৃত্তিকা। এখন প্রশ্ন হইতেছে জগতের উপাদান কারণ কে? কোন বস্তু বিনা উপাদানে (Material cause) উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব বাইবলে যে বলে, ঈশ্বরের আদেশানুসারে স্বতই আলোকাদির সৃষ্টি হইল এবং পুরাণে যে উল্লিখিত আছে, পরব্রহ্মের অনুধ্যানমাত্র জল প্রভৃতি উদ্ভূত হইল, তাহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? এ আপত্তি অপরিহার্য্য। বেদান্ত দর্শন ইহার খণ্ডনার্থ, দ্বিতীয় মত প্রকাশ করেন। তাহার সারার্থ এই—পরমাত্মা জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ নহেন; তিনি ইহার উপাদান কারণও বটেন। কুম্ভকার যেমন ঘট নির্ম্মাণ করে, তিনি তেমনি এই বিশ্বের রচনা করিয়াছেন; পরন্তু ইহার উপাদানও নিজ স্বরূপ হইতে প্রাদুর্ভূত করিয়াছেন। অর্থাৎ পরমাত্মা এই বিশ্বরূপ ঘটের কুম্ভকার ও মৃত্তিকা উভয়ই।

বেদান্তের এই সিদ্ধান্তও পরিষ্কার নহে। যেহেতু জগৎ ও জগৎকর্ত্তা যদি এক ও অভিন্ন, তবে সংসারে এত বৈষম্য দৃষ্ট হয় কেন? জ্ঞানাজ্ঞান, হিতাহিত, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ ইত্যাকার বিরুদ্ধ বিষয় সকলের কিরূপে সমাধান হইতে পারে? পরন্তু এই সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্ম যখন জগতে দেদীপ্যমান দেখা যাইতেছে, তখন জগতের উপাদান পরব্রহ্মে না থাকিবার কারণ কি? এই আপত্তির পরিহারার্থ বৈদান্তিকেরা মায়ার কল্পনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, মায়ার প্রভাবেই জগৎকে ঈশ্বর হইতে পৃথক বোধ হয় এবং সুখ দুঃখাদি বৈষম্যের ভ্রম জন্মে।

তত্ত্বজ্ঞান-বলে সেই মায়ার অপগম হই-

লেই তাদৃশ ভ্রম তিরোহিত হইয়া যায়। কিন্তু এখন কথা হইতেছে যে, মায়া পরমাত্মা হইতে পৃথক কি না? যদি পৃথক বল; তাহা হইলে, উহার উৎপত্তি বিনা উপাদানে ঘটিয়া উঠে। আর যদি মায়া ও পরমাত্মা একই পদার্থ বল, তবে এই আপত্তি হইতে পারে যে, নিত্য-জ্ঞানময় পরব্রহ্ম হইতে অবিদ্যা-স্বরূপ মায়ার কিরূপে উদ্ভব হওয়া সম্ভবে।

বেদান্তদর্শনের উক্ত দোষ দর্শন করিয়া নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, ঈশ্বর শূন্য হইতে জগতের সৃষ্টি করেন নাই বটে; কিন্তু তিনি ইহার কেবল নিমিত্ত কারণ; উপাদান কারণ নহেন। জগতের উপাদান কারণ পরমাণু। যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা লইয়া, ঘট প্রস্তুত করে, তদ্রূপ ঈশ্বর পরমাণু লইয়া বিশ্ব রচনা করেন। পরমাণু ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী। ঈশ্বর একটি পরমাণুরও সৃষ্টি করিতে পারেন না। কেবল পরমাণু পুঞ্জের সংশ্লেষ ও সমাধান করিয়া, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। ন্যায়ের মত তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে ও আপত্তি আছে; কারণ ঈশ্বর যদি সৃষ্টি বিষয়ে স্বতন্ত্র হইলেন না, পরমাণুর অধীন হইলেন; তবে বিশ্বরাজ্যের শাসন বিষয়েও তাঁহার স্বাতন্ত্র্য নাই এরূপ আপত্তি হইতে পারে। যাঁহার শক্তি একস্থলে সঙ্কুচিত হইল; তাঁহার শক্তি অন্যান্য স্থলে নিয়ত অব্যাহত থাকিবেক কেন?

সাঙ্খ্যেরা চতুর্থ মত প্রকটন করেন। তাঁহারা বলেন জগতের নিমিত্তকারণ নাই। প্রকৃতিই (Nature) উহার উপাদান কারণ। প্রকৃতির নানা পরিবর্ত্তনে ক্রমে পাঁচ প্রকার সূক্ষ্ম তন্মাত্র (পরমাণু) জন্মে; তাহা হইতে পঞ্চমহাভূত; তাহা হইতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্বের উদ্ভব হয়। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণের আধার। সুতরাং প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত পদার্থে ঐ তিন গুণের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ থাকাতে, জগতে এত বৈষম্য ও বিচিত্রতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বিশ্বসংসারের যাবতীয় কার্য্য প্রকৃতি হইতে সম্পাদিত হয়। চেতনরূপী পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা তৎসমুদায়ের ফল ভোগ করেন, পুরুষ নিজে ক্রিয়াশূন্য; তবে যে তাঁহাকে ও ক্রিয়াবান্ বলিয়া বোধ হয়, সে কেবল প্রকৃতির ক্রিয়া দ্বারা। যেমন সন্নিহিত গোলাপ ফুলের আভায় স্ফটিকমণিকে রক্তবর্ণ দেখায়; তদ্রূপ উহা ভ্রমকল্পিতমাত্র। সাঙ্খ্যমতে উপরি উক্ত মতত্রয়ের আপত্তি গুলি নিরস্ত হইতেছে। সাঙ্খ্যেরা খৃষ্টান্ ও পৌরাণিকাদিগের মত বিনাউপাদানে জগতের সৃষ্টি মানেন না; কারণ প্রকৃতিই ইহার উপাদান। তাঁহারা বৈদান্তিকের ন্যায় সুখ দুঃখাদিবৈষম্যকে ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দেন না। আদি কারণ প্রকৃতি ও তৎকার্য্য জগৎ উভয়েতেই উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বেদান্তমতে পরমাত্মাতে সুখদুঃখাদির

সত্ত্বা মানিলে, তাঁহার ঈশ্বরত্বের ব্যাঘাত জন্মে। সাঙ্খ্যেরা নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় আদি-কারণকে, পরমাণুর পরতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু উহাকে পরমাণুর ও উৎপাদক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। অতএব তাঁহাদিগের মতে কোন স্থলেই, আদি-কারণ প্রকৃতির সর্ব্বশক্তির মত্তার সঙ্কোচ নাই। সাঙ্খ্যেরা নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু চার্ব্বাকের ন্যায় আত্মাকে জড়পদার্থ হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না এবং দেহের পতনে সকল শেষ হইল এ কথা বলেন না। তাঁহারা পরকাল, পাপ-পুণ্য, ও আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করেন এবং ইহাও বলেন যে, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-বলে নানা জন্মের পর পরিণামে মোক্ষপ্রাপ্ত হইতে পারে; অর্থাৎ জন্ম, জরা মরণাদি স্বরূপ সংসারের ক্লেশপরম্পরা হইতে জীবের মুক্তিলাভ হইতে পারে।

পঞ্চম মত ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা প্রকটন করিয়াছেন। ইহা এখনও সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। তথাপি ইহার প্রতিপোষক এত অনুকূল তর্ক আছে এবং এতদ্দ্বারা বিশ্বসংসারের কার্য্যপরম্পরার এরূপ সামঞ্জস্য হইতেছে, যে অনেকানেক উচ্চ শ্রেণীর তত্ত্বজ্ঞানীরা এই মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন। তথাপি ইহাকে আপাততঃ স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে ইহার অনুকূলে এতদূর পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে যত মত প্রকটিত হইয়াছে, তৎসমস্ত অপেক্ষা ইহাতে কল্পনার অনেক অল্প সংস্রব দৃষ্ট হয়। অনেকে এরূপ আশা করেন যে, ভবিষ্যতে মনুষ্য জাতির বিদ্যাবুদ্ধির যত উন্নত অবস্থা হইবেক, ততই ইহার দৃঢ়ীকরণার্থ প্রমাণ প্রয়োগ লব্ধ হইতে থাকিবেক।

পঞ্চম মতের সারার্থ এই। আদৌ নভোমণ্ডল কেবল পরমাণু রাশিতে ব্যাপ্ত ছিল। পরমাণুর দুই শক্তি আছে, আকর্ষণ ও অপসারণ। আকর্ষণ শক্তি দ্বারা পরমাণু সকল পরস্পরকে ক্রমশঃ সংশ্লিষ্ট করে, আর অপসারণ শক্তি অনুসারে তাহারা পরস্পর ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে। এই বিশ্বসংসারে উক্ত দুই শক্তির আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য আছে। কোথায় অপসারণশক্তির আধিক্যবশতঃ পরমাণু রাশি ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইয়া প্রলয় উপস্থিত করিতেছে; কোথায়ওবা আকর্ষণশক্তির আতিশয্য নিবন্ধন পরমাণুরাশি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। এই অনন্ত নভোমণ্ডলে যে অসংখ্য নক্ষত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহার এক একটি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র স্বরূপ এবং গ্রহ উপগ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক সমূহে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। আকর্ষণশক্তির প্রভাবে সকলেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, এবং আরও অনেকের প্রাদুর্ভাব হইবেক। পক্ষান্তরে, অপসারণ শক্তির প্রভাবে ক্রমে ক্রমে এক একটির বিলয় হইতেছে

এবং আরও অনেকের বিলয় হইবেক।

এখন আমাদের আবাসভূত এই ব্রহ্মাণ্ড বা সৌর জগতের কিরূপে প্রাদুর্ভাব হইল, তাহার বিবরণ করা যাউক্। আদৌ এই সৌর জগতের অন্তরালভাগ পরমাণু রাশিতে ব্যাপ্ত ছিল। আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পরমাণু সকল কেন্দ্রাভিমুখে যেমন ক্রমশঃ চালিত হইতে লাগিল, তেমনি অপসারণ শক্তি দ্বারা তৎ সমস্ত কেন্দ্র হইতে বিদূরিত হইতে লাগিল। সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে, গণিতের নিয়ম অনুসারে এই দুই বিরুদ্ধ গতি নিরন্তর প্রতিহত হইয়া চক্রাকার ভ্রমণ রূপে পরিণত হইবেক। কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আকর্ষণশক্তি অপেক্ষা অপসারণ শক্তির প্রভাব অল্প হইতে ছিল। সুতরাং পরমাণুপুঞ্জ ঘুরিতে ঘুরিতে কেন্দ্রের দিগেই অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া ঘনীভাব ধারণ করিতে লাগিল। পরমাণু রাশি, এই প্রকার চক্রাকার গতি ও ঘনীভাব প্রযুক্ত একটি প্রকাণ্ড অঙ্গুরীয়ের আকার প্রাপ্ত হইল। এই প্রকাণ্ড অঙ্গুরীয়ের সকল স্থানে সমান বেগ ও সংযোগের সমান দার্ঢ্য সম্ভবে না। সুতরাং যে যে স্থানে বেগ অধিক ও সংযোগ কম দৃঢ়; তথাহইতে এক এক খণ্ড বিশ্লিষ্ট হইয়া দূরে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ইহা নিশ্চিত যে, এই সকল বিক্ষিপ্ত খণ্ড, গণিতের নিয়ম অনুসারে সেই অঙ্গুরীয়ের চতুর্দ্দিগে ঘুরিতে থাকিবেক। এবং ইহাও সম্ভব যে, সেই সকল বিক্ষিপ্ত পরমাণুরাশি হইতে আবার পূর্ব্বোক্ত কারণে এক বা ততোধিক খণ্ড পৃথক্‌ভূত হইয়া, তাহাদের চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিতে থাকিবেক। এখন প্রকাশ পাইতেছে যে, এই প্রকাণ্ড অঙ্গুরীয় সৌর জগতের কেন্দ্র স্বরূপ সূর্য্য; ইহা হইতে বিক্ষিপ্ত খণ্ড সকল এক একটি গ্রহ; এবং সেই সকল প্রাথমিক বিক্ষিপ্ত খণ্ড হইতে নিষ্কাশিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড গুলি উপগ্রহ রূপে গ্রহগণের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

পদার্থবিদ্যার এই সাধারণ নিয়ম যে, বস্তু সকল যত ঘনীভূত হয়, তাহা হইতে ততই তাপ নির্গম হয়। যেমন বাষ্প হইতে জল, জল হইতে বরফ ইত্যাদি। সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি যত ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই উহা হইতে তাপ নিষ্কাশিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। আমাদের আবাসভূত এই পৃথিবী প্রথমে বাষ্পময়ী ছিলেন পরে ক্রমশঃ তাপহীনা হইয়া জলময়ী হইলেন। সন্ধ্যার মার্জনে যে প্রথমে সমুদ্রের উদ্ভব কথিত আছে, মনুতে যে জলের প্রথম, সৃষ্টি কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং পুরাণে যে জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার বর্ণিত আছে, তাহা কল্পনাবিজৃম্ভিত সন্দেহ নাই। কারণ তাদৃশ প্রাচীনকালে উপরিউক্ত সাধারণ নিয়ম পরিজ্ঞাত থাকিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে যে, প্রাচীন ভারতের

কল্পনা বিজ্ঞানের এতদূর কাছাকাছি উঠিতে পারিয়াছিল।

ভূমণ্ডল যখন কেবল জলময়, তখনও ইহাতে এত তাপ ছিল যে কোনমতে জন্তুর বাসযোগ্য হইতে পারে নাই। উত্তরোত্তর তাপের অপগম হওয়াতে, পৃথিবীর উপরিভাগস্থ জল ঘনীভূত হইয়া কঠিন আবরণ রূপে পরিণত হইল। কিন্তু উহা প্রথমতঃ এত পাতলা ছিল, যে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত জলতরঙ্গের প্রতিঘাতে নিরন্তর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। তাহাতেই পৃথিবীর উপরিভাগ বিষম ও বন্ধুর হইতে লাগিল। সেই কঠিন আবরণ যেমন শীতল হইতে লাগিল, অমনি উপরিস্থিত বায়ুর অন্তর্গত বাষ্প সকল, জলাকারে পরিণত হইয়া তাহার উপর বৃষ্টিরূপে পতিত হইতে লাগিল। সেই জল ছোট বড় গর্ত্তে জমা হইল। এইরূপে ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত, উৎস, নদী, হ্রদ সাগর, দ্বীপ প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। ভূমণ্ডলের উপরিস্থ আবরণ ক্রমে আরও শীতল এবং আরও স্থূল হইতে লাগিল, তাহাতে মহাদ্বীপ, মহাসাগর, বড় বড় হ্রদ, পর্ব্বত নদী প্রাদুর্ভূত হইতে আরম্ভ হইল। অধুনা সেই কঠিন আবরণের বেধ কতিপয় মাইল হইবেক; তথাপি পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তপ্ত জলরাশির বিলোড়ন সময়ে সময়ে ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর স্থান সকল সূর্য্যের কিরণে সমানরূপে উত্তপ্ত হয় না তাহাতেই ভিন্ন ভিন্ন ঋতু ও সংস্থান অনুসারে দেশভেদে আবহাওয়ার তারতম্য দেখা যায়। ভূমণ্ডলে প্রথমে উদ্ভিদের উদ্ভব হইয়াছিল। সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপেই তাহাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়; উদ্ভিজ্জগণ নির্জ্জীব হইলে আবার সেই সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ নিবন্ধন শুকাইয়া, পচিয়া এবং মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া নানা খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। জন্তুর মধ্যে মৎস্য পৃথিবীর প্রথম অধিবাসী, তাহার পর সরীসৃপ, তাহার পর পশু পক্ষী, সর্ব্বশেষে মনুষ্য উদ্ভূত হয়।

আমরা পঞ্চম মতটি অপেক্ষাকৃত সবিস্তারে বর্ণন করিলাম। কিন্তু ইহার যথোচিত ব্যাখ্যা করিতে হইলে বিজ্ঞান ও গণিতঘটিত এত দুরূহ বিষয়ের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে যে, তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসম্ভব। ইংরাজি ভাষাতে ইহাকে "Nebulous hypothesis" বলে; বাঙ্গালা ভাষায় "বিজ্ঞান বাদ" নামে ইহার নামকরণ করা যাইতে পারে। এই বিজ্ঞানবাদ মূল অংশে সাঙ্খ্য দর্শনের সহিত মিলে; বেদান্ত ও চার্ব্বাক দর্শনেরও সহিত ইহার কতক ঐক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু ইহার অধিকাংশ বিশেষতঃ ইহার প্রমাণ পরীক্ষা ভাগ, সম্পূর্ণ নূতন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের একমাত্র ফল। ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ গণিতবেত্তা লাপলাস ইহার স্থাপনকর্ত্তা; ইংলণ্ডের বিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী হারবার্টস্পেনসার ইহার মণ্ডন ও পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানবাদ

সাঙ্খ্যদর্শনের ন্যায় জগতের নিমিত্তকারণ স্বীকার করেন না; আকর্ষণ শক্তিসম্পন্ন পরমাণু রাশি হইতে ইহার স্বতই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এরূপ কল্পনা করেন। নৈয়ায়িকের মতে পঞ্চ মহাভূতের পাঁচ প্রকার স্বতন্ত্র পরমাণু; সাঙ্খ্যের মতেও পঞ্চবিধ পৃথক তন্মাত্র পঞ্চমহাভূতের নিদান। কিন্তু বৈদান্তিকেরা বলেন যে, আকাশ বিকৃত হইয়া বায়ুরূপে পরিগণিত হয়, বায়ু বিকৃত হইয়া তেজ; তেজ বিকৃত হইয়া জল, এবং জল আবার বিকৃত হইয়া মৃত্তিকা রূপে প্রকাশ পায়। অতএব মূল ধরিতে গেলে পরমাণু এক প্রকার। বিজ্ঞানবাদ অনুসারেও এক প্রকার পরমাণু হইতে সমুদয় বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে। অপিচ বিজ্ঞানবাদ চার্ব্বাকদর্শনের ন্যায় মহাভূতকেই চেতন ও জড়ের উপাদানকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সাঙ্খ্য প্রভৃতি দর্শনের ন্যায় চেতনরূপী আত্মাকে পঞ্চমহাভূত হইতে এক স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না।

এখন প্রস্তাবের দ্বিতীয় প্রকরণটি অবতারণ করা যাউক। মন্বাদি সংহিতা ও পুরাণের মতে প্রলয় দুই প্রকার:—খণ্ড প্রলয় ও মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়ে পরমাত্মাতে সমস্ত বিশ্ব বিলীন হয়, তাহার পর আর সৃষ্টি ক্রিয়া হয় না। পরব্রহ্ম জাগ্রৎ ও নিদ্রিত-অবস্থাশূন্য হইয়া কেবল একাকী বিরাজমান থাকেন। কিন্তু খণ্ড প্রলয়ে সমুদায় বিনষ্ট হয় না, কেবল ত্রিলোকের বিলয় হয় মাত্র। যখন পরমাত্মা নিদ্রিত থাকেন, তখন সমুদয় জগৎ চেষ্টা-শূন্য হইয়া প্রলয় উপস্থিত হয়। আর যখন তিনি জাগরিত হন, তখন ভূতগণ ক্রিয়াযুক্ত হইয়া সংসারের ব্যাপার পরম্পরায় প্রবৃত্ত হয়। কত সহস্র সহস্র খণ্ড প্রলয়ে এক মহাপ্রলয় হয়, তাহার অবধারণ নাই। সৃষ্টি ও খণ্ড প্রলয়ের কাল নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু তাহাতে মতভেদ দৃষ্ট হয়। এতৎ সম্বন্ধে মনুর কয়েকটি শ্লোক অনুবাদ করিয়া দিব; তাহা হইলে পাঠক মানবধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মত অবগত হইতে পারিবেন।

(১) "নিমেষা দশ চাষ্টৌ চ কাষ্ঠা ত্রিংশত্তু তাঃ কলা। ত্রিংশৎকলা মুহূর্ত্তঃ স্যাদহোরাত্রস্তু তাবতঃ" ॥

(২) "পিত্র্যে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তু পক্ষয়োঃ। কর্ম্মচেষ্টাস্বহঃ কৃষ্ণঃ শুক্লঃস্বপ্নায় সর্ব্বরী" ॥

(৩) "দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ। অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নং ॥"

(৪) "চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণান্তু কৃতংযুগং। তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চতথাবিধঃ ॥"

(৫) "ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষুচ ত্রিষু। একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ ॥"

(৬) "যদেতৎ পারিসংখ্যাত মাদাবেব চতুর্যুগং। এতদ্দ্বাদশসাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে ॥"

(৭) "দৈবিকানাং যুগানান্তু সহস্রং

পারিসংখ্যয়া। ব্রাহ্মমেক মহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিরেবচ ॥"

"অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎকলায় একমুহূর্ত্ত, এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র হয়।"

"মনুষ্যলোকের এক মাসে পিতৃলোকের এক অহোরাত্র হয়।"

কৃষ্ণপক্ষ, তাঁহাদের দিন, এবং শুক্লপক্ষ রাত্রি"।

"মনুষ্যলোকের এক বৎসরে দেবলোকের এক অহোরাত্র হয়। উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিন এবং দক্ষিণায়ণ রাত্রি॥ চারি সহস্র বৎসরে সত্যযুগ; সত্যযুগের সন্ধ্যা চারিশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশ* ও চারিশত বৎসর॥"

"অন্যান্য যুগ এবং তদীয় সন্ধ্যা, ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ উত্তরোত্তর এক এক শূন্য; অর্থাৎ ত্রেতা তিন সহস্র বৎসর; তাহার সন্ধ্যা তিন শত বৎসর। তদ্রূপ, দ্বাপর দুই সহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যা দুই শত বৎসর ও সন্ধ্যাংশ দুই শত বৎসর। সেই প্রকার কলি এক সহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যা এক শত বৎসর ও সন্ধ্যাংশ এক শত প্রথমে যে যুগচতুষ্টয়ের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার দ্বাদশ সহস্র সংখ্যাতে দেবতাদের একটি যুগ হয়"।

"দেবলোকের সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন, এবং তত পরিমাণে তাঁহার এক রাত্রি হয়"। উপরিউক্ত অর্থ যথাশ্রুত স্বাভাবিক ও ভাষার নিয়মানুযায়ী; উহাতে কোন কষ্টকল্পনা নাই। তদনুসারে সত্য যুগের পরিমাণ ৪৮০০ বৎসর, ত্রেতার ৩৬০০, দ্বাপরের ২৪০০, এবং কলির পরিমাণ ১২০০ বৎসর। দেবতাদের যুগপরিমাণ ১৪৪,০০০,০০০ এবং ব্রহ্মার দিন ও রাত্রির, অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়ের প্রত্যেক ১৪৪,০০০,০০০,০০০ বৎসর। কিন্তু মনুর প্রধান টীকাকার কুল্লূক ভট্ট, পুরাণের সহিত বিরোধের ভয়ে চতুর্থ শ্লোকের অন্তর্গত "বর্ষ" শব্দকে দৈববর্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যা কোন মতে মনুর অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ মনুর উক্ত প্রকরণের মধ্যে দেবতাদের বর্ষ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ কিছুই উল্লিখিত হয় নাই, প্রত্যুত পূর্ব্বশ্লোকে যে বর্ষ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে মনুষ্যলোকের বর্ষ বুঝাইতেছে। পুরাণ সকল অতিশয়োক্তিতে পরিপূর্ণ। চারিযুগের পরিমাণ সমুদায়ে কেবল বার হাজার বৎসর হইলে নিতান্ত অল্প দেখায়, এই ভাবিয়া পুরাণপ্রণেতারা বর্ষ শব্দের অপ্রাসঙ্গিক অর্থ, কল্পনা করিয়া অনেকগুলি শূন্য বাড়াইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, পুরাণকর্ত্তাদের ও কুল্লূকভট্টের মতে সত্যযুগ ১৭২৮০০০, ত্রেতা ১২৯৬০০০, দ্বাপর ৮৬৪০০০, এবং কলি ৪৩২০০০ বৎসর। আর সৃষ্টি ও প্রলয় প্রত্যেকের পরিমাণ ৪৩২,০০০০,০০০ বৎসর। পরন্তু মেধা-

* সন্ধ্যা শব্দে প্রারম্ভ কাল ও সন্ধ্যাংশ শব্দে উপসংহার কাল।

তিথির মতে আরও বাড়াবাড়ি। তিনি বলেন যে, উক্ত গণনা অনুসারে যে যুগ চতুষ্টয় হয়, তাহার দ্বাদশ সহস্রে অর্থাৎ ৫১৮৪,০০০,০০০ বৎসরে দেবতাদের এক যুগ হয়; তদ্রূপ সহস্র দৈবযুগ অর্থাৎ ৫১৮৪,০০০,০০০০,০০০ বৎসর কাল এই জগৎ বিদ্যমান থাকিয়া খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত হয়; এবং সেই প্রলয়াবস্থা আবার তত সংখ্যক বৎসর থাকিয়া পরে পুনর্ব্বার নূতন সৃষ্টির আরম্ভ হয়।

মানবধর্ম্মশাস্ত্রে প্রলয়ের বর্ণনাতে কোন আড়ম্বর নাই। কেবল এই মাত্র উল্লিখিত আছে যে, পরব্রহ্মের জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থাতেই সৃষ্টি ও প্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু পৌরাণিক বর্ণনাতে বিস্তর আড়ম্বর ও অলঙ্কার দৃষ্ট হয়। পুরাণে এরূপ বর্ণিত আছে যে, প্রলয় কালে দ্বাদশসূর্য্য যুগপৎ উদিত হইয়া সর্ব্বদাহকারী জ্যোতি উদ্গীরণ করিবেক, উনপঞ্চাশৎ বায়ু এককালে প্রবাহিত হইয়া ঘোরতর নির্ঘাত ও ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত করিবেক এবং পুষ্করাবর্ত্ত প্রভৃতি মেঘগণ মুষলের ধারে বৃষ্টি করিয়া বিশ্বমণ্ডল প্লাবিত করিয়া ফেলিবেক। ইত্যাদি যে সমস্ত কাল্পনিক বর্ণন আছে, তাহাতে দর্শনের গাম্ভীর্য্য নাই, বিজ্ঞানের প্রমাণ পরীক্ষা নাই এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের ঋজুতা নাই, কেবল কাব্যের প্রৌঢ়োক্তি আছে মাত্র।

অধুনা বিজ্ঞানবাদের মত বিবৃত হইতেছে। তদনুসারেও মহাপ্রলয় ও খণ্ড প্রলয়ভেদে প্রলয় দুই প্রকার। খণ্ড প্রলয় কেবল আমাদের আবাসভূত এই সৌরজগৎ সম্বন্ধে, কিন্তু মহাপ্রলয়ে এই অনন্ত নভোমণ্ডলের অন্তর্গত অসংখ্য সৌরজগত বিলয় প্রাপ্ত হইয়া, আদিম পরমাণু রাশিরূপে পরিণত হইয়া সমন্ততঃ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যেমন এই জগন্মণ্ডল কোটি কোটি যুগে আদিম বাষ্পরাশি হইতে বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি আরও কোটি কোটি যুগে ইহার চরম প্রাদুর্ভাব বা উন্নতি সংঘটিত হইবেক এবং আরও কোটি কোটি যুগে উহার ক্ষয় ও বিলয় সমাহিত হইবেক। এই অপরিসীম সৃষ্টি ও প্রলয়কালের ইয়ত্তা করা মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য; এতদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলেও অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব জড়তা ও বৈধুর্য্যভাব উপস্থিত হয়। আমরা এতৎসম্পর্কে যথার্থই বলিতে পারি "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

একটি লোষ্ট্র জোরে উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইয়া যত উঠিতে থাকে, তাহার বেগ তত কমিতে থাকে; পরে কতকদূর উঠিয়া ক্ষণকালের জন্য স্থির হয়। অনন্তর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত বেগে নামিতে থাকে; অবশেষে ভূমিতে পতিত হইয়া সম্পূর্ণ স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। নিক্ষেপের বেগ ও পৃথিবীর আকর্ষণের তারতম্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ইহার কারণ। আবার দেখ, প্রশান্ত সরসীজলে একটি সফরী মৎস্য ঘাই করিল। অমনি তরঙ্গমালা চক্রাকারের সমন্তাৎ চলিতে লাগিল। তরঙ্গ যত ফেলাও হইতে লাগিল, ততই ক্ষুদ্রতর

আকার ধারণ করিতে লাগিল; পরিশেষে জলের, বায়ুর ও তীরস্থ বস্তুর প্রতিঘাতে ক্রমশঃ অদৃশ্য হইল। তখন সরসীর জল আবার পূর্ব্ববৎ প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। পুনশ্চ নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে বীণা হইতে একটি মধুর ঝঙ্কার উঠিল, সুরলহরী গগণপথে ভাসমান হইল। তাহার অনুরণনধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া বায়ুসাগরে বিলীন হইল; আর কিছুই শুনা গেল না। পুনর্ব্বার স্বর নিস্তব্ধ হইল। বায়ুর প্রতিঘাতই ইহার কারণ। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, যে স্থলে বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয় ব্যাপৃত থাকে, তথায় নানা ক্রিয়ার পর চরমে শান্তি সংঘটিত হয়। আমরা এই সংসার-বৃত্তান্ত যতই পর্য্যবেক্ষণ করিব, ততই দেখিতে পাইব যে সমুদয় ঘটনাই বিরুদ্ধ শক্তি সকলের ফল। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আমাদের দেহকে নীচের দিগে নিরন্তর টানিতেছে, কিন্তু মাংসপেশীর সমুদিত শক্তি তাহার প্রতিবিধান করিতেছে। অতএব আত্যন্তিক পরিশ্রম বা পীড়া নিবন্ধন মাংসপেশী শিথিল হইলে, বিশ্রাম ও শয়নের প্রয়োজন হয় এবং মৃত্যুসময়ে আবার সেই শক্তির নির্ব্বাণ কালে, করচরণাদির চালন পর্য্যন্ত দুষ্কর হইয়া পড়ে। আবার দেখ, নিশ্বাস প্রশ্বাস, ও শরীরের আভ্যন্তরীণ বিবিধ রাসায়নিকক্রিয়ানিবন্ধন নিরন্তর জীবনীশক্তির যে হ্রাস হইতেছে, খাদ্যগ্রহণ, বায়ুসেবন প্রভৃতি দ্বারা তাহার প্রতিবিধান না হইলে শরীররক্ষা হয় না। বাল্যকালে ক্ষয় অপেক্ষা বৃদ্ধি অধিক; সুতরাং অধিকতর পরিমাণে পুষ্টি সাধন হয়। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত এই প্রকারে শরীরের বৃদ্ধি; পরে ক্ষয়ের আরম্ভ হয়। সেই ক্ষয়ের চরম সীমাই মৃত্যু এবং মৃত্যুই বিরুদ্ধ শক্তি সকলের বিরামাবস্থা।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আকর্ষণশক্তির ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ শক্তির ক্রমশঃ হ্রাস প্রযুক্ত এই সৌর জগতের উপাদানভূত পরমাণু সকল উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইতেছে। সেই ঘনীভাবনিবন্ধন সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতির আয়তন ও পরিমাণ যেমন কমিতে থাকিবেক অমনি উহারা পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইতে থাকিবেক। এঙ্কির ধূমকেতু পূর্ব্বে যে সময়ে সূর্য্যের চতুর্দ্দিগে আবর্ত্তন করিত, এখন তাহার কিছু লাঘব দেখিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে যে কালে গ্রহ উপগ্রহগণ সূর্য্যের সন্নিহিত হইতে হইতে পরিশেষে উহাতে পতিত ও বিলীন হইয়া যাইবেক। কিন্তু সে কালের কে ইয়ত্তা করিতে পারে? অধ্যাপক হেমহল্‌ট গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে সূর্য্যমণ্ডলে এখন যত তাপ আছে, সৃষ্টির আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহার চারি শত পঁয়তাল্লিশ গুণ তাপ এই সৌর জগতের উপাদানভূত পরমাণুরাশি হইতে উদ্গীর্ণ হইয়াছে। পরন্তু এখন প্রতিবৎসর যে পরিমাণে তাপ নিঃসারণ হইতেছে, আর দশ লক্ষ বৎসর

সেইরূপ তাপ প্রদান করিলে সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস বিংশতি ভাগের এক ভাগ কমিয়া যাইবেক, অর্থাৎ ঘনীভূত হইয়া সূর্য্য-মণ্ডলের আয়তন তত পরিমাণে ছোট হইয়া পড়িবেক। এইরূপে কয়েক কোটি বৎসরে সূর্য্য এত ঘনীভূত হইতে পারে যে, উহা হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাপ নির্গম হইবেক না। কিন্তু তৃণ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই জীবন সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপের উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব ইহাও সম্ভব যে, পৃথিবী সূর্য্যমণ্ডলে নিপতিত হইবার পূর্ব্বে জীবযুক্ত থাকিবেক না। উক্ত ঘটনার অনেক পূর্ব্ব হইতে পার্থিবজীবনের ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকিবেক। যেমন জীবমণ্ডলীর উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সহস্র সহস্র যুগে অসংখ্য ভৌতিক পরিবর্ত্তনে ঘটিয়াছে, তেমনি তৎসমস্তের ক্ষয়ও অকস্মাৎ সংঘটিত না হইয়া অল্পে অল্পে বহুকালে সাধিত হইবেক। পৃথিবীর এখনও বাল্যাবস্থা বলিলে চলে; এ পর্য্যন্ত উন্নতির কয়েকটি সোপান রচিত হইয়াছে মাত্র। লঙ্কেশ্বর রাবণ মর্ত্ত্য-লোক হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত একটি সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। উন্নতি এই স্বর্গস্পর্শী সিঁড়ির ন্যায় অসীম; ইহার চরম সীমায় পৌঁছিতে কত যুগ যুগান্তর লাগিবেক, তাহার গণনা হয় না। তাহার পর সাম্যাবস্থা। সেও বহু-কালব্যাপিনী। পরিশেষে ক্ষয়াবস্থা। তাহাও অপরিসীম। অতএব মনুষ্য-জীবনের সহিত তুলনা করিলে, প্রলয়-কাণ্ড যে কত দূরে অবস্থিত উহার ইয়ত্তা হয় না। উহার নিকট অনুমানও হার মানেন। কেবল ভারতীয় শাস্ত্রকার-দিগের কল্পনাই উহার কাছাকাছি যাইতে সমর্থ। যাহাহউক প্রলয়ের আশঙ্কা কেবল দুই এক জন বাতুল ইয়ুরোপীয় গণিতবেত্তা অথবা দুই এক জন পাপভীরু গোঁড়া মিসনরিরাই নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। আমাদের মত স্থূলদৃষ্টি লোকের সংসারকার্য্যের কোন বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না।

তথাপি সকল প্রকার দৃষ্টান্ত ও তর্ক প্রলয়ঘটনার অনুকূলেই যুক্তি দিতেছে। অধ্যাপক হেমহল্ট গণনা করিয়া বলিয়া-ছেন, যদি পৃথিবীর গতি অধুনা অকস্মাৎ কোন অলৌকিক আঘাত পাইয়া বন্ধ হইয়া পড়ে; তাহা হইলে উহা হইতে যে তাপ উদ্ভূত হইবেক, তাহার পরিমাণ পাতরে কয়লায় এইরূপ চৌদ্দটা পৃথিবী যুগপৎ প্রজ্বলিত হইলে, যত তাপ নিঃসা-রণ হয়, তত্তুল্য হইবেক। অনেক বাদ দিয়া ধরিলেও সেই তাপপরিমাণ ১১২০০ ডিগ্রি হইবার সম্ভাবনা। পৃথিবীর গতি বন্ধ হইলে উহা অবশ্যই ভয়ানক বেগে সূর্য্যমণ্ডলে গিয়া পতিত হইবেক। সেই নির্ঘাতে আবার পৃথিবীর পূর্ব্বোক্ত উত্তাপ চারি শত গুণ অধিক হইয়া উঠিবেক। এইরূপে সমুদায় গ্রহ উপগ্রহগণ যখন সূর্য্য-মণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হইবেক, তখন যেরূপ উত্তাপের সৃষ্টি হইবেক তাহাতে সমুদয়

সৌরজগৎ সূক্ষ্ম পরমাণু রাশিতে পরিণত হইয়া দিঙ্মণ্ডল ব্যাপিয়া ফেলিবেক। তখন সৃষ্টির পূর্ব্বে যে প্রকার ছিল, আবার সেই-রূপ অবস্থা উপস্থিত হইবেক। ইহাকেই আমরা বিজ্ঞানবাদোক্ত খণ্ড প্রলয় নামে নির্দ্দেশ করিতেছি।

তামসী নিশায় ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই যে, নভোমণ্ডলের সকল স্থানে নক্ষত্রগণ সমান ঘনভাবে গ্রথিত নহে। কোথায় সাতটি, কোথায় বা পাঁ-চটি, কোন কোন স্থানে বা দুই দুইটি তারকা সম্মিলিত হইয়া জ্বলিতেছে। যাহাকে (Milky way) অর্থাৎ "দুগ্ধপথ" বলে, এবং যাহা পৌরাণিক কল্পনাতে স্বর্গনদী "মন্দাকিনী" রূপে বর্ণিত হই-য়াছে, তাহা স্তবকাকার তারকাবলী ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন কথা হইতেছে যে, নক্ষত্রমণ্ডলের যে ঘনভাব ও বিরল-ভাব, তাহা স্বাভাবিক না কোন প্রাকৃ-তিক নিয়মের অধীন? অনেক পর্য্য-বেক্ষণ ও গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, নক্ষত্রগণ স্থির নহে; উহাদের গতি আছে এবং সে গতি মধ্যাকর্ষণশক্তির নিয়মাধীন। আমাদের সূর্য্যমণ্ডলের গতি অবধারিত আছে। উহা প্রতি ঘণ্টায় (৫,০০০০০) পাঁচ লক্ষ মাইল। আর সর-জন হর্সেল যে বলেন সূর্য্য অপরাপর নক্ষত্রের সহিত একদিকেই ভ্রমণ করিতেছে, তদনুসারে সূর্য্যের বাস্তবিক গতি উক্ত দৃশ্যমান গতি অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক হইবেক সন্দেহ নাই। অতএব প্রত্যেক নক্ষত্র যদি সূর্য্যের ন্যায় গতি-বিশিষ্ট এবং এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র স্বরূপ হইল; তাহা হইলে তাহারা যে আকর্ষণ-শক্তির প্রভাবে ক্রমশঃ পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইতেছে, এরূপ অনুমান অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। দূরবীক্ষণ দ্বারা গগনমণ্ডলে যে সকল তারাযুগল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা যে কেবল দেখিতে যুগল এমন নয়; বস্তুতঃ যুগলই বটে। অর্থাৎ তাহারা সন্নিকৃষ্ট ভাবে ভীষণবেগে পর-স্পরের চতুর্দ্দিগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা কালে যে আরও সন্নিকৃষ্ট হইতে থাকিবেক এবং পরিণামে যে পরস্পরের উপর পতিত হইবেক, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

পৃথিবীর ন্যায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রহ অপেক্ষাকৃত অল্পবেগে সূর্য্যে পতিত হইলে, কিরূপ ঘটনা উপস্থিত হইবেক, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন মনে করা উচিত যে, দুইটি তারা দুই সূর্য্যের ন্যায় প্রকাণ্ড পিণ্ডদ্বয়; অসীম দূর হইতে পরস্পর-সন্নিকৃষ্ট হইয়া ভয়ানক বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা যখন পরস্পর সংঘর্ষিত হইবেক, তখন আরও তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইবেক। তখন দুই তারকামণ্ডল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু রাশিতে পরিণত হইয়া নভোমণ্ডলের এক দেশ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিবেক। অধুনা অনুধাবন করিয়া দেখ, এরূপ ঘটনার পরিণাম কি হইবেক? যে সকল তারকামণ্ডল অবশিষ্ট রহিল, তাহারা যখন এই পরমাণু ব্যাপ্ত

আকাশ প্রদেশের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিবেক, তখন, তাহারা নিরন্তর পরমাণুপুঞ্জের প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকিবেক। তাহাতে তাহাদের বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কমিতে থাকিবেক। অতএব তাহাদের সংঘর্ষণ স্বভাবতঃ যত সময়ে ঘটিতে পারে, তদপেক্ষা আরও সত্বর ঘটিতে থাকিবেক। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটির পর আর একটী তারকাযুগল পরিমাণু-রাশিতে পর্য্যবসিত হইবেক। তাহাতে নভোমণ্ডলের যত অধিক ভাগ পরমাণুতে পরিপূর্ণ হইবেক, ততই অবশিষ্ট তারকামণ্ডল সকল অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবেক। এইরূপে এই পরিদৃশ্যমান নক্ষত্রমণ্ডল ক্রমশঃ সন্নিকৃষ্ট ও পরিমাণুরাশিতে পরিণত হওত কোটি কোটি যুগে সহস্র সহস্র খণ্ড প্রলয়ের পর মহাপ্রলয়কাণ্ড সংঘটিত হইবেক। তখন আবার সমস্ত পরিমাণু-পূর্ণ ও অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া যাইবেক।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, উক্ত প্রকার মহাপ্রলয়ে জগতের মহানিদ্রা হইল কি না? এতদুত্তরে যুক্তি ও কল্পনা এই কথা বলিবেন যে, মহাপ্রলয়কাণ্ডে বর্ত্তমান অখিলব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বতোভাবে ধ্বংস হইল বটে; কিন্তু তাহার পর সৃষ্টিক্রিয়া যে আর হইবেক না, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। যেমন প্রথম সৃষ্টিকালে পরমাণু-রাশির আকর্ষণশক্তির আতিশয্য ও সম্প্রসারণশক্তির ন্যূনতা নিবন্ধন ক্রমে বিশ্ব-সংসারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আবার তাদৃশ অবস্থা সংঘটিত না হইবার কারণ কি? মহাপ্রলয়কালে সম্প্রসারণশক্তির চরম আধিক্য ও প্রাধান্য হয়। কালে যে আবার সেই সম্প্রসারণশক্তির খর্ব্বতা ও আকর্ষণশক্তির প্রবলতা হইবেক না এবং তন্নিবন্ধন পুনর্ব্বার পরমাণুরাশি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতা ও ঘনীভাব ধারণ করিবেক না, তাহাতেই বা প্রমাণ কি আছে? যাহা হউক এবিষয়ে আর আন্দোলন করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা বিজ্ঞান ও বুদ্ধির অগম্য তাহাতে মৌনাবলম্বন করাই সঙ্গত।

বন-বিমোহিনী।

Such a rural Queen
All Arcadia hath not seen.
Milton.

I.

এধনি সত্য করি কও,
তুমি নাকি বিনোদিনি
হও বন-বিমোহিনী
তুমি কি বনে বনে রও?—
এই যে নিহারি ওই বনের ভূষণ
এধনি এধনি ওযে বনেরি গঠন!

II.

এই যে মৃণালবালা
ওই যে ফুলের মালা
ও যে কবরীতে ফুল,

এ সব বনেরি বালা!—
তুমিও যে বনবালা
ইথে আছে কিলো ভুল?
এখনি এ ধনি তবে সত্য করি কও
গেঁথেছি যে ফুলমালা দয়া করে লও।

III.

কোথা যাও কোথা যাও
দাঁড়াও সুন্দরি!
কেন বা লজ্জিত হও,
এ মিনতি করি—
কাছে এস দাঁড়াও সুন্দরি!
আমিও বেড়াতে বনে বড় ভালবাসি
বনফুল পেলে ধনি মনে মনে হাসি।

IV.

তবু না রহিলে তুমি
হেথা হতে চলিলে,
যেওনা যেওনা আর
তবুও যে চলিলে?—
চল চল সঙ্গে যাব, সঙ্গে গেলে দেখা পাব;
বনমালা গেঁথে দেব,
দয়া করে বনবধূ দয়া করে পরিলে
আরও দেখিতে ভাল হবে তুমি অবলে!

V.

হেসেছে হেসেছে ওই!
হাসিলে মোহিত হই—
তাই বুঝি বনে বনে ফের,
তাই বুঝি জনপদে পরিহার কর?
বনে রতে ভাল বাস
বনফুল ভাল বাস
চল তুমি ঘরে চল
সদ্য বনফলে
গুল্ফাবধি পাদুখানি
ঢাকিয়ে সকালে,
বনে গেলে লতা ধনি জড়াইবে গায়
বনে গেলে পদে পদে কাঁটা ফুটে পায়।

VI.

আর দেখ বনবধূ
জীবিত-প্রণয়-মধু
সতত সদনে নিরবধি পাবে,
বনে যে বিভ্রম মতি
সে সুখ ভুঞ্জিয়ে সতী
দহন কদন সম মনে হবে,
মোহন-মুকুতা-মালা
হাতে মণিময় বালা
অলকা অশোক ফুলে পরিহরি ধনি
মুগ্ধ মণিময় সিঁতী পরিবে রমণি!

VII.

চল চল বিধুমুখি!
চল কমলিনী-আঁখি
চল চল বন-বিমোহিনি,
ভাসিয়ে বিমল সুখে
হাসিবে ও চন্দ্রমুখে
তাতে তুমি ভুবনমোহিনী!
চল তুমি ঘরে চল বনবিমোহিনি—
মুখে হাসি তাতে ধনি ভুবনমোহিনী!

VIII.

এলে সুখের সর্ব্বরী,
বিমল হর্ম্ম্যের ছাদে
মধুর মৃদঙ্গ নাদে
সুখে ভাসিবে সুন্দরি!

কেহবা হাসিবে নারী
গাবে কত বীণাধারী
নাচিবে প্রমোদে মেতে কত সুকুমারী
কেহবা আসব মুখে ঢালিবে সুন্দরী।

IX.

থাক ঘরে সতি,—
যেওনা যেওনা ধনি
মোর কিরে বিনোদিনি
করি এ মিনতি,
নবমল্লিকার মালা, দেবমৃণালের বালা;
এইধর ফুলমালা,
থাক ঘরে সতি—
মোর কিরে বিনোদিনি থাক ঘরে সতি
দুদিন থাকলো ঘরে থাকলো যুবতি!

X.

যদি যাইবে নিতান্ত
যেও, পড়ুক বসন্ত,
যখন কোকিল গাবে মলয়বাতাস ববে
অনন্ত ফুলের মধু
সাজাইবে বনবধূ,
ফুল হতে সুকুমারী
তাতে তুমি হও নারি!
তবু ফুল মাঝে বসে, ওইযে নয়নে হেসে;
ধীরে ধীরে উচ্চ তানে
অনুরাগে মেতে মনে,
বসন্তের গানে তুমি বিধুরা করিয়ে
থামাইবে কোকিলারে মরমে মরিয়ে।

XI.

শুদ্ধে যত বনবালা
করে বন-ফুল-মালা
সারি সারি দাঁড়াইবে ঘিরে!
আর কত বনবধূ
লয়ে বন-ফল-মধু
স্তিমিত নয়নে রবে ধীরে!
চঞ্চল যে কুরঙ্গিণী
সহসা দাঁড়াবে ধনি,
ফিরে ফিরে মুগ্ধ মনে চাবে তোমাপানে
অখিল এ বনস্থলী স্তব্ধ হবে গানে!

XII.

ওই দেখ দিনমণি
মাথায় উঠিল ধনি,
দেখ হেথা দেখ চেয়ে
আতপে কুসুম কত
বোঁটা ছেড়ে মুক্তা মত
প্রসন্ন তটিনী নীরে!
ওই দেখ মৃগবধূ
তাপিতা চলিয়ে মৃদু
জল খেতে ক্লান্ত হয়ে নদীতীরে এল
পাখিও কাতর অতি নিজ বাসে গেল।

XIII.

শুনে এই বনবধূ
বিমল হাসিয়ে মৃদু
ধীরে ধীরে কহিল—
"কি বলিলে জনপদে
যাব কি জনের ফাঁদে?—"
ধীরে সতী কহিল—
"ভোলেনা আমার মন
মুগ্ধ মণিময় হারে,
মানবেরা সুখী যাতে
অয়ি ঘৃণা করি তাতে—
অথবা প্রবৃত্তি ইথে, ক্ষম এই জনে
বনে যে বিহরে পাখি বনসুখ জানে।"

XIV.

এত বলি বনদেবী
অচিরে অপুণ্য ভাবি
উপবনে পশিল,
রূপে বিজলী যেমতি
অথচ মোহিয়ে মতি
চেতনারে হরিল,
তার পর একাকিনী
দেখ দেখ বিমোহিনী
প্রস্রবিনীতটে গিয়ে শিলাতলে বসিল
স্বচ্ছ ঝরণার জল এসে পদে চুমিল।

XV.

একাকিনী গিরি ধারে
মোহন বিতান ধরে।
এখনি সত্য করি কও,
তুমি নাকি বিনোদিনি
হও বনবিমোহিনী
তুমি কি বনে বনে রও ?—
থাক থাক বিমোহিনি, এতে সুখী হও
গেঁথেছি যে ফুলমালা দয়া করে লও !

শ্রীঃ—

মিলের জীবনবৃত্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এতদিন মিল্ কেবল নির্জ্জনে বিদ্যানুশীলন করিতেন মাত্র। লোকের সহিত কিরূপে মিশিতে হয়, লোকের সহিত কিরূপে কথোপকথন করিতে হয়, তাহা তিনি এক রকম জানিতেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু পিতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পিতৃবন্ধুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথনে মিলেরও তর্ক ও বাক্‌শক্তি ক্রমেই স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা গ্রোট্ এবং প্রসিদ্ধ ব্যবহারবিৎ অষ্টিন্ জেম্‌সের নিকট নবপরিচিত হইলেন। তাঁহাদিগের পরিচয় অচিরকালমধ্যেই বন্ধুত্বে পরিণত হইল। গ্রোট্ বয়সে জেম্‌সের অনেক কনীয়ান্ সুতরাং মিল্ অপেক্ষা বয়সে অধিক বড় ছিলেন না। এই জন্য মিলের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মিল। মিল ইহাঁর সহিত নৈতিক, রাজনৈতিক, ও দার্শনিক প্রভৃতি নানা বিষয়ে কথোপকথন করিয়া বিশেষ প্রীত হইতেন এবং প্রায় সকল বিষয়েই ইহাঁর সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেন।

অষ্টিন্ গ্রোট্ অপেক্ষা প্রায় ৫।৬ বৎসরের অধিকবয়স্ক ছিলেন। ইনি সফোক্ নগরের একজন সমৃদ্ধিশালী বণিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াও সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন এবং সিসিলীয় সমরে লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিকের অধীনে সৈনিকপদে অভিষিক্ত হন। সমর সমাপ্ত হইলে তিনি সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করেন।

গোট্‌ অনেক বিষয়ে জেম্‌স মিলের শিষ্য ছিলেন কিন্তু অষ্টিন্‌ স্বাধীন চিন্তা ও অনুশীলন দ্বারা প্রায় সকল বিষয়েই স্বাধীন মত সংস্থাপিত করেন. সুতরাং কোন বিষয়েই প্রায় জেম্‌সের শিষ্য ছিলেন না। ইনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার সেই অসাধারণ ধীশক্তি কথোপকথনের সময়েই বিশেষ স্ফূর্ত্তি পাইত। তিনি পৃথিবী ও সমাজের বর্ত্তমান দীন হীন অবস্থায় পরিতৃপ্ত ছিলেন না। এই জন্য তাঁহার মুখমণ্ডলে সতত বিষাদচিহ্ন উপলক্ষিত হইত। মানবজাতির উন্নতিসাধনে বলবতী ইচ্ছা, বলবৎ কর্ত্তব্য জ্ঞান, অসাধারণ ধীশক্তি এবং অক্ষয় জ্ঞানরাশি সত্ত্বেও এই মহাপুরুষ শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ জগতে মহতী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা হউক এই অসাধারণ ব্যক্তির বুদ্ধি ও নীতি মিলের মন ও হৃদয়কে অধিক পরিমাণে উত্তোলিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। তিনি মিল্‌কে অতিশয় ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার উন্নতি সাধনে সতত সচেষ্ট থাকিতেন।

এই সময় অষ্টিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চার্লস অষ্টিনের সহিত মিলের আলাপ হয়। চার্লস অষ্টিন্‌ কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের এক জন অদ্বিতীয় ছাত্র ছিলেন। উক্ত স্থানে ইউনিয়ন ডিবেটিং ক্লব নামে একটী সভা ছিল। চার্লস সেই সভার অধিনায়ক ছিলেন। মেকলে, হাইড, চার্লস ভিলিয়ারস, ষ্ট্রট, রোমিলি প্রভৃতি অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণ এই সভার সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন। চার্লস অষ্টিনের প্ররোচনায় মিলও এই সভার সভ্য মনোনীত হইলেন। অষ্টিনের স্বাধীন বক্তৃতাসকল ইংলণ্ডের ইতিহাসে একটী নবযুগের আবির্ভাব করে। বেন্‌থামের গভীর মত ও যুক্তি সকল ইঁহারই বক্তৃতাবলে সর্ব্বত্র বিধৃনিত হয়। চার্লস অষ্টিনের সহিত সখ্য, মিলের জীবনে একটী নূতন কাণ্ডের অবতারণা করে। মিল্‌ এতদিন পর্য্যন্ত যত লোকের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বয়োবিদ্যায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ। তাঁহাদিগের সহিত মিলের গুরুশিষ্য-ভাব ছিল। এরূপ লোকদিগের সহিত সাহচর্য্যে স্বাধীন চিন্তা বিস্ফূরিত হয় না। মিল্‌ চার্লস অষ্টিনের সহিতই সর্ব্বপ্রথমে সমতল ভূমিতে অবতরণ করেন। ইঁহারই সহিত সাহচর্য্যে মিলের চিন্তা ও তর্কশক্তি অধিকতর পরিমার্জ্জিত ও পরিস্ফূরিত হয়।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মিল্‌ একটী ক্ষুদ্র সভা সংস্থাপিত করেন। যাঁহারা সমাজ ও রাজ্যশাসনবিষয়ে হিতবাদ মতের অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহারাই কেবল এই সভার সভ্য হইলেন। প্রতিপক্ষে এই সভার একবার করিয়া অধিবেশন হইত এবং ইহাতে হিতবাদ মত সম্বন্ধে প্রস্তাবাদি পঠিত হইত। সর্ব্বপ্রথমে ইহার তিন জন মাত্র সভ্য ছিল। ইহার সভ্যশ্রেণীর সংখ্যা কখনই দশ জনের অধিক হয় নাই। অবশেষে ইহা সার্দ্ধ ত্রিবৎসর

কাল-পরিমিত জীবনের পর ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে বিচ্ছিন্ন হয়। এই সভা সংস্থাপনে মিলের দুইটী মহৎ উপকার সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ তাঁহার বক্তৃতাশক্তি বিস্ফুরিত ও পরিমার্জ্জিত হয়। দ্বিতীয়তঃ সমবয়স্ক ও সমমতাবলম্বী যুবকবৃন্দের উপর তাঁহার অধিনায়কত্ব সংস্থাপিত হয়।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মিল্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষীয় করেস্পনডেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের অন্যতম কেরাণীর পদে অভিষিক্ত হইলেন। ভারতবর্ষীয় স্বাধীন ও করদ রাজ্য সকলের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে সকল ডেস্প্যাস্ লিখিতে হইত, প্রথম হইতেই মিল্‌কে সেই সকলের ড্রাফ্‌ট প্রস্তুত করিতে হইত। মিল্ অচিরকাল মধ্যেই এই কার্য্যে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিলেন এবং ইহার পুরস্কারস্বরূপ শীঘ্রই পরীক্ষক (Examiner) পদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার ঐ পদে অভিষিক্ত হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জীবিতকাল পর্য্যবসিত হয়। এই ঘটনায় মিল্ ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা এত ভাল ছিল না যে তিনি কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়াও সহজে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। দিন রাত্রির ২৪ ঘণ্টার কিয়দংশ তাঁহাকে অগত্যা জীবিত নির্ব্বাহের জন্য ব্যয়িত করিতেই হইবে। কিন্তু কোন্ কার্য্যে ইহা ব্যয়িত করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি কোন ব্যবসায়েই দীক্ষিত হন নাই, সুতরাং ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কোন পৃষ্ঠবলও ছিল না যাঁহার সাহায্যে কোন উপযুক্ত পদে অভিষিক্ত হন। সংবাদ-পত্রের স্তম্ভ পূরণ বা পুস্তক লিখন বই তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বাধীন চিন্তা ও সাহিত্যের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং যাঁহার বিবেক-শক্তি এত বলবতী যে তিনি অর্থের জন্য নিজের মতের বিরুদ্ধে লিখিতে অসমর্থ, তাঁহার পক্ষে সংবাদ-পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য যে সকল পুস্তক সংরচিত হয়, তাহাতে কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে বটে, কিন্তু সে সকল রচনা কখন চিরস্থায়িনী হইতে পারে না। যে সকল পুস্তক ভাবী চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মূলভিত্তি স্বরূপ হইবে, সে সকল পুস্তক লিখিতে অনেক সময় ও চিন্তার প্রয়োজন এবং সাধারণতঃ তাহাদিগের জনসমাজে পরিচিত ও খ্যাত হইতে অনেক বিলম্ব ঘটিয়া থাকে; সুতরাং তাহাদিগের উপর জীবিকা নির্ভর করা যাইতে পারে না। সাধারণ লোকের প্রীতি বিধানের নিমিত্ত পুস্তক লিখিলেও কিয়ৎ পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন হয় বটে, কিন্তু প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরূপ করা অতিশয় ক্লেশকর। এই সকল কারণে

লিখনোপজীবী ব্যক্তিদিগের জীবন সকল অবস্থাতেই কারুণ্যোদ্দীপক। তথাপি মিল্ এই অনিশ্চিত জীবনই অবলম্বন করিলেন। পিতা তাঁহাকে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে দীক্ষিত করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং তদনুযায়িনী শিক্ষাও বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্র অর্থজনিত গৌরবের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না; সুতরাং তিনি পিতার সে ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিলেন না।

মিল্ নাগরিক-জীবন-প্রিয় ছিলেন না। তিনি প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে পদব্রজে লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেন। ফ্রান্সে ভ্রমণ করার পর হইতে তাঁহার ভ্রমণস্পৃহা দিন দিন উপচীয়মান হইতে থাকে। এই জন্য তিনি বৎসরে বৎসরে যে এক মাস করিয়া অবকাশ পাইতেন, তাহা প্রায়ই ভ্রমণে পর্য্যবসিত করিতেন। ফ্রান্স, বেল্জিয়ম্ এবং রিনিস জার্ম্মণি প্রায়ই তাঁহার বাৎসরিক পরিভ্রমণের বিষয়ীভূত হইত এবং অবশেষে তিনি পীড়াব্যপদেশে একবার তিন মাস ও একবার ছয়মাস সুইজর্ল ও টাইরল এবং ইটালী পরিভ্রমণ করিয়া আইসেন। এই সকল ভ্রমণের মোহন ভাব মিলের অন্তরে এত গভীররূপে অঙ্কিত হয়, যে তিনি জীবনে ইহা কখন ভুলিতে পারেন নাই।

মিল্ বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিদ্যাচর্চ্চায় কখন শিথিলপ্রযত্ন হন নাই। বরং তিনি যৎকালে ইণ্ডিয়া হাউসে নিযুক্ত ছিলেন তখন তাঁহার বিদ্যানুশীলনে যত্ন অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই সময়ে ট্রাভেলার এবং মর্ণিং ক্রনিক্লর নামক দুইখানি সংবাদপত্রে তাঁহার কয়েক খানি অত্যুৎকৃষ্ট পত্র প্রকাশিত হয়। ঐ সকল পত্রে অর্থনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে স্বাধীন মত সকল লিখিত হয়। পেরী মর্ণিং ক্রনিক্লরের সম্পাদক ছিলেন। পেরীর মৃত্যুর পর জন্ ব্লাক্ ইহার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন। ব্লাক্ অসাধারণ-বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ও বেন্থামের মতসকলে বিশেষ দীক্ষিত ছিলেন। ব্লাকের সময়ে ক্রনিক্লর হিতবাদী র‍্যাডিকাল্দিগের মুখযন্ত্র-স্বরূপ হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের আইন, ইংলণ্ডের জজ্ ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের কার্য্যপ্রণালী অভ্রান্ত বলিয়া ইংরাজ মাত্রের ভ্রান্ত সংস্কার ছিল। ক্রনিক্লর প্রমাণ দ্বারা সেই অন্যায় সংস্কারের নিরাশ করিয়া ইংলণ্ডের বিচার ও শাসনবিষয়ক সংস্কারের আরম্ভ করে। ব্লাকের সহিত জেম্স মিলের বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। এই হৃদ্যতাজন্য ক্রনিক্লর জেম্স মিলেরও মুখযন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠিল। জেম্স মিল্ স্বয়ং বা ব্লাক দ্বারা নিজের স্বাধীন নূতন মত সকল এই পত্রিকায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল যায় এমন সময় ওয়েষ্ট মিনিষ্টর রিভিউয়ের প্রস্তাব আরম্ভ হয়। এই সময়ে এডিন্বরা ও কোয়াটরলির যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়াছিল। এই দুইখানি পত্রিকাই কন্জারভেটিব্

দিগের প্রবল যন্ত্র ছিল। এই দুইখানির প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে এমন এক খানি মাসিক পত্রের অভাব র্যাডিকালদিগের শিরোমণি বেন্থামই সর্ব্ব প্রথমে অনুভব করেন। এই অভাব দূরীকরণ মানসে বেন্থাম ১৮২৩ খৃীষ্টাব্দে নিজ ব্যয়ে এই পত্রিকা বাহির করিতে কৃতসংকল্প হন। তিনি জেম্স মিল্‌কে ইহার সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু জেম্স ইণ্ডিয়া হাউসের কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া এই ভার গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। জেম্স অস্বীকৃত হইলে লণ্ডনের একজন প্রসিদ্ধ বণিক্ সার্ জন্ বাউরিংএর হস্তে এই ভার সমর্পিত হইল। বাউরিং প্রায় দুই তিন বৎসর হইতে ক্রমাগত বেন্থামের নিকট যাতায়াত করিয়া বেন্থাম ও বেন্থামের মত সকলের উপাসক হইয়া উঠেন। বেন্থামও তাঁহার কতকগুলি সদ্গুণে তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠেন। এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল র্যাডিকালদিগের সহিত বাউরিঙের আলাপ ও পত্রাদির বিনিময় ছিল। সুতরাং বাউরিংই বেন্থামের মত সকল জগতে ঘোষণা করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সক্ষম। এই সকল কারণেই এই নবপ্রস্তাবিত পত্রিকার সম্পাদকের ভার তাঁহারই উপর অর্পিত হইল। এইরূপে জগন্মান্য ওয়েষ্টমিনিষ্টার জগতে প্রাদুর্ভূত হয়। বাউরিঙের সহিত জেম্স মিলের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল না। কিন্তু জেম্স বাউরিঙের বিষয় যতদূর জানিতেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তিনি এরূপ সামাজিক রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণের অযোগ্য। সুতরাং তাঁহার হস্তে এই পত্রিকার ভার অর্পিত থাকিলে বেন্থামের যশঃ ও ধনের অপচয় বই উপচয় হইবে না। তথাপি তিনি বেন্থাম্‌কে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, এবং তাঁহার অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া প্রথম সংখ্যাতে এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব রচনা করেন। এডিন্‌বরা রিভিউএর প্রথমাবধি সকল সংখ্যার সমালোচনই এই প্রস্তাবের বিষয়ীভূত। জেম্স পুত্রকে সেই সমস্ত সংখ্যার স্থূল মর্ম্ম লিখিতে আদেশ করেন এবং সেই স্থূল মর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই সমস্ত সংখ্যার সমালোচন করেন। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউএর আবির্ভাবে ইংলণ্ডে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহার প্রধান কারণ এই সমালোচন। দ্বিতীয় সংখ্যায় এই সমালোচনের যে পরিশিষ্ট প্রকাশিত হয় তাহাও অতি চমৎকার। ইহা পুত্র কর্ত্তৃক সংরচিত হয়।

অচিরকাল মধ্যে এই পত্রিকার উদ্দেশ্য আরও বিস্তৃত হইয়া উঠে। সাহিত্যবিষয়ক বিভাগ ইহার সহিত সংযোজিত হয়। হেন্‌রী সদরন্ নামে একজন সাহিত্যোপজীবী ব্যক্তি এই বিভাগের সম্পাদকত্ব ভার গ্রহণ করেন। অবশেষে অনেক বিঘ্নপরম্পরা অতিক্রম করিয়া ১৮২৪ খৃীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে, এই পরিবর্দ্ধিত পত্রিকা জনসমাজে প্রকাশিত হয়।

ইহার কৃতকার্য্যতা আশাতীত হওয়ায় র‍্যাডিকালমাত্রেরই অন্তরে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হইল। এখন হইতে সকলেই ইহার উন্নতিসাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

জেম্‌স মিল্‌ ইহার একজন নিয়মিত লেখকের মধ্যে ছিলেন। তিনি ইহাতে অনেকগুলি প্রস্তাব লিখেন। তন্মধ্যে চারিটী অতি প্রসিদ্ধ। প্রথমটীর বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা এডিনবরার সমালোচন। দ্বিতীয়টী কোয়াটারলীর সমালোচন; তৃতীয়টী পঞ্চম সংখ্যায় সদের "বুক অব দি চর্চ্চ" নামক পুস্তকের উপর আক্রমণ; এবং চতুর্থটী দ্বাদশ সংখ্যায় রাজনীতিবিষয়ক। অষ্টিন্‌ ইহাতে একটী মাত্র প্রস্তাব লিখেন। ইহা এডিন্‌বরায় প্রকাশিত মক্কলক্‌লিখিত জ্যেষ্ঠাধিকারবিষয়ক প্রস্তাবের প্রতিবাদ। মক্কলক্‌ জ্যেষ্ঠাধিকার প্রণালীর সমর্থন করেন, এবং অষ্টিন্‌ প্রবলতর যুক্তি দ্বারা তাঁহার যুক্তি সকলের খণ্ডন করেন। গ্রোটও একবার বই ইহাতে লিখিতে পারেন নাই। তাঁহার সমস্ত সময়ই তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসে পর্য্যবসিত হইত। তাঁহার এই প্রস্তাব তাঁহার প্রিয়-ইতিহাসবিষয়কই। বিগ্‌নান্‌, চার্লস অষ্টিন্‌, এবং ফন্‌ব্লাঙ্ক প্রভৃতিও ইহার অনিয়মিত লেখকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মিলের বিশেষ বন্ধুদিগের মধ্যে ইলি, ইটন্‌ টুক, গ্রেহাম্‌ এবং রীবেক প্রভৃতিও ইহার লেখকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন। মিল্‌ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম নিয়মিত ছিলেন। দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে অষ্টাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত কয়েক খণ্ডে মিলের লেখনী হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়োদশটী প্রস্তাব বহির্গত হয়। সেগুলির প্রায় অধিকাংশই ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তক সকলের সমালোচন অথবা রাজনীতি ও ব্যবহারশাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব। জেম্‌স মিলের অন্যান্য বন্ধুদিগের নিকট হইতেও মধ্যে মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল আসিতে লাগিল। বাউরিঙের হস্ত হইতেও কয়েকটী অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব বহির্গত হইল। তথাপি জেম্‌স মিল্‌ এবং গ্রোট্‌ ও অষ্টিন্‌ প্রভৃতি তাঁহার বন্ধুবর্গের মনস্তুষ্টি হইল না। তাঁহারা সর্ব্বদাই এই পত্রিকা বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং মিল্‌ ও তাঁহার সহচরবৃন্দও গুরুজনদিগের অনুবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে তাঁহারা সম্পাদকদ্বয়ের জীবন যন্ত্রণাময় করিয়া তুলিলেন। মিল্‌ পরিণত বয়সে স্বীকার করিয়াছিলেন যে তাঁহাদিগের এরূপ ব্যবহার করা কতক পরিমাণে অন্যায় হইয়াছিল। তাঁহারা এই পত্রিকার যতদূর অনাদর করিয়াছিলেন ইহা ততদূর অনাদরের যোগ্য হয় নাই।

ইত্যবসরে এই পত্রিকার যশঃসৌরভ পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইল। এবং ইহার গৌরববৃদ্ধির সহিত বেন্‌থামিক র‍্যাডিকালিজম্‌ মতেরও গৌরববৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই পত্রিকার প্রাদুর্ভাবের

সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে স্বাধীন চিন্তার স্রোতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল এবং সমাজ ও রাজ্যসংস্কারের অভাব সর্ব্বত্র অনুভূত হইল। এতদিন পরে যেন ইংলণ্ডের নিদ্রাভঙ্গ হইল। উন্নতির স্রোতঃ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইল। বেন্থামের নাম সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইল। অসংখ্য যুবকবৃন্দ এই নূতন মতের উপাসক হইয়া উঠিলেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে বেন্থামের শিষ্যবর্গেরা তাঁহার মুখ হইতে তাঁহার মত সকল শ্রবণ করিত। এরূপ বিশ্বাস যে অমূলক তাহা জেম্স মিল্ তাঁহার "ফ্রাগ্মেণ্ট অব্ ম্যাকিণ্টস্" নামক পুস্তকে প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেন্থামের মত সকল তাঁহার রচনাতেই পরিব্যক্ত হয়। সে সকল তাঁহার কথোপকথনে প্রায় প্রকাশ পাইত না। তাঁহার মত সকল তাঁহার প্রিয়বন্ধু জেম্সের কথোপকথন দ্বারা ইংলণ্ডে যতদূর প্রচারিত হয়, তাঁহার রচনা দ্বারা ততদূর হয় নাই। জেম্স মিলের অসাধারণ দেশহিতৈষিতা, অসামান্য মানবপ্রেম, অতি উচ্চ নৈতিক ভাব, সহাস্য বদন এবং স্বভাবের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে—শ্রোতৃমাত্র তাঁহার উপর অনুরক্ত ও তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। সকলেই কোন কার্য্যে তাঁহার অনুমোদনে প্রফুল্ল ও তাঁহার অননুমোদনে বিষণ্ণ হইতেন। ভগ্নহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার আশ্বাসবাক্যে নব-জীবন প্রাপ্ত হইতেন। বলিতে কি জেম্স মিলের সাহায্য ব্যতীত বেন্থামিক মত সকল কখনই জগতে এত শীঘ্র প্রচারিত হইত না।

বেন্থামের মত সকল জেম্স মিল্ দ্বারা তিন প্রধান স্রোতে প্রবাহিত হয়। প্রথম স্রোতঃ জন্ মিল্। দ্বিতীয় স্রোতঃ কেম্ব্রিজের অলঙ্কারস্বরূপ চার্লস অষ্টিন্ এবং লর্ড বেল্পার লর্ড রোমিলী প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়িবর্গ। তৃতীয় স্রোতঃ কেম্ব্রিজের অণ্ডার গ্রাজুয়েট ইটন্ টুক এবং চার্লস বুলার্ প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়িবৃন্দ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অসংখ্য ক্ষুদ্র স্রোতে এই সকল মত প্রবাহিত হয়। তন্মধ্যে ব্লাক্ ও ফন্বাঙ্ক প্রধান। কিন্তু ফন্বাঙ্কের সহিত মিলের অনেক মতভেদ হইত। তন্মধ্যে রাজ্যের শাসনকার্য্যে স্ত্রীজাতির পরিবর্জ্জন সর্ব্বপ্রধান। মিল্ এবং তাঁহার সহচরবৃন্দ স্ত্রীজাতির পরিবর্জ্জনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। আহ্লাদের বিষয় এই যে বেন্থাম্ও তাঁহাদিগের মতের পরিপোষক ছিলেন।

মিল্ ও তাঁহার সহচরবৃন্দ এক্ষণে যে মতের উপাসক হইয়া উঠিলেন, তাহা শুদ্ধ বেন্থামের নহে; কিন্তু বেন্থাম, হার্টলে, ম্যাল্থস্ এবং জেম্স মিল্ প্রভৃতির মতের সারভাগ মাত্র।

রাজনীতি বিষয়ে জেম্স মিলের যে দুই বিষয়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল তাহা এই, প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী এবং তর্ক বিতর্কের পূর্ণস্বাধীনতা। তিনি বলিতেন যে যদি সকল প্রজাই লেখা পড়া শিখে,

যদি সকল প্রস্তাবেরই উভয় পক্ষের যুক্তি লিখন ও বর্ণন দ্বারা তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়, এবং যদি তাহারা পার্লিয়ামেণ্টে আপনাদিগের ইচ্ছানুরূপ সভ্য মনোনীত করিতে পারে, তাহা হইলে শাসনের অতি উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে। পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ সাধারণ প্রজাপুঞ্জ দ্বারা মনোনীত হইলে, তাঁহারা কোন শ্রেণীবিশেষের উদ্দেশ্য সাধন করিতে কখনই চেষ্টা করিবেন না। সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলই তাঁহাদিগের কার্য্যপ্রণালীর নিয়ামক হইবে। সুতরাং তাঁহাদিগের কার্য্যপ্রণালীর উপর কাহারও অসন্তুষ্ট হইবার কারণ থাকিবে না। সকল প্রকার শ্রেষ্ঠতন্ত্র শাসনপ্রণালীরই উপর জেম্‌স মিলের বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। তিনি সে সমস্তকেই জগতের সুশাসনের প্রধান অন্তরায় মনে করিতেন। এই জন্য তল্লিখিত সমস্ত রাজনৈতিক প্রস্তাবেই তিনি রাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তিরই মহাসভার সভ্য মনোনীত করণের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। মনুষ্য মাত্রেরই আপন নিয়ম ও শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিবার অধিকার আছে বলিয়াই যে তিনি এরূপ বলিতেন তাহা নহে; রাজ্যের নিয়ম ও শাসনবিষয়ে ব্যক্তিমাত্রেরই হস্ত না থাকিলে কখনই রাজ্যে সুনিয়ম ও সুশাসন সংস্থাপিত হইতে পারে না। এই জন্যই তিনি এরূপ বলিতেন। তিনি বেন্‌থামের ন্যায় এরূপ বিশ্বাস করিতেন না যে রাজা থাকিলে রাজ্যে সুনিয়ম ও সুশাসন সংস্থাপিত হইতে পারে না। সুনিয়ম ও সুশাসন সংস্থাপনে রাজার ভাব আর অভাব দুই সমান। রাজ্যের সকল শ্রেণীর উপর রাজ্যে শাসন ও নিয়ম সংস্থাপনের ভার থাকিলে রাজার ভাল বা মন্দ হওয়ায় কিছু বিশেষ আসে যায় না। তিনি বলিলেন যে শুদ্ধ সম্ভ্রান্তশ্রেণীর হস্তে রাজ্যভার অর্পিত থাকিলে রাজ্যের যেরূপ অনিষ্ট সম্ভাবনা, সেইরূপ গবর্ণমেণ্টসাহায্যকৃত যাজকমণ্ডলী দ্বারা ধর্ম্মনীতির উচ্ছেদ সম্ভাবনা। মানবমনের নৈতিক উন্নতির স্রোত রোধ করা তাঁহাদিগের স্বার্থ। কারণ মানবজাতি নীতিমার্গে অতিশয় অগ্রসর হইলে, তাঁহাদিগের অস্তিত্ব অনাবশ্যক হইয়া উঠে। এই জন্য তিনি এই যাজকসম্প্রদায়কে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। যাজকমণ্ডলীর ব্যক্তিবিশেষের উপর তাঁহার কোন বিদ্বেষ ছিল না। বরং অনেকের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কেবল তিনি প্রজাদিগের রুধির দ্বারা এরূপ সম্প্রদায়ের পরিপোষণপ্রণালীর উপর বিশেষ বিরক্ত ছিলেন। নীতিবিষয়ে জেম্‌স মিলের মত সম্বন্ধে শুদ্ধ এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে যাহা কিছু জগতের অধিকাংশ প্রাণীর হিতসাধক তাহাই নীতিমার্গানুমোদিত। এতদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু সকলই ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত। তিনি স্ত্রী ও পুরুষজাতির পরস্পর অসঙ্কোচিত মিশ্রণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এরূপ মিশ্রণে সমষ্টিতঃ জগতের মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। সতর্ক

সন্দর্শনাভাবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির কল্পনা অতি দূষিত হইয়া থাকে। পরস্পরের সহিত সম্মিলনেচ্ছা অতি বলবতী হইয়া উঠে। সেই সম্মিলনেচ্ছা প্রতিরোধে অধিকতর বলবতী হইয়া অনেক সময় লজ্জা ভয় অতিক্রম করে। অসঙ্কোচিত মিশ্রণ দ্বারা এই অনিষ্ট নিবারিত হইবার সম্ভাবনা। মিল্ ও তাঁহার সহচরবৃন্দ এই সকল সমাজ ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় মত সকলের বিশেষ উপাসক হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা নিজে এই মতের উপাসক হইয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। বিশেষ উৎসাহের সহিত এই মত সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। জেম্‌স মিলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের এই উৎসাহ কিয়ৎকালের জন্য সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হইল।

আমরা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত মিল্ এবং তাঁহার গুরুজন ও সহচরবৃন্দের বাহ্য জীবন অর্থাৎ মানসিক উন্নতিরূপ জীবনচিত্রের একাংশমাত্র চিত্রিত করিতেছিলাম। আমরা এখনও অন্তর্জীবনের কোন চিত্রই প্রদর্শন করি নাই। এখন আমরা ক্ষণকালের জন্য সেই চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিলাম।

অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে এক জন প্রকৃত বেন্থামিক একটী তর্কযন্ত্রস্বরূপ। ইহাকে অধিক্ষিপ্ত কর, অমনি ইহা হইতে তর্করাশি অনিবার্য্যবেগে বহির্গত হইতে থাকিবে। ইহার হৃদয় শূন্য ও পাষাণবৎ। বেন্থামিকের এই চিত্র যদি কাহারও বিষয়ে কখন সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই নূতন মতে দীক্ষিত হওনের পর দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত মিলের জীবনে হইয়াছিল। তাঁহার তর্কশক্তি তাঁহার হৃদয়ভাবের বিনাশে অস্বাভাবিক রূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ পিতা কর্ত্তৃক তাঁহার অস্বাভাবিক শিক্ষা। জেম্‌স মিল্ পুত্রের হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তি সকল উদ্দীপিত না করিয়া বরং নিযন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি কঠিনহৃদয় বা কোমলতরবৃত্তি-সকলের অগোচর ছিলেন এরূপ নহে। বরং তাঁহাতে ইহার বৈপরীত্যই উপলক্ষিত হইত। কিন্তু তিনি জানিতেন যে হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তি স্বভাবতঃ এত তেজস্বিনী যে ইহা কোন উত্তেজকের অপেক্ষা করে না। স্বতই ইহা আপনার আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া থাকে। ইহা উত্তেজিত হইলে অনেক সময় অনিষ্ট ফল প্রসব করে। তাঁহার এই বিশ্বাসবশতঃ তিনি কখন পুত্রের অন্তরের কোমলতর বৃত্তি সকলের পরিপোষণ করেন নাই। এইজন্য মিলের কোমলতর বৃত্তি সকল ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া উঠিয়াছিল। এই কোমলতর বৃত্তিনিচয়ের নিযন্ত্রণ জন্য কবিতা ও অন্যান্য কল্পনাবিজৃম্ভিত কাব্যসমূহের উপর মিলের বিশেষ অনুরাগ জন্মে নাই। তিনি স্বয়ং কল্পনাবিস্ফূরিত কাব্য পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু কোমলতর বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণ ও পরিমার্জ্জনের জন্য কাব্যপাঠের উপযোগিতা বুঝিতে পারি-

তেন না। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে মিলের অন্তরের এইরূপ অস্বাভাবিক ভাব চিরস্থায়ী হয় নাই। প্লুটার্কলিখিত জীবনাবলী এবং কণ্ডর্সেটলিখিত টর্গটের জীবনচরিত মিলের মনে প্রলয় উত্থাপিত করিল। মানবজাতির প্রকৃত উপকারক মহাত্মাদিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় এতদূর উদ্বেল হইয়া উঠিল, যে এখন হইতে তিনি কাব্যরসামৃত পানে আত্মাকে বঞ্চিত করা পাপ মনে করিতে লাগিলেন।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষে অথবা ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মিল্ বেন্থামের "জুডিসিয়াল্ এভিডেন্স" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সম্পাদনে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে তাঁহার একটী বৎসর পর্য্যবসিতহয়; এবং ইহাতে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। তিনি অপরিণতবয়স্ক হইলেও এই গ্রন্থের সম্পাদনে তাঁহার নাম বিদ্বন্মণ্ডলীতে অতিশয় খ্যাত হইয়া উঠিল। এই কার্য্যে লিপ্ত হওয়ায় মিলের ভূয়সী উন্নতি সংঘটিত হয়। বেন্থাম্ এই গ্রন্থে তাঁহার অলৌকিক চিন্তাশক্তির পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি ইংরাজী ব্যবস্থাশাস্ত্রের যাবতীয় অভাব ও দূষণ স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিয়াছেন। মিল্ এই গ্রন্থের আদ্যন্ত অতি গভীররূপে আলোড়ন করিয়াছিলেন এবং ইহার যে যে স্থল অসম্পূর্ণ ছিল তাহার পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। পুস্তক পাঠাপেক্ষা ইহাতে তাঁহার অধিকতর ফল দর্শিয়াছিল। এখন হইতে তাঁহার রচনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিতর গাঢ় ও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। মিলের প্রথম রচনা সকল অস্পষ্টতা দোষে দূষিত ও শব্দাড়ম্বরপরিপূর্ণ ছিল। এই গ্রন্থের সম্পাদনে এবং গোল্ডস্মিথ্, ফীল্ডিং, প্যাস্কাল, ভল্টেয়ার, ও কোরীয়ার প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থপাঠে তাঁহার রচনা ক্রমশই প্রাঞ্জল ও ভাবোদ্দীপিত হইয়া উঠিল। মিলের রচনার এই নবজাত উৎকর্ষ অচিরকালমধ্যেই পরীক্ষিত হইল। এই সময়ে বিগ্নান্ বেন্থামের "বুক অব ফ্যালাসীস্" নামক অতি প্রসিদ্ধ পুস্তকের সম্পাদন করেন। এই গ্রন্থ ও ইহার সম্পাদন অবলোকন করিয়া পার্লিয়ামেণ্টের অন্যতম সভ্য ও সংস্কারক অতিধনাঢ্য লীড্‌সনিবাসী মিষ্টার মার্সাল্, গ্রন্থকার ও সম্পাদকের উপর বিশেষ প্রীত হইলেন এবং বিগ্নান্ দ্বারা পার্লিয়ামেণ্টের তর্ক বিতর্ক সকল বেন্থামের প্রণালী অবলম্বন করিয়া শ্রেণীবিভক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিগ্নান্, চার্লস অষ্টিনের সাহায্যে এই গুরুতর কার্য্যের সম্পাদকত্ব নিষ্পাদন করিতে লাগিলেন। এই গ্রন্থের নাম "পার্লিয়ামেণ্টের ইতিহাস ও সমালোচন" রাখা হইল। পার্লিয়ামেণ্টের অনেক সভ্য ইহাতে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ষ্ট্রট্, রোমিলি, এবং অষ্টিন্ প্রভৃতি সুবিখ্যাত ব্যবহারাজীবেরাও ইহাতে রচনা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। জেম্স্ মিল্, কুল-

সন্ এবং মিল্ও ইহার লেখকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন। ইহার যশঃ ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার রিভিউয়ের অপেক্ষা অধিকতর হইয়া উঠিল। মিল্ উপর্য্যুপরি ইহার কয়েক খণ্ডে কয়েকটী অতি উৎকৃষ্ট রচনা প্রদান করেন। এই প্রস্তাবগুলিতে মিল্ অন্যের মতসকল উদ্গীরিত না করিয়া নিজের স্বাধীন মত সকল ব্যক্ত করেন। এই সময় হইতেই মিল্ গুরুজনক্ষুণ্ণ পথের অনুবর্ত্তন না করিয়া স্বক্ষুণ্ণ স্বাধীন পথে বিচরণ আরম্ভ করেন।

মিল্ এইরূপে যৎকালে সাধারণের জন্য লেখনী বিচালনে নিযুক্ত ছিলেন, তখনও আত্মশিক্ষা বিধানে শিথিলপ্রযত্ন হন নাই। এই সময় তিনি ও তাঁহার সহচরবৃন্দ হ্যামিল্টনের প্রণালী অবলম্বন করিয়া একত্র জার্ম্মান ভাষা পড়িতে আরম্ভ করেন। এইরূপ সহাধ্যয়নে তাঁহাদিগের বিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল। ক্রমে সহাধ্যায়িবর্গের সংখ্যা দ্বাদশ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বিজ্ঞানের যে যে শাখায় অশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ক্রমে সেই সকলের সহাধ্যয়নে ও সহবিচারণায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের এই কার্য্য সাধনের জন্য গ্রোট্ নিজগৃহে তাঁহাদিগকে একটী ঘর প্রদান করেন। এই সময় হিতবাদসভার অন্যতম সভ্য প্রেস্কট্ ও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হন। সপ্তাহে দুই দিন প্রাতঃকালে ৮½ হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত এই অজ্ঞাত সভার অধিবেশন হইত। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। জেম্স্ মিল্ লিখিত "এলিমেণ্টস" নামক পুস্তক তাঁহাদিগের প্রথম পাঠ্য পুস্তক হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন এই পুস্তকের কিয়দংশ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে সেই অংশের উপর তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইত। যাঁহার যে কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিত অতি সামান্য হইলেও তিনি ইহা উত্থাপন করিতেন। যতক্ষণ বা যতদিন সেই আপত্তির মীমাংসা না হইত, ততক্ষণ বা ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা এতদ্বিষয়ক তর্ক বিতর্ক হইতে বিরত হইতেন না। এইরূপে তাঁহারা জেম্সের পুস্তক সমাপন করিয়া রিকার্ডো বেলী প্রভৃতির পুস্তক পাঠ আরম্ভ করিলেন। এই সকল পুস্তক বিষয়ক তর্ক বিতর্ক উপলক্ষে অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক স্বাধীন ও নূতন মত সকল তাঁহাদিগের মুখ হইতে বিনির্গত হইতে লাগিল। অবশেষে মিল্ তাঁহার স্বাধীন ও নূতন মতসকল "অর্থনীতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় অমীমাংসিত প্রশ্নাবলীর মীমাংসা" নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলেন।

অর্থনীতিশাস্ত্র সমাপন করিয়া তাঁহারা ন্যায়দর্শনের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার গ্রোট্ তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে অ্যাল্ড্রিচের পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহার উপর বিরক্ত হইয়া অচিরকাল মধ্যে জেসুয়িট ডিউ ট্রিউ লিখিত ন্যায়-

দর্শন অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ইহা সমাপ্ত করিয়া প্রথমে হোয়েট্লির ন্যায়-দর্শন এবং অবশেষে হবসলিখিত "কম্পিউ-টেসিও সিব্ লজিকা" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া এই বিভাগ সমাপ্ত করিলেন। এবারেও পূর্ব্বের ন্যায় অনেক পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবিত ও তাহাদিগের মীমাংসা নিষ্পা-দিত হইল। মিল্ পরিণত বয়সে ন্যায়-দর্শন বিষয়ে যে পুস্তক রচনা করেন, তাহা অনেক পরিমাণে এই সকল তর্কবিতর্কের ফল।

মিল্ ও তাঁহার সহাধ্যায়িবর্গ ন্যায়দর্শন সমাপ্ত করিয়া মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের আলো-চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হার্টলের পুস্তকা-বলী তাঁহাদিগের পাঠ্য পুস্তক হইল। হার্টলের পুস্তকসকল সমাপ্ত হইলে তাঁ-হাদিগের সভা কিছু কালের জন্য বন্ধ হয়। অবশেষে জেম্‌স মিলের "অ্যানালিসিস্ অব্ দি মাইণ্ড" নামক পুস্তক প্রকাশিত হইলে ইহার অধ্যয়নের নিমিত্ত তাঁহারা পুনঃসমবেত হন। এইবার তাঁহাদিগের সহাধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। এই সহাধ্যয়ন-কালীন তর্ক বিতর্ক হইতেই মিলের স্বা-ধীন ও নূতন মতসকল উদ্ভাবিত হয়। এতদিন তাঁহারা অতি নিভৃতভাবে বক্তৃতা অভ্যাস করিতেছিলেন। এক্ষণে ১৮২৫ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রকাশ্য স্থলে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। রীবেক, চার্লস অষ্টিন্, উইলিয়ম্ টম্‌সন্, লর্ড ক্লারণ্ডন্, গেল্ জোন্‌স, থির্লওয়াল্, মেকলে, মক্কলক্, উইল্‌বারফোর্স, হাইড, রোমিলী, লর্ড সিডেনহাম, বুল্ওয়ার, ফন্‌ব্লাঙ্ক, হেওয়ার্ড, সী, ককবরন্, মরিস্, ষ্টার্লিং প্রভৃতি অসংখ্য পণ্ডিতমণ্ডলী এই সকল প্রকাশ্য বক্তৃতায় অংশ লইতে লাগিলেন। উন্নতিশীল ও স্থিতিশীল দুই দলের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। প্রত্যেক দলকেই স্বমতের পরিপোষক গভীর ও দুর্ভেদ্য যুক্তিসকল প্রদর্শন করিতে হইল। প্রত্যেক দলেরই প্রতি-পক্ষদলের যুক্তি সকল খণ্ডন ও তাঁহাদিগের মতসকলের ভ্রমসঙ্কুলতা প্রদর্শন করিতে হইত। তর্ক বিতর্কে সকলেরই, বিশেষ মিলের, অতিশয় উপকার দর্শিয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও মিলের বাগ্মিতাশক্তি জন্মে নাই। তিনি কখনই অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে বক্তৃতা সকল লিখিয়া আনিতে হইত। তথাপি তাঁহার বক্তৃতাসকল সারগর্ভ হওয়ায় প্রায়ই শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গ্রাহিণী হইত।

এইরূপ প্রকাশ্য বক্তৃতা সকল প্রস্তুত করিতে তাঁহার অনেক সময় ব্যয়িত হইত। এই জন্য তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ লিখিতে বিরত হইলেন। এই রিভিউ এক্ষণে অতি দুর-বস্থায় পতিত হইয়াছিল। যদিও ইহার প্রথম সংখ্যার বিক্রয় যথেষ্ট হইয়াছিল, তথাপি ইহার নিয়মিত আয় ইহার ব্যয়-নির্ব্বাহে কখনই পর্য্যাপ্ত হয় নাই। এই জন্য ইহার ব্যয় সংক্ষেপ করা হইল। সম্পাদকদ্বয়ের অন্যতর সদরন্ তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিলেন। জেম্‌স মিল্,

মিল্ এবং অন্যান্য, যাঁহারা অর্থ লইয়া ইহাতে লিখিতেন, এক্ষণে ইহাতে নিঃস্বার্থ ভাবে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তথাপি ইহার আয়—ব্যয়নির্ব্বাহে সমর্থ হইল না। সুতরাং নূতন বন্দোবস্তের প্রয়োজন হইল। জেম্‌স মিলের এ বিষয়ে বাউরিঙের সহিত অনেক কথোপকথন হইয়াছিল। বাউরিঙও বেতনভোগী ছিলেন। জেম্‌স মিল্ ও মিলের ইচ্ছা ছিল যে বাউরিঙ তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং একজন অবৈতনিক সম্পাদক তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন। বাউরিঙ তাঁহাদিগের নিকটে এ বিষয়ে সম্মত হইলেন। কিন্তু তিনি ভিতরে ভিতরে অপরের সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। ইহাতে জেম্‌স মিল্ ও মিল্ উভয়েই অতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং উক্ত রিভিউয়ের সহিত তাঁহাদিগের সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন।

ক্রমশঃ।

গ্রীক্ ও যবন।

আমরা পূর্ব্বসংখ্যায় গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি পাশ্চাত্যভাষা ও হিব্রু ভাষার প্রমাণপ্রয়োগ উল্লেখ পূর্ব্বক "যবন" শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে সংস্কৃতভাষার আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক এরূপ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব যে "যবন" শব্দে কোনক্রমেই কেবল গ্রীসদেশের অধিবাসীদিগকে বুঝাইতে পারে না। অনেক সংস্কৃত শাব্দিকেরা "যু" ধাতু হইতে "যবন" শব্দের ব্যুৎপত্তি সাধন করিয়া থাকেন। "যু" ধাতুর অর্থ মিশ্রণ, সুতরাং "যু" ধাতুনিষ্পন্ন যবনশব্দে কোন বিমিশ্র অর্থাৎ জাতিভেদরহিত জাতিকে বুঝায় এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।* এই রূপ অর্থে পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রীসদেশীয় আইয়োনীয় নামক সঙ্কীর্ণ জাতিকে বুঝাইতে পারে বটে, কিন্তু কোন সংস্কৃতগ্রন্থেই এরূপ প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ দ্রুতপাদবিক্ষেপার্থক "জু" ধাতু হইতে "জবন" শব্দের ব্যুৎপত্তি নিষ্পাদন করেন। এরূপ ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিলে "জবন" শব্দে কোন নির্ভীক সাহসী ও হঠচারী জাতিকে বুঝিতে হইবে। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, গর্ভবাচী সংস্কৃত "যোনি" শব্দ হইতে "যবন" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পরস্পর বিবাদের সময় বিশ্বামিত্রের সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বশিষ্ঠধেনুর গর্ভ হইতে যবনজাতির সমুদ্ভব হইয়াছিল, ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের পুরাবৃত্তে ইত্যাকার একটী উপাখ্যান আছে। বোধ

* যৌতি মিশ্রয়তি, মিশ্রীভবতি বা জাতিভেদাভাবাৎ ইতি যবনঃ। যুস মিশ্রণে অস্মাৎ অনট্।

হয় এই উপাখ্যানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার উদ্দেশেই প্রাচীনতম বৈয়াকরণেরা যবনশব্দের উক্তবিধ ব্যুৎপত্তি করিয়া থাকিবেন। যদি যবনশব্দ "যু" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ইহাই যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে সংস্কৃত "যুবন্" ও বিবেচ্য "যবন" উভয় শব্দই একমূলক। এরূপ হইলে সংস্কৃত "যবন" শব্দে গ্রীক্ ও এতদ্দেশীয় বিভিন্নপ্রকার জাতির সংস্রবে সঙ্কীর্ণ আসিয়াপ্রবাসী গ্রীকদিগকে বুঝাইতে পারে। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে সংস্কৃত "যবন" শব্দ আসিয়ামাইনর নামক প্রদেশে উদ্ভূত হইয়া ক্রমে ভারতবর্ষের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। পক্ষান্তরে লাটিন "যুবেনিস" (Juvenis) স্যাক্সন "য়ঙ্"(Iong) ওলন্দাজ "জঙ্"(Jong) সুইডিস ও দিনেমার "যুঙ" (Ung) গথিক "যুগস," (Juggs) জেণ্ড "জিবান" (Givan) ও সংস্কৃত যবন (যবন) এই কয়টী শব্দের পরস্পর এরূপ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, যে তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিলে অবশ্যই প্রতিপন্ন হইবে যে আর্য্যজাতীয়দিগের সাধারণ বাস্ত মধ্য আসিয়াতেই যবন শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। তাহার পর উহাদিগের স্বস্থানত্যাগ ও বিদেশগমনের সময় উক্ত শব্দটীও তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গেই দেশ বিদেশে সঞ্চারিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকিবে।

সে যাহা হউক সংস্কৃত যবন শব্দটী যে জাতিবাচী তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বাবয়বেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। মহর্ষি পাণিনিপ্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণ এক খানি প্রাচীনতম গ্রন্থ। পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর চতুর্থ অধ্যায়ে যবনজাতীয়দিগের লিপি এই অর্থ বুঝাইতে "যবনানী" এই শব্দ ব্যবহার্য্য বলিয়া একটী সূত্র লিখিত আছে। * ঐ সূত্রে স্ত্রীত্যস্থলে "আনুক্" আগমের কোথায় কি অর্থ তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ সূত্র দ্বারা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে পাণিনির সময়ে জাতিবাচক যবনশব্দের বহুল প্রচার ছিল। গোল্ডষ্টুকর প্রভৃতি পাশ্চাত্য অধ্যাপকেরা খৃষ্টাবতারের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পাণিনির কাল নিরূপণ করিয়াছেন। সুতরাং উহাঁদের গণনানুসারে প্রায় দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল পাণিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আমরা পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ সবিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকরের গণনা সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত হয় নাই। পাণিনি উহা অপেক্ষা ও অনেক বৎসর

* ইন্দ্র বরুণ ভব শর্ব্ব রুদ্র মৃড়হিমারণ্য যব যবন মাতুলাচার্য্যাণামানুক্। (যবনাল্লিপ্যাম্) যবনানাং লিপি যবনানী।) ৪।১।৪৯।

পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে যে গণনাই অভ্রান্ত হউক না কেন ব্যাকরণকার যে বহুকালের প্রাচীন লোক তাহাতে আর মতভেদ নাই। সুতরাং তাঁহার সময়ে প্রচলিত জাতিবাচক যবনশব্দ কি প্রকারে গ্রীসের অধিবাসীদিগকে বুঝাইতে পারে? আবার পাণিনির সময়েই যে উক্ত শব্দের প্রথম সম্ভব হয় একথাও কোন মতেই স্বীকার করা যায় না। তিনি যখন সাধু-ব্যবহার নির্ণয় করিবার জন্য অনুশাসন করিয়াছেন তখন তাঁহার অনল্পকাল পূর্ব্ব হইতেই যে উহার প্রচার ছিল ইহা এক প্রকার নিঃসন্দেহ। অধুনাতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের গবেষণাদ্বারা স্থির হইয়াছে যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের পূর্ব্বে গ্রীসদেশে লিখিনপ্রণালীর সৃষ্টি হয় নাই। মহাকবি হোমরের গ্রন্থাবলী কেবল শ্রুতিপরম্পরাদ্বারাই অধস্তন সময়ের হস্তে প্রহিত হইয়াছিল। অতএব গ্রীসদেশে লিখনপ্রণালী উদ্ভাবনের পূর্ব্বে আর পাণিনি যবনানীশব্দে যবনদিগের লিপি বুঝাইতে, যবনশব্দে গ্রীকদিগকে বুঝিতে হইবে এরূপ কখনই মনে করেন নাই। ইহা দ্বারা স্পষ্টই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়, যে পাণিনিপ্রযুক্ত যবনশব্দের অর্থ ভিন্নপ্রকার। ইহাদ্বারা গ্রীকদিগকে প্রতিপাদন করা কোন প্রকারেই সূত্রকারের অভিপ্রায় হইতে পারেনা। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দের প্রারম্ভে পাণিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যদি ইহাঁর সিদ্ধান্তই প্রামাণিক ও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও পাণিনিপ্রযুক্ত যবনশব্দের অর্থে গ্রীকদিগকে বুঝাইতে হইলে উহা বিবাদপদ হইয়া উঠে, কারণ গ্রীসদেশে লিখনপ্রণালী উদ্ভাবনের অব্যবহিত পরেই উহাদিগের লিপিবাচী যবনানীশব্দ শত সহস্র ক্রোশ দূরস্থ ভারতবর্ষের হৃদয়াভ্যন্তরে যে বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছিল, ও উহার ব্যাখ্যা ও অর্থনির্দ্দেশ করা বৈয়াকরণের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াছিল এ কথা অসংখ্য যুক্তিসত্ত্বেও বিশ্বাস করা যায় না। এরূপ কুতর্কের প্রতি কেহই শ্রদ্ধা করিতে পারেন না।

অধ্যাপক গোল্‌ডষ্টুকর তাঁহার প্রণীত পাণিনিবিচারনামক গ্রন্থের অন্যতম স্থলে যবনশব্দের ব্যাখ্যা উপলক্ষে বলিয়াছেন যে, "পাণিনিধৃত যবনানী শব্দের অর্থ পারস্যবাসীদিগের লিপি। এই বর্ণমালা পারস্যরাজ ডেরায়সের সময়েও তাঁহার রাজ্যে প্রচলিত ছিল। তৎকালে ভারতবর্ষবাসী আর্য্যেরা উক্ত-প্রকার পারস্যদেশীয় বর্ণমালার বিষয় সবিশেষ বিদিত ছিলেন, উহা সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। এই জন্যই তদানীন্তন কালের লিখিত ব্যাকরণাদি শব্দগ্রন্থে উহার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়।" ইহা দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে, যে উপরি উল্লিখিত

পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যেটীই অবলম্বন করা যাউক না কেন, কোন মতেই আইয়োনিয়াবাসী গ্রীকেরা যবনশব্দের প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। বরং পারস্য বা আসীরিয়ার অধিবাসীরাই ইহার প্রতিপাদ্য ইহাই সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর বলেন যে পাণিনি যে প্রকার লিপির উল্লেখ করিয়াছেন, উহা সিমিতিক। অধ্যাপক বলেন, " যবনশব্দে কেবল যে গ্রীক বা আইয়োনীয়দিগকে বুঝাইতেছে ইহা কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। অধ্যাপক ল্যাসেন নানাবিধ যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক সপ্রমাণ করিয়াছেন যে যবনশব্দ কেবল গ্রীকবাচী নহে। ইহার তাৎপর্য্য অধিকতর ব্যাপক। ইহা দ্বারা সিমিতিক জাতীয়দিগকেও বুঝিতে হইবে।"

পাণিনি, মহাবীর অ্যালেক্জাণ্ডার অপেক্ষা অধস্তন এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে কিছুমাত্র অনুকূল তর্ক নাই। আর ব্যাকরণকার যে গ্রীকভাষা ও গ্রীক্ সাহিত্যবিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন ইহাও বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। ললিতবিস্তরনামক বৌদ্ধগ্রন্থে নানাবিধ বর্ণমালার উল্লেখ আছে, কিন্তু উহার কুত্রাপি যবনানী অর্থাৎ গ্রীসদেশীয় বর্ণমালার কিছুমাত্র প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ এরূপ নির্দ্দেশ করেন, যে পাণিনি ও অ্যালেকজণ্ডরের পূর্ব্বে এক প্রকার সিমিতিক বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, উহাই ভারতবর্ষপ্রচলিত কতিপয় বর্ণমালার আদর্শস্বরূপ। পাণিনি যবনানীশব্দে উক্ত সিমিতিক বর্ণমালাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অধ্যাপক ল্যাসেন পাণিনিকে চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; এরূপ হইলে যবনানীশব্দে কথঞ্চিৎ গ্রীসদেশীয় বর্ণমালা বুঝাইতে পারে বটে, কিন্তু ম্যাক্সমুলর, গোলড্‌ষ্টকর, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতিপ্রভৃতি প্রগাঢ় অধ্যাপকগণ পাণিনিকে বুদ্ধদেবের অপেক্ষা ও ঊর্দ্ধতন বলিয়া সুচারুরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। পাণিনি বুদ্ধদেবের অপেক্ষা প্রাচীনতর এরূপ স্থির হইলে উহার উল্লিখিত যবনানীশব্দের অর্থ গ্রীকদিগের বর্ণমালা এরূপ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা বালপ্রলপিতমাত্র সন্দেহ নাই।

মানবধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক স্থলে শক, যবন, কাম্বোজ প্রভৃতি কতিপয় বিধর্ম্মী অসভ্য জাতির উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে ইহাদিগের বাসস্থান ছিল। কিন্তু সংহিতার কুত্রাপি উল্লিখিত জাতিদিগের প্রকৃত স্বরূপ প্রভৃতির কিছুমাত্র বিশেষ নিশ্চায়ক নাই। সংহিতার দশম অধ্যায়ে কথিত আছে, † যে 'পৌণ্ড্রক,

† শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ। পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খশাঃ। (১০ অধ্যায়ঃ।)

উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন (জবন), শক, পারদ, অপহ্নব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতীয়েরা উপনয়নাদি সংস্কারলোপ ও ব্রাহ্মণসেবাত্যাগ এই দুই কারণে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহারা সাধারণে সাধুভাষী, হউক বা ম্লেচ্ছ-ভাষীই হউক, দস্যুনামে অভিহিত হইতে পারে। এতাবতা প্রতিপন্ন হইতেছে যে সংহিতায় উল্লিখিত যবনশব্দের অর্থে গ্রীকদিগকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ভারতবর্ষীয় পতিত ক্ষত্রিয়েরা অন্যান্য জাতির সহিত সংস্রবে নানাবিধ সঙ্কীর্ণ জাতির উদ্ভব করে। যবনজাতীয় লোকেরাও উক্ত সঙ্কীর্ণ জাতিসমূহের অন্যতম, ইহাই সংহিতার উল্লিখিত যবন-শব্দের তাৎপর্য্য হইতে পারে। আত্রেয়-ব্রাহ্মণের মধ্যেও দস্যু ও ম্লেচ্ছশব্দে এই প্রকার পতিত ক্ষত্রিয়েরাই অভিহিত হইয়াছে। (Haug's Atraiya Brahmana.)

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে কতিপয় বিধর্ম্মীজাতির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "চণ্ডাল, ব্রাত্য, ও বৈদ্য নামে তিনটী স্বতন্ত্র পতিত জাতি আছে, ইহারা শূদ্রের ঔরসে ও যথাক্রমে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে।" এই পর্ব্বেরই অপর একটী স্থলে কথিত আছে, যে "শক, যবন, কাম্বোজ, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, পুলিন্দ, উশীনর, প্রভৃতি কতিপয় সম্প্রদায় ক্ষত্রিয়েরাও ব্রাহ্মণসেবা ত্যাগহেতুক বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আদিপর্ব্বের যযাত্যুপাখ্যাননামক প্রবন্ধে লিখিত আছে যে যবনেরা নহুষাত্মজ যযাতির দ্বিতীয় পুত্র তুর্ব্বসুর বংশীয়। পিতার প্রতি অভক্তিপ্রকাশ করাতে ইহারা ধর্ম্মে পতিত হয়।

বিষ্ণুপুরাণেও মহাভারতের মতই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। উক্ত পুরাণে ভারতবর্ষের সীমানির্ণয়প্রসঙ্গে কথিত আছে, যে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে কিরাতদিগের বাস। পশ্চিমসীমায় যবনদিগের আবাস-ভূমি। আর মধ্যভাগ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই কয়েকটী আর্য্যধর্ম্মপরায়ণ জাতির অধিকৃত। (Wilson's Visnu Purana P. 37) বিষ্ণুপুরাণের অপর একটী স্থানে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত হৈহয় তালজঙ্ঘ ও যবনদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল এরূপ বর্ণনা আছে। যবনেরা এই যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে বিজেতৃসেনারা শাস্তিস্বরূপ উহাদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেয়। কথিত আছে, যবনেরা সেই অবধি আবহমান কাল পর্য্যন্ত মস্তকমুণ্ডন করিয়া আসিতেছে। তদবধি ইহা তাহাদিগের জাতীয় ব্যবহার হইয়া উঠিয়াছে। আইয়োনীয় গ্রীকদিগের বিষয়ে যতদূর অবগত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা কখনই এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না যে উহারা কোন কালেই উল্লিখিত প্রকারে মুণ্ডিতকেশ হইয়াছিল। অতএব বিষ্ণুপুরাণের মতের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র শ্রদ্ধা করিতে হইলেও সংস্কৃত যবনশব্দে গ্রীকদিগকে বুঝায় ইহা

কোন প্রকারেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না।

এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুপুরাণের আর দুই তিনটী স্থলেও যবনজাতির নামোল্লেখ আছে. কিন্তু তত্তৎস্থলের কুত্রাপি উহাদের স্বরূপ প্রকৃতি ও বাসস্থান প্রভৃতির পরিচায়ক কোন বিশেষ গুণের উল্লেখ নাই। কেহ কেহ বলেন যে বিষ্ণুপুরাণের কথায় তাদৃশ আস্থা করা যাইতে পারেনা। বিষ্ণুপুরাণ যে অতিশয় পুরাতন গ্রন্থ তাহার কিছু-মাত্র প্রমাণ নাই। বরং প্রতিকূল যুক্তি-বিরহে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে গ্রীকদিগের কর্ত্তৃক আফ্‌গানিস্তান অধিকৃত হইবার পর কোন না কোন সময়ে উহার রচনা হইয়া থাকিবে। বিষ্ণুপুরাণের প্রাচীনতরতা সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে, কিন্তু এরূপ করিয়া প্রস্তাববাহুল্যের প্রয়োজন নাই। বিষ্ণুপুরাণের মত পরিত্যাগ করিয়া কেবল মহাভারত ও মনুসংহিতার উপর নির্ভর করিলেও আমাদের যুক্তিই অপ্রতিহত থাকিতেছে। মনুসংহিতা ও মহাভারতে যে যবন জাতির উল্লেখ আছে তাহারা বহুকাল হইতেই ভারতবর্ষের প্রান্তনিবাসী, সুতরাং কেবল মহাভারত ও মনুসংহিতার উপর নির্ভর করিয়াই এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে গ্রীসদেশের অধিবাসীরা কোন প্রকারেই সংস্কৃত যবন শব্দের প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। এই মহাভারত ও মনুসংহিতার উপর নির্ভর করিয়া ইহাও বলা যাইতে পারে যে আসিয়াপ্রবাসী গ্রীকেরাও উক্ত যবনশব্দের অভিধেয় হইতে পারে না। অতএব কেবল উচ্চাচরণ ও শব্দসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া গ্রীক ও যবনদিগের পরস্পর অভিন্নতাপ্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা কোন ক্রমেই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত বলিয়া প্রতীতি হয় না।

তবে মহাভারতের অপর এক স্থানে কতিপয় যবনজাতির উৎপত্তিবিষয়ে একটী উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। উহা বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীরা স্বপক্ষের অনুকূল যুক্তি বলিয়া প্রতিপাদন করেন, কিন্তু বিবে-চনা করিয়া দেখিলে পর্য্যবসানে উহা আমাদের মতেরই পোষক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। অতএব উক্ত উপা-খ্যানের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা না করিয়া সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিলে উহা যুক্তিসঙ্গত হইবে না বিবেচনা হওয়াতে এ স্থলে উহার উল্লেখ করা যাইতেছে। "কোন সময়ে কান্যকুব্জ প্রদেশের রাজা মহারাজ গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র মৃগয়া উপলক্ষে মহর্ষি বশিষ্টের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বশিষ্ট যথাবিধানে অতিথিসৎকার পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে নানাবিধ বহুমূল্য বসন ভূষণ ও রত্নালঙ্কার উপহার প্রদান করিলেন। বশিষ্টের নন্দিনী নামে সর্ব্বকামদুঘা একটী গাভি ছিল। নন্দিনীর প্রসাদে মহর্ষির কিছুরই অভাব হইত না। তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত, প্রার্থনা-মাত্র নন্দিনী তাঁহার মনোরথ সিদ্ধি করিত। বিশ্বামিত্র এই অদ্ভুত ব্যাপার

অবগত হইলেন। নন্দিনীকে আত্মসাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার যৎপরোনাস্তি লালসা জন্মিল। তিনি কোন মতেই লোভসম্বরণ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি বশিষ্টের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, এবং কহিলেন "মহর্ষে! আমি আপনাকে শত কোটি পয়স্বিনী গাভি উপহার প্রদান করিতেছি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে এই সর্ব্বকামদুঘা গাভি প্রদান করুন। যদি ইহাতেও সম্মত না হন, আমি আপনাকে আমার সমুদয় রাজত্ব পর্য্যন্ত দান করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।" বশিষ্ট বিশ্বামিত্রের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। তিনি কহিলেন, "রাজন্! আপনার সমস্ত রাজ্য অপেক্ষাও আমার নন্দিনীর মূল্য অধিক। আমি মহারাজের সমস্ত রাজ্যের পরিবর্ত্তেও আমার গাভিকে হস্তান্তর করিতে পারি না।" বিশ্বামিত্র হতাশ হইয়া ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। কহিলেন "ঋষে! আপনার গাভি আমি অবশ্যই গ্রহণ করিব। আমি প্রবল, আপনি দুর্ব্বল। আমি ক্ষত্রিয়, আপনি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের বল নাই। তপস্যা ও অধ্যয়ন এই দুইটীই ব্রাহ্মণের কার্য্য। অতএব প্রবল ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের বল কোথায়? যদি আপনি সহজে আপনার গাভি আমাকে না প্রদান করেন, আমি উহা অবশ্যই বলপ্রয়োগপূর্ব্বক গ্রহণ করিব।" বশিষ্টদেব আপন বল বিলক্ষণ বুঝিতেন। তিনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন "তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার। কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই।" বশিষ্টের গর্ব্বিতবচনে বিশ্বামিত্র ক্রোধান্ধ হইয়া কামধেনুকে আক্রমণপূর্ব্বক কশাঘাত করিতে লাগিলেন ও নিজরাজধানীর অভিমুখে লইয়া যাইবার জন্য অন্যান্য নানাবিধ প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নন্দিনী আশ্রম ত্যাগ করিয়া এক পদও অগ্রসর হইলনা। বশিষ্ট নন্দিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন। "এক্ষণে আমি কি করিব?" নন্দিনী মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিল। "মহর্ষে! আপনি কি জন্য বিশ্বামিত্রকৃত আমার এতদূর অপমান সহ্য করিতেছেন? ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করা কি আপনার কর্ত্তব্য নহে।" বশিষ্ট উত্তর করিলেন। "নন্দিনি! তেজ ক্ষত্রিয়দিগের বল, আর ক্ষমাই ব্রাহ্মণদিগের বল। আমার অন্তঃকরণ ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার আধার। অতএব এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি, ইচ্ছা হয় তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পার।" নন্দিনী জিজ্ঞাসা করিল। "মহর্ষে! আপনার মনের ভাব কি আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি কি আমাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন! যদি আমাকে পরিত্যাগ করিতে আপনার মনোগত ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে বিশ্বামিত্র সহস্র বলপ্রকাশ করিলেও আমাকে লইয়া যাইতে পারেনা।" বশিষ্ট কহিলেন, "তোমাকে ত্যাগ করিতে

আমার অণুমাত্র ইচ্ছা নাই। তুমি ইচ্ছা করিলেই আমার আশ্রমে থাকিতে পার।” মহর্ষির কথায় শ্রদ্ধা করিয়া নন্দিনী বুঝিতে পারিল, যে তাহার প্রতি তাহার প্রভুর যথার্থ স্নেহ আছে। নন্দিনী বিশ্বামিত্রের অসদাচরণে যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বশরীর হইতে অগ্নিশিখা প্রবলবেগে বিনির্গত হইতে লাগিল। সর্ব্বাবয়ব হইতে দ্রাবিড়, শক, যবন, শবর, শরভ, কিরাত, সিংহল প্রভৃতি নানাজাতীয় অস্ত্রধারী সৈন্যসমূহ উদ্ভূত হইয়া বিশ্বামিত্রের প্রবল সেনাবলকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিল। বিশ্বামিত্র লজ্জায় অধোবদন হইয়া বুঝিলেন যে ক্ষত্রিয়ের বল ব্রাহ্মণের বলের নিকট কোন কার্য্যেরই হইতে পারেনা। ফলে ব্রাহ্মণের বলই প্রকৃত বল। ব্রাহ্মণ্যই জগতের মধ্যে সার পদার্থ। এই রূপ সংস্কার হওয়াতে বিশ্বামিত্র সংসারবিরাগী হইয়া রাজ্য ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির আশয়ে কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন।

শল্যপর্ব্বে এই উপাখ্যানটীর পুনরুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তথায় অনেক স্থলে পূর্ব্ববর্ণিত পাঠের সহিত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। রামায়ণের আদিকাণ্ডেও এই উপাখ্যানটীর সবিস্তর উল্লেখ আছে। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, রামায়ণ প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থে এই উপাখ্যানটীর উল্লেখ আছে যথার্থ বটে, কিন্তু কুত্রাপি এরূপ বিনিগমনা কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা উক্ত যবনাদি অসভ্য বর্ব্বরদিগের স্বরূপনির্ণয় করা যাইতে পারে। টীকাকারেরা বলিয়া থাকেন, যে উল্লিখিত উপাখ্যানে যবনজাতীয়দিগের উৎপত্তির বিষয় বর্ণিত আছে, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে পারা যায়না, কারণ যবনাদি বর্ব্বরজাতীয়েরা বর্ণিত ঘটনার পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে বাস করিতেছিল। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্টের পরস্পর যুদ্ধের সময় বশিষ্ট উহাদিগকে সাহায্যার্থ ভারতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন এই মাত্র। যবন প্রভৃতির উৎপত্তিবর্ণনা করা উক্ত উপাখ্যানের উদ্দেশ্য হউক, আর নাই হউক, উহার মর্ম্ম অনুধ্যান করিলে অবশ্যই প্রতীতি হইবে, যে উল্লিখিত সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় জাতির মধ্যে একটী তুমুল সংগ্রাম ঘটিয়াছিল। ঐ ঘটনাটীই বশিষ্ট বিশ্বামিত্রের উপাখ্যানে নিবদ্ধ হইয়াছে। বশিষ্টধেনুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে নানাবিধ অসভ্য জাতির উদ্ভব হইয়াছিল, উপাখ্যানের এই অংশ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দিগের প্রবলতর সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া সাহায্যার্থে যবননামক পতিত ক্ষত্রিয়দিগকে সমরক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই প্রাচীন যুদ্ধে আহূত যবনদিগকে ইউরোপীয় বা আসিয়িক গ্রীকদিগের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। এই

উপাখ্যানটী কত কাল পূর্ব্বের রচিত এক্ষণে তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। ইহাতে বর্ণিত সংগ্রামের অধিনায়কদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঋগ্বেদ সংহিতার কোন কোন স্থানের রচয়িতা। ফলে বশিষ্ট বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ যে আর্য্যসমাজের প্রবর্ত্তয়িতা তাহা আর কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই সকল সমাজপ্রবর্ত্তয়িতা বেদরচয়িতা মহর্ষিগণ যে আইয়োনীয় গ্রীকদিগকে যুদ্ধের সাহায্যার্থে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ করাই বিশুদ্ধ ধৃষ্টতার কার্য্য। বিচারের ত কথাই নাই। তবে আইয়ো ও বশিষ্টবিশ্বামিত্রঘটিত উভয় উপাখ্যানের অসাধারণ সাদৃশ্যের প্রতি মনোনিবেশ করিলে সহসাই উভয়ই এক ও অভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হইবার সম্ভাবনা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গোরূপধরা আইয়োর গর্ভে আইওনীয়দিগের উৎপত্তি ও সুরভিকন্যা বশিষ্টধেনুর গর্ভে যবনজাতির সমুদ্ভব, এই দুইটী শ্রবণমাত্র কাহার না এক বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি জন্মে! কিন্তু উভয় ঘটনার সময়ের প্রতি মনোনিবেশ করিলে উভয়ের সাদৃশ্য পর্য্যবসানে কেবল ঘুণাক্ষরের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে সংশয় নাই! ঋগ্বেদসংহিতার নানা স্থানে বশিষ্ট ও বিশ্বামিত্রের পরস্পর বিবাদের বিষয় বারম্বার উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কুত্রাপি যবনদিগের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। অন্যান্য কতিপয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণের মধ্যেও উক্তপ্রকার বিবাদের বিষয় উল্লিখিত আছে, কিন্তু কোথায়ই যবনজাতির নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ লোভান্ধতা ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার, এই উভয় কারণে বিশ্বামিত্রের প্রতি তদানীন্তন ব্রাহ্মণেরা যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়াছিলেন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাদিগের বিরক্তির ফলস্বরূপ বিশ্বামিত্র নানা স্থানে নিন্দিত হইয়াছেন। যৎকালে ঐ ঘটনা হয়, তখন কেবল ভূমি ও গোধন এই দুইটীই সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত ছিল। সুতরাং ঐ সময়ের অধস্তন পৌরাণিকেরা বশিষ্টদেবের গাভিকে সর্ব্বকামদুঘা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের নানা স্থানে গোধন প্রাপ্তির উদ্দেশে বশিষ্ট কর্ত্তৃক ইন্দ্রের স্তব দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদের দুই একটী স্থলেও উল্লিখিতপ্রকার সর্ব্বকামদুঘা গাভির বর্ণনা আছে। ডাক্তার মিয়োর সাহেব তাঁহার "সংস্কৃত মূল সংগ্রহ" নামক গ্রন্থের মধ্যে উক্তপ্রকার কতিপয় শ্লোকের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। ঐ কয়েকটী স্থলের স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণের গোধনাপহারী দুষ্ট ক্ষত্রিয়ের ধন, মান, ধর্ম্ম, বল, বুদ্ধি তাবৎ পদার্থই লোপ প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণের হোমধেনুর এরূপ প্রভাব, যে উহার অপমান করিলে ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বস্বান্ত পর্য্যন্ত হইতে পারে। (Muir's Sanskrit Texts vol. I. pp, 285—288) এতাবতা নিঃসন্দেহ প্রতীত হইতেছে, যে কোন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের গোধন

অপহরণ করিতে চেষ্টা করাতে উঁহাদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ হইয়াছিল। ইহাই বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রঘটিত উপাখ্যানের তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্য অবলম্বন করিয়াই পুরাণরচয়িতৃগণ উল্লিখিতপ্রকার উপাখ্যানের কল্পনা করিয়াছেন। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে সর্ব্বসাধারণেরই বিশ্বাস হইবে যে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান ও গ্রীসদেশীয় আইয়োর উপাখ্যান এ উভয় কোন ক্রমেই এক ও অভিন্ন হইতে পারে না।

কর্ণপর্ব্বে শল্য ও কর্ণের কথোপকথনস্থলে যবন প্রভৃতি বিধর্ম্মী জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

আবার শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের প্রশ্নোত্তরস্থলে ভীষ্মদেব সিন্ধুসৌবীর, উশীনর, প্রাচ্য, যবন, কাম্বোজ, ও দাক্ষিণাত্য এই কয়েকটী জাতির উল্লেখ করিয়া প্রত্যেকের সাহস বীর্য্য প্রভৃতির বিশেষ বর্ণন করিয়াছেন দেখা যাইতেছে। অধুনাতন কাণ্ডাহার প্রদেশে গান্ধারদিগের বসতি ছিল। সিন্ধুসৌবীরজাতীয়েরা সিন্ধুতীরবাসী। কাণ্ডাহারের দক্ষিণাংশে উশীনরেরা বাস করিত। মণিপুর, ত্রিপুরা, কাছাড় প্রভৃতি স্থানে প্রাচ্যদিগের বাস ছিল। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমায় হিন্দুকুস পর্ব্বতের নিকটে কাম্বোজেরা বাস করিত। যবনেরা সর্ব্বদাই কাম্বোজদিগের সহিত একত্র বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং উহাদিগকে কাম্বোজদিগের প্রতিবাসী বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে যবনেরা অধুনাতন ব্যাকট্রিয়া প্রদেশে অথবা উহার সান্নিধ্যে বাস করিত।

অমরকোষ অভিধানে সীথিয়া ব্যাকট্রিয়া, কাণ্ডাহার প্রভৃতি প্রদেশোৎপন্ন অশ্বের বর্ণনস্থলে যবননামক এক প্রকার অশ্বের উল্লেখ আছে। এস্থলে টীকাকারেরা যবনশব্দে ক্ষিপ্রগামী অশ্ব বুঝায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু মূলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিলে অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইবে যে টীকাকারেরা উহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। সীথিয়া, ব্যাকট্রিয়া, কাণ্ডাহার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় অশ্বের বর্ণনস্থলে প্রযুক্ত হওয়াতে যবন শব্দেও কোন দেশ ও যবনাশ্বশব্দে তদ্দেশীয় অশ্ব বুঝাইতেছে তাহাতে আর সংশয় নাই। অতএব যখন যবন শব্দে যবনদেশীয় অশ্ব বুঝাইতেছে এরূপ সিদ্ধান্ত হইল, তখন যবনশব্দের অর্থ বহুদূরবর্ত্তী আইয়োনিয়া দেশ না হইয়া, ভারতবর্ষের অদূরবর্ত্তী কাম্বোজ প্রভৃতি দেশের সন্নিহিত কোন প্রদেশ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আবার উক্ত অভিধানেই যবনদেশোদ্ভব পদার্থবিশেষ (*Turkish i. e. gum benjamin or olibanum*) বুঝাইতে "যবন" এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে উক্ত দ্রব্য মধ্য আসিয়াতেই উৎপন্ন, কোন কালেই গ্রীসদেশ হইতে তথায় আনীত হয়

নাই। সুতরাং এরূপ প্রমাণ সত্ত্বেও যবন-শব্দে গ্রীসদেশের অধিবাসীদিগকে বুঝিতে হইবে একথা কোন প্রকারেই প্রামাণিক বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারা যায় না।' হেমচন্দ্রকোষে "যবনেষ্ট" শব্দের সীসক (সীসা) এই অর্থ লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন পুরাবৃত্তপাঠে যতদূর অবগত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, যে ফিনীসিয়া ও রোমের অধিবাসীরাই সময়ে সময়ে এতদ্দেশ হইতে সীসা লইয়া যাইত। সীসা গ্রীক্‌দিগের অভীষ্ট পদার্থ ছিল, সুতরাং গ্রীকেরা উহা স্বদেশে লইয়া যাইবার উদ্দেশে এ দেশে যাতায়াত করিত, পুরাবৃত্তে এরূপ কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। "যবন-প্রিয়" শব্দের অর্থ মরিচ। গ্রীকদিগের আসিয়াখণ্ডে আগমনের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই পাশ্চাত্য লোকেরা এতদ্দেশ হইতে স্বদেশে মরিচ লইয়া যাইত।

আবার রাজনির্ঘণ্টের ব্যাখ্যানুসারে "যবনেষ্ট" শব্দে আর্দ্রক (আদা) বুঝায়। ম্লেচ্ছজাতীয় তাবৎ লোকেরাই সাদরে এই দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং যবন শব্দে কেবল গ্রীকদিগকে বুঝায় অন্য কোন জাতি বুঝাইতে পারে না ইহা কিরূপে সম্ভবে?

পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর চতুর্থ অধ্যায়ে তদ্ধিতাপত্যপ্রকরণে একটী সূত্র আছে। বার্ত্তিককার মহর্ষি কাত্যায়ন উক্ত সূত্রের বৃত্তিস্থলে কাম্বোজ ও যবনদিগকে একত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি যবনজাতির সহিত কাম্বোজদিগের কিছুমাত্র নিকট সম্পর্ক না থাকিত, তাহা হইলে মহর্ষি কি নিমিত্ত উহাদিগকে একত্র উল্লেখ করিলেন বুঝা যায় না। †

পতঞ্জলিপ্রণীত মহাভাষ্যের ধাতুবিবেকপ্রস্তাবে একটী এরূপ বাক্য আছে, যাহা লইয়া বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা আপনাদের পক্ষসমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অধ্যাপক গোল্‌ষ্টুকর তাঁহার প্রণীত পাণিনিবিচার নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের সবিস্তর উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাকরণের সূত্রে এইরূপ অনুশাসন আছে। অতীতসন্নিহিতকালের ঘটনার বিষয় বর্ণনা করিতে হইলে ক্রিয়াতে লঙ্ বিভক্তি ব্যবহার হইবে। কাত্যায়ন সূত্রের উপর নিম্নলিখিত প্রকার বার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন **"অনদ্যতনে লঙ্"**। ইহার অর্থ এই যে, যে ঘটনা বক্তার দর্শনপথাতীত, কিন্তু চেষ্টা করিলে বক্তা উহা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ, এরূপ ঘটনার বর্ণনস্থলে লঙ্ ব্যবহার করিতে হইবে। এই দুইটী উদাহরণ দ্বারা মহাভাষ্যকার উপরি উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপরি উল্লিখিত ব্যাখ্যাদ্বারা নিঃসন্দেহ

---

† **কম্বোজাল্লুক্। ৪।১।১৭৫**
কম্বোজাদিভ্য ইতি বক্তব্যম্। যবনঃ। কোলঃ।
(পরোক্ষে চ লোকবিজ্ঞাতে প্রযোক্তু দর্শনবিষয়ে)। অরুণদ্‌ যবনঃ সাকেতম্, অরুণদ্‌যবনো মাধ্যমিকান্।

প্রতীতি হইতেছে যে পতঞ্জলি যদিও যবনদিগের কর্ত্তৃক সাকেত অবরোধ ও মাধ্যমিকদিগের সহিত উহাদের বিবাদ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন নাই, কিন্তু তিনিই ইচ্ছা করিলে ঐ ঘটনাদ্বয় প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। এতাবতা এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে পতঞ্জলি উক্ত ঘটনাদ্বয়ের সমসাময়িক। নাগোজিভট্টও এই কথার প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন।

খৃষ্টাবতারের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব মানবলীলাসম্বরণ করেন, অধুনাতম পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণাদ্বারা ইহা এক প্রকার স্থির নিশ্চয় হইয়াছে। আর বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তয়িতা নাগার্জ্জুন বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় চারিশত বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন ইহাও একপ্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। যদি এই উভয়ের প্রামাণিকতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে পতঞ্জলি খৃষ্টাবতারের ১৪৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কারণ ইহা সাধারণ্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে নাগার্জ্জুনের অন্ততঃ চারি শত বৎসর পরে পতঞ্জলি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে নানাবিধ যুক্তির দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে পতঞ্জলি এই সময়ের আরও দুই শত তিন বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ ইনি কশ্মীররাজ অভিমন্যুর সমসাময়িক ছিলেন। কশ্মীররাজ নানাবিধ উপকার করিয়া মহাভাষ্যকারের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এই মত অভ্রান্ত বলিয়া ম্যাক্‌সমুলর প্রভৃতি যাবতীয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এক প্রকার স্থির নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই মতের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে হইলে পতঞ্জলি খৃষ্টাবতারের প্রায় ৬০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি পতঞ্জলি যথার্থই এই সময়ের লোক হন, তাহা হইলে ইহাঁর প্রযুক্ত যবন শব্দে কোন মতেই গ্রীকদিগকে বুঝাইতে পারে না, কারণ এই সময়ে গ্রীক্, ব্যাক্‌ট্রিয়, সীথিয় প্রভৃতি নানা জাতীয় বিধর্ম্মী সেনা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। যখন নানাজাতীয় লোক সমকালে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিল ইহার বহুল প্রমাণ রহিয়াছে, তখন পতঞ্জলি ইতর-ব্যবচ্ছেদ করিয়া কেবল গ্রীকদিগকেই যবন শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকর, ল্যাসেনের মতানুযায়ী হইয়া নিম্নলিখিত প্রকারে উক্ত সন্দেহের নিরসন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "খৃষ্টের পূর্ব্বে ১৪৩ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টের পর ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে কোন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত যবন শব্দে গ্রীক্ ভারতরাজাদিগকে বুঝিতে হইবে। খৃষ্টের ১৬০ বৎসর পুর্ব্ব হইতে ৮৫ "বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে এই প্রকার নয় জন রাজা ভারতের সান্নিধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহাঁদিগের মধ্যে মিয়ান্ত্রস

নামক এক জন দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে যমুনা-তীর পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছিলেন। গ্রীক ভূগোলবিৎ ষ্ট্রাবো এই বিষয়ের স্পষ্টাভিধানে উল্লেখ করিয়াছেন। ল্যাসেনের গবেষণা দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে উক্ত রাজা খৃষ্টাবতারের ১৪৪ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ন্যূনাধিক বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।" আমরা উল্লিখিত যুক্তির সারগর্ভতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ইহার খণ্ডনার্থ অন্য চেষ্টা না করিয়া ল্যাসেন সাহেব স্থানান্তরে এ বিষয়ে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। তিনি বলিয়াছেন—"ব্যাকট্রিয়-রাজারাও যবন শব্দের প্রতিপাদ্য।" ফলে "যবন" এই শব্দটী বহুকালের প্রাচীন শব্দ, ইহার অর্থও বহুব্যাপক। ভারতবর্ষের অধিবাসীরা বহুবিধ পাশ্চাত্য জাতিকে যবন শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছে। প্রথমে এই শব্দে আরবদেশ ও উহার অধিবাসীদিগকে বুঝাইত। ফিনীসিয়ার অধিবাসীরা বাণিজ্য সূত্রে ভারতবর্ষে যাতায়াত করিত বলিয়া ভারতবর্ষীয়েরা কালক্রমে ইহাদিগকেও যবনশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছে।

মিয়াস্ত্রস যমুনাতীর পর্য্যন্ত রাজত্ব-বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহাঁর বিশেষ প্রমাণ কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। ষ্ট্রাবো ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, যে মিয়াস্ত্রস যমুনাতীর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, কারণ মথুরা নগরীতে মিয়াস্ত্রসের একটী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। একটী মুদ্রাপ্রাপ্তি ও ষ্ট্রাবোর লিপি এই উভয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া কেহই বিশ্বাস করিতে পারেন না যে মিয়াস্ত্রস যমুনা পার হইয়া অযোধ্যার নিকট পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। এই কারণে মিয়াস্ত্রসের বিষয় প্রকৃত ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে রোমক রাজারা দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত ত্রিবাঙ্কোর প্রদেশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন ইহাও স্বীকার করিতে হয়, কারণ সীজরদিগের প্রণীত কতিপয় মুদ্রা ত্রিবাঙ্কোরের ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা এক প্রকার নির্ব্বিবাদ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে যে পতঞ্জলিপ্রযুক্ত যবনশব্দে কোন ক্রমেই কেবল গ্রীকদিগকে বুঝাইতে পারে না। প্রকৃত কথা এই—মিয়াস্ত্রস প্যারোপোমিসস্ পর্ব্বতের পূর্ব্বদিক্ পর্য্যন্ত নিজরাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। আর বিষ্ণুপুরাণের মতে যবনদিগের রাজ্য সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং মিয়াস্ত্রস যবন রাজ্যের অভ্যন্তরে আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে। যদিও ভারতবর্ষীয় লেখকেরা মিয়াস্ত্রসকে যবনরাজ শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাহার অর্থ এই রূপে বুঝিতে হইবে যে, যবনরাজ্যের অভ্যন্তরে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়াই উহাঁকে যবন শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নতুবা মিয়াস্ত্রসকে গ্রীক বলিয়া যবনশব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা।

আমাদিগের পক্ষ সমর্থনার্থ অন্যান্য অনেক যুক্তি আছে, এবারে প্রস্তাববাহুল্য হওয়াতে এই স্থলেই বিশ্রাম করিলাম। বারান্তরে সংস্কৃত স্মৃতি ও সাহিত্য সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক অন্যান্য অনুকূল যুক্তির অন্বেষণ পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়া প্রস্তাব শেষ করা যাইবে।

ক্রমশঃ।

বৃত্রসংহার।

বৃত্রসংহার কাব্য। প্রথম খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। কলিকাতা ১২৮১

নারীর প্রথম আকর্ষণ যেমন তাহার রূপ, কাব্যের প্রথম আকর্ষণ তেমনি তাহার ভাষা। এই জন্য আমাদিগের কাব্যদেবী শ্বেতাঙ্গিনী। অঙ্গের লাবণ্য তাহার প্রথম বিমোহন। যে কাব্য এই বাহ্য সৌষ্ঠবে ভূষিত না থাকে, অনেক গুণ থাকিলেও তাহার সমাদর শীঘ্র ঘটিয়া উঠে না। ভাষার মাধুর্য্যে প্রথম আকৃষ্ট না হইলে, পাঠক শীঘ্র কাব্য মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে না। পাঠক কাব্য অধ্যয়নে তত মস্তিষ্কের চালনা করিতে চাহে না। আমাদিগের সমালোচ্য কাব্যের বিস্তর গুণ থাকিলেও ইহার রূপ নাই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহার ভাষার লালিত্য ও মধুরতা নাই। এক্ষণকার কাব্যভাষা যেরূপ কর্কশতা-দোষে কলঙ্কিত হইয়াছে এই কাব্যেও সেই রূপ দোষ লক্ষিত হয়। কাব্যভাষার শব্দ নির্ব্বাচন বিষয়ে আমরা হেমবাবুর শ্রবণশক্তির বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। অভিধানের অনেক কর্কশ শব্দ তাঁহার কাব্যমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ণনাকে ওজস্বিনী করিবার জন্য ভাষার উচ্চতা আবশ্যক বটে কিন্তু কর্কশ শব্দ দ্বারা সে উচ্চতা সম্পাদিত হয় না। কর্কশ শব্দগুলি পাঠকের কর্ণ যেন কণ্টক-সংবিদ্ধ করে। আমরা হেম বাবুর রচনা গুলির অনেক স্থলে প্রশংসা করিয়াছি, তন্মধ্যে যে সমস্ত ভাব ও সুন্দর দৃশ্য কল্পিত হইয়াছে তাহারও প্রশংসা করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার শব্দনির্ব্বাচন-শক্তির সম্যক্ সাধুবাদ করিতে পারি নাই।

হেম বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমিত্রছন্দের সমালোচন স্থলে বলিয়াছেন, এই ছন্দ ভিন্ন রীতিতে রচনা করা যায় কি না সে এক স্বতন্ত্র কথা। নানাবিধ রীতিতে রচনা করা যায় আমরা স্বীকার করি, কিন্তু রচনা করিলে মাইকেলের কবিতার মত উৎকৃষ্ট হয় কি না তৎপক্ষে আমাদিগের সমূহ সন্দেহ। হেম বাবু এক পক্ষের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। তদবলম্বিত রীতি যে অনুকরণীয় নহে তাহা স্থির

সিদ্ধান্ত। তিনি সংস্কৃত শ্লোক রচনার প্রণালী অনুকরণ করিতে গিয়া বাস্তবিকই যেন সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনার ভিতরে ভাব থাকিলে কি হয়, সে ভাব আহরণ করা দুষ্কর। শ্লোকের পদগুলি দুর্ব্বোধ ও নিতান্ত নিয়মনিবদ্ধ। ভাবের স্রোত যে ভাবে গড়াইয়া পড়ে, ভাবস্রোতের সেই গতির অনুসরণে এই শ্লোকের পদগুলি বিরচিত হয় নাই। বরং শ্লোকের নিয়মানুরোধে ভাবস্রোতকে স্থানে স্থানে প্রতিরুদ্ধ করা হইয়াছে। সে কিসের জন্য? হেম বাবু বলেন যতির অনুরোধে। পদমধ্যে যতি যে বিরামস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয় তাহা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোগত পদাবলিতে এই বিরামস্থান বিভিন্নস্থানীয় হইয়াছে কেন? কোন মৌলিক নিয়ম কি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে যখন এই বিরামযতি বিভিন্নস্থানীয় হইয়াছে তখন অবশ্য ইহার একটি সাধারণ নিয়ম সম্ভাবিত হইতেছে। আমরা বলি কবিতা রচনার সাধারণ নিয়ম দ্বারা এই বিরাম যতির নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কবিতা রচনার মৌলিক নিয়ম ধ্বনি। এই আদি নিয়ম দ্বারা কাব্য সাহিত্যে নানাবিধ ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। এই নিয়ম দ্বারাও বিবিধ ছন্দের বিরামযতি সংস্থাপনের নিয়ম নিবদ্ধ হইয়াছে। সাত এবং আট অক্ষরের পর বঙ্গীয় পয়ারের যতিপাত হইবার নিয়ম আছে বটে, কিন্তু অন্যান্য ভাষায় পয়ারের অনুরূপ ছন্দে কি সে নিয়ম নিবদ্ধ আছে? ইংরাজি পয়ারানুরূপ ছন্দের বিরামযতি কোথায় পড়ে? ধ্বনি দ্বারা নিয়মিত হইয়া বিরামযতি সংস্থাপিত হয়। এই ধ্বনি দ্বারা নিয়মিত হইয়া মিত্রছন্দের মিলন অক্ষরের নিয়মও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মিলবাক্যে আবদ্ধ থাকিতে হইলে ভাবস্রোত পাছে প্রতিরুদ্ধ হইয়া যায়, এই জন্যই অমিত্রছন্দের উৎপত্তি। অমিত্রছন্দে মিলবাক্য পরিবর্জ্জিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তা বলিয়া তাহা কবিতার আদি নিয়মের অতীত হয় নাই। মাইকেলের কবিতা এই সাধারণ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত দেখা যায়।

মাইকেলের ছন্দ পয়ারের অবয়বগত বটে, কিন্তু তজ্জন্য পয়ারের নিয়মগত নহে। সে ছন্দ পয়ারের মিত্রাক্ষর-বিরহিত হইয়াই তাহার বিশেষ নিয়মের বশবর্ত্তিতা পরিহার করিয়াছে। পরিহার করিয়াও কবিতার মৌলিক নিয়মের শাসনাধীন রহিয়াছে। কবিতার ভাবস্রোত যেমন প্রবাহিত হইয়াছে, তিনি তদনুসারে বিরামযতি সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু হেমবাবু কেবল পয়ারের অবয়বগত নিয়মে আবদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ভাবস্রোত অনর্গল প্রবাহিত হয় নাই। মাইকেলের কবিতাকে শ্রবণকঠোর ভাবিয়া তিনি ধ্বনির জন্য লালায়িত হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তিনি যে ধ্বনির জন্য লালায়িত, বহু মূল্যেও তাহা ক্রয় করিতে সম্পূর্ণ

সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই; অথচ তাঁহার কবিতাগুলি দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যদি পদান্তরে মিলবাক্য দিতেন, তাহা হইলে, আর কিছু না হউক, শ্রবণযুগল কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইত।

মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দে ধ্বনি রক্ষিত হইয়াছে, অথচ তাহাতে বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু হেমবাবুর ছন্দে কিছুই বৈচিত্র্য নাই, সকলই একভাবাপন্ন। তিনি যে বৈচিত্র্যের প্রয়াসী হইয়া নানা ছন্দে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তৎপ্রয়াসী হইয়া যদি অমিত্রচ্ছন্দও রচনা করিতেন, আমরা নিশ্চয় অন্যবিধ অমিত্রচ্ছন্দ প্রাপ্ত হইতাম। আমাদিগের পরমসৌভাগ্য যে তিনি সমুদায় গ্রন্থখানি অমিত্রচ্ছন্দে রচিত করেন নাই।

এ কাব্যের দ্বিতীয় দোষ ইহার বিষয়গত। ইহাকে আমরা মহাকাব্য বলি আর নাই বলি তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। কেহ ইহাকে আখ্যান বা খণ্ডকাব্য, কেহ বা ইহাকে বর্ণনা-কাব্য বলিতে পারেন। বাস্তবিক ইহা যে শ্রেণীর কাব্য হউক না কেন, ইহার বিষয়ে মানবের কোন আকর্ষণ নাই। দেবাসুরের যুদ্ধে বা কার্য্যে মানবমনের অনুরাগ জন্মে না। মানব স্বতন্ত্রভাবে দূরদেশে অবস্থান করে। দেখে, যে সমস্ত কার্য্য ও ঘটনা ঘটিতেছে তাহা মানবাতীত। যাহাতে মানবকুল বিনিযুক্ত নাই, তাহাতে মানবহৃদয়ের সহানুভূতিও নাই। এবিষয়ের আর একটী দোষ এই, দেবাসুরের যুদ্ধের পূর্ব্বে পাঠক মাত্রেরই জানা থাকে, পরিণামে দেবগণের জয় অখণ্ডনীয়। পাঠকের মনে এ প্রকার সংস্কার থাকিলে ঘটনা বিরূপ হইলেও তাহাতে কৌতুহল জন্মে না। কাব্যের আখ্যায়িকায় অনুরাগ না থাকিলে পাঠকালে স্থানে স্থানে কাব্যের রসাস্বাদনে সুতরাং ব্যাঘাত হয়।

তৃতীয় দোষ কাব্যের কল্পনাগত। ইতিপূর্ব্বে আমরা হেমবাবুর বিস্তর রচনা পাঠ করিয়াছি। সেই সমস্ত রচনায় তাঁহার বর্ণনা ও কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এ গ্রন্থেরও অনেক গুলি বর্ণনা তাঁহার স্বকীয়-কল্পনা-সম্ভূত। যে যে স্থলে তাঁহার স্বকীয় কল্পনা প্রতিভাত হইয়াছে, সে সে স্থলে তাঁহার কল্পনাশক্তির আমরা ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছি। তাঁহার কল্পনার একটী বিশেষ ধর্ম্ম থাকাতে ইতিপূর্ব্বে তিনি ইংরাজী সাহিত্য হইতে সমধর্ম্মী কতিপয় কবিতার অনুবাদ করিয়াছেন। সে সমস্ত অনুবাদে তাঁহার স্বকীয় কল্পনার প্রকৃতিই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। সমালোচ্য কাব্যের কতিপয় স্থানে তিনি আর এই রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি ইংরাজী কাব্যশাস্ত্র হইতে অনুবাদ করিতেন, এক্ষণে তাঁহার অনুকরণে প্রবৃত্তি হইয়াছে, তিনি যে মাতৃকল্পনাকে অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ক্ষমতা অধিক। সে কল্পনা অনেকদূর উড্ডীন হইতে পারে, উড্ডীন হইয়া

অনেকক্ষণ পর্য্যন্তও থাকিতে পারে। সে কল্পনা যখন উড্ডীন হয়, তাহাকে যেন বৃহৎ শ্যেন পক্ষিণীর ন্যায় দেখাইতে থাকে। তদ্দ্বারা চারিদিকের বায়ু কম্পিত হয়, আকাশের শোভা হয়, দর্শক তাহার নানাদিক্ পরিভ্রমণ ও সুন্দর লীলা দেখিয়া চমৎকৃত হয়েন। সে কল্পনা ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। কখন স্বর্গে গিয়া দেবগণের আনন্দলহরী, ঘোর দ্বন্দ্ব ও সুখময় আবাস পর্য্যবেক্ষণ করে, কখন স্বর্গ হইতে মর্ত্তে নামিবার সময় পৃথিবীর চমৎকার রমণীয়তা সম্ভোগ করে, কখন পাতাল হইতে উর্দ্ধে উঠিবার সময় অন্ধকারময় দেশের অদ্ভুত রহস্য, সূর্য্যালোকের সুবর্ণময় দীপ্তি এবং চন্দ্রবিভা বিভাসিত দেখিয়া কতই আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। হেমবাবু এই কল্পনার দিকে লক্ষ্য করিতে গিয়াছেন। ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনিও পাতালে দেবগণের সভা রচনা করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, মাতৃ-কল্পনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারও কল্পনা উর্দ্ধে উঠিতে চেষ্টা করিয়াছে। দুই একবার কিছু উর্দ্ধেও উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু উচ্চতার যেন ভার রাখিতে পারিল না বলিয়া অমনি সহসা নিম্নগামিনী হইয়া অধস্তলে নিপতিত হইয়াছে। কপোতিনী কখন শ্যেনপক্ষিণীর উচ্চতায় উঠিতে পারিবে না। উঠিতে গেলে তাহাকে শ্যেনপক্ষিণীর ন্যায় প্রকাণ্ডও দেখাইবে না। সেকালে কবিগণ প্রকৃতি দেখিয়া নিজ নিজ চিত্র অঙ্কিত করিতেন, এক্ষণে কবিগণ তাঁহাদিগের চিত্র দেখিয়া নিজ নিজ চিত্র অঙ্কিত করিতে যান। সুতরাং চিত্রে বিস্তর অসম্পূর্ণতা ঘটে। হেমবাবু যে স্থানে পরকীয় চিত্র অবলম্বন না করিয়া স্বাধীনভাবে নিজ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সে স্থানে তাঁহার কল্পনা অতি মনোহারিণী হইয়াছে। আমরা তাঁহার এই কল্পনার প্রকৃতি পরে বিবৃত করিব। অনুকরণ করিতে গিয়া তিনি যে বিষয়ে কিঞ্চিৎ সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহাও পরে প্রকাশিত হইবে।

এক্ষণে তাঁহার কাব্যকল্পনার মধ্যে আমরা যে যে দোষ অবলোকন করিয়াছি, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এই কাব্যের প্রধান কল্পনা বৃত্রাসুরবধ। এই কল্পনার বৈচিত্র্যসাধন জন্য কবি শচীহরণের আখ্যায়িকা তন্মধ্যে সংযোজিত করিয়াছেন। কল্পনার এরূপ বৈচিত্র্য থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এই বৈচিত্র্য-বিধায়ক আখ্যায়িকায় কতিপয় দোষ দৃষ্ট হয়। এই আখ্যায়িকা অত্যন্ত সুদীর্ঘ হইয়াছে। বলিতে কি, প্রায় সমস্ত সমালোচ্য গ্রন্থ খানি এই আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। ইহাকে বৃত্রাসুরবধের প্রথম ভাগ না বলিয়া শচীহরণ কাব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বোধ হয় এই আখ্যায়িকা পরেও কিছু বিস্তৃত হইবে। এই সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা পড়িতে পড়িতে আমরা কাব্যের প্রধান কল্পনা বিস্মৃত হই। কাব্যের প্রারম্ভেই

এই আখ্যায়িকার সূত্রপাত্র হইয়াছে। এ জন্য ট্যাসোর জেরুসেলাম-কাব্যান্তরীণ ওলিণ্ডো এবং সফ্রোনিয়া ঘটিত আখ্যায়িকার যে দোষ, সমালোচ্য আখ্যায়িকার-ও সেই দোষ ঘটিয়াছে। কাব্যের প্রারম্ভেই যে কল্পনা সংস্থাপিত হয়, তাহাতেই পাঠকের কল্পনা পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সে কল্পনাকে শীঘ্র স্থানান্তরিত করা যায় না। এজন্য কাব্যের প্রধান কল্পনার কিয়দংশ আয়োজিত হইলে, উপকল্পনা দিয়া তাহার বৈচিত্র্য সাধন করিবার নিয়ম আছে। এ কাব্যে আমরা প্রথম সর্গে প্রধান কল্পনার কিছু আয়োজন দেখিলাম বটে, কিন্তু দ্বিতীয় সর্গ হইতে যে প্রধান কল্পনার সূত্র হারাইলাম তাহা একাদশ সর্গ পর্য্যন্ত আর পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম না। উপকল্পনা আমাদিগের কল্পনাকে এরূপ অধিকার করিয়া বসিল, মধ্যে মধ্যে প্রধান কল্পনার কিঞ্চিৎ আভাসেও তাহা আর স্থানান্তরিত হইল না। কবি, স্থানে স্থানে প্রধান কল্পনার স্মরণার্থ যে কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বৃথা হইয়াছে। আর এক দোষ এই, প্রধান কল্পনার বৈচিত্র্য সাধন জন্য কবি যে আখ্যায়িকা সংরচিত করিয়াছেন তাহাতেও যুদ্ধ-বর্ণনা। যুদ্ধ বর্ণনা হইতে বিরাম দিবার জন্য কবিগণ কাব্যমধ্যে অপর আখ্যায়িকার উদ্ভাবন করেন। কিন্তু তাহাতেও সেই যুদ্ধ, তবে আর পাঠকের বিরাম কোথায়? এ গ্রন্থে প্রধান কল্পনায় বড় যুদ্ধ, উপকল্পনায় ছোট যুদ্ধ। প্রধান কল্পনায় সৈন্য সামন্ত লইয়া ঘোর যুদ্ধ, উপকল্পনায় সাংঘাতিক মল্ল যুদ্ধ। এই মল্লযুদ্ধ আবার দুই বার। একবার যুদ্ধে অসুরের নিপাত, দ্বিতীয়বারে দেবনিপাত। এই দুই বার যুদ্ধ যোজনার জন্য যে সমস্ত ঘটনা কল্পিত হইয়াছে, তাহাতেই এই আখ্যায়িকা বৃথায় প্রবর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত যুদ্ধ অতিক্রম করিয়া কি দেখি? প্রধান কল্পনার সহিত উপকল্পনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। যে অল্প সম্বন্ধ কবি প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য এই আখ্যায়িকা এত সুদীর্ঘ হওয়া বিধেয় নহে।

আমাদিগের কবি—দেবতা, স্বর্গ, দৈত্য প্রভৃতি অলৌলিক প্রস্তাব লিখিতে ভাল বাসেন। তিনি যাহা মনে করুন, আমরা জানি এপ্রকার প্রস্তাব লেখা অত্যন্ত কঠিন। যাহা লৌকিক ও মানবীয়, তাহার কল্পনাকে সমুজ্জ্বল করা যায়। তাহার নানাবিধ বিশেষ দৃশ্য দিয়া চিত্রকে পরিপূর্ণ করা যায়। কিন্তু মানবাতীত বিষয়ের চিত্রাঙ্কন করিতে গেলে, তাহা অধিকাংশ মানবীয়ভাবে পূর্ণ হইয়া পড়ে। অল্প লোকেই অলৌকিক বিষয়ের পূর্ণ চিত্র প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন। মিল্টন এবং ডান্তের কল্পনাও সম্যক্ কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে নাই। আমাদিগের কবি যে এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা আমরা কখনই বলিতে পারি না। মানবের সহিত তাঁহার দেবগণের বড় অধিক প্রভেদ নাই। দৈত্যকন্যা ইন্দুবালার হৃদয় নিতান্ত অধীর ও কোমল। তাঁহাকে দৈত্যকন্যা কে বলে? দেবগণের

মন্ত্রণায় তাঁহাদিগের দোষগুণ, ও বুদ্ধিবল এরূপ স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়াছে যে তাঁহাদিগের নিকট দেবাবগুণ্ঠন একেবারে উন্মোচিত হইয়াছে এবং তাঁহারা আমাদিগের নিকট মানুষী প্রকৃতি ধারণ করিয়াছেন। ইন্দ্র একাকিনী শচীকে বনমধ্যে স্থাপিতা করিয়া কোথায় ভুলিয়া আছেন তাহার সংজ্ঞাও নাই। শিব সর্ব্বজ্ঞ, অথচ তিনি শচীহরণ বৃত্তান্ত কিছুই অবগত নহেন। শচীহরণবৃত্তান্ত শুনিবামাত্র তাঁহার প্রচণ্ড-রোষানল প্রজ্জ্বলিত হইল। ইন্দ্রাণী এক বার বিপদে পড়িয়াও আত্মরক্ষার কোন উপায়াবলম্বন করিলেন না। যখন স্মরণ করিবামাত্র তাঁহার পুত্র আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তিনি ভুলিয়াও কি একবার বিপদকালে ইন্দ্রকে স্মরণ করিলেন না? এই প্রকার অন্যান্য কল্পনাও আছে যাহা আমরা দেবপ্রকৃতিসঙ্গত এবং অলৌকিক বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিলাম না।

এতক্ষণ আমরা এই কাব্যের দোষাবলি আলোচনা করিয়া যেমন অসুখী হইয়াছি, একবার ইহার গুণাবলি স্মরণ করিয়া তেমনি আনন্দিত হই। এক্ষণে কাব্যখানি মেঘমুক্ত শরৎশশীর ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিল।

হেমবাবুর ভাষার দোষ সত্বেও তাঁহার বর্ণনাগুলি অতি চমৎকার। বাস্তবিক হেমচন্দ্রের বর্ণনা তাঁহার কবিতার প্রধান গুণ। তাঁহার কল্পনা যেমন উচ্চ ও গভীর, তাঁহার বর্ণনা তেমনি ধীরে ধীরে উচ্চে উঠিতে ও গভীরতর হইতে থাকে। তাঁহার বর্ণনায় ওজস্বিতা ও জীবিতভাব অনুভূত হয়। তাঁহার চিত্র সকল বর্ণে উচ্ছলিত দেখায়। তিনি ভাবসকল একে একে, দলে দলে প্রবাহের মত আনিয়া ফেলেন। স্থির হইয়া দেখিতে পারি না, মনে সকল ভাবের অঙ্কপাত হয় না। কিন্তু সমুদায় বর্ণনায় মনে একটী উচ্চভাবের উদ্রেক হয়। মন প্রমত্ত হয় না কিন্তু অধস্তন প্রদেশ হইতে উথলিয়া উঠে। একদা উচ্চে উঠিতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। স্বর্গের দিকে নয়ন উন্মীলিত হয়। কবির বর্ণনার প্রভাব মনে উদিত হইতে থাকে।

হেমবাবু বঙ্গভাষায় কতিপয় উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন। এই কবিতাবলিতে তাঁহার বর্ণনা ও কল্পনাশক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। হেমবাবুর কল্পনাশক্তি সুন্দর কাব্যদৃশ্য সকল রচনা করে এবং তদীয় বর্ণনাশক্তি সেই দৃশ্য নিশ্চয় উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করে। বৃত্রসংহার কাব্যেও এই গুণ প্রধানতঃ লক্ষিত হয়। ইহাতেও দৃষ্ট হয় যে, তাহার কল্পনায় গাম্ভীর্য্য আছে, তাহার বর্ণনায় ওজস্বিতা বিদ্যমান আছে। হেমবাবুর কল্পনার প্রকৃতি এই যে, সে কল্পনা কখন লঘু বিষয় গ্রহণ করে না। তাঁহার কল্পনা দেবী সামান্য ও তুচ্ছবিষয় সমুদায় পরিহার করিতে চাহে। ভারতের দুরাবস্থায় তাঁহার কল্পনাদেবী যেন শোকাতুরা হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার কল্পনায় বাল-সুলভ চপলতা নাই, যৌবন-সুলভ লঘুতা নাই, এবং স্ত্রীসুলভ আমোদ-

প্রিয়তা নাই। তাহা নৃত্য করে না, গীত গাহেনা, হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে না। তাহাতে যুবতীর যৌবনসুলভ দোষের কিছুই নাই। কিন্তু তাহাতে যুবতীর রূপ ও নবীনত্ব আছে। সে কল্পনা যেন যৌবন বয়সেই সন্ন্যাসিনী, পতিহারা শোকাতুরা উন্মাদিনী, দেবসেবায় নিরত, পূজা ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ। সে কল্পনা কুসুম দামে নিজের বেণীবন্ধ করে না, কিন্তু সেই কুসুমহার চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া ইন্দ্রাণীর গলে সমর্পণ পূর্ব্বক সুখিনী হয়েন, অথবা পরম ভক্তির সহিত শিবপদে পুষ্পোপহার দেন। জীবলোকের ঐশ্বর্য্য তিনি দেব লোকে আনিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করেন। সে কল্পনার হৃদয়ভাব যেন ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি—উষ্ণ, অথচ তেজোবিরহিত। অমরাবতীবিরহিতা ইন্দ্রাণীর যে হৃদয়ভাব, তাহারও সেই হৃদয়ভাব। এজন্য তদবস্থ শচীদেবীর হৃদয়ভাব তাঁহার কবিতায় সুন্দররূপে বিকশিত হইয়াছে। সে কল্পনা যদি কখন তদ্বর্ণিত চপলার ন্যায় চপলা নারীর প্রকৃতি ধারণ করে, তবে শোকাতুরা ইন্দ্রাণীর সেবায় বিরতা হইবে। স্বর্গে গিয়া যদি সুখিনী হয়, তবু একটি লালসার জন্য ঐন্দ্রিলার ন্যায় বিষণ্ণা হইবে।

তাঁহার কল্পনায় চমৎকার চিত্র সকল দেখিলে, বাস্তবিক তাঁহার কবিত্বশক্তির সমূহ প্রশংসা করিতে হয়। রণজনিত শ্রমে ক্লান্ত জয়ন্ত নিশীথে বনমধ্যে নিদ্রিত আছে, এবং চন্দ্রবিভাও তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্ষণিক নিদ্রা যাইতেছে, ইন্দ্রাণী আসিয়া যখন সেই দৃশ্যের শোভা সম্ভোগ করিতেছেন, সেই একটি সুন্দর ও গভীর দৃশ্য। দানবরমণী ঐন্দ্রিলা যখন নন্দনকাননে বসিয়া আছেন, আর চারিদিকে সুরসুন্দরীগণ তদীয় বিলাস রচনায় নিরত আছে, সেই একটি চমৎকার দৃশ্য। চপলা যখন মদনের সহিত রহস্য করিতেছে, সেই একটি পরম রমণীয় দৃশ্য। ভীষণ যখন চপলার রূপে বিমোহিত হইয়া গেল সেই একটি চিত্রকরের দৃশ্য। তৎপরে ভীষণ মায়াকাননে ইন্দ্রাণীকে দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য যখন বিগলিতহৃদয় হইয়া গেলেন, সেই ভাব বর্ণনাদ্বারা কবি কেমন চমৎকার কৌশলে সমস্ত দেবকন্যা অপেক্ষাও ইন্দ্রাণীর রূপের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইন্দ্র যখন কুমেরু গিরি ছাড়িয়া কৈলাসাভিমুখে উঠিতে লাগিলেন, নিম্নে ধরাতল কেমন দেখাইতে লাগিল, সেও একটি সুমহৎ দৃশ্যকল্পনা। বাস্তবিক এই সমস্ত দৃশ্যই তাঁহার কাব্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। এই প্রকার কতিপয় পুষ্প তাঁহার রণশোণিত-রঞ্জিত ভয়ানক শ্মশানভূমির রচনামধ্যে পরম শোভা ধারণ করিয়াছে।

সুন্দর ছবি চিত্র করাতে যে প্রকার গুণপনা আছে, সেই ছবিকে সুন্দর ভাবে সংস্থাপন করায় ততোধিক গুণপনার আবশ্যক। অনেকে সুন্দরচিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা সংস্থাপন করিতে জানেন না সুন্দরদৃশ্যকে সুন্দর

ভাবে না রাখিলে তাঁহার শোভা বৃদ্ধি হয় না। সুন্দর দৃশ্যরচনায় যে প্রকার কবিত্বের আবশ্যক করে, তাঁহাকে সুন্দর ভাবে সংস্থাপন জন্যও ততোধিক আবশ্যক করে। আমাদিগের কবি এক স্থলে এই প্রকার কবিত্বের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। কবি, প্রথম দুই স্বর্গে যে দুই দৃশ্য চিত্রিত করিয়াছেন তাহা অতি চমৎকার। সুধু দৃশ্যদ্বয় চমৎকার নহে, সুন্দর সংস্থাপন জন্য তাঁহাদিগের শোভা অধিকতর সুন্দর হইয়াছে। এই দৃশ্যদ্বয় পরস্পরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। চিত্রকর ও কবিতে প্রভেদ এই, চিত্রকর দৃশ্যের যথাযথ প্রতিকৃতি দেখান, কবি সুধু তাহাই দেখাইয়া ক্ষান্ত হয়েন না। তিনি চিত্রকে অর্থপূর্ণ করেন। কবির চিত্র দেখিলে সুধু আমরা দৃশ্যের শোভা উপলব্ধি করি না, সেই চিত্র আমাদিগের হৃদয়ের সহিত কথা কহিতে থাকে, তাহাতে আমাদিগের হৃদয়ে নানা ভাবোৎপাদন করে। চিত্রকর ঘটনা চিত্র করেন, কবি ঘটনার গতি ও বেগ হৃদয়ে উচ্ছ্বলিত করিয়া দেন। আমরা বৃত্রসংহারের প্রথম দুইসর্গে চিত্রিত দৃশ্য দেখিয়া এইরূপ চমৎকার কবিত্ব উপলব্ধ করিয়াছি। একদিকে দেবগণ দ্বিগুণ প্রভাবে সমুত্থিত হইতেছেন, অন্যদিকে দৈত্যরাণীর ভোগেচ্ছা ও সুখলালসা বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যখন দৈত্যরাণীর ভোগবাসনা হৃদয়ঙ্গম করিলাম, অমনি তৎসঙ্গে দেবগণের পুনরুত্থান-চেষ্টা ও মনে মনে করিয়া অন্তরেই যেন দৈত্যরাণীর ভোগবাসনার পরিণাম দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম তাঁহার দুরাশা ফলবতী হইবার পূর্ব্বেই তাহাতে অশনিপাত হইবে। কিন্তু হায়! কবি এই দুই দৃশ্যের অর্থ অন্যভাবে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই দুই দৃশ্যের সংস্থাপনে তিনি যে কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কল্পনায় তাহা বিনষ্ট করিয়াছেন। তদ্রূপ রুদ্রপীড় যে নৈমিষযাত্রায় কৃতকার্য্য হইল, তাহা কাব্য-কল্পনায় অনুভূত হয় নাই।

নাটকে আমরা সচরাচর যে হৃদয়ভাব পরিব্যক্ত দেখি, কাব্যে সে ভাবের উন্মেষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। নাটকে ঘটনা দ্বারা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার সংঘটন করিতে হয়। এইরূপ ঘটিলে তাঁহাদিগের হৃদয়ভাব যেরূপে ব্যথিত, উদ্বোধিত প্রণোদিত এবং পরিণত হয় তাহাই নাটকে প্রকাশিত হয়। এজন্য নাটকের হৃদয়ভাব সদ্যসম্ভূত। সে হৃদয়ভাবের নবীনত্ব আছে। নবীনত্ব হেতু তাহার প্রাবল্য আছে। প্রাবল্যজনিত তাহার গভীরতা জন্মে। মানবীয় হৃদয়ভাবের যতদূর প্রাবল্য সম্ভবিতে পারে, নাটকে তাহা প্রকটিত হয়। নাটকীয় ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ঝঞ্ঝাবাত বহিতে থাকে, যেন সমুদ্র উথলিয়া উঠে। সে হৃদয় একদা গগনের উচ্চশিখায় উত্থিত হয়, একদা পাতালের গভীরতায় নিমগ্ন হয়। বাণের তরঙ্গের ন্যায় সে ভাব সহসা হৃদয়ে উদ্বেলিত হয়। ভাবের প্রতিঘাতে হৃদয়ে যেন ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হয়। কিন্তু কাব্যের হৃদয়ভাবের এরূপ প্রকৃতি নহে।

কাব্যকল্পিত ব্যক্তিগণ হয়তো একাকী ঘটনার স্রোতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে। একাকী নির্জ্জনে ভাবুকের মত হয়তো বসিয়া আছে। একাকী কোন স্থানে উপনীত হইয়া দেখে, মায়াবিনী স্মৃতিদেবী সে স্থানকে পরম রমণীয় শোভায় শোভিত করিয়াছে। তাহাদিগের হৃদয়ভাব সাক্ষাৎ নহে। তাহাতে সদ্যোজাত হৃদয়ভাবের নবীনত্ব ও প্রাবল্য নাই। সে হৃদয়ভাবের প্রাবল্য, কালব্যবধানে কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়াছে। অন্যান্য ভাবের সহিত তাহা সম্মিলিত হইয়াছে। কুহকিনী স্মৃতি সে হৃদয়ভাবকে কতই ইন্দ্রজালে পরিবেষ্টিত করিয়াছে। এ হৃদয়ভাবের প্রাবল্য নাই সত্য বটে, কিন্তু ইহাতে কেমন একপ্রকার মৃদুতা ও মাধুর্য্য আছে, যাহা নাটকীয় হৃদয়ভাবের প্রাবল্যে কখন অনুভূত হইবে না। যিনি সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া সাগরসমুত্থিত প্রবল অনিলপ্রবাহ সম্ভোগ করিয়াছেন, তিনি কি বুঝিতে পারিবেন নাটকীয় হৃদয়ভাব কি? যখন সেই সাগরানিল নানা প্রান্তর, অরণ্যানী ও প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া সৌরভের আমোদে নৃত্য করিতে করিতে তোমার কক্ষবাতায়নে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হইয়া তোমাকে প্রফুল্লিত করিবে তখনই তুমি বুঝিতে পারিবে কবির হৃদয়ভাব কি। যখন কবি লিখিলেন :—

"......................বহে
মন্দ সমীরণ, নন্দন কানন হতে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন কোন ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।"

যখন কবি লিখিলেন :—

"সাহসে সুরভি বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে,
মুহুর্মুহু অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিল বদনশশী"

তখন যেন তিনি স্বকীয় হৃদয়ভাবের অনুচিত্র প্রদান করিলেন।

আমরা এইরূপ হৃদয়ভাব সমালোচিত গ্রন্থের এক স্থানে সুন্দরভাবে প্রকটিত দেখিয়াছি। ইন্দ্রাণী যখন চপলার সহিত হৃদয়কবাট উন্মুক্ত করিয়া খেদোক্তি করিতে করিতে সুরপুরীর সুখসম্ভোগ বর্ণনা করিতেছেন তখন ইন্দ্রাণীর হৃদয়ভাব কেমন রমণীয়! স্বর্গ হইতে প্রতাড়িত হইলে যখন তাঁহার হৃদয় প্রথম ব্যথিত হইয়াছিল, এই শোকবর্ণনায় সে হৃদয়ভাবের প্রাবল্য নাই। সে শোক এখন কিছু মন্দীভূত হইয়াছে। কালের দূরত্ব হেতু সে ভাবের এখন স্থৈর্য্য জন্মিয়াছে। স্মৃতি আসিয়া অন্যবিধ ভাবের সহিত তাহা বিমিশ্রিত করিয়াছে। আশা আসিয়া সে ভাবে বর্ণবিনিয়োগ দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়াছে। ইন্দ্রাণীর এপ্রকার হৃদয়ভাব আমরা যখন হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম, তখন আমাদিগেরও মনে ধীরে ধীরে তাহার সহানুভূতি জন্মিতে লাগিল। আমাদিগেরও তখন বোধ হইতে লাগিল যেন-

নন্দন কানন হতে, মন্দ সমীরণ,
সুরভি আনন্দে নাচি মৃদু ধীরে ধীরে,
সুস্বনে সবার কানে কহিছে বিলাসী
কোন কোন ফুল চুম্বি কি ধন পাইল।

হেমবাবু একটি নূতন বিষয়ে এবারে তাঁহার কল্পনা বিস্তৃত করিয়াছেন। বিস্তৃত করিয়া কিয়ৎপরিমাণে সুসিদ্ধও হইয়াছেন। স্পেন্সর যেমন অনেক অনবয়বী ভাবের অবয়ব প্রদান করিয়া চমৎকার রূপক-রচনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, হেমবাবুও তদ্রূপ দুই একটি রূপকময় চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। স্পেন্সর, আলস্যহিংসা, লোভ, ক্রোধ, সমর, নিদ্রা প্রভৃতি অনেক রূপহীন মানসিক ভাবকে অবয়ব প্রদান করিয়াছেন। এই সমস্ত রূপকবর্ণনা পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র বর্ণিত রূপকের মত নহে। প্রবোধচন্দ্রোদয় গ্রন্থ নাটক; এজন্য তাহার রূপক অন্যবিধ হইয়াছে। সমগ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় গ্রন্থখানি একটি রূপক। নাটকে হিংসাদি রিপুগণ কেবল অনুরূপ বাক্যে সম্ভাষণ ও কার্য্য করিতে পারে। সেই রিপুগণ কিরূপ অবয়ব ধারণ করিবে, নাটকে তাহা বর্ণিত হইতে পারে না। সেরূপ অবয়ব কল্পনা করা অভিনেতার কার্য্য। ইহাদিগের অনুরূপ অবয়ব কল্পনা করাও কবির কার্য্য। কল্পনার সুকুমার তুলিকায় কবি সকলভাবেরই অনুরূপ চিত্র প্রদান করিতে পারেন। স্পেন্সরের কাব্য মধ্যে প্রবেশ কর, দেখিতে পাইবে সমগ্র মানসিক রাজ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমার সমক্ষে সমুদিত হইয়াছে।

হেম বাবুর বিষয় অন্যবিধ, তত্রাচ তিনি স্থান পাইয়া এইরূপ অনবয়বী মানসিক ভাবকে চমৎকার মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন। পাঠকগণ দেখুন তিনি নিয়তির কেমন অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"পাষাণের মূর্ত্তি যেন, দৃষ্টি নিরদয়।
মাধুর্য্য, কি স্নেহ, কিম্বা অনুকম্প-লেশ,
বদন, শরীর, নেত্র, গাত্র, কি ললাটে,
ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র; নিয়ত দর্শন,
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য পটে।
অনন্যমানস, দৃষ্টি আলেখ্যের প্রতি,
কহিলা নীরস বাক্য চাহিয়া বাসবে—"

অন্যত্র :—

"কহিলা সে হুতাশন—সর্ব্ব অঙ্গে শিখা
প্রজ্বলিত হৈল তেজে পাতাল দহিয়া;"

আর আমরা এ প্রস্তাব প্রবর্দ্ধিত করিতে চাহি না। হেমবাবুর কাব্য সমাপ্ত হয় নাই, আমাদিগেরও বক্তব্য অসমাপ্ত রহিল। আংশিক সমালোচনা হেতু যে সমস্ত ত্রুটি হইয়াছে, হেমবাবু তজ্জন্য যেন আমাদিগকে সম্পূর্ণ অপরাধী না করেন। এ কাব্যের গুণ ভাগই বিস্তর। ভাষা একটু সুললিত হইলে বৃত্রসংহার কাব্য বঙ্গভাষায় এক খানি পরম উপাদেয় কাব্য হইত।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

উত্তরাবিলাপ কাব্য— অথবা ভর্তৃহীনা উত্তরা। শ্রীরুক্মিণীকান্ত ঠাকুর প্রণীত। গুপ্তপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য।• আনা। গ্রন্থখানি কিরূপ নিম্নউদ্ধৃত

কবিতাটী পাঠ করুন, পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

পশ্চিম গগণ আরক্তময়,
ক্রমেতে তপন বিলীন হয়;
নলিনী ডুবিছে বিষাদ-নীরে,
কুমুদিনী দেখা দিতেছে ধীরে।

বৈদেহী-বৈধব্যকাব্য। শ্রীঅনাথ-বন্ধু রায় প্রণীত। ঢাকা গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।॰ আনা। গ্রন্থকার সংস্কৃত কবিদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া এত দুর্ব্বোধ শব্দনিচয় ও সমাসচ্ছটা প্রকাশ করিয়াছেন, যে যদি ইহাতে কিছু কবিত্ব থাকে, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া ভার। পাঠকগণ নিম্নে দৃষ্টি করুন, আমার অর্থ বুঝিতে পারিবেন।

অদম্য-দনুজ-লবণ-সূদন,
বীরেন্দ্র-কেশরী বীর শক্রঘন
রক্ষক ইহার—ইহারে যে জন
ধরিবে তাহার নিশ্চয় মরা।

বলদমহিমা নাটক। বঙ্গদর্শন-সম্পাদকস্য অনুমত্যানুসারেণ কেনচিদ্‌-গ্রাহকেন বিরচিতম্‌। ঢাকা ইষ্টবেঙ্গল প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৵৹ আনা মাত্র। এইরূপ নাটক আর দুই-এক খানি বাহির হইলেই এদেশের শ্রীবৃদ্ধি!

ভারত অধীন? শ্রীকুঞ্জবিহারী প্রণীত। নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৵৹ আনামাত্র। এখানি ভারত-মাতার অনুকরণে রচিত। এরূপ গ্রন্থের সংখ্যা যত বাড়ে, ততই আমাদের দেশের মঙ্গল।

ভুগোল সার। অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদিগের ব্যবহারার্থ বেঙ্গল একাডেমীর হেড পণ্ডিত শ্রীনগেন্দ্র নাথ কোঙার সঙ্কলিত। মূল্য /৹ আনামাত্র। যে উদ্দেশে ইহা সংরচিত হইয়াছে, ইহা সেই উদ্দেশ্য সাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী।

কবিতা-কুসুম-মালিকা। মেডিকেল কালেজের ইংরাজী শ্রেণীর ছাত্র শ্রীকুঞ্জবিহারী সাহা কর্ত্তৃক প্রণীত কলিকাতা গুপ্তযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা মাত্র। গ্রন্থ খানি মন্দ নহে! ইহা হইতে নিম্নে একটী কবিতা উদ্ধৃত হইলঃ—

তারাদল সহ যবে রোহিণী-বল্লভ
ডুবিবেন প্রিয় সখে! আকাশ-সাগরে,
যবে কুমুদিনী, হায়!—সরসী-বিভব—
মুদিবে বদন চারু তাপিত অন্তরে;—
হায়, সখে! সে সময় আশার আদেশে
তোমায় ছাড়িয়া আমি যাব অন্য দেশে,
তাই হে, কাতর স্বরে, তথায় যাবার তরে,
তোমার নিকটে আজি যাচিছি বিদায়,
—দেখ, সখে! ভুলনা আমায়!!

মেয়ে মনষ্টার মিটিং প্রহসন। কলিকাতা গিরিশবিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।/৹ আনা মাত্র। গ্রন্থকার স্ত্রী-স্বাধীনতার উপরি বিরক্ত হইয়া এই কৌতুক-জনক কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাতে জঘন্য রসিকতা বই আর কিছুই উপলক্ষিত হইল না।

———

গ্রীক ও যবন।

যে সকল পাশ্চাত্য অধ্যাপকেরা সংস্কৃত যবনশব্দে গ্রীসদেশের অধিবাসীদিগকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, নিজপক্ষসমর্থনার্থ তাঁহারা কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকে বর্ণিত যবনশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত নাটকাদির তত্তৎস্থল বিশেষ মনোযোগসহকারে পাঠ করিলে পর্য্যবসানে অবশ্যই প্রতীতি হইবে, যে ঐ সকল স্থলে প্রযুক্ত যবনশব্দে কেবল গ্রীকদিগকে বুঝাইতেছে, এরূপ কখনই সপ্রমাণ হইতে পারে না। উক্ত নাটকাদিপ্রযুক্ত যবনশব্দের প্রতিপাদ্য গ্রীসদেশের অধিবাসী, অপর কেহই নহে, ইহার কিছুমাত্র বিনিগমনা নাই। বরং উহার তাৎপর্য্য ভিন্নপ্রকার বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। মহাকবি কালিদাসপ্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা দুষ্যন্ত সঙ্গিনী যবনীদিগের কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া মৃগয়াযাত্রা করিতেছেন এরূপ বর্ণনা আছে। * এই স্থলের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অধ্যাপক উইলিয়মস্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে "এ স্থলে যবনীশব্দে কোন্ জাতীয় স্ত্রীলোকদিগকে বুঝিতে হইবে, তাহার মীমাংসা করিতে পারা যায় না। যবনশব্দের প্রকৃত প্রতিপাদ্য আরবদেশ, কিন্তু গ্রীস দেশও এই শব্দের অন্যতম অভিধেয়। অতএব এস্থলে কবি আরবদেশীয় বা গ্রীক এই উভয় অর্থের কোন্টী বুঝাইবার উদ্দেশে যবনশব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র অনুমাপক নাই।" (Translation of Sakuntala p. 35) বিক্রমোর্ব্বশীনামক নাটিকার পঞ্চম অঙ্কে এই প্রকার একজন অস্ত্রধারিণী রাজসহচরীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক উইলসন উক্ত স্থলের অনুবাদ উপলক্ষে বলিয়াছেন যে "এখানে যবনী শব্দে গ্রীসদেশীয় স্ত্রীলোক বুঝাইতে পারে না। বোধ হয় ব্যাক্‌ট্রিয়া বা তাতারদেশীয় স্ত্রীলোক বুঝানই কবির অভিপ্রায় ছিল।" ইহাদ্বারা স্পষ্টই অনুমান হইতেছে যে উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ যবনশব্দে গ্রীকদিগকে বুঝাইতে পারে না, এটী একপ্রকার অকাট্য সিদ্ধান্ত। এক্ষণে কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের যেরূপ সময় নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, কালিদাসকর্ত্তৃক অভিজ্ঞানশকুন্তল ও বিক্রমোর্ব্বশী রচনার

* **এসো বাণাসন হত্থাহিং যবনীহিং বণপুপ্ফমালাধারিণীহিং পরিবুদো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি পিঅবঅস্সো।** দ্বিতীয় অঙ্ক। পাঠান্তর।

বহুকাল পূর্ব্বে মহাবীর সেকেন্দর সাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সুতরাং কালিদাস গ্রীক্‌দিগের চরিত্রাদির বিষয় যে সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কালিদাস আর্য্যপুরাবৃত্তের এই সকল সূক্ষ্ম তথ্য সুচারুরূপে অবগত থাকিয়াও উক্তরূপ কালানৌচিত্য দোষে আপন রচনা দূষিত করিবেন ইহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর বোধ হয়না। গ্রীসদেশীয়েরা সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টাবতারের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, কালিদাস এই সকল বৃত্তান্ত বিশেষরূপে বিদিত থাকিয়াও গ্রীসদেশের রমণীদিগকে পুরূরবা প্রভৃতি সত্যযুগীয় নৃপতিগণের সহচরীস্বরূপে বর্ণনা করিবেন ইহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারেননা।

সে যাহা হউক, যদিও বিরুদ্ধ পক্ষের ব্যাখ্যাই প্রকৃত ঘটনা বলিয়া স্বীকার করা যায়; আর যদি ইহাও সত্য হয়, যে তৎকালে ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণ গ্রীসদেশীয় মহিলাদিগকে স্বদেশীয় সুন্দরীদিগের অপেক্ষা অধিকতর সমাদরপূর্ব্বক আপনাদিগের নর্ম্মসাচিব্যে নিয়োজিত করিতেন, তাহা হইলেও এরূপ সন্দেহ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, যে তৎকালে এতদ্দেশে এরূপ পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় গ্রীসদেশীয় স্ত্রীলোক কি প্রকারে পাওয়া যাইত, যে রাজগণ তাহাদিগকে উল্লিখিতরূপ অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইতেন! আমরা এই কূট প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে সমর্থ নহি। ফলে বর্ণিত সময়ে গ্রীকেরা এতদ্দেশে যাতায়াত করিত এরূপ স্বীকার করিলেও ইহা কখনই বিশ্বাস করিতে পারা যায়না, যে তৎকালে আমাদের দেশে গ্রীক রমণীদিগের অতদূর প্রাচুর্য্য হইয়াছিল। যৎকালে মহাবীর সেকেন্দর ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি দুইটী এতদ্দেশীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। প্রথম ব্যাক্‌ট্রিয়াদেশীয় রক্‌সানা ও দ্বিতীয় পারস্যদেশীয় ষ্ট্রাটিরা। রক্‌সানার গর্ভে সেকেন্দরের এক মাত্র পুত্রের জন্ম হয়। সেকেন্দরসাহের ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার পরলোক হইলে নিজ নিজ অধিকৃত প্রদেশে নিজ নিজ স্বাধীনতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে এতদ্দেশে গ্রীক দেশের রমণীগণের তাদৃশ প্রাচুর্য্য ছিলনা, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। সেকেন্দরের উত্তরাধিকারিগণ স্বদেশীয় স্ত্রীলোকের অভাবে অত্রত্য কন্যাগণের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রীক বিজেতৃ সৈন্যের সহিত একজনও তদ্দেশীয় স্ত্রী ভারতবর্ষে আসে নাই, এরূপ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তবে অত্রত্য তদানীন্তন গ্রীকেরা এতদ্দেশে স্বজাতীয় স্ত্রীদিগের অসদ্ভাব বা অল্প সংখ্যা প্রযুক্তই এতদ্দেশীয় মহিলাগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাতে আর সন্দেহ কি? খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দে স্পানিয়ার্ড, পর্ত্তুগীজ,

ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি অধুনাতন ইউরোপীয় জাতীয়েরা বাণিজ্য ও রাজ্য-বিস্তার উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করেন। সেকেন্দর সাহ যে সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দে তদপেক্ষা যাতায়াতের অনেক অধিক সুবিধা হইয়াছিল ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব যাতায়াতের এতদূর সুবিধাসত্ত্বেও যখন ফরাসী পর্ত্তুগিজ প্রভৃতি ইউরোপীয়দিগকে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের সহিত বিবাহ করিতে হইয়াছিল, ও এইরূপ বহুল সংশ্রবে ফিরীঙ্গী নামক একটী স্বতন্ত্র জাতির সমুদ্ভব হইয়াছে দেখা যাইতেছে, তখন শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিল তাহারা যে এতদ্দেশীয় স্ত্রীদিগকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সে কেবল স্বদেশীয় কন্যার অভাব বা অল্পতাপ্রযুক্ত তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। সুতরাং এরূপ অবস্থায় তদানীন্তন ভারতবর্ষীয় রাজগণ যে গ্রীসদেশীয় রমনীদিগকে সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহা কি প্রকারে সম্ভবে? ইহাদ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে তৎকালে সীথিয়া, ব্যাক্‌ট্রিয়া, পারস্য ও আফ্‌গানিস্তান এই কয়েকটী প্রদেশের রমণীরাই ভারতবর্ষে আগমন করিত, এবং উহাদিগকেই কালিদাস যবনীশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৌধায়নসূত্রে গোমাংশভক্ষক, বিরুদ্ধবহুভাষী ও ধর্ম্মাচারবিহীন জাতিদিগকে § ম্লেচ্ছশব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ম্লেচ্ছশব্দ যবনশব্দের প্রতিবাক্য। সুতরাং উপরি উক্ত লক্ষণাক্রান্ত জাতিদিগকেই যবনশব্দে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। উপরি উল্লিখিত বৌধায়নসূত্রে এরূপ কোন বিশেষ লক্ষণ নাই যদ্দ্বারা পারস্য প্রভৃতি ভারতসন্নিহিত দেশের অধিবাসীদিগকে যবনশব্দে নির্দ্দেশ না করিয়া দেশান্তরনিবাসী গ্রীকদিগকে যবনশব্দে নির্দ্দেশ করিতে হয়। পাটলিপুত্ররাজ চন্দ্রগুপ্ত একটী গ্রীসদেশীয় রমণীর পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন ইতিহাসরচয়িতা মেগাস্থিনিস এ কথা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথার্থ বটে, কিন্তু ঐ ঘটনার যাথার্থ্য পক্ষে প্রমাণান্তর দেখিতে পাওয়া যায়না। আর উহা সত্য হইলেও এই এক মাত্র উদাহরণদর্শনে আমাদিগের সিদ্ধান্তকে অপসিদ্ধান্ত বলিতে অগ্রসর হওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

কালিদাসপ্রণীত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের অন্যতম স্থলে যবনশব্দের উল্লেখ আছে। নাটকের নায়ক বিদিশাধিপতি মৌর্য্যবংশোদ্ভব রাজা অগ্নিমিত্র, এরূপ বলিতেছেন, বর্ণনা আছে,

---

§ গোমাংসখাদকো যস্তু বিরুদ্ধং বহুভাষতে। ধর্ম্মাচারবিহীনস্তু ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে॥

যে তাঁহার পিতা মহারাজ পুষ্পমিত্র কোন সময়ে শুভ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিয়া যজ্ঞার্থ অশ্ব পরিবর্জ্জন করেন। ঐ অশ্ব রক্ষার্থ বসুমিত্র ও তাঁহার এক শত সহচর নিযুক্ত ছিলেন, এমত সময় অশ্বটী সিন্ধু নদী অতিক্রম-পূর্ব্বক উহার পর পারে উপনীত হয়। ঐ সময় এক দল যবনসৈন্য বল পূর্ব্বক অশ্বটীকে হরণ করিবার চেষ্টা করাতে উহাদের সহিত সসৈন্য বসুমিত্রের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ডাক্তার ওয়েবর বলেন, যে এস্থলে যবনশব্দে আসিয়াপ্রবাসী গ্রীকদিগকে বুঝিতে হইবে, কারণ সেকেন্দর সাহের ভারতবর্ষ আক্রমণের সময় অবধি আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের সান্নিধ্যে গ্রীকদিগের বসতি হয়। কিন্তু উল্লিখিতজাতীয় লোকেরা যে গ্রীক, সুলেমানগিরির সান্নিধ্যনিবাসী অন্যান্য অসভ্যজাতি নহে তাহার কিছুমাত্র স্থির নিশ্চয় হইতে পারে না।

কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে যুবরাজ রঘু পারস্যদশে জয় করিবার উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা করিলেন এরূপ বর্ণনা আছে। কালিদাস পারস্যদেশীয়দিগের বনিতা-দিগকে যবনীশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার উক্ত যবনীদিগের স্বামীরা শ্মশ্রু-ধারণ করিত এরূপ নির্দ্দেশ আছে। সুতরাং স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে এস্থলে যবনশব্দে গ্রীকদিগকে বুঝাইতে পারে না, কারণ সেকেন্দর সাহের অধস্তন আসিয়াপ্রবাসী গ্রীকেরা শ্মশ্রুধারণ করিত না, ইতিবৃত্তে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

দশকুমারচরিত নাম আখ্যায়িকার তৃতীয় পরিচ্ছেদে এরূপ বর্ণনা আছে, যে কোন সময়ে মিথিলাপ্রদেশের অন্যতম রাজা একজন যবন বণিককে প্রবঞ্চনা-পূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে এক খণ্ড মহামূল্য হীরক লইবার নিমিত্ত ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলেন। এই ঘটনাটী খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের ঘটনা বলিয়া অধুনাতন প্রত্নকম্রেরা এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে গ্রীসের অধিবাসীরা বাণিজ্যের উদ্দেশে ত্রিহুত দেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, এটী নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা। অধ্যাপক উইলসন তৎকালে গ্রীকদিগের ত্রিহুত পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহা সংস্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে উক্ত স্থলে যবনশব্দে আরব বা পারস্যদশীয় কোন বণিককে বুঝিতে হইবে, উহাদ্বারা গ্রীক-দিগকে বুঝাইতে পারে না। অধ্যাপক ল্যাসেন ও নিজ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া উইল্‌সনের মতের পোষকতা করিয়াছেন।

সংস্কৃত স্মৃতিশাস্ত্রের নানা স্থানে যবনশব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কুত্রাপি উহাদিগের প্রকৃতস্বরূপ নির্ব্বাচনার্থ কিছুমাত্র বিশেষ লক্ষণের উল্লেখ নাই। কেবল এই মাত্র বুঝিতে

পারা যায় যে যবনশব্দ ম্লেচ্ছশব্দের সমানার্থক। যবনেরা অস্পৃশ্য জাতি, উহাদিগের ছায়াস্পর্শ করিলেও প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা যবনদিগের স্বরূপ ও প্রকৃত্যাদির বিষয় কিছুমাত্র অনুমান করিতে পারা যায়না। সে যাহা হউক এই প্রস্তাবের ইতঃপূর্ব্বভাগে যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা নিঃসন্দেহ প্রতীতি হইতেছে, যে সংস্কৃত ভাষায় প্রযুক্ত যবনশব্দে অগ্রে কাণ্ডাহার প্রদেশের পশ্চিমস্থ কোন স্থানের অধিবাসীদিগকে বুঝাইত, পরে উহার তাৎপর্য্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া উঠে, এবং যবন শব্দে ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ তাবৎ দেশদেশান্তরের অধিবাসীদিগকে বুঝাইতে আরম্ভ হয়। ফলে যবনশব্দের এরূপ স্বরূপযোগ্যতা বা লক্ষণাবৃত্তিসিদ্ধ কোন যোগ্যতা নাই, যদ্দ্বারা কেবল গ্রীস্ দেশের অধিবাসীরাই উহার প্রতিপাদ্য হইতে পারে।

এই প্রস্তাবের প্রারম্ভে বিরুদ্ধমতাবলম্বী পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রদর্শিত যে চারিটী যুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকেরা তৎসমুদয় অবশ্যই বিস্মৃত হইতে পারেন না। উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে তদ্দ্বারা প্রথম যুক্তিটীর খণ্ডন হইল। উপরি উল্লিখিত প্রমাণাদিদর্শনসত্ত্বে কেবল শব্দসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া সংস্কৃত যবনশব্দের সহিত গ্রীক "আইয়োনিয়া" প্রভৃতি শব্দের অভিন্নতা সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করা বোধ হয় কোন বিজ্ঞ পাঠকের অভিমত হইবে না।

এক্ষণে দ্বিতীয় যুক্তির অবতারণা করিয়া উহার অযৌক্তিকতার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি। দ্বিতীয় যুক্তিটী এই:—সংস্কৃত যবন শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন পালি ভাষায় ব্যবহৃত "যোনা" শব্দ আইয়োনিয়া দেশীয় অন্যতম নৃপতি বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে, অতএব সংস্কৃত যবনশব্দে অবশ্যই গ্রীস্‌দেশের অধিবাসীদিগকে বুঝাইবে। কিছুদিন হইল গির্নার ও ধৌলী-নামক দুইটী স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী রাজা অশোকের প্রতিষ্ঠা পিত তাম্র এক খণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রিন্‌সেপ সাহেব উহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহাতে সীরিয়া প্রদেশের গ্রীসদেশীয় রাজা এণ্টিয়োকস টিয়সকে "যোনা" শব্দে, নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই স্থলে এণ্টিয়োকস্ যে সংস্কৃত যবনশব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন যোনাশব্দের প্রতিপাদ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কারণ কপূর্‌রগিরি নামক স্থানের খোদিত লিপিতেও এণ্টিয়োকসই উল্লিখিত "যোনা" শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। অধ্যাপক উইলসন্ ঐ খোদিত লিপির উদ্ধার করিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই, উক্ত "যোনা" শব্দে কেবল গ্রীক, না সামান্যতঃ সকল পাশ্চাত্য জাতীয়কেই বুঝাইতেছে? যদি উল্লিখিত দুইটী সম্ভাবনার প্রথমটীই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ যোনাশব্দে গ্রীসের অধিবাসিভিন্ন অন্য

কোন জাতিকে বুঝাইতে পারেনা, এইটীই প্রকৃত তথ্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত স্থলে প্রযুক্ত যবনশব্দের প্রকৃততাৎপর্য্যবিষয়ক সন্দেহের মীমাংসা হইতে পারেনা, কারণ উল্লিখিত তাম্রশাসন লিপিতে সীরিয়ারাজ এণ্টিয়োকস যোনা শব্দে উল্লিখিত হইয়াছেন, যথার্থ বটে, কিন্তু তাঁহার স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় টলেমিয়স, এণ্টিগোনস, মেগস, আলেক্‌জাণ্ডার প্রভৃতি গ্রীক্ রাজগণের বর্ণন স্থলে উল্লিখিত যোনা শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। ইহাদ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে তৎকালে সীরিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া আফ্‌গানিস্তান পর্য্যন্ত এণ্টিয়োকসের অধিকৃত তাবৎ প্রদেশকেই যোনা শব্দে নির্দ্দেশ করিত, সুতরাং যবনদেশের অধিপতি বলিয়া এণ্টিয়োকসের "যোনা" এই উপাধি হইয়াছিল, নতুবা যোনা শব্দে যাবতীয় গ্রীকদিগকে বুঝাইবার অভিপ্রায় থাকিলে তদানীন্তন লোকেরা এণ্টিগোনস্‌র প্রভৃতি অন্যান্য গ্রীক সামন্তদিগকে "যোনা" এই সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিত সন্দেহ নাই। যদি যাবতীয় গ্রীক্‌গণই পালী যোনা শব্দের প্রকৃত অভিধেয় ইহা যথার্থ হয়, তাহা হইলে গ্রীক্‌কুল চূড়ামণি মহারাজ আলেক্‌জাণ্ডারকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অন্যতম সেনানী এণ্টিয়োকসকে তৎশব্দে নির্দ্দেশ করা অল্প আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের বিষয় নহে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে উক্ত খোদিত লিপিতে প্রযুক্ত যোনাশব্দের অর্থে এণ্টিয়োকসের জন্মভূমি অর্থাৎ গ্রীসদেশ বুঝিতে হইবে, এণ্টিয়োকসের অধিকৃত আসিরিক প্রদেশ উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নহে। যদি এণ্টিয়োকসের জন্মভূমিবুঝানই অশোক রাজার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তিনি "যোনা" শব্দ "এণ্টিয়োকস", এই ব্যক্তিবাচী সংজ্ঞার বিশেষণস্বরূপেই ব্যবহার করিতেন, কখনই তাঁহাকে "যোনা" দেশীয় রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না।

যদি যোনাশব্দে সাধারণ্যে যাবতীয় ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ দেশ মাত্রের অধিবাসীদিগকে বুঝায়, এই দ্বিতীয় পক্ষই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা এই বলিয়া তর্ক করিতে পারেন, যে যদি যোনা শব্দটী সাধারণতঃ তাবৎ গ্রীকদিগকে বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে উহা তাদৃশরূপে ব্যবহৃত হয় নাই কেন? কি জন্য উহা আলেক্‌জাণ্ডার প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রীক রাজগণের উপাধি স্বরূপ ব্যবহৃত না হইয়া কেবল এণ্টিয়োকসের নামের পূর্ব্বেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই এই আপত্তির মীমাংসা হইতে পারে। আলেক্‌জাণ্ডারের যে সকল সেনানী এতদ্দেশে অধিকার-বিস্তার করিয়াছিলেন, আণ্টিয়োকস তাঁহাদিগের সকলের মধ্যেই প্রধান বলিয়া কেবল তাঁহাকেই উক্ত উপাধি প্রদান করা হইয়াছে, অন্য কেহ উক্ত নামে অভিহিত হয় নাই। সে যাহা

হউক উপরি উল্লিখিত দুইটী পক্ষের যেটীই অবলম্বন করা যাউক না কেন, উভয়ের একটী অনুসারেও এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, যে ডাক্তার করণের মত কোন প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ, অর্থাৎ যবনঃ শব্দে কেবল গ্রীকদিগকে বুঝায়, অন্য কোন জাতীয় লোকদিগকে বুঝায় না, ও বুঝাইতে পারে না।

মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া আপনাকে ম্যাসিডোনীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কোন প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয় না। পুরাবৃত্তরচয়িতা এরিয়ান ও প্লুটার্ক ইহাঁরাও উভয়েই আলেক্‌জাণ্ডারকে ম্যাসিডোনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব আলেক্‌জাণ্ডার যে ম্যাসিডনের অধিবাসী ছিলেন তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পুরাবৃত্তের প্রতি মনোনিবেশ করিলে অবশ্যই প্রতিপন্ন হইবে, যে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সিন্ধুনদীর অপর পার পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাঁহার পাশ্চাত্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন। সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত যে আলেক্‌জাণ্ডারের বৃত্তান্ত সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন তাহা এক প্রকার নিঃসন্দেহ। আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কয়েক বৎসর পরেই তিনি সিলিউকস নিকেতর নামক আলেকজাণ্ডারে আসিয়িক একজন প্রতিনিধির অন্যতম দুহিতার পাণি গ্রহণ করেন। এই সময়ে মেগাস্থিনিস নামক একজন গ্রীসদেশীয় রাজদূত তাঁহার সভায় উপস্থিত হইয়া কয়েক বৎসর তথায় বাস করেন। কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন যে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার উক্ত গ্রীক রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র সুপ্রসিদ্ধ অশোক এই বিন্দুসারের আত্মজ। মহারাজ অশোক উল্লিখিত গ্রীক্ মহিলার পৌত্র ছিলেন কিনা তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে অশোক রাজা ঐ গ্রীক রমণীরই পৌত্র। যদিও একথা অমূলক হয়, তাহা হইলেও ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে অশোক মাসিডোনীয় গ্রীকদিগের বিষয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অবগত ছিলেন। কারণ তাঁহার পিতামহের জীবিতকালে উক্ত গ্রীকেরা ভারতবর্ষে উপস্থিত ছিল, এবং তাঁহার পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের সহিত গ্রীকদিগের সবিশেষ পরিচয় ও বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়াছিল। অতএব অশোক যে তাঁহার পিতামহের সমসাময়িক নবাগত বিজেতাদিগের জন্মভূমি আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন তাহা আর কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবেক যে অশোক এই রূপে সমস্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইয়াও কি জন্য গ্রীকদিগের বর্ণনস্থলে তাহাদিগকে গ্রীক বলিয়া নির্দ্দেশ না করিয়া "যোনা" অর্থাৎ যবন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা অজ্ঞানবশতঃ

হইয়াছিল, এরূপ কেহই বলিতে পারিবেন না। নিশ্চয়ই অশোকের এরূপ করিবার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। অশোক গ্রীকদিগের মধ্যে যাঁহাকে "যোনা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তিনি আবার সিন্ধুনদীর পশ্চিমপারস্থ একটী প্রদেশের রাজা ছিলেন, রাজশাসনাদি বিষয়ে তাঁহার জন্মভূমি গ্রীসের সহিত কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে অশোক আণ্টিয়োকসের অধিকৃত প্রদেশ বুঝাইবার জন্যই তাঁহার নামের পূর্ব্বে "যোনা" এই শব্দটী ব্যবহার করিয়াছিলেন, নতুবা আণ্টিয়োকস যে গ্রীসদেশের অধিবাসী ছিলেন ইহাই বুঝাইবার জন্য "যোনা" শব্দ প্রয়োগ করা কথনই অশোকের উদ্দেশ্য ছিল না। এতদ্ভিন্ন অশোক কর্ত্তৃক উল্লিখিত "যোনা" শব্দ প্রয়োগের আর এক প্রকার সমাধান করা যাইতে পারে। বোধ হয়, সংস্কৃত যবন শব্দের ন্যায় প্রাকৃত "যোনা" শব্দ ও তৎকালে সামান্যতঃ ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ যাবতীয় প্রদেশের অধিবাসীদিগকে বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইত। অশোকের খোদিত লিপিতেও এই অর্থেই "যোনা" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকিবে। এই প্রকারেই গ্রীস ও রোমের গ্রন্থকর্ত্তারা বিদেশীয় জাতি বুঝাইবার জন্য "বর্ব্বর" (Barbarian) এই শব্দের ব্যবহার করিতেন। বহুকাল হইতেই ভারতবর্ষীয়েরা উক্ত প্রকারে সংস্কৃত যবনশব্দের ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। যবনশব্দের ব্যুৎপত্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলে উহার ঐ প্রকার অর্থই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া প্রতীতি হইবে। অধুনাতন সময়েও হিন্দুজাতীয়েরা কোন বিশেষ দেশের অধিবাসীদিগকে বুঝাইতে হইলে বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞার ব্যবহার করিয়া থাকে। আমরা ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগকে ইংরাজ, ফ্রান্সের অধিবাসীদিগকে ফরাসী, পর্ত্তুগালের অধিবাসীদিগকে পর্ত্তুক, ডেন্‌মার্কের অধিবাসীদিগকে দিনেমার, হল্যাণ্ডের অধিবাসীদিগকে ওলন্দাজ, ও জর্ম্মেনির অধিবাসীদিগকে ইলিমার বলিয়া থাকি; কিন্তু ইহাদিগের সকলকেই যবন বা ম্লেচ্ছ এই সাধারণ সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। এতাবতা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে অশোকের সময়ে এবং তাঁহার পূর্ব্বেও "যোনা" বা যবন" শব্দের এইরূপেই ব্যবহার হইত।

এক্ষণে তৃতীয় যুক্তির অবতারণা করিতেছি। সেটী এই। সংস্কৃত জ্যোতিঃশাস্ত্রঘটিত গ্রন্থাদিতে গ্রীকদেশীয় গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে। ইহা দেখিয়া বিরুদ্ধমতাবলম্বী পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেন যে উল্লিখিত স্থলে ব্যবহৃত সংস্কৃত যবনশব্দে গ্রীসদেশের অধিবাসীদিগকে বুঝিতে হইবে। যদি বিরুদ্ধমতাবলম্বী মহোদয়েরা এরূপ সপ্রমাণ করিতে পারিতেন, যে সংস্কৃত জ্যোতিঃশাস্ত্রের কিঞ্চিন্মাত্র অংশও সাক্ষাৎসম্বন্ধে গ্রীক্‌দিগের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রদর্শিত যুক্তি প্রবলতর

ও অকাট্য হইতে পারে। কিন্তু এরূপ প্রমাণ করিবার নিমিত্ত কিছুমাত্র উপায় নাই। বিপক্ষ মহাশয়েরা তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞা সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশে যে সকল যুক্তি পরম্পরার উদ্ভাবন করিয়াছেন, কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে, যে তৎসমুদয় নিতান্ত অসার ও প্রকৃতানুপযোগী। আমাদিগের রাশিচক্রস্থ অনেক গুলি চিহ্নের গ্রীকদিগের জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত রাশিচক্রচিহ্নের সহিত ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় যথার্থ বটে, কিন্তু কেবল ইহা দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না, যে ভারতবর্ষীয়েরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে তদীয় রাশিচক্রের চিহ্নগুলির নাম সকল গ্রহণ করিয়াছিল। ফলতঃ এই সকল জ্যোতিঃশাস্ত্রঘটিত পারিভাষিক শব্দের জন্য গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট ঋণী, কি ভারতবর্ষীয়েরা গ্রীকদিগের নিকট ঋণী তাহার কিছুমাত্র বিনিগমনা নাই। পণ্ডিতবর্য্য ডাক্তার ওয়েবার অনুমান করেন যে ভারতবর্ষীয়েরাই গ্রীকদিগের নিকট হইতে উক্ত নাম সংগ্রহ করিয়াছিল। যদি ইহাঁর মতই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগের নিজ পক্ষসমর্থনার্থ। বিশেষ আনুকূল্য হইবে এরূপ বোধ হয় না। কারণ উক্তরূপ অনুমান ন্যায়সঙ্গত হইলেও উহার দ্বারা কখনই প্রমাণ হইতে পারে না, যে পালী "যোনা" বা সংস্কৃত "যবন" শব্দের অর্থে কেবল গ্রীকদিগকেই বুঝিতে হইবে, গ্রীকভিন্ন অন্যান্য কোন জাতিকে বুঝাইতে পারে উহাদের এরূপ স্বরূপযোগ্যতা নাই। ডাক্তার ওয়েবার নিম্নোদ্ধৃত ও অন্যান্য কতিপয় সংস্কৃত জ্যোতিঃশাস্ত্রঘটিত পারিভাষিক শব্দ গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যথাঃ—কেন্দ্র, কোণ, ত্রিকোণ, জামিত্র, হেলি, হৃদ্রোশ, হোরা প্রভৃতি। এই আপত্তির সমাধান উপলক্ষে বলা যাইতে পারে, যে ডাক্তার ওয়েবার কর্তৃক উল্লিখিত সংস্কৃত শব্দগুলি প্রায়ই প্রাচীন সংস্কৃত মূল হইতে উৎপন্ন। সেই সকল প্রাচীন মূলের যে অর্থ, তৎসমুদয় হইতে উৎপন্ন বিবেচ্য শব্দগুলির ও সেই অর্থ রহিয়াছে, সুতরাং তৎসমুদয় যে গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত তাহার প্রমাণ কি? তৎসমুদয়কে গ্রীকভাষা হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে অনায়াসেই এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, যে সমগ্র সংস্কৃত ভাষাই গ্রীকভাষা হইতে গৃহীত, গ্রীকভাষারই রূপান্তর মাত্র। মনে কর, ত্রিকোণ শব্দটী সংস্কৃত **ত্রি** এবং **কোণ** এই দুইটী শব্দের সহযোগে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে, **ত্রি** শব্দের গ্রীক প্রতিবাক্য ত্রেস (Tres), ও কোণ শব্দের গ্রীক্ প্রতিবাক্য কোণস্ (Konus) এই শব্দসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া সংস্কৃত **ত্রি** ও **কোণ** এই দুইটী শব্দ গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইলে, যে যে ভাষায় উক্তরূপ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় সংস্কৃত **ত্রি** ও **কোণ** শব্দকে

যথাক্রমে তৎসমুদয়ের অন্যতম হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রতিজ্ঞা করা যাইতে পারে। স্যাক্সন্ ভাষায়, সংস্কৃত ত্রি শব্দের প্রতিবাক্য থ্রিস (tres), সুইডিস ভাষায় ত্রি, (tre), জর্ম্মন্ ভাষায় দ্রি (drei); ফরাসী ভাষায় ত্রইস (trois); ইটালীয় ভাষায় ত্রি (tre), স্পেনীয় ওলাটিন ত্রিস (tres) আবার সংস্কৃত কোণ শব্দের প্রতিবাক্য ফরাসীভাষায় কোণা (cona), ইটালীয় কোণো (cono), স্পেনীয় কোণো (cono), লাটিন কোনস্ (cones)। অতএব উল্লিখিত সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া সংস্কৃত কোণ ও ত্রি শব্দকে গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইলে উক্ত শব্দদ্বয়কে ফরাসী, জর্ম্মান, সাক্সন প্রভৃতি ভাষার অন্যতম হইতে গৃহীত ইহাও অনায়াসেই বলিতে পারা যায়। উপরি উল্লিখিত ও অন্যান্য অনেক শব্দের বিষয়ে ও ত্রিকোণ শব্দের ন্যায় যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ফলকথা, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সমান পারিভাষিক শব্দ গুলির মধ্যে একটী ও অন্য কোনটী হইতেই গৃহীত নহে, সমুদয়ই একটী সাধারণ মূল হইতে গৃহীত। আধুনিক শাব্দিকগণের গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে আর্য্যভাষাই সংস্কৃত ও যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষার জননীস্বরূপ। সকল ভাষাই ঐ প্রাচীনতম ভাষায় সন্তানসন্ততিস্বরূপ। সুতরাং এক মাতার সন্তানসন্ততিদিগের মধ্যে যেমন নানাবিধ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আর্য্যভাষা হইতে উৎপন্ন তাবৎ ভাষাতেই অনেক পারিভাষিক শব্দ একরূপ আছে, এতদ্ভিন্ন উহাদের পরস্পরের ব্যাকরণাদিঘটিত নানাবিধ সাদৃশ্য ও অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এইরূপ সাদৃশ্য-দর্শনে উহাদিগের একটীকে অপর কোনটী হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত অসঙ্গত। সংস্কৃতে জ্যোতিশাস্ত্রঘটিত কয়েকটী পারিভাষিক শব্দ গ্রীক্ভাষার নিতান্ত অনুরূপ, সুতরাং গ্রীক্ভাষা হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে গৃহীত বলিয়া সন্দেহ হয় বটে, কারণ তৎসমুদয়ের সংস্কৃতে কোন মূলনির্ণয় করিতে পারা যায়না। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে অবশ্যই প্রতীতি হইবে, যে যদিই উক্ত পারিভাষিক শব্দগুলি গ্রীকভাষা হইতেই গৃহীত হইয়া থাকে, তথাপি কখনই সাক্ষাৎসম্বন্ধে গ্রীকভাষা হইতে গৃহীত নহে; সংস্কৃত ও আরবী উভয় ভাষার মধ্যে আদান প্রদান দেখিতে পাওয়া যায়, আরবী ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হইয়াছে, আবার কয়েকটী আরবী পারিভাষিক শব্দও সংস্কৃত ভাষার জ্যোতিঃশাস্ত্রে অবিকল গৃহীত হইয়াছে দেখা যাইতেছে, যদি ঐ আরবী শব্দগুলি গ্রীক বলিয়া স্থিরনিশ্চয় হয়, তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়, যে উক্ত শব্দগুলি আরবের অধিবাসীরা গ্রীক্দিগের নিকট গ্রহণ করিয়াছিল, এবং

আরবীয়দিগের নিকট হইতেই উহা ভারতবর্ষে গৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় গ্রীসদেশ বা গ্রীসদেশের অধিবাসীদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র সংজ্ঞা নাই, আর ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে, যে সংস্কৃত যবনশব্দে আরবীয় ও অন্যান্য জাতীয়দিগকে ও বুঝাইয়া থাকে, সুতরাং যবনশব্দে যে কেবল গ্রীক্‌দিগকেই বুঝায় অন্য কোন জাতি বুঝায় না, কোন মতেই এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারেনা।

বিরুদ্ধমতাবলম্বী পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে তিন চারি জন গ্রীসদেশীয় গ্রন্থকারের রচনাবলী সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ঐ সকল অনুবাদ-গ্রন্থে মূলরচয়িতা গ্রীক্‌দিগকে যবন-শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অনুবাদ গ্রন্থগুলি এক্ষণে সমুদয় বিদ্যমান নাই। যাহাও দুই এক খানি দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দর্শনে ইহাই প্রতীতি হয় যে হিন্দুজাতীয়েরা সাক্ষাৎসম্বন্ধে গ্রীক্‌-দিগের কোন রচনাই গ্রহণ করে নাই, যাহাও গৃহীত হইয়াছে তৎসমুদয় আরবীয় দিগের নিকট হইতে। সুতরাং যবন শব্দের অর্থে আরবীয়দিগকে বুঝান যত দূর সম্ভব, গ্রীক্‌দিগকে বুঝান ততদূর সম্ভবপর নহে।

সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রঘটিত গ্রন্থাদিতে যবনজাতি ও যবনদেশের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু কুত্রাপি এরূপ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা দ্বারা যবন দেশের প্রকৃত অবস্থানভাগ নির্ণীত হইতে পারে। জ্যোতিঃশাস্ত্রঘটিত গ্রন্থাদিতে ও এই দেশের বিষয় যাহা লিখিত আছে, তাহাতেও কোন অংশেই সন্দেহ নিরাকরণ হইতে পারে না। পরাশররচিত গ্রন্থে লিখিত আছে, যে মধ্যদেশের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যবনদেশ অবস্থিত। যদি এই মধ্যদেশ বলিতে মথুরা বুঝিতে হইবে এরূপ ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে বেলুচিস্তানের মধ্যে কোন প্রদেশে যবনদেশের অন্বেষণ করিতে হয়, কিন্তু বরাহমিহিরের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, যে লঙ্কার যাম্যোত্তরবৃত্তের ৬০ অংশ পশ্চিমে যবনদেশ অবস্থিত আছে। এইরূপ গণনানুসারে যবনদেশের অনুসন্ধানার্থ লিবিয়ার মরুভূমি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে হয়। লঙ্কাদ্বীপের যাম্যোত্তরবৃত্তের ৯০ অংশ পশ্চিমে রোমনগর অবস্থিত ইহা ডাক্তার করণ স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অনুসারে গণনা করিতে হইলে যাম্যোত্তর বৃত্তের দূরত্ব অর্থাৎ ৬০ অংশের অংশ উত্তরে উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত সেকেন্দ্রা নগরীই প্রাচীন যবনপুর নগরের অবস্থান-ভূমি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ডাক্তার করণ অন্য এক স্থলে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে দ্রাঘিমা লইয়া গণনা করিতে হইলে ইস্তাম্বল অর্থাৎ কনষ্টাণ্টিনোপল নগরও যবনপুরের অবস্থানভূমি হইতে পারে। কিন্তু মেলিন্দাপানা নামক এক খানি সিংহলদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট আছে, যে যবনরাজ মিলিন্দর আলাসাদা

অর্থাৎ আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরে, জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, কশ্মীর প্রদেশের ২৪০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত সাগল নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। এই সাগল নগর হইতে সেকেন্দ্রা নগরী প্রায় দুই শত যোজন অর্থাৎ চারি শত ক্রোশ অন্তর। সুতরাং ইহাদ্বারা যবনপুর নগর পারস্যের পূর্ব্বে, কোন স্থানে অবস্থিত ছিল ইহাও অনুমিত হইতে পারে। সে যাহা হউক যবনপুর শব্দে সেকেন্দ্রা, ইস্তাম্বল বা পারস্যদেশের অন্তর্গত কোন নগর এই তিনের যেটাই হউক না কেন, উহা দ্বারা গ্রীস বুঝিবার পক্ষে কিছুমাত্র অনুকূল তর্ক নাই, অতএব সংস্কৃত যবনশব্দে গ্রীসদেশের অধিবাসীদিগকে না বুঝাইয়া বরং মিসর আরব বা পারস্যের অধিবাসীদিগকে বুঝাইতে পারে।

বিরুদ্ধমতাবলম্বী মহোদয়দিগের চতুর্থ যুক্তির বিষয়ে আমাদের অতি অল্পমাত্র বক্তব্য আছে। সিন্ধুতীর-বাসী হিন্দুরা ও শতসহস্রক্রোশদূরবর্ত্তী গ্রীসের অধিবাসীরা এক পিতা মাতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ইহাঁদিগের মধ্যে ভাষা, আচার ব্যব-হার প্রভৃতি নানা বিষয়ে পরস্পর সৌ-সাদৃশ্য থাকিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? ইহার উপর আবার আলেক্‌জাণ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণের সময় হইতে বা-ণিজ্যাদিসূত্রে উহাদিগের পরস্পর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইহা দ্বারা এই পর্য্যন্ত অনুমিত হইতে পারে যে সংস্কৃত ভাষায় গ্রীস দেশ ও গ্রীক জাতির বিশেষ সংজ্ঞা থাকা উচিত, কিন্তু যবনশব্দ উক্ত আবশ্যক সংজ্ঞা নহে তাহা যথো-চিতরূপে সপ্রমাণ করা হইয়াছে। অত-এব এ বিষয় লইয়া আর অধিক বাদানু-বাদের প্রয়োজন দেখিতেছি না।

আমরা উপরে যে সকল বিষয় অব-লম্বন পূর্ব্বক বিচার করিলাম, তৎসমুদয়দ্বারা সংস্কৃত যবনশব্দের তাৎপর্য্যবিষয়ে এই সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে ঃ—

১। সর্ব্বাগ্রে কাণ্ডাহারের পশ্চিমস্থ কোন প্রদেশ ও তাহার অধিবাসীদিগকে বুঝাইতে সংস্কৃত যবনশব্দ ব্যবহৃত হইত। ঐ দেশটী আরব, পারস্য, মীডিয়া, বা আসীরিয়ার অন্যতম হইবার সম্ভাবনা।

২। তৎপরে উপরি উক্ত সমুদয় প্র-দেশ ও ইহার অধিবাসিগণ যবনশব্দের প্রতিপাদ্য হইয়া উঠে।

৩। পরে সিন্ধুনদীর পশ্চিমস্থ যাবতীয় প্রদেশের জাতিহীন অধিবাসীরা যবন-শব্দে অভিহিত হয়। অর্থাৎ আরবীয়, আসিরিক গ্রীক, ও মিসরদেশের অধি-বাসীরা সকলেই যবনশব্দে অভিহিত হইতে থাকে।

৪। আফগানিস্তানে হিন্দু-গ্রীক রাজ-গণ ও কালক্রমে উক্তশব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়েন।

৫। ফলে যবনশব্দে কোনকালে যে কেবল গ্রীকদিগকে বুঝাইত অন্য কোন জাতিকেই বুঝাইত না এরূপ প্রমাণ করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। অতএব

সংস্কৃত যবনশব্দের কি প্রকৃত তাৎপর্য্য ছিল এক্ষণে তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

এত দীর্ঘ বিচার ও আড়ম্বরের পর এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়াতে পাঠকগণ বিরক্ত হইতে পারেন বটে, কিন্তু এরূপ কঠিন বিষয় অবলম্বন করিয়া অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা নিতান্ত দুরূহ। ভ্রান্তিসঙ্কুল সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া অপেক্ষা জ্ঞানাভাবস্বীকার, বা সন্দেহ দোলায়িতচিত্তবৃত্তি থাকা আমাদের মতে অনেক প্রশস্ত। এক্ষণে শাস্ত্রীয় গবেষণা দ্বারা কেহই ইহা অপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিবেন না। তবে শাস্ত্রীয় গবেষণা ক্রমাগত চলিতে থাকিলে নব নব রহস্যের উন্মেষ হইবার সম্ভাবনা। এবং কালক্রমে এই সকল মূল অবলম্বন করিয়া অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারা যাইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

শত্রু সিংহ।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অনুপমার কি হইল?

পরিচারিকারা অনুপমাকে কমলার ঘর হইতে অন্য ঘরে রাখিয়া আসিয়াছে। মূর্চ্ছাপনোদনের পর অনুপমার চৈতন্যের উদ্রেক হইয়াছে। কিন্তু আত্মজ্ঞান এখনও মনোমধ্যে সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইতে পারে নাই। অনুপমার মনের অবস্থা এখন একরূপ স্বতন্ত্রপ্রকার। মূর্চ্ছাকালে চৈতন্যের লোপ হইয়াছিল, ইন্দ্রিয়সকল জড়, নির্জীব মৃতপ্রায় হইয়াছিল, এখন সে ভাব নাই। চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সকলও জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে। অনুপমা এখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু কি দেখিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না, শ্রবণে শব্দের অনুভব হইতেছে, কিন্তু কি শব্দ কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না, অঙ্গে স্পর্শের অনুভব হইতেছে, কিন্তু তাঁহার অঙ্গ কোন্ বস্তু স্পর্শ করিতেছে তাহা তিনি জানিতে পারিতেছেন না। এখন অনুভূতিজ্ঞান তাঁহার চিত্তে বর্ত্তমান আছে, অন্য জ্ঞান তিরোহিত—স্তম্ভিত।

ক্রমে এ ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। চিত্তে স্মৃতির কার্য্য আরম্ভ হইল। অনুপমার মনে হইল—অস্পষ্টরূপে মনে হইল—তিনি কোথায় আছেন। অমনি মনে হইল তিনি কোথায় ছিলেন।

মনে হইল-তিনি এখন কি করিতেছেন—কি করিতেছিলেন। মনে হইল তিনি কমলা দেবীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা ছিলেন। অমনি মনে হইল কমলাদেবী তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন। এখন মনের স্বাভাবিক ভাব উপস্থিত। কমলাকে মনে হইবার পরই তাঁর আগা গোড়া সমস্ত মনে হইল। কমলার কাছে তিনি যাহা শপথ করিয়াছেন তাহা মনে হইল :—তাঁহার হৃদয় আবার অন্ধকারময়; তিনি আবার চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন। এ ভাব রহিল না, থাকিলে অনুপমার পক্ষে মঙ্গল ছিল। হয়ত এই গুরু বিপ্লব সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইত, নয়ত তাঁহার মনের এই বিকৃত ভাব স্থায়ী হইয়া যাইত। তিনি ক্ষিপ্ত হইতেন। দুইয়ের যাহা হয় এক হইলেই তাঁহার পক্ষে ভাল ছিল। ক্ষিপ্ত হইলে অনুপমার এই মঙ্গল হইত, তিনি আপনার অবস্থা প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারিতেন না। পরে তাঁহার কি হইবে, এই ভাবিয়া তাঁহাকে জীবন্তে অনুক্ষণ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। অনুপমা পাগল হইলে সুখী হইতেন। পাগল হইলে মহাবল সিংহের গ্রাস হইতে এড়াইতে পারিতেন, ইহাই অনুপমার পক্ষে পরম মঙ্গল হইত। অনুপমার সে সুখ কপালে নাই।" অনুপমা পাগল হইলেন না। আপনার অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে কমলার অবস্থাও অনুপমার স্মৃতিতে আসিতে লাগিল। অনুপমার মনে হইল, কমলাকে তিনি কিরূপ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। কমলার মৃত্যুশয্যা তাঁহার মনের নয়নে উদিত হইল। মহাবলপুরের রাজলক্ষ্মী মৃতুশয্যায় শয়ান আছেন তিনি, স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। স্নেহময়ী জননী কমলাদেবী যখন ইহলোক পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন, অনুপমা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলেন, অনুপমার হৃদয় বিগলিত হইল, আত্মচিন্তা আবার তাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করিল। তিনি পরচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কমলাকে দেখিতে তাঁহার নিরতিশয় কামনা হইল। উঠিয়া বসিলেন, শরীর অতিশয় ক্ষীণ, যেন কত দিন গুরুতর রোগ ভোগ করিতেছেন, রোগেরই বা কশুর কি? অনুপমার মনের রোগ। কমলার উদ্দেশে যাইতে চেষ্টা করিলেন, সমীপস্থা পরিচারিকা নিবারণ করিল।

অনুপমা এতক্ষণ পরিচারিকাকে দেখিতে পান নাই। কেই বা দেখিবে? পরিচারিকার নিবারণে অতিশয় বিরক্ত হইলেন, কিন্তু নিবারণ শুনিতে হইল। উত্থানে নিরস্ত হইলেন। দাসীকে কমলার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, দাসী নিরুত্তর। অনুপমা প্রথম কিছুই বুঝিলেন না। পরক্ষণেই সন্দেহ হইল। দাসী কিছু নাই বলুক, তার মুখের ভাব দেখিয়াই অনুপমার মনে সন্দেহ হইল, সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল। তিনি দাসীকে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

নির্জ্জীব জড়ের ন্যায় মৌনভাবে রহিলেন। বুঝিতে পারিলেন তাঁহার দশা কি হইয়াছে। তিনি প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন তাঁহার দশা কি হইবে। প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন স্নেহময়ী কমলা ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন। কমলা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনুপমারও শেষ হইয়া আসিয়াছে। অনুপমা হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। কি করিতে হইবে, কি করিলে ভাল হয় সে সব চিন্তা তাঁহার মন হইতে কোথায় পলায়ন করিয়াছে। তিনি জীবিত আছেন মাত্র। মনের ভিতর এত বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে যে তাঁহার মনের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। কোন বিষয়ই মনে নাই। মনের ভিতর কেবল শূন্য; কেবল অন্ধকার।

প্রথম দিন এইরূপেই অতিবাহিত হইল। কিরূপে কমলার সময় অতিবাহিত হইল তার বড় হুস রহিল না। দ্বিতীয় দিনে, মন ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইল। কিন্তু মনের জ্বালা বাড়িতে লাগিল। তৃতীয় দিনে মন প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়াইল। তৃতীয় দিনে অনুপমার আত্মচিন্তা বলবতী হইল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার দশা কি হইবে। একাকিনী, অসহায়া! একটী কথা জিজ্ঞাসা করেন এমন কেহই নাই। যিনি ছিলেন তিনি গিয়াছেন। যাঁহারা আছেন তাঁহারা কোথায় তার ঠিক নাই। বীরসিংহের খপর জানিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু বীরসিংহ কোথায়? কেইবা বীরসিংহের কাছে গিয়া তাঁহার কথা বলে? অনুপমা অনেক ভাবিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। বীরসিংহ এমন বিপদের সময় কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিলেন? কমলাদেবীর পরলোক হইল বীরসিংহ কোথায় রহিলেন? মনে করিলেন কাহাকে জিজ্ঞাসা করেন। সাহস হইল না। অনেক দিন শত্রুমণ্ডলীর মধ্যে বাস করিয়া অনুপমার অভিজ্ঞতার অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। মনের ইচ্ছা মনেই রাখিলেন। অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দুই-চারি দিবস এইরূপে অতিবাহিত হইল।

অনুপমার মন ক্রমে একটু স্থির হইল, মানসিক বৃত্তিসমূহ নিতান্ত অন্ধকারাবচ্ছিন্ন ছিল, তাহাদের এখন প্রকাশ হইল। শোক, দুঃখ, ভয়, পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার হৃদয় হতাশতাময় হইয়া উঠিল। কাজেই মনের ভাব স্থির হইল। অনুপমা নিশ্চিন্ত হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। সময় কাটাইতে আর তাঁহার ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল না। প্রফুল্লতা না হউক চিত্তের স্থিরতা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। অনুপমার এখন আর কোন বিষয়েই চিন্তা নাই। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তাঁহার কাছে সকলই সমান। সংসারের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি জীবিত থাকিয়াও সংসারের কেহ নহেন। সংসারের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র মায়া নাই। আশা

হৃদয় হইতে ক্রমে ক্রমে দূরে গমন করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে সকল চিন্তাই দূরে যাইতে লাগিল। দিনপাত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বীরসিংহের কথাও ভুলিতে লাগিলেন, প্রতাপসিংহের কথা মনে আনিতে সাহসই করিতে পারিতেন না। বীরসিংহের কথা কি রূপে ভুলিলেন? অনুপমা আপনাকে আপনিই ভুলিয়াছেন। তিনি সময়ে সময়ে নিজের অস্তিত্ব বাস্তবিক বিস্মৃত হইয়া যাইতে লাগিলেন। অনুপমার হৃদয় এখন একেবারেই শূন্য। এরূপ শূন্যহৃদয়ে কত দিন থাকিতে পারিবেন, অনুমান করা দুঃসাধ্য!

অনুপমা এক দিন শয্যায় অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় রহিয়াছেন, এক একবার পূর্ব্বচিন্তা মনে উদয় হইতেছে। প্রতাপসিংহের কথা মনে হইতেছে; জীবনের সুখকালের কথা মনে হইতেছে, চক্ষু দিয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ হইতেছে। আবার হতাশা আসিয়া সেই অশ্রু তিরোহিত করিতেছে। মুখের শোকসংক্ষোভিত ভাবকে পুনর্ব্বার স্তিমিত করিতেছে। বীরসিংহের কথা মনে হইতেছে, বীরসিংহের অনিষ্টাশঙ্কা আসিয়া মুখ ম্লান করিতেছে, হৃদয় বিচলিত করিতেছে। মস্তক চঞ্চল করিতেছে কিন্তু হতাশা আসিয়া আবার সে ভাব দূর করিতেছে, বলিয়া দিতেছে "তুমি এ সংসারের কে, যে পরের জন্যে ভাবিতেছ। সংসারের সহিত তোমার কোন সংস্রব নাই। তোমার জীবন নামমাত্র; সুখ, দুঃখ তোমার পক্ষে সকলই সমান। তোমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলেই মঙ্গল।" অনুপমা যেন ক্ষণে ক্ষণে চকিত হইয়া উঠিতেছেন। প্রাণপণে হৃদয়কে স্থির করিয়া রাখিতেছেন, তথাপি প্রবঞ্চক দীর্ঘ নিশ্বাস মধ্যে মধ্যে তাঁহার হৃদয়কে বঞ্চিত করিতেছে।

বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল অলক্ষিত ভাবে চক্ষু হইতে গণ্ডদেশে বহিয়া শয্যায় পতিত হইতেছে। অনুপমা মধ্যে মধ্যে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, দেখিতেছেন ঘর নির্জ্জন কি না। নির্জ্জন নিস্তব্ধ! সে দিকে জন মানবের সমাগম নাই। অনুপমা নিশ্চিন্ত হইলেন। কাহারও মুখ দেখিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। যাহাদের প্রফুল্ল মুখ কোমল হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে সেই সকল বস্তু যখন দেখিতে পাইতেছেন, তখন আর তিনি কাহার মুখ দেখিবেন? মনে মনে স্থির করিয়াছেন মনুষ্যের মুখ আর দেখিবেন না। সকলের উপর তাঁহার ঘৃণা হইয়াছে, রাজপুরীর সকল লোকই তাঁহার চক্ষে কালসর্প। সকলেই মহাবল সিংহের অনুচর, সকলেই মহাবল সিংহের ন্যায় পামর। এই পাপ সংসারে যিনি পবিত্রহৃদয়া ছিলেন সে দেবীও তিরোহিতা। তবে অনুপমা নির্জ্জনে না থাকিয়া আর কি করিবেন? এখন অনুপমার মন অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া এক চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছে। মরণ কালে কমলাদেবী যে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছেন, যে দুশ্ছেদ্য গুরুতর শপথে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই

তাঁহার মনের এক মাত্র চিন্তা। অনুপমার মনে কুসংস্কার আছে। উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোক তাঁহার মনে প্রবেশ করে নাই। প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে।

কমলা মরণকালে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করিলে ভয়ানক পাপ, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করিলে স্বর্গীয়া কমলাদেবীর আত্মা আসিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিবেন, দিবারাত্রি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিবেন। বলিবেন, "কৃতঘ্নে! পামরে! পাপীয়সি! এই কি তোর ধর্ম্ম? এই তোর সত্যরক্ষা! এই তোর কৃতজ্ঞতা?" অনুপমা এরূপ তিরস্কার কিরূপে সহ্য করিবেন? তাঁহার হৃদয়ের শান্তি ত লুপ্ত হইয়াছে; স্বর্গীয়া দেবীর স্বর্গীয় হৃদয়ের শান্তিসুখ কিরূপে নষ্ট করিবেন? অনুপমা ভাবিয়া অস্থির।

মহাবল সিংহকে বিবাহ না করিলে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না! উ! কি ভয়ানক কথা! মনে হইলেই অনুপমার সংজ্ঞা লোপ হয়। তিনি একবারে উন্মত্ত হন, এ কথা মনে করিয়া কিরূপে স্থির থাকিবেন? অনুপমা আর ভাবিতে পারেন না। তাঁহার চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই, মন একেবারে বিকৃত হইবার যো হইয়াছে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করেন এমন লোকটী নাই। এ বিপদে পরামর্শ দেয় এমন সুহৃৎ কেহ নাই। অনুপমা তাহাই ভাবিতেছেন, বীরসিংহের কি হইল তাহাই ভাবিতেছেন, বীরসিংহের কি হইল এ সংবাদ তাঁহাকে কে আনিয়া দেয় তাহাই ভাবিতেছেন, এই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া তিনি শয্যায় অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন। এমন সময়ে তাঁহার ঘরে কে প্রবেশ করিল, অনুপমা সহসা উঠিয়া বসিলেন, মুখের ভাবান্তর হইল, মনের ভাবান্তর হইল। হৃদয়ে ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে, স্পষ্টই অনুভূত হইল। সে ভয় তিরোহিত হইয়া হৃদয় আবার স্থির হইল, ভয় সাহসের নিকট পরাজিত হইল। অনুপমার মুখ স্থিরভাব ধারণ করিল। কাহাকে দেখিয়া অনুপমার এত ভয় ও তাঁহার মনের এরূপ অবস্থা? ঘরে এ সময়ে কে প্রবেশ করিল? পাঠক! পরে জানিতে পারিবে।

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউএর সহিত সংশ্রব পরিত্যাগের পর মিলের লেখনী কিছুদিনের জন্য বিশ্রান্ত হইল। এই বিশ্রামে তাঁহার চিন্তাসকল অতিশয় পরিপক্ক ও পরিণত হইয়া উঠে। এই বিশ্রাম না পাইলে তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল

এতদূর তেজস্বিনী হইত কি না সন্দেহ। এই অবসরকালে তাঁহার চিন্তাসকল বাহ্য জগৎ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বকীয় অন্তর্জগতের গূঢ় গণনায় নিমগ্ন হইল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে যখন মিল্ বেন্থামের গ্রন্থসকল পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, বিশেষতঃ যৎকালে ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সময় হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে মিলের জীবন লক্ষ্য-বিশিষ্ট হয়। এতদিন ইহা সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য-শূন্য ছিল। এখন হইতে জগতের মঙ্গল সাধন করা, জগতের কুসংস্কার অপনীত করা, তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। তাঁহার সুখ, তাঁহার সন্তোষ এই লক্ষ্যের সহিত গ্রথিত হইয়া গেল। যাঁহারা এই ব্রতে ব্রতী, এই ব্রতের অনুষ্ঠান বিষয়ে তিনি তাঁহাদিগেরই সহানুভূতির প্রার্থী হইলেন। তিনি এখন হইতে এই ব্রতের অনুষ্ঠানোপযোগি উপকরণসকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। একদিন অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়াকাশে এক খান চিন্তামেঘ সমুদিত হইয়া তাঁহার সুখ-সূর্য্য আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তাঁহার মনে সহসা এই প্রশ্ন উত্থিত হইল, "মনে কর তোমার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল; তুমি যে সকল সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের জন্য এতদূর যত্ন করিতেছ, সে সমস্ত এই মুহূর্ত্তেই সংসাধিত হইল; ইহাতে কি তোমার অপরিসীম আনন্দ ও সুখের উৎপত্তি হইবে?" সহসা অনিবার্য্য আত্মজ্ঞান উত্তর করিল "না!" এই উত্তরে তাঁহার হৃদয় অন্তরে বিলীন হইল। যে ভিত্তির উপর তাঁহার জীবনগৃহ নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহা সহসা ভূতলশায়িনী হইল। তিনি দেখিলেন যে যাহা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য,—তাহার অনুসরণেই সুখ, তাহার প্রাপ্তিতে সুখের অবসান। যাহার প্রাপ্তিতে সুখের অবসান, তাহার অনুসরণে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং মিলেরও জীবনের লক্ষ্য সংসাধনে প্রবৃত্তি রহিল না। কিছুদিনের জন্য তাঁহার জীবনতরি কর্ণধার-শূন্য হইল। মিল্ ভাবিলেন এই চিন্তামেঘ তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে শীঘ্রই অপসৃত হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। শান্তিদায়িনী নিদ্রা তাঁহার হৃদয়ে ক্ষণিক মাত্র শান্তি প্রদান করিল। তিনি জাগরিত হইলেন। হতাশা তাঁহার হৃদয়কে পূর্ব্ববৎ জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। তিনি যে কার্য্যে, যে সভায় গমন করিতেন, গভীর হতাশ ভাব তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইত। জগতের অসংখ্য প্রলোভনপরম্পরাও তাঁহার অন্তর্নিগূহিত গভীর বেদনাকে বিস্মৃতিজলে ভাসাইতে পারিল না। এই মেঘ ক্রমেই গাঢ়তর হইতে লাগিল। তিনি পুস্তকরাশিতে চিত্তের বিনোদনোপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুস্তক পাঠে তাঁহার মনে আর পূর্ব্বের ন্যায় ভাবোদয় হইল না। বোধ হইল যেন তাঁহার মানব-

প্রেম ও উৎকর্ষপ্রিয়তা একবারে পর্য্যবসিত হইল। তিনি নিজের গভীর বেদনা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে ভাল বাসিতেন না। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার এই যন্ত্রণার বিশেষ কারণ নাই। সুতরাং নিষ্কারণ যন্ত্রণা কাহারও সহানুভূতি উদ্ভূত করিতে পারে না। এ অবস্থায় সদুপদেশ অতিশয় প্রার্থনীয়; কিন্তু কাহার নিকট যাইলে সেই সদুপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, তিনি তাহা জানিতেন না। কোন সাধারণ বিপদ্ পড়িলে, তিনি পিতার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু এরূপ অসাধারণ কাল্পনিক বিপদুৎপাতে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা নিতান্ত হাস্যকর। তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহার হৃদয়ে যে গভীর চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, পিতা তদ্বিষয়ে কিছুই অবগত নন। কিন্তু তিনি জানিতেন, পিতা অবগত হইলেও তাঁহা দ্বারা এ রোগের প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে পিতৃ-পরিশ্রমের ফল। পিতা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে সে শিক্ষার পরিণাম এরূপ বিষময় হইবে। মিল্ এই সংবাদ দিয়া পিতার হৃদয়ে যাতনা দিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি জানিতেন যে তাঁহার রোগ এক প্রকার অচিকিৎস্য অথবা পিতৃ-চিকিৎসাতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না, যাঁহার নিকট তিনি হৃদয়ের যাতনা ব্যক্ত করিলে সহানুভূতি পাইতে পারিতেন। সুতরাং এ বিষয়ে তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই হতাশা বলবতী হইতে লাগিল।

মিল্ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যে সৎ ও অসৎ উভয়প্রকার নৈতিক ও মানসিক ভাবই আমাদের সংস্কারের (Association) ফল; আমাদের যে, কোন বিষয়ে প্রীতি এবং কোন বিষয়ে ঘৃণা জন্মে, আমরা যে, কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান ও চিন্তনে সুখ এবং কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান ও চিন্তনে দুঃখ অনুভব করি, তাহার কারণ এই যে আমাদের শিক্ষা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছে যে এই এই কার্য্য করিলে আমরা সুখী এবং এই এই কার্য্য করিলে আমরা অসুখী হইব। সুতরাং আমরা শিক্ষাবলে বাল্য হইতেই কতকগুলি কার্যের সহিত সুখ এবং কতকগুলি কার্যের সহিত দুঃখ সংশ্লিষ্ট করিয়া ফেলি। বস্তু ও কার্যের সহিত সুখ ও দুঃখের এরূপ শিক্ষা-জনিত অনিচ্ছাকৃত সংশ্লেষণের নামই সংস্কার। জেম্‌স মিল্ সর্ব্বদা বলিতেন যে, যে বস্তু ও কার্য্য দ্বারা জগতের অসংখ্য লোকের মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে, তাহার সহিত সুখ, এবং যে বস্তু ও কার্য্য দ্বারা জগতের অসংখ্য লোকের অনিষ্ট সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা তাহার সহিত দুঃখের, সংস্কার দৃঢ়সম্বদ্ধ করাই শিক্ষার প্রধান কার্য্য। মিল্ পিতার এই মতের সম্পূর্ণ পরিপোষণ করিতেন। কিন্তু জেম্‌স—প্রশংসা ও

নিন্দা এবং পুরস্কার ও শাস্তিরূপ যে পূর্ব্ব-পরম্পরাগত উপায় দ্বারা এই সংস্কার বদ্ধমূল করিবার মত প্রকাশ করিয়াছেন, মিল্ সে মতের সম্পূর্ণরূপে পরিপোষকতা করেন নাই। তিনি বলিতেন যে এইরূপ বলপূর্ব্বক কোন সংস্কার জন্মাইলে তাহা চিরস্থায়ী হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্থায়িত্বের উপর কখন নির্ভর করিতে পারা যায় না। সুতরাং এই সংস্কার চিরস্থায়ী করিতে হইলে সুখ ও দুঃখের সহিত বস্তু ও কার্য্যের যে নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ সম্বন্ধ সেইটীই যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া উচিত; বিশ্লেষণ শক্তি (Power of Analysis) এই নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ সম্বন্ধের প্রধান আবিষ্কারক; সুতরাং মনুষ্যের কল্পনা ও হৃদয়ভাব বস্তু ও কার্য্যের সহিত সুখ ও দুঃখের যে অস্বাভাবিক ও অনিত্য সম্বন্ধ সংঘটিত করে, বিশ্লেষণ শক্তি তাহার মূলে কুঠারাঘাত করে। মিলের এই বিশ্লেষণশক্তি অতিশয় বলবতী হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার যেমন ইষ্ট তেমনি অনিষ্টও সংঘটিত হইয়াছিল। মনুষ্যের অধিকাংশ সুখ ও দুঃখ কল্পনা-বিজৃম্ভিত। মনুষ্যের কার্য্য ও দ্রব্যজাতের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ সুখ ও দুঃখের পরিমাণ অল্প। জগতে অনিত্য অস্বভাবিক ও কল্পনাবিজৃম্ভিত সুখ ও দুখের পরিমাণই অধিক। মনুষ্যের জীবনকে এই শেষোক্তপ্রকার সুখ ও দুঃখের সহিত বিয়োজিত কর, ইহা জীর্ণ অরণ্য ও জল-বৃক্ষাদিশূন্য মরুভূমিবৎ প্রতীয়মান হইবে। মিলের হৃদয় এই বিশ্লেষণশক্তিবলে নীরস ও শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। দয়া, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি যে সকল কোমল গ্রন্থি পরস্পরের হৃদয়কে পরস্পরের সহিত গ্রথিত করে, তাঁহার বিশ্লেষণশক্তি সে সকল গ্রন্থির ছেদ সাধন করিয়াছিল। তিনি জানিতে পারিলেন যে হৃদয়ের এই কোমলতর বৃত্তিসকল বলবতী থাকিলে তিনি অধিকতর সুখী হইতে পারিতেন। কিন্তু এই জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে সেই কোমলতর বৃত্তিসকলের অবতরণা করিতে পারিল না। দয়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি কোমলতর বৃত্তি সকল তদীয় বিশ্লেষণশক্তির উজ্জ্বল কিরণে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দয়া স্নেহ প্রভৃতির সহিত মিলের আত্মাভিমান ও গৌরবপ্রিয়তাও বিলীন হইল। তাঁহার কার্য্যের উত্তেজক আর কিছুই রহিল না। এইরূপে তিনি আত্মবিষয়ক ও পরবিষয়ক উভয়প্রকার সুখেই বঞ্চিত হইলেন। ইচ্ছা করিলেন জীবন নূতন ভাবে পুনরারম্ভ করেন কিন্তু তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

১৮২৬।৭ খৃষ্টাব্দে যখন এই সকল গভীর চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতেছিল, তখনও তিনি আপনার নিত্য দৈনিক পাঠনায় বিরত হন নাই। পাঠনা তাঁহার এরূপ অভ্যাসগত হইয়াছিল যে ইহার নিত্য অনুষ্ঠান হইতে বিরত হওয়া তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইত। তিনি এরূপ মানসিক অবস্থাতেও তাঁহা-

দিগের তর্কসভার জন্য কয়েকটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা রচনা করেন। কিন্তু যেমন কোন সচ্ছিদ্র পাত্রে অমৃতবর্ষণ করিলে তাহা অবিলম্বেই অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেইরূপ আশা ব্যতীত, লক্ষ্য ব্যতীত, মনের স্ফূর্ত্তি ব্যতীত, মিলের কার্য্য-প্রবণতা ক্রমেই নিষ্প্রভ হইতে লাগিল। জীবন তাঁহার নিকট দিন দিন ভারবোধ হইতে লাগিল। একদিন তাঁহার মনে এই প্রশ্ন সমুদিত হইল "যখন জীবন এরূপ দুর্ভর বোধ হইতে লাগিল তখন আর আমি ইহা কত কাল বহন করিতে পারিব?" তাঁহার মন হইতেই আবার এই উত্তর বহির্গত হইল "তুমি এই দুর্ভর জীবন এক বৎসরের অধিককাল বহন করিতে পারিবে কি না সন্দেহ।" কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এক বৎসর কাল অতীত না হইতেই আশা-সূর্য্যের একটী সূক্ষ্ম রশ্মি তাঁহার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে কিঞ্চিৎ আলোকিত করিল। এক দিন তিনি মার্ম্মনটেলের জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে গ্রন্থের যে স্থানে—বাল্যাবস্থায় মার্ম্মনটেলের পিতৃবিয়োগ, এবং পিতৃবিয়োগে জননী ও ভ্রাতৃভগিনীগণের বিলাপ শ্রবণ ও দুরবস্থা দর্শনে মার্ম্মনটেলের হৃদয়ের বিগলিত ভাব ও তৎকর্ত্তৃক পরিবারবর্গের সান্ত্বনা—এই সকল ঘটনা লিখিত ছিল সেই স্থানে সহসা উপনীত হইলেন। বিযুক্ত পরিবারের তাৎকালিক হৃদয়ভাব ও শোচনীয় দৃশ্য মিলের অন্তরে পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত হইল। অনুভূতি-সমুদ্ভূত অশ্রুধারা প্রবলবেগে তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল। এই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার হৃদয়ের দুঃখভার কিঞ্চিৎ উপশমিত হইল। তাঁহার হৃদয় শুষ্ক ও ভাবশূন্য বলিয়া তাঁহার মনে যে যাতনা হইতেছিল, এক্ষণে তাহা অন্তর্হিত হইল। হতাশা তাঁহার হৃদয়কে আর নিপীড়িত করিতে পারিল না। এখন হইতে তিনি আর আপনাকে পাষাণবৎ মনে করিলেন না। তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে তাঁহার অন্তরে এমন পদার্থ এখনও বিদ্যমান আছে যাহাতে তিনি সুখী হইতে পারেন। তাঁহার যাতনা অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য নহে—যে মুহূর্ত্তে তাঁহার অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই জীবনের সামান্য ঘটনাতেও তিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুখ পাইতে লাগিলেন। সূর্য্য-কিরণ, গগনমণ্ডল, গ্রন্থরাশি, কথোপকথন প্রভৃতি সাধারণ বস্তু ও কার্য্যও তাঁহার প্রফুল্লতার কারণ হইতে লাগিল। আত্মমতের সমর্থন ও সাধারণ হিতের অনুষ্ঠানের জন্য তিনি পুনরায় উত্তেজিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্তর হইতে মেঘ তিরোহিত হইল এবং জীবন তাঁহার নিকট পুনরায় সজীব বোধ হইতে লাগিল। যদিও ইহার পর আরও কয়েকবার তাঁহার অন্তর এই চিন্তামেঘে আচ্ছন্ন হয়, তথাপি তিনি এই সময়ের ন্যায় জীবনের আর কোন ভাগে এরূপ গুরুতরদুঃখভার-প্রপীড়িত হন নাই।

এই সকল ঘটনায় মিলের মতে দুইটী

পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ জীবন সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বে এই মত ছিল যে আত্মসুখই মানবজীবনের সমস্ত কার্য্যের নোদক ও এক মাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এক্ষণে এই মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। তাঁহার বর্ত্তমান মতে আত্মসুখ—কার্য্যের অব্যবহিত লক্ষ্য নহে; যাহারা আত্মসুখকে কার্য্যের অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করে তাহারা কখনই সুখী হইতে পারে না। যাহারা পরের সুখ ও উন্নতি আত্মকার্য্যের অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করে তাহারাই প্রকৃত সুখী। আত্মসুখের অন্বেষণে আজীবন পরিভ্রমণ কর, কখনই সুখ পাইবে না; পরের দুঃখ বিমোচনে, পরের সুখ বর্দ্ধনে ও বিজ্ঞানাদির আলোচনায় সতত নিরত থাক, সুখ আপনা হইতেই আসিবে। কখন আত্মসুখের জন্য ব্যগ্র হইও না, কখন অন্তরে আত্মসুখের অস্তিত্বের অনুসন্ধান করিও না; কারণ সুখ—ব্যগ্রতা ও অনুসন্ধিৎসা সহিতে পারে না। এই নূতন মত, এখন হইতে মিলের জীবনবিজ্ঞানের মূলভিত্তিস্বরূপ হইল। মিলের মত বিষয়ে যে দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহা এই,—এতদিন তিনি বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মরণশক্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ্জনকেই শিক্ষার প্রধান ও একমাত্র অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন; দয়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ্জনার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। এখন হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে শিক্ষার সম্পূর্ণতা বিধানে উভয়প্রকার বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ্জনারই বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে; উভয়প্রকার বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য বিধান করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য; মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণ জন্য যেমন গণিত বিজ্ঞানাদির প্রয়োজন, সেইরূপ হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণ জন্য কবিতা নাটক নবন্যাস সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা প্রভৃতিরও প্রয়োজন। মিল্ বাল্যাবধিই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন; সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি আশৈশব তাঁহার হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। তিনি বলিতেন সঙ্গীত অন্তরে কোন নূতন ভাবের অবতারণা করেনা বটে, কিন্তু অন্তরে যে সকল উন্নত ভাব ম্লানভাবে অবস্থিত থাকে ইহা তাহাদিগকে উত্তেজিত ও পরিপুষ্ট করে। মিল্ এখন হইতে কবিতার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্ব্ব প্রথমে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও বাইরন্ পাঠ করেন। মিল্ স্বয়ং যে দুঃখপ্রবণতা (melancholia) রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, বাইরণের চাইল্ড হেরল্ড ও ম্যান্‌ফ্রেড্ও সেই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং বাইরন্ পাঠে তাঁহার দুঃখ বই সুখ পাইবার সম্ভাবনা ছিলনা। কিন্তু ওয়ার্ডস ওয়ার্থের স্বভাববর্ণনা বিশেষরূপে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করে। ওয়ার্ডস ওয়ার্থ শুদ্ধ স্বভাব বর্ণনা দ্বারাই মিলের এতদুর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন এরূপ নহে;

স্বভাবসৌন্দর্য্য দর্শনে হৃদয়ে যে সকল অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হয়, সেই সকলের চিত্রীকরণ দ্বারাই তিনি মিলের এত প্রিয় হইয়াছিলেন। ওয়ার্ডস ওয়ার্থ পাঠে তিনি সর্ব্বপ্রথমে জানিতে পারিলেন যে প্রকৃতি-পর্য্যালোচনাই অনন্ত সুখের আকর। বাইরন্ অপেক্ষা ওয়ার্ডস ওয়ার্থের উৎকর্ষ খ্যাপন করিতে গিয়া তাঁহার অনেক পুরাতন বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ব-বিচ্ছেদ ও অনেক নূতন বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ব সংঘটিত হয়। বাইরন্ ও ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের পরস্পরের কবিত্বশক্তি লইয়া তর্কসভায় তাঁহাদিগের বিশেষ বিতর্ক উপস্থিত হয়। মিলের পূর্ব্ববন্ধু রীবক্ বাইরণের, ও মিল্ ওয়ার্ডস ওয়ার্থের উৎকর্ষ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করেন। এই সময় হইতে রীবকের সহিত মিলের বিচ্ছেদ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যে সময় রীবকের সহিত মিলের বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, সেই সময় ফ্রেডারিক মরিস এবং জন্ ষ্টার্লিং নামক দুই জন পণ্ডিতের সহিত তাঁহার নব সখ্য সংস্থাপিত হয়। মরিস চিন্তাশীল ও ষ্টার্লিং বাগ্মী ছিলেন। মিল মানসিক উন্নতির জন্য কোলেরিজ এবং গেটি প্রভৃতি জার্ম্মান্ পণ্ডিতগণের নিকট যেরূপ ঋণী ছিলেন, ইহাদিগের নিকট ও সেইরূপ ঋণী ছিলেন। যদিও কোলেরিজ নীতি বিষয়ে মরিসের গুরু ছিলেন, তথাপি ধীশক্তি বিষয়ে তদপেক্ষা মরিসের উৎকর্ষ অবিসম্বাদিত। মরিসের তীক্ষ্ণ প্রতিভা এবং স্বভাব ও অভিপ্রায়ের সাধুতা নিবন্ধন তাঁহার প্রতি মিলের ভক্তি অতি গভীর ও অবিচলিত ছিল। ষ্টার্লিং বুদ্ধি ও বিদ্যায় কোলরীজ ও মরিস উভয়েরই শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় অতিশয় সরল, প্রেমময় ও প্রশস্ত ছিল। কি সামান্য কি গুরুতর সকল বিষয়েই তাঁহার সত্যপ্রিয়তা অতিশয় বলবতী ছিল। তাঁহার স্বভাব অতি উদার ও উদ্যোগশীল ছিল। তিনি যে সকল মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন, সে সকলের সমর্থন জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে ও পরাঙ্মুখ হইতেন না। যদিও তিনি স্বমতের পরিপোষণের জন্য সতত বদ্ধপরিকর ছিলেন, তথাপি তিনি বিরুদ্ধ মত বা তদবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রতি কখন অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন না। স্বাধীনতা ও কর্ত্তব্যকারিতা তাঁহার কার্য্যস্রোতের নিয়ামক ছিল। এই সকল কারণে ষ্টার্লিং অচিরকাল মধ্যেই মিলের হৃদয়াপহারক হইয়া উঠিলেন। মিল্ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে আর কাহারও সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব এত ঘনীভূত হয় নাই। যদিও মিলের সহিত ষ্টার্লিঙের সর্ব্বদা মতভেদ সংঘটিত হইত, তথাপি তাঁহাদিগের এই গভীর সখ্যভাব কখন বিচলিত হয় নাই।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের পর মিল্ তর্কসভা হইতে অপসৃত হইলেন। অনেক তর্ক বিতর্ক ও অনেক বক্তৃতার পর বিশ্রাম তাঁহার অতিশয় প্রীতিকর হইল, তিনি

কিছুদিন নির্জ্জনে পাঠনার অনুশীলন ও চিন্তাশক্তির পরিমার্জ্জনে বিশেষ সুখানুভব করিতে লাগিলেন। তিনি বাল্যান্থিত পুরাতন ও শিক্ষিত মত সকল দ্বারা যে সৌধরাজি নির্ম্মিত করেন, এই পরিবর্ত্তন কালে তাহার স্থান স্থান প্রতিদিনই জীর্ণ ও ভগ্ন হইতে লাগিল; তিনি প্রতিদিনই তাহাদিগের জীর্ণসংস্কার করিতে লাগিলেন। কখনই ইহাকে ভূতলশায়িনী হইতে দেন নাই। নূতন মতের সমাগমে তিনি কখনই হতবুদ্ধি ও ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেন না। তিনি এত পরিস্ফুটরূপে প্রাচীন ও নূতন মতের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেন, যে তাহাদিগের পরস্পরের সহিত কখন সংঘর্ষ উত্থিত হইত না।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মিল্ ন্যায়দর্শন (Logic) বিষয়ক তাঁহার মত সকল কাগজে সন্নিবেশিত করেন। এই সময়ে কোলেরীজ, গেটি, এবং কার্লাইল প্রভৃতির রাজনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার মত সকলের অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। কিন্তু সেণ্ট সাইমন ও তৎশিষ্যবর্গের রাজনীতিবিষয়ক পুস্তক সকল পাঠ করায় তাঁহার মনে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ নূতন মতের অবির্ভাব হয়। ১৮২৯ ও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই সকল গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থাবলীর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। ইঁহাদিগের রাজনীতিবিষয়ক মত সকলের এক্ষণে শৈশবাবস্থা। তাঁহারা এখনও তাঁহাদিগের রাজনৈতিক বিজ্ঞানকে ধর্ম্মপরিচ্ছদ পরিধান করান নাই। তাঁহাদিগের "সোসালিজম্" প্রণালী এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাঁহারা কেবল পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পিতৃপৈতামহিক সম্পত্তির ভোগাধিকার প্রণালীর যৌক্তিকতা বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মিল্ সেণ্টসাইমোনীয়দিগের সহিত সকল বিষয়ে ঐকমত্য অবলম্বন করিতেন না। কিন্তু ইহাঁরা মানবজাতির স্বাভাবিকী উন্নতি বিষয়ে যে পরস্পরসম্বদ্ধ ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ইতিহাসকে সজীব ও নির্জীব যে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, মিল্ সেই সকলের বিশেষ পরিপোষণ করিতেন। ইতিহাসের এই সজীব বিভাগে মনুষ্যজাতি দৃঢ় প্রতীতির সহিত কতকগুলি ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। এই সকল বিশ্বাস তাহাদিগের সকল কার্য্যের উপর প্রভুত্ব সংস্থাপন করে। এই বিশ্বাসপ্রভাবে তাহারা অনেক উন্নতিও সাধন করে। কিছুকাল পরে এই বিশ্বাসের ভ্রান্ততা বা অভ্রান্ততা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয় এবং সেই সকল তর্ক বিতর্কের সঙ্গে সেই পুরাতন বিশ্বাস তিরোহিত হয়; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কোন নূতন বিশ্বাস সংস্থাপিত হয় না। সুতরাং বিশ্বাসের অভাবে কার্য্যেরও অভাব হইয়া পড়ে। সমাজ ধর্ম্ম ও রাজনীতি প্রভৃতি কিছু-

দিনের জন্য জড়ভাব অবলম্বন করে। ইতিহাসের এই ভাগকে তাঁহারা নির্জ্জীব নামে আখ্যাত করিয়াছেন। গ্রীক ও রোমীয় অনেকেশ্বরবাদিত্ব (যতদিন সুশিক্ষিত গ্রীক ও রোমীয়গণ ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বাস করিতেন) ইতিহাসের একটী সজীব বিভাগ। ইহার পর যে সময়ে গ্রীক দার্শনিকদিগের অবিশ্বাসমূলক মত সকল প্রচারিত হয়, সেই সময়কে ইতিহাসের একটী নির্জীব বিভাগ বলা যাইতে পারে। আবার খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সহিত আর একটী সজীব বিভাগ প্রচলিত হয়। অবশেষে চিরপ্রচলিত ধর্ম্মসংস্কারের লুথার কর্ত্তৃক উচ্ছেদ এবং ফরাশি বিপ্লব দ্বারা সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন সংস্কারের উচ্ছেদ—এই ঘটনা দ্বয় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমস্ত সময়কে ইতিহাসের নির্জীব বিভাগ বলা যাইতে পারে। এই নির্জীব বিভাগ অচিরকাল মধ্যেই এক উন্নততর সজীব বিভাগ দ্বারা অপসারিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই মতগুলি যে সেণ্ট সাইমোনীয়েরাই আবিষ্কার করেন, এরূপ নহে। এসকল বহুকাল হইতে সমস্ত ইয়ুরোপে, অন্ততঃ ফ্রান্স ও জার্ম্মাণিতে, প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। সেণ্ট সাইমোনীয়েরা কেবল ইহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করেন মাত্র। এই সকল মত বিষয়ে সেণ্ট সাইমনীয়দিগের যতগুলি গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল, তন্মধ্যে অগষ্ট কম্‌ট লিখিত গ্রন্থখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই গ্রন্থের টাইটেল পেজে অগষ্ট কমট আপনাকে সেণ্ট সাইমনের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি *মনুষ্য জাতির জ্ঞানবিভাগের তিনটী* স্বাভাবিক ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে তিনটী এই, প্রথমতঃ ধর্ম্মযুগ, দ্বিতীয়তঃ তর্কযুগ, শেষতঃ প্রত্যক্ষযুগ। তিনি বলেন সমাজবিজ্ঞানও এই নিয়মের অধীন। তাঁহার মতে সামন্ততন্ত্র ও ক্যাথলিকপ্রণালী, সমাজবিজ্ঞানের ধর্ম্মযুগবিভাগের শেষ পরিণাম মাত্র। প্রোটেষ্টাণ্টিজম্ তর্কযুগবিভাগের আরম্ভ এবং ফরাসি বিপ্লবকালীন মতাবলী ইহার পরিণাম মাত্র। এই বিভাগ এখনও চলিতেছে। প্রত্যক্ষযুগ বিভাগ অচিরসম্ভাবী। এই বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ মিলের বর্ত্তমান মতের সহিত সম্পূর্ণরূপে সমঞ্জসীভূত হইল। মিল্ বর্ত্তমান যুগের উচ্চ তর্কবিতর্ক ও দুর্ব্বল বিশ্বাসের মধ্য দিয়া অচিরসম্ভাবী প্রত্যক্ষযুগের রমণীয় মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে এই প্রত্যক্ষযুগ বিভাগে সজীব ও নির্জীব উভয় যুগের সমস্ত গুণ একত্রীকৃত হইবে। এই সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তি অসংযতভাবে নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে পারিবে, অপরের সুখ বা স্বাধীনতার ব্যাঘাত সম্পাদন না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিবে; এবং কোন্‌টী ভাল ও কোন্‌টী মন্দ এ বিষয়ে

একটী গভীর বিশ্বাস সকলেরই হৃদয়ে চির-অঙ্কিত হইবে।

কম্‌ট অচিরকাল মধ্যে সেণ্ট সাই-মোনীয়দিগকে পরিত্যাগ করিলেন; এবং মিলেরও কম্‌ট বা তদ্রচিত রচনাবলীর সহিত কিছুকালের জন্য কোন পরিচয় রহিল না। কিন্তু মিল্ সেণ্টসাইমোনীয়-দিগের গ্রন্থাবলী পাঠে বিরত হইলেন না। এই সময় মসো গষ্টেভ ডি ইচ্‌থাল নামক একজন প্রধান সেণ্ট সাইমোনীয় ইংলণ্ডে আসিয়া বসতি করিতেছিলেন। ইহাঁর স-হিত মিলের পরিচয় হইল এবং ইহাঁর নি-কট তিনি সেণ্ট সাইমোনীয়দিগের ক্রমিক উন্নতি বিষয়ে বিশেষরূপে অবগত হইতে লাগিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মিল্ বাজার্ড এবং এন্‌ফাণ্টিন্ নামক দুইজন সেণ্ট সাইমোনীয় অধিনায়কের সহিত পরিচিত হন। ইহাঁরা "সোসালিজম্" মত সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন, মিল্ তৎসমস্ত অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। ইহাঁদিগের মত সকলের সার নিম্নে সংগৃহীত হইলঃ—(১) প্রথমতঃ তাঁহারা বলেন ভূমির উপর ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ত্ব এবং দায়-ক্রম প্রণালী সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক; (২) তাঁহাদিগের মতে সমাজের সমস্ত পরিশ্রম ও ধন জনসাধারণের উপকারে বিনিয়ো-জিত হওয়া উচিত; সমাজের সমস্ত লোক-কেই আপন আপন ক্ষমতানুসারে গ্রন্থ-কার, শিক্ষক, শিল্পী ও কৃষক প্রভৃতির কার্য্য সম্পাদন করা উচিত; এবং সকলের সম-বেত পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জিত ধন এক স্থানে সংগৃহীত হইয়া ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতা-নুসারে সকলের মধ্যে বিভক্ত হওয়া উচিত। মিল্ ইহাঁদিগের উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা ও অভিলষণীয়তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন; কিন্তু যে সকল উপায় দ্বারা তাঁ-হারা এই উদ্দেশ্য সংসাধিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা অভীষ্ট-ফলোৎপাদনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া মনে করিতেন, এবং কেহ যে কখন এই অভীষ্ট সংসাধিত করিতে পারিবেন তদ্বিষয়েও তাঁহার সম্পূর্ণ সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে সমাজের এই উৎকৃষ্ট আদর্শ লোকের নয়নসমক্ষে ধারণ করিয়া রাখিলে, এক সময়ে না এক সময়ে, সমাজ এই আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইবে। আর একটী বিষয়—যাহার জন্য লোকে সেণ্টসাইমোনীয়-দিগের বিশেষ নিন্দা করিত এবং মিল্ বিশেষ ভক্তি করিতেন—এই যে ইহাঁরা অসম সাহস ও স্বাধীনতার সহিত পারি-বারিক-সম্বন্ধ-বিষয়ক চিরপ্রচলিত কুসং-স্কার সকলের মূলে সর্ব্বপ্রথমে কুঠারা-ঘাত করেন। কোন সমাজসংস্কারক অদ্যাবধি এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। ইহাঁরাই জগতে সর্ব্বপ্রথমে খ্যাপন করেন যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সকল বিষয়ে সমান অধিকার। ইহাঁরাই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পরস্পরসম্বন্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ নূতন শৃঙ্খলার উদ্ভাবন করেন। এই সকল কারণে জগৎ ইহাঁদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

আমরা মিলের এই সময়ের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে গিয়া কেবল সেই সকল ঘটনারই উল্লেখ করিয়াছি, যাহাতে তাঁহার মতসকলে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, যাহাতে তাঁহার চিন্তাশক্তির স্পষ্ট বিস্ফুরণ ও উন্নতি উপলক্ষিত হয়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বিষয়ে তাঁহার চিন্তাশক্তি পরিণত ও পরিমার্জ্জিত হয়। কিন্তু এই সকল বিষয় পৃথিবীর নিকট নূতন ও আবিষ্কার নহে। যে সকল বিষয় বহুকাল হইতে পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, মিল্ সে সকল বিষয় হয় বিশ্বাস করিতেন না, নয় অগ্রাহ্য করিতেন। যে সকল উপায় দ্বারা জগতে সেই সকল বিষয় সর্ব্ব প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, মিল্ সেই সকল উপায় দ্বারা যখন স্বয়ং সেই সকল বিষয় নবাবিষ্কৃত করিতেন, তখন তাহাদিগের সত্যতা বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিত।

ক্রমশঃ।

সিপাহী বিদ্রোহ।

লার্ড ক্যানিঙ ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত মন্ত্রী জর্জ্জ ক্যানিঙের পুত্র। তিনি শান্তস্বভাব, মিতভাষী ও গম্ভীরপ্রকৃতি ছিলেন। এবং বিংশতি বৎসরকাল লার্ড সভার সদস্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া রাজনীতিশাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ক্যানিঙ সর রবার্ট পীলের মন্ত্রিত্ব কালে পররাষ্ট্রবিভাগের সহকারী সেক্রেটেরি ছিলেন; পরে ১৮৫২ খৃঃ অব্দে পোষ্টমাষ্টার জেনেরেল পদে নিযুক্ত হইয়া, পাঁচ বৎসর কাল বিলক্ষণ দক্ষতা সহকারে উক্ত কর্ম্ম সম্পাদন করেন। অনন্তর লার্ড ডালহাউসির প্রস্থানের পর ডাইরেক্টরসভা তাঁহাকে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে বরণ করিয়া পাঠাইলেন। তিনি ১৮৫৬ অব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারি শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক কলিকাতা কৌন্সিলে আসন পরিগ্রহ করিলেন।

তৎকালে ইংরাজেরা বৈদেশিক সংগ্রামে সবিশেষ বিব্রত ছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই রুষিয়ার সহিত যুদ্ধঘোষণা হয়।* তন্নিবন্ধন অনেক ইউরোপীয় পল্টন এদেশ হইতে চলিয়া যায়। সম্প্রতি পারস্যরাজের সহিত সংগ্রামের ঘোষণা হইল। ইংরাজেরা হিরাটনগরের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে বরাবর যত্নবান্ ছিলেন। কিন্তু পারস্যাধিপতি লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ১৮৫৫ অব্দে উহা অধিকার করিয়া লন। এই সম্বাদ পাইয়া মন্ত্রিসভা লক্ষ্ণৌরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব রেসিডেন্ট মেজর আয়ুরামকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া সসৈন্যে পারস্যোপসাগরের

* ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে রুষিয়ীয় সংগ্রামের আরম্ভ হয়। রুষিয়ীয়েরা নিরুপায় তুরকাধিপতির প্রতি অত্যাচার করিতে বদ্ধপরিকর হইলে পর ফরাসি ও ইংরাজেরা তাঁহার রক্ষার্থে রুষিয়ীয়দিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন।

উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। লার্ড ক্যানিঙ এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষীয়দিগের উৎসাহ দর্শনে অগত্যা বোম্বাই হইতে একদল সৈন্য ও প্রচুর সামগ্রীসম্ভার প্রেরণ করিয়া দিলেন, এবং আফগানেশ্বর দোস্ত মহম্মদের সহিত সন্ধি বন্ধন করিয়া স্বপক্ষ দৃঢ়ীভূত করিলেন। ইতিমধ্যে চিনের অধীশ্বরের সহিত বিরোধ বাঁধিয়া উঠিল। চিনদেশবাসী ইংরাজদিগের প্রতি সরকারী কর্ম্মচারিগণ অত্যাচার করিতেছেন, উহার কোন প্রতিবিধান হইতেছে না, এই সম্বাদ পাইয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। এবং লার্ড এল্‌গিনকে প্রভূত সৈন্যের সহিত বৈরনির্য্যাতনার্থ পাঠাইয়া দিলেন। যাহা হউক এই সকল বৈদেশিক সমরে ভারতসাম্রাজ্যের শান্তি-ভঙ্গের কোন সম্ভাবনা ছিল না। বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল আগমনকালীন ডাইরেক্টরদিগের নিকট একটি বক্তৃতা করিয়া এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে রাজ্যতন্ত্র নিরুপদ্রবে চলে, ইহা আমার আন্তরিক বাসনা; কিন্তু হয় ত বিতস্তিপ্রমাণ একটুক্ মেঘখণ্ড নভোমণ্ডলের এক কোণে প্রকাশ পাইয়া প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত উত্থাপিত করিয়া দিবে। যাহা হউক আপাততঃ উক্ত আশঙ্কার কোন বিশিষ্ট কারণ লক্ষিত হয় নাই।

পেগুরাজ্যে বহুসঙ্খ্যক মান্দ্রাজী সৈন্য স্থাপিত ছিল। লার্ড ক্যানিঙ উহাদিগকে প্রত্যানয়ন পূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে কতিপয় সিপাহি পল্টন প্রেরণ করিতে আদেশ করিলেন। পেগুতে যাইতে হইলে, বঙ্গোপসাগর দিয়া প্রয়াণ করিতে হয়। হিন্দুশাস্ত্রমতে কলিতে সমুদ্রযাত্রা জাতিনাশক। অতএব হিন্দু সিপাহিরা পেগুতে গমন করিতে সাতিশয় অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। নূতন লাট সাহেব এদেশের আচার ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি উক্ত কুসংস্কার নিবারণ করিবার জন্য ১৮৫৬ অব্দের ৫ই জুলাই এই হুকুম জারি করিলেন যে ভবিষ্যতে যে ব্যক্তি সিপাহিশ্রেণীভুক্ত হইতে চাহিবেক, তাহাকে প্রথমতঃ শপথ গ্রহণ করিতে হইবে যে সমুদ্রযাত্রায় তাহার কোন আপত্তি নাই। এই অনুমতি প্রচার হইতে না হইতেই সর্ব্বত্র অসন্তোষচিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহার উপর আবার জনরব উঠিল যে, গবর্ণমেণ্ট ত্রিশ হাজার শিখ যোদ্ধা নিযুক্ত করিবেন। অতএব সিপাহিরা নির্ব্বিঘ্নমনে বলিতে লাগিল, সরকার বাহাদুর আমাদের রুটি মারিতে উদ্যত হইয়াছেন; হায়! এখন আর আমাদের আদর থাকিবেক কেন? কোম্পানি বাহাদুর আমাদের সাহায্যে কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত নিজ অধিরাজ্য বিস্তীর্ণ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের জয়তরঙ্গ সাগরতরঙ্গে গিয়া মিশিয়াছে; অধুনা আমাদিগকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করাই উচিত।

এই সময়ে গবর্ণর জেনেরেল বিধবা-বিবাহ আইন প্রচার করেন, বহুবিবাহ

নিবারণে যত্নবান্ হন, এবং মিষনারিস্কুল ও বাইবেল সোষাইটির উন্নতি সাধনে প্রয়াস পান। ইঁহার উপর আবার সৈনিক কর্ম্মচারীরা প্রকাশ্যরূপে সিপাহিদিগকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। ইত্যাদি কারণে অজ্ঞ সিপাহিগণের মনে ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা জন্মিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ কলে কৌশলে আমাদের ধর্ম্মনাশে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহাতে কার্য্যসিদ্ধি না হইলে, পরে বলপ্রয়োগ করিতেও পরাঙ্মুখ হইবেন না। এই সকল ঘটনার কিঞ্চিৎ পরে পারস্যরাজের নিকট হইতে একজন দূত দিল্লীশ্বরের সন্নিধানে আগমন করেন। তাঁহার সহিত সম্রাট্ কিরূপ মতলব আঁটিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ পায় না। কিন্তু পারস্যরাজ যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে কোন সংকল্প করিয়াছিলেন, উহা নিতান্ত সম্ভব। পরন্তু তৎকালে মুষলমানদিগের মধ্যে এপ্রকার একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রচলিত ছিল যে "ইংরাজজাতির রাজত্ব শতবর্ষমাত্র স্থায়ী হইলে পর মুষলমানদিগের আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবেক"। পলাশীর যুদ্ধ হইতে একশত বৎসর অতীত হইল, সম্প্রতি দিল্লীশ্বর ভারতরাজ্যের সিংহাসনে পুনর্ব্বার শুভাধিরোহণ করিবেন, এই প্রত্যয়ের পরতন্ত্র হইয়া সমুদয় মুষলমানসমাজ উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

পুরাতন বন্দুকের পরিবর্ত্তে রাইফল-নামক নূতনবিধ বন্দুক ব্যবহার করিবার হুকুম জারি হইলে পর দমদমার কারখানায় বসামিশ্রিত টোটা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে এক দিন কোন ব্রাহ্মণজাতীয় সিপাহি যেমন এক লোটা জল লইয়া যাইতেছিল, একজন খালাসি জলপানার্থ ঐ লোটাটি চাহিল। সিপাহি সক্রোধে উত্তর করিল, তুই অতি নীচজাতীয়, তোর সংস্পর্শে আমার জলপাত্র অপবিত্র হইয়া যাইবেক। খালাসি ব্যঙ্গ করিয়া জবাব দিল, "তোমারা ঠাকুর জাত্ জাত্ করে অহঙ্কারে মর; কিন্তু কিছু দিন থাক, গরু ও শোরের চর্ব্বিতে টোটা তৈয়ার হচ্ছে, সাহেব লোকের হুকুমে ঐ টোটা তোমাদিগকে দাঁত দিয়া কাট্‌তে হবে"। সৈনিক এই কথা শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেল। অবিলম্বে এই বিষয় লইয়া সিপাহী সৈন্য মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। এবং বসামিশ্রিত টোটা প্রস্তুত করা যাহাতে বন্ধ হয়, তন্নিমিত্ত আবেদন হইল। তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট টোটাতে চর্ব্বি দেওয়া না হয়, এরূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন। উহাতেও সিপাহিদিগের সন্দিগ্ধ চিত্ত নিবৃত্তিলাভ করিল না। টোটার কাগজ মসৃণ ও চিক্কণ। তাহারা ভাবিল ঐ কাগজ চর্ব্বিমাখান হওয়াতে এরূপ দৃষ্ট হইতেছে, অতএব উহা অস্পৃশ্য। এই নূতনবিধ সংশয়ের উচ্ছেদ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কাগজের রাসায়নিক

পরীক্ষা করাইয়া এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে উহাতে চর্ব্বির সম্পর্কও নাই। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্টি করিলে কিঞ্চিৎ তৈলবৎ পদার্থের অনুভব হয় বটে, কিন্তু বোধ হয় পুলিন্দা প্রস্তুতকারীদিগের হাতের তৈল লাগাতে ওরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক এই যুক্তিতে সিপাহিদিগের মনে তৃপ্তিলাভ হইল না।

অনন্তর ১৮৫৭ অব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি বহরমপুর স্থিত উনবিংশতিতম রেজিমেণ্টের সিপাহিগণ কাওয়াজের সময় টোটা স্পর্শ করিতে অস্বীকার করিল ও অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আস্ফালন করিতে লাগিল। তথাকার অধিনায়ক কর্ণেল মিচেল বলপ্রয়োগ করিতে সাহসী না হইয়া সামোপায় * দ্বারা উঁহাদিগকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিতে সমর্থ হইলেন। গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর এই সম্বাদ প্রাপ্তিমাত্র উক্ত অপরক্ত রেজিমেণ্টকে বারাকপুরে লইয়া আসিতে অনুমতি দিলেন। এবং রেঙ্গুণ হইতে অষ্টাশীতিতম ইয়ুরোপীয় রেজিমেণ্টের আনয়নার্থ সম্বাদ পাঠাইবেন।

এই সময়ে গোয়ালিয়ার রাজা ভারতবর্ষের রাজধানী দেখিতে সমাগত হইয়াছিলেন। তিনি ১০ই মার্চ তারিখে কোম্পানির বাগানে গবর্ণর সাহেব ও তাঁহার পারিষদ্দিগকে একটি ভোজ দিবার আয়োজন করেন। সিপাহিদের এরূপ সংকল্প ছিল যে লাট সাহেবের অনুপস্থিতি রূপ সুযোগে কলিকাতার কেল্লা দখল করিয়া লইবেক। তৎকালে কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে ইয়ুরোপীয় সৈন্য আদপে ছিল না বলিলে হয়। সিপাহিগণ মনে করিলে অবলীলাক্রমে আপনাদের অভিসন্ধি সফল করিতে পারিত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে দিন ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ হওয়াতে উক্ত নিমন্ত্রণ স্থগিত রহিল; তন্নিবন্ধন চক্রান্তকারীরা হতোৎসাহ হইয়া পড়িল। পরন্তু তাহাদের মধ্যে দুই জন টাকশালের প্রহরীদলের সুবেদারকে বেগড়াইবার চেষ্টা করাতে, তৎকর্ত্তৃক ধৃত হইল। এবং প্রত্যেকের চৌদ্দ বৎসরের জন্য কারাবাসের আদেশ হইল।

অনন্তর উনবিংশতিতম রেজিমেণ্ট বারাকপুরে আসিয়া পৌঁছিল। মার্চ মাসের শেষ তারিখে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করা হইল। এই ঘটনার দুই দিন পূর্ব্বে তথায় আর একটি কাণ্ড উপস্থিত হয়। চতুস্ত্রিংশ রেজিমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত মোগল পাঁড়ে নামক এক জন সিপাহি ভাঙে চুরচুরে হইয়া তরবারি ও পিস্তল গ্রহণ পূর্ব্বক প্রান্তরে সদর্পে পরিক্রমণ করিতে লাগিল এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান পূর্ব্বক নিজ ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় সহ-

---

* সামোপায়—রাজনীতি শাস্ত্রে চারি প্রকার উপায় নির্দ্দিষ্ট হয়। যথা, সাম—মিষ্টবাক্য, দান—অর্থদান, ভেদ—আত্মবিরোধ, বিগ্রহ যুদ্ধ।

চরগণকে আহ্বান করিতে লাগিল। দুই জন ইংরাজ কর্ম্মচারী তাহাকে থামাইতে আসিয়া শক্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের সন্নিকটে জমাদার ঈশ্বরী পাঁড়ে ও কয়েক জন সিপাহি দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল, তাহারা কিছুই বলিল না। লার্ড ক্যানিঙ অবিলম্বে সমস্ত সৈন্যের সমক্ষে মোগল পাঁড়ে ও ঈশ্বরী পাঁড়ের ফাঁসি দেওয়াইলেন, এবং চতুস্ত্রিংশত্তম রেজিমেণ্টকে নিরস্ত্র ও কর্ম্মচ্যুত করিবার আদেশ করিলেন।

উক্তপ্রকার পারুষ্য প্রয়োগ করিয়া গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর ও তাঁহার মন্ত্রিগণ ভাবিলেন, টোটাকাটা নিবন্ধন সিপাহী সৈন্যের মধ্যে যে অপরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, উহা নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। এমন সময় শুনিতে পাইলেন, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এক এক থান চাপাটি * সঞ্চালিত হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই অদ্ভুত ব্যাপরের মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিলেন না। কেহ বলিলেন, চক্রান্তকারীরা চাপাটির ভিতর চিটি মোড়ক করিয়া স্বপক্ষীয়দিগের নিকট প্রেরণ করিতেছে। কেহবা অনুভব করিলেন কোন ভাবী অনর্থপাত হইতে সকলকে সতর্ক করাই চাপাটি প্রেরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। শেষোক্ত অনুমানটি সম্ভবপর বোধ হয়। তৎকালে ধর্ম্মলোপ ও জাতিনাশের আশঙ্কা লোকের মনে অত্যন্ত দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। ইহা অসম্ভব নয় যে তদ্বিষয়ে সকলকে সাবধান করিবার নিমিত্তই এই নিগূঢ় সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হয়। নিম্নলিখিত ঘটনাটি দ্বারা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী লোকের তদানীন্তন মনের ভাবগতিক বিশেষরূপে সূচিত হইতেছে। এপ্রিল মাসে কতিপয় মিরাটনগরবাসী মহাজন সরকারী বোট ভাড়া করিয়া কাণপুরে আটার আমদানি করে, এবং অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। তন্নিবন্ধন অবিলম্বে এই জনরব উঠিল যে, গবর্ণমেণ্ট সকলের জাতিনাশ করিবার জন্য আটাতে গো-অস্থি-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। এই দারুণ জনরব উঠিবামাত্র হাট বাজার হইতে আটা বিক্রয় একবারে বন্ধ হইয়া গেল। যাহারা ভোজনে বসিয়াছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ রুটি ফেলিয়া দিল, এবং আপনাদিগকে নিতান্ত অশুচি বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল।

মে মাসের প্রথমে মিরাটস্থিত অশ্বসৈন্যের তৃতীয় রেজিমেণ্টের লোকেরা টোটা স্পর্শ করিতে অসম্মত হওয়াতে প্রত্যেকে দশ দশ বৎসরের জন্য কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হয়। তন্নিবন্ধন তত্রত্য সিপাহিগণ ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া অনেকানেক ইয়ুরোপীয়কে নিদারুণরূপে সংহারপূর্ব্বক দিল্লীর দিগে প্রস্থান করিল। দিল্লীস্থ যোধগণ অকাতরে উহাদের পক্ষ অবলম্বন করিল। তৎকালে ঐ নগরে ইয়ুরোপীয় সৈন্যের নাম গন্ধ

* চাপাটি—হাতেচাপড়ান অসিদ্ধ রুটি।

ছিল না। সুতরাং বিদ্রোহীরা অনায়াসে অস্ত্রাগার অধিকার পূর্ব্বক অতি নিষ্ঠুর ভাবে ইয়ুরোপীয় অধিবাসীদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। অবলা ও বালক, রোগী ও বৃদ্ধ সকলেই নির্ব্বিশেষে তাহাদের কোপানলে শলভত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে ভারতরাজ্যের প্রাচীন রাজধানীতে ইংরাজদিগের আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। তখন বৃদ্ধ সম্রাট্ মহম্মদ বাহাদুর পৈতৃক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, এবং আপনার পুত্রগণের উপর রাজ্যতন্ত্র সংক্রান্ত নানা কার্য্যের ভার অর্পণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ভূপতিগণ ও প্রজাবর্গকে ইংরাজ জাতির উচ্ছেদ সাধনার্থ অভ্যুত্থান করিতে আহ্বান করিলেন, এবং এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে ইংরাজেরা ধর্ম্মনাশক, রাজ্যাপহারক ও শঠের শিরোমণি। উহারা হিন্দু ও মুষলমান উভয় জাতির পরম শত্রু। অতএব উহাদের উন্মূলনার্থ সকলে মিলিত হইয়া আমার আনুকূল্য কর।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই, দোয়াব প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। তত্রত্য সিপাহিগণ ট্রেজরি লুট করিয়া এবং কয়েদিদিগকে খালাস দিয়া দিল্লীর অভিমুখে চলিয়া গেল। অনন্তর মে মাসের শেষ তারিখে রোহিলখণ্ডের রাজধানী বরেলী নগরীতে মিয়ুটিনি হইল। রোহিলারা যেন ওয়ারেণ হেষ্টিংসকৃত অত্যাচার স্মরণ হওয়াতে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ইয়ুরোপীয়দিগকে হত্যা করিতে লাগিল।

জুন মাসের প্রারম্ভে গোয়ালিয়র ও হুলকার রাজ্যে স্থাপিত যোধগণ ক্ষেপিয়া উঠিল। সেন্ধিয়া ও হুলকার স্বরক্ষিত সৈন্য দ্বারা উহাদিগকে দমন করিতে যথোচিত প্রয়াস পাইলেন, এবং কিছু কালের জন্য তাহাদের অনেকানেক অত্যাচার নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন। ঝান্সির রাজ্ঞী লক্ষ্মীবাই ডেলহাউসী হইতে সর্ব্বস্বান্তা হইয়া বৈরনির্যাতনার্থ বরাবর সচেষ্টিতা ছিলেন, অধুনা সুযোগ পাইয়া আপনার রাজ্যে যে সকল ইংরাজ লোক বাস করিতেন তাহাদিগকে অকাতরে সংহার করিলেন এবং ইংরাজজাতির প্রভুত্ব উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

তৎকালে আগ্রানগর দিল্লীর ন্যায় ইয়ুরোপীয় সৈন্য-বর্জ্জিত ছিল না। সুতরাং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টিন্যাণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত কলভিন সাহেব বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে উহার রক্ষা বিধান করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু এলাহাবাদের সিপাহিগণ অবাধে ট্রেজারি লুট, কয়েদি খালাস, সৈন্যাগার দাহ ও ইয়ুরোপীয়দিগের হত্যা প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব করিতে লাগিল। কেবল কেল্লাটি মাত্র কিয়ৎসংখ্যক ইংরাজ ও শিখ যোদ্ধার অধ্যবসায়গুণে রক্ষিত হইল। ৪টা জুন কাশীস্থিত প্রায় দুই হাজার সৈনিক ক্ষেপিয়া উঠে। তথায় দুই শত মাত্র ইয়ুরোপীয় যোদ্ধা ছিল। কিন্তু তাহারা কৌশলপূর্ব্বক সমুদায় কামান অধিকার করিয়া লইয়া বিদ্রোহী-

দিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাভব করিল এবং উক্ত নগরে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য অব্যাহত রাখিল।

এই ঘটনার পর দিন কাণপুরে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কাণপুরের অদূরে বিটুর নগরে নানা সাহেবের বাস ছিল। তিনি শেষ পেষোয়া বাজী রাওর পোষ্য পুত্র। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় পেনশিয়ান পাইবার নিমিত্ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিকট বারম্বার আবেদন করেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তৎপরে নানা সাহেব ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের সহিত এরূপ অমায়িক ভাবে মিশিতেন, যে কেহই তাঁহার মনের ক্ষোভ লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। তিনি প্রায় বিটুর নগরের বাহির হইতেন না, কিন্তু ঐ বৎসর এপ্রিল মাসের দারুণ গ্রীষ্মেতে যেরূপ ত্বরান্বিত হইয়া দিল্লী, কাণপুর ও লক্ষ্ণৌ নগরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে ছিলেন, তদ্দর্শনে সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন। অযোধ্যার রেষিডেণ্ট শ্রীযুক্ত সর হেন্‌রি লরেন্স তাঁহাকে বহু সমাদরে সম্বর্দ্ধনা করত সমাগমের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দেন নগর দর্শনার্থ আগমন করিয়াছি। অনন্তর কাণপুরে গোলযোগের উপক্রম হইল। নানাসাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তথাকার সেনানী সর হিয়ু হুয়িলারকে ট্রেজরি রক্ষার্থ দুই শত সিপাহি প্রদান করিতে চাহিলেন। তিনি অসন্দিগ্ধচিত্তে উক্ত সাহায্য গ্রহণ করিলেন। অবিলম্বে ক্যাণ্টনমেণ্টের সিপাহিরা ক্ষেপিয়া উঠিল। তখন নানাসাহেবের কাপট্যের অবগুণ্ঠন অপসারিত হইল। তিনি বেতন বৃদ্ধি করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বিদ্রোহীদিগকে স্ববশে আনিলেন, আনয়নপূর্ব্বক ট্রেজরি লুঠ ও অস্ত্রাগার অধিকার করিলেন, এবং আপনাকে পেষোয়া বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। অবিলম্বেই বিদ্রোহীরা তত্রত্য ইয়ুরোপীয়গণকে অবরুদ্ধ করিল। সর হিয়ু হুয়িলার, ২৪ শে জুন পর্য্যন্ত বিলক্ষণ অধ্যবসায় সহকারে আত্মরক্ষা করিলেন; কিন্তু অবশেষে লক্ষ্ণৌ হইতে সাহায্য প্রাপ্তির শেষ আশা উচ্ছিন্ন হইল দেখিয়া এবং নানাসাহেব হইতে নির্ব্বিবাদে এলাহাবাদে পৌঁছিবার আশ্বাস পাইয়া আত্ম সমর্পণ করিলেন। তৎকালে অবরুদ্ধদিগের ক্লেশের এক শেষ হইয়াছিল। যাহা হউক, এখন যাবতীয় দুঃখের অবসান হইল ভাবিয়া সকলে কুতূহলে নৌকাধিরোহণ করিল। এমন সময়ে নৃশংস সিপাহীগণ নদীর উভয়তীর হইতে গুলি বর্ষণ করত হতভাগ্য আরোহীদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। ক্রমে সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইল, কেবল চারিজন ব্যক্তি দিগ্বিজয় সিংহের অনুগ্রহে জীবনরক্ষা করিতে পারিল। অতঃপর বালক ও অবলাগণ নানা সাহেবের পটমণ্ডপে সমানীত হইলে তিনি তাহাদিগকে আপাততঃ রুদ্ধ রাখিলেন। কিন্তু দুই সপ্তাহকাল অতীত না হইতেই সেই নিরপরাধ বন্দীগণ তদীয় অনুমতিক্রমে অতি

নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইল। এই হৃদয়-বিদারণ হত্যাকাণ্ড শ্রবণ করিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়।

তৎকালে অযোধ্যাবিভাগে অতিবিস্ময়কর ব্যাপার সকল সম্পাদিত হইতেছিল। এই অতিভয়ঙ্কর বিদ্রোহকাণ্ড কতিপয় চক্রান্তকারীর উৎসাহে ও সাহায্যে কেবল সিপাহিসৈন্য দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়; ইহাতে অপর সাধারণ প্রজালোক ও জমিদারগণ কোনরূপে লিপ্ত হন নাই। তাহা হইলে ইংরাজদিগের আধিপত্য সমূলে উন্মূলিত হইয়া যাইত। প্রত্যুত তাঁহারা অনেক স্থলে পলায়মান ইংরাজদিগকে আশ্রয়দান করিয়াছেন, এবং যাহাতে উঁহারা নিরুপদ্রবে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে পারেন, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ সেই নিদারুণ সময়ে এদেশীয় ভৃত্যবর্গের প্রভুভক্তির অসংশয়িত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। যদি আয়া, বাবুর্চি, সইষ, কোচমান, চাপরাশি, খানসামা, খেজমদগার, প্রভৃতি ভৃত্যগণ নিজ নিজ ইউরোপীয় প্রভুর প্রতিকূলবর্ত্তী হইত; তাহা হইলে এক প্রাণীরও জীবন রক্ষা হইবার সম্ভাবনা ছিলনা। প্রত্যুত তাহারা তাদৃশ সঙ্কট কালে কিছুতেই প্রভুর পার্শ্ব পরিত্যাগ করে নাই; বরং স্বয়ং বিপদে পতিত হইয়াও তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়াছে। কিন্তু অযোধ্যা প্রদেশে বিশেষতঃ লক্ষ্ণৌ-নগরে এই নিয়মের বিপরীতভাব লক্ষিত হইয়াছিল। তথায় প্রজালোক ও পুলিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিয়াছিল। ইহা বলা বাহুল্য যে, এই বিরুদ্ধ ঘটনাটি লার্ড ডালহাউষীর দুর্নীতির বিষম ফল।

২রা মে লক্ষ্ণৌনগরের সন্নিকটবর্ত্তী সপ্তম রেজিমেণ্টের যোধগণ কাওয়াজের সময় দাঁত দিয়া টোটা কাটিতে আদিষ্ট হয়। তৎকালে টোটাকাটার হুকুম রদ হইয়া গিয়াছিল। তথাপি কি জন্য যে সৈনিক কর্ম্মচারীরা সেই হুকুম জারি করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক সপ্তম রেজিমেণ্টের সিপাহিগণ উক্ত আদেশ অমান্য করিল এবং অষ্টচত্বারিংশত্তম রেজিমেণ্টকে বেগ্ড়াইয়া আপনাদের দল পুষ্টি করিতে চেষ্টা দেখিতে লাগিল। কিন্তু সর হেনরি লরেন্স সত্বর সেই স্থানে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহীরা তদ্দর্শনে ভীত হইয়া আপনাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার বশীভূত হইল। ৩০ শে মে তিন রেজিমেণ্ট সিপাহি ক্ষেপিয়া উঠিল। কিন্তু পরাজিত হইয়া সিতাপুরের দিগে পলায়ন করিল। তন্নিবন্ধন কালব্যাজ না করিয়া অবশিষ্ট সিপাহিগণকে কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করা হইল। বিদ্রোহিগণ লক্ষ্ণৌ হইতে আঠার মাইল অন্তরে নবাবগঞ্জ নামক গ্রামে আপনাদের আড্ডা করিল। অপরক্ত যোধগণ চারিদিক্ হইতে আসিয়া তাহাদের দলপুষ্টি করিতে লাগিল। শ্রীযুক্ত প্রধান কমিষনর সাহেব, বিপক্ষ

পক্ষের বলবৃদ্ধি হইতে দেওয়া অবিধেয় বিবেচনা করিয়া কিয়ৎসঙ্খ্যক ইউরোপীয় ও শিখ যোদ্ধা সমভিব্যাহারে লইয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া রেসিডেন্সিতে * ফিরিয়া আসিলেন। বিদ্রোহীরাও জয়দর্পিত হইয়া দ্রুতপদে নগর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে ঘেরিয়া ফেলিল।

এদিগে গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর নিতান্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি তাদৃশ অশ্রুতপূর্ব্ব বিপৎপাতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া, অবিচলিতচিত্তে প্রতিকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। সিপাহিগণ চক্রান্তকারীদিগের কুহকে মতিচ্ছিন্ন হইয়া ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইতেছে, এই মর্ম্মে এক ঘোষণা করিয়া দিলেন, বিদ্রোহগ্রস্ত জনপদে সাংগ্রামিক আইন † জারি করিলেন, এবং লার্ড এল্‌গিনকে চীন হইতে ও মেজর আয়ুটরামকে পারস্য উপসাগর হইতে, যত শীঘ্র সম্ভব সৈন্য প্রেরণ করিবার জন্য লিখিলেন। অনন্তর পঞ্জাবের প্রধান কমিষণর জন লরেন্সকে অনুমতি করিলেন, আপনি পঞ্জাব হইতে যত সৈন্য বাঁচাইতে পারেন, দিল্লীতে পাঠাইয়া দিবেন এবং সর্ব্ব প্রযত্নে ঐ নগরের অবরোধ কার্য্যে সহায়তা করিবেন। গত মে মাসের প্রারম্ভে লাহোরের অদূরে অবস্থাপিত তিন রেজিমেণ্ট সিপাহি সৈন্য ইউরোপীয়দিগকে সংহার পূর্ব্বক লাহোরের দুর্গ অধিকার করিবার সংকল্প করে। কিন্তু তাঁহাদিগকে সত্বর নিরস্ত্র করাতে সমুদায় গোলযোগ থামিয়া যায়। ইহার অব্যবহিত পরে ফিরোজপুর ও অম্বালাস্থিত সিপাহিগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অবাধে দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিল এবং আটক ও পেষোরে স্থাপিত সৈন্য মধ্যে হুলস্থূল বাঁধিয়া উঠিল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কালাতিপাত না করিয়া পঞ্জাবের সমস্ত অপরক্ত যোধগণকে নিরস্ত্র করিয়া অচিরকালের মধ্যেই শান্তি স্থাপন করিলেন। অধুনা সব জন অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া দিল্লীর অবরোধ কার্য্যে সাহায্য করিতে সচেষ্ট হইলেন। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা উচিত যে পাতিয়ালা ও ঝিণ্ডির অধিপতিরা নিজ নিজ অর্থ ও সামর্থ্য দ্বারা দিল্লীর অবরোধী সৈন্যের যথোচিত সাহায্য করেন। তৎপ্রযুক্ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নিকট চিরকাল ঋণী থাকিবেন।

যৎকালে কলিকাতা হইতে পেষোর পর্য্যন্ত বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়, কমাণ্ডারিঞ্চিফ শ্রীযুক্ত এনসন সাহেব অসুস্থতা বশতঃ সিমলার সমীরণ সেবন করত কালযাপন করিতেছিলেন। তিনি ২৩শে মে

* রেসিডেন্সিতে—যে রাজপুরুষ ভারতবর্ষীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া করদ বা মিত্র রাজ্যে অবস্থাপিত হন, তাঁহাকে রেসিডেণ্ট বলে। রেসিডেন্সি তাঁহার আবাস স্থান।

† সাংগ্রামিক আইন—এই আইন নিতান্ত কঠিন; এই আইন অনুসারে সৈনিক ও বিদ্রোহীদের দণ্ডবিধান হয়।

অম্বালায় অবতরণ পূর্ব্বক দিল্লীর অবরোধার্থ বন্দোবস্ত করিতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অনন্তর সর হেনরি বার্ণাড অম্বালা হইতে সসৈন্যে প্রয়াণ করিলেন। তিনি পথিমধ্যে মিরাট হইতে আগত একদল ফৌজের সহিত মিলিত হইলেন, এবং অবিলম্বে দিল্লীর উপকণ্ঠে বিপক্ষদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক এক সুদৃঢ় স্থানে সেনা নিবেশ করিলেন। বিদ্রোহীরা নিরন্তর নগরের অভ্যন্তর হইতে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু প্রতিবারই পরাহত হইতে লাগিল, কোনরূপেই আক্রমণকারীদিগকে হটাইয়া দিতে পারিল না। ইতিমধ্যে কয়েকটি পল্টন পঞ্জাব হইতে আসিয়া অবরোধী সৈন্যের বলাধান করিয়াছিল, নতুবা তাদৃশ প্রবল বিপক্ষের পুরোভাগে তিষ্ঠিয়া থাকা সেনাপতির পক্ষে দুর্ঘট হইত। এইরূপে জুনমাস অতীত হইল। জুলাইমাসের প্রারম্ভে সর হেনরি বার্ণার্ড ওলাউঠা রোগে কালকবলে পতিত হইলেন। তন্নিবন্ধন সৈনিকগণ নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। সর হেনরির মৃত্যুতে ব্রিগেডিয়র উয়িলসন সাহেব সৈনাপত্য প্রাপ্ত হইলেন। এবং অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায় সহকারে আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পঞ্জাব হইতে বহুতর সৈন্য আসিয়া পৌঁছিল। এদিগে বিপক্ষগণের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ ও গোলযোগ চলিতেছিল। উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহী যোধগণকে আয়ত্ত রাখিয়া যুদ্ধের যথোচিত উদ্যোগ করেন, তৎকালে দিল্লীতে এমন কোন অধিনায়ক দৃষ্ট হন নাই। সাহজাদারা যেমন কার্য্যবিধুর তেমনি লঘুচিত্ত। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উইলসনকে এই বলিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন, যে আমরা বরাবর ইংরাজদিগের প্রতি অনুরক্ত; আমাদের সহিত তাঁহারা কিরূপ ব্যবহার করিবেন, জানিতে পারিলেই তাঁহাদের সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর হইতে পারি। ইত্যাদি কারণে হতোৎসাহ ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া দিল্লীস্থ সিপাহিগণ পরস্পর কাটাকাটী করিয়া নিধনপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পালে পালে যে দিগে ইচ্ছা প্রস্থান করিতে লাগিল। এই সুযোগে শ্রীযুক্ত উয়িলসন সাহেব ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের প্রত্যূষে দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক নগরের আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। বিদ্রোহী যোধগণও অবিচলিত সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা সহকারে তদীয় সৈন্য প্রতিরোধ করিতে লাগিল। এইরূপে সপ্তাহকাল সংগ্রাম হইল। অবশেষে সিপাহিরা রণ হইতে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল। তখন সহরের অধিবাসিগণ আক্রমণকারীদিগের ঘোরতর বৈরনির্য্যাতনে ত্রাসিত হইয়া স্ব স্ব আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর সম্রাট্ প্রাণরক্ষার আশ্বাস পাইয়া বিজেতাদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহার দেখাদেখি তাঁহার দুই পুত্র ও

এক পৌত্র ইংরাজদের শরণাগত হইলেন। কিন্তু হড্‌সন নামধেয় জনৈক সৈনিক কর্ম্মচারী অতি নির্ব্বরভাবে নিজ হস্তে গুলি মারিয়া তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিল।

গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর অবিলম্বে এই সুসমাচার সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, যাহারা ইংলণ্ডের দৌবর্ল্যের উপর নির্ভর করিয়া বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তাহারা সমুচিত শাস্তি পাইয়াছে, তাহাদের প্রধান আড্ডা অধিকৃত হইয়াছে, এবং ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য অব্যাহত রাখিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে নূতন যোধগণ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মিয়ুটিনির মস্তক চূর্ণ করা গিয়াছে।

সেই সময়ে অযোধ্যা ও অন্তর্গঙ্গ প্রদেশ বড় নিস্তব্ধ ছিল না। কর্ণেল নীল মান্দ্রাজ হইতে আগমন করিবার অব্যবহিত পরেই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রয়াণ করিতে আদিষ্ট হন। তাঁহার সমভিব্যাহারে অতি অল্পসংখ্যক মাত্র যোদ্ধা ছিল। কিন্তু তিনি এরূপ অদ্ভুত সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন, যে জুনমাসের মধ্যেই কাশীতে শান্তি স্থাপন হইল, এলাহাবাদের বিদ্রোহ নিবারিত হইয়া গেল, এবং চতুর্দ্দিগস্থ জনপদসকল কেবল তাঁহার নামের ভয়েই নিঃস্তব্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু অনতিচিরকালের মধ্যেই মহারথ জেনেরেল হ্যাবেলক রণাঙ্গনে উপস্থিত হওয়াতে নীল তাঁহার অধীনস্থ হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। উক্ত জেনেরেল পারসিক যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই একদল সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া ২৫ শে জুন অন্তর্গঙ্গ প্রদেশে প্রেরিত হন। তিনি সত্বর প্রধাবিত হইয়া ফতেপুর ও এয়ঙ্গ গ্রামের সন্নিকটে এক এক দল বিপক্ষকে পরাজয় পূর্ব্বক ১৫ জুলাই মহারাজপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় বহুসংখ্যক বিদ্রোহী সমবেত হইয়াছিল এবং নানা সাহেব পাঁচ হাজার ফৌজ লইয়া তাহাদের পার্ষ্টি দেশ রক্ষা করিতেছিলেন। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেই নিজ নিজ পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা প্রকটন করিল। কিন্তু পরিশেষে ইংরাজদিগের জয় লাভ হইল। অনন্তর বিজয়ী যোধগণ কাণপুরে প্রবেশ করিল এবং নানাসাহেবের কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সেই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের নানা প্রকার চিহ্ন অবলোকন করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না।

অতঃপর জেনেরেল হ্যাবেলক ভাগীরথী পার হইয়া লক্ষ্ণৌ নগরে অবরুদ্ধ ইয়ুরোপীয়দিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। অবরোধের উপক্রমেই গুণশালী শ্রীযুক্ত সর হেনরি লরেন্স বিপক্ষ কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত একটা জ্বলন্ত গোলা দ্বারা আহত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎপরে জেনেরেল ইংগ্লিস অবরুদ্ধদিগের রক্ষাকার্য্যে দীক্ষিত হন। বিদ্রোহিগণ হাবেলকের অভিযান প্রতিরোধ করিবার

নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল, কিন্তু দুই দুই বার পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। এমন সময়ে সম্বাদ আসিল, দানাপুরের সিপাহিগণ বিগড়িয়া উঠিয়াছে, জগদীশপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার কুমারসিংহ আপনার দলবল লইয়া, উহাদের সাহায্যে আরা নগর অবরোধ করিয়াছেন, গোয়ালিয়র রাজ্যের রক্ষি সৈন্য পূর্ণসংগ্রামে কাল্পীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং প্রায় চার হাজার বিদ্রোহি বিটুর নগরে সমবেত হইয়া কাণপুরকে লক্ষ্য করিতেছে। সেনাপতি পশ্চাদ্ভাগ এরূপ সঙ্কটাকীর্ণ দেখিয়া দ্রুত পদে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শেষোক্ত স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং বিপক্ষগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার অধীনস্থ সৈনিকেরা সমরক্লেশে ও ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাবে এরূপ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল যে তিনি কলিকাতা হইতে সাহায্য প্রাপ্তির প্রতীক্ষা করতঃ আপাততঃ কাণপুরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে সর জেম্স আয়ুটরাম গৌরবের সহিত পারসিক সংগ্রাম সমাপন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। অযোধ্যার প্রধান কমিষণর নিযুক্ত হইয়া অবিলম্বে এক দল সৈন্য লইয়া কাণপুরে উপস্থিত হইলেন। জেনেরেল হ্যাবেলক তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সত্বর লক্ষ্ণৌ নগরের দিগে যাত্রা করিলেন, এবং দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম সহকারে শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে রেষিডেন্সিতে উপস্থিত হইলেন। অবরুদ্ধ ইয়রোপীয়গণ প্রায় তিন মাস বিপক্ষদিগের নিরন্তর আক্রমণে এককালে ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছিল; অধুনা যেন পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বিচক্ষণ শ্রীযুক্ত হ্যাবেলক অনতি চিরকালের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন, যে বিদ্রোহিরা এখনও হীনবল হয় নাই, উহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিতে গেলে অধিকতর সৈন্যের দরকার হইবেক। অতএব আমরা অবরুদ্ধদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়া নিজেই শত্রুসেনার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িলাম।

১৩ তেরই আগষ্ট সর কলিন ক্যাম্বেল জেনেরেল এনসনের উত্তরাধিকারী হইয়া কলিকাতায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বিগত রুষিয়ীয় সমরে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, যে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই সঙ্কটের সময়ে তাঁহাকে ভারতসাম্রাজ্যের সেনাপতি পদে বরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করিতে না করিতেই ইংলণ্ড হইতে ভূরি ভূরি সৈন্য আসিয়া পৌছিল। সর কলিন লক্ষ্ণৌস্থিত ইংরাজগণের সঙ্কটবার্ত্তা শ্রবণে প্রভূত সেনা সমভিব্যাহারে লইয়া সত্বর প্রধাবিত হইলেন; এবং বিদ্রোহিগণের সমুদায় বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু আপাততঃ উহাদের সহিত সংগ্রাম না করিয়া যে সকল বৃদ্ধ ও রোগী বালক ও স্ত্রীলোক অবরুদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধারপূর্ব্বক কাণপুরে

প্রতিগমন করিলেন। এই সময়ে মহাবীর জেনেরেল হ্যাবেলক রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। বিপদ্ বিপদের অনুগমন করে। অতএব উক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরেই কমাণ্ডারিঞ্চিফের নিকট সম্বাদ আসিল যে, গোয়ালিয়র রাজ্যের রক্ষি সৈন্য নানাসাহেবের দলবলের সহিত মিলিত হইয়া কাণপুরের দিগে অগ্রসর হইতেছে। এই সম্বাদ প্রাপ্তিমাত্র তিনি শক্রর অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ৬ই ডিষেম্বর দুই দলে সম্মুখীন হইল। বিদ্রোহীরা কিয়ৎকাল মাত্র যুদ্ধ করিয়া রণ হইতে ভঙ্গ দিল এবং ইংরাজ যোধগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

অনন্তর প্রধান সেনাপতি দোয়াব প্রদেশের শান্তি স্থাপনার্থ কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার লক্ষ্ণৌ নগরের অভিমুখে অভিযান করিলেন। মেজর জেনেরেল আয়ুটরাম এপর্য্যন্ত চারিহাজার ফৌজে সহিত আলমবাগে এক প্রকার অবরুদ্ধ ছিলেন। এখন তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া নগর আক্রমণার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ১১ই মার্চ নৈপাল রাজ্যের সর্ব্বাধ্যক্ষ জঙ্গবাহাদুর ৯০০০ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তন্নিবন্ধন আক্রমণকারী সৈনার সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার হইয়া উঠিল। সেই দিনই উক্ত নগর চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রান্ত হইল। বিদ্রোহী সৈন্য একাদশ দিন কাল অক্ষুন্ন সাহস সহকারে প্রাণপণে নগর রক্ষা করিল, কিন্তু পরিশেষে একে একে যাবতীয় আশ্রয়স্থান হইতে পরাহত হইয়া ইতস্ততঃ পলাইয়া গেল। এইরূপে অযোধ্যারাজ্যের রাজধানী সর্ব্বতোভাবে ইংরাজদের হস্তগত হইল।

অনন্তর সর এডওয়ার্ড লুগার্ড এক দল সৈন্য লইয়া, আজিমগড়ের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। কুমারসিংহ অশীতিবর্ষবয়স্ক হইয়াও যুবার ন্যায় কিছুকাল সসৈন্যে নানাস্থানে বিচরণ করিয়া পরিশেষে উক্ত কেল্লা অবরোধ করিয়াছিলেন। ১৫ই এপ্রেল দুই পক্ষে সাক্ষাৎ হইল। বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং তাহাদের অধিনায়ক কুমারসিংহ শক্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

এদিগে কামাণ্ডারিঞ্চিফ বাহাদুর মে মাসের প্রারম্ভে রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করিলেন। রোহিলারা খাঁ বাহাদুরের অধীনে সমবেত হইয়া স্বদেশ হইতে ইংরাজদিগের আধিপত্য একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু অধুনা সর কলিন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সুশিক্ষিত যোধগণকে প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া ইতস্ততঃ পলাইয়া গেল। সেনাপতি অবলীলা ক্রমে বরেলী নগর অধিকার পূর্ব্বক রোহিল খণ্ডের সমুদায় গোলযোগ নিবারণ করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপ ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ডে

বিদ্রোহকাণ্ড নিবারিত হইল। অতঃপর মধ্য ভারতবর্ষের তদানীন্তন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে। সেই সঙ্কটের সময়ে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে কোন উপদ্রব ঘটে নাই। তৎকালে নিজাম সমস্ত ভারতবর্ষীয় নরপতি অপেক্ষা প্রভুশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। মিয়ুটিনির প্রারম্ভে তদীয় রাজ্যস্থিত অনেকানেক মুষলমান ওমরা ও যোধগণ ধর্ম্মবিদ্বেষী ইংরাজজাতির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার নিমিত্ত চক্রান্ত করত নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। যদি হায়দারাবাদের অধিপতি কোম্পানির প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিতেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ দাক্ষিণাত্যে ঘোরতর উৎপাত উপস্থিত হইত। কিন্তু তিনি প্রধান মন্ত্রী সলাবৎ জঙ্গ বাহাদুরের বুদ্ধি বলে ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গুণে কেবল সমুদয় গোলযোগ নিবারণ করিতে পারিয়াছিলেন এমন নয়, নিজ রাজ্যের রক্ষি সৈন্যকে মধ্য প্রদেশের উপপ্লব শান্তির নিমিত্ত প্রেরণ করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। ভাতবর্ষীয় ভূপালগণ এই বিদ্রোহ কার্য্যে লিপ্ত হন নাই। যে কয়েকজন নরপতির ইংরাজদের প্রতিকূলবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্ষীণবল ও হীনমর্য্যাদ, এবং প্রায়ই কোম্পানি বাহাদুরের বিপক্ষে বৈরনির্যাতনার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সুতরাং ভূপতিগণ সাধারণ্যে তাঁহাদের পক্ষপাতী ও অনুকূলবর্ত্তী হইতে ইচ্ছুক হন নাই।

সেন্ধিয়া, হুলকার, পাতিয়ালা, ঝিণ্ডি এবং নেপালের ভূপালেরা ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের কিরূপ আনুকূল্য করিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে; এস্থলে ইহা উল্লেখ করা উচিত যে রেওয়া, জয়পুর, কর্ণল, কাশী, চিকারী প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিরাও মিয়ুটিনি নিবারণার্থ যথোচিত সাহায্য করেন। ভূপালের কোম ও কোটার রাজা ইংরাজদিগের অনুকূলবর্ত্তী হওয়াতে তাঁহাদের যোধগণ বিগড়িয়া উঠে এবং তাঁহাদিগকে ঘোর বিপদে ফেলে। কিন্তু অবশেষে তাঁহারা ইংরাজ সৈন্যের সাহায্যে অপরক্ত সৈনিকগণকে পর্য্যুদস্ত করিয়া স্বস্ব রাজ্যে শান্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হন।

তৎকালে অনেক নরপাল কোম্পানির নামে আপীল করিবার নিমিত্ত লণ্ডননগরে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা মিয়ুটিনি বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্র সমস্ত পূর্ব্বাপকার বিস্মরণ পূর্ব্বক সত্বর সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং বিদ্রোহ শান্তির নিমিত্ত যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এই কথাটি সমর্থন করিবার জন্য সৌরাষ্ট্রের নবাব ও ক্ষীরপুরের আমীরের নাম নির্দ্দেশ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। অধিক কি, যে সুকল সর্দ্দার কোম্পানি কর্ত্তৃক অন্যায়পূর্ব্বক অপকৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রসন্ন মনে এই মহাব্যসন হইতে কোম্পানির আধিপত্য উদ্ধার করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। ভাওনগরের ঠাকুর এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্থল।

পাঁচ শত পদাতি ও পাঁচ শত অশ্ব সৈন্য নিজ ব্যয়ে সুসজ্জিত করিয়া ইংরাজ সেনাপতির অধীনে অবস্থাপিত করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু সরকার বাহাদুর তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না। গবর্ণমেণ্টের এই অবিশ্বাসসূচক আদেশ নিবন্ধন অন্যান্য ভূপতিরা নিরস্ত হইয়া রহিলেন, এবং নিগড়বদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া নিতান্ত খিন্ন মনে দূর হইতে বিদ্রোহীদের উপদ্রব সকল দেখিতে লাগিলেন।

সর হিয়ু রোজ মধ্য ভারতবর্ষস্থ সমস্ত সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া ১৮৫৭ অব্দের ১৫ই ডিসেম্বর ইন্দোর নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং কালব্যাজ না করিয়া ভূপাল ও বিদিশা দিয়া রাতগড়ে পৌঁছিলেন। রাতগড়ের সুদৃঢ় কেল্লা এক দল বিদ্রোহীর হস্তে পতিত হইয়াছিল। সেনাপতি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক সাগর নগরের অভিমুখে অভিযান করিলেন। অবিলম্বে এক পল্টন ফৌজ মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। অনন্তর সর হিয়ু বিন্ধ্যপর্ব্বতের অভ্যন্তর দিয়া অতি দুর্গম বর্ত্ম সকল অতিক্রম পূর্ব্বক ঝান্সি নগরীতে উপস্থিত হইলেন। ঝান্সির রাণী এ পর্য্যন্ত নিশ্চিন্তা ছিলেন না। তিনি প্রায় বার হাজার ফৌজ সংগ্রহ পূর্ব্বক অরির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজ সেনাপতি উক্ত নগর অবরোধ করিলেন, এবং উহার অধিকারার্থ বিপুল পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ৩১ মার্চ তারিখে এই সম্বাদ পাইলেন যে গোয়ালিয়রের বিদ্রোহী সৈন্য তাণ্টিয়া টোপী নামক সেনানী কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া রাণীর সাহায্যার্থ আগমন করিতেছে। সর হিয়ু রোজ কিছুতেই বিচলিত না হইয়া অবরোধী সৈন্য হইতে ১২০০ যোদ্ধা সমভিব্যাহারে লইয়া বেতোয়া নদীর তীরে এই নবাগত শত্রুর সম্মুখীন হইলেন, এবং দুর্দ্ধর্ষ বিক্রম প্রকটন পূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ফেলিলেন। এই জয়ের পাঁচ দিন পরে ৬ই এপ্রিল তারিখে ঝান্সিনগর ইংরাজদের হস্তে পতিত হইল। কিন্তু বীর্য্যবতী রাজমহিষী স্বপক্ষীয় অধিকাংশ যোদ্ধা সমভিব্যাহারে লইয়া অক্ষত শরীরে যথেষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর ইংরাজ সেনাপতি ঝান্সিতে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া শত্রুর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ২২ মে তারিখে কাল্পীর অদূরে গলোলি নামক গ্রামে দুই দলে সাক্ষাৎ হইল। এক ঘোরতর সংগ্রামের পর বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া ইতস্ততঃ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। অবিলম্বে প্রভূত অস্ত্র শস্ত্র যুদ্ধসামগ্রী ও লুণ্ঠিতদ্রব্যের সহিত কাল্পী নগর বিজয়ী সেনার হস্তগত হইল। অধুনা সর হিয়ুরোজ মনে করিলেন, যে সংগ্রামের অবসান হইল; অতএব স্বাস্থ্য পোষণের জন্য শীঘ্র জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিতে হইবেক। এমন সময়ে সম্বাদ আসিল যে ঝান্সির রাজ্ঞী অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায় সহ-

কারে নষ্টাবশিষ্ট সৈন্য সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক সেন্ধিয়াকে পরাজয় করিয়া গোয়ালিয়র নগর অধিকার করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং ইংরাজসেনাপতিকে পুনর্ব্বার বদ্ধপরিকর হইতে হইল। তিনি কাল-ব্যাজ না করিয়া উক্ত নগরের অভিমুখে অভিযান করিলেন। বিদ্রোহীরা মরিয়া হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিল। তাণ্টিয়া-টোপী প্রভৃতি অধিনায়কগণ নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া ইতিপূর্ব্বেই রণাঙ্গন হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই মহাবীর্য্যবতী রাজমহিষী পুরুষবেশ ধারণ পূর্ব্বক এক বিপুল তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া এবং কতিপয় সাহসিক সহচরে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন এবং অসামান্য নৈপুণ্য অধ্যবসায় ও সাহস প্রকাশ পূর্ব্বক সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধারণে ব্যাপৃত হইলেন! যাহা হউক পরিশেষে ইংরাজ যোধগণ সমুদায় বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক গোয়ালিয়রের দুর্গ অধিকার করিয়া লইল। সেই সাপটে বহুসংখ্যক বিদ্রোহী ভূতলশায়ী হইল এবং স্বয়ং মহারাণীও জয়াশার সহিত জীবনযাত্রা বিসর্জ্জন করিলেন। সংগ্রামের পরদিন ১৮৫৮ অব্দের ২০শে জুন তারিখে মহারাজ সেন্ধিয়া সেনাপতি কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পৈতৃক সিংহাসনে পুনর্ব্বার অধিরোহণ করিলেন। এইরূপে সেই অতি ভয়ঙ্কর মিয়ুটিনির অবসান হইল, এবং ভারতসাম্রাজ্যে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই মহোৎপাতের সময় লার্ড ক্যানিঙ ও তাঁহার অধীনস্থ অনেকানেক রাজপুরুষ যেরূপ ধৈর্য্য, কৌশল, সাহস ও অধ্যবসায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার যথোচিত স্তুতিবাদ করা সুকঠিন। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিগণ বরাবর ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের অনুকূল; বিশেষতঃ রাজা রাধাকান্ত, প্রতাপ নারায়ণ সিংহ বাহাদুর, বর্দ্ধমানের অধীশ্বর ও নবদ্বীপের অধিপতি প্রভৃতি বঙ্গ সমাজের ধুরন্ধরগণ সিপাহি মিয়ুটিনির প্রতিকূলে ঘোরতর বিদ্বেষ ও ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অচলা ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিনন্দন পত্র সকল ভারতসাম্রাজ্যের নানাবিভাগে প্রচারিত হইয়া লোকের মন হইতে বৃথা আশঙ্কা অপনয়ন করিয়া দিয়াছিল। ইত্যাদি কারণে অজ্ঞ বিদ্রোহিগণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থিত বাঙ্গালিদের দারুণ দুরবস্থা করে। তৎকালে কত বঙ্গবাসী ভদ্রসন্তান যে তাহাদের কোপে নিধনপ্রাপ্ত, সর্ব্বস্বান্ত ও বিকলাঙ্গ হন, তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর। এদিগে ইংরাজ রাজপুরুষেরা নিজ পৌরুষ প্রভাবে শত্রুকে পরাজয় করিয়া যেরূপ ভয়ঙ্কর বৈরনির্যাতন করিয়াছিলেন, উহা স্মৃতিপথে উদিত হইলে শরীর লোমাঞ্চিত ও হৃদয় কম্পিত হয়। যাহারা সশস্ত্র ধৃত অথবা নরহত্যাপরাধে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে সাংগ্রামিক আইন অনুসারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা ন্যায়বিরুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু

যে কোন ব্যক্তির কথানুসারে লোককে কারাগারে নিক্ষেপ করা ও সাংগ্রামিক আদালতের * বিচারাধীন করা নিতান্ত দূষণীয়। তৎকালে যে কতশত নিরপ-রাধ প্রজালোক নরশোণিতলোভী নরা-কার রাক্ষসগণের বৈরনির্যাতনস্পৃহা চরি-তার্থ করিবার জন্য বিনা অনুসন্ধানে ও বিনা বিচারে কালকবলে নিহিত হইয়া-ছিল উহার নির্ণয় করা দুষ্কর। একজন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "এইরূপে যে শো-ণিতরাশির বর্ষণ হইয়াছে উহা গঙ্গার জলেও বিধৌত হইবে না এবং যুগ-যুগান্তরেও লোকের মন হইতে অন্তর্হিত হইবার নহে"। লার্ড ক্যানিঙ, তাঁহার মন্ত্রি-গণ এবং উচ্চশ্রেণিস্থ ইউয়ুরোপীয় সমাজ নিরর্থক নরশোণিত বর্ষণ না করিয়া যাহাতে ন্যায়ানুসারে বিচার হয়, এবং নিরপরাধ প্রজালোক বিদ্রোহীদের সহিত নির্ব্বিশেষ নিধন প্রাপ্ত না হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন-বান্ ছিলেন। কিন্তু নিম্নশ্রেণিস্থ এক দল নিষ্ঠুর নীচাশয় ইংরাজের কুহকে ও মিথ্যা-পবাদে কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গবর্ণমেণ্ট তৎকালে এমন অনেক আইন প্রচার করেন, যে তদ্দ্বারা কিছুকালের জন্য সমাজস্থিতি উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং হত-ভাগ্য প্রজাবর্গের সুখ স্বচ্ছন্দ, মান সম্ভ্রম ও সহায় সম্পত্তি বিষম সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। এই সকল আইনের প্রত্যেক অক্ষর নরশোণিতরুধিরে লিখিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথাপি উক্ত নষ্টমতি সাহেবগণ অকুণ্ঠিতচিত্তে ও মুক্তকণ্ঠে ইহা রটাইয়া দিয়াছে, যে বাঙ্গালিরা গবর্ণমেণ্টের পরম শত্রু; তাহাদের রাজভক্তি কেবল মুখে, কার্য্যে প্রকাশ পায় না; এবং লার্ড ক্যানিঙ বৃথা দয়া ও পক্ষপাতিতা দোষে অন্ধ হইয়া এদেশীয় লোকের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে-ছেন কিন্তু ইয়ুরোপীয়দিগের ক্ষতি পূরণ ও ক্লেশাপনোদন বিষয়ে তাদৃশ যত্নবান্ নহেন।

এখন নানা সাহেব কোথায়? রাজ-পুরুষগণ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়াছেন, এবং কতবার কত নানা সাহেবকে ধরিয়া মহা উল্লাস করিয়াছেন, কিন্তু অবিলম্বেই বুঝিতে পারি-য়াছেন, তাহারা জাল নানা সাহেব, প্রকৃত নানা সাহেবকে বাঁচাইবার জন্য অনুসন্ধান-কারীদিগকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইছে। যাহাহউক অধুনা এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, ধুন্দুপন্থ নেপালপতির আতিথ্যচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিরাপদে অবস্থিতি করিতেছেন। দিল্লীশ্বরের কি হইল! সকলে শুনিয়া বিস্মিত ও ব্যথিত হইবেন, যে বাব-রের বংশধর এতদিনের পর দিল্লী হইতে নিষ্কাশিত হইয়া রেঙ্গুণে নির্ব্বাসিত হইয়া-ছেন এবং তাঁহার গুজরানের জন্য দশ টাকা মাত্র মসহারা নির্দ্ধারিত করাতে তাঁহার দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। এস্থলে ইহাও নির্দ্দেশ করা উচিত যে, খাঁবাহাদুর ধৃত হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন

* সাংগ্রামিক আদালত—সৈনিকও বিদ্রোহীদিগের বিচারার্থ—কিছুকালের জন্য স্থাপিত হয়। ইহা অন্যান্য বিচারালয়ের ন্যায় নিয়মাধীন ও প্রমাণপরতন্ত্র নয়।

লক্ষ্ণৌনগর অধিকারের পর লর্ড ক্যানিঙ এক ঘোষণাপাত্র প্রচার করিয়া দেন—উহার মর্ম্ম এই—"অযোধ্যাবাসী প্রজা-লোক ও জমিদারগণ বিদ্রোহীদের সহযোগী হইয়া অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। কেবল রাজা দিগ্বিজয় সিংহ প্রভৃতি ছয় জন ভূস্বামী গবর্ণমেণ্টের অনুকূলবর্ত্তী আছেন। অতএব এই ছয়জন ভিন্ন অযোধ্যার সমুদায় জমিদার ও তালুকদার নিজ নিজ স্বত্বাধিকার হইতে চ্যুত হইবেন। যাঁহারা কালব্যাজ না করিয়া প্রধান কমিষণর সাহেবের নিকট আত্ম সমর্পন করিবেক; যদি তাহারা নরহত্যাপরাধে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে গবর্ণরজেনেরল বাহাদুর তাহাদের জীবন ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন অঙ্গীকার করিতেছেন। যাহারা দেশে শান্তি স্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রধান কমিষণর সাহেবের সহায়তা করিতে সত্বর অগ্রসর হইবেক, তাহাদের প্রতি শ্রীযুক্ত গবর্ণরজেনেরেল উদারতার সহিত ব্যবহার করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন ইংরাজ রমণীর নিধন কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছে সে যেমন কদাপি ক্ষমাভাজন হইবেক না, যে ব্যক্তি কোন বিপন্ন ইংরাজের জীবন রক্ষা করিয়াছে সে তেমনি কারুণ্য ও অনুগ্রহের পাত্র হইবেক"।

অনেকে ভাবিয়াছিল যে এই ঘোষণা পত্র প্রচার হইলেই বৈরানল নির্ব্বাপিত না হইয়া, আরও প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠিবেক। কিন্তু এ আশঙ্কা অমূলক; কারণ উহার অব্যবহিত পরেই মানসিংহ প্রভৃতি জমিদারগণ আসিয়া আত্ম সমর্পণ করিলেন এবং সর্ব্বত্র শান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে লাগিল। মিয়ুটিনির উপক্রম হইতেই ভারতরাজ্যের শাসন-কার্য্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে গ্রহণ করিবার জন্য নানা অন্দোলন চলিতে ছিল; পরিশেষে ১৮৫৮ অব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে পার্লিয়ামেণ্ট মহা-সভা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য একটি আইন পাশ করিলেন। তদনুসারে শ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়া ভারতভূমির রাজ্য-তন্ত্র নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। অংশি-দার সভা, ডাইরেক্টর সভা, ও অনুশাসনী সভা এককালে উঠিয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে একজন বিপুল ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজপুরুষ সেক্রেটরি অব ষ্টেট উপাধি ধারণ করিয়া কতিপয় অমাত্যের সহিত ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে দীক্ষিত হইলেন। নবেম্বর মাসের প্রথম দিবসে গবর্ণরজেনেরেল বাহাদুর এলাহাবাদ নগরে ইংলণ্ডেশ্বরীর ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়া দিলেন উহার মর্ম্ম এই ভারতবর্ষের রাজ্যভার স্বহস্তে ও সাক্ষাৎসম্বন্ধে গ্রহণপূর্ব্বক আমরা * এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ভারতবর্ষীয় ভূপতিগণ কোম্পানি বাহাদুরের সহিত যে সকল সন্ধি ও বন্দোবস্ত করি-

* আমরা—অস্মদ্ শব্দ রাজ্যের অধিপতি বা রাজ্যের অধীশ্বরীর বাচক হইলে, বহুবচনান্ত হয়।

য়াছেন, তাহা চিরকালের জন্য অক্ষত থাকিবেক; আমরা অন্যদীয় অধিকার আত্মসাৎ করিয়া নিজ রাজ্যের উপচয় করিতে ইচ্ছুক নহি, কিন্তু যদি কেহ আততায়ী হইয়া অস্মদীয় অধিকার আক্রমণ করে, উহা কদাপি সহ্য করিব না। যদিও খৃষ্টীয়ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা আছে, তথাপি প্রজালোকের ধর্ম্মের উপর কদাপি হস্তক্ষেপ করিব না; এবং ইহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছি, যে সকল রাজকর্ম্মচারী প্রজাপুঞ্জের শাস্ত্রোদিত কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবেন, তাঁহারা আমাদের যৎপরোনাস্তি বিরাগের পাত্র হইবেন। আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে সকলে সমভাবে ও বিনা পক্ষপাতে আইনের আশ্রয় হইতে অধিকারী হইবেক, এবং বিদ্যা যোগ্যতা ও চরিত্র অনুসারে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেক। জাতিভেদ বা ধর্ম্মভেদ নিবন্ধন তদ্বিষয়ে কোন ইতর বিশেষ হইবেক না। আমরা অবগত আছি যে ভারতবর্ষীয় লোকেরা পৈতৃক ভূসম্পত্তির মহা গৌরব করে; অতএব যথাযোগ্য রাজস্ব পাইয়া তাহাদের সমুদয় স্বত্বাধিকার বজায় রাখিতে প্রস্তুত আছি; এবং ইহাও সত্য করিতেছি যে কি বিধিব্যবস্থা-সঙ্কলন কি রাজ্যশাসন উভয় বিষয়েই ভারতবর্ষীয়দিগের চিরাগত স্বত্বাধিকার আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির বিরুদ্ধে কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান হইবেক না।

বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত।*

স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির পরস্পর মিলন এবং সেই মিলনের ফলস্বরূপ সন্ততি সমাজগৃহের মূলভিত্তি। এই মিলনের নাম বিবাহ। এই মিলনসমদ্ধ পুরুষ—স্বামী ও স্ত্রী—ভার্য্যা বা স্ত্রী নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। যে সকল নিয়মাবলী দ্বারা এই বিবাহ সংযমিত হয় তাহা সম্পূর্ণ লৌকিক। লৌকিক না হইলে কখন ইহা এত পরিবর্ত্তনশীল হইত না। লৌকিক না হইলে বিভিন্ন দেশের শাস্ত্রকারেরা বিভিন্ন কালে স্ব স্ব ইচ্ছামত এতৎসম্বন্ধে বিভিন্নপ্রকার নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত করিতে পারিতেন না। এই নিয়মাবলী দৈব হইলে আদি মনুষ্য হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহা সকল দেশে সকল সময়ে একভাবে চলিয়া আসিত। কিন্তু জগতে আমরা ইহার বৈপরীত্যই উপলক্ষিত করিয়া থাকি। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত জগতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, যে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর সম্বন্ধ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। আদি কালে বিবাহের কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না। যে পুরু-

* শ্রীঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

ষের যে রমণীকে লইয়া যতক্ষণ বা যত দিন থাকিতে ইচ্ছা হইত, তিনি ততক্ষণ বা ততদিন থাকিতে পারিতেন। ক্রমে বিবাহের প্রথা চিরস্থায়িনী হইয়া উঠিল। কিন্তু বিবাহপ্রথা চিরস্থায়িনী হইয়াও, বিভিন্ন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিভিন্ন কালে বিভিন্ন বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে। কোন দেশে এক স্ত্রী দ্বি বা বহুপতিকে বিবাহ করিতে পারেন, কোন দেশে এক পতি দ্বি বা বহু স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারেন, কোন দেশে বা এক পতি একমাত্র ভার্য্যার পাণিগ্রহণ, করিতে পারেন। হিন্দু ও মুষলমানদিগের মধ্যে পুরুষের বহুভার্য্যার পাণিগ্রহণ, তিব্বতীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে এক ভার্য্যার বহুপতি গ্রহণ, এবং খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে এক পতির একমাত্র ভার্য্যা গ্রহণ প্রচলিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও নানা দেশে নানা প্রকার বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে; এবং বিবাহ বিষয়ে প্রতিদিন নূতন নূতন মতের উদ্ভাবনা হইতেছে। কেহ বা বিবাহকে ধর্ম্মমূলক, কেহবা প্রেমমূলক, এবং কেহবা ইন্দ্রিয়মূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। কোন স্থানে চিরবিবাহপ্রণালীর পরিবর্ত্তে ইচ্ছাসংসর্গের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, কোন স্থানে চিরপ্রচলিত বহুবিবাহকে উঠাইবার চেষ্টা হইতেছে, কোন স্থানে বা বহুবিবাহকে নবপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। এক দেশে যাহা ভাল বলিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, আর এক দেশে তাহা অনিষ্টকর ও অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। একদেশেরও আবার ভিন্ন ভিন্ন লোকের এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত। ঘাত প্রতিঘাতে হিন্দুসমাজে ঘোরতর তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে। এ তরঙ্গের বেগ কে রোধ করিতে পারে? এরূপ ভাব অস্বাভাবিক নহে। মানবজাতির মন স্বভাবতঃ পরিবর্ত্তনশীল। ইহা চিরকাল কখন একভাবে থাকিতে পারে না। স্থিরতা ইহার মৃত্যু। যেমন সরোবরের জল স্থির বলিয়া শীঘ্র দূষিত ও কলুষিত হয়, সেইরূপ মানবমন ও মানবমনঃকল্পিত নিয়মাবলীও অধিক দিন স্থিরভাবে থাকিলে নিশ্চয়ই দূষিত ও কলুষিত হইবে। পরিবর্ত্তন মানবমনের জীবন। পরিবর্ত্তনই ইহার উন্নতি। যে সময় হইতে হিন্দু সমাজে এই পরিবর্ত্তন রহিত হইয়াছে, যে সময় হইতে ঋষিদিগের বাক্য অখণ্ডনীয় বেদবাক্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, সেই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুসমাজের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। ঋক্‌বেদের সময় হইতে মনুর সময় পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতীতি হয়। সেই সময়েই আর্য্য জাতির গৌরবরবির মধ্যাহ্ন কাল। ক্রমে পরিবর্ত্তন রহিত হইল, আর্য্যজাতিও ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। নিশ্চেষ্টতা তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা হইয়া উঠিল। নিশ্চেষ্টতাই তাঁহাদিগের স্বর্গ ও মোক্ষ বলিয়া চতুর্দ্দিকে উদ্ঘোষিত হইতে লাগিল। এইরূপে

আর্য্যজাতি কিছুকাল নিদ্রায় অভিভূত ও বিহ্বল হইয়া ছিলেন। এক্ষণে প্রতীচ্য জ্ঞানসূর্য্য উদিত হইয়া আর্য্যজাতির সেই নিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছে। আর্য্যজাতি নব জীবন প্রাপ্ত হইয়া নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছে। এ সুখের সময় গ্রন্থকার কেন এত বিষণ্ণ হইতেছেন?

মনুষ যে অবস্থায় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেই অবস্থাতেই বসুন্ধরার কুক্ষিস্থ হইতে পারে না। যে পারে সে মানুষ নয়। সে নরাকার জড়পিণ্ড। আমরা এরূপ লোকের অস্তিত্ব গ্রাহ্যই করি না। যাঁহার জীবনে যে পরিমাণে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে বড় লোক। পরিবর্ত্তনে অনেক সময় অনেক অমঙ্গল সংঘটিত হয় সত্য; কিন্তু পরিবর্ত্তন—শৌর্য্য, সাহস, সজীবতা, দুঃখসহিষ্ণুতা প্রভৃতি যে সকল অসংখ্য মানসিক গুণের উদ্ভাবনা করে, তাহাতে যে জগতের অসংখ্য মঙ্গল সংসাধিত হয় তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ফরাশিবিপ্লব নররুধিরতরঙ্গে ভূমণ্ডল উক্ষিত করিয়াও যে জগতে নব জীবন সঞ্চারিত করিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবেন? গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে পুনরায় বিবাহিতা বিধবার সন্তান পৌনর্ভবও হইবে না, একবারে ঔরস পুত্র তুল্য গণ্য হইবে; তাঁহার মতে পুনর্ব্বিবাহার্থিনী বিধবার বয়সেরও কোন নিয়ম নাই। কোন ব্রাহ্মের যত্নে নূতন এক বিবাহব্যবস্থা হইল, তাহা জাতিনির্ব্বিশেষ হইল, তাহাতে কন্যা বরের বয়সের যোগ্যাযোগ্যতারও নিরূপণ রহিল না—বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীর ও বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিবার বাধা ত্যাগ হইল।

গ্রন্থকারের জানা উচিত ছিল যে এ সকল পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা সর্ব্বত্র অনুভূত না হইলে কোন ব্যক্তিবিশেষের যত্নে কখন এরূপ গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারিত না।

"বিধবাবিবাহের কি গরলময় ফল উৎপন্ন হয়, গত ১৮ই মার্চের ইণ্ডিয়ান্ মিরার তাহার দুইটী বাস্তব ঘটনার উদাহরণ দিয়া বঙ্গদর্শনের মধুমতিকে বঙ্গবাসীদিগের হৃদয়ে পুনঃ প্রদর্শিত করিয়াছেন"।

দুইটী বাস্তব ঘটনায় বিধবাবিবাহের গরলময় ফল উৎপন্ন হইতে দেখিয়া গ্রন্থকার একেবারে বিধবাবিবাহকে অনিষ্টোৎপাদক মনে করিয়াছেন। কি গভীর যুক্তি!

"কিন্তু এক্ষণে আনন্দ সহকারে দেখিতেছি, সে দিন গিয়াছে; ঝড় থামিয়াছে; স্রোতও ফিরিয়াছে। * * * * কিন্তু আমার হৃদয়ে আশঙ্কার অধিকার অধিক। আমি ভয় করি, আবার এই স্রোত বিপরীত দিকে যাইবে। কে বলিতে পারে, যাইবে না?"

আমরা গ্রন্থকারকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে এই স্রোত প্রকৃতির নিয়মানুসারে আবার বিপরীত দিকে যাইবে, কেহই ইহার গতি রোধ করিতে পারিবে

না। স্রোতের গতিপরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তিনি যেন প্রত্যেক পরিবর্ত্তনে পরলোকের অভিলাষী না হন।

আমরা স্থানাভাবে এই খণ্ডে শুদ্ধ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা, অবশ্যম্ভাবিতা ও অনিবার্য্যতা মাত্র বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। পরখণ্ডে "বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত" সকলের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমাদিগের বিশ্বাস এই যে পৃথিবীতে বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে যত প্রকার মত প্রচলিত আছে তন্মধ্যে মনুর ও মহম্মদের মত সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। মনুর মতে যে অনেক দোষ ও অভাব নাই এ কথা আমরা বলিনা। কারণ মনুষ্যকৃত নিয়মাবলী দোষস্পর্শশূন্য হইতে পারে না ইহা আমাদিগের পূর্ণ বিশ্বাস। এই দোষগুলির দূরীকরণ ও অভাবগুলির পরিপূরণ করিলে বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মতগুলি সভ্যজগতে যে অতি উপাদেয় দ্রব্য হইবে তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ইহাকে সর্ব্বাবয়বে বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত করিবার চেষ্টা উন্মত্ততা মাত্র। তবে ইহার যে অবয়বগুলির বর্ত্তমান সময়ে প্রচলন আবশ্যক আমরা কেবল তাহারই মীমাংসা করিব।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

জীবনরক্ষক। সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত। নূতন ভারতযন্ত্রে মুদ্রিত। হস্তমৈথুন বা অনৈসর্গিক উপায়ে রেতঃপাতনে মনুষ্যের যে সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সংঘটিত হয়, সেই সকলের বর্ণন দ্বারা বাল ও যুবকবৃন্দকে সর্ব্বসংহারকারি হস্তমৈথুনের হস্ত হইতে মুক্ত করা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য। অনেক শান্তশীল সচ্চরিত্র যুবক—যাঁহারা বেশ্যাগমন নরক গমনের সদৃশ মনে করেন—এই ভীষণ অভ্যাসের দাস হইয়া জন্মের মত আত্মসুখে জলাঞ্জলি দেন। সেই সকল যুবক যদি সময়ে জানিতে পারেন যে হস্তমৈথুন বেশ্যাগমন অপেক্ষা সহস্র গুণে গুরুতর পাপ তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই ইহা হইতে বিরত হইতে পাবেন। বালক ও যুবকবৃন্দ যখন প্রথমে এই ভীষণ অভ্যাসের দাস হয়, তখন তাহারা মনে করে ইহা একটী নির্দোষ আমোদ মাত্র। এই সময় যদি তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া যায় যে এই আমোদ হইতে তাহাদিগের ভাবি সুখের আশা সমূলে উন্মূলিত হইবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা এই কুঅভ্যাসের অনুসরণ হইতে বিরত হইবে। পিতা মাতা বা অভিভাবকগণ যদি নিজ মুখে এই সকল কথা বলিতে লজ্জা বোধ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অধীন বালক ও যুবক বৃন্দের হস্তে ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার জীবনরক্ষক অর্পণ করিয়া তাহাদিগকে ঘোরতর ভাবি দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবেন। এই কর্ত্তব্যের অকরণে তাঁহারা জগতের শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

বঙ্গবামার ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা।

কুক্ষণে বঙ্গবালা জন্ম পরিগ্রহ করে। পুত্রসন্তান জন্ম পরিগ্রহ করিলে সকল পুরজনেই প্রফুল্লিত হয়েন, কিন্তু কন্যা জন্মিলে সকলেরই মুখ মলিন হয়। প্রসূতিও বিষণ্ণা হয়েন, জনকেরও মুখ ম্লান হইয়া যায়। কন্যার জন্মের সঙ্গে পিতার মনে শত ভাবনা উপস্থিত হয়। বঙ্গকামিনীর সমস্ত দুর্দ্দশা যেন তাঁহার হৃদয়াকাশে একদা চিত্রিত হয়। তিনি নিজ কন্যার পক্ষে সকলই সম্ভাবিত জ্ঞান করেন। তাঁহার মস্তকোপরি বিনামেঘে বজ্রাঘাত হয়। পৌরজন বলিয়া উঠে "একটা মেয়ে হয়েছে।" আত্মীয় ও প্রতিবেশিনীগণ মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যান। বর্ষীয়সীগণ তামাসা করিয়া জনককে বলিতে থাকে "টাকার সম্বল কর।" জনক সে কথায় হয় তো হাসিয়া উঠেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইয়াছে। জননী পূর্ব্বে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন—আমার কখন কন্যা হইবে না, কন্যা হইলে তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিব। এখন তিনি সেই কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন। স্বাভাবিক স্নেহ বশতঃ এবং লোকলজ্জাভয়ে তিনি কিছু করিতে বা বলিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে তাঁহার অনাদর জন্মিল। মাসকলায়ে পোকা ধরে না বলিয়া তিনি সূতিকা গৃহেই শিশু সন্ততির প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রকৃতির হস্তে যতদূর হয়, শিশুকন্যার পুষ্টিসাধন হইতে লাগিল। যাহার প্রতি জনক জননীর অনাদর, তাহাকে অন্য কে যত্ন করিবে?

কন্যার প্রতি জনক জননীর এ প্রকার ভাবের কারণ, আমাদিগের স্ত্রীজাতির দুরবস্থা। বাস্তবিক স্ত্রীজাতির অবস্থা আজিও কোন সভ্য সমাজে প্রকৃষ্ট রূপে উন্নত হয় নাই। সকল সমাজেই পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতির অবস্থা হীনতর। এই হীনতা সমাজ বিশেষে কেবল ন্যূনাধিক রূপে অবস্থান করিতেছে মাত্র। নতুবা কোন সমাজে আজিও এই হীনতা একেবারে অপনীত হয় নাই। অপনীত হইবার বড় উদ্যোগও নাই। কেবল বঙ্গদেশে কেন, সকল সভ্য সমাজেই, কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তানের জন্মগ্রহণ অধিকতর আদরণীয় হয়। যে সমাজে স্ত্রীজাতির যে পরিমাণে দুর্দ্দশা সে দেশে সেই পরিমাণে তাহার প্রতি অনাদর। কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করিলে সকল সমাজেই ন্যূনাধিক রূপে আহ্লাদের পরিবর্ত্তে বিষণ্ণতার চিহ্ন উপলক্ষিত হয়। যে সমস্ত জাতি সভ্যতম বলিয়া ভান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরও মধ্যে স্ত্রীজাতির সম্যক্ উন্নতি

সাধিত হয় নাই বলিয়া এই বিসন্নভাবের অভাব দৃষ্ট হয় না। বঙ্গদেশে এরূপ ভাব লক্ষিত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

এই দুর্দ্দশার কারণানুসন্ধান করিলে প্রতীত হইবে যে পুরুষজাতি সম্বন্ধে স্ত্রী-জাতির অধীনতাই ইহার মূল। পৃথিবীর ইতিবৃত্তে প্রকাশিত হয় যে পুরুষজাতিই আবহমান কাল প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে। কি সমাজ, কি ব্যবহার, কি রাজকার্য্য সকল বিষয়ে পুরুষজাতিই প্রভু। পুরুষজাতির প্রবলতা হেতু স্ত্রী-জাতির অধীনতা সংঘটিত হইয়াছে। সমাজে যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে, দেশে যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে, এবং স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদিগের যে সমস্ত ভাব হৃদয়ে অঙ্কিত আছে, সে সমস্ত পরীক্ষা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে তৎসমস্তেরই মূলে এই অধীনতার ভাব নিহিত আছে। সে সমুদায় ব্যবস্থা, আচার, ব্যবহার ও রীতি কেবল পুরুষজাতি কর্ত্তৃক সংরচিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা স্ত্রীজাতিকে ক্রমশঃ কঠিনতর অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হইয়াছে। কেবল পুরুষজাতির অধিকতর সুখ সমৃদ্ধির জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। তৎসমস্ত পুরুষজাতির যতদূর পক্ষপাতী স্ত্রীজাতির ততদুর নহে। পুরুষজাতির স্বার্থ ও প্রয়োজন সাধনোদ্দেশেই ইহাদিগের সৃষ্টি। এজন্য ইহারা স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত হইয়াছে। আবার আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইহাদিগকে ধর্ম্মতঃ বৈধ বলা হয়। কিন্তু কে বলে? যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা তাঁহারাই ইহাদিগকে ধর্ম্মবৈধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"এক্ষণকার স্ত্রী এবং পুরুষজাতি সম্বন্ধীয় নৈতিক সমাজ যে নিশ্চয় ভ্রম-সঙ্কুল তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। স্ত্রীজাতিকে অধীন বিবেচনায় পুরুষজাতি যে সমস্ত স্বার্থপর ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সমস্ত ব্যবস্থার অনুসারে এক্ষণে উভয়জাতীয় সম্বন্ধ নিরূপিত ও পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু স্ত্রীজাতি যখন স্বাধীনভাব ধারণ করিবে, এবং সেই ভাবে যখন পুরুষজাতির ব্যবস্থা সকল পরীক্ষা করিতে সক্ষম হইবে, তখন যে মানবীয় নৈতিক সমাজের কি গণ্ডগোল ঘটিবে কে বলিতে পারে?" স্ত্রীজাতি যখন নিজে নিজে বিচার করিতে শিখিবেন; পুরুষজাতির সহিত যখন তাঁহাদিগের অধিকার, মতামত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচিত ও অবধারিত হইতে থাকিবে; তখন বাস্তবিক পৃথিবীর যে এক যুগান্তর উপস্থিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। তখন স্ত্রী ও পুরুষজাতি সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যপথ, ধর্ম্মের পথ, ও ব্যবস্থা নির্ণীত হইবে। এক্ষণে যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ স্বার্থমূলক। যাহা কেবল স্বার্থের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, সে ব্যবস্থানিয়ম কখন ধর্ম্মবৈধ হইতে পারে না। স্বাধীন স্ত্রী-জাতির সহিত বিচারে এবং বিতণ্ডায় যাহা স্থিরীকৃত হইবে তাহাই নিঃস্বার্থ ও

নৈব। তদ্ভিন্ন স্ত্রী এবং পুরুষজাতীয় ব্যবস্থাবলি কখন স্বার্থপরতা-পরিশূন্য হইতে পারে না। যে ব্যবস্থাবলি যত স্বার্থপরতা-পরিশূন্য তাহাকে তত ধর্ম্মতঃ বিশুদ্ধ বলা যাইতে পারে। এজন্য এক্ষণে যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহা কতদূর ন্যায়ানুগত ও বিশুদ্ধ তাহার স্থিরতা নাই। স্ত্রীজাতির জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রবল না হইলে তাহার স্থিরতার সম্ভাবনাও নাই। পুরুষজাতি সহজে কখন স্ত্রীজাতিকে অধীনতাশৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত করিবে না। মনুষ্যসমাজ যদি কখন স্বার্থশূন্য হয় তবে সেরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা। স্ত্রীজাতির স্বত্ব ও অধিকার লইয়া আজি কাল সভ্যসমাজে ঘোর বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। মিল্, স্পেন্সর, কিঙ্গিস্লে, এবং মরীস্ প্রভৃতি মহোদয়গণ স্ত্রীজাতির পক্ষে ঘোর বিচার উত্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রবল ধ্বনি ক্রমশঃ দিগন্তব্যাপী হইতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যসমাজে এত দিনের পর ও এত কালের জ্ঞানালোচনার পর এক্ষণে পুরুষজাতির সহিত স্ত্রীজাতির বিতণ্ডা ঘটিবার সূত্রপাত মাত্র হইয়াছে। আজিও স্ত্রীজাতির জ্ঞানজ্যোতিঃ নিতান্ত দুর্ব্বল ও ম্লান। ক্রমে যখন এই জ্যোতিঃ প্রবল হইতে থাকিবে তত সমাজ সংস্কৃত ও পরিশুদ্ধ হইয়া আসিবে। ইউরোপ ও আমেরিকার স্ত্রীসমাজে তবু অনেক দূর স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের স্ত্রীসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কেবল অশ্রুপাত করিতে হয়। এখানে কেবল দাসীত্ব ও পশুবৎ আচরণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। সমাজের সহিত স্ত্রীগণের কোন সম্বন্ধ নাই। গৃহে তাহারা পশুর ন্যায় অবস্থান করিতেছে। পুরুষজাতির অধীনতা, সেবা ও শুশ্রূষাই তাহাদিগের ধর্ম্ম ও জীবনের সমুদয় কর্ম্ম। এই উদ্দেশে কি তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে? আহা! তাহাদিগের অবস্থা, কি শোচনীয়! তাহাদিগের জ্ঞানান্ধতা কি গভীর!

অতি শৈশবাবস্থা হইতেই আমরা নারীগণকে পুরুষজাতির অধীনতা শিক্ষা দিই। জনক জননী তাহাদিগকে এরূপে লালন পালন করেন, যেন তাহারা শ্বশুরালয়ে সকলের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া থাকিতে পারে। শিশুকালেই তাহাদিগের সাহস, বিক্রম ও তেজ খর্ব্বীকৃত করা হয়। বাস্তবিক সর্ব্ব বিধায়ে যাহাতে তাহারা পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া শ্বশুরালয়ে আবদ্ধা থাকিবার উপযোগিনী হয়, এরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। সহোদরের নিকট সহোদরা অতি দুর্ব্বল। জনক জননী তাহাদিগকে দুর্ব্বলা করিয়া তুলেন। পুত্র সন্তান অধিকতর প্রশ্রয় পায়। কন্যাগণ অধিকতর সংযমিত হইতে থাকে। শুদ্ধ ইহাই নহে, অতি অল্প বয়স হইতেই ইহারা কুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকে। অতি অল্প বয়স হইতেই বালকগণের সঙ্গ হইতে ইহাদিগকে বিচ্ছিন্না করা হয়। বালিকারা একটী স্বতন্ত্র সমাজ সংগঠিত করে। গৃহিণী অথবা বয়স্কা স্ত্রীগণ ইহা-

দিগকে আদর্শস্বরূপ হয়। এই সময় হইতেই তাহাদিগের চরিত্র কলঙ্কিত হইতে থাকে।

এতদ্দেশে যে বালিকাবিবাহ প্রচলিত আছে, তাহা কোন মতে বিবাহ বলা যাইতে পারে না। কারণ, অজ্ঞানাবস্থায় যাহা কৃত হয় তাহা সিদ্ধ নহে। বালিকাগণ যখন বিবাহ করে তখন তাহারা জানে না আমরা কি করিতেছি। অপরাপর ক্রীড়ার ন্যায় পরিণয়সংস্কারও তখন তাহাদিগের নিকট একটী প্রমোদরূপে প্রতীয়মান হয়। শৈশবাবস্থায় খেলিবার সময় তাহারা আমোদ করিয়া এরূপ কতবার বিবাহ করিয়াছে। প্রকৃত বিবাহ কালে তাহারা ইহার পুনরভিনয় করে মাত্র। কোন ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগের সেই ক্রীড়ার প্রতি যে প্রকার ইচ্ছা থাকে, এই পরিণয়েও তাহাদিগের তদ্রূপ ইচ্ছা ব্যতীত আর অধিক কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। দশ এগার বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তাহাদিগের কোন বিষয়েই চৈতন্য ও বিবেচনা হয় না। সে সময়ে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেও তাহারা তদ্বিরুদ্ধে দ্বিরুক্তি করিতে সমর্থা নহে। সমর্থা হইলেও সাহসিনী নহে। পিতা মাতাও যে তাহাদিগকে সর্ব্ব সময়ে সৎপাত্রে প্রদান করেন এরূপ নহে। তাঁহাদিগকে দেশের রীতি ও আচার ব্যবহারের অধীন হইতে হয়। তাঁহাদিগের অবস্থার উপরও অনেকদূর নির্ভর করে। তাঁহাদিগের প্রকৃতি, লাভালাভ বিবেচনা, শিক্ষা ও রুচির উপরও অনেক পরিমাণে কন্যার বিবাহ নির্ভর করে। পিতা যদি অর্থলোলুপ হন, তাঁহার কন্যার বিবাহ কিরূপে সম্পন্ন হয় তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। পিতা যদি বৃদ্ধ হন তবে হয়তো মনে করেন আমি তো দায়মুক্ত হই, আমাকে অধিককাল কিছুই দেখিতে হইবে না, কন্যার কপালে যা থাকে তাহাই ঘটিবে। এই প্রকার বিবেচনায় ও নিজ অবস্থার সঙ্কীর্ণতা হেতু, কন্যাকে হয়তো চিরদিনের জন্য জলে ভাসাইয়া দেন। যে হতভাগিনী বালিকা আবার পিতৃহীনা তাহার বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার যতদূর সম্ভাবনা তাহা স্মার বলিয়া দিবার আবশ্যক করে না। জীবনের একটী প্রধান কার্য্য বিবাহ——তাহাতেও স্ত্রীজাতি এই প্রকার পরের নিকট সম্পূর্ণ অধীন। বিবাহ ভালই হউক আর মন্দই হউক, বালিকারা জানে না কি হইতেছে। তাহাদিগের তখন বিবেচনার শক্তি নাই, কোন কথা বলিবার শক্তি নাই, বলিলে সে কথা রক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই, কেহ বুঝাইয়া দিলে আপনাদিগের কোন বিহিত ও প্রতিবিধান করিবারও সামর্থ্য নাই। তখন তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের নিতান্ত অধীন। সুতরাং তাহাদিগের এপ্রকার অবস্থায় ও সময়ে বিবাহ দেওয়া যে নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অবৈধ তাহার আর অণুমাত্র সংশয় নাই। দেশের রীতি নীতি ইহাকে বৈধ বলুক, সদ্বিবেচনায় ইহাকে কখন বৈধ বলা যাইতে পারিবে

না। যে কার্য্য স্বকীয় বিবেচনা ও ইচ্ছার অনুমত নহে, যাহাতে আপনার কিছুই আয়ত্তি নাই, পরের নিতান্ত বাধ্য হইয়া যাহা সম্পন্ন করিতে হইতেছে, সে কার্য্যের কি কিছু ধর্ম্মনৈতিক বন্ধন আছে? বালিকাবিবাহের যদি ধর্ম্মনৈতিক কিছু মূল্য থাকে, তবে কোন কার্য্যেরই ধর্ম্মনৈতিক মূল্য নাই। শুদ্ধ পশুবৎ বলপ্রয়োগে যদি কেহ তোমায় কোন গর্হিত অথবা শুভ কার্য্য করায়, তবে সে কার্য্য কি তোমার কৃত বলিবে? না সে কার্য্যে কোন ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম আছে? পরিণতবয়স্কা অনেক রমণী অনুতাপ করেন, কেন পিতা মাতা তাঁহাদিগের সে প্রকার বিবাহ দিয়াছিলেন। অবিবাহিতা হইয়া অথবা বিধবা হইয়া চিরকাল অতিকষ্টে অবস্থান করাও তাঁহাদিগের শ্রেয়স্কর বিবেচিত হয়। কোন হিন্দুনারী যদি বয়স্কা হইয়া এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করেন, যে আমার অজ্ঞানাবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমার যেবিবাহ দিয়াছেন, তাহা আমার জ্ঞানাবস্থায় অনভিমত, অতএব তাহা সিদ্ধ কি অসিদ্ধ? এই প্রশ্নের মীমাংসায় আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, আইনে যাহাই বলুক, বিচারপতি প্রকৃত ব্যবহার-তন্ত্রের উপদেশানুসারে সে বিবাহকে কখন সিদ্ধ বলিবেন না। বাস্তবিক এরূপ বিবাহে যে নারী আবদ্ধ হইয়াছেন, ন্যায়-মতে তিনি পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন। যে হেতু প্রকৃত কল্পে তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হয় নাই। বেদবিৎ দয়ানন্দ স্বরস্বতী কহিয়া গিয়াছেন এপ্রকার বিবাহসংস্কার বেদবিহিত নহে। বৈদিক সময়ে ইহা প্রচলিত ছিল না। ঠিক কোন্ সময়ে ইহা এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হয় তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন। যে সময়েই হউক, ইহা যে ন্যায়ানুমত নহে ও যথার্থ ধর্ম্মবিরুদ্ধ তাহা পুরুষজাতি না হউক জ্ঞানবতী স্ত্রীলোকমাত্রই মুক্তকণ্ঠে উচ্চরবে বলিয়া উঠিবেন। পক্ষপাতশূন্য সদাশয় পুরুষগণও ইহা স্বীকার করিবেন।

কেবল স্বার্থপর পুরুষজাতীয় সাধারণ জনগণ ইহার প্রতিবাদে উদ্যত। তাঁহারা অগ্রসর হইয়া বলিতে আসিবেন, কৃতসংস্কার স্ত্রীগণের পাণিগ্রহণ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা হয় না, তাহাতে ঘৃণা বোধ হয়। অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিলে তাহাদিগের কলঙ্কিতা হইবার সম্ভাবনা। বালিকাবস্থা হইতে গ্রহণ করিলে তাহাদিগের পবিত্রতা সুরক্ষিত হয়। এজন্য তাহাদিগের অল্প বয়সেই বিবাহ হওয়া উচিত।

এই কথাগুলিতে ঘোর স্বার্থপরতা প্রকাশ পাইতেছে। আমরা ভার্য্যাকে নিষ্পাপ ও নির্ম্মলা চাই। আমরা নিজে যা ইচ্ছা তাই হইনা কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। পাপী হই বা নিষ্পাপ হই, বৃদ্ধ হই বা অল্পবয়স্ক হই, আর দুই বা ততোধিক বার দার পরিগ্রহ করিয়া থাকি, আমরা অবশ্য গ্রহণীয়। কিন্তু নারীজাতি দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষ

বয়ঃক্রম অতিক্রম করিলে আর গ্রহণীয়া নহে। কেন নহে, কারণানুসন্ধান করিলে মূলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পুরুষজাতির প্রবৃত্তি নাই এই জন্য। পুরুষজাতি প্রবলজাতি, তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি অবশ্য প্রবলা হইবে. তাঁহাদিগের বাক্যই নিয়ম তাঁহাদিগের ব্যবস্থাই ধর্ম্ম। কি স্বার্থপরতা! ধর্ম্ম কি স্বার্থপরতার প্রতি-বাক্য মাত্র?

বাল্যবিবাহের ফলাফল গণনা করিয়া আমরা তাহার ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা করিতে চাহিনা। সে বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে বিচার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের স্ত্রীজাতির আধুনিক ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা কি তাহা আলোচনা করিতে গেলে প্রতীত হইবে যে পুরুষজাতি তাহাদিগকে যে ঘোর অন্ধ ও জড়ভাবে অবস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন সেই অস্বাভাবিক অবস্থাই তাহাদিগের বৈধ, তদ্বিপরীত অবস্থা অবৈধ বলিয়া সমাজে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এবিষয়ের দ্বিতীয় প্রমাণ আমাদিগের বামাগণের সতীত্ব ধর্ম্ম।

ক্রমশঃ।— শ্রীপূ——

কলঙ্কিনী।

[রূপবতী গণিকার মুখদর্শনে]

১

কেন তুমি হলে ধনি! রূপের সাগর লো
মজিবার তরে!
প্রফুল্ল কুসুম সম, কেন শোভা নিরুপম
ওই বিধুমুখে তোর দিলেন ঈশ্বর লো
বল যদি দেন নি অন্তরে!

২

প্রভাতে ফুটিল ফুল রূপে আলো করেলো
বায়ুভরে দোলে;
কিবা শোভা নিরমল, নিজ রূপে ঢল ঢল
কেন সে কোমল ফুল দয়াহীন নরে লো
রূঢ়হস্তে আসি নিল তুলে।

৩

বাগান করিয়ে আলো সাধের গোলাপ লো
ছিলে নিজ স্থানে,
তুলিত সুসভ্য কেহ, পাইতে উচিত স্নেহ
নিষ্কলঙ্ক রূপে তুমি পাইতেনা তাপ লো
বিহারিতে হায় তার প্রাণে।

৪

কিন্তু সে সৌভাগ্য ধনি! হলোনা তোমারলো
হলোনা তোমার!
হায় হেন সুপ্রভাতে, পড়িলে পাষণ্ড হাতে
অপবিত্র স্পর্শে ধনি! হলি কদাকার লো
হলি কদাকার!

৫

নারীর সতীত্ব ধন সাত-রাজা-ধন লো
জানত সুন্দরি!
তবে কেন কেন হায়! সহজে ছাড়িলি তায়
কেন না রাখিলে প্রাণে করিয়া যতন লো
দস্যুহস্তে কেন দিলি ধরি!

৬

গুণের আধার হয়ে বিকাইলি মান লো
কামুকের হাতে,
রমণী দেবতা জানি, নর হতে শ্রেষ্ঠ মানি
ছিলে তুমি নিজ-মানে দেবতা-সমান লো
এ কলঙ্ক ছিলনা তোমাতে।

৭

কিন্তু কেন পাষণ্ডের কথাতে ভুলিলি লো
নিজে মজাইলি!
খোয়ালি সতীত্ব মান মলিন করিলি প্রাণ
কুল মান ধর্ম্ম সবে জলাঞ্জলি দিলি লো
হায় কেন সব ডুবাইলি!

৮

কি আর বলিব আমি কি সুখের লাগি লো
হলি কলঙ্কিনী?
কেন না আমার ঘরে, এলি বোন্ সমাদরে
রাখিতাম, হতেনাত কলঙ্কের ভাগিলো
কত সুখে থাকিতে ভগিনি!

৯

হায় কি হইল! কেন এমন রতনে রে
মজালে পামর!
একাকিনী পেয়ে তারে, কেন সে জনম তার
দহিতে ফেলিয়া দিল যাতনা-দহনে রে
হতভাগ্য! নির্দ্দয়! বর্ব্বর!

১০

কে বলে মানব তারে পশুর অধম রে
সেই মূঢ় নর!
যে নিজ ইন্দ্রিয় তরে, হেন শোভা ম্লান করে
নারীর সতীত্ব-ফুলে সে যে কীটসম রে,
কীটসম নিকৃষ্ট অন্তর!

শ্রীশিঃ —

বঙ্গদেশের অধিবাসী।

যৎকালে মুসলমান, ইউরোপীয় ও অন্যান্য বিদেশিকেরা বঙ্গদেশে আগমন ও বসতি করেন নাই, সেই সময় যে সকল জাতীয় লোক এতদ্দেশে বাস করিত, তাহাদিগকেই ইহার প্রকৃত অধিবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। সেই সকল জাতীয় লোকেরা কে, এবং কোন্ বংশে উদ্ভূত এই সমস্ত তথ্য সবিশেষ অবগত হইবার জন্য প্রত্যেক বঙ্গবাসীর মনেই স্পৃহার উদয় হওয়া প্রকৃতিসিদ্ধ। আমরা এইরূপ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া মধ্যে মধ্যে এই বিষয় উপলক্ষে অনুসন্ধান করিয়া থাকি. অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগের যেরূপ সংস্কার জন্মে, তাহা সাধারণের গোচর করা বিধেয় বিবেচনা করিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি।

কোন কথা অসঙ্গত বোধ হইলে পাঠক অনুগ্রহপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন আমরা অবশ্যই এরূপ আশা করিতে পারি। বৈদেশিক জাতিদিগের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে দ্বিবিধ স্বতন্ত্র জাতির বসতি ছিল ইতিবৃত্ত পাঠে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হয়। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সম্প্রদায় অপরের উপর আধিপত্য করিত, ইহারাই আর্য্যবংশীয়। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমস্থ কোন ভূভাগ হইতে কালক্রমে ইহারা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। আর্য্যবংশীয়দিগের অধীন দ্বিতীয় সম্প্রদায়ই বাঙ্গালাদেশের আদিম নিবাসী। আর্য্যবংশীয়েরা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমস্থ যে প্রদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল, কালক্রমে উহাদের বংশবৃদ্ধি হওয়াতে তথায় স্থান সমাবেশ হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। সুতরাং তাহাদিগকে অন্যান্য বাসস্থানের অনুসন্ধান করিতে হইল। এইরূপে দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে তাহারা বাঙ্গালাদেশের অভ্যন্তরে উপনীত হইয়া তত্রত্য আদিম নিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের উপর আধিপত্য সংস্থাপন করে। আদিম নিবাসীরা নবাগত আর্য্যবংশীয়দিগের নিকট পরাজিত হইয়া কেহ কেহ তাঁহাদের দাসত্ব করিতে স্বীকৃত হয়, আর কতকগুলি মাতৃভূমি ও বাস্তুবাটীর আশয়ে জলাঞ্জলি দিয়া সন্নিহিত বা দূরস্থ পর্ব্বতে বা গহনে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করে। কত কাল অতীত হইয়াছে, কিন্তু বিজেতা আর্য্যবংশীয় ও পরাজিত আদিমনিবাসীদিগের আচার ব্যবহারাদি ঘটিত ভিন্নভাব ও পরস্পর বিরোধ অদ্যাপি অন্তর্হিত হয় নাই। উপরি-উল্লিখিত ঘটনার পর যুগ যুগান্তর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, বিশেষানভিজ্ঞ বৈদেশিকেরা তত্রত্য আদিমনিবাসীদিগকেও এক ও অভিন্ন বংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন, অনেকে আর্য্যবংশীয়দিগের মধ্যে আচার ব্যবহারাদি ঘটিত এতদূর অন্যোন্যবিরোধ থাকা লজ্জার বিষয় বলিয়া আমাদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি বাঙ্গালার যাবতীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে যে পরস্পরবিরোধ চলিয়া আসিতেছিল তাহা অব্যাহতই রহিয়াছে, কোন ক্রমেই তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে না। বিদেশীয়েরা না বুঝুন, কিন্তু আমরা ইহার নিগূঢ় কারণ কি তাহা স্পষ্টই বুঝিয়াছি। কারণ তাহারা আবহমান কাল হইতে দুই ভিন্ন জাতি। এক জাতির মধ্যে বিদ্বেষ বুদ্ধি হইয়া এরূপ পার্থক্য হইয়াছে, এরূপ কথনই বলা যাইতে পারে না। কলিকাতার সান্নিধ্যবাসী সুসভ্য বাঙ্গালী ও বীরভূমের গহননিবাসী অসভ্য সাস্তাল কথনই একবংশীয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। যদিও এই উভয় জাতি পরস্পর মিশ্রিত হইয়া অভিন্নভাব ধারণ করিলে সমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের একটী

উপায়বুদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু এরূপ হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। সাক্‌সন নরম্যান প্রভৃতি জাতীয়েরা ইংলণ্ড অধিকারপূর্ব্বক কত কাল হইল রাজত্ব করিতেছে, কিন্তু তথাপি ওয়েলস ও স্কটলণ্ডের পার্ব্বতীয় প্রদেশে অদ্যাপি প্রাচীন ব্রিটনজাতির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। আর্য্যবংশীয়েরা তাহাদিগের কর্তৃক পরাজিত আদিমনিবাসীদিগকে যে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিত তাহার সমূহ কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যেরা পরাজিত আদিমনিবাসীদিগের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এমন কি যদি আর্য্যদিগকে মনুষ্যপদবাচ্য বলিয়া স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে অসভ্য আদিমনিবাসীরা পশুর অধম হইয়া পড়ে। সংস্কৃত ভাষায় উক্ত আদিমনিবাসীরা দস্যুনামে অভিহিত। দস্যুজাতীয়েরা সকল বিষয়েই আর্য্যদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। দস্যুদিগের ভাষা অতিশয় কদর্য্য। সংস্কৃতের ন্যায় বিশুদ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাষায় যাহাদের আত্মীয় জ্ঞান আছে, তাহারা সন্তাল, কোল প্রভৃতিদিগের অর্দ্ধ-পরিস্ফুট পশুবাগ্‌বৎ অসভ্য ভাষাকে হেয়জ্ঞান করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? দস্যুদিগের প্রতি আর্য্যদিগের ভয়ানক বিদ্বেষের অপর একটী কারণ উহাদের শরীরের বর্ণগত ভেদ। আর্য্যেরা সুশ্রী, ও শ্বেতকান্তি, দস্যুবংশীয়েরা বিশ্রী ও কৃষ্ণকায়। সুতরাং ইহাদিগের মধ্যে প্রকৃত সৌসাদৃশ্য কিরূপে সম্ভবে? এক্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দের শেষ ভাগ, আজি কালি জগতের অনেক স্থান সভ্যতার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে, কিন্তু যে কারণে শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বের আর্য্যসন্তানেরা হতভাগ্য দস্যুবংশীয়দিগকে ঘৃণা করিতেন, অবিকল সেই কারণে, এক্ষণেও শ্বেতকান্তি ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় মহাপুরুষেরা অত্রত্য ঈষদূন শ্বেতকায় আসিয়াখণ্ডের অধিবাসীদিগকে পশুবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন, যখন সমাজের প্রৌঢ়াবস্থাতেই এরূপ ব্যাপার বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন তদানীন্তন বিজেতা শ্বেতকান্তিরা পরাজিত কৃষ্ণকায়দিগকে যে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতেন ইহাতে কিছুমাত্র বিস্ময়ের কারণ দেখিতে পাওয়া যায়না। দস্যুজাতীয়দিগের জঘন্য আচার ব্যবহার উহাদিগের প্রতি নবাগত আর্য্যদিগের প্রবল বিদ্বেষবুদ্ধির তৃতীয় কারণ। দস্যুদিগের খাদ্যাখাদ্য বিচার ছিল না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অশ্বমাংস ভক্ষণ করিত, কেহ বা নরমাংসলোলুপ ছিল, কেহ বা আমমাংস ভোজন বিলাস মনে করিত, ফলতঃ তাহাদের মাংসভোজন-স্পৃহা এতদূর বলবতী ছিল, যে উহারা যে কোন প্রকার মাংস প্রাপ্ত হইত অবিচারিতচিত্তে তাহাই ভক্ষণ করিত, এইরূপ রাক্ষসবৎ ব্যবহারদর্শনে সুসভ্য নিরামিষাশী আর্য্যসন্তানেরা তাহাদের প্রতি মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ করিত

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আর্য্য ও দস্যুদিগের পরস্পর বিরোধের আর একটী কারণ দস্যুদিগের জঘন্য পৌত্তলিকতা। যৎকালে আর্য্যবংশীয়েরা স্থানাভাববশতঃ উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া স্থানান্তরে আবাসান্বেষণ করিতে বাধ্য হয়, তখন একেশ্বরবাদ ও পরলোকের অস্তিত্ব এই দুই গুরুতর বিষয়েও তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। প্রাচীন আর্য্যেরা মুসলমানদিগের সময় হইতে কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বহুকাল অবধি বিদেশাগত যবন বিজেতৃবর্গের শাসনাধীনে ইহাদিগের সাহস উৎসাহ প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণ ভস্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে, যথার্থ বটে, যবনের উৎপীড়ন প্রভৃতি নানাবিধ কারণে সেই সনাতন বৈদিক তথ্যের বহুবিধ পরিণাম ও বিবর্ত্ত হইয়াছে ইহাও যথার্থ, কিন্তু তাহা বলিয়া একেশ্বরবাদ ও পরলোকের অস্তিত্ব এই দুইটী সংস্কার আর্য্যসন্তানদিগের অন্তঃকরণ হইতে একবারে অন্তর্হিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে ইহা কোনরূপেই স্বীকার করা যাইতে পারেনা। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এতদ্দেশে বহুবিধ দেব দেবীর আরাধনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। আর্য্যসন্তানেরা যে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অজ্ঞানান্ধকারবশতঃ পৌত্তলিকতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এরূপ নহে। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় নিয়ত আন্দোলন করাতে ইঁহারা একপ্রকার তন্ময় হইয়া উঠিয়াছে, এবং ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ ও অবিনশ্বর নিয়মসমূহকে মনে মনে আকার প্রদানপূর্ব্বক উঁহাদিগের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছে ইহাই প্রকৃত কথা। বেদাদি অধ্যয়ন করিলে যদিও এরূপ স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে আর্য্যবংশীয়েরা অনেক দেবদেবীর আরাধনা করিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগের একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের অস্তিত্বে যে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, তাহাতে আর সংশয় নাই। ফলতঃ আর্য্যেরা নানাবিধ দেবদেবীদিগকে স্বচ্ছ সরোবরে প্রতিফলিত অসংখ্য সূর্য্যের ন্যায় এক মাত্র ঈশ্বরের প্রতিবিম্বমাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে আদিমনিবাসী অসভ্যদিগের একমাত্র পরমেশ্বরে বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, তাহাদিগের অন্তঃকরণে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধাতা ঈশ্বররূপ কোন পদার্থের অনুভব পর্য্যন্ত হইতনা, তাহারা জড় পঙ্গুর ন্যায় আহার নিদ্রাদি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ ছিল কিনা সন্দেহস্থল। যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়েই এরূপ বিবাদ তখন পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়েও এইরূপ মনোযোগ হইবারই সম্ভাবনা। পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে আর্য্যবংশীয়দিগের দৃঢ়প্রতীতি ছিল। আর্য্যদিগের মতে মৃত্যুদ্বারা দেহ ও আত্মার পরস্পর বিচ্ছেদ হয়, এই বিচ্ছেদের পর আত্মাকে একাকী অনমুমেয় দূর পথ অতিক্রমপূর্ব্বক পর-

লোকাভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়। এই রূপ ভয়ানক পথে একাকী গমন করা নিতান্ত কঠিন কার্য্য বলিয়া আর্য্যেরা এই দুর্গম পথে লইয়া যাইবার জন্য একটী নায়ক কল্পনা করেন। এই রূপ কল্পনা করা যে কেবল আর্য্যদিগেরই রীতি এরূপ কখনই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। মিসরবাসী সুগন্ধ অগুরু চন্দনাদি বিলিপ্ত হইয়া পিরামিডের নিম্নে শয়ন করিয়া থাকিত, থিয়ট তাঁহার আত্মাকে পরলোকে লইয়া যাইতেন। গ্রীকেরা এই কার্য্যের নিমিত্ত হরমিসের আশ্রয় গ্রহণ করিত। মরকরী রোমের অধিবাসীদিগকে উক্ত পথে লইয়া যাইবার নায়ক ছিলেন। এইরূপ য়িহুদীপ্রভৃতি তাবৎ সিমিতিক জাতীয়েরাই অজ্রেল নামক দেবতার সাহায্যে উল্লিখিত দুর্গম পথ অতিক্রম করিত। এইরূপ আর্য্যবংশীয়েরা এই দুস্তর পথ অতিক্রম করিবার নিমিত্ত যমরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। জেন্দ ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যে পৃথিবীতে যৎকালে পাপ ও তজ্জনিত শোকদুঃখাদির আবির্ভাব হয় নাই, তৎকালে যমনামে এক রাজা পরমসুখে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতেন, কালক্রমে পৃথিবী পাপ শোকে দুঃখাদিতে পরিপূর্ণ হইল, এবং মৃত্যু ভীষণ মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক পাপীদিগকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় যমরাজ কতিপয় পুণ্যশীল অনুচরের সহিত এই পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন পুণ্য ক্ষেত্রে নিজরাজধানী সংস্থাপন করিলেন। জেন্দাবেস্তার মতে যমরাজ অদ্যাপি তথায় রাজ্য করিতেছেন। সংস্কৃত ধর্ম্ম শাস্ত্রে যমরাজের বিষয় ভিন্নরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দর্শনে অনেকে অনুমান করেন যে জেন্দাবেস্তার বর্ণন, সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বর্ণনা অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন। সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণনা আছে, যে যমরাজই সর্ব্বপ্রথম মৃত্যুর দ্বার অবলম্বন পূর্ব্বক পরলোক গমন করিয়াছিলেন। পরলোকে গমন করিবার পথ সর্ব্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কৃত করেন। সুতরাং তিনি পরলোকে রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরলোকগামীদিগের নায়ক স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। ঋগ্‌বেদসংহিতার নানা স্থানে এই বিষয়ের বারম্বার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এক স্থলে বর্ণনা আছে, যমরাজ নব-পল্লবাচ্ছাদিত মনোহর তরুমূলে আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, আবার স্থানান্তরে, এরূপ বর্ণনা আছে, যে তিনি রাজসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক নবাগত পুণ্যাত্মাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মোচিত সুখময় আবাস বিতরণ করিতেছেন। দুইটী বিস্তীর্ণনাসারন্ধ্র বুভুক্ষু ভয়াবহ কুক্কুর তাঁহার প্রাসাদের পথে নিরন্তর ইতস্ততঃ ভ্রমণ পূর্ব্বক প্রহরীর কার্য্য করিতেছে।" অথর্ব্ব বেদের অনেক স্থলেও যমের বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকার নানাবিধ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত বিষয়ে আর্য্যবংশীয়দিগের সহিত দস্যুদিগের নিতান্ত

বৈপরীত্য ছিল। দস্যুবংশীয়েরা পরলোকের বিষয়ে কখনই কোনরূপ ভাবনা করিত না, কেবল নির্বুদ্ধি পশুবৎ বর্ত্তমান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, তাহাদিগের অন্তঃকরণে পরলোক প্রভৃতি ভবিষ্যদ্ভাবনার নামমাত্র ছিল না। সুতরাং এরূপ বিরুদ্ধমতাবলম্বী ও বিরুদ্ধাচারী জাতিদিগের পরস্পর বিরুদ্ধত্বা স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। মৃত ব্যক্তির শব দেহ দাহ করা আর্য্যবংশীয়দিগের পদ্ধতি। গ্রীক রোমান প্রভৃতি প্রাচীন ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও এই রীতি প্রচলিত ছিল। আর্য্যেরা মৃত্যুকে পরলোকের দ্বার স্বরূপ মনে করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে জন্ম, উপনয়নাদির ন্যায় মৃত্যুও অন্যতম জন্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। মৃত্যুর পর অগ্নি দ্বারা পার্থিব দেহ ও ঐশ্বরিক আত্মার পরস্পর বিয়োগ হইত। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় অন্তরঙ্গেরা স্তুতিকার ন্যায় চিতার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার চক্ষুকে সূর্য্যদেবের তেজে বিলীন হইতে দেখিতেন, তাহার শ্বাসবায়ু অনন্ত পবনে লীন হইতে দেখিতেন, ও তাহার পার্থিব শরীরকে পৃথিবীতে মিসাইয়া যাইতে দেখিতেন। তাহার আত্মা ঈশ্বরে বিলীন হইয়া যাইত। অধুনাতন শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকেরা মৃত্যুর পর পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপপুণ্য অনুসারে দেহীর আত্মাকে দেহান্তরে সংক্রমণ করিতে হয় এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচীনকালে আর্য্যবংশীয়দিগের এরূপ সংস্কার ছিল না। বেদের কোন অংশেই এরূপ মতের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। তৎকালে শবদাহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পাদনের সময় যে সকল মন্ত্র পঠিত হইত, তৎসমুদয়ের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে যে তদানীন্তন আর্য্যদিগের মৃত্যুর পর আত্মা অপবিত্র পার্থিব কারাগার হইতে উন্মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সহিত বিলীন হয় এবং অনন্তকাল অবিনশ্বর সুখ ও শান্তি সম্ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু যাহারা চিরজীবন পুণ্যকার্য্য করিয়া ইহকাল অতিবাহিত করিয়াছে, তাহাদের অদৃষ্টেই মৃত্যুর পর পূর্ব্বোক্তপ্রকার সুখের অবস্থা উপস্থিত হইত। মৃত্যুর পর পরলোকে যে তাবৎ প্রাণীর পূর্ব্ব সুকৃত দুষ্কৃতের বিচার ও ফলাফল প্রদত্ত হয়, এটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক মত সন্দেহ নাই। অধস্তন সময়ের একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রঘটিত গ্রন্থে উল্লিখিত বৈদিক শ্লোক সকলের ব্যাখ্যা স্থলে কথিত আছে, যে পরলোকে যাবতীয় মনুষ্যের পাপ ও পুণ্য তুলাদণ্ডে সংস্থাপন পূর্ব্বক পরিমাপিত হইয়া থাকে, এই পরিমাপন ক্রিয়ার ফল অনুসারে কেহ বা স্বর্গে সংস্থাপিত হইয়া অনন্তসুখভোগের অধিকারী হয়, আর কেহ বা নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া অনন্তকাল যাতনা সহ্য করিতে থাকে।

পরলোক বিষয়ে প্রাচীন আর্য্যসন্তানদিগের যেরূপ মত ছিল, তাহাতে

সিমিতিক বা প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদিগের মতের অপেক্ষা অনেক অধিক দূর বিশ্বাস ও ধ্রুবজ্ঞানের চিহ্ন লক্ষিত হয়। বেদের বর্ণনানুসারে মৃত্যুর পর পরলোকগত আত্মা পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পুরাতন বন্ধু বান্ধবের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে, কিন্তু গ্রীক কবি হোমিরের বর্ণিত পরলোক কেবল দুঃখপূর্ণ এবং তথাকার অধিবাসীদিগের দেহ অন্ধকারপ্রতিফলিত ছায়ার অনুরূপ। হোমর কর্ত্তৃক বর্ণিত পরলোক আমাদিগের সুখস্বচ্ছন্দের এতদূর পরিপন্থী যে একিলিস ও ইউলিসিস্ পরলোকের রাজত্ব অপেক্ষা ইহলোকের দাসত্বও শ্রেয়ঃ বলিয়া নিজ দুঃখ ও আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ফলতঃ গ্রীক ও রোমকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন স্থলেই নির্দ্দেশ নাই যে দেহীর মৃত্যুর পর আত্মা কোন নির্দ্দিষ্ট পরলোকে গমন করিয়া থাকে। এক্ষণে অনেকের মনে এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে অতি প্রাচীনতম কালের ভারতবর্ষীয়েরা কি প্রকারে ভবিষ্যদ্ভাবনা ও পরলোকচিন্তার বিষয়ে আধুনিক সভ্যসমাজের অপেক্ষাও অগ্রসর হইয়াছিলেন, আর কি কারণেই বা গ্রীক ও রোমকদিগের অপেক্ষা সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যসন্তানদিগের এ বিষয়ে উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ হয়। অনেকে এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা উপলক্ষে বলিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষের পশ্চিম কোণস্থ কোন প্রদেশে মানবজাতির প্রথম সমুদ্ভব ও উন্নতি হয়, তথা হইতে চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইবার সময় যাহারা তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে আপনাদিগের বাসস্থান নির্ণয় করিয়াছিল তাহারাই প্রকৃত স্বদেশে বাস প্রভৃতি নানা কারণে ঐহিক অপেক্ষা পারত্রিক বিষয়ের চিন্তায় অধিকতর মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিল। আর যাহারা দূরতর প্রদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহারা আপনাদিগের ঐহিক অভাবাদিমোচনের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকাতে পারত্রিকের বিষয়ে তাদৃশ মনোনিবেশ করিতে পারে নাই, এই জন্যই ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের পারত্রিক চিন্তায় এতদূর প্রসরবৃদ্ধি হইয়াছিল। সে যাহাহউক যুক্তি যেরূপই হউক না কেন, সিদ্ধান্ত যে নিশ্চিত ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের অনুকূল তাহাতে আর সংশয় নাই।

পরলোকচিন্তার বিষয়ে ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা বর্ণিত হইল, এক্ষণে আদিমনিবাসীদিগের সহিত আর্য্যদিগের এই গুরুতর বিষয়ে কতদূর বিভিন্নতা ছিল তাহা সপ্রমাণ করা কঠিন হইবে না। আদিমনিবাসী অসভ্যদিগের ভবিষ্যৎ চিন্তা ছিল না, সুতরাং তাহারা কখনই ভবিষ্যতের ভাবনা করিত না। পরলোকের বিষয়ে তাহাদের কিছুমাত্র অনুভব বা অনুমান পর্য্যন্ত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। নিজ নিজ জীবন অপেক্ষা সময় যে দীর্ঘতর হইতে পারে তাহারা

এ বিষয় অনুভব ও ধারণা করিতে পারিত না। ইহারাই "সম্বন্ধো জীবনাবধিঃ" এই প্রচলিত কিম্বদন্তীর তাৎপর্য্য প্রকৃতরূপে বিশ্বাসপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করিতন কোন আত্মীয় বন্ধুর মৃত্যু হইলে উহার মৃতদেহ গৃহ হইতে অপসারিত করিতে পারিলেই তাহার সঙ্গে অনন্তকালের জন্য সম্বন্ধ ফুরাইল। পরলোকস্থ পিতা মাতা প্রভৃতির উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি দান করিবার সময় আমাদের অন্তঃকরণ অনির্ব্বচনীয় রসে আর্দ্র হইয়া বিগলিত হয়; কিন্তু অসভ্য আদিমনিবাসীরা শবনিক্ষেপ করিবার পর তাহার বিষয় আর ভুলিয়াও মনে করে না। উত্তর পূর্ব্বদিকস্থ পার্ব্বতীয়েরা একটী গর্ত্তে শব নিক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ দৈনিক কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। আর এক প্রকার সম্প্রদায়ের অসভ্যেরা মৃতদেহকে সামান্যরূপ কবরে নিক্ষেপপূর্ব্বক আপনারা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া আমোদ করিয়া থাকে। এইরূপ আহারাদি করিবার সময় তাহারা মৃতব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া এই বলিয়া থাকে যে তুমি এতদিন পর্য্যন্ত আমাদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলে, আমাদিগের সহিত একত্র আহার করিতে সুরাপান করিতে ও আমোদ প্রমোদ করিতে, কিন্তু অদ্য হইতে অনন্ত কালের জন্য তোমার সহিত আমাদের সম্পর্কের শেষ হইল। আর্য্যবংশীয়েরা মৃত্যুর পর পরলোকে পুনর্ম্মিলনের আশায় সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু অসভ্যেরা পরলোকে মিলনের আশা করা দূরে থাকুক, অজ্ঞাতকুলশীল মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত আত্মীয়ের নামপর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে ভয় করিয়া থাকে।

এক্ষণে সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে যে বিজেতা আর্য্যসন্তান ও বিজিত আদিমনিবাসীদিগের মধ্যে পরস্পর বিষম বৈসাদৃশ্য ও বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল। প্রাচীন কালের আচার ব্যবহার ও তদানীন্তন সময়ের সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বাবয়বেই এই বিষম বৈসাদৃশ্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কৃতভাষী আর্য্যেরা তাহাদিগের দস্যুবংশীয় প্রতিবাসীদিগকে পরম শত্রু, দুষ্টভূতযোনিজ, ইতর জন্তু, ও ক্রীত দাস বলিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতেন।

সে যাহা হউক, আর্য্য ও দস্যুদিগের মধ্যে যতই বৈসাদৃশ্য থাকুক না কেন, বহুকাল একত্র বাসদ্বারা কালক্রমে এই বৈসাদৃশ্যের অনেক লাঘব হইয়াছিল। দস্যুজাতীয়েরা অবশ্যই আর্য্যদিগের আচার ব্যবহারের অনেক অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু আর্য্যবংশীয়েরাও সহবাসের গুণে দস্যুদিগের আচার ব্যবহারের অধিকাংশই আপনাদিগের সমাজে প্রচলিত করিয়াছিলেন। ঘৃণিত দস্যুদিগের সহবাসে আর্য্যেরাও অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম ভাষা ও রাজনীতির অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। আদিমবাসীদিগের ভাষার সহিত সংস্রবে সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশে একটী স্বতন্ত্র উপভাষার প্রাদুর্ভাব হয়। তৎকালে নীচজাতীয়েরা এই অপভ্রংশোৎপন্ন ভাষায় কথা বার্ত্তা

কহিত, অদ্যাপি বীরভূমি, বাঁকুড়া প্রভৃতি বাঙ্গালা দেশের পশ্চিমসীমাস্থিত কতিপয় প্রদেশের নীচজাতীয়েরা যেরূপ ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে উহার অন্তর্গত বহুসংখ্যক শব্দই সংস্কৃতমূলক নহে। এই প্রকার দক্ষিণাবর্ত্তে প্রচলিত তেলুগু দস্যুপ্রভৃতি নানাবিধ উপভাষার মধ্যেও এইরূপ বাক্যের অবশেষে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে তদানীন্তন দস্যুদিগের অপকৃষ্ট ভাষাও বিশুদ্ধ আর্য্যভাষার উপর এতদূর প্রভাব প্রকাশ করিয়াছিল যে কালক্রমে পরস্পরের সংস্রবে একটী স্বতন্ত্র অপভ্রংশোৎপন্ন ভাষার সমুদ্ভব হইয়াছে। যদিও উক্তপ্রকার অপভ্রংশজ ভাষা লিখিত বিশুদ্ধ সাধুভাষার অঙ্গস্বরূপ হইতে পারে নাই, কিন্তু উহা যে বাঙ্গালা দেশের পশ্চিমাংশবাসীদিগের পারিবারিক ভাষা হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভাষার ন্যায় ধর্ম্মের বিষয়েও দস্যুদিগের সংস্রবে আর্য্যেরা অনেক পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিয়াছিল। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে, যে শীতলা মনসা প্রভৃতি যে সকল দেবতা জনসমাজের কেবল অপকার করিয়া থাকেন দস্যুদিগের সহিত সংস্রবেই আর্য্যেরা সেই সকল জঘন্য দেবতাদিগকে পূজা করিতে আরম্ভ করে। সনাতন আর্য্যধর্ম্মে কুত্রাপি নরবলি প্রভৃতি ভয়ানক প্রথার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। নানাবিধ অনুসন্ধান দ্বারা এক্ষণে নিসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে কেবল দস্যুদিগের সহিত সংস্রবেই আর্য্যসমাজে এইরূপ নানাবিধ জঘন্য প্রথার প্রচার হয়। ১৮৬৫—৬৬ খৃষ্টীয় অব্দে বাঙ্গালার পশ্চিমাংশে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, উহার প্রশমনোদ্দেশে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা গোপনে নরবলি প্রদান করিয়াছিল। উক্ত সংস্কার সকল এক্ষণকার অধিবাসীদিগের অন্তঃকরণে এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছে, যে ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির সমাগমে সভ্যতার স্রোত প্রবাহিত হইলেও কোন প্রকারেই উহার নিবারণ হয় নাই। উক্ত ১৮৬৫ অব্দে এই প্রকার যে সকল অত্যাচার হয়, সৎসমুদয় অধুনাতন বিচক্ষণ পুলিসের তত্ত্বাবধানে অধিক হইতে পায় নাই, যশোহর জেলা এতদ্দেশের মধ্যে একটী অতি প্রাচীন স্থান। এখানে বীরভূমি প্রভৃতির ন্যায় তাদৃশ দস্যুসংস্রবও নাই, তথাপি উক্ত অব্দে যশোহরে একটী ভয়ানক নরবলি প্রদত্ত হইয়াছিল। যশোহরের অন্তঃপাতী লক্ষ্মীপাশা নামক স্থানে একটী কালীর মন্দির ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় সপ্তমবর্ষীয় একটী যবন বালককে উক্ত সময়ে নরবলি প্রদান করা হইয়াছিল। হুগলী জেলার মধ্যেও এইরূপ একটী দুর্ঘটনা হইয়াছিল। ঘটনাস্থলে যবা প্রভৃতি পুষ্পে জড়িত কোন হতভাগ্যের মৃতদেহ পতিত দৃষ্ট হইয়াছিল। অধিক কি সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে প্রদেশে আদিমনিবাসী দিগের সহিত অধিকতর সংস্রব হইয়া-

ছিল, তৎসমুদয় স্থানেই উক্ত প্রকার ভয়ানক প্রথার লক্ষণ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে আদিম নিবাসীদিগের অধিক সমাগম ছিল না বলিয়া তথায় এরূপ জঘন্য রীতির তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই। কিন্তু বঙ্গদেশের অধিকাংশেই এই সকল ভয়ানক ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সিংহলদ্বীপে দস্যু জাতীয়দিগের সংস্রব হইয়াছিল এরূপ প্রমাণ আছে, তত্রত্য হিন্দুরাজগণ অহিংসাব্রত বৌদ্ধ পুরোহিত ও খৃষ্টীয়ধর্ম্ম-প্রচারক প্রভৃতি অনেকের সমবেত ও স্বতন্ত্র চেষ্টাতেও উক্ত ঘৃণিত প্রথার সম্পূর্ণরূপ মূলোচ্ছেদ হয় নাই।

গ্রাম্য ও গৃহদেবতার পূজা বিষয়েও আদিম নিবাসীরা আর্য্যসমাজে অনেক প্রভাব পকাশ করিয়াছিল ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালাদেশের সমুদয় সমতল প্রদেশেই কতকগুলি গ্রাম্য দেবতার অর্চ্চনা হইয়া থাকে, অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ঐ সকল দেবতা সনাতন আর্য্যধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ নহে। কেবল আদিম নিবাসীদিগের কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে ও উহাদিগের সংস্রবেই আর্য্যসমাজে প্রবেশ করিয়াছে। অনেক স্থলে ভূতযোনির অর্চ্চনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল উপাস্য দেবতাদিগের যদিও মন্দির বা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত নাই তথাপি দস্যুবংশীয় লোকদিগের দ্বারা উহাদিগকে উপহার প্রদত্ত হইয়া থাকে। বীরভূমি প্রভৃতি পশ্চিম অঞ্চলে এই প্রকার পূজাপদ্ধতি সমধিক প্রচলিত। বীরভূমির প্রায় সমুদয় অধিবাসীরাই বৎসরের মধ্যে একবার অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিল্ববৃক্ষতলবাসী ভূতযোনির পূজা উপলক্ষে মহাসমারোহ করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে উহারা অবিচারিতচিত্তে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের অনেক বিধির উল্লঙ্ঘন পর্য্যন্ত করিয়া থাকে।

উপরি উক্ত কারণে ধর্ম্ম ও ভাষার ন্যায় রাজনীতি বিষয়েও নানাবিধ পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। বঙ্গবাসীদিগের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহাদিগের মধ্যে ঐক্যের চিহ্ন মাত্র লক্ষিত হয় না। আমাদিগের বিবেচনায় চিরবিসদৃশ জাতিদ্বয়ের পরস্পর প্রীতিসূত্রে ও ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ না হওয়াই ইহার প্রকৃত কারণ। বিজয়ী ও বিজিত জাতির পরস্পর বহুকাল সংস্রব থাকিলেও প্রকৃত মিলন হইতে বহুকাল লাগিয়া থাকে। ইংলণ্ডে বিজয়ী ও বিজেতাদিগের পরস্পর একীভাব হওয়াতেই এতদূর সমুন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে বঙ্গবাসীরা আদিম নিবাসীদিগকে মনের সহিত ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিয়া ঐক্যরূপ সমাজশ্রীবৃদ্ধির মূলমন্ত্রে বঞ্চিত হইয়াছে. এবং যাবৎ পরস্পর বিষম্বাদী যাবতীয় বঙ্গবাসীরা সম্পূর্ণরূপে একীভূত না হইবে তাবৎ বঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এতদ্ভিন্ন আদিম নিবাসীদিগের শারীরিক বল ও আর্য্যবংশীয়দিগের মানসিক বল এই উভয়ের সমবায় না হওয়াতেই হতভাগ্য বাঙ্গালী শত সহস্র বৎসর নানাদেশীয় যবন জাতির নিকট দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া ক্লেশভোগ করিতেছে। অতএব বাঙ্গালাবাসী তাবৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইবার চেষ্টা করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহাতে আর সংশয় নাই। ফলে এতদ্ভিন্ন উহাদের উন্নতির আর উপায়ান্তর নাই।

চিত্র।

(শ্রীমতী বিনোদমোহিনীর চিত্রসন্দর্শনে)।

মরি কিবা প্রতিবিম্ব নয়ন-দর্পণে
হলো বিভাষিত আজি; দেখিয়াছি হায়!
পূর্ণিমা শারদ শশী সুনীল গগনে;
দেখিয়াছি সরোজিনী সলিলশয্যায়।

২

দেখিয়াছি ভাগীরথী ভাদ্রমাসে ভরা;
পূর্ণ যোয়ারের জল মন্থর যখন;
দেখিয়াছি সুখ-স্বপ্নে নন্দনে অপ্সরা,
কিন্তু হেন চারু চিত্র দেখিনি কখন।

৩

দেখিব কি! দেখিলে কি নয়ন মোহিত
পারে কেহ ফিরাইতে? রবে অবিরত
মুগ্ধ দৃষ্টি একস্রোতে চিত্রে প্রবাহিত;
চিত্র দেখি হইলাম চিত্রিতের মত।

৪

বিরহেতে গুরুতর উরসের ভারে
ঢলিয়া পড়েছে বামা কুসুমেশুশরে
কুসুম শরীর; কিন্তু কুসুমে কি পারে
নিবাইতে যে অনল জ্বলিছে অন্তরে?

৫

সুগোল সুবর্ণনিভ চারু ভুজোপরে
শোভে পূর্ণবিকসিত বদনকমল
(রূপের কমল মরি যৌবনসাগরে),
ভানুর বিরহে কিন্তু নিমীলিত দল!

শোভিতেছে অন্যকরে কাব্য মনোহর,
স্খলিত অলকারাশি, পয়োধর থর
বিশ্রামিছে অযতনে কাব্যের উপর,—
পুণ্যবান্ কবি—বাক্য পুণ্যের আকর!

৭

বিনোদ বদন-চন্দ্র, বিনোদ নয়ন
পল্লবে আচ্ছন্ন, পাঠে স্থির সন্নিবেশ;
অতুল—বিনোদতম—ত্রিদিব-মোহন,
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের বিলাস আবেশ।

৮

বিলাস বঙ্কিম রেখা, কুহকী যৌবন
চিত্রিয়াছে কি কৌশলে—সর্ব্ব অঙ্গে মরি
পূর্ণতার পূর্ণাবেশ—সুনীল বসন
বিকশিছে তলে তলে কনকলহরী।

৯

এইরূপে বিরহিণী বিনোদ কামিনী।
চিত্রময়ী! চিত্রপটে রয়েছে শায়িত
অযতনে—অনিমেষ কুসুমশায়িনী।
চিন্তাকুলা! চিত্রতলে রয়েছে লিখিতঃ—

১০

"বিরহেতে বিষাদিনী, বিরহযাতনা
ভুলিবার তরে মনে সদা আকিঞ্চন;
রতন ভূষণ ত্যজি পাঠেতে মগনা,
তথাপি বিরহানল দহিছে জীবন।"

১১

পুণ্যবান্ তুমি ! হায়, যাহার লাগিয়া
এই প্রেমময় চিত্র চিন্তায় অচল,
শতপুণবান্ তুমি—যাহার লাগিয়া
হায় ! এই চিত্রময় বিরহ অনল !

১২

অতুল ঐশ্বর্য্য তব,—অসঙ্খ্য রতনে
পূর্ণিত ভাণ্ডার তব, রত্নাকর জিনি !
সকল রত্নের রত্ন—দুর্ল্লভ ভুবনে !
অমূল্য রতন এই বিনোদ কামিনী !

১৩

হেন রত্ন হায়, যার কণ্ঠের ভূষণ,
তাহার জীবন পথ উজ্জ্বল সতত
পবিত্রপ্রণয়ালোকে—মানব-জীবন-
নন্দন-কাননে ইন্দ্রসুখ স্বপ্নমত !

১৪

উজ্জ্বল সুদূরস্থায়ী ভানুর প্রতিমা
দেখে যথা ক্ষুদ্র নর প্রতিবিম্বে জলে ;
কিম্বা যথা দেখে সেই অনলগরিমা
সুদূরবীক্ষণে কিম্বা বিজ্ঞানকৌশলে

১৫

তেমতি কি পুণ্যবলে এই রূপরাশি
দেখিলাম প্রতিবিম্বে এই চিত্রপটে ;
নিরখিব স্মৃতিনেত্রে, রবে দিবা নিশি
চিত্রময়ী মনে, চিত্র নয়ন নিকটে।

১৬

"হরিষে" প্রণয়ে রক্ত অধর যুগল—
চিত্রে অচঞ্চল—যবে বর্ষে সুসঙ্গীত
সেই সুললিত কণ্ঠ—মধুর তরল,
হৃদয়ে পবিত্র প্রেমে করি উচ্ছ্বসিত ;

১৭

বড় সাধ সে সঙ্গীত শুনি একবার,
বড় সাধ নিরখি সে আচ্ছন্ন নয়ন—
কমল-কোরক,—যবে স্নেহের আসারে
বিকাশে ত্রিদিবশোভা, উজ্জ্বল বরণ।

১৮

না দেখি, না শুনি;—কিন্তু দেখিব শুনিব
কল্পনায় নেত্রে কর্ণে দিবস যামিনী ;
পবিত্র স্বপনে কিম্বা শুনিব, দেখিব,
চিত্রময়ী কণ্ঠ, চিত্র বিনোদ কামিনী।

শ্রীনঃ—

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এইরূপে মিল্ অনেক পুরাতন বিষয়—যাহা তিনি পূর্ব্বে বুঝিতে পারিতেন না, বা বিশ্বাস করিতেন না—নূতন ভাবে দেখিতে লাগিলেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে দুই একটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্ব্বে তিনি অদৃষ্টবাদ (Fatalism) অবস্থাবাদ (Doctrine of circumstances) এবং স্বাধীন ইচ্ছাবাদের (Doctrine of Free Will) বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। এবিষয়ে তাঁহার মনের ভাবসকল, সম্পূর্ণ তমসাচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার মনে এই তর্ক সমুদিত হইত যে যদি 'যাহা অদৃষ্টে লিখিত আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে' এই মত সত্য হয়, তাহা হইলে মানব ইচ্ছা স্বাধীন

অর্থাৎ মনুষ্য যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে' এইমত কিরূপে সত্য হইতে পারে? যদি 'মনুষ্য অবস্থার দাস' এই মত সত্য হয়, তাহা হইলে 'মানব ইচ্ছা স্বাধীন' এইমত কিরূপে সত্য হইতে, পারে? আর যদি 'যাহা অদৃষ্টে লিখিত আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে' তাহা হইলে মনুষ্যের, স্বভাব ও ব্যবহার অবস্থা-স্বাপেক্ষ কেন হইবে? কারণ কোন অবস্থা সংঘটিত হওয়ার পূর্ব্বেই যাহা ঘটিবে তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। তিনি এই পরস্পর-বিসম্বাদী মত সকলের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিতেন না— অথবা ইহাদিগের কোন্‌টী সত্য. কোন্‌টী মিথ্যা, তাহা নির্ণয় করিতে, পারিতেন না। তাঁহার মন সতত সন্দেহদোলায় দোলায়মান হইত। "মনুষ্য যে সকল ঘটনার দাস, তাহাদিগের উপর তাহার কোন, প্রভুতা নাই'—'মনুষ্যের স্বভাব অদৃষ্ট দ্বারা পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছে'— 'মনুষ্যের কার্য্যাবলী অদৃষ্ট দ্বারা পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছে'—এই সকল চিন্তা তাঁহার মনে যেই উত্থিত হইত, অমনি তাঁহার হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিত। অমনি—তিনি সমাজসংস্কারক হইবেন, তিনি জগতের হিতসাধন করিবেন—এই সকল চিররূঢ় আশালতা সমূলে উন্মূলিত হইত। ইচ্ছা হইত তিনি এই সকল মত অগ্রাহ্য বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দেন; কিন্তু তাহাও পারিতেন না। এইরূপে হতাশাপ্রপীড়িত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে তিনি এই বিষয়ে আলোক দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন যে যেমন মনুষ্যের স্বভাব ও চরিত্র অবস্থা দ্বারা সংগঠিত হয়; সেইরূপ অবস্থাসকলও মনুষ্যের ইচ্ছা দ্বারা সংগঠিত বা রূপান্তরিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ দুইই সত্য যে—মনুষ্য অবস্থারও দাস এবং মনুষ্যের ইচ্ছাও স্বাধীন। এই সূক্ষ্ম অনুভূতি মিলের অন্তর হইতে গুরুতর ভার অপনীত করিল। তাঁহার মনে আবার আশার সঞ্চার হইল যে তিনি সমাজসংস্কারক হইবেন, জগতের হিত সাধন করিবেন। এই সকল মত লইয়া তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়দর্শনের শেষ অধ্যায়ের স্বাধীনতা এবং অবশ্যম্ভাবিতা নামক প্রস্তাবদ্বয় রচনা করেন। রাজনীতি বিষয়েও মিলের মতে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। তিনি পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতেন যে সকল দেশে সকল সময়ে সকল লোকেরই রাজ্যশাসন কার্য্যে সমান অধিকার। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার বিশ্বাস অন্যপ্রকার হইয়া উঠিল। তাঁহার মতে দেশ কাল পাত্র ভেদে শাসনপ্রণালীরও ভেদ আবশ্যক। যে শাসনপ্রণালী ইংলণ্ড বা ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগিনী, তাহা অন্যদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপোযোগিনী না হইতে পারে। তাঁহার মতে সাধারণতন্ত্র ইউরোপের বিশেষতঃ ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ উপযোগি। সম্ভ্রান্তশ্রেণীর আধিপত্য নিবন্ধন ইংলণ্ডের শাসনকার্য্য এরূপ দূষিত ও কলুষিত হইয়াছে, যে এই আধি-

পত্য নিবারণের জন্য কোন প্রস্তরই অনুত্তোলিত রাখা উচিত নয়। অযথা কর নির্দ্ধারণ বা অন্য কোন সামান্য অসুবিধার জন্য তিনি এরূপ মত ধারণ করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি বলিতেন যে সম্ভ্রান্তশ্রেণী গবর্ণমেণ্টকে পক্ষপাত-দোষে দূষিত করিয়া, সমস্ত রাজ্যে দুর্নীতি বিস্তার করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট এই শ্রেণীর প্ররোচনায় ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থসাধনের জন্য অন্যায্য বিধি প্রণয়নাদি দ্বারা প্রজাসাধারণের অহিত সাধন করিতেছেন। ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণী প্রায়ই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। সুতরাং তাহারা লক্ষ্মী বা লক্ষ্মীর আনুসঙ্গিক সরঞ্জাম সকলের বিশেষ আদর করিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইলে তাহাদিগের এই আদর অবশ্যই কমিবে। সুতরাং নিম্নশ্রেণীকে জ্ঞানালোক প্রদান করা সম্ভ্রান্তশ্রেণীর স্বার্থের বিরোধী। অতএব যতদিন তাঁহাদিগের হস্তে রাজ্যের সমস্ত শাসনভার অর্পিত থাকিবে, ততদিন তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর অন্তর জ্ঞানালোকে আলোকিত করিতে চাহিবেন না। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর হস্তে রাজ্যশাসনভার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্পিত হইলে, তাহাদিগের সুশিক্ষাবিধান উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থ হইয়া উঠিবে। কারণ মূর্খ প্রতিদ্বন্দ্বী অজ্ঞানবশতঃ যে সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সংঘটিত করে, তাহাদিগের সহিত তুলনায় জ্ঞানকৃত অনিষ্ট অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই জন্য ইংলণ্ডে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহা মিলের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, এবং তিনি ওয়েন ও সেণ্ট সাইমনের সম্পত্তিবিরোধী মতসকল সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া এই ইচ্ছা পরিপূরণের একটি প্রধান উপায় বলিয়া মনে করিতেন।

তাঁহার মনের অবস্থা এইরূপ, এমন সময় ফরাশি বিপ্লব সমুপস্থিত হয়। মিল একবারে উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন, এবং যেন নব জীবন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে প্যারিস নগরী যাত্রা করিলেন এবং তথায় উত্তীর্ণ হইয়া লাফেটী ও অন্যান্য সাধারণতন্ত্র-দলপতিদিগের সহিত বিশেষ পরিচিত হইলেন। কিয়দ্দিবস প্যারিসে অবস্থিতির পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন এবং এক্ষণ হইতে অতিগভীররূপে তদানীন্তন রাজনীতিবিষয়ক তর্কসাগরে অবতরণ করিলেন। এই সময়ে লর্ড গ্রে ইংলণ্ডের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ এবং রাজনীতি-সংস্কারমানসে পার্লিয়ামেণ্টে রিফরম্ বিল্ নামক একটী বিলের প্রস্তাব করেন। রিফরম্ বিলের প্রস্তাবনায় ইংলণ্ডের সংবাদপত্র সকলে রাজনীতিবিষয়ে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয় এবং মিল্ সেই সকল তর্ক বিতর্কে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।

সংবাদপত্রে বর্ত্তমান ঘটনাবলীর আন্দোলনে চিন্তাশক্তির তাদৃশ পরিণতি হয়না, এইজন্য মিল্ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে "দি স্পিরিট্ অব্ দি এজ্" নামক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে

বর্ত্তমান সময়ের প্রকৃতি এবং পরিবর্ত্তনের আনুসঙ্গিক অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য বিশৃঙ্খলা জনিত অনিষ্টাপাত বিষয়ে নিজের মত সকল সন্নিবেশিত করেন। এই পুস্তক পাঠে কার্লাইল্ অতিশয় প্রীত হন এবং স্বয়ং চেষ্টা করিয়া মিলের সহিত আলাপ করেন।

মিল্ যে সকল উপায়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন কার্লাইলের গ্রন্থাবলী তাহার অন্যতম। কার্লাইলের রচনাবলী—কবিত্ব ও জার্ম্মান মনোবিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। সেই সমস্ত রচনার সাধারণ ভাব,—ধর্ম্মে বিশ্বাসাভাব, হিতবাদ, অবস্থাবাদ এবং সাধারণতন্ত্র, ন্যায়দর্শন ও অর্থনীতিশাস্ত্রের অত্যাবশ্যকতা প্রভৃতি মিলের প্রধান প্রধান মত সকলের বিরোধী। যদিও কার্লাইলের মত সকল মিলের মত সকলের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল, তথাপি মিল্, বহুকাল পর্য্যন্ত কার্লাইলের রচনাবলীর একজন প্রধান স্তুতিবাদক ছিলেন। কার্লাইলের দর্শন—মিলের বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত না করুক, কার্লাইলের কবিত্ব—মিলের হৃদয়কে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

ধীশক্তিসম্পন্ন যতগুলি লোকের সহিত মিলের পূর্ব্ব পরিচয় ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ অষ্টিনের সহিতই তাঁহার মতের অনেক ঐক্য হইত। কার্লাইলের তেজস্বিনী কল্পনা ও মিলের গভীর চিন্তাশীলতা—এ দুইই জ্যেষ্ঠ অষ্টিনে অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করে। অষ্টিন্ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জুরিস্প্রুডেন্টের অধ্যাপকপদে অভিষিক্ত হইয়া আইন অধ্যয়নের নিমিত্ত বন্ নগরে গমন করেন। জার্ম্মান্ সাহিত্য এবং জার্ম্মান্ সমাজের প্রকৃতি ও অবস্থা—মানবজীবন সম্বন্ধে তাঁহার মত সকলে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে। জার্ম্মান্ প্রভাবে তাঁহার স্বভাব কোমলতর, তাঁহার তর্কস্পৃহা ক্ষীণতর, এবং তাঁহার কবিত্ব ও চিন্তা শক্তি প্রবলতর হইয়া উঠে। তিনি বর্ত্তমান সময়ের অন্তঃসংস্কার-বিরহিত বাহ্য পরিবর্ত্তনের বিরোধী হইয়া উঠিলেন। সাধারণতঃ ইংরাজ জীবনের নীচতা, ইংরাজ চিন্তার সঙ্কীর্ণতা, ইংরাজ হৃদয়ের অনুদারতা এবং ইংরাজ লক্ষ্যের অনুচ্চতা প্রভৃতির তিনি বিশেষ ঘৃণা করিতেন। অধিক কি ইংরাজেরা যাহাকে দেশহিতৈষিতা বলেন, তাহার প্রতিও তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি বলিতেন এবং মিলও তাঁহার অনুমোদন করিতেন, যে ইংরাজ প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা প্রুসীয় যথেচ্ছাচারপ্রণালীর অধীনে কার্য্যতঃ উৎকৃষ্টতর সুশাসন, এবং সকল শ্রেণীর লোকের সুশিক্ষা ও মানসিক উন্নতি বিধানের জন্য অধিকতর যত্ন হইয়া থাকে। অষ্টিন্ রিফরম্ বিলের অনুমোদন করিতেন বটে, কিন্তু লোকে ইহা হইতে রাজ্যশাসন বিষয়ে তৎক্ষণাৎ যত শুভ ফলের প্রত্যাশা করিত, তিনি ততদূর করিতেন না। মিলের সহিত তাঁহার প্রায় পুরাতন ও নূতন সকল মত বিষয়েই সহানুভূতি ছিল। মিলের ন্যায়

তিনি হিতবাদী ছিলেন। জার্ম্মান্‌জাতির প্রতি তাঁহার অবিচলিত প্রেম এবং জার্ম্মান্ সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, তিনি কখনই তাঁহাদিগের দুর্ব্বোধ দর্শনে দীক্ষিত হন নাই। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম—জার্ম্মান্‌দিগের ন্যায় কবিত্ব ও অনুভূতিময় হইয়া উঠিল। রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার মতসকল মিল্ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ অনুষ্ঠান সকলের উন্নতি বিষয়ে তিনি ক্রমে উদাসীন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি "সোসালিজম" মতের বিরোধী ছিলেন না; এবং যাহাতে এই মত সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় ও সম্ভ্রান্তশ্রেণীর হস্ত হইতে অধিকার সকল প্রচুর পরিমাণে বিগলিত হইয়া নিম্নশ্রেণীর হস্তে পতিত হয়, ইহা তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। তিনি মানবজাতির নৈতিক উন্নতির কোন সীমা নির্দ্দেশ করিতে চাহিতেন না, এবং এরূপ সীমা নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর বলিয়াও মনে করিতেন না। তিনি এই সকল মত জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিলেন কিনা, মিল্ তাহা জানিতেন না। তবে তাঁহার শেষকালের রচিত গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া মিলের মনে সন্দেহ হয়, যে অন্তিম কালে অষ্টিনের অন্তরে রাজনীতি বিষয়ে গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

আমরা পিতা ও পুত্রের পরস্পরের সহিত বর্ত্তমান মানসিক সম্বন্ধ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক অদ্যকার প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

পিতার চিন্তা ও অনুভূতি হইতে মিল্ ক্রমেই দূরসমাকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। যদি তাঁহারা পরস্পর প্রশান্ত ভাবে পরস্পরের নিকট আত্মমতের সারবত্তা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতেন এবং অনাবশ্যক প্রভেদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অন্তর্ব্বর্ত্তি দূরত্বের অনেক হ্রাস হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু জেম্‌স মিল্ নমনীয় স্বভাবের লোক ছিলেন না। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি তাঁহার পতাকা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত আত্মমতের যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করা তিনি নীচতা মনে করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে রাজনীতি সংক্রান্ত মত সকলে পিতা ও পুত্রের সম্পূর্ণ ঐকমত্য ছিল। এই বিষয়ের কথোপকথনে ও এই বিষয়ের তর্ক বিতর্কে তাঁহাদিগের অনেক সময় অতিবাহিত হইত। যে সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের মতভেদ ছিল, সে সকল বিষয়ে তাঁহারা প্রায় কোন কথা উপস্থিত করিতেন না। জেম্‌স মিল্ জানিতেন যে তিনি যে স্বাধীন চিন্তার ভাব পুত্রের অন্তরে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন, সেই স্বাধীন চিন্তা বলে পুত্র অনেক সময়ে বিভিন্ন মত অবলম্বন করিবে। তথাপি কি প্রণালীতে সেই বিভিন্নতা সংঘটিত হইত তাহা জানিবার জন্য জেম্‌স বিশেষ উৎসুক হইতেন। কিন্তু তিনি দুঃখের

সহিত দেখিতেন যে পুত্র তাঁহার নিকট সেই প্রণালী ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছুক। মিল্ বলিতেন যে এরূপ তর্ক বিতর্কে কোন ফল নাই; অধিকন্তু পরস্পরের মনোবেদনা হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা; এই জন্যই তিনি ইহা হইতে ক্ষান্ত থাকিতেন। কিন্তু যখন পিতা, পুত্রের মতের বিরোধি মত সকল এরূপ ভাবে ব্যক্ত করিতেন, যে তাহার প্রতিবাদ না করা পুত্রের পক্ষে অক্ষমতারই পরিচয় মাত্র, তখন তিনি প্রতিবাদ করিতে বিরত হইতেন না।

মত-সৃষ্টি।

ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে সচরাচর দুই প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। এক সম্প্রদায় বলেন—

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি॥

"ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা জানি কিন্তু তথাপি তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না। অধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহাও জানি তথাপি তাহা হইতে নিবৃত্তি হয় না। হে হৃষীকেশ! তুমি হৃদয়ে থাকিয়া যেরূপে যেরূপে নিয়োগ করিতেছ আমি সেইরূপ আচরণ করিতেছি" ইহার ভাবার্থ এই—মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও কার্য্যাদির উপর মনুষ্যের কর্তৃত্ব নাই। নাস্তিক এবং সংশয়বাদীদিগের মধ্যেও অনেকে এই মতাবলম্বী আছেন; তাঁহারা মনুষ্যের স্বাধীনতাকে ভগবানের কর্তৃত্ব দ্বারা নিয়মিত করেন না, কিন্তু সেই স্বাধীনতাকে দুর্ভেদ্য অপরিহার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী নিয়মপরম্পরা দ্বারা বদ্ধ করিয়া থাকেন। ইহার ঠিক বিপরীতমতাবলম্বী এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা মনুষ্যকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন জীব বলিয়া স্বীকার করেন; এবং প্রত্যেক কার্য্যাকার্য্যের জন্য তাহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দায়ী মনে করেন। এই উভয় প্রকার মতের বিবাদে বহুদিন অতিবাহিত হইয়াছে; কিন্তু আজিও যে ইহার প্রকৃত মীমাংসা হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করাই অস্মদাদির পক্ষে ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। তবে সহজ বুদ্ধিতে এই মনে হয় যে এই উভয় প্রকার মতের মধ্যেই প্রকৃত সত্য কথা নিহিত আছে; অর্থাৎ মনুষ্যের ভাব চিন্তা কথা কার্য্য ব্যবহার প্রভৃতি যে ভূরি পরিমাণে পূর্ব্বাগত অবস্থা এবং শিক্ষা প্রভৃতি দ্বারা অনিবার্য্যরূপে নিয়মিত হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না—আবার অপর দিকে মনুষ্যের ইচ্ছাসম্ভূত বল দ্বারা যে এসকলের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমে ব্যক্তিবিশেষের (Individual) চরিত্র ও কার্য্যাদি পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। সভাসমাজে বর্দ্ধিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রের কার্য্যকলাপের পশ্চাতে কতকগুলি মানসিক সংস্কার ও বিশ্বাস (notions and beliefs) দেখিতে পাওয়া যায়। সে গুলির মূল কোথায়? সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার সদুত্তর দিতে পারে না। তাহার পক্ষে সেগুলি এত সুলভ ও স্বতঃপ্রবৃত্ত যে তাহার পক্ষে সেগুলিকে প্রকৃতির সহজাত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু বাল্যাবস্থা হইতে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের জ্ঞানবৃদ্ধির ক্রম অনুশীলন করিতে পারিলে এই দুরূহ বিষয়টীর অনেক তত্ত্ব নির্ণয় করা যাইতে পারে। একটী ক্ষুদ্র শিশু যে সবে দুই এক পা হাঁটিতে শিখিতেছে, কিম্বা দুই একটী কথা বলিবার উপক্রম করিতেছে, তাহার ক্ষুদ্র মনের অবস্থা ও শিক্ষা প্রভৃতির বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ। তাহার সবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা জন্মিতেছে, সুতরাং সে দুই একটী কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই আদিম ও অপ্রস্ফুটিত অবস্থায় সে তাহার কার্য্যের দোষ গুণের বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহার নিকট একটী জলপাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলাও যাহা, আর অপর একটী শিশুর প্রাণ নষ্ট করাও তাহা, কিন্তু সে সময়ে তাহার প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি পিতা মাতার দৃষ্টি পতিত থাকে। প্রথমদিন সে খেলিতে খেলিতে একটী জলপাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং মহানন্দে কর্দ্দমাক্ত হইয়া মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইল। মাতার নিকট আসিয়া সে কিরূপ ব্যবহার লাভ করিল? মাতা তাহার প্রতি বিরক্তিসূচক ভ্রূকুটী অথবা প্রহার প্রয়োগ করিলেন। তাহাতে সেই শিশুর ক্ষুদ্র মনে এই সংস্কার জন্মিল যে জলপাত্র ভগ্ন করা মাতার বিরক্তিজনক। হয়ত প্রথম শিক্ষা সে ভুলিয়া গেল, হয়ত বারান্তরের শিক্ষা তাহার হৃদয়ে সেই সংস্কারকে দৃঢ়মুদ্রিত করিল। এইরূপে বাল্যকালাবধি কতকগুলি কার্য্য এবং তাহাদের ফলস্বরূপ পরিবারবর্গের সন্তোষ বা অসন্তোষ এই উভয়ের মধ্যে এক প্রকার ভাবযোগ (Association of ideas) জন্মিয়া যায়। পরে সেই কার্য্যগুলি স্মরণ হইলেই অথবা করিলেই সন্তোষ অসন্তোষের কথাও স্মরণ হয়। আবার লোকের সন্তোষ বা অসন্তোষ এবং নিজের হর্ষ বা বিষাদের মধ্যে ভাবযোগ থাকাতে সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে হর্ষ বা বিষাদের সঞ্চার হয়। কিন্তু মানসিক অব্যক্ত নিয়মানুসারে এই সমুদায় কার্য্য এত শীঘ্র হয় যে আমরা ইহার ক্রম লক্ষ্য করিতে পারি না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে যেমন বলে "উৎপলপত্র-গত-ব্যতিভেদবল্লাঘবান্ন সংলক্ষ্যতে"। এক শত পদ্মপত্র এককালে সূচীবিদ্ধ করিবার সময় যেমন তাহাদের ক্রম ধরিতে পারা যায় না, এস্থলেও

সেইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য-অনুভব করিতে পারা যায় না। কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে একটী গাভী বা অশ্বের সম্মুখে একটী যষ্টি উত্তোলন করিবামাত্র সে মুখ ফিরাইয়া লয়। কিন্তু সেই গাভী বা অশ্বের সেই কার্য্যের মূলে এই ভাবযোগের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। গাভীটী বা অশ্বটী আরো অনেকবার যষ্টির আঘাত সহ্য করিয়াছে; করিয়া করিয়া তাহার মনে যষ্টি এবং সেই প্রহার-বেদনা এই দুইটি গাঢ়রূপে সম্বদ্ধ হইয়া আছে। সেই ভাবযোগ থাকাতে যষ্টিটী দেখিবামাত্র প্রহার-বেদনাটী স্মরণ হওয়াতে আতঙ্কে মুখ ফিরাইয়া লয়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে পূর্ব্বে যাহা শিক্ষা করিতে সময় লাগে, তাহা মনের আশ্চর্য্য শক্তি ও দৃঢ় নিয়মানুসারে সময়ান্তরে অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়া যায়। এইরূপে আমাদের বিশ্বাস ও সংস্কারের অধিকাংশই বাল্যকালাবধি হৃদয়ে ভাবযোগ দ্বারা বদ্ধমূল হইয়াছে। চিন্তাশীল পাঠক হয় ত এখানে একটী প্রশ্ন করিবেন। সে প্রশ্নটী এই—বাল্যকালে যদি অপরাধ সকলের গুরুত্ব লঘুত্বের প্রভেদ থাকে না তবে বয়ঃপ্রাপ্ত দশায় সেরূপ প্রভেদ লক্ষিত হয় কেন? ইহার উত্তর এই—বয়োবৃদ্ধির সহিত দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের বাল্যের শিক্ষিত সংস্কারদিগের মধ্যে কতকগুলি জনসমাজের মত দ্বারা ঘনীভূত হয় কতকগুলি বা সামান্য ও মার্জ্জনীয় বলিয়া উপেক্ষিত হয়। সুতরাং সেই অনুসারে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির পূর্ব্বসংস্কারেরও ব্যতিক্রম ঘটিতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর, একটী শিশু বাল্যাবধি দেখিয়া আসিতেছে যে তাহার জনক জননী কোন গৃহসামগ্রী নষ্ট করিলেও অসন্তুষ্ট হন, আবার তাঁহাদের কার্য্যের অবাধ্য হইলেও বিরক্ত হন। এই উভয়কেই দুষ্কর্ম্ম বলিয়া তাহার সংস্কার থাকে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে দেখিতে পায় যে চারিদিকের লোকে অবাধ্যতাকে অধিক অপরাধ মনে করে কিন্তু অসাবধানবশতঃ কোন ক্ষতি করাকে অপরাধ মধ্যে গণ্যই করে না—তখন তাহারও সংস্কারের ব্যতিক্রম ঘটিতে থাকে। এই কারণই সমাজ ভেদে বিবেক ও ধর্ম্মনীতির ভেদ দেখা যায়।

প্রথম সংস্কার উপার্জ্জন করিবার সময় চিন্তা, তর্ক, স্মৃতি প্রভৃতি কার্য্য করে; কিন্তু উপার্জ্জিত হইলে তাহা সর্ব্বদাই হৃদয়ের নিকট উপস্থিত থাকে। তবে ত দেখিতেছি যে মানুষ যেরূপ গৃহে ও যেরূপ সংসর্গে জন্ম গ্রহণ করে ও বর্দ্ধিত হয় তাহার প্রতিদিনের কার্য্য, চিন্তা, ব্যবহার প্রভৃতির মূলীভূত সংস্কারগুলিও তদনুসারে গঠিত হয়—অতএব মনুষ্য কতক পরিমাণে পরাধীন। ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয় পিতা মাতা ও প্রতিবাসিগণের মত দ্বারা আমাদের চরিত্র কতদূর গঠিত। এইরূপ এক সময়ে পূর্ব্ব পুরুষেরা তর্ক যুক্তি করিয়া যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা

আমাদিগের নিকট অভ্রান্ত সত্য হইয়া আছে।

দ্বিতীয়তঃ জনসমাজের রীতি নীতির বিষয় আলোচনা করা যাউক। আপাততঃ বোধ হয় ব্যক্তিবিশেষ লইয়াই জনসমাজ সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র গঠনের প্রণালী বুঝিতে পারিলেই সমগ্র সমাজের চরিত্র গঠনপ্রণালী বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বাস্তবিক এই উভয়ের শিক্ষার মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। জনসমাজ সকলের ইতিবৃত্ত আরও আশ্চর্য্য দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। সুপ্রসিদ্ধ বকল মানব সমাজ সকলকে সভ্যতার আস্থানুসারে বন্য—যাযাবর—গৃহস্থ—সামাজিক—অর্দ্ধসভ্য ও সুসভ্য এই ছয় শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। এই ছয় প্রকার সামাজিক অবস্থার মধ্যেই প্রধানতঃ কার্য্য ও ব্যবহার গত এবং তাহার মূলে সংস্কার ও বিশ্বাসগত তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করিলে বক্তব্য বিষয়টী পরিষ্কার হইতেছে না। দৃষ্টান্তস্থলে বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ এবং ইংলণ্ডীয় সমাজ এই উভয়কে অবলম্বন করা যাউক্। পূর্ব্বোক্ত উভয় সমাজে কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রধানতঃ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়? (১) প্রথম জাতিভেদ (২) অবরোধ (৩) বহুবিবাহ। আহার পরিচ্ছদাদির বিষয় গৌণ বোধে পরিত্যক্ত হইল। রীতি নীতিগত যে সকল প্রভিন্নতার উল্লেখ করা হইল ইহার মূলে উভয় জাতির উভয় প্রকার সংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়। বহুবিবাহ—একজন ইউরোপীয়ের চক্ষে অতি ভয়ঙ্কর পাপ। একজন হিন্দুর চক্ষে সেরূপ নয় কেন? ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে বোধ হয় একদিকে বাইবেলের আদম ইবের গল্প পর্য্যন্ত যাইতে হয় এবং অন্য দিকে মনু কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকার দিগকে পর্য্যন্ত টানিতে হয়। এই সকল সামাজিক সংস্কার অধিকাংশ স্থানে বহু শতাব্দীয় শিক্ষার ফলস্বরূপ। আমাদের যে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট—সুশিক্ষার কষ্ট—চরিত্রের কষ্ট—সভ্যতাংশে হীন সমাজে জন্ম গ্রহণ করা তাহার বার আনার কারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ ওই বঙ্গীয় যুবাকে জিজ্ঞাসা কর তুমি যুবাপুরুষ অথচ এত দুর্ব্বল কেন? উত্তর—আমি পিতামাতার অসময়ের সন্তান। তাঁহাদের বাল্য বিবাহ হইল কেন? উত্তর—পিতামহ পিতামহী দিয়াছিলেন। তাঁহারা দিলেন কেন? উত্তর—তাঁহারা এককর্ম্মকে দুষ্কার্য্য বলিয়া জানিতেন না। কেন দুষ্কার্য্য বলিয়া তাহাঁদের বোধ হয় নাই? উত্তর—তাহাঁদের শৈশবাবস্থা হইতে এ কথা কেহ শিক্ষা দেয় নাই, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও এ বিষয়ের বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। তবে দেখ সেই যুবার অকালে মৃত্যুর কারণ পূর্ব্বতন সমাজের লোকের বিকৃত মতের ফল মাত্র। ওই দ্বিতীয় যুবাকে জিজ্ঞাসা কর তুমি অসময়ে পাঠ সাঙ্গ করিলে কেন? আমি পুত্র কন্যার ভারে ভার-

গ্রস্ত। তোমার আবার পুত্র কন্যা কেন? —আমার বালক কালে বিবাহ হয়। পিতা মাতা বিবাহ দিলেন কেন?—লোকাচার অর্থাৎ লোকের মত। এখানেও অবশেষে সমাজের বিকৃত মত সেই যুবার শিক্ষাভাবের কারণ। তৃতীয় যুবাকে জিজ্ঞাসা কর—তুমি বহুবিবাহ করিলে কেন? পিতা মাতার অনুরোধ? সে অনুরোধ রাখিলে কেন?—ইহাকে ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় নাই—একজন সাহেবের বোধ হয়, তোমার হইল না কেন?—আমাদের দেশের শাস্ত্রে বা লোকাচারেত সেরূপ ভয়ানক পাপ বলে না। আমার পিতা কিম্বা আমি যদি ইউরোপে জন্মিতাম তাহা হইলে আমাদিগের দ্বারা এরূপ কার্য্য অসম্ভব হইত। তবে দেখ এখানেও তাহার সাংসারিক যন্ত্রণা সমাজের বিকৃত মতের ফলস্বরূপ, অসৎ বিষয়ে যেমন সদ্‌গুণ বিষয়েও সেইরূপ। ভারতের সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ কর ভারতবাসিরা যে সকল গুণের জন্য প্রসিদ্ধ তাহার প্রত্যেক্যের মূলে মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্রকর্ত্তা—বাল্মীকি ব্যাস প্রভৃতি সমুদায় পুরাণ কর্ত্তাকে দেখিতে পাইবে। ফলকথা এই সমাজের মধ্যে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগের মত দ্বারাই সমাজের রীতি নীতি অধিক পরিমাণে গঠিত হয়।

গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ শাসনপ্রণালী বিষয়েও এইরূপ। আদালত প্রভৃতি কি? কেবল শাসনকর্ত্তাদিগের মতমাত্র। পরিবর্ত্তন হইলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি রাজবিধি রাজশাসন প্রভৃতি সমুদায় বিষয় পরিবর্ত্তিত হয়। সমুদায় দেশের ইতিহাস মধ্যে ইহার প্রমাণ অতিস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

এক্ষণে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে জনসমাজের রীতিনীতির বিষয় বল—রাজশাসনের বিষয় বল—অথবা ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র কিম্বা ব্যবহারাদির বিষয় বল—কোন বিষয়েই পূর্ব্বে সুমত সৃষ্টি ভিন্ন সুফল প্রত্যাশা করা যায় না। অনেকে দেশ সংস্কারের জন্য রাজবিধির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন। ইহার ন্যায় ভ্রমাত্মক কার্য্য দুইটী নাই। ইহা রাজবিধির অস্বাভাবিক ভাবমাত্র। পূর্ব্বে লোকাচার পরে রাজবিধি এই সর্ব্বত্রই নিয়ম। তাঁহারা এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে চান। রাজবিধি কাহাদের জন্য?—প্রজাদের জন্য কিন্তু তাহারাই যদি সেই বিধির মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হয় তবে সেরূপ বিধিতে ফল কি? বিধবা বিবাহের আইন ত বহুদিন প্রচলিত হইয়াছে তবে তদ্দারা সমাজ সংস্কারকে আশানুরূপ অগ্রসর করিতেছে না কেন? যে দেশে যথেচ্ছাচার প্রণালী প্রচলিত নয়, সে দেশে প্রজাদিগের মতের দ্বারাই আইন প্রভৃতি নিয়মিত হয়—দুর্বুদ্ধিবশতঃ রাজা বা রাজমন্ত্রী প্রভৃতি কেহ যদি প্রজাদিগের সেই তরঙ্গায়িত মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন তবে অচিরে দেশ

মধ্যে ঘোর বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, রাজায় প্রজায় ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া যায়। ইংলণ্ড ও ফরাসি দেশের ইতিহাসে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ বকল তাঁহার প্রণীত সভ্যতার ইতিহাস নামক গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন ঃ—

"such writers do not perceive that the history of every civilized country is the history of its intellectual development, which kings, statesmen and legislators are more likely to retard than to hasten; because, however great their power may be, they are at best, the accidental and insufficient representatives of the spirit of their time; and because, so far from being able to regulate the movements of the national mind, they themselves form the smallest part of it, and, in a general view of the progress of man, are only to be regarded as the puppets who strut and fret their hour upon a little stage; which beyond them, and on every side of them, are forming opinions and principles which they can scarcely perceive, but by which, alone, the whole course of human affairs is ultimately governed."

"ইহার অর্থ এই—"ঐরূপ লেখকেরা (অর্থাৎ কেবল ঘটনাসমূহের ইতিবৃত্ত মাত্র লেখকেরা) জানেন না যে সভ্যসমাজ মাত্রের ইতিহাস সেই সমাজের মানসিক বৃত্তি নিচয়ের বিকাশের ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাজা রাজনীতিজ্ঞ কিম্বা আইনকর্ত্তা ইহাঁরা এই স্বাভাবিক বিকাশের সাহায্য করা দূরে থাকুক বরং ব্যাঘাত করিয়া থাকেন; কারণ তাঁহাদের ক্ষমতা যত বড়ই হউক না কেন তাঁহারা তাঁহাদের সময়ের বিশেষ ভাবের অতি যৎসামান্য ও আকস্মিক প্রতিনিধিস্বরূপ; কারণ সাধারণের মত শাসন করিতে সমর্থ হওয়া দূরে থাকুক তাঁহারা তাহার এক কণার ন্যায় কোথায় পড়িয়া থাকেন। সাধারণতঃ মনুষ্য জাতির উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিতে গেলে তাঁহাদিগকে ছায়াবাজীর পুতুলের ন্যায় বোধ হয় তাঁহাদের সামান্য রঙ্গ ভূমিতে দুইচারি দিন নাচিয়া কুঁদিয়া সরিয়া পড়েন; এদিকে তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে এরূপ সকল মত ও বিশ্বাস সৃষ্টি হইতে থাকে যাহা কালক্রমে সমাজের সমুদায় কর্ম্মকে নিয়মিত করে।"

শ্রেণী কি নিরবচ্ছিন্ন এই কারণে নয়, যে দেশবাসীদিগের মত এখনও প্রস্তুত নয়, বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে অতি উৎকৃষ্ট রাজবিধি লইয়াও সে দেশে ঘোরতর বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে।

অতএব সর্ব্বাংশেই সকল প্রকার উন্নতির মূলে উন্নত মত সৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অদ্যাবধি জগতের জাতিদিগের ইতিবৃত্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে জগতে চিরকাল জ্ঞানবান্ কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা বহুসংখ্যক অজ্ঞ ব্যক্তি নীত হইয়াছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বহু তর্ক ও বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন সহস্র সহস্র চিন্তাশক্তি-শূন্য ব্যক্তি অবিচারিত চিত্তে তদনুসারে কর্ম্ম করিয়াছে। একবারও তাহার সত্যাসত্যতা অনুসন্ধান করে নাই। অধিক কি এই জগৎ ঘুরিতেছে ইহা প্রমাণ করিতে গালিলিওর মস্তক ঘূর্ণিত হইয়াছিল কিন্তু এখন আমাদের গৃহের ৪ বৎসরের বালিকার নিকট ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কোন কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে জগতে চিরকাল এইরূপে কতিপয় নেতা ও বহুসংখ্যক নীত দেখিতে পাওয়া যাইবে, এবং এরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক বোধ হয় না; কারণ চিরকালই জগতে চিন্তাশীল অপেক্ষা চিন্তাবিহীনের সংখ্যা অধিক থাকিবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বোক্ত সমুদায় কথার সার নিষ্কর্ষ করিয়া বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র গঠন পক্ষে সুমত সৃষ্টি যেরূপ আবশ্যক, সমুদায় সমাজের রীতি নীতি পরিশুদ্ধ করিবার জন্যও সেইরূপ সুমতসৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক। জনসমাজ যে সকল শক্তি দ্বারা চালিত হয়, তন্মধ্যে ধন এবং বুদ্ধি বিদ্যার ন্যায় লোকের মতও একটী প্রধান শক্তি। জনসমাজ এক এক সময়ে এক এক প্রকার মত প্রবল হইয়া কিরূপ কার্য্য করিয়াছে তাহা চিন্তা করিলে একেবারে বিস্মিত হইতে হয়। যেমন গ্রীষ্ম কালের সন্ধ্যাকালে পশ্চিম আকাশে একটু মেঘের সঞ্চার হইয়া দেখিতে দেখিতে সেই মেঘ নভোমণ্ডল আচ্ছাদন করে দুই চারি দণ্ডের মধ্যে ভয়ঙ্কর বাত্যা বা প্রবল বৃষ্টি আনয়ন করে, জনসমাজেও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে এক এক কোণ হইতে একটু মতরূপ মেঘের সঞ্চার হইয়া প্রবল ঝটিকা উপস্থিত করিয়া থাকে। এই জন্যই সুচতুর গবর্ণমেণ্ট মাত্রেই রাজ্যের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের কিরূপ মত তাহা প্রায় অনুসন্ধান করিয়া থাকে এবং বিপদের আশঙ্কা দেখিলে সেই মত গুরুতর আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বেই তাহা নিবারণ করে। আমাদের দেশে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কিছুদিন হইল এইরূপ দুইটী সতর্কতার কার্য্য করিয়াছেন, প্রথম "ওহাবি সম্পদায়ের দমন" দ্বিতীয় পঞ্জাব প্রদেশীয় কুকা নামক শিক সম্প্রদায়ের দমন।" পুনরায় আপনাদিগের রাজ্য স্থাপন করা এই উভয় সম্প্রদায়েরই লক্ষ্য। ওহাবিরা ভিতরে ভিতরে স্বদেশস্থ লোকদিগকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত করিয়া তুলিতেছিল—কুকারাও পুনরায় ভারতে গুরু নানকের শিষ্যদিগের

রাজ্য দেখিবার জন্য আশাপূর্ণ হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছিল। গবর্ণমেণ্ট উভয় দলের দলপতিদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। বিখ্যাত আমীর খাঁ প্রভৃতি ওহাবিদিগের দলপতি, এবং রাম সিংহ নামক এক ব্যক্তি কুকাদিগের দলপতি ছিলেন। ইহাঁদের সকলকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের এরূপ ব্যবহার ন্যায়-সঙ্গত কি না বর্ত্তমানে বিচার করিবার সময় নাই—পাঠকগণ চিন্তা করিয়া স্থির করিবেন। তবে এই মাত্র বলা উচিত যে অন্ততঃ রাম সিংহের প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করা হইয়াছে। তাঁহার শিষ্যদিগের ব্যবহারে যদি কোন ক্রটী হইয়া থাকে থাকিবে, কিন্তু আমরা তাঁহার ব্যবহারে কোন ক্রটী দেখিতে পাই না। তিনি—ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বন্ধুত্ব দেখাইতে কখনই ক্রটী করেন নাই। যাহাঁরা তাহাঁকে দেখিয়াছেন ও তাঁহাঁর সহিত আলাপ করিয়াছেন তাহাঁদের মুখে শুনা যায় যে তিনি বাস্তবিক এক জন পরম ধার্ম্মিক লোক। তাঁহার দৃষ্টান্ত গুণে কুকাদিগের মধ্যে চুরি এবং মিথ্যা কথা নাই বলিলেও হয়। ইংরাজেরা কেবল মাত্র আশঙ্কা নিবারণের জন্য তাহাঁকে এক জন সামান্য বন্দীর ন্যায় ব্রহ্মদেশের এক কারাগারে রাখিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় রাম সিংহ সেখানেও পরম প্রফুল্ল, তাঁহার মুখ কিছুমাত্র মলিন নয়, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেখানেও কয়েদীদিগের মধ্যে তাহাঁর মত প্রচার হইতেছে এবং কয়েদীদিগের মধ্যেই তিনি গুরুরূপে আদৃত হইয়া থাকেন। ভাবিতে চক্ষে জল আসে, ভারতবর্ষ যদি পরাধীন না হইত তাহা হইলে কি এমন নির্দ্দোষ রত্নদিগকে কারাবন্দী হইয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইত!!

সে যাহা হউক, এক একটী সামান্য মত সময়ে সময়ে দেখিতে দেখেতে অতি ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ইহার প্রমাণ। গত বারের আর্য্যদর্শনে পাঠকেরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। “প্রাণ দিব ত জাতি দিব না, কখনই টোটা দাঁত দিয়া কাটিব না” এই মত একটী কি দুইটী সেনাদলে উঠিতে উঠিতে দাবানলের ন্যায় দিগ্‌দিগন্তে প্রধাবিত হইল এবং ভারতক্ষেত্রে ঘোরতর বিদ্রোহাগ্নির শিখা উত্থিত করিল। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্বাধীন দেশ সকলে ইহার দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে “স্লেভওয়ার” অর্থাৎ “দাস যুদ্ধ” হইয়া আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটের অর্দ্ধেক পুরুষ নিঃশেষিত হইয়াছে বলিতে হয়, সেই যুদ্ধ এই মত-সৃষ্টির একটী প্রধান দৃষ্টান্ত। পাঠকগণের অনেকে বিদিত আছেন যে ইউনাইটেড ষ্টেটের দক্ষিণ বিভাগে বহুদিন অবধি দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল; দেশের আইনও এই রাক্ষসতুল্য ব্যবহারের সহায়তা করিত। আফ্রিকার হতভাগ্য কৃষ্ণবর্ণ সন্তানেরা

দলে দলে পশুর ন্যায় আমেরিকার বাজারে ক্রীত ও বিক্রীত হইত। ক্রয়-কর্ত্তার হস্তে তাঁহাদের জীবন মৃত্যু থাকিত। ক্রয়কর্ত্তা শ্বেতকায় প্রভু কখনও কখনও প্রহার করিতে করিতে সেই হতভাগ্যদিগকে একেবারে নিধন করিতেন—কখনও মাতার ক্রোড় হইতে দুই বৎসরের শিশুকে কাড়িয়া অপরের নিকট বিক্রয় করিতেন—কখন বা কোন দাস যুবার প্রণয়ের পাত্রী যুবতীকে বলপূর্ব্বক ছিঁড়িয়া অপর প্রভুর নিকট বিক্রয় করিতেন—এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে তাহাদিগকে পশুর ন্যায় ব্যবহার করি-তেন, এইরূপে দশ বৎসর গেল—বিংশতি বৎসর গেল—ত্রিশ বৎসর গেল—অবশেষে আমেরিকাবাসী দুই এক জনের চক্ষু ফুটিতে লাগিল—দুই একটী রসনা এই দুর্নীতির অযশ ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে চ্যানিং, থিয়োডোর পার্কার প্রভৃতি দেখা দিলেন, ক্রমে "টম্ খুড়ার কাবিন" প্রকাশিত হইল; এবং সমুদায় উত্তর বিভাগ একস্বরে চীৎ-কার করিয়া উঠিল—"এপ্রথা আর থাকিতে দিব না"। তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। কি চমৎকার দৃশ্য! আফ্রিকার দাসদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য শত শত শ্বেতকায় মার্কিন সন্তান প্রাণ উৎসর্গ করিল; রক্তে সরোবর সকল পূর্ণ হইল এবং নরশরীরে পর্ব্বত নির্ম্মাণ হইয়া গেল। দক্ষিণ বিভাগের লোকেরা বলিল "এ প্রথা তুলিলাম" তবে সে সমরাগ্নি নির্ব্বাণ হইল। আমাদের দেশের নীলকরদিগের দমন ও মহান্তের দণ্ড এই দুইটীকে মত-সৃষ্টির দৃষ্টান্তস্বরূপ দেওয়া হইতে পারে। নীলকর ভায়ারা মফঃস্বলের হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়া আছেন। বাঙ্গালির প্রাণ মক্ষিকার প্রাণের ন্যায় জ্ঞান করেন—বাঙ্গালির শ্রম নিজের পৈতৃক ক্রীতদাসের শ্রমের ন্যায় বিবেচনা করেন—গরিব প্রজাদের স্ত্রী ও কন্যাদিগকে আপনাদের ধনে প্রতিপালিত রক্ষিত বেশ্যার ন্যায় মনে করেন—এইরূপে কিছুকাল গেল অবশেষে পশ্চিমে একটু মেঘের সঞ্চার হইতে লাগিল। মৃত হরিশ্চন্দ্রের লেখনী দুই এক কথা লি-খিতে লাগিল দুই এক জন পত্রপ্রেরক দুই এক পংক্তি পাঠাইতে লাগিল—দুই এক স্থানে সেই কথাবার্ত্তা চলিল। অবশেষে সেই ক্ষুদ্র মেঘ গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল—ক্রমে নীলদর্পণ প্রকাশ হইল—লঙের কারাগার হইল—এবং দেখিতে দেখিতে দেশ জ্বলিয়া উঠিল। শ্বেতকায় ভায়াদেরও মনোময় রাজ্যের অবসান হইল।

মহান্তের ব্যাপারটীও মতসৃষ্টির একটী প্রধান দৃষ্টান্ত। এই মোকদ্দমার সময় বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলের মন কিরূপ আন্দোলিত হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। উপরে যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা গেল তাহাতে একটী কৌতুকজনক ভাব দেখা যায়। তাহা এই—যেমন একটী অগ্নিশিখা জ্বলিলে চারিদিক্ হইতে বহুতরঙ্গ আসিয়া তাহাকে

আলিঙ্গন করে, সেইরূপ একটী মত উৎসাহ ও বিশ্বাসের সহিত দাঁড় করাইতে পারিলে, লোকের সহানুভূতি আসিয়া তাহার সহায়তা করে। সে মত কেন সত্য তাহা কেহ ভাবিবার কষ্ট স্বীকার করে না; এবং রাজপথে "মরি মার" শব্দ উঠিলে যেমন যে শুনে সেই বলে "মার মার" সেইরূপ কোন সামাজিক মতের বায় উঠিলে, সে বায়ু যেখানে যায় সেখানেই লোকে সেই মত গ্রহণ করে। জনসমাজের এই বিচিত্র মতসৃষ্টি প্রণালী থাকাতে অনেক সুচতুর লোক অনেক সময় আপনাদের অনুকূল মতসৃষ্টি করিয়া স্বার্থ সাধন করিয়া লয়। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে মৃত তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রুসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ফরাসিদিগের বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য বেতন দিয়া কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা পথে পথে "ফ্রান্সের জয় প্রসিয়ার পরাজয়" এই কথা ঘোষণা করিয়া বেড়াইত। কবিবর সেক্সপিয়র তাঁহার প্রণীত জুলিয়সসিজার নামক নাটকে চিন্তাহীন সাধারণ লোকের এইরূপ মতচাঞ্চল্য অতি চমৎকার রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, এখনও এই প্রশ্নের বিষয় চিন্তা করিলেই সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাদিগের কথা প্রথমেই স্মরণ হয়। ইহারা সভ্যসমাজে মতসৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান যন্ত্রস্বরূপ। কিন্তু মত দুইপ্রকার একপ্রকার সাময়িক ও ক্ষণিক—আর একপ্রকার স্থায়ী ও বহুকালসাধ্য, দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর বরদার গুইকুমারকে কারাগার হইতে মুক্ত করা আবশ্যক; এই একমাত্র কার্য্য সাধন করিবার জন্য আমরা সংবাদপত্রে তাঁহার প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের অবিচারের কথা আন্দোলন আরম্ভ করিলাম; মনে কর ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রজাদেরই মত হইল; মনে কর ইংলণ্ডের সংবাদপত্র সকল পর্য্যন্ত সেইমত অবলম্বন করিলেন; অবশেষে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে আমাদের কথা শুনিতে হইল। এই সাময়িক লক্ষ্য সিদ্ধ হইলে আমাদের সাময়িক উত্তেজনারও কারণ চলিয়া গেল। কিন্তু আর একপ্রকার স্থায়ী ও বহুদিনসাধ্য মত আছে। মনে কর বঙ্গবাসিরা ভীরু—সমগ্র জাতিকে সাহস ও শৌর্য্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক; তাহার উপায় কি? তাহার উপায় সাহিত্য। আমাদের কবিরা শৌর্য্যের প্রশংসা করিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করুন; আমাদের নাটককারেরা সেইরূপ নাটক প্রণয়ন করুন; আমাদের পুত্র কন্যাদিগের হস্তে যে সকল পুস্তক ও পুস্তিকা পড়িবে সে সকল এই ভাবে পূর্ণ হউক; এইরূপে দুই এক শতাব্দীর মিলিত মত ও শিক্ষার গুণে অবশেষে বঙ্গসমাজে শৌর্য্যের সঞ্চার হইবে। দেশের লোকের রুচিও এইরূপে গঠিত হয়। প্রতিভাশালী লেখকদিগের এবিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা দেখা যায়। তাঁহাদের শক্তি ও প্রতিভাগুণে মুগ্ধ হইয়া লোকে অপর সাধারণ

অপেক্ষা তাঁহাদের মত ও রুচি অতি শীঘ্রই অবলম্বন করে; এমন কি তাঁহাদের এক এক জন চিরপ্রচলিত রুচি ও প্রবৃত্তি প্রভৃতি একেবারে ফিরাইয়া ফেলিতে পারেন। এরূপ গ্রন্থকারদিগকে "যুগ প্রবর্ত্তক" (Epoc-making) গ্রন্থকার বলিয়া থাকে। সুতরাং সেরূপ ব্যক্তির বিবেচনার ত্রুটীতে অথবা বিকৃত মত বা রুচির দোষে সমগ্র জাতির রুচি ও প্রবৃত্তি বিকৃত হইতে পারে। যতদিন না দ্বিতীয় কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন ততদিন সেই পথেই লোকের প্রবৃত্তিস্রোত বহিতে থাকে। ইংলণ্ডের কবিদিগের মধ্যে পোপ ও কাউপারের এইরূপ সম্বন্ধ দেখা যায়। আমাদের দেশের কবিদিগের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং মাইকেলের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের বাঁধুনী অনুপ্রাস ও বর্ণবিন্যাস কৌশল বহুদিন দেশে আদৃত হইয়াছিল। তাহার পর মাইকেল মধুসূদন দত্ত সে রুচি ফিরাইয়া গিয়াছেন। এই কারণেই ত দেশের প্রতিভাশালী লেখকদিগের কুরুচির চিহ্ন দেখিলে হৃদয়ে এত বিরক্তি জন্মে।

সংবাদপত্র ও সাহিত্য ব্যতিরেকে মত-সৃষ্টির আর একটী প্রবল উপায় আছে। মত-প্রচারকের নিজের অকপট বিশ্বাস ও স্বয়ং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আগ্রহ। মৃত মহাত্মা জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ ইহার একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যীশুর প্রথম শিষ্যদিগের ধর্ম্ম-প্রচারের কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "যখন ষ্টিফেনকে লোকে লোষ্ট্রাঘাতে হত্যা করে তখন কে ভাবিতে পারিত যে সেই ষ্টিফেনের মত অবশেষে জগতে জয় লাভ করিবে এবং সেই আঘাতকারীদিগের মত কালে কালগ্রাসে পতিত হইবে। মনুষ্যের আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের শক্তি অসীম। আমার দৃঢ় সংস্কার এই আগ্রহ ব্যতিরেকে কোন জাতির সামাজিক সংস্কার হইতে পারে না। অর্দ্ধ জাগ্রত অর্দ্ধ-নিদ্রিত ভাবে মত প্রচার করিলে লোকেও অর্দ্ধ-জাগ্রত অর্দ্ধ-নিদ্রিতভাবে শুনিয়া থাকে। কেবল মুখ ভারতী ও অভিধানের শ্রাদ্ধ করিয়া কখনই কোন জাতির উন্নতি হয় নাই। ইংলণ্ডের বিষয় চিন্তা কর—দুর্ব্বল চঞ্চলচিত্ত ফ্রান্সেরও বিষয় চিন্তা কর—লোকে ধর্ম্মের জন্য যে আগ্রহ প্রকাশ করে এ সকল স্থানের লোকেরা রাজনীতি বিষয়ে সেইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। এই জন্যই সকল বিষয়ে এত শীঘ্র উন্নতি হয়। আমাদের দেশে কত উদ্দেশ্যে কত সভা স্থাপিত হইতেছে এবং দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় আবার সমাজের হৃদয়েই মিলাইয়া যাইতেছে—কিন্তু ইংলণ্ডে এক সুরাপাননিবারিণী সভার উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিলে অবাক হইতে হয়। তাঁহারা ৫ বৎসর একাদিক্রমে আপনাদের মত পার্লেমেণ্ট সভায় গ্রাহ্য করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রতি বৎসরেই বিফল হইতেছেন—তথাপি

আবার দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন; পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে অনুমান দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং প্রতিদিন সুরাপান নিবারণার্থে পুস্তক পত্রিকা—চিকিৎসকদিগের মত প্রভৃতি মুদ্রিত করিতেছেন। এরূপ আগ্রহ ও অধ্যবসায় ব্যতিরেকে কোন সামাজিক উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সামাজিক রীতি নীতি রুচি প্রবৃত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহা এক প্রকার নির্দ্ধারিত হইল। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে আমাদের আরও গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। সমাজের মত বিকৃত থাকিলে মনুষ্যকে সামাজিক সাংসারিক ও পারিবারিক কত প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে আমাদিগকে এইরূপ অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে; আমরা একদিকে যেরূপ আর্য্যজাতির জগদ্বিখ্যাত সদ্‌গুণ সকলের উত্তরাধিকারী হইয়াছি, অপরদিকে তাঁহাদের দূষিত মতের ফল স্বরূপ অনেক সামাজিক অসুবিধারও উত্তরাধিকারী হইয়াছি। আমাদের সকলেরই চেষ্টা করা উচিত—কারণ তাহা আমাদের সকলেরই সাধ্যায়ত্ত—আমাদের সকলেরই চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে ভাবী বংশধরেরা আসিয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজ দেখিতে পায়—যাহাতে আমাদের পুত্র কন্যারা সুমত শুনিতে পায় ও সুদৃষ্টান্ত দেখিতে পায়। সভ্যতার সংগ্রাম ঘোরতর সংগ্রাম! সন্তান সন্ততি আর কিছু দেখিতে না পায় এই দেখুক যে আমরা রণসজ্জা করিতে করিতে মরিয়াছি—জয় লাভ ঈশ্বর তাহাদের জন্য রক্ষা করুন। যে সকল দুর্ভাবনা মধ্যে মধ্যে ঘন নিবিড় মেঘের ন্যায় আমাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে—যে সকল অনুতাপের অগ্নিশিখা মধ্যে মধ্যে আমাদের হৃদয় মন দগ্ধ করে—যে সকল অশ্রু-বারি মধ্যে মধ্যে নিরাশা ও ক্ষোভের সাক্ষ্যরূপে দুই গণ্ডে প্রবাহিত হয়, আর কিছু না পারি যদি স্নেহের ধন পুত্র কন্যাদিগকে সেই দুর্ভাবনা সেই অনুতাপ সেই নিরাশা ও সেই অশ্রুজল হইতে রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলেও যথেষ্ট।

তবে মুছি অশ্রু উঠিয়া দাঁড়াই:
যা হবার হলো এ জনম গেল
বিষম সংগ্রামে, তাতে দুঃখ নাই।
রক্তবিন্দু হতে শুনি এ জগতে
শত রক্তবীজ জন্মে যে প্রকার!
জীবন সংগ্রামে ভারতের নামে
যত রক্তবিন্দু পড়িছে এবার,
শত পুত্র হবে বীর অবতার!
ভারত আঁধার ভারতের ভার
ঘুচাইবে তারা;—ভেবে মরে যাই।

শ্রীশিঃ—

আদিশূরের সময় নিরূপণ।

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের শাখা ও প্রশাখা।

ব্রাহ্মণপঞ্চকের বংশাবলীর বিশেষ বিশেষ বিবরণ লিখিবার অগ্রে তাঁহারা, কোন্ সময়ে এদেশে আগমন করেন তাহা নির্দ্ধারণ করা উচিত।

আমরা তদনুসারে কৃষ্ণচন্দ্র-চরিতের বচন দ্বারা আদিশূরের সময় নিরূপণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। ঐ পুস্তকের বচনে সামান্যাকারে অব্দ শব্দ মাত্র লেখা আছে *।

সুতরাং ঐ অব্দ পদের শক্তি শক ও সংবৎ উভয়েতেই যাইতে পারে; কিন্তু সংবৎ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া শক অর্থ ধরিলে শতাধিক বৎসর কালের ন্যূনতা ঘটে এজন্য সংবৎ অর্থই অবশ্য গ্রহণ করিতে হয়।

ঐ অর্থ গ্রহণ না করিলে কৌলীন্যাদি সংস্থাপনের কালের সঙ্গে বিশেষ অনৈক্য ঘটে। এমন কি ১৩৬ বৎসরের পশ্চাৎবর্ত্তী হইতে হয়। তদ্দ্বারা ছয় পুরুষের সময়ের ব্যতিক্রম জন্মে। সুতরাং সংবৎ অর্থই গ্রহণযোগ্য বলিয়া জ্ঞান হয়। সংবৎ অর্থই যে প্রকৃত তাহার প্রামাণ্য সংস্থাপন নিমিত্ত কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত বোধে এখানেই লিখিত হইল।

১ম যখন দেখা যাইতেছে যে আদিশূরের সময় হইতেই বঙ্গদেশের বৌদ্ধগণের পরাক্রম নষ্ট হয়। বঙ্গে তিনিই পুনর্ব্বার বৈদিক ক্রিয়া কলাপের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান করেন এবং বৈদিক ধর্ম্মানুযায়ী শাস্ত্রসম্মত আচার ব্যবহারাদি প্রকৃত পদ্ধতিক্রমে প্রবর্ত্তিত করেন ‡।

তাঁহার রাজত্বকালের পূর্ব্বে গৌড়রাজ্যে যে মহামহীশ্বরগণের অধিকার ছিল, তাঁহারা শৈব ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাব ও বৈদিকধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের মধ্যবর্ত্তি কালে শৈবধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। ভারত ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থলের অনার্য্যদিগের মধ্যে শৈবধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, বোধ হয় তাহাদিগের সাহায্যেই বৌদ্ধধর্ম্ম নিরাকৃত হয়। অতএব আমাদিগকে এক্ষণে শৈবমতাবলম্বী রাজাদিগের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত নরপাল-

* আদিশূরো নবনবত্যধিকনবশতশতাব্দে পঞ্চব্রাহ্মণানানয়ামাস। কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত।

‡ শ্রীমদাদিশূরোঽভবদবনিপতি র্ধর্ম্মিরাজোবশাস্তা
সল্লোকঃসদ্বিচারৈরদিতিসুতপতিঃস্বর্যথাসীত্তথাসীৎ।
প্রাতাপাদিত্যাত্তপ্তাখিলতিমিরস্তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা
জিত্বাবুদ্ধাংশ্চকার স্বয়মপি নৃপতির্গৌড়রাজ্যান্নিরস্তান্।।
ধনঞ্জয়কৃত কুলপ্রদীপ।

দিগের রাজত্ব ও শৈবদিগের পরেই বৈদিক ধর্ম্মের প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। অনেকেই জানেন যে পালবংশীয়েরা গৌড়রাজ্যে আদিশূরের অনেক পূর্ব্বে রাজত্ব করেন। এবং তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, পালবংশীয়দিগের পরেই বঙ্গে কাম্বোজবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ রাজত্ব করেন। তাঁহাদিগের এক জন গৌড়ের রাজধানী দিনাজপুরের অন্তর্গত বাণরাজার বাটীতে (এক্ষণে থানা গঙ্গারামপুরের অধীন অরণ্য বিশেষ) বিরুপাক্ষের মন্দির প্রস্তুত করান। মন্দিরটী প্রস্তরময়। ঐ মন্দিরের একটী প্রস্তরস্তম্ভ দিনাজপুরের রাজবাটীতে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহার মূলে যে শ্লোকটী লিখিত আছে তাহার অর্থ সংগ্রহ করিলে তাঁহাকে ৮৮৮ সংবতে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা (দিনাজপুরের রাজবাটীতে অনুসন্ধান কর) করিতে অধিকারী বলা যাইতে পারে এবং তাঁহারা যে শৈব ছিলেন সেটীও বিশেষরূপে প্রতীতি হইতে পারে। সুতরাং এক্ষণে আদিশূর যে সময়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন পূর্ব্বক বৈদিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করেন তাহার অব্যব হিত পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সঙ্গে মিল হয়। *

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ধ্বংশের পরেই এক কালে বৈদিক ধর্ম্মের সর্ব্বথা প্রচার সম্ভবপর বোধ হয় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অন্তর্ধানের পরেই এবং বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের পূর্ব্বে কিছুকাল বিমিশ্র অদ্বৈতবাদের প্রচার থাকা আবশ্যক করে। বিচার অনুসারে দেখিতে গেলে অন্ততঃ দুইশত বৎসর অর্থাৎ ৮৮৮ পূর্ব্বে অন্ততঃ এক শত বৎসর ও পরে আর এক শত বৎসর না অতিক্রম করিতে পারিলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরেই বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠা সুসঙ্গত হয় না। কারণ অশোকের সময় হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এদেশে প্রবল হয়, পালবংশীয়দিগের সময় পর্য্যন্ত সতেজ থাকে। তৎপরে কাম্বোজ বংশের সময়ে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আদিশূরের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম একেবারে নির্ধূম হয়। অশোকের সময় সংবতের পূর্ব্ব প্রায় শতাধিক বর্ষ। কাম্বোজদিগের সময় প্রায় ৮৮৮ সংবৎ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রায় সহস্র বৎসর কাল পরে শৈব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। তৎপরে শতাধিক বর্ষ গত হইলে ৯৯৯ সংবতে আদিশূর বৈদিক অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন। এখন দেখ যে আচার ব্যবহার সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত অবাধে চলিয়া আসিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ হঠাৎ কদাচ সম্ভব বোধ হয় না। তাহাকে এককালে তিরোধান

* দুর্ব্বারারিবরূথিনীপ্রমথনে দানেচ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণ গুণগ্রামগ্রহো গীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ম্
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণভূভূষণঃ॥

করিতে ন্যূন কল্পে দুই শত বর্ষকাল গত হইয়াছে একথা স্বীকার করিতে বোধ হয় কোন বিচক্ষণ লোকেরই অরুচি জন্মিবে না।

আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আনয়ন করেন। বল্লাল উহাদিগকে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন। লক্ষ্মণসেন কুলীনদিগের মর্য্যাদার সমীকরণ করেন। আদিশূর খৃঃ দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন এবং খৃঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে অর্থাৎ খৃঃ ১০৫৬ অব্দে পুত্রেষ্টি যাগ করেন।

প্রমাণ এক্ষণে	সংবৎ	১৯৩৫
ঐ	শালিবাহন শক	১৭৯৬
ঐ	খৃষ্টীয় শক	১৮৭৫
সংবতের সহিত শকের অন্তর		১৩৫
ঐ খৃ	ঐ	৫৭

এখন দেখা যাইতেছে যে ৯৯৯ সংবৎ অর্থাৎ যে বর্ষে পুত্রেষ্টিযাগ হয় সে বৎসর খৃঃ—১০৫৬। আইন আকবরীর মতে ১০৬৬ খৃঃ বল্লালসেন রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন।

লক্ষ্মণসেনের সময়ে তৎসভাসদ্ জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচিত হয়। গীতগোবিন্দে পূতিতুণ্ডবংশীয় গোবর্দ্ধনাচার্য্যের উল্লেখ আছে।

লক্ষ্মণের মন্ত্রী হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব রচনা করেন, ও কবিরহস্য নামেও একখানি ধাতুপাঠ প্রস্তুত করেন। তাঁহার অভিধানও প্রসিদ্ধ। ইনি দক্ষের সন্তান, ও চট্টবংশসম্ভূত। ইনি লক্ষ্মণের নিকট পরম মান্য ছিলেন *। (ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বের শেষ পরিচয়ে লিখিত আছে) ঘটকদিগের মিশ্রগ্রন্থের কারিকা দেখ তাহাতেও পূতিতুণ্ডবংশের গোবর্দ্ধনাখ্য ও চট্টবংশীয় হলায়ুধের কৌলীন্য প্রাপ্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১২২৩ খৃ অব্দ পর্য্যন্ত মাধব ও কেশব সেনের রাজত্বকাল। তৎপরে লক্ষ্মণসেন ভূমিষ্ট হইয়া ১২০৩ খৃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এবং এই লক্ষ্মণকেই গোবর্দ্ধন ও হলায়ুধের সমকালীন না বলিলে, তাঁহাদিগের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ কুলীন উৎসাহ মুখোপাধ্যায়কে শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদশ সন্ততি বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। বস্তুতঃ উৎসাহ যে শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদশ সন্তান তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই †। বিবেচনা

* বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহ দ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনঃ
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিঃক্ষ্মাপতিঃ।

৪ শ্লো গীতগোবিন্দ ১ম সর্গ।

† বহুরূপঃসুষেণোনাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চসমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥
পূতি গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরোঘোষালসম্ভবঃ।
গাঙ্গুলীয়ঃশিশোনাম্না কুন্দো রোষাকরোঽপিচ॥

কর ৯৯৯ সংবতে শ্রীহর্ষের বয়ঃক্রম অন্যূন ৯০ বৎসর। তৎকালে তিনি তাঁহার অধস্তন ধারাবাহিক চারি পুরুষের মুখাবলোকন করিতে সমর্থ। তখন খৃ ১০৫৬। যখন ১২০৩ খৃঃ অব্দ তখন মহারাজ লক্ষ্মণ রাজ্যচ্যুত হন। অনুমান ৯০ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীহর্ষ বিক্রমপুরে আসিয়া থাকিবেন। তৎকালে তাঁহার পুত্রের পৌত্র হওয়া সম্ভব। তাহা হইলে শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদয় পুরুষে উৎসাহে কৌলীন্য সংস্থাপনের অনুসন্ধানের সহিত মিল হয়। ১০৫৬ হইতে ১২০৩ খৃঃ অব্দ প্রায় দেড়শত (১৪৯) বৎসর অন্তর। গড়ে প্রত্যেক ২০ বর্ষে যদি এক পুরুষের কাল ধরা যায় তাহা হইলে সার্দ্ধ শতাব্দীতে ৭ পুরুষের জন্মের সম্ভব। এক্ষণে যদি শ্রীহর্ষের পঞ্চম পুরুষের সহিত এই সাত পুরুষের সমষ্টি করা যায় তাহা হইলে লক্ষ্মণ সেনের সময় শ্রীহর্ষের অধস্তন দ্বাদশ সন্ততি উৎসাহে কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপন সুসঙ্গত হয়। লক্ষ্মণ সেন রাজ্যভ্রষ্ট হইবার কিছু পূর্ব্বেই কুলীনদিগের মর্য্যাদার সমীকরণ করেন।

শ্রীহর্ষের বংশাবলী দেখ।‡

জাহ্লনাখ্যস্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ।
দেবলোবামনশ্চৈব ঈশানোমকরন্দকঃ॥
উৎসাহগরুড়াখ্যাতো মুখবংশসমুদ্ভবৌ।
কান্যকুতূহলাবেতৌ কাঞ্জিকুর্লপ্রতিষ্ঠিতৌ॥
ঊনবিংশতিসংখ্যাতা মহারাজেনপূজিতাঃ॥
ধ্রুবানন্দ মিশ্র।

† বভূব তস্যাং প্রকৃতের্মহানিব
শ্রিয়োনিবাসায়তনং হলায়ুধঃ।

এইগুলি পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে আদিশূরের সময় মিল হইতে পারে। আদিশূরের সময় হইতে এক্ষণে শ্রীহর্ষের ৩৪ পুরুষ হইয়াছে।

(১) শ্রীহর্ষ—মূল।
(২) শ্রীগর্ভ—পুত্র।
(৩) শ্রীনিবাস—পৌত্র।

‡ যৎকীর্ত্তিরম্ভোনিধিবীচিদণ্ড-
দোলাধিরোহব্যসনং বিভর্ত্তি॥ ১
লব্ধংজন্ম ধনঞ্জয়াদ্গুণবতঃ শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতে-
রাবৃত্যা লঘুতা নিজস্য বয়সঃপ্রাপ্তা মহাপাত্রতা।
শব্দব্রহ্মকরামলকবদ্ভোগোত্তরা সংক্রিয়ে
অস্তিপ্রার্থয়িতব্যমস্য কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন সাংসারিকম্॥ ২
যেনাসীদজিতং নসিন্ধুলহরীধৌতাঞ্জনায়াং ক্ষিতৌ
যস্যাজ্ঞাপ্তমভূনসপ্তভুবনে নানাবিধং বাঙ্ময়ম্।
দেবঃস ত্রিজগন্ময়স্যমহিমা শ্রীলক্ষ্মণঃ ক্ষ্মাপতিঃ
নেতা যস্য মনীষিতা ন্নিকৃপুরস্কারোত্তরাঃ সম্পদঃ॥ ৩
বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল-
শ্ছাত্রোৎসিক্তমহামহত্তনুপদংদত্তানয়ে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলং ক্ষ্মাপাল-নারায়ণঃ
শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতি ধর্ম্মাধিকারং দদৌ॥ ৪

(৪) আরব—প্রপৌত্র।
(৫) ত্রিবিক্রম—বৃদ্ধপ্রপৌত্র।
(৬) কাক—অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র।
(৭) (ধাঁধু) সাধু—বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র।
(৮) জলাশয়—অষ্টম পুরুষ।
(৯) বাণেশ্বর—দশম পুরুষ।
(১০) (গুঁই) গুহ—একাদশ ঐ।
(১১) মাধব—দ্বাদশ ঐ।
(১২) কোলাহল—ত্রয়োদশ ঐ।
(১৪) উৎসাহ—প্রথম কুলীন।
(১৫) আহিত—কুলীনপুত্র।
(১৬) উদ্ধব—কুলীনপৌত্র।
(১৭) শিব—ঐ পৌত্র।
(১৮) নৃসিংহ—ঐ প্রপৌত্র।
(১৯) গর্ব্বেশ্বর—ঐ বৃদ্ধপ্রপৌত্র।
(২০) মুরারি—ঐ অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র।
(২১) অনিরুদ্ধ—ঐ বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র।
(২২) লক্ষ্মীধর—(সর্ব্বদ্বারী বিবাহ. তাঁহার সময়ে লোপ পায়।)
(২৩) মনোহর—মেলবন্ধনের কুলীন।
(২৪) গঙ্গানন্দ—পুত্র।
(২৫) রামাচার্য্য—পৌত্র।
(২৬) রাঘবেন্দ্র—প্রপৌত্র।
(২৭) নীলকণ্ঠ—বৃদ্ধপ্রপৌত্র।
(২৮) বিষ্ণু—ফুলেমেলের প্রধান।
(২৯) রামদেব—পুত্র।
(৩০) সীতারাম—পৌত্র।
(৩১) সদাশিব—প্রপৌত্র।
(৩২) গোরাচাঁদ।
(৩৩) ঈশ্বর—খড়দহনিবাসী।
(৩৪) অমুক—(অজ্ঞাত)

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী ও সমাধ্যায়ী ছিলেন। যদি চৈতন্যের সময় ঠিক করা যায় তাহা হইলে রঘুনন্দনকে প্রায় চারি শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক স্থির করিতে হয় *। এবং তিনি যদি তাঁহার গ্রন্থে কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে প্রমাণ স্থলে গ্রহণ করেন তাহা হইলে তৎকালের প্রথা অনুসারে তাঁহাকে অন্ততঃ তিন পুরুষের অগ্রবর্ত্তী বলিতে হয়। তাহা হইলে কুল্লূকভট্টকে আমরা ত্রয়োদশ শকের লোক মনে করিতে পারি †। কুল্লূকভট্ট আপনার পরিচয় স্থলে নিজ কুলের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন ঐ মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহাকে বল্লালের উত্তরবর্ত্তী পুরুষ বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে ‡।

* উদ্বাহতত্ত্ব কন্যাদান প্রকরণে—
নিয়োগ বিষয়ে—
যস্যাম্ভ্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যকৃতে পতিঃ
তামনেন বিধানেন নিজোবিন্দেত দেবরঃ।
যথাবিধ্যভিগম্যৈনাংশুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাং
মিথো ভজেতাপ্রসবাৎসকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ॥
আগর্ভগ্রহণাৎ সকৃদ্গমনোপদেশাচ্চ
যস্মৈবাগ্‌দত্তা তস্যৈবাপত্যোভবীতি
কুল্লূকভট্টঃ॥
রঘুনন্দন।

† শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতারী।
অষ্ট চব্বিশ বৎসর প্রকটবিহারী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত ছাপান্নে ইহাঁর অন্তর্দ্ধান॥
চৈতন্যচরিতামৃত।

কানাকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের অধস্তন সন্ততিবর্গের বিদ্যাব্রাহ্মণ্য অতি অল্প কালে লোপ পাওয়া সম্ভবপর বোধ হয় না।

এখন দেখ যদি হলায়ুধ চট্টো উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের সমকালীন হন এবং তৎসমান পর্য্যায়ের লোক গোবর্দ্ধন—লক্ষ্মণের সভাসদ্ বলিয়া স্থির করা যায়, তাহা হইলে লক্ষ্মণকে আদিশূরের ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ পুরুষ উত্তরবর্ত্তী বলিতে হয়। এইটী বলিলেই উৎসাহ হইতে প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর অগ্রবর্ত্তী হইতে হয়। তাহা হইলে আদিশূর যে বল্লালের পিতামহ বা মাতামহ পর্য্যায়ের লোক নহেন তাহাও স্থির হয়। অর্থাৎ নিদান পক্ষে চতুর্দ্দশ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যায়। সুতরাং কায়স্থদিগের ২৫।২৬ পর্য্যায়ের সঙ্গে বল্লালের প্রদত্ত কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদানের কালের ঐক্য হয়। এক্ষণে কায়স্থদিগের, ২৫।২৬ পর্য্যায়ের অগ্রে ১০ পুরুষ যোগ কর, ব্রাহ্মণ দিগের ৩৫।৩৬ পুরুষের সঙ্গে ঠিক মিলিয়া যাইবে। এবং প্রত্যেক পুরুষের গড় পড়তায় একটা মোটামুটী কাল ২৬ বৎসর ধর তাহা হইলে ৩৬ + ২৬ হইবে = ৯৩৬। ৯৩৬ হইতে ৯০০ শত বৎসর অগ্রবর্ত্তী হও, আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণের আনয়নের কালের ৯৯৯ অব্দের সঙ্গে যোগ কর, অদ্যকার সময়ের সঙ্গে মিল হইবে অর্থাৎ ১৯৩৬ বৎসরের নিকটবর্ত্তী হইবে।

শ্রীলা

‡ গৌড়ে নন্দনবাসিনাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাংকুলে
শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লূকভট্টোভবৎ।
কাশ্যামুত্তরবাহিজহ্নুতনয়াতীরে সমং পণ্ডিতৈঃ
তেনেয়ং ক্রিয়তে হিতায় বিদুষাংমন্বর্থমুক্তাবলী॥
মীমাংসে বহুসেবিতাসি সুহৃদস্তর্কাঃ সমস্তাঃ স্থ মে
বেদান্তাঃপরমাত্মবোধগুরবো যূয়ং বয়োপাসিতাঃ।
জাতা ব্যাকরণানি বালসখিতা যুষ্মাভিরভ্যর্থয়ে
প্রাপ্তোহয়ং সময়ে মনূক্তিবিবৃতৌ সাহায্যমালম্ব্যতাং॥
মনুটীকার ভূমিকা।

বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মনুষ্যের যত প্রকার বিবাহ ঘটিতে পারিত, মনু তৎসমুদায়কে আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন:—যথা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ। (১)

বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা কন্যাবরের আচ্ছা-

দন ও পূজন পুরঃসর বিদ্যা-সদাচার-সম্পন্ন অপ্রার্থক বরকে কন্যাদান করার নাম "ব্রাহ্ম" বিবাহ। (২)

হিন্দুদিগের মধ্যে এই বিবাহ সর্ব্বত্র প্রচলিত।

অতি বিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি, যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তা ঋত্বিককে সালঙ্কৃত কন্যা দান করাকে "দৈব" বিবাহ বলা যায়। (৩)

এই প্রকার বিবাহ এক্ষণে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত এবং ইহার পুনঃপ্রবর্ত্তনারও কোন আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না।

বরের নিকট হইতে এক বা দুই গোমিথুন গ্রহণ-পূর্ব্বক যে কন্যাদান, তাহার নাম "আর্ষ" বিবাহ। (৪)

এই বিবাহও এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অপ্রচলিত রহিয়াছে। ইহারও পুনঃ প্রবর্ত্তনা অনাবশ্যক।

"তোমারা উভয়ে ধর্ম্মের আচরণ কর" বর ও কন্যাকে এই কথা বলিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক কন্যা দানের নাম প্রাজাপত্য বিবাহ। (৫)

কন্যার পিত্রাদিকে এবং কন্যাকে শক্ত্যনুসারে শুল্ক দিয়া বরের স্বেচ্ছানুসারে যে কন্যা গ্রহণ, তাদৃশ বিবাহকে আসুর বিবাহ বলা যায়। (৬)

কন্যা এবং বর উভয়ের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয় তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা যায়। (৭)

গান্ধর্ব্ব বিবাহ এক্ষণে প্রচলিত নাই। এই বিবাহের পুনঃ প্রচলন আরম্ভ হইলে কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রূণহত্যার ভীষণ পাতকে দূষিত ও কলঙ্কিত হইবে না। তাহা হইলে প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর পবিত্র সম্মিলন আর ব্যভিচার নামে আখ্যাত হইবে না। তাহা হইলে কত দুষ্মন্ত ও কত শকুন্তলা আমাদের নয়নসমক্ষে রমণীয় আকার ধারণ করিবে, এবং কত ভরত কত আলেক্জাণ্ডার ও কত যীষস্ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া জগতের সিংহাসন অধিকার করিবেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

---

(১) ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ। গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ॥ ৩।২১

(২) আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং। আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩।২৭

(৩) যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে। অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে। ৩।২৮

(৪) একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ। কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥ ৩।২৯

(৫) সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ। কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৩।৩০

(৬) জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ। কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে। ৩।৩১

(৭) ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ। গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥ ৩।৩২

আসুর বিবাহ অনেকস্থলে প্রচলিত রহিয়াছে। বংশজ ও শ্রোত্রিয় বরের বিবাহে এইরূপ শুল্ক দেওয়ার প্রথা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

বিপক্ষ কন্যাপক্ষীয়দিগকে হত ও আহত করিয়া প্রাচীরাদি ভেদ পূর্ব্বক রোরুদ্যমানা ক্রোধান্বিতা কন্যার হরণের নাম রাক্ষস বিবাহ। (৮)

নিদ্রায় অভিভূতা বা মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা অনবধানযুক্তা স্ত্রীকে নির্জ্জন প্রদেশে গমন করার নাম পৈশাচ বিবাহ। ইহা আট প্রকার বিবাহের মধ্যে পাপজনক ও অতি অধম। (৯)

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে পৃথিবীতে যত প্রকার মত প্রচলিত আছে তন্মধ্যে মনু ও মহাত্মদের মত সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও দোষস্পর্শশূন্য নয়। তন্মধ্যে কেবল মনুর মতের দোষ গুণ বিচার করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

বিবাহ কাহাকে বলে এবং ইহার উদ্দেশ্যই বা কি এই গুরুতর প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? সাধারণ লোকে ইহার মূল অনুসন্ধান করিবে না, সুতরাং তাহারা এরূপ প্রশ্নে চমকিত হইয়া প্রশ্নকর্ত্তার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবে। তাহাদিগের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে প্রশ্নকর্ত্তা নাস্তিক নতুবা এরূপ স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত করিবেন কেন। তাহারা বলিবে শুভদিনে শুভলগ্নে বর ও কন্যাপক্ষীয়দিগের সম্মুখে অগ্নি সাক্ষী করিয়া কন্যা বরের যে পরস্পরের পাণি গ্রহণ তাহাই বিবাহ, আর পুত্র উৎপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য—আবার কি? কিন্তু চিন্তাশীল সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত—বিবাহের এই লক্ষণে ও শুদ্ধ এই উদ্দেশ্য নির্ব্বাচনে পরিতৃপ্ত হইবেন না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিবেন—বিবাহ কাহাকে বলে এবং ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? দেখা যাউক, আমরা এই চিন্তাশীল সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি কি না। মনু বলেন—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" পুত্র উৎপাদন করিবার নিমিত্ত স্ত্রী ও পুরুষের যে পরস্পর মিলন তাহাকে বিবাহ বলা যায়। কম্‌ট বলেন প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর সংসর্গনিরপেক্ষ হৃদয় ও মনের যে মিলন তাহাই বিবাহ। আমরা এই দুই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তয়িতার মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক বিবাহের এই লক্ষণ নির্দ্দেশ করি—প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর সংসর্গসাপেক্ষ হৃদয় ও মনের যে মিলন তাহাই বিবাহ। কম্‌ট যে বিবাহের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রণয়ের লক্ষণ বিবাহের লক্ষণ নহে। প্রণয় ও বন্ধুত্ব একই, তবে কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে স্ত্রী ও পুরুষের হৃদয় ও মনের মিলন হইলে তাহাকে আমরা প্রণয় বলি এবং স্ত্রী ও

(৮) হত্বা ছিত্ত্বাচ ভিত্ত্বাচ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ। প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে। ৩।৩৩

(৯) সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি। স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ৩।৩৪।

স্ত্রীর বা পুরুষ ও পুরুষের হৃদয় ও মনের মিলন হইলে তাহাকে আমরা বন্ধুত্ব বলি। সুতরাং বন্ধুত্বকে, যেমন আমরা বিবাহ বলি না, সেইরূপ শুদ্ধ প্রণয়কেও আমরা বিবাহ বলি না। আমাদিগের মতে হৃদয় মন ও শরীর—এ তিনেরই মিলন না হইলে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু এই দুঃখময় জগতে আমরা বিবাহের এ পবিত্র ও পূর্ণ ভাবের কত সহস্র ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। পৃথিবীর বিশেষতঃ হতভাগ্য ভারতভূমির প্রতিগৃহই এই ব্যতিক্রমের বিষময় ফল ভোগ করিতেছে। প্রতি সুশিক্ষিত ব্যক্তিরই হৃদয় এই বিষের জালায় জর্জ্জরিত। যাঁহারা ভাবিতে শিখেন নাই, যাঁহারা বিবাহকে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়সেবার উপায়স্বরূপ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের মনে কোন অসুখ নাই। স্ত্রীর সহিত শারীরিক মিলনেই তাঁহারা পরম সুখী। স্ত্রী দেখিতে সুন্দর হয়, ধনবান্ লোকের কন্যা হয়, এবং পুত্রপ্রসবিনী হয়, তাহা হইলেই তাঁহাদিগের পরম সুখ! কিন্তু যাঁহাদিগের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়াছে, যাঁহাদিগের চিন্তাশক্তি উদ্দীপিত হইয়াছে, এবং যাঁহারা সকল বিষয়ের তল স্পর্শ করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। প্রচলিত বিবাহে তাঁহাদিগের হৃদয়ের শান্তি হইতে পারে না। হৃদয়ে হৃদয়ে, মনে মনে, ও দেহে দেহে যে অদ্বৈত ভাব তাহার অভাবে তাঁহাদিগের সুখের উচ্চ আদর্শ পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। সুখের এই উচ্চ আদর্শের পরিতৃপ্তি বিরহেই অনেক সুশিক্ষিত যুবক শৃঙ্খল ভেদপূর্ব্বক বেশ্যালয় গমন প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যাঁহারা দাম্পত্য সুখের উচ্চ আদর্শ জানিতে পারেন নাই তাঁহারা এক প্রকার সুখে আছেন। কিন্তু যাঁহারা একবার সেই উচ্চ আদর্শ জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ইহার পরিতৃপ্তি বিরহে কখনই প্রশান্ত থাকিতে পারেন না। দাম্পত্য সুখে বঞ্চিত হতাশা-প্রপীড়িত যুবকের হৃদয়ের যে কি যন্ত্রণা, তাহা যিনি অনুভব করিয়াছেন তিনিই জানেন। আমরা সমাজ ও রাজবিধি হইতে অসংখ্য সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি বটে; কিন্তু আমরা সে সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত আছি, তথাপি দাম্পত্যসুখে বঞ্চিত হইতে চাহি না। আমরা পবিত্র দাম্পত্য সুখের বিনিময়ে প্রহরিপরিবেষ্টিত গগনস্পর্শিনী অট্টালিকায় রত্নখচিত পর্য্যঙ্কে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিতে চাহি না। আমরা পর্ণশালায় বল্কল পরিধান করিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করি তাহাতে আমাদের দুঃখ নাই, সমস্ত দিবস পর্য্যটনের পর সচ্ছন্দবনজাত ফল মূল শাকাদি দ্বারা জীবন ধারণ করি তাহাতে আমাদের দুঃখ নাই, কিন্তু তথাপি যেন আমরা সাবিত্রী শকুন্তলা ডেস্‌ডেমেনা প্রভৃতির ন্যায় স্ত্রী পাই। তাহা হইলে সেই বল্কল আমাদের বহুমূল্য বস্ত্র, সেই ভূমি আমা-

দের দুগ্ধফেননিভ শয্যা এবং সেই ফল-মূলাদি আমাদের বহুমূল্য মিষ্টান্ন হইয়া উঠিবে। যে বিষয়ে আমাদের জীবনের সমস্ত সুখ নির্ভর করিতেছে, সে বিষয়ে আমরা সমাজ বা রাজা কাহারও বাধা সহ্য করিতে পারি না। সমাজ বা রাজ-বিধির দোষে এ বিষয়ে আমরা অসুখী, হইলে যখন সমাজ বা রাজা আমাদিগের সে অসুখ নিবারণে অক্ষম, তখন তাঁহা-দিগের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত নহে। এ বিষয়ে যাঁহারা সুখ দুঃখের ভাগী তাঁহাদিগেরই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। আমরা নিজের বুদ্ধিতে চিরজীবন কষ্ট পাই তাহাতে আমাদিগের দুঃখ নাই, কিন্তু আমরা পরের বুদ্ধিতে একদিনও কষ্ট পাইতে চাহিনা।

পাঠক! বিবাহ বিষয়ে আমাদিগের মত ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক বৃদ্ধ মনুর কি মত। মনু যখন—বিপক্ষ কন্যাপক্ষীয়দিগকে হত ও আহত করিয়া প্রাচীরাদি ভেদ-পূর্ব্বক রোরুদ্যমানা ক্রোধান্বিতা রমণীর কৌমার্য্য হরণ করাও বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তিনি যখন—নিদ্রায় অভিভূতা বা মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা অনবধানযুক্তা রমণীতে নির্জ্জন প্রদেশে গমন করাও বিবাহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; তখন স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক আর অনিচ্ছাপূর্ব্বকই হউক সংসর্গ মাত্রকেই তিনি বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ দ্বয় যে মনুর মতে অতি নিকৃষ্ট তাহা নাম করণেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি এই অপকৃষ্টত্ব অবগত হইয়াও যে এতদ্বয়ের বিবাহত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে গভীর অর্থ নিহিত আছে। মনে কর এইরূপে বলপূর্ব্বক বা অজ্ঞানাবস্থায় যে রমণীর কৌমারব্রত ভঙ্গ হইল, তাহার অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল, এবং সেই বলকৃত বা অজ্ঞানকৃত সংসর্গে তাহার গর্ভসঞ্চার হইল। এ অবস্থায় সেই সংসর্গকে বিবাহ বলিয়া স্বীকার না করিলে সেই হতভাগিনী রমণীর এবং তদ্গর্ভোৎপন্ন নিরপরাধ সন্তানের দশা কি হইবে? মনু এরূপ বিবাহকে বিধিবদ্ধ করিয়া অতি বুদ্ধিমান্ ও দূরদর্শীর কার্য্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই। এরূপ ঘটনা যে সকল দেশেই সকল সময়ে ঘটিয়া থাকে তাহা কে অস্বীকার করিবেন? কিন্তু এরূপ বিবাহ বলপূর্ব্বক চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করা অনুচিত। যদি সেই রমণী সেই স্বামীর সহিত সহবাস করিতে না চান বিধি বা সমাজের তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সেই স্বামীর সহবাস করিতে বলার কোন অধিকার নাই। এরূপ অনিচ্ছা স্থলে সেই বলকৃত বা অজ্ঞানকৃত বিবাহকে শুদ্ধ সাময়িক বিবাহ মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করাই উচিত।

ক্রমশঃ।

